সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

সপ্তদশ বর্ষ । বৈশাখ ১৩৭৬

আমাদের শক্তি শুধু ইস্পাতেই নয়,
মানুষেও। বাঁচার মত বাঁচতে হ'লে শুধু খাওয়া
পরা নয়, তার সঙ্গে চাই সঙ্গীত, নৃত্য ও
অন্যান্য আনন্দের খোরাক। জামসেদপুরের
নাগরিক জীবনে তার সবরকম সুযোগ
সুবিধা আছে।
টাটা স্টীল

আনন্দে
উৎসবে
প্রয়োজন
সবার মনোরঞ্জনে
পরিনীমরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

আপনার
বাজেট্
ঠিক্ রাখুন

Orient
ENGINEERED
TO OUTLAST
MANY MANY SUMMERS
Orient
CEILING FAN
GUARANTEED FOR TWO YEARS
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
CALCUTTA-54
ASP/OGI-2/66

ভারত সরকার
পাঁচ বছর
মেয়াদী
জমা
স্বল্পকালীন লগ্নি হিসেবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়
এতে ৫% করমুক্ত সুদ পাওয়া যায়
প্রতি ১০০ টাকা জমা
৫ বছর পর ১২৫ টাকা হয়ে যায়।
৭০,০০০ টিরও বেশী পোষ্ট অফিসে এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া ও এর সহযোগি ব্যাঙ্কগুলির
২,৩০০ শাখায় ৫০ টাকার গুণিতকে
জমা নেওয়া হয়।
একজন ব্যক্তি ২৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত এবং দুইজন
যুক্তভাবে ৫০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত জমা
রাখতে পারেন।
এই রকম জমা টাকায়
সম্পদ কর
দিতে হয়না
জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা
করমুক্ত সুদ

খাঁটি জিনিস চান?

তাহলে এগমার্কা দেওয়া জিনিস কিনুন।

যাঁরা খাঁটি জিনিস চান তাঁরা সব সময়েই ঘি, মাখন, তেল, মধু, মসলা এবং কৃষিজাত অন্যান্য জিনিস কেনার সময় এগমার্কা দেওয়া জিনিসই কিনতে চান।

গত বছর প্রায় ১৫০ কোটি টাকা মূল্যের দুগ্ধ ও কৃষিজাত দ্রব্যাদিতে এগমার্কা দেওয়া হয়।

৮২ কোটি টাকারও বেশী মূল্যের এগমার্কা দেওয়া দ্রব্যাদি রপ্তানি করা হয়।

সুসজ্জিত পরীক্ষাগারগুলিতে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করার পর সরকার থেকে এই সরকারি গ্যারান্টি এগমার্ক দেওয়া হয়।

এগমার্ক—গুণ ও বিশুদ্ধতার নিদর্শন

davp 68/482
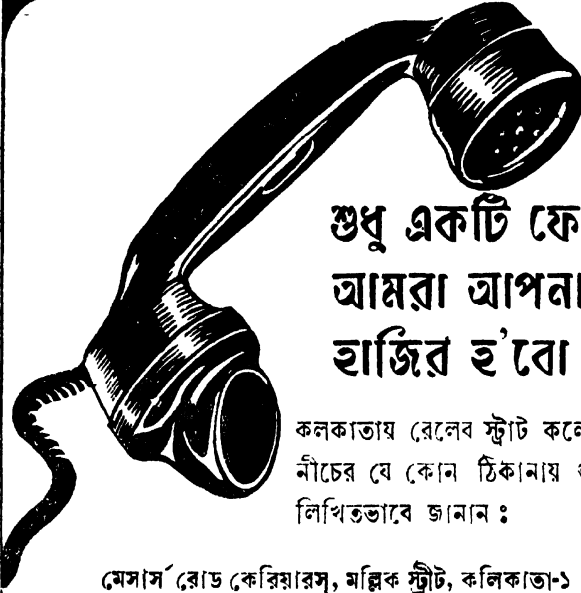
কলকাতায় রেলের স্ট্রাট কলেকশন ডেলিভারী সার্ভিস-এর জন্য নীচের যে কোন ঠিকানায় শুধু একবার ফোন করুন, কিংবা লিখিতভাবে জানান :

মেসার্স রোড কেরিয়ারস্, মল্লিক স্ট্রীট, কলিকাতা-১	ফোন ৩৩-৬৮৮৬ ৩৩-৭৮৯৪
এসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল অফিসার (ডেভেলপমেণ্ট) ৩ কয়লাঘাট স্ট্রীট কলিকাতা-১	ফোন ২৩-০২১১
চীফ পার্শেল এ্যাণ্ড লাগেজ ইনস্পেক্টর, হাওড়া	ফোন ৬৬-৪০৭৭
গুডস্ ইনস্পেক্টর, হাওড়া	ফোন ৬৬-৩৩৫৬
চীফ লাগেজ ইনস্পেক্টর, শিয়ালদহ	ফোন ৩৫-১২১১
গুডস্ সুপারভাইজার, শিয়ালদহ	ফোন ৩৫-১২১১

মাল সরবরাহের কাজ সুরু সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা এবং সংগ্রহের কাজ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা। কলকাতায় হাওড়া ও শিয়ালদহ দিয়ে একেবারে আক্ষরিক অর্থে দোর থেকে দোরে মাল সংগ্রহ ও সরবরাহের ব্যবস্থার সুযোগ নামমাত্র বাড়তিভাড়ায় আপনি পেতে পারেন। তাড়াতাড়ি মাল খালাস, প্রেরকের বাড়ি থেকে পুরো ওয়াগনের মাল সংগ্রহ এবং হাতে হাতে রেল-রসিদ প্রদান এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যের জন্য
মার্কেটিং এ্যাণ্ড সেলস্ অর্গানাইজেশন
৩ কয়লাঘাট স্ট্রীট কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৬২৫১ (এক্স-৬০)
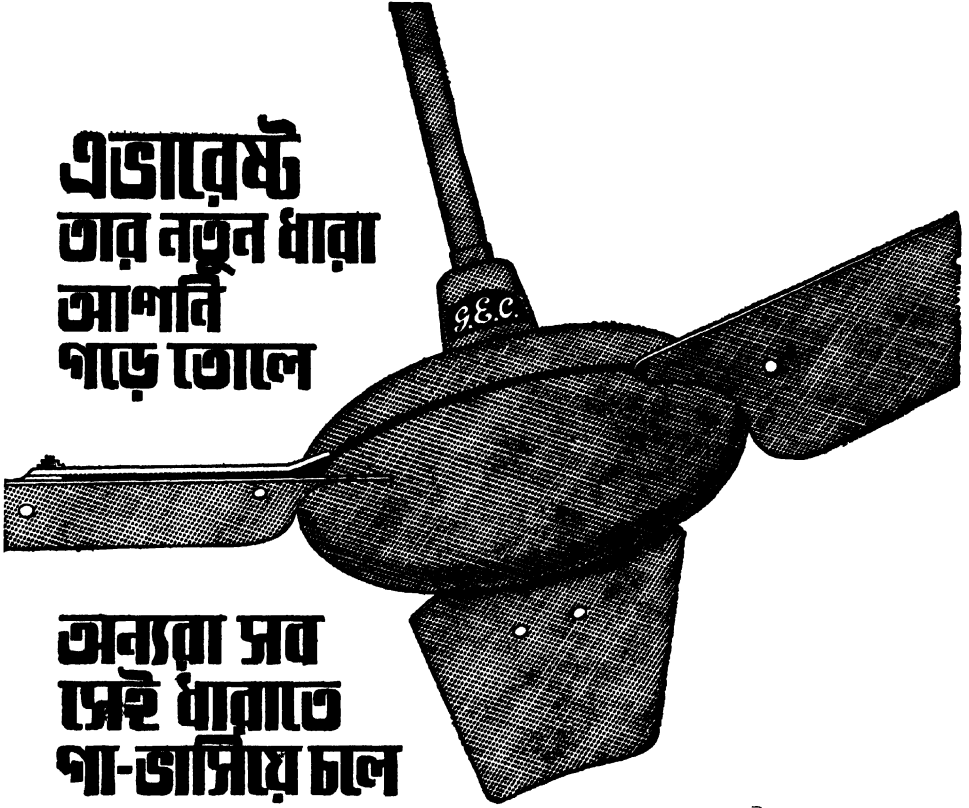
এক জাতি : এক প্রাণ

একই পতাকার নিম্নে এবং একই পতাকার প্রতি অকুণ্ঠভাবে অনুগত একই রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে এতো বেশী সাদৃশ্য রয়েছে যে যাঁরা ভারতকে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরুর প্রশ্ন থাকতে পারেনা। সকলেই সমান সুবিধে, সমান ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী ···। আমরা যে রাষ্ট্র স্থাপন করতে চাই তা হবে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পূর্ণ সমভাবাপন্ন ধর্ম্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র।
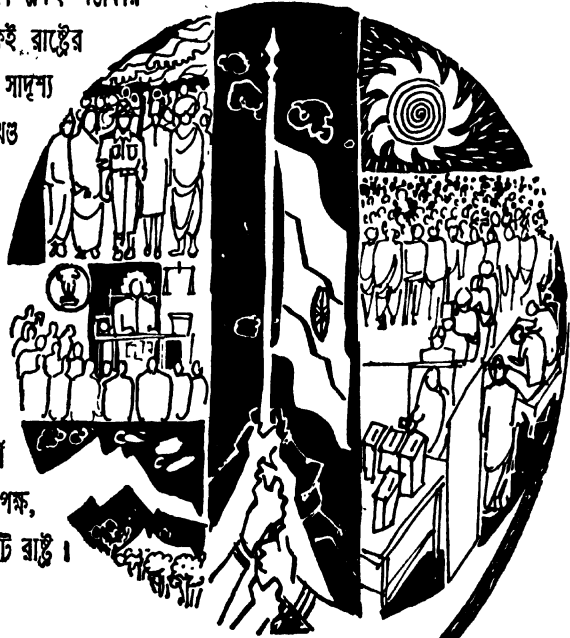
মহাত্মা গান্ধী

MAHATMA GANDHI
BIRTH CENTENARY
OCT 2.1968 TO
FEB 22 1970

महात्मा गांधी
जन्म शताब्दी
अक्तूबर 2.1968 से
फरवरी 22.1970
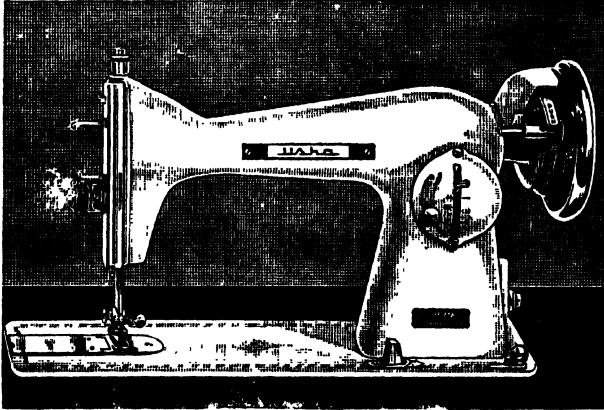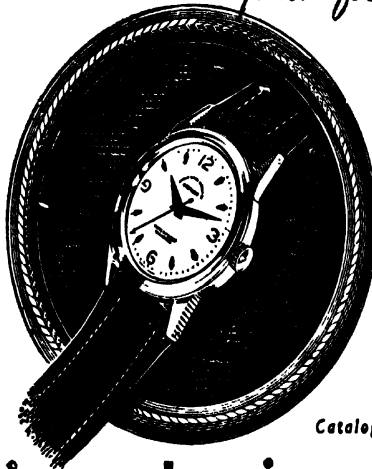
Yours for a lifetime
WATERPROOF • SHOCKPROOF
CAVALRY
NON-MAGNETIC • RADIUM DIAL
This handsome 17 jewelled centre second watch is built to give undeviating accuracy and to withstand rough treatment. It is unaffected by climatic changes and is the ideal watch for use in tropical countries.
FULL STAINLESS STEEL CASE
Catalogue sent free on request
anglo-swiss watch co. Calcutta 1.

QUALITY RUBBER PRODUCTS .....
OUR SPECIALITY
PATHASATHI
&
PATHABIR
CYCLE TYRE & TUBE
A.R.P
1 INSERTION SHEET
2 RUBBER TUBE & HOSE
3 V BELT
4 HORN-BULB
5 SOLE-HEEL
6 TRI-CYCLE RUBBER PARTS
7 SPONGE PAD
8 PEDAL
9 SADDLE-TOP
10 BRAKE-RUBBER
11 PLAY BALL
12 BLADDER
13 HOT-BAG
14 RUBBER CLOTH
15 ERASER
STOCKISTS ALL OVER INDIA
ASSOCIATED RUBBER & PLASTIC WORKS
CALCUTTA • DUM-DUM
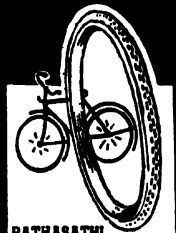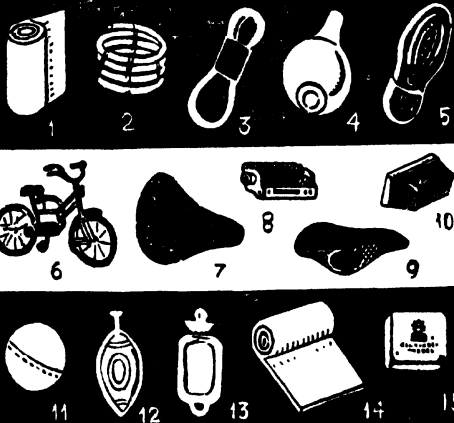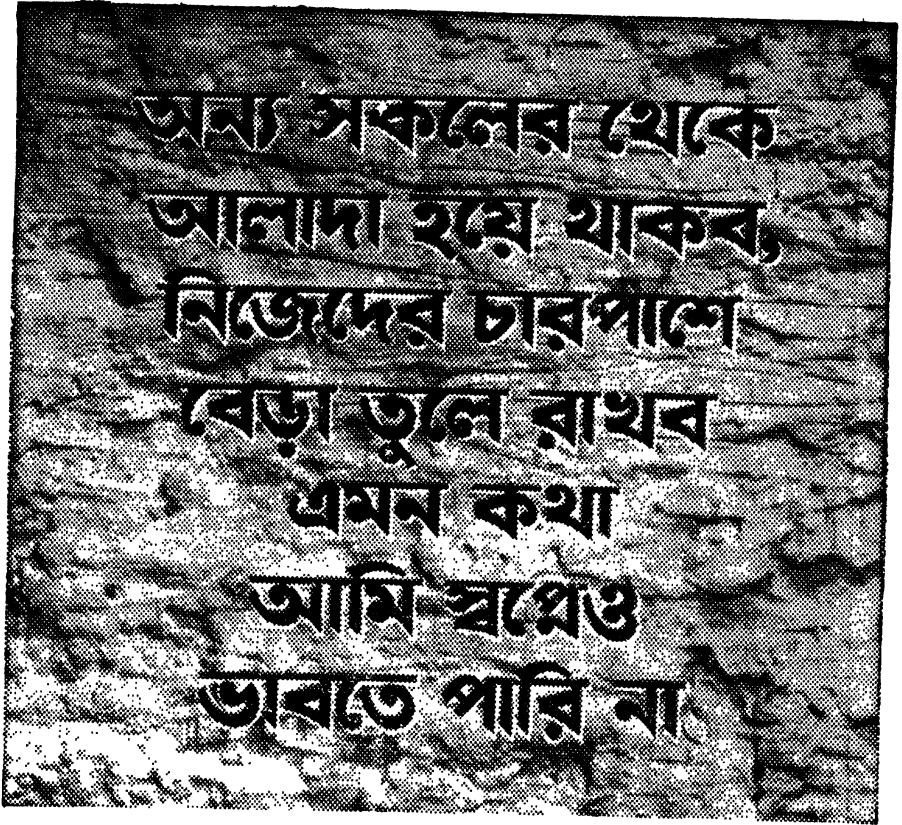
সপ্তদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচী পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মর্ডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

'জাতীয় মেলা জাতীয় জীবনে যে প্রেরণা দিয়াছিল তাহার ফলে বাঙালী সমাজ স্বদেশের উন্নতিকল্পে সবিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই। কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শরীর চর্চা, বিভিন্ন বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাহারা উদ্যোগী হইয়াছিল—পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। তথাপি এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ বিশেষ ভাবে করিতে হইবে, কেন না প্রধানতঃ জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান হইতেই তাহার উৎপত্তি। এই বিষয়টি হইল জাতীয় সঙ্গীত।

—হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১১২

"ইতিহাসে আমাদের নিকটতরকালে দেখি শিখগুরু গোবিন্দের শিষ্যবৃন্দের কাছ থেকে জাগতিক জীবন বিষয়ে তাঁর নেতৃত্ব প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন এ রকম ক্ষণভঙ্গুর জিনিষ দিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ না করতে। তেমনি ১৯২২ সালে যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর রাজনৈতিক যজ্ঞে শ্রীঅরবিন্দের সাহায্য চান তখন এই ঋষিও তাতে অস্বীকার হলেন, জানালেন পূর্ণ আধ্যাত্মিক সিদ্ধির অপেক্ষা করছেন তিনি, তা না হলে মানবজাতির প্রকৃত উদ্ধারের চেষ্টা শুধু বিভ্রমের সৃষ্টি করবে।"

—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত

রজনীকান্তের বহুদিনের অপূর্ণসাধ আজ পূর্ণ হইল। তাঁহার রোগশয্যা পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া কৃতজ্ঞ কবি অবনত মস্তকে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন। ভক্তিযমুনা ও ভাবগঙ্গার অপূর্ব সম্মিলন হইল। মরণপথের যাত্রী রবীন্দ্রনাথের চরণতলে যে অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য এতদিন সাগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—আজ তাঁহার সে প্রতীক্ষা সফল হইল। অশ্রুসজলচক্ষে তিনি জানাইলেন—'আজ আমার যাত্রা সফল হইল। তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া, তোমারি কণিকার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অমৃতের সন্ধানে ছুটিয়াছি। আশীর্বাদ করুন যেন আমার যাত্রা সফল হয়।

—কান্তকবি রজনীকান্ত

তেরশ' ছিয়াত্তর
বৈশাখ

সমকালীন

সপ্তদশ বর্ষ
১ম সংখ্যা

বাংলার লোকসংস্কৃতি ও বারজনসংস্কৃতি

বিনয় ঘোষ

ইংরেজিতে যাকে 'folk culture' বলে, বাংলাভাষায় তাকেই যদি 'লোকসংস্কৃতি' বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে 'people's culture' বা 'সাধারণ জনসংস্কৃতি' নামে যে কথাটি আজকালকার রাজনৈতিক শব্দকোষে অতি মাত্রায় উচ্চারিত হয়, তার সঙ্গে 'লোকসংস্কৃতিকে' সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা উচিত। 'Folk culture' ও 'people's culture' এক পদার্থ নয়, অথচ অধিকাংশ সময় এই দুটি ভিন্ন বস্তুকে আমরা এক ও অভিন্ন মনে করে থাকি। দুর্গোৎসব, দোল-উৎসব, সরস্বতীপুজো, কালীপুজো, শিবপুজো অথবা এইসব দেব-দেবীর পুতুল-প্রতিমা 'লোকসংস্কৃতি'র নিদর্শন নয়—সাধারণ জনসংস্কৃতির বা 'people's culture'-এর নিদর্শন—আমার মতে যার বাংলা প্রতিশব্দ 'বারজনসংস্কৃতি' হলে ভুল হয় না। আপাতত এই আলোচনায় আমি 'folk culture' অর্থে 'লোকসংস্কৃতি' এবং 'people's culture' অর্থে 'বারজনসংস্কৃতি' কথা দুটি ব্যবহার করব। আলোচনায় বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্টতা রক্ষা করার জন্য এরকম 'শব্দের' স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

দোল-দুর্গোৎসব, সর্বজনীন পুজোপার্বণ যেমন 'লোকসংস্কৃতি'র নিদর্শন নয়, তেমনি বাংলাদেশে পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিনে যে পৌষপার্বণ উৎসব হয়, যে 'নবান' বা নবান্ন উৎসব হয়—বিশেষ করে উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে, অর্থাৎ মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ও সদর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলে এবং বর্ধমান-বীরভূমের উত্তরখণ্ডের কোন কোন অঞ্চলে—তা হল পুরোপুরি 'লোকসংস্কৃতি'র নিদর্শন। কালীঘাটের কালীমন্দিরে নববর্ষের দিনে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও নতুন খাতা-সহ যে বিপুল জনসমাবেশ দেখা যায়, অথবা তারকেশ্বরে সপ্তাহান্তে যে পুণ্যার্থীদের প্রবল স্রোত বইতে থাকে, তার মধ্যে 'লোকসংস্কৃতির' চিহ্নমাত্র নেই, এগুলি বারজনসংস্কৃতির গড্ডল-প্রবাহ ও প্রকাশ মাত্র। কালীঘাটের পশুবলি, আর বাংলার উত্তর-রাঢ় অঞ্চলের শত শত মায়ের থান বা মাতৃস্থান, বা

মাতৃদেবীর স্থানের যে পশুবলি, তার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। এই অঞ্চলের প্রত্যেক জনগোষ্ঠী এইসব মাতৃস্থানকে 'মাই-থান' বলে এবং বর্ধমানের বরাকর অঞ্চলের কল্যাণেশ্বরীর এরকম একটি 'মাই-থান' নাম থেকে ইংরেজি 'মাইথন' নাম হয়েছে। এরকম কয়েকটি 'মাইথান' দুর্গম শালবনের গভীর অভ্যন্তরে খুব সম্প্রতি দেখে এলাম, ঝাড়গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত—উল্লেখ্যের মধ্যে একটি চিল্‌কিগড়ে কনক দুর্গার থান, মূর্তিহীন মা পরে স্থানীয় সামন্তরাজাদের পোষকতায় মূর্তিমতী স্বর্ণদুর্গা হয়েছেন—কিন্তু স্থান, পরিবেশ ও জনগোষ্ঠীর প্রভাবে তিনি আদৌ শহুরে দুর্গাদেবী হন নি, পরিপূর্ণ বনবাসিনী মাতৃদেবীই রয়ে গিয়েছেন। আর একটি ঝাড়গ্রাম থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে—বিহার-পুরুলিয়ার সীমান্তে কাঁকড়াঝোরের গহন শালবনের মধ্যবর্তী ভৈরবের থান—ভৈরব হলেও এটিও মায়ের থান। স্থানীয় সাঁওতাল ওঁরাও মুণ্ডা মাহাতো শবর প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর অন্যতম আরাধ্যা গ্রামদেবী। এখানে দেখেছি—শূয়োর পাঁঠা মুর্গী মোষ প্রভৃতি জীবজন্তুর বলির রক্তে থানের চারিদিকের মাটি এবং এ অঞ্চলের শুকনো মাটি—লালটুকটুক্‌ করছে এবং যা বর্ষাকালে পর্যন্ত নরম কাদা হয় না, তাও ভিজে কাদায় পরিণত হয়েছে। একদা এইসব মায়ের থানে 'নরবলি' হত এবং এই 'একদা' কিন্তু খুব বেশিদিনের কথা নয়—উনিশ শতকের শেষ দশকে পর্যন্ত হয়েছে—অর্থাৎ ৭০।৮০ বছর আগে। প্রাচীন বাংলা সাময়িকপত্রে এই সব স্থানের নরবলির অনেক সংবাদ পাওয়া যায় এবং সংবাদ পেয়ে তখনকার ব্রিটিশ শাসকরা পর্যন্ত যে কি রকম সন্ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হতেন, তারও অনেক খবর পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের অত্যধিক 'সভ্য' মনে করতেন এবং এই সব প্রথানুগামী জনগোষ্ঠীকে মনে করতেন বন্য, অসভ্য ও বর্বর—তাই আইন করে তাঁরা এসব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যদিও সামান্য জিনিসপত্র চুরির অপরাধে কলকাতা শহরের প্রকাশ্য রাজপথে জনতার সামনে অপরাধীকে ফাঁসিকাঠে লট্‌কাতে ব্রিটিশ শাসকদের সভ্যতায় তখন বাধেনি—আঠার শতক থেকে প্রায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত—যদিও এদেশের শতসহস্র নির্দোষ জনগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে নৃশংসভাবে কামান-বন্দুক দিয়ে হত্যা করে রাজসিংহাসন দখল করতে তাঁদের উন্নত ও পরিমার্জিত বিবেকে কোন দংশন হয়নি এবং আজও ভিয়েৎনামের পাইকারী নরহত্যার তাণ্ডব উৎসবে তা হয় না, বরং নরহত্যার পর অবলীলাক্রমে গির্জার হল ঘরে খ্রীষ্টোপাসনা করা যায় তাহলেও এদেশের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর 'নরবলি'র ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাঁদের কাছে বর্বর মনে হয়েছিল এবং তাঁরা এ অনুষ্ঠান অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন। অবৈধ ঘোষিত হবার পরেও দীর্ঘকাল এ প্রথা রহিত হয়নি, কারণ এ কোন কৃত্রিম ফ্যাশানের মতো প্রথা নয়। একটি নরবলির পরিবর্তে একটি বৃহৎ নরগোষ্ঠীর জীবনের সামগ্রিক বিকাশ, পূর্ণতা, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও কামনার সাবলীল স্ফূর্তি হবে—এই অগাধ অতল বিশ্বাস থেকে 'নরবলি'। আমাদের মতো শহুরে মানুষ, কৃত্রিম সভ্যতার প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের আওতায় প্রতিপালিত যারা, তারা ঠিক এই বিশ্বাসের গভীরতা ও তাৎপর্য—এই বিশ্বাসের ত্রিমাত্রিক রূপ বা দৈর্ঘ-প্রস্থ-বেধ, কিছুই বুঝতে পারব না। লটারীর টিকিট কিনে প্রাইজ পাওয়ার আশায় আমরা যারা কালীবাড়ি সওয়া পাঁচ আনার ডালা দিই এবং অর্থপ্রাপ্তি ঘটলে একটি ছাগশিশু বলি দিয়ে পুজো দেওয়ার মানত করি—তাদের বিবর্ণ ফ্যাকাশে বিশ্বাসের সঙ্গে এই সব আদি জনগোষ্ঠীর তাজা রক্তের মতো জীবন্ত বিশ্বাসের ব্যবধান আশমান-জমিন।

রক্ত—তাজা রক্ত হল জীবনের প্রতীক, বাসনা-কামনার পরিপূর্ণতার প্রতীক, কল্যাণের প্রতীক। নরকল্যাণের জন্য, নরজীবনের পূর্ণস্ফূর্তির জন্য নররক্তই শ্রেষ্ঠ এবং তার জন্য বনবাসিনী মায়ের থানে একটি নরবলি খুব বড় অপরাধ নয়, অন্তত মুনাফা বা সাম্রাজ্যলোভে আধুনিক যুদ্ধের নরহত্যার চেয়ে হীনতর অপরাধ নিশ্চয় নয়।

এবার আমরা লোকসংস্কৃতির প্রকৃত মর্মস্থলে পৌঁছেছি। হয়ত খানিকটা অন্তত আভাস দিতে পেরেছি—লোকসংস্কৃতির সঙ্গে বারজনসংস্কৃতির তফাৎ কি এবং কৃত্রিম শহুরে সংস্কৃতিরই বা পার্থক্য কি? নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার (Kroeber) অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় ও ভঙ্গিতে লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। ক্রোবার বলেছেন: "Folk Societies are attached to their soil emotionally by tie of habit, and economically by experience. Consequently they belong to that group of societies which identify themselves with their locality, in contrast to the sophisticated city-dwellere who float without roots but take pride in living in their era and day, and are therefore constantly subject to the play of fashion". লোক-সমাজ বা folk society, তাদের মাটি বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্কিত এবং এই অন্তরঙ্গতা, তাদের দীর্ঘকালীন বসবাস, অভ্যাস ও জীবনধারণের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ তাদের মনের শিকড় তাদের পরিবেশের মাটির গভীরে নিবদ্ধ ও প্রোথিত—সে পরিবেশ অরণ্যময় হোক, পর্বতসঙ্কুল হোক, আর বিচ্ছিন্ন গ্রাম্য হোক। তার কোল থেকে তাদের ছিনিয়ে নেওয়া, অথবা সেই প্রকৃতি থেকে তাদের সামাজিক শিকড়টি উপরে ফেলা সম্ভব নয়।

কিন্তু ঠিক এর বিপরীত হল, শহরের নাগরিক জীবন। সুসভ্য নগরের জনসমাজ হল ভাসমান জনপিণ্ড, নাগরিক পরিবেশের ইট-পাথর-লোহা কংক্রিটের মধ্যে তাদের মনের কোন শিকড় গজায় না—তারা কালের যাত্রায়, যুগের স্রোতের টানে ভেসে বেড়ায়—সেটাই তাদের গর্বের কারণ বলে তারা মনে করে, সতত পরিবর্তনশীল আধুনিকতার ফ্যাশানই তাদের অহঙ্কার ও আভিজাত্যের অবলম্বন হয়। লোকসংস্কৃতি তাই নাগরিক সমাজের, অথবা অন্য যে-কোন পরিবর্তনশীল সমাজের কৃত্রিম পরিবেশে বিকাশলাভ করতে পারে না। এমন কি পরিবর্তনশীল কৃত্রিম সমাজের জীবনযাত্রার সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে পর্যন্ত লোকসংস্কৃতির বিকৃতি ঘটে। বাংলার লোকসংস্কৃতি এরকম কৃত্রিম উপকরণ সংস্পর্শজনিত বিকৃতি থেকে নিস্তার পাইনি। তার কারণ যোগাযোগের পথঘাট ও যানবাহনের চলাচলের ফলে দুর্ভেদ্য বিচ্ছিন্ন অঞ্চলেরও বিচ্ছিন্নতা বলে আজ আর কিছু নেই এবং ক্রমেই সেই বিচ্ছিন্নতা দ্রুত অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। বাইরের কৃত্রিম জনসমাজের, টাউনের ও শহরের জীবনযাত্রার উপকরণ অনর্গল প্রবাহিত হচ্ছে সুদূর গ্রাম্য হাটবাজারে, উৎসব-পার্বণের মেলায় এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে folk-society বা লোকসমাজের জীবনযাত্রার উপর। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের ভাষায় একে urbanisation-এর প্রভাব বলা হয়। এই প্রভাবের ফল হচ্ছে এই যে লোকসমাজের বা লোকসংস্কৃতির অবিকৃতরূপ আর থাকছে না, তার স্বাভাবিক সারল্য ও অকৃত্রিমতা অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

দু'একটা দৃষ্টান্ত দিই। পৌষসংক্রান্তির সময় বাংলাদেশের বিখ্যাত উৎসব ও মেলার মধ্যে অন্যতম হল জয়দেব-কেঁদুলির মেলা—বর্ধমানে বীরভূমের সীমান্তে অজয়নদের তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামে। কুড়ি বছর আগেও দেখেছি এই মেলায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অন্তত পাঁচ-ছয় হাজার বাউলের সমাবেশ হত এবং বাংলার বাউলের এই কেন্দ্রীয় সমাবেশই ছিল কেন্দুবিল্বের প্রধান আকর্ষণ। তারপর থেকে গত বছর পর্যন্ত কমপক্ষে দশবার কেঁদুলির মেলায় গিয়েছি এবং বছরের পর বছর দেখেছি কেঁদুলি-মেলার ক্রমিক urbanisation ও অবনতি। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কেঁদুলির মেলা প্রায় কলকাতা শহরের ম্যারাপ-বাঁধা সাংস্কৃতিক মেলা ও অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আগে দেখেছি অজয়ের তীরে প্রচণ্ড শীতে গাছতলায় ধুনি ও আগুন জ্বালিয়ে বসে, দলে দলে বাউল-বাউলানীদের নৃত্যগীতের প্রাণখোলা উৎসব সারারাত্রি ধরে চলেছে এবং এক অদ্ভুত পরিবেশ রচিত হয়েছে কেঁদুলি গ্রামে। এখন আর সেই বাউলের সমাবেশ হয় না, সেই মেলাও হয় না। মেলার গ্রাম্য রূপ একেবারে বদলে গিয়েছে। প্ল্যাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম, সার্কাস, সিনেমা হোটেল গ্রাম্য মেলাকে গ্রাস করে ফেলেছে। গ্রাম্য যাত্রীদের ভীড় প্ল্যাস্টিকের দোকানে অথবা সিনেমায় ও সার্কাসে, আর দেশবিদেশের ট্যুরিষ্ট ও ভদ্রলোক যাত্রী যাঁরা, তাঁরা বিরাট এক ম্যারাপ-বাঁধা বাউলের আসরে ভিড় করেছেন—মঞ্চের উপর উঠে একেবারেই বাউলধর্মী নন এরকম কোন বাউলগুরু বক্তৃতা দিচ্ছেন মাইকে বাউল সম্বন্ধে, যার আগাগোড়া অর্থহীন—তারপর একে একে বাউলরা গান গাইছেন, তালি পড়ছে। দু-একজন বাউল পৃথকভাবে হয়ত দূরে আসর জমিয়েছেন—সামনে পোষ্টারে তাঁর পরিচয় লট্‌কানো এবং সেই পরিচয় হল এই যে তিনি একজন বেতারশিল্পী—এবং সেখানেও মাইক। মেলা থেকে একটু দূরে চলে গিয়ে অজয়ের তীরে দাঁড়িয়ে কেঁদুলির এই অনুষ্ঠানের মাইক-প্রচারিত যান্ত্রিক বাউল-কণ্ঠের কলরব শুনলে মনে হয়, কলকাতা শহরের কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গতানুগতিক বক্তৃতা ও গান শুনছি—যা শুনে শুনে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমস্ত অনুভূতি পর্যন্ত অসাড় হয়ে গিয়েছে। এই হল ১৯৬৮ সালের জয়দেব-কেঁদুলির বাউল মেলার রূপ—বাংলার লোকসংস্কৃতির এক গৌরবময় নিদর্শনের শোচনীয় পরিণতি। যে বাউল-গান একদিন যৌবনকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনে অফুরন্ত প্রেরণা সঞ্চার করেছিল এবং যিনি বাংলার লোকসংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের কঠিন ব্রত সারা জীবন গ্রহণ করেছিলেন বাউল সন্ধান ও বাউল-গানের সংগ্রহ থেকে শুরু করে।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেব—লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ লোকশিল্পের বা 'folk-arts'এর নিদর্শন। বিভিন্ন মেলায় স্থানীয় লোকশিল্পীদের কাঠের পুতুল ১৫।২০ বছর আগেও দেখা যেত। বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমান অঞ্চলের অনেক মেলায় দেখেছি তার সঙ্গে চমৎকার সব বেত-বাঁশের ঝুড়ি-ঝাঁপির বা basketryর নিদর্শনও। এখন আর একেবারেই তা দেখা যায় না। এগুলি প্রায় লোপ পেয়ে গেছে প্ল্যাস্টিকের পুতুলের বাহারের প্রতিযোগিতায়। কিছু লোকশিল্পের নিদর্শন আছে, যেগুলির প্রতি গভর্ণমেণ্টের 'patronising' দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে—তার মধ্যে প্রধান হল বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ো গ্রামের পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া এবং বাঁকুড়া মানভূম অঞ্চলের ডোকরা-কামারদের পিতলের মূর্তি। পাঁচমুড়োর মৃৎশিল্পীদের কথা বলি। প্রায় ১৭।১৮ বছর আগে বাংলার গ্রামাঞ্চল

পরিদর্শনকালে আমি যখন পাঁচমুড়ো গ্রামে যাই এবং সেখানকার মৃৎশিল্প সম্বন্ধে 'যুগান্তর' পত্রিকায় একাধিক সচিত্র পরিচয় প্রকাশ করি, তখন পাঁচমুড়োর মতো উপেক্ষিত গ্রাম বা সেখানকার মৃৎশিল্প তো দূরের কথা, বাংলাদেশের অনেকেই জানতেন না যে বিষ্ণুপুর একটা ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থান এবং সেখানকার দেবদেউল ও মন্দিরের পোড়া-ইটের কারুকলা লোকশিল্পের বিচিত্র কীর্তি। পাঁচমুড়োর কথা উক্ত পত্রিকায় প্রচারিত হবার পর এবং আমার 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর (জানুয়ারি, ১৯৫৭) কিছু কিছু টুরিস্ট সেখানে যেতে আরম্ভ করেন, তারপর সরকারী ব্যুরোক্রাটিক মন যখন জাতীয়তাবোধের উত্তেজনায় হঠাৎ দেশের লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে, তখন পাঁচমুড়োর মাটির হাতি, ঘোড়া প্রথমে কলকাতার কিউরিও শপে এবং পরে সরকারী sales emporium এর Show-case-এ স্থান পেতে থাকে। যেমন বাউলগান, তেমনি পাঁচমুড়োর হাতি-ঘোড়ার প্রতি ক্রমে কলকাতার শৌখিন সংস্কৃতিবিলাসীদের দৃষ্টি পড়ে এবং তার সঙ্গে বিদেশী ট্যুরিস্টরা, বিশেষ করে হুজুগপ্রিয় আমেরিকান ট্যুরিস্টরা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কলকাতার দোকান-পাট, এমনকি বড় বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর ও স্টেশনারী দোকানে পর্যন্ত বিক্রয়ার্থে পাঁচমুড়োর হাতি-ঘোড়া দেখা যায়—বারোয়ারী পুজোর স্টলেও এই হাতিঘোড়ার ভীড় হতে থাকে। পাঁচমুড়োর হাতিঘোড়া প্রাদেশিক ও ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে সুদূর ইয়োরোপ আমেরিকা পর্যন্ত যাত্রা করতে থাকে—অনেক foreign exchange উপার্জন করে। কলকাতা শহরেও দেখা যায় মুদ্রাস্ফীতিপুষ্ট একশ্রেণীর স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত—যাঁরা নতুন culture snob-এ পরিণত হয়েছেন—তাঁরা খুব সজাগ folk-culture—বিলাসী হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের drawing-room-এ পাঁচমুড়োর হাতিঘোড়া visitor-দের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান রয়েছে। সাম্প্রতিক কলকাতা শহরের শৌখিন বাবু-কালচারের একটা অন্যতম অঙ্গ হল folk-cultureএর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন এবং আধুনিক 'paraphernalia of urban middle-class gentility and culture' হল এইগুলি : (১) টবের ফুলগাছ (২) পাঁচমুড়োর হাতি-ঘোড়া ও কিছু মাটির ও কাঠের পুতুল (৩) রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বাউলগানের কয়েকটি রেকর্ড (৪) বাঁধানো ও গোছানো একসেট ঝক্ঝকে রবীন্দ্ররচনাবলী এবং (৫) নবকল্লোল, উল্টোরথ, সিনেমাজগৎ প্রভৃতি পত্রিকা। নবকালচারের এক বিচিত্র হিং টিং ছট্গোছের সংমিশ্রণ। কেঁদুলি ও পাঁচমুড়োর মতো আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এত নাগরিক অনুরাগ ও দরদ সত্ত্বেও, শহর-নগরের এত সামিয়ানা-ম্যারাপ-বাঁধা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘন ঘন লাউডস্পীকারে লোকসংস্কৃতির মাহাত্ম্য ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পাঠ্য বিষয় হওয়া সত্ত্বেও, লোকসংস্কৃতির গবেষণায় গণ্ডায় গণ্ডায় 'ডি. ফিল' হওয়া সত্ত্বেও, চার-পাঁচ কিলো ওজনের বড় বড় বই প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এত বিদ্বৎজনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেকচার সত্ত্বেও, এমন কি সরকারী sympathy অজস্র ধারায় বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, বাংলার লোকসংস্কৃতির অদৃষ্টে কি লাভ হয়েছে বা হচ্ছে ?

বাংলার গ্রাম্যজীবন, গ্রাম্য উৎসব-মেলা-পার্বণ ও লোকসংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে কিছুই লাভ হয়নি, বরং অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ও

হচ্ছে। পাঁচমুড়োর কথাই বলি। কয়েক বছর পর মাত্র মাস ছয় আগে একবার পাঁচমুড়ো গ্রামে গিয়েছিলাম—এত কাণ্ডের পর সেখানকার মৃৎশিল্প ও শিল্পীদের অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে দেখার জন্য। ভেবেছিলাম হয়ত কিছু ভাল ভাল পাকাবাড়ি, মৃৎশিল্পের ছোট ছোট workshop studio পাঁচমুড়োয় দেখতে পাব—যেমন কৃষ্ণনগরে ঘূর্ণী অঞ্চলে মৃৎশিল্পীদের পাড়ায় দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। বেশ বড় গ্রাম পাঁচমুড়ো—তার মধ্যে মৃৎশিল্পীদের পাড়াটির বিশেষ কিছুই উন্নতি হয়নি—গ্রামের ধানচালের আড়ৎদার ও ব্যবসায়ীদের অনেক উন্নতি হয়েছে। মৃৎশিল্পীদের বহু পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কয়েকটি পরিবারের মধ্যে যারা বিখ্যাত হাতি-ঘোড়ার যোগান দেয় কলকাতার বাজারে তাদের হাতে গোণা যায়। আগে তাদের আহার জুটত না, এখন মোটামুটি খেয়েপরে চলে যায়। দু-একজন প্রবীণ শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হল—অত্যন্ত নিরুৎসাহ দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—'কলকাতা তো পাঁচমুড়োর হাতি-ঘোড়ায় ছেয়ে গেছে, বিদেশেও যাচ্ছে—তাসত্ত্বেও তাদের অবস্থা এরকম কেন?' উত্তরে যা শুনলাম ও বুঝলাম সেটা অবশ্য ব্যবসার কথা—এবং ব্যবসায়ের মধ্যবর্তী দালালরা দু'পয়সা করছেন—শিল্পীরা বিশেষ লাভবান হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা হল—একদা আঞ্চলিক যে-সব লোক-উৎসব ও অনুষ্ঠানের সময় স্থানীয় গ্রাম্য লোকের পোষকতায় পাঁচমুড়ো ও অন্যান্য সংলগ্ন গ্রামের মৃত্শিল্প প্রতিপালিত হত, সেই সব উৎসব অনুষ্ঠান লোপ পাচ্ছে, তাদের অবনতি হচ্ছে। পাঁচমুড়োর মৃৎশিল্প স্থানীয় লোকসমাজের যে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক পরিবেশের মধ্যে বেঁচে ছিল, সেই পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ তার স্বাভাবিক মাটির শিকড়টি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—কাজেই শহরের টবের ফুল গাছের মতো তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেও বাঁচানো সম্ভব হবে না। কাজেই সরকারী পোষকতা, বিদেশী ট্যুরিস্ট ও মধ্যবিত্ত culture snobদের কৃত্রিম অনুরাগ এবং সামিয়ানাশ্রিত সংস্কৃতি-সম্মেলনের দরদী বক্তৃতা—কোন কিছুতেই বাংলার লোকসংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তার প্রধান কারণ তার যে আদি-অকৃত্রিম লোক-সামাজিক পরিবেশ—তার উৎস-স্বরূপ যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, ধ্যানধারণার গভীর ও সরল স্বাভাবিকতা—তার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে বর্তমান বিজ্ঞান, টেকনোলজি ও নাগরিকতার যুগে। কাজেই এখনও লোকসংস্কৃতির যে নিদর্শনগুলি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে, আমাদের কর্তব্য হল সেগুলির সঠিক নিখুঁত পরিচয় যথাসম্ভব সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে রাখা—লোকশিল্পাদির বিচিত্র নিদর্শন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রহশালায় রক্ষা করা এবং লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত ও লোক উৎসবের documentary film ও record যতদূর সম্ভব তৈরি করে রাখা—যাতে ভবিষ্যতের বংশধররা অন্তত তার একটা সত্যকার পরিচয় খানিকটা পেতে পারে। সময় থাকতে একাজ না করলে পরে যে আফশোস করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

আজকের বঙ্গসংস্কৃতির ধারার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একদিকে বারজনসংস্কৃতি যেমন সাহিত্য ও উৎসব-পার্বণের মধ্যে টিপিক্যাল 'mass culture'-এর বিকৃত মূর্তি ধারণ করছে, অন্যদিকে তেমনি লোকসংস্কৃতি হয়ে উঠছে নতুন নাগরিক বাবুকালচারের ফ্যাশানের বস্তু এবং একশ্রেণীর স্ফীতমুদ্রাপুষ্ট culture-snobদের ড্রয়িংরুমের সোহাগের জিনিস। এর কোনটিতেই বাংলার সংস্কৃতির মুক্তি হবে বলে মনে হয় না, পুনর্জীবন তো নয়ই।

শিল্পে ও শিল্পীর জাতি বিচার

অসিতকুমার হালদার

আমরা শাস্ত্র অনুযায়ী চলি, তাই শাস্ত্রের শস্ত্র আমাদের শিল্পকলাকেও জাতি-বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ করে টুকরো টুকরো করেছেন। পটুয়া যাঁরা, তাঁরা শূদ্র এবং কাঠের কাজ যিনি করেন তিনি সূত্রধর এবং ধাতু দ্বারা যাঁরা বস্তু নির্মাণ করেন, তাঁরা হলেন লোহার, স্বর্ণকার, কাঁসার প্রভৃতি··· মাটি দিয়ে যাঁরা গড়েন, তাঁরা কুমোর—এইরূপভাবে। তাই ছেলেবেলায় আর্ট স্কুলে কোনো বামুনের ছেলে মাটির কাজ শিখতে গেল, অমনি তাকে একঘরে করলে অন্য ছেলেরা—সে কুমোরের কাজ শিখছে বলে। অবশ্য অতটা না হোক, তাকে যে সবাই একটু হীনচক্ষে দেখতে লাগলো—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের এই জাতি-বিচারের ফলে এখনও রাজওয়াড়ার মুলুকে দেখা যায় যে শিল্পকলা এক এক জাতির লোকের মধ্যেই আবদ্ধ—তার আর প্রসার নেই। এমন কি, এক একটি অমূল্য কারুকলা ভারতবর্ষ থেকে সেই সব জাতির সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেতে বসেছে। এখন তাই আর House of artizan, অর্থাৎ, শিল্পী-পরিবারের লোক ছাড়া শিল্পকলা শেখাবার প্রয়োজন নেই—এ কথা বললে চলে না। শিল্পকলা যা Fine Art সেটি কেবলি পটচিত্রে আবদ্ধ নয়। রূপ, রং ঢং—এই নিয়ে শিল্প। সেটা কাগজের উপরই হোক, আর মাটি, পিতল লোহা, কাঠ—যারই উপর হোক। তাই যদি শিল্প—কারু ও চারু—দুই ভাবে চর্চ্চা করতে হয় যার যেটি সহজেই আসে, তারই সেটি চর্চ্চা করার দরকার। শিল্পকলা ভাবের রূপ। যা আমাদের আনন্দকে আহার-বিহারের অনিত্যতার উপর যুগে যুগে সবাইকার কাছে পৌঁছে দিতে পারে। সেই হলো শিল্প সৃষ্টি। এই শিল্প সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নিয়ে মানুষ জন্মেছে। এখন একে জাতের গণ্ডীর ভিতর আর আবদ্ধ করলে চলবে কেন? আমরা এখন শিল্পী বলে নিজেদের গৌরব করতে চাই। আমরা কেবল ধনীর পণ্যভার সৃষ্টি করবার জন্যে এবং জাতি-বিচার করে শিল্পকলার অগৌরব আর বাড়াবো না। আমাদের শিল্প-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-জীবনের উপর শ্রদ্ধা জন্মাবার চেষ্টা করবো। নিজেদের দেশের সব কাজে এবং সব জিনিষে দেশী শিল্পের ছাঁদ বা হাত থাকবে—তা পিতলের উপরেই হোক, লোহার উপরেই হোক বা আর যে কোনো ধাতুর উপরেই হোক।

শিল্পকলার জাতি-বিচার না হোক, শ্রেণী-বিচার হতে পারে, কিন্তু শিল্পীর জাত-বিচারের কোনোই উপকারিতা নেই। শিল্পকলা ভাল-জাতের ভাল-শিল্পীর গড়া—এইমাত্র জাতি-ভেদ সম্ভবপর।

রচনা-শক্তিটা কোনো জাতির পংক্তির উপর নির্ভর করে না। সরস্বতীর বর যিনিই লাভ করেন, তিনিই শিল্পী হতে পারেন—তা যে কোনো জাতের লোকই তিনি হোন্ না কেন।

অবশ্য আমাদের দেশে কতকগুলি কারুশিল্প বংশানুক্রমে চলে আসার কারণ এই যে তাতে করে শিল্পী-পরিবারের ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সকলেই শিল্পীকে সহায়তা করতে পারায় শিল্প-সম্ভার বেশী পরিমাণে তৈরী হতে পারে এবং সস্তায় বাজারে বিক্রয় সম্ভব হয়। এই অর্থনীতির দিক থেকে

এর উপকারিতা থাকলেও, তার নব নব উন্মেষলাভ এ উপায়ে ঘটে না। বরং একই ধাঁচের জিনিষ বংশানুক্রমে শিল্পীরা তৈরী করে চলেন। অভিনব জিনিষ রচনার ভার যেন তাঁদের পূর্ব্বপুরুষরাই নিয়ে চুকেছেন—অধিক আর তাঁদের কিছু করবার নেই। অবশ্য জিনিষটির পরিকল্পনা যাই হোক, তার তৈরী করার কৌশলের তারিফ না করে থাকা যায় না। যেমন, মুরাদাবাদি বাসনের উপর কারুকার্য্য। বাংলা দেশের কালিঘাটের পট প্রভৃতির শিল্পী—এঁরা তাঁদের বাপ-দাদার আমলের পরিকল্পনার বোঝা অক্লেশে গ্রহণ করে চলেন। তাই এঁদের সৃষ্টিকার্য্যে অনাসৃষ্টিতে পরিণত হতে বেশী বিলম্ব হয় না। কাজেই এখন আমাদের দেখা দরকার যে কেবল একটির পর একটি পরিকল্পনাকে নকল আবহমানকাল শিল্পীরা করবেন, না, নতুন নতুন চিন্তার দুয়ার উদ্‌ঘাটিত করবেন।

যদি শিল্পকলাকে আমরা বাজারের পণ্যকলা (Commercial Art) করে রেখে নিশ্চিন্ত না হই, তবে আর জাতি-বিচার করে হাত গুটিয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের জাত-হাঁড়ির ভিতর ছুঁই-ছুঁতে যে আছে, তা জানা কথা…কিন্তু শিল্পকাজেতেও আর ছুঁই-ছুঁতে কাজ কি?

অনেকে প্রাচীনকালের দোহাই দেন। কিন্তু বহু প্রাচীনকালে শিল্প-শিক্ষা রাজন্যবর্গদের উচ্চশিক্ষারই অন্তর্গত ছিল, প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। জাতি-বিচারটি কোনো সময় ভারতে বৌদ্ধ-প্রভাব যাবার পর ছুঁই-ছুঁত হয়েছিল, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা বিশেষভাবে বলতে পারবেন।

শিল্পকলায় শিল্পীদের ছুঁই-ছুঁত ছাড়াও মেয়েদের গান শেখানো ও ছবি শেখানোকে আমাদের মধ্যে অনেকেরই আপত্তি আছে দেখা যায়। অথচ মেয়েদের এই কারু ও চারুশিল্প থেকে বঞ্চিত করে তাঁদের সংসারের কাজে লাগানোর জন্য আমাদের দেশের যে কত ক্ষতি, তা আমাদের বুদ্ধিরও অগোচর। কতকগুলি কারুশিল্পকলায় স্ত্রীজাতির বিশেষত্ব আছে—তার মধ্যে সূচীকার্য্য এবং চিত্রকলা হলো সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। বাঙলার মেয়েরা আলপনার মাধ্যমে তাঁদের কলালক্ষ্মীর পূজা সম্পাদন করে থাকেন। ছুঁচের কাজ পশ্চিম অঞ্চলে মেয়েদের সখের কাজ এবং সৌখীন কাজ। লেখক চিকণের সূক্ষ্ম-কাজ মেয়েদের হাতে যা দেখেছেন, সেরূপ কাজ অতি-সূক্ষ্ম কলের সাহায্যেও করা সম্ভবপর নয়। একটি লক্ষ্ণৌয়ের দোপাল্লি-টুপিতে সেইরূপ কাজ করতে ২০০ টাকা ব্যয় হয়।

এখন শিক্ষা-দীক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং স্ত্রীশিক্ষার কদর হওয়ায় আশা করা যায় যে দেশের মেয়েদের জন্য শিল্পকলা চর্চ্চার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র হবে—তাতে কোনো জাতি-বিচার থাকবে না।

অতীত-ভারতকে আধুনিক ভারতে জীবন্ত করার উপায় ছুঁই-ছুঁতে নয়, তার এই শিকল কেটে দিয়ে তাকে সব বিষয়ে মুক্তি দেওয়ায়।

আসল কথা, মানুষের মনে—সে যে জাতেরই মানুষ হোক না কেন, যদি সুর রঙের আনন্দ সহসা রূপ পাবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে, তখন আর কিছু বাধাই বাধা থাকে না। ঠিক যেভাবে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে সব ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হতেন, যার ভিতর সেই বড় শিল্পীর ডাক পৌছেছে তাকে তাঁরই কাছে ছুটে যেতে হবেই হবে। তার কাছে আর জাতিভেদের

বর্ণভেদের শাসন-বারণ চলে না।

আমাদের দেশের শিল্পের দুর্গতির আরেকটি বিশেষ কারণ হচ্ছে—পরস্পর পরস্পরকে না শেখানো। এমন কি, নিজের ছেলেকেও কখনো কখনো আমাদের দেশের কারিগরেরা তাদের বিদ্যা ভালো করে শেখাতে চায় না। এইভাবে ভারতের অনেক শিল্পকলা একেবারে লোপ পেয়ে গেছে—তার আর পুনরুদ্ধারেরও আশা নেই।

শিল্প-বিদ্যাকে অর্থকরী-বিদ্যায় পরিণত করায়ও এই এক দোষ জন্মায় যে পরস্পর পরস্পরের প্রতিচ্ছবি হওয়ায় শিল্পীরা তাঁদের বিশেষত্বটি নিজের কাছ থেকে অপরের কাছে প্রকাশ করতে চাননা। শুধু শিল্পকলা কেন, ভারতের ভালো ভালো ওষুধপত্রও এই একই কারণে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেছে।

গভর্ণমেন্টের হাতে শিল্প-শিক্ষার ভার দিয়ে আমরা এখন বসে আছি। কিন্তু আমরা এটা বুঝতেও পারি না যে শিল্পকলার উন্নতির প্রকৃত পথের সন্ধান সরকারী লোকদের লেফাফা-দুরস্ত কাজের লোহার ফ্রেমের মধ্যে মেলা দুষ্কর…বেসরকারী বেপরোয়া মুক্ত জনসাধারণের মধ্যে গুণগ্রাহী রসগ্রাহী মানুষদেরই হাতে নেওয়া দরকার। সরকারী শিল্প বিদ্যালয় শিল্পশিক্ষা যত দিক না দিক, পরীক্ষা নেবার বাঁধা রুটিনে চলবার এবং নিয়মিতভাবে তাঁদের সার্টিফিকেটের ছাপ দিয়ে বিদায় করবার রাস্তা বলে দিতে পারবে। সরকারী কর্মচারীটি পরীক্ষার নিয়ম, উপস্থিতি-অনুপস্থিতির বাঁধা শাসনের অস্ত্রশস্ত্র শানাতেই ব্যস্ত—শিল্পকলায় ছাত্রদের মন ধরা দিলো কি দিলো না, তা দেখবার তাঁর ফুরসৎ নেই। এই ভাবে দেশের শিল্পের জাতি ও শিল্পীদের জাতি-বিচার যদিও উঠে যাচ্ছে, কিন্তু জাতিগত কুসংস্কার যে একেবারে যাচ্ছে বলে তো আমাদের মনে হয় না।

বাংলাদেশে বেসরকারী শিল্প-বিদ্যালয় দুটি তিনটি ছিল, এখন সেগুলির কিরূপ অবস্থা—আমাদের জানা নেই। সেগুলিকে ভালো করে কোনো ভালো শিল্পীর হাতে চালাবার ভার দেওয়া যায় তো দেশের আর্টের পক্ষে অনেক উপকার হয়।

এখনকারকালে ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অপেক্ষা বাঙালীর শিল্পকলায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যতই অগ্রসর হবেন, ততই দেশের আর্থিক উন্নতি হবে—নচেৎ আর্টের চর্চ্চাটাও মাড়োয়ারীর নিকট গচ্ছিত বাংলার ধন-ঐশ্বর্যের মতোই স্থগিত থেকে যাবে।

বাঙলার মেয়েদের, ছেলেদের মতোই এখন শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ণতা আনতে হবে এবং তার জন্য শিল্প-শিক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ। এখন আর কোনো জাতি-বিশেষের হাতে শিল্পকলার প্রসারের ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। এখন আর ব্রাহ্মণের পূজাপাঠ, বৈশ্যের বাণিজ্য, শূদ্রের চাষবাস নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ভারতবর্ষের গণ্ডী এখন ভারত ছাড়িয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে গেছে। এখন ভারতের লোক তার বাইরের দুনিয়ার শিক্ষা-দীক্ষার আলোক নিত্য লাভ করছে। তাই তাদের এগিয়ে চলতে হবে তারই ছায়ায় ছায়ায়। এখন গণ্ডীর ভিতর শিল্পলক্ষ্মী সীতা দেবীর মতো বন্দী হয়ে নেই। পৃথিবীর প্রবল যাবনিক শিক্ষা দশ হাত দশ মুণ্ড বিস্তার করে তাঁকে হরণ করেছে, তাই তাঁকে পুনরায় আহরণ করতে হলে তারই সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাকে বশ করে ফিরিয়ে আনতে হবে। *

* স্বর্গীয় অসিতকুমার হালদার যখন লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং যে সময়ে মহিলাদের মধ্যে শিল্পচর্চ্চার প্রচলন ছিল না, সেই সময়ের পারিপার্শ্বিকে এই অপ্রকাশিত লেখাটি রচিত হয়েছিল ॥—সম্পাদক

বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ

অমিয়কুমার মজুমদার

রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞানী বললে আধুনিক বিজ্ঞানীজগতে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, কঠোর সমালোচনা হবে লেখকের অর্বাচীনতার বিষয়ে এবং সাহিত্যিক বা সাহিত্যের অধ্যাপকেরাও যে মারমুখী হয়ে উঠবেন এ আশঙ্কাও আছে। কিন্তু নানাবিধ এবং বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে যিনি তাঁর সত্য পরিচয় ঘটিয়েছেন, জীবনযাত্রার প্রতিপদে যিনি প্রতিটি অপবিশ্বাস বা কুসংস্কার সমূলে উচ্ছেদ করে এসেছেন, অজ্ঞানতার ও অন্ধবিশ্বাসের গাঢ় পঙ্ক থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে যিনি আজীবন নিন্দুকের 'শিকার' হয়েছেন তাঁকেই তো বলা যায় প্রকৃত বিজ্ঞানী। যাঁরা কলেজে বিজ্ঞান শিখে বিজ্ঞানের অন্দরমহলে প্রবেশ করেও নানা কুসংস্কারের দাস তাঁকে কেমন ক'রে বলি বিজ্ঞানী! যেখানে মন অবৈজ্ঞানিক সেখানে কর্মের ক্ষেত্রে যাথার্থ কৃতকার্যতা অসম্ভব। একথা মানি বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের কোন নতুন দান নেই। তা না থাক, তিনি বিশ্বের বিজ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এদেশের চিত্তভূমিতে। তার ফলে চিত্তভূমি হয়েছে উর্ব্বরা। বিজ্ঞানের ফসল ফলানো যাতে জীবধর্ম হয়ে ওঠে তার অন্যতম সার্থক প্রয়াস। তাই তিনি বিজ্ঞানী। আমাদের দেশে অনেক বিজ্ঞানী আছেন। কিন্তু জনসাধারণ তাঁদের অধিকাংশেরই শিক্ষার দান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তাঁরা শিখেছেন অথচ 'পারিবে না করিতে প্রয়োগ'। এ যেন অভিশপ্ত কচের মতো শিক্ষা ব্যর্থতার গ্লানিতে মুখ লুকিয়ে আছে। দেশের প্রাণের সঙ্গে দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান, শিক্ষার এই লাঞ্ছনাময় পরিণতি রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল বেদনা দিয়েছে এবং একারণেই তিনি এ বিষয়ে সজাগ হতে বরাবর বলে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই বিজ্ঞান-প্রীতি নিয়ে আলোচনার কালে মনে পড়লো আর এক কবির কথা। তিনি গ্যেটে। দুজনের মধ্যে মিল রয়েছে প্রতিভার ক্ষেত্র ও প্রভাব নিয়ে। গ্যেটে একাধারে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অথচ তিনি কেবলমাত্র ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও কবি বলেই খ্যাত হয়ে আছেন। বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর দেহতত্ত্বের পরীক্ষা বিপ্লব এনেছিল এবং অপটিকস্ ও রং সম্বন্ধে তাঁর মতামত আজ বিজ্ঞানীরা নাকচ ক'রে দিলেও অন্যদিক থেকে যথেষ্ট মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানী নন। বিজ্ঞান তিনি ভালোবাসতেন এবং এই ভালোবাসায় সোনালী রং ধরেছিল।

বিদেশী মনীষীদের সঙ্গে কথায় রবীন্দ্রনাথের এই বিজ্ঞানী মনটি ফুটে ওঠে। রোঁমা রোঁলা ও এইচ. জি. ওয়েলস-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বার্তালাপের (১) খানিকটা তুলে ধরলেই তা প্রাঞ্জলিত হবে।

রোঁলা: আমার বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ভারতের নানা প্রশ্নের (সমস্যার) সমাধান করতে সাহায্য করবে।

রবীন্দ্রনাথ: আমি জানি ভারত দীর্ঘদিন ধ'রে কেবলমাত্র বুদ্ধি সঞ্জাত বিচার-নিষ্পত্তিকে

মেনে নিতে পারে না। সমতা ও সাম্যাবস্থা ফিরে আসতে বাধ্য। এ কারণেই একদিকে ঝুঁকে পড়লে তা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সমন্বয় সাধনে সাহায্য করবে। বিজ্ঞান আমাদের সাহায্যে অবশ্যই আসবে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে মানবোচিত ক'রে তুলবো।

রোঁলা: আজকের জগতে বিজ্ঞানই বোধকরি সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাছে পারস্পরিক সহযোগিতার স্পৃহা তার নিদর্শন। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতিজ্ঞদের হাতে রয়েছে 'বিষবাষ্প'। একথা মর্মন্তুদ যে বিজ্ঞানীরা আজ সামরিক শাসন যন্ত্রের পরিচালনাধীনে আছেন, মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রগতি সম্বন্ধে যারা ন্যূনতম উৎসাহী।

ওয়েলস্‌কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'বোধহয় উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থ বিজ্ঞান প্রতীচ্যকে শ্রেষ্ঠ জাতি বোধের চেতনা এনে দিয়েছে। প্রাচ্যদেশে এই পদার্থ বিজ্ঞান নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ ক'রে নিলে স্রোত উল্টোদিকে বইতে পারে এবং তা হয়তো স্বাভাবিক ধারা নেবে।'

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, ভারতবর্ষে যদি সত্যিকারের বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহলে গোড়া থেকেই তার অর্থশাস্ত্র, তার কৃষিতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিদ্যা, তার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে নিজের প্রতিষ্ঠাস্থানের চারদিকের পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করে দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করবে, গো-পালন করবে, কাপড় বুনবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করে ছাত্র, শিক্ষক ও চারদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হবে।

শান্তিনিকেতনের তৎকালীন বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনগুপ্তকে কবি বলেছিলেন (২) 'বাইরে দেখে এসেছি সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত, রাশিয়াতে প্রজাসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে হয়েছে, বঞ্চিত এই দেশবাসীর কাছে তা ইন্দ্রজাল বলেই মনে হ'লো। চিত্ত ও বিত্তের আদান-প্রদান সেখানে বুদ্ধি বিচারের সঙ্গে চালনা হয়েছে বলেই এত দ্রুত বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হয়েছে। এদেশে এই জনহিতকর শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা যথাসাধ্য করেছি, হয়তো তাতে একটা ক্ষীণ স্রোত বইছে, বিজ্ঞান শিক্ষার এই স্রোত যাতে কোথাও বাধা না পায় তার দায়িত্ব রেখে গেলুম তোমাদের উপর, এই শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে যারা কাজ করছ তাদের আমি আশীর্বাদ করছি।'

রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন যাতে শিক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে। যাতে হাতের ও চোখের দক্ষতা ও বস্তু পরিচয় ঘটে এমন শিক্ষা দেবার জন্য তিনি তাঁর আশ্রমে বহুদিন ধরে চেষ্টা ক'রে এসেছেন। কিন্তু তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। তার কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'উদ্যোগশিক্ষা' (৩) প্রবন্ধে বলেছেন: 'সফলতা লাভ করিতে পারি নাই তাহার একমাত্র কারণ পুঁথিগত বিদ্যায় আমাদিগকে কেবল যে অকর্মণ্য করিয়া দিয়াছে তাহা নহে, পুঁথির বাহিরে সত্য কিছু আছে তাহার প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য চলিয়া গেছে। বই পড়াইবার ক্লাস আমরা সহজে চালাইতে পারি কিন্তু কেজো শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কি, করা যায় আমরা ভাবিয়া পাই না এবং সে সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা যায় না।'

পাশ্চাত্যে যে যন্ত্রের পুজো হয় তাতে মানুষের বুদ্ধি লাগে, প্রয়োজন হয় উদ্যমের। ফলে

প্রকৃতির ক্ষেত্রে মানুষ নতুন নতুন পথ উদ্ঘাটন করছে। কিন্তু আমাদের সমাজ যে সব নিয়মে চলছে তাতে বুদ্ধিকে প্রবেশ করতে দিলেই বিপদ, তার জন্যে কেবল পুঁথি আবৃত্তি করতে হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের প্রশংসা করে বলেছেন ইয়োরোপ যে বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছে তার মূলে রয়েছে তার বিজ্ঞান। তা শাশ্বত, সর্বকালীন ও সর্বজনীন। যে বর্বরতা আপন প্রয়োজনটুকুর উপরেই সমস্ত মন ঢেলে দেয়, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে, ইয়োরোপ তাকে অনেক দূরে অতিক্রম ক'রে গেছে। ইয়োরোপ এমন এক সত্যের নাগাল পেয়েছে তা শাশ্বত, সনাতন। তা হলো তার বিজ্ঞান। কোন কারণে যদি ইয়োরোপের দৈহিক শক্তির বিনাশও ঘটে তাহলেও এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার বিলুপ্তি কোনদিন ঘটবে না। কবি তাঁর এক ভাষণে (৭) (৯ই পৌষ, ১৩৩২ তারিখে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষদে আচার্যরূপে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ) বিজ্ঞানকে তিনি এক অভিনব স্থান দিয়েছেন।

'পশ্চিমমহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর ক'রে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে দেখবো, আত্মম্ভরী পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার। বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানেই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা, বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে।'

দেশের চিত্তক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সেচন যথেষ্ট ব্যাপক না হলে আমরা চিরদিন অকৃতার্থ হয়ে থাকবো। বিজ্ঞান-শিক্ষার অভাবে অন্ধসংস্কার ও অপবিশ্বাস অবাধে জাতির বুদ্ধি বিকার ঘটিয়েছে, গড়ে তুলেছে মূর্খতার সুউচ্চ প্রাচীর। তারই চাপে দেশবাসী ডুবছে অতল তলে, হচ্ছে ভরাডুবি। দেশবাসীকে সচেতন করিয়ে তিনি বারে বারে বলেছেন—'প্রকৃতির সঙ্গে সত্য পরিচয় না থাকলে জীবনযাত্রায় মূঢ়তার দ্বার অবারিত থাকে, সকল প্রকার অপবিশ্বাস অবাধে সমাজের ভাবনা কল্পনা ও ক্রিয়াকলাপকে অধিকার ক'রে বসে, প্রকৃতির সঙ্গে তার সত্যব্যবহার ভ্রষ্ট হয়ে মানুষকে পদে পদে অকৃতার্থ করে দেয়। আমাদের দেশে এই দুর্গতির দৃষ্টান্ত পরিব্যাপ্ত। আমাদের অধিকাংশ পরাভবের মূল এই অজ্ঞানের মধ্যে। এই জন্য আমি মনে করি দেশকে বিজ্ঞান শিক্ষায় অভিষিক্ত করে দেওয়া তার সফলতা সাধনের উদ্দেশ্যে একটি মহৎ কর্তব্য।'

রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি, নিজের একান্ত পরিজনের মধ্যেও বিজ্ঞান ভাবনা; বিজ্ঞান-চিন্তার প্রবাহ প্রবেশ করাতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী শুধুমাত্র প্রগতিশীল নয়, অত্যন্ত বাস্তবপন্থীও। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বোলপুর থেকে তিনি বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন,

'......কে এণ্ট্রেন্স পাস করিয়েই আমি জাপানে mining অথবা আর কোন practical বিষয় শিখতে পাঠাব। আমার উদ্দেশ্য এই যে, শিখে এসে সে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারবে। সন্তোষকে (শ্রীশচন্দ্রের পুত্র) পাঠাও না। বেশি খরচ নয়— মাসে ৬০৲ টাকা মাত্র। তুমি যে কোন বিষয়ে তাকে পারদর্শী করতে চাও সেখানে তারই সুবিধা আছে। বুঝতেই পারচ বাঙালিদের চাকরি প্রভৃতি সমস্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছে—ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়

অতএব একটা কোন অর্থকরী শিল্পবিদ্যা না শিখতে পারলে উপায় নেই—য়ুরোপে শিখতে দেবে না অর্থও ঢের লাগে—জাপানের উপরেই আমাদের একমাত্র ভরসা—কিন্তু সেও বেশিদিন নয়।' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দও অনুরূপ কথা দেশবাসীকে বলেছিলেন। টেকনিক্যাল এডুকেশন চাই, যাতে মানুষ চাকরী না করে দু-পয়সা রোজগার করে খেতে পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা লেখকের এক গ্রন্থে (৫) আছে।

১৩১৪ সালের ৯ই ভাদ্র তারিখে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখেন, (৬) 'নগেন্দ্রকে (কবির কনিষ্ঠজামাতা ডঃ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) কৃষি শিক্ষাতেই প্রবৃত্ত করিয়ে দেওয়া ভাল। Ceramics শিখে এদেশে সুবিধা হবে না। এখানে একটি মাত্র কম্পানি আছে তার অর্থাভাবে শোচনীয় অবস্থা। নিজের টাকায় একাজ চলবে না। অতএব ওকে এমন একটা কিছু শিখিয়ে নিস যাতে ও তোদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে পারে।'

রথীন্দ্রনাথকে লেখা আরও একখানা চিঠিতে কবির কুটিরশিল্পের প্রতি আগ্রহ ফুটে উঠেছে—

'ধানভানা সন্ধান দেখিস। তারপরে এখানে চাষাদের কোন industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না—এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিষটাকে Cottage idustry রূপে গণ্য করা চলে কি না। একবার খবর নিয়ে দেখিস অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কি না। মুসলমানরা যেরকম সানকির জিনিষ ব্যবহার করে এরা যদি সেইরকম মোটা গোছের প্লেট, বাটি, প্রভৃতি করতে পারে তাহলে উপকার হয়।

আরেকটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরী করতে শেখানো। সেরকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে।

নগেন্দ্র বলছিল খোলা তৈরী করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাত দিতে চায় পেরে ওঠে না—খোলা পেলে সুবিধা হয়। যাই হোক ধানভানা কল Potteryর চাক ও ছাত তৈরীর শিক্ষকের খবর নিস।

ব্যবহারিক শিক্ষার দিকে তাঁর যে ঝোঁক ছিল তা ক্ষণিকের নয়, দীর্ঘস্থায়ী এবং তাঁর দৃষ্টির মধ্যে এক সুদূর প্রসারী ভাব বিরাজিত। ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুরকে ১৩১২ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে তিনি এক পত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে কবির বিজ্ঞান-প্রীতির প্রখরতা পরিলক্ষিত হয়।

'অরুণ কাগজে দেখিলাম তোমাদের জন্য একটি বিশেষ বিদ্যালয়ের স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, আশা করি সেটা ভাল নিয়মে উপযুক্ত লোকের দ্বারা চালিত হইবে। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্রগুলো অব্যবহারে, অনাদরে ও চৌর্যে যেন নষ্ট না হইয়া যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়ো—তোমাদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাটা ভাল করিয়া প্রচলিত হয় এই আমার ইচ্ছা।

আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ সুন্দর চলিতেছে। কেবল একটি কারখানা ও ল্যাবরেটরি হইলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম।'

কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা হলেই চলবে না, তাকে ব্যবহারিক কাজে লাগাতে হবে, দেশের লোকের উপকারে আসতে হবে, তা না হলে তার সার্থকতা কোথায়। এ দিকে তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। আজ থেকে ৫৬ বছর আগে কবির চিন্তাধারা কতটা আধুনিক ছিল তার প্রমাণ মেলে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ তারিখে ত্রিপুরার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লেখা আর একখানা চিঠিতে (৮)।

'সোমেন্দ্র (সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা) যাহাতে তোমাদের রাজ্যের কাজে লাগে এমন একটা শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। তোমাদের রাজ্যে বিস্তর অরণ্যসম্পদ পরিয়া রহিয়াছে। কাজে লাগাইতে পারিলে তাহা বিশেষ লাভবান সম্পত্তি হইয়া উঠিবে। এইজন্য সোমেন্দ্রকে Forestery শেখানো যাইতে পারে। শুনিয়াছি তোমাদের রাজ্যে ভাল Kaoline মাটি বাহির হইয়াছে— সোমেন্দ্র যদি Ceramics শিখিয়া আসে তবে এই মাটি কাজে লাগিতে পারিবে। কিন্তু ইহার কলকারখানা বহুব্যয়সাধ্য। এ সম্বন্ধে যদি তুমি কিছু চিন্তা করিয়া থাক আমাকে জানাইবে।'

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বয়সে শরীরের অপটুতা স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের কর্মশক্তিকে শিথিল করে আনে সেই বয়সে এই কর্মযোগী বিজ্ঞানী কালের ভ্রূকুটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, ক্লান্তিহীন শ্রমসহ করে জনসাধারণের চিত্তভূমিতে বর্তমানকালের বিজ্ঞানশিক্ষার ভূমিকা রচনা করে দিয়ে গেছেন, বিজ্ঞানকে অন্তরের জিনিস বলে গ্রহণ করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মূর্খতার, অজ্ঞানতার অভিশাপে অসাড় হয়ে রয়েছে শত সহস্র মন; কবির সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শ দেশময় প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তুলবে আর অভিষিক্ত করে দেবে দেশের চিত্তভূমিকে বিজ্ঞানরসে।

১। Asia : March, 1937, P 152—153, 154 | লেখক কর্তৃক অনূদিত

২। দেশ, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪৮, ৮ম বর্ষ, ২৫ সং পৃ-৫৮

৩। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৬-৭ সংখ্যা, ১৩২৬

৪। ঐ ৭ম বর্ষ, ১৩৩২

৫। বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা : ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার, রূপা এণ্ড কোং

৬। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড

৭। প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪৮

৮। ঐ

বটতলার বসন্তক

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বটতলার স্বর্ণযুগ কেটে গেছে ১৮৬৫ সালেই। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মনে নবজাগরণের চেতনার সূর্যোদয় সুরু হতেই সমাজের যত গলতি গলদে নজর পড়েছে কলকাতার মানুষদের। বিদেশী ভাষা সংস্কৃতি ও তার নামে গোটা বিদেশী উচ্ছৃঙ্খলতার সংস্পর্শে আসার প্রথম যে প্রেরণা ডিরোজীয়ান যুগের এঞ্জুরা পেয়ে ও পাইয়েছিলেন কলকাতাকে, তারই বহু ঘাঁটা ঘোলাজল ক্রমশ থিতিয়ে আসছে নবনব ব্যক্তিত্বের সুমহান আবির্ভাবে। জেগে উঠেছে রেঁনেসাযুগের নতুন এক সম্প্রদায়। পৈতৃক সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের শিথিল ঘড়া নিঃশেষ প্রায়—বাঙলার বুকে 'লীলা'-চঞ্চল অতীত 'বাবু'-স্থানীয় খোয়াড়িকাটা এক আজব-জাত—কেরানীকুল দশটা-ছটার ঘানিতে পিষে তৈরী হচ্ছে। সীমিত আয়ু ও সংক্ষিপ্ত আয়ের ক্ষুদ্র বৃত্তে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের নিখুঁত 'নিবারণ' হয়ে উঠেছে 'কলির সমুদ্রমন্থনে।'

অন্যদিকে সভ্যতার সহবাসে নতুন রাষ্ট্রিক জাতীয়চেতনার স্ফুটনোমুখ কলি দেখা গেছে। Transition Period-এর ফসল ব্যঙ্গ সাহিত্যে এই দুই বিপরীত ধারা ও ধারণার অহরহ সংঘর্ষ ঘটেছে। টুলোশিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষা, হিন্দু বনাম খেরসতানী ধর্ম, কেরানীগিরি বনাম অতীত ফ্যাক্টর-রাইটারদের ডেপুটিগিরি,—দৈনন্দিন জীবনধারণের গ্লানি বনাম বিশ্বের বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জাতীয় চেতনা, ক্ষুদ্র বনাম বৃহত্তর স্বার্থ, স্বাধীনতা বনাম আনুগত্য এহেন অজস্র উদাহরণ রয়েছে এখানে। এরই সঙ্গে বিদেশী উদাহরণে উদরেজিত আন্দোলন বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ, পতিতা বিবাহ, মদ্যপান, প্রভৃতি সামাজিক বিদ্রোহে চণ্ডীমণ্ডপের নিস্ফল আস্ফালনও কম নয়। অহরহ এই সংঘর্ষ বোঝার আগে বটতলার গোড়ার কথাটা এক কথায় ঝালিয়ে নেওয়া যাক। এক সুবৃহৎ অ-শিক্ষিত জনসংখ্যা অন্ধ আবেগে দেশে নবজাগরণের এই নতুন উত্তাপ উপভোগ করতে তাদের সংক্ষিপ্ত বিদ্যাবুদ্ধি ও অবসর নিয়ে এগিয়ে এল। এরই ফলে বটতলার 'জনসভার সাহিত্য' ছবির সার্বিক চাহিদা অনুভূত হল। এদিকে সমাজের নীচুধাপে সাহিত্য 'বিদ্যাসুন্দর' আশ্রয়ী হয়ে ঢালু সিঁড়ি বেয়ে চলেছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্তর মত কট্টর জ্ঞানী পণ্ডিতরাও যৌবনের অন্ধ চাঞ্চল্যে কুৎসিত আদিরস কাব্যের দীক্ষা নিয়ে সমাজকে আদিরসের সুদীর্ঘ গভীর ঘন চাহিদার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করছেন। সর্বজন সুধায় রাজার পোষা 'সাহিত্য' আজ জনসভার আমদরবারে সর্বজনবোধ্য আদিরসের বাহনে হানা দিয়েছে 'পয়সা মূল্যে'র পুস্তকে। কিন্তু সবকিছুরই আছে শেষ সীমা। আদিরসের সীমানাও টানা রয়েছে এক জায়গায় তাই অস্পষ্ট মুদ্রণ কুৎসিত কাগজ কিম্ভূত কম্পোজিং সত্ত্বেও যে বই একদা সদ্য সাক্ষরকে তৃপ্ত করেছে আজ আর সে সন্তোষ আনে না। বটতলার ভগীরথ কেরিস কোম্পানী থেকে ছাপান তাঁর প্রথম বইয়েই তাই 'প্রতি উপক্ষণে' দুটি ছবি মুড়ে দিয়ে বটতলা মাত করেছিলেন। ডিহিসুতানুটির সদ্য সাক্ষরের সংখ্যা কিন্তু তখন

অসহায় ভাবে কম। কিন্তু ছবি ছাপার 'কষ্টিং' তুলতে বইয়ের সার্কুলেশন বাড়াতেই হবে। তাই বাধ্য হয়েই ছবি বাড়ল—দাম বাড়ল—খদ্দের বাড়াতে হবে ছবির খরচ তুলতে, তাই আবার ছবি বাড়লো এই ভিসিয়স সার্কলে পড়লো বটতলার বই। মনে রাখতে হবে ছাপা বই দেখলেই চোখ বন্ধ করে ফেলার সংস্কারে ঘা দেবার জন্য ছবিই সদ্য স্বাক্ষর—মানে সবচেয়ে বড় অস্ত্র!

মোটামুটি বলা যায় ১৮২০-২২ সালেই ইউরোপীয় শিল্পীর চেষ্টায় কলকাতায় লিথোগ্রাফিক প্রেস প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮২২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা জার্নালে জানা গেল, মাশিয়ে বেলনম ও ম্যশিয়ে স্যাভিন্যাক এই দুই ফরাসী শিল্পীর চেষ্টায় এই প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমান, মাদাম্ বেলনম্ নামে আরেকজন যে মহিলাশিল্পীর সন্ধান সেকালের কলকাতায় পাওয়া যায় তিনি পূর্বোল্লিখিত ম্যশিয়েরই স্ত্রী হতে পারেন। পাণ্ডুলিপির রোমাঞ্চকে উদ্বাস্তু করেছিল বটতলার অক্ষম মুদ্রাযন্ত্রগুলো—বেকার হয়েছিল পুঁথির লিপিকরেরা যারা খাওয়া ও একজোড়া গামছার বদলে রামায়ণ নকল করে দিতো ধনী গৃহস্থকে। তেমনি ইউরোপীয় শিল্প ও শিল্পীর লিথো এসে কালীঘাটের পট ও পটুয়াকে উদ্বাস্তু ও বেকার করেছে। যাইহোক আমরা কলকাতার ছবি ছাপার যন্ত্রযুগের গোড়ার কথা বলছিলাম। ১৮২৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সমাচার চন্দ্রিকার শুড়ো লিথোগ্রাফিক প্রেস। অর্থাৎ শুড়ায় পাতুরিয়া ছাপাখানা'র সংবাদ ছাপিয়েছিল। কারণ, 'তাহাতে নানাবিধ গ্রন্থ ও নানাপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ ছবি ছাপা করিবেন সংপ্রতি তিন কর্মারম্ভ হইয়াছে…।' 'তাঁরা আরও বলছেন' 'অপর চিত্রবিদ্যাবিষয়ক চিত্র করিতে ও গৃহে রাখিতে সকলেরি অভিলাষ হয় কিন্তু চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন উপায় এই দেশে না থাকাতে অনেকের তাহাতে মনোযোগ নাই এবং পটুয়া আদি যাহারা জানে তাহারাও উত্তমরূপে পারে না এ প্রযুক্ত চিত্রবিদ্যা সর্বজন শিক্ষার নিমিত্ত ইংরেজী উত্তম চিত্রাভিজ্ঞ সকলের মতে গৌড়ীয় ভাষায় সঙ্কলন করিয়া ও চিত্র আদর্শ নিমিত্ত মনুষ্য ও পশ্বাদির ছবি ১৫ খান পরিমাণ বিশেষ করিয়া এক গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে ঐ গ্রন্থ শুড়া পাষাণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইবেক তাহার মূল্য চারি টাকা স্থির করিয়াছেন।'

এইভাবে নিরক্ষর ও সদ্যসাক্ষর কিন্তু বটতলার বইয়ে অতৃপ্ত ও বিরক্ত জনতার জগতে ক্রমশ ছবির এক গোপন চাহিদা সৃষ্টি হতে লাগল। বহু চিত্রশিল্পীর নামও নতুন শোনা যেতে লাগল। রামচাঁদ রায় (গঙ্গাকিশোরের প্রথম বইয়ের চিত্রশিল্পী) বিশ্বম্ভর আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবর্ত্তী বীরচন্দ্র দত্তের কথা বলা যেতে পারে। ১৮২০ সালে সেপ্টেম্বরে ফ্রেণ্ড অব ইনডিয়ায় এক চিত্রশিল্পী—জোড়াসাঁকোর হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করা হয়েছে। এর আগে ১৮১৮-১৯ স্কুলবুক সোসাইটি দ্বিতীয় বার্ষিক রির্পোটে রয়েছে কাশীনাথ মিস্ত্রীর কথা। এখানে মনোহর কর্মকার ও কৃষ্ণ মিস্ত্রীর কথাও বলা দরকার। মনোহর পঞ্চাননের পুত্র এবং কৃষ্ণ মনোহরের জামাই। অনেকেই জানেন বর্তমান বাংলা লিপি শ্রীরামপুরী টাইপ অর্থাৎ পঞ্চাননের হাতের লেখারই নকল। ছবির ক্ষেত্রেও 'মিস্ত্রী'রাই ছবি আঁকতেন ও নিজেই ব্লক লিথো করে একসঙ্গে 'চার্জ' করতেন। বটতলার ছাপাখানাওয়ালা যেমন নিজের প্রকাশিত বইয়ের নিজেই বিক্রেতা (এজেন্টের কমিশন বেঁচে যায়।) তেমনি মিস্ত্রীরাই সেখানে ছবি আঁকিয়ে (শিল্পী!) এতে নাকি 'কষ্টিং' কম পড়ে। এর ফলে টাইপ

ফাউণ্ডারীর লোকেরাই প্রথম বুঝতে পেরেছেন পাতা-ভরা টানা কম্পোজিং থেকে পাঠকের চোখকে 'রিলিফ' দিতে গেলে কিছু ছবির প্রয়োজন যাতে তাঁদের রুজি-রোজগার ক্ষতিগ্রস্ত হবে না—ছবিও তাঁরাই করবেন। Transition Periodএর প্রধান ফসল ব্যঙ্গসাহিত্যে। নাটক নয় প্রহসন। এখন এই সাহিত্যের জুড়িদার হয়ে যেসব ছবি এল তারা মূলত ব্যঙ্গাশ্রয়ী। গঙ্গাকিশোরের অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরে ব্যঙ্গসাহিত্যের স্পর্শ নেই। আদিরসের ভিয়ানে ছবির স্কোপ ত নেই বল্লেই চলে। কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র চিত্রণে ছবির ভূমিকা কম নয়। আলালের ঘরে দুলাল একটি ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস। এতে তাই যেসব ছবি ছাপা হল তা মূলত ব্যঙ্গধর্মের অনুসারী। বটতলার স্বর্ণযুগ শেষে মৃতপ্রায় ব্যবসায়ীরা বইয়ের বাজার নেবার শেষ চেষ্টা করল এই ব্যঙ্গাত্মক ছবিতে। জন্ম নিল বসন্তক। ব্যঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে সদ্যসাক্ষর জনতার প্রথম আন্তরিক সাযুজ্যস্থাপনে এ পত্রিকাটির ভূমিকা অপরিসীম।

বসন্তক বটতলারই সর্বশেষ উল্লেখ্য ফসল। বসন্তকের উদ্বোধনী সংখ্যায় বলা হয়েছে 'কলিকাতা গরাণহাটা ৩৩৬নং সুচারু যন্ত্রের মুদ্রিত।' সুচারুযন্ত্রের মালিক ছিলেন বোধহয় প্রাণনাথ দত্ত চৌধুরী। সে যাক, এই ৩৩৬ নম্বরটি অবশ্য চিৎপুর রোডের। প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রসঙ্গটি তাই সুস্পষ্ট 'কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬নং সুচারুযন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।' এখন 'কলিকাতা, চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬নং ভবন'টির সঙ্গে খাস বটতলারই দূরত্ব নির্ণয় করা যাক। বটতলার এক ইসলামী কেচ্ছা'র বইয়ে জানা যায় ৩৩৫ নম্বরটিই বটতলা। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে 'গ্রহস্ত, গ্রাহককারি যে জন হইবে। বটতলা আসিয়া তল্লাস করিবে ॥ তিনশো পঁয়ত্রিশ নম্বর দোকান আমার। তল্লাস করিলে পাইবে আবশ্যক যার।' এখন পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী ৩৩৬ নম্বরের আত্মীয়তা আবশ্যকীয়। এ ছাড়াও বর্তমানে ৩৩৮ নম্বর ভবনে রয়েছে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বটতলার প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয়।

এখন প্রাণনাথ দত্ত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীরই ছাত্র ছিলেন। ধনী পরিবার হাটখোলার দত্ত বংশের সঙ্গে স্কুলের আঢ্যদের যোগও ছিল। এরই ফলে দেখি বসন্তকের নিয়মিত চাঁদাদাতার তালিকাতে হরেকৃষ্ণ আঢ্যর নামও প্রকাশিত হত। বসন্তকের ২য় পর্ব তৃতীয় সংখ্যায় জানা যায় বসন্তক নাকি একবার স্কুলপাঠ্য টেকসট বই হিসাবে 'ধরানো'র চেষ্টা হয়েছিল! কারণ বসন্তকের মতে 'ছেলেদের মাথা ত খাবার জন্যই হোয়েছে। বিশেষত বাঙালীদের ছেলের মাথা ইংরেজেরা খাচ্ছে, নয় আমি খেলুম। যাদের মাথা তাদের গেল, আমারত পেটটা ভোরল।' এরপর লেথব্রিজ সাহেবের নিরস ভারত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে তুলনা করে বসন্তক বলছে 'আমার পুস্তক ত তার চেয়ে ভাল হবে; নিদেন রস রঙ্গটাও ত থাকবে? ভালমন্দ বিবেচনা করে কি পুস্তক ধরান হয়, এ কেবল ছোটকর্ত্তা ও বড় সাহেবের অনুগ্রহে হয়।' অর্থাৎ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর সঙ্গে বসন্তকের ছিল সরস সম্পর্ক। হাটখোলার দত্তবাড়ী ও বটতলার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর মধ্যে যে 'ধনীর আত্মীয়তা' বিদ্যমান ছিল তা অনুভব না করতে পারলে ধনী প্রাণনাথ দত্তের বটতলা-প্রীতি তথা মুদ্রাযন্ত্রপ্রীতি উপলব্ধি কঠিন হয়ে পড়বে। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর কর্তা হরেকৃষ্ণ আঢ্য তখন বিপুল ধনী ও সমাজের অন্যতম নেতা। আর হাটখোলা

দত্তবাড়ীর সন্তান যে কেমন ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

বসন্তক পত্রিকার সঙ্গে যে দুটি নাম জড়িত তাঁরা হলেন গিরীন্দ্রকুমার দত্ত এবং প্রাণনাথ দত্ত। সচরাচর গিরীন্দ্রকুমারকেই বসন্তকের সম্পাদক বলে থাকি আমরা। ডঃ সুকুমার সেনও বলেছেন গিরীন্দ্র দত্তই বসন্তক বাহির করিয়াছিলেন। শ্রীসেনের সঙ্গে গিরীন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র রাধানাথের পরিচয় ছিল। যতদূর জানা যায়, গিরীন্দ্রকুমার ও প্রাণনাথ পরস্পর আত্মীয় (ভাই) ছিলেন। তাঁরা নিমতলার মিত্র পরিবারের খ্যাতনামা সন্তান প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্রেরও আত্মীয় ছিলেন। প্যারীচাঁদের আলালের ঘরে দুলাল ২য় সংস্করণে গিরীন্দ্র দত্তের ছবি যোগ করে বই প্রকাশ করেন প্রাণনাথ দত্তচৌধুরী। এইখানেই আমাদের একটি স্পর্শগ্রাহ্য বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রাণনাথ দত্ত লোকনাথ দত্তের সন্তান ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জন্ম। 'তিনি ইংরাজী বাংলা সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।' রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্যসন্দর্ভের পরবর্তী সম্পাদকও হয়েছিলেন প্রাণনাথ। তিনি শুধু দত্ত হলেও তার কোম্পানীর নাম ছিল প্রাণনাথ দত্তচৌধুরী। 'অতি মান্যবংশৎ বিদ্যানুরাগী সুশিক্ষিত সুলেখক' প্রাণনাথ 'রচনা রত্নাবলীর' অন্যতম পরিচালকও ছিলেন।

গিরীন্দ্র দত্তও খুব সম্ভবতঃ হাটখোলা দত্ত পরিবারেরই সন্তান। জন্ম ১৮৪১ সালে। হাটখোলা দত্ত পরিবার বিখ্যাত বংশ। চুড়ামণি দত্ত বনাম নবকৃষ্ণের বিবাদ-সংঘর্ষ একদা কলকাতার স্থায়ী আলোচনার বিষয় ছিল। দত্ত পরিবার অত্যন্ত ধনী ছিলেন। 'যম জিনতে যায়রে চুড়ো……ও নব দেখবি যদি আয়' এ গান চূড়ামণি যখন সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করেন তখন নাকি নবকৃষ্ণের বাড়ীর সামনে গাওয়া হয়। এরই প্রতিশোধ চূড়ামণির মৃত্যুর পর তার পুত্র কালীপ্রসাদের আয়োজিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নবকৃষ্ণের কূটভূমিকাও কম নয়। শোনা যায় সেকালের অসামাজিক বলে বিবেচিত যবনীবাঈজীর গৃহে রাত্রিযাপনের অভিযোগে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের প্রবেশ নিষেধ ঘোষণা করেছিলেন নবকৃষ্ণ। পরে রামদুলাল সরকার ও বড়িষার সন্তোষ রায়ের মধ্যস্থতায় ব্রাহ্মণরা এক শর্তে আসতে রাজী হন, তাঁরা দক্ষিণা নেবেন না। এই দক্ষিণার জন্য বরাদ্দ পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে সন্তোষ রায় নাকি কালীঘাটের মন্দির নির্মাণে উদ্যোগী হন বলে গুজব আছে।

স্থান নৈকট্যে হাটখোলার ধনী বংশ বটতলার বই ব্যবসায়ে মন দেন। বটতলার দক্ষিণে জোড়াবাগানে তাঁরা সুধাবিন্দু প্রেস করেন। বটতলার বই বলতেই যে সস্তারই বোঝায় এ ধারণা সৃষ্টির মূলে সুধাবিন্দুর ভূমিকাও কম নয়। তারা বহু প্রচলিত বই (যথা বিদ্যাসুন্দর) প্রচুর কমদামে বিক্রী করে বাজার মাত করে। 'বিন্দুতুল্য অর্ধেন্দুমূল্যে' একটি সংবাদপত্রও তাঁরা সুধাবিন্দু নামে প্রকাশ করেন। গিরীন্দ্র দত্ত তখন ছবি এঁকে চলেছেন। ১৮৭০ সালের ১৫ই নভেম্বর সুচারু যন্ত্র থেকে প্রাণনাথদত্ত আলালের ঘরে দুলাল ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি ভূমিকায় লিখছেন, 'আলালের ঘরে দুলাল ইতিপূর্বে এই সুললিত উপন্যাসটি এবার রোজারিও কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়, কিন্তু তাহাতে বহুতর বর্ণাশুদ্ধি ও অস্পষ্ট মুদ্রণের জন্য পাঠকগণের অনেক পাঠে ব্যাঘাত হইত। এক্ষণে ঐ মুদ্রিত পুস্তক সমস্ত নিঃশেষ হওয়াতে গ্রন্থকার

এতৎ গ্রন্থের স্বত্ব সুচারু যন্ত্রালয়াধিকারীকে দিবায় তিনি নিমতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের কৃত কয়েকখানি লিথোগ্রাফ চিত্র দিয়া ইহা পুণর্বার শুদ্ধ ও স্পষ্টরূপে মুদ্রিত করিতেছেন। বোধকরি এইবার পাঠকগণ ইহার বিশুদ্ধ মুদ্রণ ও সম্ভাব সম্পন্ন চিত্রগুলিন দেখিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্ট হইবেন।' অর্থাৎ প্রাণনাথ দত্তই আলালের ঘরে দুলাল সচিত্র ২য় সংস্করণ প্রকাশের সময় সেই সঙ্গে গিরীন্দ্রদত্তের আঁকা ছবি জুড়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। গিরীন্দ্র দত্ত আঁকিয়ে ছিলেন। তিনি তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য বীরাঙ্গনাকাব্যের সচিত্র সংস্করণেও ছবি এঁকেছিলেন। উপরন্তু তিনি ছবি আঁকার ওপরে একটি বইও লিখেছিলেন। বইটির কপি মাত্র ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রয়েছে। তাঁর 'চিত্রবিদ্যা বিষয়ক' এই পুস্তকটির নাম 'চিত্রবিজ্ঞান'। প্রথমপৃষ্ঠা: চিত্র বিজ্ঞান। চিত্র অঙ্কন করিবার চলিত প্রথা। প্র্যাকটিকাল লেসনস্। অন। ড্রয়িং এ্যণ্ড পেনটিংস। শ্রীগিরীন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। কলিকাতা। ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের গলি বাগবাজার। পত্রিকা প্রেস হইতে। শ্রীআশুতোষ দে দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য একটাকা মাত্র। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ দেখে মনে হয় বিক্রীও হয়েছিল বেশ।

এখন চিত্রশিল্পী গিরীন্দ্রকুমারকে বসন্তকের সম্পাদক বলার কোন প্রমাণ আছে কি না দেখা যাক। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসন্তকের পুরনো ফাইলে বহুনাম আমরা পেয়েছি। প্রকাশক সম্পাদক হিসাবে কিন্তু কোথাও গিরীন্দ্রকুমারের নাম ছিল না। অন্যদিকে প্রাণনাথ ছিলেন একাধিকভাষায় শিক্ষিত এবং সেকালের অন্যতম জ্ঞানগর্ভ সাময়িক পত্রিকা দুটির সম্পাদক। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য ও রহস্য সন্দর্ভের প্রশংসা বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে রয়েছে। প্রাণনাথ তার অযোগ্য সম্পাদক ছিলেন না। হরিহর শেঠ প্রাণনাথের সম্পর্কে লিখেছেন তিনি সেকালের সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। 'ছাপখানা লোহাঢালাইয়ের' ব্যবসাও তিনি করেছিলেন। 'তিনি এই সময় 'বসন্তক' নামে একখানি হাস্যরস পূর্ণ বিদ্রূপাত্মক সচিত্র মাসিক প্রকাশ করেন।' কিন্তু গিরীন্দ্রকুমার সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন 'গিরীন্দ্রকুমার ছবি আঁকিতে পারিতেন……বসন্তকে তাঁহার রেখাচিত্রের প্রচুর নিদর্শন আছে।'

মনে রাখতে হবে বসন্তকের ঘোষিত সম্পাদক কেউ ছিলেন না! কার্টুনিষ্ট গিরীন্দ্রকুমার ও প্রকাশক প্রাণনাথ একই বাড়ীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এরই ফলে হয়ত বসন্তকে এই ব্যপারটা সমস্যা হয়ে উঠতে পারে নি। যেমন বসন্তকে কার্টুন দেখে অনভ্যস্ত পাঠক যখন 'মনুষ্যদেহের অঙ্গবিকৃতিতে' কৌতুক না বোধকরে বিব্রত হয়েছিলেন তখন বসন্তক লিখেছিলেন সরু সরু হাত পায়ের ওপর মোটা মাথা আঁকাটা বক্তব্যবাহী। 'পত্রপ্রেরকগণের প্রতি' তারা জানাচ্ছেন 'আমাদের একজন পাঠক চিত্রগুলির মূর্তির শরীরের পক্ষে মাথা বড় দেখে লিখেছেন যে সে রূপ করায় ফল কি। মাথা বড় হলেই হাস্যরস গড়িয়ে পড়ে? আমরা তদুত্তরেই বলছি যে মাথা বড় দেখে চটবেন না এর একটু কারণ আছে। যেমন শ্রীপঞ্চমীর সময় সাধারণ লোক বলে থাকে 'যদি বাঙালী না থাক্‌তো এদেশে তবে তিনি খাজা গুড় সুঁটি কড়াই কোথায় খেতে পেতে' সেই রকম আমরাও বলি "যদি হেঁড়ে মাথা ছেড়ে দিয়ে ছবি লিখতে যাই। তবে যশুরে কৈমাছের মত চিনবে কিসে

ভাই' এক্ষেত্রে কার্টুনিষ্ট ও সম্পাদকের মিলিত মতামতটি উপভোগ্য। আরেকটি ক্ষেত্রেও আমরা একটি সূক্ষ্ম ঐক্য লক্ষ্য করতে পেরেছি মনে হয়।

১৮৭২ সালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। হরিদাসের গুপ্তকথার ব্যবসায়িক সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই এ সময় গুপ্তকথার ব্যর্থ নকল করেছিলেন। গিরীন্দ্র দত্তও 'গজপতি রায়' ছদ্মনামে ১৮৭৩ সালে 'মাধবমোহিনী' লিখেছিলেন। গুপ্তকথা রহোন্যাস। 'মাধবমোহিনী' ছিল নবন্যাস। প্রকাশ করেছিলেন প্রাণনাথ দত্ত, তার সম্পাদনায়—রহস্য সন্দর্ভে। ১৮৮৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর যুবরাজ কলকাতা পরিদর্শনে এসে বকুলবাগানে (ভবানীপুরে) হিন্দু জেনানা দেখতে গিয়েছিলেন। বন্দরে নেমে নাকি যুবরাজ অভিনন্দনের উত্তরে টুপি খুলে প্রত্যাভিবাদন জানান নি। বসন্তক পত্রিকার ২য় পর্ব সপ্তম সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছেন এর কারণ 'পৃথের নোটবহীতে দেখা গেল 'আমি অগ্রে নবন্যাসে পড়িয়াছিলাম যে কলিকাতার রৌদ্র বড় ভয়ংকর অনাচ্ছাদিত মস্তকে লাগিবামাত্র নয় সর্দি নয় গর্মি নয় বিকার হয়। প্রথমে সেই ভয়ে টুপী খুলি নাই।' বসন্তক পড়লেই বোঝা যাবে এটা সম্পাদকীয় মন্তব্য। আর গিরীন্দ্রও নিশ্চয়ই নিজের উপন্যাসের উল্লেখ নিজেই করতে পারেন না। বরং তা সহজ এবং স্বাভাবিক প্রাণনাথেরই পক্ষে। তিনিই উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সম্ভবত এখানেও তাই ছিলেন। প্রাণনাথ ইংরেজী Indian Charivari নামে ব্যঙ্গ পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

এইভাবে মনে হয় বসন্তকের সম্পাদক ছিলেন প্রাণনাথ দত্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই বলেছেন। গিরীন্দ্র দত্ত ছিলেন কার্টুনিষ্ট। অবশ্য তার মানে বোধ হয় এই নয় যে আজকের মত এই বিশ্লেষণী বিভাগটি তখনও খুবই পূর্ণাঙ্গ ছিল। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছাড়াও প্রথম ব্যঙ্গ পত্রিকার দুই উদ্যোক্তার মানসিক সমঝোতার ফলেই বসন্তক জন্ম গ্রহণ করেছিল। এরই অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে কার্টুন পত্রিকার মূলগত প্রভেদও সম্ভবত এই যে এখানে কার্টুনিষ্ট নিছক কর্মী থাকতে পারেন না, কারণ অন্য পত্রিকার সম্পাদকের কলম কিছুটা স্কোপ পেলেও কার্টুন পত্রিকায় কার্টুনিষ্টের তুলিই একমাত্র প্রকাশসক্ষম বাহন। বস্তুত প্রাণনাথ গিরীন্দ্র দত্তের সৌভ্রাত্র্যমূলক সমঝোতাতেই বসন্তকের জন্ম। যেখানে অলিখিত সম্পাদকের নাম খুঁজে ফেরার মধ্যে আর যাই থাক্ কোন পৃথক তত্ত্ব না থাকার সম্ভাবনাই বেশী। ডঃ সুকুমার সেন গিরীন্দ্র দত্তের পুত্রের কাছে তথ্য জেনে গিরীন্দ্র দত্তকেই সম্পাদক বলেন তবে ব্যাপারটা দাঁড়াবে নিধুবাবুর পুত্রের কাছে সংগৃহীত তথ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নিধুবাবুর জীবনী রচনার মতই।

বসন্তক প্রকাশের পূর্বেই যে বেশ আয়োজন চলছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়, আমার 'আগমনবার্তা পেয়েই মিরার তার দস্তুর মতাবেক একবার চকমকিয়ে উঠে লিখে ফেলেছেন যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক একখানি 'প্যাঞ্চ' বাহির করিবেন, কিন্তু যেন জেল বাঁচিয়ে করেন। আমারত দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়েছিল।' [আক্কেল গুড়ুমের উত্তর পরে বসন্তক দিয়েছিল তার পুস্তক সমালোচনা বিভাগে, 'সম্প্রতি তিনি (মিরার) একটা ভারী অন্যায় কথা লিখিয়াছেন যে 'অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক একখানি প্যাঞ্চ প্রকাশ করিবেন' প্যাঞ্চ আমরা প্রকাশ করিব। অমৃতবাজার

পত্রিকার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। মিরার ব্রাহ্ম; তাঁহাদের আপন পর জ্ঞান নাই, তাঁহারা অনায়াসে পরের দ্রব্য তিনি নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা হিন্দু, আমাদের দ্রব্য তিনি অপরকে দিলে ক্ষতি গ্রস্থ হই।] ...সভ্যগণ মিরারের অর্থ দর্পণ, বাঁকা বৈ সোজামুখ এতে দেখবার যো নেই, নচেৎ আমার সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকেরও জেলের ছবি পড়লো কেন?'

এই হল বসন্তকের ঝগড়াটে আগমনী। তবু বসন্তক কোন এক বসন্ত পঞ্চমীর দিন আবির্ভূত হল কিছু চিন্তা ভাবনার পর। 'অহো কি আশ্চর্য্য। প্রাচীন হিন্দুকুলচূড়া স্বরূপ ভারতীয় রাজগণের সভায় যে বসন্তক হাস্য-রসসাগর উচ্ছসিত করিয়াছিল; নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত ঋষি প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ যাহার গুণগানে যত্ন করিয়াছেন এবং যাহার ভ্রাতা বিজাতীয় পরিচ্ছদ ধারণ করত ইউরোপীয় রাজদলের মধ্যে কৌতুকোদ্দীপন করিয়াছে, আমি সেই বসন্তক হইয়া আধুনিক রণক্ষেত্রে অবতরণের জন্য এতক্ষণ কি ভাবিতেছিলাম?'

বসন্তক প্রকাশিত হল। এবং পাঠক-দর্শক চিত্তজয় করে জনপ্রিয়ও হল। 'লোকের এই রকম স্বভাব যে, কেহ একজনের নিকট আসিলে অগ্রে ঐ আগন্তুক ব্যক্তির নাম ধাম কর্মাদির বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং সভ্য সমাজেরও মন আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি, আমি যাত্রাওয়ালার সঙের দাদার মতন নই যে ফড়ফড় করে না জিজ্ঞাসা কোত্তেই আত্মপরিচয় দিতে থাকবো। অতএব আমি ভাটের মত কুলুজী না পেড়ে এইমাত্র বলিতেছি, যে সভ্যগণ আমার বসন্ত পঞ্চমীর পর উদয়েই নাম বুঝিবেন এবং এই কীর্তিতেই বৃত্তি জানিবেন। আরও আমার ধাম জানিবার জন্য যিনি ব্যস্ত হইবেন, তিনি আপনার মস্তক খুঁজিবেন, তাহা হইলেই দেখিতে পাবেন—তাতেও যদি আমার ধাম দেখিতে না পান, তাঁর আমার কাছ থেকে বিদায় সেরে যাওয়াই ভাল॥'

ভাটের মত কুলুজী না পাড়লেও বসন্তক নিজেকে ভাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করেছে। অবশ্য তার আগে ভাট সম্পর্কে ধারণাটিও সুস্পষ্ট করেছে। 'পূর্বকালে ভাট চারণ প্রভৃতি বন্দী এ দেশস্থ রাজারাজড়া দিগের পূর্বপুরুষের কুলজী গুণ কীর্তন করিয়া লোকরঞ্জন ও স্বীয় ভরণপোষণ দুই কার্য্যই সমাধা করিত। এক্ষণে ইংরাজী কেতার আবির্ভাবে তাহা প্রায় একপ্রকার লোপ হইয়া যাইবার সম্ভব হইয়াছে। অস্মদ্দেশস্থ সংবাদপত্র লেখকরা অস্মদ্দেশস্থ ভাটের কবিতাচয় সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। কারণ এখানকার ভাটদের মৃত্যু হইলে সমস্ত লুপ্ত হইয়া যাইবেক (গুপ্তকবির কবিজীবনী?) কিন্তু আমরা ইহাতে এক বিন্দুও ভাবনা করি না, ভাটেরা যে শেষ হইতেছে তাহা আমরা একদিনের জন্যও জানি না ও গ্রাহ্য করি না। আমি বসন্তক কি? কেবল বেশ পরিবর্তন বই তো নয়। সময় গুণে সমস্ত দ্রব্যেরই বিভিন্নতা জন্মে, এক্ষণে ভাটেদের কার্যও ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। যথা ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ শোভাবাজার রাজাদের ভাট, ইহাতে তাহাদের গুণকীর্তন হয়! অমৃতবাজার পত্রিকা পাড়াগেঁয়ে জমিদারদের ভাট আর বসন্তক স্বয়ং আপনাদেরই, ভাট, ভাঁড় চারণ ইত্যাদি ইত্যাদি।'

একনাগাড়ে সাত সংখ্যা করেই ভাঁড়ামি বসন্তকে ক্লান্তি নেমেছিল মনে হয়। 'আমি প্রথম

যখন রঙ্গস্থলে অবতরণ করি তখন ভেবেছিলেম যে আমি অনেক কেলে পাপী, পুরাতন রাজারাজড়ার সহিত বেড়িয়েছি, ভুষুণ্ডির কাকের সহিত মিত্রতা আছে ও বেল্লিকতন্ত্রের একমাত্র অধিকারী হয়েছি, অতএব জনসমাজের চিত্তরঞ্জন করা আমার দ্বারা সহজ হইবে; কিন্তু ফলে দেখছি সেটা বড় সহজ ব্যাপার নয় কাল ফেরতায়, সকল বিষয়ই ফিরেছে, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।' এরপর বসন্তক লিখছে, 'তখন বারোমুনির তেরোমত ছিল এখন সাত মুনির ৭০ মত, কার মনযোগাব ঠিক করে উঠতে পারি না……'

……লোকে কথায় বলে 'এক যুবতি শতেক পতির মন রাখে কেমনে' তা আমারও সেই দশা হয়েছে।'

এ দশার কারণ অশ্লীলতা সমস্যা। বটতলার ঘন আদিরসের আঠা ক্রমশই তখন পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ভূমিকায় যে কথা আমরা বলেছি যেই নবজাগরণের সার্বিক চেতনা দানা বাঁধছে বটতলার পাঠকের মনে।

সরস সচিত্র আদিরসে অতৃপ্ত মন এবার ক্লান্ত। উন্নত ব্রাহ্মশ্রেণী তখন 'অশ্লীলতা' আন্দোলনে ব্রতী। বসন্তকের মতে 'শহরে এক নতুন হুজুগ উঠেছেরে ভাই। অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই। এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা, বঙ্গদর্শন-এর নেতা। এদের কথার মাত্রা অশ্লীলতা সদা দেখতে পাই। কারে বলে অশ্লীলতা লেজ তুলে দেখে নাই।' এই গ্রাম্য রসিকতা অশ্লীলতা চেতনার বিরোধেই বসন্তক-ধ্বংসের বীজ উপ্ত ছিল।

বসন্তক তখন সার্বিক গণচেতনার রাজনৈতিকরূপ লক্ষ্য করছে। শোভাবাজারী জমিদার ভাটগিরি যে চিরস্থায়ী হতে পারে না সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এ উপলব্ধি বোধহয় সর্বপ্রথম বসন্তকেই। কলকাতা শহরের ফুটপাথ, ড্রেন সমস্যা, হগমারকেটের দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক আলোচনায় বসন্তক ডিহিকলকাতার অশ্লীল দুর্নীতির ক্লেদ মুক্ত হয়েছে ক্রমশই।

প্রাথমিক ভাঁড়ামি থেকে এই ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার পথ উত্তরণই বসন্তকের যাত্রাপথের ধারাবিবরণী। স্বায়ত্তশাসনের চেতনায় সক্রিয় সাহায্যও সমালোচনার অঙ্গীভূত। কথাগুলো পত্রিকাতে বাসন্তিকা বলেছিল আর 'বাসন্তিকার মুখের এই কথাগুলি শুনেই আমার বুদ্ধি খুলে গেল, অমনি মনে ভাবলেম যে ঠিক কথা বড় বড় রাজাদের কাছে যখন বিদূষক ভয় করে কথা কননি তখন আমারই বা কি ভয়? আমি লোকের ক্লান্ত মনকে প্রফুল্ল করবার জন্য দুই একটি রঙ্গরসের কথা বলবো, আর বড় লোকেদের চোখে অঙ্গুলি দে দেখাবো।'

নিছক চণ্ডীমণ্ডপীয় সামাজিক কোন্দলের উর্দ্ধে এই প্রথম বৃহৎ সামগ্রিক চেতনার নতুন ইঙ্গিত। যাবতীয় অসামাজিক কুৎসার কুৎসিত আড্ডা—বটতলার দুর্গন্ধমুক্ত নতুন রেঁনেসার বাণী ভেসে আসছে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। রামমোহন বিদায় নিলেও অদূরেই দেবেন্দ্রনাথের সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য্যের উদয়। সুগঠিত স্বাস্থ্যবান ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক শৃংখলাবস্থার প্রতীক তখন। দিকে দিকে সার্বিক গণচেতনার জয় গান। সমালোচনার ব্যঙ্গ-চাবুকে কলকাতাকে নতুন স্বর্গে জাগরিত করার অগ্রদূত রাজনৈতিক বসন্তক তখন স্বায়ত্ত শাসনের মুখপাত্র। বটতলার অন্তিম ঘণ্টাধ্বনি বাজাবার প্রকৃত দায়িত্ব বটতলারই ফসল বসন্তকের কাঁধে।

তেমন কবিতা চাই

ভবেশ দাশ

বুঝতে হবে—একটা বিরাট কিছুর অভাব আছে। সেই অভাবেই উত্তেজনা, বিক্ষোভ এবং অনীহা পাঠক সাধারণের অন্তঃ শিবিরে প্রলয় গতিতে প্রসৃত হোচ্ছে। এর প্রতিকারে কবিজনের নির্বিকারতা কালক্রমে অধিক পাঠক সংগ্রহে বিফলতা আনছেই বরং সংখ্যাক্রম নিম্নগামী হোচ্ছে। এ অবস্থাকে আমি শোক কিংবা বেদনার অনুকূল বোলে আখ্যা দিতে চাই না। কেননা সাহিত্য-ক্ষেত্রে, এমনকি আমূল শিল্পেও তর্ক বিতর্ক ও পাঠক পাঠ্যের সংঘর্ষ বিষয়ে কবিতা অনন্য পদপ্রাপ্ত। সুতরাং কবিজনের মনে কবিতার জনপ্রিয়তা সূত্রে অসন্তোষ চিরকালের দুর্ঘটনা। কবি জন্মলগ্নেই সে সংবাদ জেনেছেন। এখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আরও পরিপুষ্ট হচ্ছেন। কিন্তু এখানে কবিতার ক্রম অপ্রীতির জন্য কবির স্বকীয় নির্বিকারতা পরোক্ষে যে বিরোধমূলক পৃষ্ঠপোষণে ব্যস্ত, সে কথাই আমার প্রতিপাদ্য।

খুব গভীরভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কবিতার সংক্ষিপ্ত পাঠক থাকলেও সেটা আবার অপরপক্ষে এই শিল্পেরই উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক। তার কারণ এতে কবিতার একটা মাত্রা চেতনা এবং ধীশক্তির প্রাখর্য সম্পর্কে গভীরতা পাঠকের মনে থাকে। কিন্তু বিপরীত ধারণায় যদি পাঠকের সংখ্যা ক্রমেই অগণ্য হোতে থাকে, সেখানে কবিতা সহজেই নগণ্য হোয়ে পড়ে। কেননা তখনই দেখা দেবে পাঠকের মনে চিন্তাবিক্ষেপ, সহস্র অনুভূতিমালা, দর্শনের তত্ত্ববহুলতা। এ সবে মিলে পাঠকের মধ্যে নৈমিত্তিক বিরোধ লেগে থাকবে। কবিতা যাবে ক্রমশঃ তার জায়গার থেকে সরে। ফলতঃ এ শিল্পের বন্ধন তখন শিথিল। মনে রাখতে হবে প্রত্যেক শিল্পেই স্বাতন্ত্র্যের এক প্রতিচ্ছন্ন চূড়ো আছে। সেই চূড়োতেই পদ্মমধুর চাক। সেখানে যে হাত বাড়াবে, যে খুলে দেবে তার বন্ধন ; তখনই বুঝতে হবে সর্বনাশ ঘটিয়েছে সে সেই শিল্পের। এই বন্ধনের মধ্যেই থাকে আমাদের অস্তিত্বের অবিনশ্বর চলমানতা। প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির মধ্যেই তার স্বাদ। কিন্তু পাওয়া বা না পাওয়ার আগেই যদি তার চরম বিশ্লিষ্ট বিচার হোয়ে যায়, তবেই তো সেই চূড়ো ভেঙে গেল। পাঠকের আধিক্যে সে সম্ভাবনা আছে। তাই তা অমঙ্গল।

কিন্তু পাঠকের প্রতি আস্থাহীনতা এবং অবিশ্বাস নিঃসন্দেহে আত্মপক্ষবিরোধী। তার কারণ, এতে অন্যথায় কবিতার ব্যাপ্তি অকাম্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু কবিজনেরা কখনই তা চাইবেন না। এমনকি শিল্পের শুভবাদীরাও নয়। যদি এই সিদ্ধান্তই সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়, তবে কবিতার ক্রম-অপ্রীতি নিশ্চিত প্রীতিপ্রদ ঘটনা নয়। যেহেতু এটাই এ শিল্পের সাম্প্রতিক সঙ্কট, সেহেতু এঘটনায় আমি মূলত কবিজনকেই অর্শাব।

পাঠক সাধারণ কবির অভিজ্ঞতায় উন্নীত হবেন, না কবি পাঠকের বোধশক্তির স্তরে নেমে আসবেন—এ নিয়ে তর্কবিতর্কের কাজ বহুজনেই সমাধা করেছেন। কিন্তু তার পরেও আজপর্যন্ত এর সার্থক মীমাংসা হলো না। সুতরাং এ বিচার কার্যে আমাদের কৃচ্ছতা অবশ্যই বেমানান। তবু

জড়বিজ্ঞানের ধারণায় সমাজে যে শ্রেণীবিরোধ রয়েছে, (যার অবসান আজও পর্যন্ত হয় নি) তার পরিপ্রেক্ষিতে কবি যে দোদুল্যমান চিন্তার মধ্যে নির্যাতিত হয়। কেননা এ সময়ে তার পক্ষপাতিত্বের যোগসাজসে রায় দিতে হয়। কিন্তু কবির স্বাধীনতা অর্থে যে সারেনিরেনব্বই ভাগ নিরপেক্ষতা আবশ্যক, সে কথা অনেকেই স্বীকার করবেন না। এখন প্রশ্ন উঠছে, কবিতা কি—কবি কে—। কবির যে প্রতিভা তা একমাত্র প্রকৃতি ও পুরুষাকারের সার্থক পরিণয়ের মধ্য দিয়েই সম্ভব। অতএব প্রকৃতি অথবা নিসর্গ নিষ্ঠায় কবির যে উন্মীলিত অনিমেষ প্রাণঘনতা—তার মধ্যে কবিতার জন্ম। মূলকথা, পাঠকের অন্বিষ্ট নান্দনিক অভিজ্ঞতার সন্ধান দিতে পারলেই কবি খুশী। কিন্তু বহু মত অভিমত নিরীক্ষায় দেখা গেছে, কবির এই নন্দন অভিজ্ঞার জন্য যে ব্যাকুলতা, তা অধিকাংশ জড়বাদীর কাছে অশ্রদ্ধেয় ঠেকেছে। সেখানে কবি বুর্জোয়া স্বার্থের দাসত্ব করছেন এ প্রশ্ন উঠেছে। এটাও কবির চিরকালের বিক্ষোভ। কিন্তু প্রত্যহ মশাল হাতে করে যারা কবির বিপক্ষে ছুটছেন, তারাই আড়ালে সে কবির রচনায় মোহিত। এখানেই কবি অপরাজেয়। কবির কাছে যতই শ্রেণীচরিত্রের উদ্ঘাটন চাওয়া হোক, কালনিষ্ঠার দাবী করা হোক, কবি সততা-প্রসূত অভিজ্ঞতা ও ভাবকল্পনার মধ্য দিয়ে বিশ্বলোকের গতিশীল তরঙ্গমালায় সময়চেতনার যে রশ্মিপাত ঘটে তার মধ্যে কবিতার ফসল ফলাবেন। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কবিতার সার্থকতা এই পথেই। প্রত্যেকের মনোকণিকা যে কবিতার এই রীতির স্বপক্ষে, তার প্রমাণ আমি পরে রাখছি। সুতরাং কবি যদি অভিজ্ঞতা নিঃসৃত বৈভবকে পাঠকের অভিজ্ঞতার আলোকে তার চোখের অঞ্জন করে পরিয়ে দেন, তবেই বোঝা যাবে, কবি-পাঠক অভেদাত্মা। সেখানেই কবির ইন্দ্রজালিক দক্ষতার ছোঁয়া। সেটাই এ শিল্পের প্রবণতা। আসলে কে আগে, কে পিছে সে কথা বড় নয়।

পাঠকের সঙ্গে কবির যে আত্মীয়তা, তার স্বার্থে কবিকে অনেক বেশী পাওনা দিতে হয়। সেই কাজেই সে নির্বিকার। প্রথমতঃ আমার মনে হয়েছে কবির এই চিত্তবিক্ষেপ কোন দৈনাত্মিক অত্যুচ্ছ্বাস অথবা আয়ত গভীর দৃষ্টিহীনতা থেকে নিঃসৃত। ফলতঃ সাময়িক উত্তেজনায় ও বিস্মৃতির জোয়ারে কাব্যশরীরের অনুবন্ধন শিথিল হচ্ছে। কথাটা ইংরেজীতে বললে বোধ হয় ভাল শোনাবে—Poetical language is based on total unity of the lyrical words. এখানে কবিতার লিরিকধর্মিতার কথা বোঝাচ্ছি না। আমি শুধু বলতে চাই যে ছন্দশক্তির বিদ্যুদ্‌বিলাসে কাব্যদেহের যে সামুহিক গহনতা এবং শাব্দিক সুরসঙ্গতি, তার মধ্যেই কবিতার সার্থক উৎসায়ন। —সম্প্রতি কবিতায় ক্রমশ সেই প্রচেষ্টা অন্তর্হিত হচ্ছে। কবি ভাবছেন তার অন্তর্বিপ্লবের কথা এবং ভাবছেন অভিচেতনে গ্রথিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অজস্র চিত্রমালার কথা। কিন্তু তাকে কবিতার অঙ্কুরে ফলিত করার মঙ্গলতম শক্তি যদি কবি লাভ করতে না পারেন, তবে তা ভাবনার মৌন মিছিলে পর্যবসিত। একান্ত আত্মনিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে এই ফলিত করার শক্তি কবির মধ্যে কতখানি রয়েছে। ঠিক তার সমপরিমাণ ভাবনা এবং অভিচেতনের চিত্রলতা কবির অন্তরে বহন করা নিরাপদ। রবীন্দ্রনাথের ছান্দসিকতা বিচার করতে গিয়েও সুধীন্দ্রনাথ এই কথা জানিয়েছেন। [যেমন ধনবিজ্ঞানের অনুসারে প্রভু, সঞ্চয়ের চেয়ে যথেচ্ছ অপচয়ত্ব ভালো, তেমনি

মস্তকে সুমেরুপ্রমাণ কল্পনা বয়ে বেড়ানো ততটা প্রয়োজন নয়, যতটা প্রয়োজন নিজের কল্পনাকে পরের কাজে লাগানো।—সুধীন্দ্রনাথ | স্বগত | ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ]

ফলিত করার শক্তির চেয়ে বিষয়ের প্রাচুর্য বেশী ঘটলেই আর কিছু থাকুক বা না থাকুক total unity বিপর্যস্ত হোয়ে পড়বে। অন্ততঃ যা প্রাথমিক প্রয়োজন। যে চিন্তার অনুলিপি একজন কবির কাছে প্রকাশের মর্যাদা পায়, তা অপরজনের কাছে অবজ্ঞেয় হোতে পারে। এই পার্থক্য কিন্তু ফলিত শক্তির পার্থক্যের সংগে সংশ্লিষ্ট। এ পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক এবং পাঠকের সঙ্গে বৈচিত্র্যের স্বার্থে কাম্যও বটে। কিন্তু সাম্প্রতিক কবিরা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছেন ফলিত শক্তির নিশ্চিতিবোধের জন্য আত্ম-নিরীক্ষায়। পাঠকের অভিজ্ঞান সে ভালভাবেই জানে। কবি যদি তার সেই অভিজ্ঞানকেই অসমান্তর—বন্ধুরকিনারা কয়েকটি শব্দরেখার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন, তবে তা পাঠকের কি কাজে আসবে। পাঠক চান তার সতন্ত্র অভিজ্ঞতার মিউজিক্যাল এমব্রয়ডারী। তা কখনও ভাবনায় আসেনা, আসে অনুশীলনে এবং ধীশক্তিতে। অবশ্য জানিনা, সম্প্রতিবিৎরা আমার কথাকে কতখানি মানবেন। কিন্তু আমি কবিতা পড়ে দেখেছি এবং সেই সংগে ভেবে দেখেছি আত্মসমাহিতি, অতলস্পর্শীতা, ছন্দবিদ্যুৎ ও শব্দের সাংগিতীক অনুবন্ধন, ইত্যাদির যথার্থ অভাবে কবিতা হারিয়ে যাচ্ছে। আমাকে যদি কেউ সে কবির পথ সমর্থন কোরে বোঝাতে আসেন, কবি'ত নিজে তাঁর সৃষ্টিতে খুশী থাকছেন। তখন আমি স্পষ্ট বোলব কবি কিছুতেই খুশী থাকতে পারেন না। তার কল্পনা—মনীষা কিছুতেই শান্তিবোধ কোরতে পারেনা। এমন কি কেউ যদি কখনও কবির এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁর মুখে হাসি দেখে থাকেন ; তখন বুঝতে হবে সে অধৈর্য্যের উত্তেজনা এবং আয়তগভীর দৃষ্টিহীনতা থেকেই প্রকাশিত। আর সেই কারণেই আমার মনে হোয়েছে যে এই শক্তির অভাবের জন্যই কবিতা তার ভালবাসা হারাচ্ছে।

ইতিহাসবোধ ও কালাকাল চেতনা যদি কবিতার মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট না থাকে, তবে আবহমানের রক্ত সচল নেই বুঝতে হবে। সুতরাং সে কবিতার নশ্বরতা যে অনিবার্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতিহাসের অন্তঃস্থলে যে অমোঘতা লুকিয়ে আছে, সেই অমোঘশক্তির নিরীখে আভাসিত বর্ত্তমানকে বিচার করতে হবে। তারই প্রেক্ষাপটে সময় ও জীবনের অনুবর্তনজাত যে চলচ্ছবি তাকে চিহ্নিত কোরতে হবে। সেই চলচ্ছবির প্রবহমানতা যদি কবিতার অস্থিতে ব্যাপ্তি লাভ কোরতে না পারে, তবে তা অদিতির পায়ে মাথা খুঁড়ে মরলেও শাশ্বতলোকে উত্তীর্ণ হোতে পারবেনা। [কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতর থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।—জীবনানন্দ | কবিতার কথা | উত্তররৈবিক বাংলাকাব্য]

আমরা যতই বিশ্বসংসার জাগতিক নিয়মশৃংখলা নিয়ে সর্বাংগে স্বেদপাত ঘটাইনা কেন, বিশ্ববীক্ষা, ইতিহাস চর্চারই আর এক নাম। এই ইতিহাসকেই যদি আবার সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান নামে ভূষিত করা যায়। তখন মনে হবে—ইতিহাস কবিতার অনেক কাছাকাছি। ইতিহাসবোধের কথা বোললেই সমাজচেতনা, বিশ্ববীক্ষা, পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানের কাজ অনেক এগিয়ে যায়। কেননা ইতিহাস ব্যাপারটাই—a dialogue between historian in the present and the facts of the part. [ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন উভয়েই প্রত্যক্ষ যুক্ত।

এসম্পর্কে E. H. Carr বলেছিলেন—The man whose action the historian studies were not isolated individuals acting in a vacuam : they acted in the context, and under the impulse, of a post society.]

পৃথিবীর মানুষ সেদিন ছন্দধ্বনি, লয়কে বিভিন্ন বস্তু এবং অবয়ব সামগ্রীর সাথে আবেগের সাহচর্যে গ্রথিত কোরল, সেই দিনই কবিতার জন্ম। সেদিন মানুষের কবিত্ব শক্তিতে এত বেপরোয়া বাঁধাধরা নিয়ম এসে ভীড় করেনি। সেদিক থেকে কবিতা আদিমরস। ইতিহাসেরও অনুবর্তন সেই মনুষ্য বর্জিত লীলাভূমি থেকেই। সুতরাং কাব্যের ক্রমমুক্তি ইতিহাসের চক্ররেখাতেই বলয়িত। ইতিহাস অনুধ্যানকারীদের মতে শিল্পের সার্বত্রিক গুণই ঐতিহাসিকের একান্ত আবশ্যক।—The historian is more akin to the artist, reliving events in their Concrete individuality. Al though history is the assertion of fact, it is Kindled by imagination.···The historian who handles history as if it were mere drama is in a state of deadly sin ; but unless he is enough of an artist to see the dramatic force of it, Unless he is cunning in the use of words, a clear and eloquent writer easily moved by pity and sympathy, unless the deeds of the past speak with a trumpet toungue to his heart and mindle with in him a pOets and on Without all this, he will never be an historian. [এ উদ্ধৃতি টুকু Melrin Rader এর Art and history প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হোয়েছে। গ্যেটেও প্রায় এর সমধর্মী একটা মন্তব্য কোরেছিলেন।—The tree of life is greener than the tree of thought and it is the tree of life that blooms in works of art.] অতএব দেখা গেল ইতিহাস যখন কবিতার গুণাগুণেই পুষ্ট, তখন কবিতা ইতিহাসের সুভঙ্গলালিত সম্পর্কের কথা অবশ্য স্বীকার্য। যতই সমাজ চেতনার প্রশ্ন উঠুক না কেন, উঠুকনা কেন জীবনচেতনার কথা—এসবেরই পথচ্যুতি ঘটবে ইতিহাসের অস্বীকারে। জীবনানন্দ বলেছিলেন, কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুইরকম উৎসারণ। জীবন বোলতে আমরা যে অসংলগ্ন অগোছালো আট পোরে বাস্তবতা বুঝি ; কবিতা আমাদের তাকে ছাড়িয়ে আরও এক নতুন প্রদেশে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন আবহমানের ভালবাসাকে বুঝেছিলেন তাজমহলের অনুষঙ্গে, যেমন বলেছিলেন সংকীর্ণ বন্দর ছেড়ে নতুনের পথে যাত্রার জন্য। জীবনানন্দ প্রাণপ্রতিমাকে খুঁজে পেয়েছিলেন হাজার বছর আগের মিশরে বেবিলনে এশিয়ার মাঠে মাঠে। তেমনি মানুষের জীবনের বিভিন্ন নৈমিত্তিক গতিস্রোতকে·খুঁজেপেতে হয় ইতিহাসের বিচিত্র চিত্র পথে।

একালে আমাদের দেশে মার্কসবাদের যে পরাক্রমশালীভূমিকা তার সংগে ইতিহাসের অমোঘতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। তা মূলতঃ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুচেতনায় বিকশিত। সেই সংগে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাঁটোয়ারার সংগে এ চেতনা অঙ্গীভূত হোয়ে খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি কোরেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এর মধ্যে একটা নিবিড় যোগ আছে। আপাতত ধারনায় এই মতবাদের শিবির থেকে যে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উঠবে—পৃথিবীব্যাপী মানুষের

সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনকে সুখময় কোরে গড়ে তোলবার সংগ্রামে কবিতার সাধ্য কি ?—এর উত্তরে বোলতে হয়, পাঠকের হৃদয়ের স্বতন্ত্র নির্জনতা আবশ্যক। সেই নির্জন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম। সেই সংগে আবার বোলব সাম্প্রতিক কবি এবং পাঠক উভয়েই চরমতার দায়িত্বে আত্মনিয়োগ কোরতে ভালবাসেন। যেটাকে ইন্টেলেকচ্যুয়ালরা dogmtaism বলেন। এই চরম, পাঠকদেরই দাবী কবিতা দিয়ে সংগ্রামের বর্শা তৈয়ারী হোক, এই কবিদেরই দাবী প্রতিপাদ্যের আকাশছোঁয়া বিস্ফোরণ ঘটুক। কিন্তু বিস্ফোরণত ভাবনায় নিহিত নেই। সেতো লেখায় প্রকাশিত হবে। সার্বত্রিক বিচারে এই চরমকে যে কবিই অলঙ্কার ভেবে নিয়েছেন সেই-ই পূর্বোক্ত চূড়োকে মুহূর্তের মধ্যে ছত্রখান কোরেছেন। এরপরেও যদি সেই কবি সার্থকতা লাভ কোরে থাকেন ; তবে অবশ্য আমার পরাজয় মেনে নিতে হোলো। কিন্তু জীবনানন্দ বোলেছিলেন—কোন কিছুকে 'চরম' মনে কোরে সুস্থিরতা লাভ কোরবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই ; রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করবার প্রয়াস—যাকে কবিজগত বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখাতে চায়। এতে কোরে বাস্তব বাস্তবই থেকে যায়না ; দুয়ের একটা সমন্বয়ে সেতুলোক তৈরি হোয়ে চলতে থাকে এক যুগ থেকে অপর যুগে—কোনো পরিনির্বাণের, কারুমতে, অল্পাধিক শুভপরিচ্ছন্ন সমাজ প্রয়াণের দিকে, অন্য কারু ধারনায় ; কবিজগতে যে পাঠকেরা ভ্রমণ কোরেছেন তাদের মনে (কিংবা হাতে) ইহজগত আবার নতুন কোরে পরিকল্পিত হবার সুযোগ পায় তাই।—[জীবনানন্দ | কবিতারকথা | কবিতাপ্রসংগে] এই ইতিহাসবোধ, পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানের অভাব ও চরমপ্রিয়তা একালের কবিজনের মধ্যে আভাসিত।

আর একটা কথা এই সংগে বোললে অবশ্য প্রসংগচ্যুতি ঘটবে না বোলে মনে করি, তা হোল অতিমাত্রায় কালনিষ্ঠা। তার কারণ ইতিহাসবোধের কথা উঠতেই মনে হোতে পারে যে আমরা এখন আগামী দিনের ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ে বাস করছি। আসল কথা এযুগটাই অসংলগ্ন এবং অন্তঃসারশূণ্য। তাকে কেন্দ্র কোরে যে কবিতা গড়ে উঠবে তাও মহাসময়ের কোলে দীর্ঘস্থায়ী নয়। তবুও এরই মধ্যে পথ কোরে নিতে হবে কবিকে। জীবনের গহনতম রন্ধ্রে প্রবেশ কোরে ইতিহাসের আদ্যন্ত প্রেক্ষাপটে মানুষের বেদনা, সাফল্য ঢেলে দিয়ে গুছিয়ে তুলতে হবে, তাই এ কালের উত্তীর্ণ কবিতা। নচেৎ কালের স্বরাজ্যে নিঃস্তব্ধ পরিমণ্ডলে কবির অবিরত বিচরণ ব্যর্থ হবে। কবি কিছুতেই অন্তর্ভৌমিক সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ কোরতে পারবেন না। একালের কবিকে সজাগ থাকতে হবে।

একটু আগেই যে চরমতার কথা বলছিলাম তা থেকেই কবিদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক ন্যক্কারজনক প্রচেষ্টা—সনাতনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা। সুধীন্দ্রনাথও এই কথা ভেবে কোন এক সময়ে ব্যথা অনুভব কোরেছিলেন। [বর্তমানের বুদ্ধি বৈনাশিক ; তার উল্লেখনী মানুষী কীর্তিস্তম্ভের আপতিক ভিত্তিকে এমনি নিষ্ঠুর অন্বেষণে আমাদের জ্ঞানগোচরে এনেছে যে তথাকথিত সনাতন সত্যসমূহকে আমরা সহজেই বীতশ্রদ্ধ। অতএব কাব্যের কল্পতরু আজকে আর বটের মতো ধরিত্রীর অঙ্কে বদ্ধমূল নয়, সে গাছ পর্বতজাত রক্তডেণ্ড্রনের মতো তনুবাত অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত ; এবং সেইজন্যই তার দেহগ্রন্থিল, তার পরিসর খর্ব্ব, তার তলায় ছায়া নেই, ফল নেই তার শাখায়,

আছে শুধু একটা অহেতুক আন্দোলন, আর আছে ফুল, নির্মল রক্তাক্ত ফুল।—সুধীন্দ্রনাথ স্বগত কাব্যের মুক্তি]

যা সকলের চোখে প্রিয়, হঠাৎ তাকেই অপ্রিয় ঘোষণা করা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের দাবী করা একটা জনপ্রিয় অভ্যাস। প্রাক্তনকে কিংবা অসংগতকে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে তারিফ করার যোগ্য, কিন্তু যখন বিকৃত বিফলতা পাঠকের পথ্য হিসাবে পরিবেশিত হয়, তা একান্তই ঘৃণ্য। এই কুৎসিত অভ্যাসপ্রিয়তার মধ্য দিয়েই আত্মনিরীক্ষায় অধৈর্য্য, সনাতনের প্রতি বীতস্পৃহা, ঐতিহ্যবিরোধী অনুশীলন, আয়াসপ্রিয়তার সাধ ক্রমশঃ প্রসার লাভ কোরেছে। কবিতার চেয়ে, কবিতার জন্মদাতা হোতে গেলে কতখানি দৈবানুপ্রাণিত হোতে হবে, কতখানি কৃচ্ছ্রতাসাধন কোরতে হবে অর্থাৎ কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখবার লৌহ কঠিন ব্যবস্থা কোরে তবেই কবিতার জন্ম কৃতকার্য হবে। সে দাসত্ব কবির, পাঠকের নয়, কোন পাঠক যদি এই প্রেরণা-সঞ্চারের কাজে এগিয়ে আসেন তবে তা সৌভাগ্য, কিন্তু কবিকেই আসতে হবে সম্মুখভাগে।

পাঠক কবিতাকে আর তেমন ভালবাসেন না, একথা আমি মানিনা। বরং কবিতাকে ভালবাসা না দিতে পারার ব্যথা পাঠকের মনে আছে। তাকে হাতের অঞ্জলি কোরে দেবার দায়িত্ব কবির। এ বৈফল্য তার সাম্প্রতিক স্বভাবধর্মের সহজাত। আসলকথা পাঠক কবিতাহীন চাপল্য কখনই সহ্য কোরবেন না। কখনো কখনো কবির ব্যক্তিজীবনের রুচিমাত্রার কলুষিত প্রকাশে পাঠক বীতশ্রদ্ধ। তবু মুঠো শক্ত কোরে বোলতে পারি বাংলাদেশেই প্রচুর কবি আছেন যারা শুভবাদের পায়ে মাথা নুইয়ে তপস্যাকঠিন পথে আলোর সন্ধানে ব্যস্ত। তারা আড়ালে ধ্রুবতারার প্রদীপ জেলে আত্মমগ্ন। কিন্তু পাঠক হাঁপিয়ে উঠেছেন। তারা কবিতাকে কখনোই অস্বীকার কোরতে চাননা। বরং আপন অভিজ্ঞান মণ্ডলকে দূরগামী বৈতরণীতে ভাসিয়ে দিয়ে দীনাত্মামুক্ত কোরতে চান অমৃতের অকৃত্রিম পথশোভায়।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

সীতারাম (সীতা : ১।২)

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস "সীতারাম"-এর নায়ক রাজা সীতারাম রায় একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরে এঁর বাস ছিল। ক্রমে ইনি শক্তিবৃদ্ধি করে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। তৎকালীন বাংলার সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁ কয়েকবার সৈন্য প্রেরণ ক'রে তাঁকে দমন করতে অসমর্থ হন। ক্রমে তিনি বিলাসী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই সুযোগে নবাব সৈন্যের আক্রমণে তিনি পরাজিত হন। কারও মতে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে তাঁকে শূলে দেওয়া হয়, আবার কারও মতে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু এই চরিত্রের ঐতিহাসিকতার প্রতি বেশি মনযোগ দেন নি। তাই তিনি বলেছেন—"যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা West Land সাহেবকৃত যশোহরের বৃত্তান্ত এবং Stewart সাহেবকৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ" করেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার দেখিয়েছেন, (বঙ্কিম গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) বঙ্কিমচন্দ্র সামান্য কিম্বদন্তী ও ঐতিহাসিকমূলক কাহিনী অবলম্বনে যে সীতারামের চরিত্র অংকন করেছেন, তা অনেকাংশেই ইতিহাসসম্মত। বিশেষভাবে, মহম্মদপুর ও ভূষণার সংগে সীতারামের সংযোগ, সীতারামের শক্তিমত্তা, তাঁর তিন বিবাহ ও ব্যক্তিগত দোষের ফলে তাঁর পতন—ইতিহাসানুগ ঘটনা।

কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র সীতারাম অপেক্ষা, মানবচরিত্র সীতারামকেই বঙ্কিম সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। এক দৃঢ়নিষ্ঠ কর্মীপুরুষের জীবন-ট্র্যাজেডিই চিত্রিত হয়েছে এই চরিত্রে।

বীরপুরুষোচিত সমস্ত গুণই সীতারামের মধ্যে বিদ্যমান। উপন্যাসের প্রথমেই দেখি গঙ্গারামের উদ্ধারকল্পে তাঁর দৃঢ়নিষ্ঠতা। এই পরোপকারবৃত্তির পিছনে তাঁর পরিত্যক্তা স্ত্রী শ্রীর অনুরোধ যত না প্রেরণা জুগিয়েছে, তার চেয়ে বেশি প্রেরণা পেয়েছেন তিনি তাঁর নিজের মধ্যে। তিনি বুঝেছেন—শরণাগতকে রক্ষা করাই প্রকৃত মানুষের ধর্ম। তাই গঙ্গারামের প্রাণের বিনিময়ে তিনি নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজী হয়েছিলেন।

গঙ্গারামের পলায়নে কতটা সীতারামের কৌশল কার্যকরী হয়েছে, আর কতকটা ঘটনাবিপর্যয়ে তা সম্ভব হয়েছে বঙ্কিম তার স্পষ্ট মীমাংসা করেন নি।

শেষজীবনে বঙ্কিমের প্রবল হিন্দুপ্রীতি সীতারামের মধ্যে আরোপিত হয়েছে।—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?"

সীতারাম পিতৃ আদেশে প্রধানা স্ত্রী শ্রীকে ত্যাগ করেন। কিন্তু এখানে ব্রজেশ্বরের মত তাঁর অন্ধ পিতৃভক্তি প্রকাশ পায় নি। তাই তিনি বলেছেন—"পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে, তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি

অধর্ম করিতে বলেন, তবে তাহা কি পালনীয়? পিতা-মাতা বা গুরুর অজ্ঞাতেও অধর্ম করা যায় না—কেন না যিনি পিতামাতার পিতা-মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রী ত্যাগ ঘোরতর অধর্ম—অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম করিতেছি—শীঘ্রই আমি তোমাকে এ কথা জানাইতাম, কিন্তু—" (১।৭)

এই 'কিন্তুর' উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন এইভাবে—"স্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে যে, কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে, মনে হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে না। যার একদিকে নন্দা, আর একদিকে রমা, তার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে?" (১।৮)

প্রথম দর্শনেই শ্রীর প্রতি সীতারামের রূপমোহ জন্মায়। তাই শ্রীকে প্রথম দর্শন করেই সীতারামের বিস্ময়োক্তি "তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!" এই আকর্ষণ কেন? ব্রজেশ্বরের ক্ষেত্রে নয়ানবৌ ছিল কুরূপা, আর সাগর ছিল বালিকা—প্রকৃত গৃহিণী কেউ ছিল না। তাই তার প্রফুল্লর প্রতি এত আসক্তি। কিন্তু সীতারামের রমার সৌন্দর্যও কম নয়, নন্দাও সুগৃহিণী। তা'হলে শ্রীতে আবার নূতন কি পাবার আকাঙ্ক্ষায় সীতারাম ছুটেছেন। নূতনের প্রতি আকর্ষণ, অধরাকে ধরবার চেষ্টাই সীতারামের কামনাকে বাড়িয়ে তুলেছে—"যাহাকে ইহজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয়।"

প্রথম দর্শনের পর শ্রীকে না পেয়ে সীতারাম কিঞ্চিৎ বিহ্বল হয়ে পড়লেও, "শেষে সীতারাম স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্য স্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ পর্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই; কেন না, দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। তাঁর সনন্দ পাইবার অভিলাস হইল। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন, ইহা স্থির করিলেন।" (২।১)

সীতারামের এই অনুপস্থিতিতে গঙ্গারামের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। শেষ মুহূর্তে সীতারাম এসে রাজ্য রক্ষা করলেন, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। সন্ন্যাসিনী শ্রীকে কাছে পেয়ে, অথচ নিজের ক'রে না পেয়ে, তার কল্যাণী রাজশক্তি এক ভয়ংকরী সর্বনাশী শক্তিতে পরিণত হল।

"এ শ্রী তো সীতারামের শ্রী নয়" "সীতারাম তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন।" মনে হয় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছেন। ক্রুদ্ধ সাপ যেমন শত্রুকে না পেয়ে দোদুল্যমান গাছের ছায়াতেই বারবার ছোবল মারতে থাকে, সীতারামের রাগ তেমনি বর্ষিত হ'তে লাগল রাজ্যের কর্মচারীদের ওপর। সীতারাম শেষ ছোবল মারলেন, তথা ট্র্যাজিক্ পরিণতির চরম সীমায় গিয়ে পৌছলেন, সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা ক'রে বেত্রাঘাত করবার সময়ে।

রমার নীরব আত্মদান সীতারামের হৃদয়ে খানিকটা অনুশোচনা জাগালো, কারণ তিনি সেদিন 'চিত্তবিশ্রামে' গেলেন না। কিন্তু তাতেও তাঁর পরিবর্তন হল না। তখনো শ্রী-র আশা আছে। কিন্তু শ্রীহীন অবস্থায় ভানুমতী নামে সামান্য এক নারীর—"ধর্ম আছে" এই কথাটি সীতারামের

চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাল—এটা একান্তই অসম্ভব ব'লে মনে হয়। তা'হলে এই ব্যাখ্যাই দিতে হয়—সীতারাম তখন সমস্ত শক্তি হারিয়ে প্রায়শ্চিত্তের পথে ফেরার জন্যই উন্মুখ হয়েছিলেন।

বঙ্কিম ইতিহাসও কিংবদন্তীর দ্বিধায় সীতারামের পরিণতি স্পষ্ট ক'রে চিত্রিত করতে সাহস করেন নি বটে, কিন্তু এত বড় একজন শক্তিশালী পুরুষের সমস্ত শক্তির নিঃশেষিত রূপ; পাঠকহৃদয়ে তাঁর পরিণতির বেদনাদায়ক ছাপই রেখে গেছে।

সীতারাম চরিত্রটির সংগে রবীন্দ্রনাথের "রাজারাণী" নাটকের বিক্রমদেবের মনোবৃত্তির একটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। উভয়েই প্রচণ্ড শক্তিমান পুরুষ, কিন্তু সেই শক্তি প্রেমের প্রচণ্ডতায় বিকৃতি লাভ করেছে।—"এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।"

(রাজারাণীর ভূমিকা—রবীন্দ্র রচনাবলী)

সুকুমারী (আনন্দঃ ১।১২) ॥

মহেন্দ্র কল্যাণীর কন্যা সুকুমারী নিতান্ত শিশুমাত্র। তাই উপন্যাসে সে বিষপান ক'রে, নিমাইয়ের মাতৃস্নেহ কেড়ে নিয়ে—ঘটনার সৃষ্টি ক'রলেও চরিত্র হ'য়ে উঠতে পারে নি।

(চন্দ্রঃ ১।২) ॥

"সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী, শৈবালিনীর সখী।" আবার সুন্দরীর বোন রূপসী প্রতাপের স্বামী। সুতরাং সম্বন্ধের দিক থেকে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এ চরিত্রের উপস্থিতি অনিবার্য। তাছাড়া সুন্দরীকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আরও অনেক কাজ করিয়েছেন।

সুন্দরী সহজ সরল গ্রাম্যবধূ। শৈবলিনীর সংগে তার হাস্যপরিহাস ও আন্তরিকতা বাঙালী গ্রাম্য মেয়েদের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। ভীমা পুষ্করিণীতে লরেন্স ফষ্টরকে দেখে সুন্দরীর ভীতি ও পলায়ন—গ্রাম্য মেয়ের ইংরেজভীতিকেই প্রকাশ করেছে।

কিন্তু এই সুন্দরীই আবার প্রয়োজনে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। নাপিতানীর বেশে শৈবলিনীকে উদ্ধারের চেষ্টা তার সাহস, বুদ্ধি ও কুশলী মনের পরিচয় দেয়। শৈবলিনীকে সে যথার্থ ভালবাসে বলেই এরূপ কার্যে সাহস পেয়েছে। তা'ছাড়া সে চন্দ্রশেখরকেও যথার্থ ভালবাসে। তাই সে চন্দ্রশেখরের মত স্বামীকে ত্যাগ ক'রে শৈবলিনীর গৃহে প্রত্যাগমনের অসম্মতির কথা শুনে তাকে ধিক্কার দিয়েছে। সাধারণ বাঙালী বধূর মতই স্বামীই তাদের একমাত্র দেবতা। তাই শৈবলিনী উদ্ধারকালে স্বামীর সময়ে আহার না হওয়ায় উদ্বেগ বোধ করেছে।

কিন্তু সুন্দরীর উভয় সংকট। তার সংস্কার শৈবলিনীর প্রতি ঘৃণা জাগিয়েছে, কিন্তু তার ভালবাসা শেষপর্যন্ত শৈবলিনী উদ্ধারের উপায় হিসাবে প্রতাপের কাছ পর্যন্ত তাকে টেনে নিয়ে গেছে। শৈবলিনীর প্রতি ভালবাসার বশেই সুন্দরী তার মৃত্যু কামনা করেছে।

কাহিনীর অল্প অবসরে সুন্দরী চরিত্রটি সরলতায়, আন্তরিকতায়, ভালবাসায় ও সাহসিকতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সুভাষিনী (ইন্দিরা ৬ষ্ঠ পরিঃ) ॥

'ইন্দিরা' উপন্যাসের সুভাষিনী, 'বিষবৃক্ষে'র কমলমণির দ্বিতীয় সংস্করণ। সুভাষিনীও পতিগতপ্রাণা, স্বামীর সংগে পরামর্শ ক'রে সব কাজ করে। তার একটি কন্যা ও একটি পুত্র। পুত্রটি অস্ফুট কথায় মাতার ও অন্যান্যদের কাছ থেকে আদর কেড়ে নেয়। সুভাষিনীও প্রাণোচ্ছল। ইন্দিরার প্রতি তার ভালবাসা নিবিড়। ইন্দিরাকে সে যেভাবে চাকরী দিয়েছে তাতে তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। কমলমণি অবশ্য সুভাষিনীর মত গৃহিণীপনায় দক্ষ ছিল না।

সুভাষিনীর চেষ্টাতেই ইন্দিরার সংগে তার স্বামীর সাক্ষাৎ হয়। সুভাষিনীর হৃদয় অত্যন্ত মহৎ। তাই নিজের অলংকার সে ইন্দিরাকে পরিয়ে আনন্দ লাভ করতে চায়।

সুভাষিনী সুহাসিনীও বটে।

সুভাষিনীর শাশুড়ী (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ) ॥

চরিত্রটি খুবই উপভোগ্য। তাঁর রঙটা কালিভরা বোতলের মত হলেও, মনটা ততটা কালিভরা নয়। তাঁকে বোকা বানানো খুবই সোজা। দু-একটি পাকা চুল বেছেই ইন্দিরা তাঁর মন জয় করে নিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতে চান না যে তাঁর যৌবন গিয়েছে। তা'ছাড়া কর্তার সামনেও কোন যুবতী মেয়েকে যেতে দেন না। পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ অধিক। আর পাঁচটা সাধারণ গিন্নির মতই তার চরিত্র।

সুভাষিনীর ছেলে (ইন্দিরা ৮ম পরিঃ) ॥ 'বিষবৃক্ষে'র শচীশচন্দ্রের প্রতিরূপ।

সুরেন্দ্র (বিষঃ ২০শ পরিঃ) ॥

দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র। ইনি সচ্চরিত্র। কিন্তু দেবেন্দ্রকে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাই দেবেন্দ্রকে সৎপথে আনার বহু চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে হতাশ হয়ে দেবেন্দ্রের সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

সূর্য্যমুখী (বিষঃ ১ম পরিঃ) ॥

সূর্যমুখী সূর্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়—তাতেই তার আনন্দ। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নায়িকা সূর্যমুখীর সূর্য—নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ। কিন্তু স্বামীর প্রতি এই আত্যন্তিক আসক্তি তাকে ব্যক্তিত্বহীন নারীমাত্রে পর্যবসিত করেনি। বস্তুত বঙ্কিম উপন্যাসে সূর্যমুখীর মত প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী নারী খুব কমই আছে।

অনেকে বলে থাকেন সূর্যমুখী হল বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নীর প্রতিচ্ছবি। এ ধারণা প্রতিষ্ঠা করবার মত প্রমাণ বর্তমানে আর অবশিষ্ট নেই। তবে সূর্যমুখী-চরিত্র পরিকল্পনার পিছনে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাবকে অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই।

সূর্যমুখী সম্পন্ন বাঙালী ঘরের বধূ। উপন্যাসমধ্যে যখন তিনি আবির্ভূতা হয়েছেন, তখন তাঁর যৌবন চাপল্যের সীমা অতিক্রম ক'রে স্থৈর্যে এসে উপনীত হয়েছে। তাছাড়া এতবড় এক

জমিদার বাড়ীর গৃহিণী হিসাবে স্বভাবতঃই তাকে গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হয়েছে সূর্যমুখী লেখাপড়াও শিখেছিলেন। এই সমস্ত কারণে সূর্যমুখীর ব্যক্তিত্ব প্রখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপযুক্ত স্থানে যে তাঁর স্বভাবগাম্ভীর্য শিথিল হয় তার প্রমাণ পাই কমলমণির সংগে তাঁর কথোপকথনের মধ্যে।

সূর্যমুখী নগেন্দ্রের কাছ থেকে পত্রে কুন্দের কথা জানতে পেরে স্বামীকে রসিকতা ক'রে লিখেছেন—"একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিসের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচামিঠে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?" "যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।" (৫ম পরিঃ)। ভাগ্যলক্ষ্মী তখন অদৃশ্যে হাসছিলেন। এই রসিকতাই শেষপর্যন্ত সত্যে পরিণত হ'ল।

তারাচরণের সংগে বিবাহদান, দেবেন্দ্রের হাত থেকে কুন্দকে রক্ষা এবং বিধবাকে নিজগৃহে রক্ষা করার মধ্যে সূর্যমুখীর দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু সূর্যমুখী অন্তরে বুঝতে পেরেছেন, তাঁর কপাল ভেঙেছে। স্বামীর প্রতিটি আচরণের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুঝিয়ে দিয়েছে, নগেন্দ্রের কোথায় অভাব। সেকথা তিনি কমলমণিকে চিঠিতে জানিয়েছেন। কিন্তু স্বামীর প্রতি তাঁর এতটুকু অনুযোগ নেই। তিনি সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন।

সূর্যমুখী যদি সাধারণ স্ত্রীলোক হতেন তাহলে এত চিন্তার কারণ ছিল না। নগেন্দ্রনাথও সহজে কুন্দকে বিয়ে করে দুই স্ত্রী নিয়ে সংসার করতে পারতেন!

সূর্যমুখীর সর্বাপেক্ষা আঘাত লাগল সেদিন, যেদিন নগেন্দ্র কুন্দের গৃহত্যাগের জন্য দায়ী করলেন সূর্যমুখীকে। সূর্যমুখী সচেষ্ট হলেন কুন্দের সংগে স্বামীর বিবাহ দিতে। সূর্যমুখীর প্রেম এত গভীর যে, বিয়ের পর স্বামীর সুখ কতটুকু হয় সেটা দেখে যাবার সাধও মেটাতে চায়।

তারপর পথে পথে সূর্যমুখীকে যেভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাতে তাঁর দুর্ভোগের চূড়ান্ত হয়েছে। বিষবৃক্ষের ফল, সূর্যমুখীকে এই বিচ্ছেদের জ্বালা সহ্য ক'রে ভোগ করতে হয়েছে। তবে সূর্যমুখীর দোষ খুবই অল্প। তাই শেষপর্যন্ত স্বামীর সংগে তার মিলন ঘটেছে।

সের (xerxes) (রাজঃ ৫।৬) ॥

পারস্য সম্রাট। খ্রীঃ পূর্ব ৪৮১ অব্দে গ্রীসের বিরুদ্ধে বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিয়ে অভিযান করেন। ঐতিহাসিকদের মতে সৈন্য সংখ্যা ছিল নাকি ২৫ লক্ষের উপর। রাজসিংহের ক্ষুদ্র রাজ্যের ওপর ভারতসম্রাট ঔরঙ্গজেবের আক্রমণ উপলক্ষে সেরের কথা বলা হয়েছে।

সেলিম (কপাঃ ৩।১) ॥

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের যুবরাজ থাকাকালীন নাম সেলিম। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সংক্ষেপে ঐতিহাসিক সেলিমের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা আছে। মেহের-উন্নিসার প্রতি জাহাঙ্গীরের প্রেমও ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু লুৎফ-উন্নিসার প্রতি জাহাঙ্গীরের প্রেমের ব্যাপারটা বঙ্কিমের সম্পূর্ণ কাল্পনিক সংযোজন। এই উপন্যাসে সেলিমকে বহু নারীতে আসক্ত চরিত্ররূপে অংকিত করা হয়েছে।

আর্থনীতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় ঃ রায়ত-প্রসংগ ঃ একদিক

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সমাজ-আর্থনীতিক অবস্থা কেমন ছিল প্রশ্ন উঠলে স্বভাবতই রায়তীপ্রথা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যা' ঐ যুগের ইতিহাসকে স্মরণীয় করেছে, মনে আসে। প্রাচীন যুগে, মনুসংহিতার সূত্রানুযায়ী, যে জমি চাষ করে তারই স্বত্ব জমিতে, যদিচ রাজা ছিলেন মূল জমির মালিক। কিন্তু সে নিয়ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় রইল না। এ-সময়ে জমির মালিক হয়ে এলেন জমিদার শ্রেণী। এঁরা পাঁচ দশ বছরের জন্য জমির মালিক হতেন। কিন্তু এতে সুবিধে অপেক্ষা অসুবিধে দেখা দিল অনেক। তার ফলে রায়তদের ওপর আর্থনীতিক শোষণ বেড়েই চলল। এ-দিকে ব্রিটিশ সরকারের রাজস্বের সুবিধার জন্য হেষ্টিংস এবং ফ্রান্সিস জমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত সম্পর্কে এই মত প্রকাশ করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, যা কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক-ও উদ্ভাসিত হয়েছিল, আলোর সন্ধান দিতে পারে নি। জমিদারদের জমিতে চিরস্থায়ী স্বত্বপ্রাপ্তি রায়তদের মধ্যে কোন সাড়া জাগায়নি এই কারণেই যে, রায়তদের চরম দুর্দশা, যা এক্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ছিল তা উত্তর কালে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চরমে পৌছেচে। প্রজার কষ্টার্জিত অন্ন, জমিদারদের খাজনা আদায়ের কালে, যেমন হারাতে হয়েছে, তেমনি সবকিছু বিকিয়ে গেছে দেনার দায়ে। জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের চক্রান্তে রায়তদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ সরকার তাঁর আয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু অপর উদ্দেশ্য চাষ-বিস্তার এবং প্রজার উন্নতি, যা জমিদার শ্রেণীর প্রতি আশা করা হয়েছিল, হয়নি এতটুকু। মার্কসীয় দৃষ্টিভংগীতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, প্রলেতারিয়দের ওপর বুর্জোয়ার কর্তৃত্ব যা শ্রেণী-সংঘর্ষের রূপ নেয় কালক্রমে, বাংলার রায়ত ও জমিদারে তা দৃষ্ট। প্রলেতারিয়দের ওপর বুর্জোয়াদের নিষ্পেষণ, শোষণ মানবতা বিরোধী কিন্তু বুর্জোয়ারা মানবিকতার দাস নয়। জমিদার এবং রায়ত এই দুই শ্রেণীর সমস্ত সংঘর্ষ সমাজ এবং আর্থনীতিক দুরবস্থাকে কেন্দ্র করে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যখন জমিদার বা পুঁজিপতি মালিক শ্রেণী কৃষক বা শ্রমিকের ওপর শোষণ চালায় এবং তাদের সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার কেড়ে নেয় তখন শ্রমিক কৃষকরা নিজেদের মুক্তি এবং সমস্ত অধিকার ন্যায্য ভাবে পাওয়ার জন্য জমিদার বা মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। শ্রম বিভাগের ফলে একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। আর এ-কথাও স্বীকৃত যে, একটি লোকের পক্ষে তার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষের উৎপাদান একা করা সম্ভব নয়। প্রাচীনকালের উৎপাদন ব্যবস্থার সংগে আধুনিক যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার তফাৎটা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখেনা। উৎপাদনে কর্মরত সমস্ত মানুষ উৎপাদিত দ্রব্য বা লাভের ফসলের অধিকারী। পুঁজিপতিদের হাতে সমস্ত উৎপাদন

ক্ষমতা থাকায় উৎপাদন কর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদল প্রায় কিছুই পায় না, এমন কি জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও না। রায়তদের আসল অবস্থাটা এই। তারা ইকনমিক্যালি অপ্রেসড্ হচ্ছে। এদিকে জমিদার শ্রেণী বিনা মেহনতে সমস্ত লভ্যাংশ পায়। উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ ধনিক শ্রেণীর গহ্বরে যাওয়ায় সাধারণ লোকের আর্থনীতিক দুরবস্থার সৃষ্টি হয়। —'থিওরী অব সারপ্লাস ভ্যালু'তে মার্কস স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, ধনিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণী সর্বদাই প্রতারিত হচ্ছে। কারণ উদ্বৃত্ত অর্থের সমস্তটাই ধনিক শ্রেণীর পকেটস্থ হচ্ছে কিন্তু আসলে শ্রমিকরাই এই অর্থের মালিক।

আসলে ভূমি-সমস্যার মূল কথা, যা রায়তও জমিদারদের মধ্যে প্রায় চিরকালের দ্বন্দ্ব, হচ্ছে এই যে, চাষ যোগ্য জমির উৎপাদন শক্তি কতটুকু এবং তার ফলে দেশের আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় হোল কি না সে প্রশ্ন অবান্তর হয়ে দেখা দেয় কখনো কখনো। জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে অসতর্কতা জাতিকে ক'রে তোলে দুর্বল এবং সমস্যা হয় ঘনীভূত। বাংলাদেশের ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রেও ছিল অনেক ভ্রান্তি। সেই ভ্রান্তির ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিল ব্রিটিশ রাজ উদ্ভাবিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্তের তীব্র আক্রমণাত্মক লেখা স্মরণীয়। রায়তদের জমির ওপর যে-অধিকার বা রায়তে—জমিদারে, যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাতে উৎপাদনের অবস্থা কতটা উন্নত হবে সহজেই অনুমেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেকটা স্থায়ী অর্থাগমের উপায় হিসেবে উদ্ভাবিত হয়েছিল বলা যেতে পারে। আসলে কৃষকের হাতেই ভূমি সমর্পণ করা উচিত, কারণ, কৃষি উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও অর্থ সে প্রয়োগ ক'রে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু যখন সেই জমি ও উৎপন্ন ফসলের মূল মালিক হয় জমিদার এবং খাজনা বাকীর দায়ে ভূমি এমন কি বসত বাড়ী থেকেও রায়তকে উচ্ছেদ করে তখন রায়ত কৃষি-উন্নতিতে মন দেয় না। অবশ্য প্রসংগত বলে রাখা ভাল যে, এমন দু-একজন জমিদারকে দেখা গেছে যাঁরা প্রজাদের উন্নতিকল্পে কিছু করেছেন—কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। —যে কথা বলছিলাম, ভূমি সমস্যার মূল অন্তর্নিহিত রয়েছে রায়তওয়ারি প্রথার গলদে। প্রাচীন হিন্দুরীতি, কৌটিল্যের ভূমি ব্যবস্থার নির্দেশ, ভারতবর্ষের মধ্যযুগেই যা কিছুটা পালটেছে—অর্থাৎ মোরল্যাণ্ডের ভাষ্যানুযায়ী রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষকের উৎপন্ন ফসলের অংশ রাজস্ব হিসেবে গৃহীত হয়—এ ইতিহাস ও কিছুটা অভিনব। কিছুটা প্রাচীন যুগরীতি থেকে স্বতন্ত্র। তেমনি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ভূমি-ব্যবস্থা ও রায়তী প্রথা পূর্বযুগ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন, এবং আলাদা। রায়তের সংগে জমিদারের সরাসরি কোন যোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে। জাষ্টিস ফিল্ড প্রদত্ত ভাষা বা টেব্‌ল স্পষ্টভাবে এই প্রমাণ করে যে, মধ্যস্বত্ব ভোগীরাই জমিদার রায়তের মাঝখানে থেকে শোষণ করছিল। জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীর শোষণের ফলে রায়তদের আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। এই রায়তদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ দেখা গেল—স্বত্ববান রায়ত কর্তৃক নিম্নরায়তেরা শোষিত হোত।

হেনরী ফ্লাড সাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষকের খাজনা সমস্যা প্রসংগে এই বলা চলে যে, আর্থিক অবস্থার অবনতির জন্য খাজনা ততটা দায়ী নয়, কৃষক ও জমিদারজমির প্রতি

অবহেলাই অন্যতম কারণ। কিন্তু একথা ভুললে চলবে কি করে যে, মধ্যস্বত্বভোগীদের সন্তুষ্ট করতে করতেই অনেক রায়ত নিঃস্ব হয়ে গেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একদল দায়িত্বহীন জমিদারের উদ্ভব হয়, যারা শহরে বিলাস—ব্যসনে মত্ত থাকত। তাদের রসদ যোগাত গ্রাম বাংলার নিঃস্ব রায়তেরা। জমিদারের নায়েব—গোমস্তরা রায়তদের ওপর অত্যাচার করে অর্থ সংগ্রহ করত, অর্থদিতে অক্ষম রায়তদের ভিটে মাটিটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিত। তা' ছাড়া মহাজন এবং তেজারতি কারবারিদের ব্যাপার কাউরই অজানা নয়।—অর্থাৎ রায়ত, জমিদার এবং মধ্যস্বত্ব ভোগীদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা শ্রেণী দ্বন্দ্বেরই আর একটি রূপ। প্রসংগত—বলা যেতে পারে যে, শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসের অভিমত স্বীকৃত। অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানুষের আর্থনীতিক জীবনে 'শ্রেণী-সংগ্রাম' বিশেষ স্থান অধিকার করে আসছে। শুধু আর্থনীতিক জীবনই নয়, আর্থনীতিক জীবন যে সমাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজের উত্থান পতনও শ্রেণী সংগ্রাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের সমাজ-গঠনের কাল থেকেই দ্বন্দ্ববাদের সূত্রপাত। শ্রেণী বিভেদের কথা আমরা গীতা এবং ভারতীয় প্রাচীন পুস্তক থেকেই জানতে পারি। কিন্তু আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাকে বা শ্রেণী সংগ্রামকে বুঝতে হলে সমসাময়িক তাত্ত্বিকদের তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। যদিও একশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে মার্কসের আবির্ভাবের তথাপি তাঁর সূত্র এখনো নির্ভার যোগ্য এবং প্রায়ই অখণ্ডনীয়। এম, এন, রায় ও কোন কোন নেতা বা তাত্ত্বিক কিছু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তাঁদের যত কাজ বা সংস্কার কর্ম সবকিছুরই ভিত্তি মূল 'মার্কসীয় তত্ত্ব'। যাই হোক, সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে যে শ্রেণী সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছে তা আজও বর্তমান। তবে ফরম্‌টা পরিবর্তিত হয়েছে। ঐতিরেয় নিম্নশ্রেণীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বলে শিক্ষাদান কালে তার পিতা কর্তৃক অবহেলিত হয়েছিলেন। দুই পুলোমার মিলনেও শ্রেণী-বিভেদ ছিল প্রধান বাধা। এমন কী গীতাতে-ও বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির ভয়ে অর্জুনের ভীত রূপ দেখতে পাই। সে-যুগের শ্রেণী-চেতনার সংগে আজকের শ্রেণী-চেতনার আপতঃদৃষ্টিতে কোন মিল না থাকলেও একটা যোগসূত্র যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। তৎকালীন যুগের শ্রেণী-চেতনার যে-আভাস পাই তা' দীর্ঘকাল ধরে ইতিহাসের বিভিন্ন পথ বেয়ে বর্তমান রূপকে গ্রহণ করেছে। তৎকালীন যুগের দাস শ্রেণী ও প্রভুদলের সঙ্গে পরবর্তীকালের রোম ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দাস, বিশেষ করে ক্রীতদাস, শ্রেণীর মিল লক্ষ্যণীয়। এমন কি এখনকার বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক শোষিত শ্রমিক কৃষক শ্রেণীরও সাদৃশ্য আছে। (১) তবে মুক্তি কোন পথে ? অর্থাৎ রায়তদের জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা এলে এবং জমিদার বা মধ্যস্বত্ব ভোগীদের থেকে মুক্তি পেলেই কি জমির উন্নতি হবে ? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। তবে সরকারী খাসমহলের কৃষকদের অবস্থা যে কতটা শোচনীয় ছিল তা'ও দেখা গেছে। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি উপহার এনে দিল !

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের রায়ত ও জমিদারের সম্পর্ক প্রসংগে একদা বলেছিলেন নীল চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করার চেষ্টায় ছিল, তখন

জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েছে। নিষেধ আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকত তা হলে নীলের বন্যায় রায়তিজমি ডুবে একাকার হোত।” চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্থায়ী-জমিদার পাওয়া গিয়েছিল, আর সেই স্থায়ী জমিদারের উপকার পেয়েছি এটুকু! তাইবা শতকরা ক'জন জমিদার করেছিলেন! এবং মহাজনের ফাঁদে পড়ে রায়তের যে কি অবস্থা হোত তা কাউরই অজানা নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন জমিদার, এবং রায়তদের সুখ সুবিধে দেখতেন বলেই হয়ত মনে করতেন সমস্ত জমিদারই রায়তের সময় অসময়ের বন্ধু। প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন : রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসেবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করার জন্য আজীবন কী করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি,—কেননা তাঁর জমিদারী-সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে সেখদের বাঁচানো।—কিন্তু সেই সঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে, বাংলার জমিদার মাত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও যেমন জমিদার হিসেবেও তেমনি Unique।” ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথ, বা তাঁর মত শতকরা একজন জমিদার, রায়তের জন্য কি করেছিলেন তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন, যাঁরা রায়ত এমন কি গোটা দেশটাকেই শোষণ করার জন্য অংশতঃ দায়ী, তাঁদের সম্পর্কে এবং অবহেলিত—অত্যাচারিত রায়ত প্রসংগেই বলা প্রয়োজন।

রায়তদের দুরবস্থার কারণনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, অশিক্ষা এবং উচ্চশ্রেণী দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে এরা যুগ যুগ ধরে সমস্ত কিছু—খুইয়েছে—এমনকি নিজেদের বাঁচার বিদ্যাটা পর্যন্ত জানে না। এদের সমস্ত থেকেও কিছুই নেই। জমিতে স্বত্ব নেই। স্বত্ব জমিদারের—রাজার। কিন্তু আসল জমির মালিক তো রায়তেরই হবার কথা। প্রথমেই বলেছি এ অজ্ঞতার মূল কারণ—অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা। এদের তৈরী হতে প্রথমেই চাই শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। সুতরাং রায়তদের প্রথম দাবী হোল শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মঞ্জুরও হোল। কিন্তু যখন জমিতে স্বত্বের প্রশ্ন উঠল তখনই ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করল সকলে মিলে। যে সমস্ত—জমিদার শ্রেণী রায়তের পক্ষে ওকালতি করল (যদিও তা মুষ্টিমেয়) তাঁরা এক ঘরে হয়ে গেলেন সাম্প্রদায়িকতার দায়ে। এ সাম্প্রদায়িকতা কি? শোষকের সঙ্গে শোষিতের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ! রাশিয়ার ইতিহাসে দেখি অক্টোবর বিপ্লবের ফলে কৃষকেরা মুক্তি পেল। অবশ্য সে সংগে শ্রমিকরাও। প্রলেতারিয় একনায়কত্বের উত্থান রাশিয়ার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। শুধু রাশিয়া কেন, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই এ-এক অভূতপুর্ব ব্যাপার। জন রিড এ-সম্পর্কে অনেক প্রামাণিক তথ্য দিয়েছেন। আমাদের দেশের কৃষক বা রায়তের অবস্থা রাশিয়ার প্রাক্ বিপ্লব যুগীয় কৃষকের সঙ্গে কি তুলনীয়? আজ কেউ কেউ কৃষিবিপ্লবের দ্বারা কৃষক বা রায়তদের সমস্ত ক্ষমতা এবং অধিকার ফিরিয়ে আনতে চাইছেন—কিন্তু গলদ গোড়াতেই, কারণ কৃষি-বিপ্লবই একটা বিপ্লবের পরিপূর্ণতা নয় রায়তদের অবস্থা ছিল, মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড-এর রিপোর্ট অনুযায়ী—মহাজন জমিদার বা কোন নিকটাত্মীয় কর্তৃক গঠিত--শিক্ষার আলোথেকে বঞ্চিত। এই অশিক্ষিত দরিদ্র রায়ত বা কৃষকদের ওপর জমির মালিকের অর্থনৈতিক শোষণ এবং মধ্যস্বত্বভোগীর অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছিল। অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'জমির মালিক' পুস্তকে স্পষ্টই লিখেছেন : “১৭৯৩ সালের পর দেড়শ বছর

কেটেছে। এর মধ্যে জমিদারী বদল হয়েছে অনেক। কিন্তু লক্ষ বিঘা জমির জমিদার থেকে একশ' বিঘা জমির জমিদার পর্যন্ত কেউই চাষের কাজে নজর দিয়ে চাষা হবার মতো ছোটলোকী বুদ্ধির কখনো পরিচয় দেননি। পেটের দায়ে ও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় যে ফসল ফলিয়েছে তার যতটা সম্ভব বড় অংশ খাজনায় ও খরচ-মাথট-ভিক্ষা ইত্যাদি ফিকিরে আদায় করতে পারে এমন নায়েব-গোমস্তা বহালে তাঁরা তৎপরতা মন্দ দেখান নি; কিন্তু এ ফসল যাতে বাড়ে সে চেষ্টায় কখনো অর্থ কি সামর্থ্য খরচ করেন নি।" অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ, যা প্রাচীন ভারতেও দৃষ্ট, কৃষি-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা, প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে—অন্তত: এটা বলা চলে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল এবং বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিকতাবাদে বিশ্বাসী ক্ষমতাসম্পন্ন এক শ্রেণীর লোক, যাঁরা রক্ষকের ভূমিকায় অংশ গ্রহণকারী, কর্তৃক রায়তের, বিশেষ করে নিম্নরায়ত বা কৃষকের, সর্বস্ব শোষিত হয়েছে। আর যাঁরা মূলধন খাটিয়েছেন তাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে এতটুকুও ব্যয় না করে সমস্তটা জমিতেই নিয়োগ করেছেন। এদিকে এখানকার কাঁচামাল ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে যে দ্রব্যাদি তৈরী হোত তা এদেশের বাজারেই বিক্রি হোত চড়া দরে। শিল্পে উন্নতি করার কোন প্রচেষ্টাই দেখা যায়নি। ফলে মাটিতে নিয়োজিত মূলধন মাটিতেই মাটি হয়ে গেছে। এর জন্য কৃষককেও কম দুর্ভোগ ভুগতে হয়নি! আজকের রায়ত বা কৃষকের দুরবস্থা এবং শিল্পে অনগ্রসরতার মূল কারণও কি ভূমিতে নিয়োজিত মূলধন নয়?

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

১। গ্রাম সমাজের শ্রেণী ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা যায় যে, এখানে সেখানে উৎকট শ্রেণী (বিশেষ করে জাতি) প্রথা বর্তমান। এবং এম. শ্রীনিবাস তাঁর Cast in Modern And Other Essays গ্রন্থে এই মন্তব্য করেছেন যে, Cast system-এর প্রখরতা আমাদের জাতীয় জীবনে শীঘ্রই আরো প্রকট হয়ে দেখা দেবে, তবে আশা—ভবিষ্যতে এই জাতিপ্রথা বিলুপ্ত হবে। আমাদের দেশের শ্রেণী-সংগ্রামের প্রাথমিক এবং মূল ব্যাপারটিই রয়ে গেছে জাতিপ্রথা এবং অন্যায় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে। এই সামাজিক দুষ্টক্ষতই সমাজকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। সুতরাং এটা হচ্ছে একটা সামাজিক সমস্যা।

হাওড়া জেলার লোকের উপাধি

ভারতের বা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের উপাধি নিয়ে কিছু গবেষণামূলক লেখা বিভিন্ন ইংরাজী· গবেষণা-সংক্রান্ত পত্রিকায় ও সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে জানি। কোন কোন প্রবন্ধ সুযুক্তিহীন ও আবেগমূলক বা বিশেষ কল্পনামূলক হয়েছে বোধ হয়; অন্ততঃ অনেক কিছু কাজ বাকী রয়ে গেছে। আমিও একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সীমিত ক্ষুদ্র জেলার লোকের উপাধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও কৌতূহল ও স্মৃতি সম্বল করে দু কথা বলতে যাচ্ছি।

নিজ নামের পরে পরিচয়সূচক যে এক বা একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে উপাধি বলে গণ্য করা যায়। কোন কোন প্রদেশে পিতৃনাম ও তৎপরে সাধারণ উপাধি পরে দেওয়া হয়; কোথাও বা জন্মগ্রামের বা স্থানবাচক শব্দের প্রয়োগও হয়। গ্রন্থাদিতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার জন্য সাধারণতঃ শেষ উপাধিকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়। উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও উপাধিবাচক শব্দ বা শব্দগুলি প্রধানতঃ নিম্নকারণে হয়। (১) দেবতার নামে, যথা মিত্র, আদিত্য,...... ; (২) প্রাণীদের নামে; যেমন সিংহ, বাঘ, হাতী নাগ,...... ; (৩) সম্মানসূচক বা বিশেষ জ্ঞান পরিচায়ক, যথা উপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায়,......। বিনয়ে সম্মান দেখান যায় এই বৈষ্ণবভাবে দাস, ইত্যাদি। (৪) কর্ম বা পেশাবাচক, যেমন কর্মকার, স্বর্ণকার, চামার (চর্মকার),......। (৫) একটা মূল নাম বা নামাংশ হতে উপাধি, যেমন রঙ্গরাজ গোপালের পরে পরবর্তী রাজাদের নামে পাল শব্দকে উপাধি ধরা হয়; ঐভাবে শ্রীগুপ্তের পরে চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির গুপ্তকে উপাধি ও সুষেণ বা এরূপ নামের পরে বল্লালসেন প্রভৃতির সেন শব্দকে উপাধি মনে করা হয়। (৬) বিবিধ। এর মধ্যে দেবতা ডাকিনী প্রভৃতির ক্রোধ হতে রক্ষা পাবার জন্য বা কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে কদর্য্য শব্দ-বাচক ষাড়, ভোঁড় প্রভৃতি উপাধিও হাওড়ায় দেখা যায়।

অতীতেও বিশিষ্ট মানবসম্প্রদায় স্বার্থের প্রয়োজনে পরিচয় বা উপাধির পরিবর্তন ঘটিয়েছে, বর্তমান যুগে তো তা বিশেষভাবে ঘটছে। কুলগুরু পরিবর্তনে বা ধর্মমত-পরিবর্তনেও উপাধির পরিবর্তন ঘটে। বৈদিক যুগে বা সুপ্রাচীন ভারতে দেবতা, রাজা, ঋষি প্রভৃতির উপাধি সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিতে কিছু বলা কঠিন। উপনিষদে তো ব্যাঘ্রীপুত্র, ভল্লুকীপুত্র প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়।

যাক, এবারে মূল বক্তব্যের দিকে ফিরি। বাংলাদেশেও বহু বিচিত্র জাতি বা সম্প্রদায়ের শত শত উপাধির মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটে অপরিচিত বোধ হয়। চারিপার্শ্বস্থ জেলা বা অঞ্চলের বিশেষ প্রভাবই সাধারণতঃ একটা মধ্যবর্তী জেলা বা অঞ্চলের নাম ও উপাধির উপর পড়ে। দাস, ঘোষ, সিংহ প্রভৃতি, উপাধ্যায়ান্ত উপাধি, গুপ্তান্ত উপাধি প্রভৃতি সাধারণ উপাধি হাওড়ায় দেখা যায়। দাস, ঘোষ, সেন প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট জাতিবাচক বলে কারও কারও ধারণা; কিন্তু এ ধারণা নিরাপদ নয়, ওগুলি দ্বারা একাধিক জাতি (Caste) সূচিত হতে পারে। দাস শব্দ স্থলে কেউ কেউ দাশ (দাতা অর্থে) লেখেন। প্রয়োজনমত উপাধি পরিবর্তন চলে, পূর্বেই বলেছি, এক জাতিও (Caste) যে নির্ভেজাল তা নয়। বিখ্যাত ও পূর্বোক্ত

ধরণের ব্যাপক উপাধিগুলি নিয়ে এখানে আর বলতে চাই না।

কয়েকটি দুর্লভ ও অদ্ভুত উপাধির কথা বলি। ২টির কথা পূর্বে বলেছি। শ্যামপুর থানার কয়েকটা গ্রামে ১৫০।২০০ বৎসরপূর্বে ঘোষ (মহিষ ?) উপাধি ছিল। উলুবেড়িয়ার অদূরে ফুলেশ্বর স্টেশনের পাশে গণ্ডার উপাধির প্রচলন বর্তমানে রয়েছে। এক শিক্ষকের নিকট শুনলাম যে হাওড়ায় ছাগল উপাধি আছে। আর এক শিক্ষক তার সমর্থনে বলেন যে মেদিনীপুরে তাঁর ছাত্রের ঐ উপাধি ছিল। গোরু উপাধি প্রচলিত আছে কি না জানি না, তবে এক ভারতীয় পণ্ডিতের 'গাই' (Gai) উপাধি আছে ; এর মূলে হয়ত গাঁই, গ্রাম বা অন্য কোন শব্দ আছে। বাঘ, সিংহ নাগ, হাতী প্রভৃতি ও ঘোষ প্রভৃতি উপাধি প্রাণীবাচক বলেই মনে হয়। অনেকে এগুলিকে 'টটেম্' শ্রেণীর উপাধি অর্থাৎ আদিম বাসিন্দাদের পূজ্য বা মাননীয় উপাস্যের প্রতীক বলে মনে করেন। তবে এমন হওয়াও সম্ভব যে কোন রাজা বা সামন্তাদির মহিষশালা প্রভৃতির তদারক করা বা ঐ সমস্ত প্রাণী বশ করতে বা তাদের নিয়ে যাঁরা ব্যবসায় করতেন তাঁদের উপাধি ওরূপ হয় ; অন্ততঃ আমার এরূপ ধারণা। দুর্গাদেবীর নানা বর্ণনায় সিংহ বা মহিষাসুরের কথা পাওয়া যায় ; ও দুটিকে 'উপাধিও হওয়া সম্ভব' মনে করলে বোধ হয় এমন অপরাধ হয় না। কখনও কখনও চমকপ্রদ কাজের জন্য লোকে বা ব্যক্তিবিশেষ এক উপাধির প্রবর্তন করে ; যেমন ১টি বাঘ মারায় শের (শাহ) উপাধি হয়ে গেল। বাগনান স্টেশন হতে ২।৩ মাইল দূরে নবাসন গ্রামে বা তার পাশে সোনা উপাধি আছে। শতপথি (বোধহয় শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে দক্ষতার জন্য) উপাধিও শ্যামপুর থানায় নাউল গ্রামের পাশে আছে।

কোন কোন উপাধির বিচিত্র ব্যাখ্যাও দেখা যায়। যেমন চৌধুরী = চতুর্ধুরী অর্থাৎ চার বেদের চর্চাকারী ; এ সত্য হলে কায়স্থাদিও কয়েকটিশতাব্দী পূর্বে ঐ কর্মে দক্ষ ছিল তা মনে করা যেতে পারে। নানা দেশ বা প্রদেশ হতে লোক হাওড়ায় আসে, বিশেষতঃ শহর এলাকায় থাকে ফলে বিচিত্র আবাঙ্গালী উপাধিও বাঙ্গলায় বা বাঙ্গালীর মধ্যে এসে যাচ্ছে। অব্রাহ্মণ কয়েকটি উপাধি (বিশ্বাস, রক্ষিত, ঘোষ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি) বৌদ্ধ লেখমালায় বা নামে বিশেষ ভাবে দেখা যায়। সাঁতরা কথাটি কারও মতে সামন্তরাজ হতে এসেছে। দলুই-এর সঙ্গে হয়ত দলপতি যোগ আছে। ঘড়ুই, হাড়ি প্রভৃতির সঙ্গে ঘড়া (কলসী) হাড় প্রভৃতির সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়।

রামপ্রসাদ মজুমদার

বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্॥ আজহারউদ্দীন খান্। প্রকাশক: জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-৯। মূল্যঃ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বাঙ্গালী মাত্রেরই দুর্ভাগ্য যে জীবিত থেকেও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আজ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী এবং স্মৃতিভ্রষ্ট। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যাঁর লেখাপড়ার চর্চায় কেটেছে, অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তিনি আজ নাম স্বাক্ষর করতেও অক্ষম। কবি কাজী নজরুলের মত পণ্ডিত প্রবর্ শহীদুল্লাহ্ও আমাদের কাছে থেকেও আজ অনেক দূরে। তবে এটুকু সান্ত্বনা যে, নজরুল যেমন জীবন-মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সরস্বতীর বরমাল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, শহীদুল্লাহে্র ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটেনি। প্রায় আটদশক একটানা জ্ঞানানুশীলনের পর জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে শহীদুল্লাহে্র সারস্বত-সাধনায় ছেদ পড়েছে। আজ তাঁর বয়স চুরাশী। অনেক পেয়েছি আমরা শহীদুল্লাহে্র কাছ থেকে, তবুও যেন আরও কিছু পেতাম—এই বেদনাও আজ কম নয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পিরামিড রচনায় যেসব অক্লান্ত একনিষ্ঠ সাহিত্যকর্মী নিঃশেষে নিজেদের সমর্পণ করেছেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নিঃসন্দেহে সেই প্রথম সারির অন্যতম বিশিষ্ট কৃতীকর্মী। মুখ্যত: ভাষাতাত্ত্বিক ও শব্দতাত্ত্বিক পণ্ডিতরূপেই শহীদুল্লাহে্র জগৎজোড়া খ্যাতি। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অন্যান্য বহু ভারতীয়ভাষা তো তাঁর নখদর্পণে; উপরন্তু ইংরেজীর অতিরিক্ত ফরাসী ভাষাতেও তাঁর দখল কম নেই। ফরাসী ভাষায় লেখা গবেষণাগ্রন্থের জন্য শহীদুল্লাহ্ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' উপাধি পান। ভাষাচার্য শহীদুল্লাহ্ কুড়িটিরও বেশী ভাষা জানেন। ভাষাবিদ্ আচার্য হরিনাথ দে-র অন্যতম যোগ্য উত্তরাধিকারীর মর্যাদায় তাঁকে নির্দ্বিধায় আমরা ভূষিত করতে পারি।

বঙ্গদেশ বিভাগ হলেও এই অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি অখণ্ড বঙ্গেরই সন্তান। বাংলাভাষা ও বাঙালীর কোন বিভাগ সম্ভব নয়—এই অভিমতই শহীদুল্লাহ্ আজীবন পোষণ করেছেন। বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর আরও যেন ঘনীভূত হয়েছে শহীদুল্লাহে্র রচনায়। শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আশার আবেগে বাংলাভাষা যে পাকিস্তানে সরকারী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে, তার নেপথ্যে শহীদুল্লাহ্র অবদানও কম নয়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহে্র জন্ম এক বিখ্যাত পীরের বংশে। বিশুদ্ধ ইসলাম ধর্মের আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েও ধর্মীয় সংকীর্ণতা তাঁর মনকে কখনও আচ্ছন্ন করেনি। তাঁর মধ্যে ইসলামীয় ধর্মবোধ আছে, কিন্তু ধর্মগত ছুৎমার্গী সংস্কার নেই; নিয়মনিষ্ঠ আচার-আচরণের প্রতি অবিচল আছে, কিন্তু ধর্মান্ধতার শূন্যগর্ভ মোহ নেই। খাঁটি মুসলমান হয়েও তিনি ছিলেন উদার মানবতাবাদের বিশ্বাসী। শহীদুল্লাহে্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে এই মানবতাবাদের সুরই ধ্বনিত

হয়েছে। বিশেষ এক ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও তিনি তাঁর সকল রচনায় দলগত সংকীর্ণতার অনেক উর্দ্ধে অবস্থান করে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন। বর্ণ ধর্মনির্বিশেষে বাঙ্গালী ছাত্র মাত্রেই ছিল তাঁর কাছে প্রিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে এবং ব্যক্তিগত উদার নিরভিমান জীবনের অমায়িকতায় হিন্দু-মুসলমান সব ছাত্রেরই তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুগভীর আশা পোষণ করেছেন শহীদুল্লাহ্ এবং সেই আশার ভিত্তিতেই তিনি সকল বাঙ্গালী ছাত্রকেই বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর সর্ববিধ রচনাই বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির প্রশস্তিতে ভরা।

আজীবন সাহিত্যব্রতী শহীদুল্লাহ্ মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী। বাংলার আকাশ বাতাসের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল সুনিবিড়। বাংলার মাঠে ঘাটে যে সাহিত্য অবহেলায় অনাদৃত হয়ে আছে, সেইসব লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের সীমা পরিসীমা ছিল না। আজকের দিনে বাংলার লোকসাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালী ছাত্র বা পাঠকসমাজের যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে তার আদি কৃতিত্ব যে শহীদুল্লাহে্র সেকথা অকুণ্ঠচিত্তে এখন স্বীকার করতে বাধা নেই। বাংলার লোকসংস্কৃতি যেসব লোকসাহিত্যে বিধৃত রয়েছে, বাংলার লোকজীবনের ইতিহাস যেসব ধ্বংসস্তূপ ও পুরোনো পুঁথিপত্রের মধ্যে নিবদ্ধ আছে, সেই লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বর থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকিত রাজ্যে টেনে এনে বাংলাসাহিত্যের অগ্রগমনের পথ যাতে প্রশস্ত ও সুগম হয়, সেজন্য তাঁর অতন্দ্র-প্রহরীর মত নিরলস প্রয়াস মাতৃভাষাপ্রিয় বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রশংসার দাবী রাখে। শহীদুল্লাহে্র সর্ববিধ রচনার অন্তরালেই যে মাতৃভাষা প্রেমিক জাতীয়বাদী মানুষের স্পর্শ রয়েছে, সেই স্পর্শে বাংলাসাহিত্য আজ সঞ্জীবিত ও মহিমান্বিত।

রাজনৈতিক কারণে আজ বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত—পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা। শহীদুল্লাহ্ এখন পূর্ববাংলার মানুষ হলেও পশ্চিমবাংলার ওপর তাঁর দরদও কম নেই। পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত জনগণের কাছে তিনি আজও মধ্যমণি ও শ্রদ্ধার প্রাত্র। সেই শ্রদ্ধারই অর্ঘ্য সাজিয়েছেন পশ্চিম-বাংলার লেখক আজহার উদ্দীনখান। তিনি সম্প্রতি বাংলাসাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। উভয় বাংলার মধ্যে শহীদুল্লাহ্ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ-রচনা এই প্রথম। সেই দিক থেকে আজহারউদ্দীন খান দুই বাংলার বিদ্বৎসমাজের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহে্র বিচিত্র কালের পরিচয় প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক আজহারউদ্দীন তাঁর গ্রন্থটি কয়েকটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করেছেন। শহীদুল্লাহ্র-জীবনচরিত, সাহিত্য-সাধক শহীদুল্লাহ্, ভাষাচার্য শহীদুল্লাহ্, অনুবাদক শহীদুল্লাহ্, শহীদুল্লাহ্ ও শিশুসাহিত্য, শহীদুল্লাহ্র গল্প ও কবিতা সম্পাদক শহীদুল্লাহ্ শহীদুল্লাহর শিক্ষাচিন্তা, শহীদুল্লাহ্র 'ধর্মচিন্তা, বাঙ্গালী শহীদুল্লাহ্ এবং পরিশিষ্টে শহীদুল্লাহ্র গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে।

শহীদুল্লাহ্র জীবনচরিত প্রসঙ্গে আজহারউদ্দীন যে সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তার মাধ্যমে শহীদুল্লাহে্র ব্যক্তিজীবনের কোন অন্তরঙ্গ পরিচয় তেমনভাবে পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ পায়নি। কয়েকটি ঘটনার বিবৃতি অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাসাহিত্যের

অধ্যাপকতা' শিরোনামায় 'প্রবাসী' বা 'শনিবারের চিঠি' থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতির কোন প্রয়োজন ছিল না। বরং জীবন-চরিত প্রকাশনায় পারিবারিক কোন ঘটনার উল্লেখ থাকলে এ অংশটি অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ হতে পারতো। গ্রন্থের অন্যান্য উপবিভাগে শহীদুল্লাহে্‌র বিচিত্র সাহিত্যকৃতির আলোচনায় লেখকের কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। বহু তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন এবং সেই সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে শহীদুল্লাহের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ণ প্রমাণ-নির্ভর হয়েছে। শহীদুল্লাহে্‌র সঙ্গে লেখক আজাহারউদ্দীনের মৌখিক পরিচয় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শহীদুল্লাহে্‌র ব্যক্তিত্ব ও মনীষাকে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলাসাহিত্যে শহীদুল্লাহ্‌ সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে আজাহারউদ্দীন যে পথিকৃতের সম্মান পাবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উভয় বাংলার বিদ্বৎসমাজে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

অধীর দে

কুশল সংলাপঃ কবিরুল ইসলাম। পূর্বাশা প্রকাশন, ৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯। সাড়ে-তিন টাকা।

এই দশকে তরুণ কবিদের মধ্যে যাঁরা নানা পত্র-পত্রিকায় আপন স্বাক্ষর রাখছেন তাঁদের মধ্যে কবিরুল ইসলাম একটি পরিচিত নাম। 'কুশল সংলাপ' কবিরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সর্বমোট বিয়াল্লিশটি কবিতার সম্মিলন 'কুশল সংলাপ' গ্রন্থে। নিবিষ্ট পাঠক 'কুশল সংলাপ' পাঠ করে কবির সহজ অনুভবের আত্মাকে অনায়াসেই স্পর্শ করতে পারবেন :

ভোরের জানালা খুলে প্রত্যহ ডেকেছি ;
ভালোবাসা, হে আমার দর্পিত দুপুর,
হে আমার রক্তের গোলাপ !
দিন আসে, দিন যায়। রাত্রির আকাশ
ভ'রে ওঠে নক্ষত্রের কথোপকথনে—
সারারাত্রি কুশল সংলাপ।' (কুশল সংলাপ)

এবং পাশাপাশি কবি যখন আকাঙ্খা করেন, 'তোমার হাতের মধ্যে একদিন উজ্জল যৌবন ফিরে পাবে, তোমার বুকের মধ্যে বিশাল পৃথিবী | কুশল সংবাদ তার এনে দেবে, পরিদৃশ্যমান | যা কিছু তোমার রক্তে বেজে উঠবে মৌল অধিকারে' (কুশল সংবাদ)—তখন কবিতা পাঠকের খুশির কারণ ঘটে।

'কুশল সংলাপের' কবি মূলত রোমান্টিক—এবং বর্তমান কাব্যগ্রন্থের শরীরে তিনি তাঁর ব্যাকুল হৃদয়ের এক সুন্দর পরিচয় রাখবার চেষ্টা করেছেন—যা সময়ের ভাবনায় চিহ্নিত। আধুনিককালের

তথাকথিত ছলনার আশ্রয়কে কবি আদর্শ হিসেবে আঁকড়ে ধরেননি। ক্ষেত্র বিশেষে ঋজু ভাব প্রকাশের পরবর্তী পর্যায়ে কখনো কখনো অপেক্ষাকৃত দুর্বল পংক্তি পাঠকের নজরে পড়লেও কবি তাঁর মনের আকুলতা প্রকাশে সতত সৎ বলেই বোধ হবে।

'কুশল-সংলাপে'র কবির ভাবনা ভালোবাসাসর্বস্ব। কবি প্রেমিক, 'অন্ধকারে আলোর উৎসব' ঘেরা তাঁর জগৎ। কবির নিমন্ত্রণ তাই সাদর।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো এসো, দ্বিধা কেন ?
ভেতরে প্রবেশ কর আলোর আশ্রয়ে
খুব পরিচিত কারো কণ্ঠস্বরে অভ্যর্থনা সাজানো তোমায়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের স্বদেশে।'

পরবর্তী মুহূর্তে কবি আবার আশ্চর্য প্রত্যয়ে বিশ্বাস করেন : একঘর আলো জ্বেলে কেউ এসে ঢুকবে এখুনি | আমরা প্রস্তুত আছি : চতুর্দিকে আলোর পাহারা | অন্ধকার পলাতক ফেরারী আসামী | পরন্তু দু'হাত ব্যস্ত এবং দু'চোখে | পরিচিত প্রত্যয়ের কুশল-সংলাপ। (নিমন্ত্রণ)

'কুশল সংলাপ' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সর্বত্র কবির ব্যাকুল হৃদয়ের এক শান্ত বিস্তার প্রবাহিত। বিশেষত, 'নিজেরই মুখ, 'সুপ্রিয় তোমাকে, গন্তব্যে পৌছানো, 'বন্ধু', 'সহোদর,' 'স্বগত', 'মায়ের প্রসন্ন মুখ', নিমন্ত্রণ, রক্তের নিয়মে, 'আমি কবিতার মধ্যে' ইত্যাদি কবিতাবলী এক অনাস্বাদিত লাবণ্যে সঞ্চারিত। সমসাময়িক আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠক কবি কবিরুল ইসলামের কাছে নিশ্চয় প্রত্যাশা রাখবেন।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 May '69 (0'50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অবাঞ্ছিত সন্তান জন্মের ঝুঁকি না নিয়ে . . .
বিবাহিত জীবনের সমস্ত সুখ উপভোগ করুন।
আজকাল সব পুরুষই, জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে নিরাপদ ও সন্তোষ-জনক উপায়টি কিনে নিতে পারেন, তা হলোঃ নিরোধ
পুরুষের জন্যে উৎকৃষ্ট ধরণের জন্মনিরোধক।
নিরোধ
পরিবার পরিকল্পনার জন্য
৩টির মূল্য ১৫ পয়সা
সরকারী সাহায্যে হ্রাস মূল্যে

শুধুই
কেশ তৈল নয়
একটি
কেশ রসায়ন

অতুলনীয় গুণাবলীর
জন্য যুগ যুগ ধরে
সুবিদিত

আমলকীই ইহার
প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্বতা রোধ ক'রে ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-৫

SA-2/69

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরাজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

সপ্তদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

তেরশ' ছিয়াত্তর
জ্যৈষ্ঠ

সপ্তদশ বর্ষ
২য় সংখ্যা

হুইটম্যান ও ভারতীয় সাহিত্য

শিশিরকুমার দাশ

এক প্রচণ্ড শক্তির উদ্দামতা, বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে আমিত্বের প্রতিষ্ঠা আর গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল বিশ্বাস—এই তিনটি লক্ষণ নিয়ে 'লীভস্ অফ্ গ্রাস' ১৮৫৫ সালে যখন আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তখন এমারসন যদিও লক্ষ্য করেছিলেন এর কবিতাগুলির তলায় মার্কিনী জীবনের স্রোত এবং নিশ্চিত প্রাণশক্তি, সাহস বিস্তৃত বক্ষপট এবং মুক্তচিন্তা; হেনরী ডেভিড থোরো অভিনন্দন জানিয়েছিলেন; বোস্টনের থেকে প্রকাশিত ক্রিশটিয়ান একজামিনার লিখেছিলেন এই গ্রন্থের ভাষা অভদ্র এবং উদ্ধত, ইংরেজি ভাষায় অনাচার; এবং বোশট্‌ন ইনটেলিজেন্স আরো তীব্র কণ্ঠে বলেছিলেন, অশালীনতা, ভাববাষ্প, উদ্ভটচিন্তার এক বিচিত্র পঙ্ককুণ্ড। ১৮৬০-এ এই কাব্যের তৃতীয় সংস্করণ বেরোবার একবছর আগেই দান্তে গ্যাব্রিএল ও ক্রিস্টিনার ভাই উইলিয়াম মাইকেল রোশেটি এই কবিতার মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন ছন্দের বিশিষ্টতা, স্পন্দনের বৈদ্যুতী শক্তি; "একান্তভাবে আধুনিক কবিতা"। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ হবার আগে ১৮৬৮ সালে সুইনবার্ন 'লীভস অফ গ্রাসের' কবির সঙ্গে ব্লেকের ঐক্য অনুভব করেছিলেন, তাঁদের আধ্যাত্মিকতায়, জীবনের সমস্ত কিছুকে গ্রহণকরার ক্ষমতায়; গভীর বিস্তৃত সংগীতময়ী ভাষায়। যদিও চার বছরের মধ্যে তাঁরও চিন্তায় পরিবর্তন এল, তাঁর যা ছিল আধ্যাত্মিক, তা হল সভ্যতা-বিরোধী, যে কবি সম্বন্ধে ছিলেন উচ্ছ্বসিত, তার সম্বন্ধে তার কণ্ঠ হল ব্যঙ্গময়, এবং শেষপর্যন্ত তাকে "নিকৃষ্ট ধরনের Southey" নামে অভিহিত করলেন।

হুইটম্যান-এর কবিপ্রতিভা নিয়ে ইউরোপ আমেরিকায় যখন স্তুতি নিন্দা, বিস্ময়-অবহেলা, বিচার-বিবেচনার ঢেউ উঠেছিল তখনও তাঁর কাব্য ভারতবর্ষে কোন সাড়া তোলেনি। তার একটা

কারণ হয়ত যখন তাঁর কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হল তখন ইংরেজি সাহিত্যের জগৎ আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। ভারতীয় ইংরেজি শিক্ষিত তরুণেরা তখন শেক্সপীয়ারের বিচিত্র জগতে পরিভ্রমণ করছেন, মিল্টনের উদাত্তস্বর কখন কারো প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। রোম্যান্টিক কবিদের স্বপ্ন আর আশা, বিদ্রোহ আর মুক্তির বাণী তখন ভারতীয় কবিদের কানে প্রবেশ করেছে। তখনও হুইটম্যানের নাম ভারতবর্ষে এসে পৌছয়নি। ব্রুকলিন ইগ্‌ল-এর সম্পাদক হুইটম্যান, ১৮৪৬ পর্যন্ত কাঁচা ছোটগল্প আর জন্মমৃত্যুর রহস্য নিয়ে অপরিণত ছন্দবদ্ধ বাক্য গেঁথেছেন। আরো দু বছর সাংবাদিকতা, সমালোচনার বাঁধাধরা পথে তাঁর জীবন কাটল। এই সময়েই এক নতুন ধরনের কবিতার শুরু হয়েছে তাঁর হাতে। হয়ত সাহিত্যে একেবারে নতুন নয়, বিশেষত হাইনে তাঁর নর্থসী সাইক্লস-এ তার ব্যবহার করেছিলেন—কিন্তু হুইটম্যানের পক্ষে নতুন। ছন্দের বাঁধাধরা নিয়মভাঙা এক মুক্তির জগৎ, অনিয়মিত যতিপাতের মধ্যে দিয়ে সংগীত সৃষ্টির এক অভিনব চেষ্টা, মিলহীনতার শূন্যতাকে ভরাবার দুঃসাহসিকতা নিয়ে ছত্রিশ বছরের যুবক আত্মঘোষণা করলেন। তখনও ভারতীয় সাহিত্যের নবযুগের সূত্রপাত হতে দেরী। তখনও মাইকেলের মেঘনাদ কাব্য প্রকাশ হয়নি। হুইটম্যানের কাব্যে শেষ সংস্করণ, মৃত্যু-শয্যা সংস্করণ নামে যা পরিচিত, হল ১৮৯২ সালে যখন ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রত্যেকটি স্তরের সঙ্গে ভারতীয় কবি সাহিত্যিকেরা অল্পবিস্তর পরিচিত হয়েছেন, বঙ্কিম তাঁর সাহিত্যজীবন শেষ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন সোনারতরী, চিত্রা। তখনও হুইটম্যান সম্বন্ধে ভারতীয় কবি শিল্পীদের নীরবতা বিস্ময়কর।

অথচ আমেরিকান সাহিত্যের সঙ্গে, চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে ভারতবর্ষের। ১৮৩০ সাল নাগাদ টমাসপেনের "এজ অফ রিজন" তরুণ বাঙালীরা আগ্রহের সঙ্গে পড়েছে, বাংলায় তার কিছুটা অনুবাদও হয়েছে ; বয়স্কেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েছেন এমারসন বা থোরো ; কবিরা পরিচিত হয়েছেন লংফেলো কিংবা এডগার এ্যালান-পো-র সঙ্গে, হেমচন্দ্র করেছেন "শাম অফ লাইফ"এর অনুবাদ, যা কিছুকাল আগে পর্যন্ত সমস্ত বাঙালী স্কুলে পড়েছে ; পো-র ছোটগল্পের অশরীরী শিহরণ, স্বপ্নাচ্ছন্ন মোহিনীমায়া বাঙালী লেখকের বিস্ময় কুড়িয়েছে , আশুতোষ চৌধুরী ১৮৮৬ সালে ভারতী পত্রিকায় পো-র কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করছেন অথচ হুইটম্যান, যাঁর মধ্যে অনেক মার্কিনী এবং ভারতীয় চিন্তাশীল লক্ষ্য করেছেন বেদান্ত, গীতা, তন্ত্র-তত্ত্ব, রইলেন দীর্ঘকাল অপঠিত।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ভারতীয় যিনি হুইটম্যান সম্বন্ধে প্রথম লিখলেন। তাঁর আলাপ (১৯১০) গ্রন্থটিতে ওয়াল্ট হুইটম্যান নামে একটি প্রবন্ধ আছে। সেটি লেখা হয়েছিল ১২৯৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে, অর্থাৎ হুইটম্যানের মৃত্যুর কিছু আগে, যদিও ছাপা হয়েছে মৃত্যুর বারো বছর পরে। "কি সুন্দরভাবে, কি দেব-স্পৃহনীয় স্বরে তিনি সকলকে আহ্বান করিতেছেন, শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে"। তারপর Salut au monde (পৃথিবীকে অভিবাদন) কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধার করেছেন—

তোমরা সে যে দেশের সন্তান হও না কেন
তোমরা যারা ইংলণ্ডের সন্তান বা সন্ততি
তোমরা যারা মহান স্লাভিক বংশের, স্লাভিক সাম্রাজ্যের, তোমরা যারা রাশিয়ায়

তোমরা যারা কৃষ্ণবর্ণ, দেবতাত্মা আফ্রিকার সন্তান, প্রশস্ত, সুন্দর-শির
　　সুগঠিত, মহান ভাগ্যের জন্য নিয়ন্ত্রিত, আমার সঙ্গে সবাই সমান
তোমরা যারা নরওয়ের, যারা সুইডেনের, যারা ডেনমার্কের, যারা
　　আইসল্যাণ্ডের যারা প্রাশিয়ার
…তোমরা যারা এশিয়ার, আফ্রিকার, অস্ট্রেলিয়ার, সবস্থান নির্বিশেষে
তোমরা যারা সমুদ্রের অসংখ্য দ্বীপের, অসংখ্য উপদ্বীপের
তোমরা যারা শতাব্দীর পরেও আমার কণ্ঠস্বর শুনবে
তোমরা যাদের নাম আমি করিনি, তাদের সকলকে, প্রত্যেককে
তোমাদের শুভ হোক! তোমার জন্য শুভেচ্ছা পাঠাই আমি আর আমেরিকা!
আমরা প্রত্যেকে অনিবার্য
আমরা প্রত্যেকে সীমাহীন—আমরা প্রত্যেকেই! প্রত্যেকেরই শক্তি সীমাহীন;
আমরা প্রত্যেকেই চিরন্তন বাণী
আমরা প্রত্যেকেই স্বর্গীয়।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ হুইটম্যানের সুরের এই বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে তার তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন "ইংলণ্ডের কবিতা স্থিতিশীল হইয়া গতিশীল। মার্কিন কবিতা গতিশীল হইয়া স্থিতিশীল। ইংলণ্ডের কবি পুরাতন হইতে নূতন হইতে চাহেন; মার্কিন কবি নূতন হইতে পুরাতন হইতে চাহেন। ইংলণ্ডের কবি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার নূতন পত্তন করিতে সপ্রয়াস; মার্কিন কবি চতুর্দিকেই স্বাধীনতার তীব্রস্রোত প্রবাহিত দেখিয়া পাছে সেই স্রোতে কেহ বিপথে গিয়া পড়ে, এই ভয়ে সেই স্বাধীনতাকে সুনিয়ম, প্রেম, শান্তি প্রভৃতি সুদৃঢ় বন্ধনে সীমাবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। ইংলণ্ডের কবিতা ভাঙনের দিকে, এই জন্য তাহা সময়ে সময়ে সাধারণ হইতে ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে, মার্কিন কবিতা গড়নের দিকে এইজন্য তাহা ব্যক্তিকে ছাড়িয়া প্রায়ই সাধারণে গিয়া পড়ে।" (আলাপ, পৃ ৫০-৫১) ক্ষিতীন্দ্রনাথের বক্তব্যে ত্রুটি আছে। প্রধান ত্রুটি অতি সরলীকরণের; দ্বিতীয় ত্রুটি তাঁর সমালোচনার মানদণ্ডের অস্পষ্টতা। তবু তাঁর বক্তব্য মূল্যবান: সম্ভবত ইংলণ্ডের কবিতা ও আমেরিকার কবিতার পার্থক্য সন্ধানের এই প্রথম ভারতীয় প্রচেষ্টা।

সমকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে লংফেলো ও পো-র কাব্যের পরিচয়ের সূত্রেই তিনি ঐ দুটি কবির সঙ্গে হুইটম্যানের যোগ সন্ধান করেছেন। বলেছেন লংফেলো জয় পরাজয় সমন্বিত জীবনকে সত্য পদার্থ বলে গ্রহণ করেছেন; আর পো সমস্ত মানসিক প্রবৃত্তির প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। হুইটম্যান এক পদক্ষেপ অগ্রসর হয়ে বললেন—

　　যে জীবন অপার—কামনায়, কম্পনে, প্রাণের শক্তিতে
　　ঐশ্বরীয় নীতি মেনে স্বাধীন কর্মের আনন্দচঞ্চল
　　সেই আধুনিক মানুষের, সংগীত রচনা করি

ক্ষিতীন্দ্রনাথ অবশ্য পো-র সঙ্গে হুইটম্যানের আকাশ-পাতাল বৈসাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেননি। যদিও দুই কবির ভাগ্যের মিল আছে, কর্মে এবং চিন্তায়; কবিতার রচনায় এবং

ভাবনায় তাদের পার্থক্য দুস্তর। হুইটম্যান যদিও পো-র প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, বলেছিলেন, "পো-র কবিতায় আছে নৈরাশ্য সৌন্দর্য এবং আঙ্গিকের গভীর নৈপুণ্য, মিলের কলায় ঘটেছে আধিক্য, নৈশ কাহিনীর প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ, প্রতিটি পাতায় এক অশরীরী সংকেত...তীব্র, উজ্জ্বল, তবু নিরুত্তাপ...আমি চাই কবিতার জন্য দীপ্ত আলো, মুক্ত হাওয়ার সঞ্চরণ, চাই সুস্থ দেহের শক্তি ও উদ্দীপনা, প্রলাপের নয়, আর কবিতার পটভূমিতে চাই চিরন্তন নীতি-কে।" নীতি-লঙ্ঘনের জন্য পো-কে যদি হুইটম্যান দায়ী করেন; সমালোচকেরা একই অপরাধে অভিযুক্ত করেছিলেন হুইটম্যানকে।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সমগ্র মানবের প্রত্যেক কর্ম, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক বৃত্তি, এই সমুদয়ই সাধারণতন্ত্রের এই দুর্জয় প্রেমিক কবির কবিতার উৎস। প্রকৃতই তাঁহার কবিতার এই মহান সার্বভৌমিকত্বই অন্যান্য কবিদিগের কবিতা হইতে বিভিন্নতার এক প্রধান নিদান।" এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন 'সং অফ অকুপেশনের' কথা। আর লক্ষ্য করেছেন হুইটম্যানের কবিতায় "আমি"—এই আমিত্ব জ্ঞান এবং কবিতায় তাহার ব্যাপ্তি, হুইটম্যানের বিশেষত্ব।"

হুইটম্যানের কবিতায় আমি পরবর্তীকালে নানা তত্ত্বের বিচার বিতর্কের ক্ষেত্র। সর্বপ্রথম এমারসন হুইটম্যানের কাব্য সম্বন্ধে বলেছিলেন "ভগবদ্ গীতা আর নিউইয়র্ক হেরাল্ডের সংমিশ্রণ", স্বামী বিবেকানন্দও একদা বলেছিলেন হুইটম্যান "আমেরিকার সন্ন্যাসী", শ্রীঅরবিন্দ হুইটম্যানের কাব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন হুইটম্যানের ব্যাপ্তি যে অহংবোধ বা ব্যক্তিত্ববোধ তাকেই প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা বলেছিলেন মহান আত্মা। কিন্তু হুইটম্যানের কাব্য বুঝতে তাতে আমাদের কতকটা সাহায্য হবে জানিনা। হুইটম্যান ভারতীয় সাহিত্য বা ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতেন না। তাঁর একটি লেখায় "প্রাচীন হিন্দুদের কাব্য", আর একটি লেখায় "হিন্দু মহাকাব্য" এর উল্লেখ আছে; "প্যাশেজ টু ইণ্ডিয়া" কবিতার মধ্যেও "এশিয়ার পুরা কাহিনী"র কথা আছে—কিন্তু তাঁর সত্যিকারের কোন পরিচয় ছিল না ভারতীয় কাব্য বা দর্শনের সঙ্গে। থরো একবার তাঁর কবিতার মধ্যে প্রাচ্যধর্ম লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি প্রাচ্য কাব্য বা ধর্মের সঙ্গে পরিচিত কিনা। হুইটম্যান উত্তর দিয়েছিলেন, আমাকে বরং সেই সম্বন্ধে বলুন। গে উইলসন অ্যালেন-এর লেখা হুইটম্যানের জীবনী, দি সাইলেণ্ট সিঙার (১৯৫৫)—এও হুইটম্যানের প্রাচ্যদর্শন বা কাব্যের সঙ্গে যোগের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

অথচ কোন সন্দেহ নেই যে উপনিষদের বহু উক্তির সঙ্গে, বহু ভাবনার সঙ্গে হুইটম্যানের কবিতার বহু ক্ষেত্রে আশ্চর্য মিল। তাদের অনৈক্য তো আছেই কিন্তু এমন গভীর ঐক্য এল কোথা থেকে? ডরোথী মেরসের ভগবদ্গীতার সঙ্গে হুইটম্যানের ঐক্য সন্ধান করেছেন: গীতার আত্মার অমরত্ব-এর সঙ্গে হুইটম্যান "সং অফ মাই সেল্‌ফ" এর 'অহং'-এর বিচিত্ররূপী, বহুরূপী, মৃত্যুহীন রূপের মিল স্বভাবতই মনে পড়ে। উপনিষদ্ বা গীতার সঙ্গে আকস্মিক মিলনকে বড় বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন অনেকে। ভি, কে, চারি হুইটম্যানের কাব্য ব্যাখ্যা করেছেন বেদান্তের আবহাওয়ার মধ্যে। ভারতীয় তত্ত্বপ্রিয় সমালোচক আরো এক পদ এগিয়ে গেছেন। ও. কে. নাম্বিয়ার তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে হুইটম্যানের কাব্য যোগশাস্ত্রের পটভূমিকাতে বিচার করতে চান না। তিনি

বলেছেন Song of myself-এর পঞ্চম অংশটি, যে অংশে এই মিলন দৃশ্যের বর্ণনা, যে অংশের জন্য অশ্লীলতার অভিযোগও উঠেছিল, তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনীর ধারণা না থাকলে বোঝাই যাবে না। যেন হুইটম্যান কুলকুণ্ডলিনীর তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন! কবি সাধক নন। কবির জীবনে এক একটি অনুভূতি চৈতন্যের গভীর থেকে জেগে ওঠে, সেই অনুভূতি আশ্চর্য, অনিবার্য এবং বিশিষ্টভাবে একক। প্রভাব অনুসন্ধানের নেশায় আচ্ছন্ন মনে সেই সহজ সত্যটি ধরা পড়ে না। মানুষের ইতিহাসে চিন্তার ঐক্য দেশে দেশে কালে কালে বিস্ময়কর ভাবে দেখা দিয়েছে। কী ধর্মে, কী সাহিত্যে, কী লোকশ্রুতিতে। হুইটম্যানের অনুভূতি একান্তভাবে ব্যক্তিগত। এক শান্ত, অদ্বৈতের অনুভবের ব্যাপ্তি তাঁর কাব্যের একটি সুর যেমন জাগছে, তেমনিই এক প্রচণ্ড উদ্দামতা, এক আদিম প্রাণোচ্ছ্বাস, নির্বিচার গ্রহণের উল্লাসের মধ্যে আর একটি সুর জাগছে। নানা সুরে এসে মেশে নানা ভাবের বর্ণালী। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবিতা, When I heard the learn'd Astronomer, রবীন্দ্রনাথ Personality-র বক্তৃতা মালায় যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে চিত্রার পূর্ণিমা কবিতার কী আশ্চর্য মিল। তবু রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন পূর্ণিমার পেছনে রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত-ব্যক্তিগত অনুভূতি, যা হঠাৎ, যা মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যা স্বতন্ত্র। জ্যোতির্বিদের নানা গাণিতিক গণনা, নানা বিচার, নানা ব্যাখ্যার পর নক্ষত্রভরা আকাশের মৌনতা এসে কবির মনকে ভরে তুলল শুধু অগাধ শান্তিতে নয়, বিরাট প্রজ্ঞায়। হুইটম্যানের কবিতায় যে প্রকার স্পর্শ তা বেদান্ত, গীতা, তন্ত্র থেকে নয়, যা হঠাৎ জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের তরঙ্গ চাঞ্চল্যের ওপর ছিটকে ওঠা এক মুক্তোর দীপ্তি, যা বইয়ের পাতায় নেই, যা জীবনের মধ্যে আছে লুকিয়ে।

হুইটম্যানের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের যে পরিচয় সে এই ব্যক্তিগত, ঐশ্বরিক অনুভূতির প্রতি আকর্ষণে নয়, হুইটম্যানের অজয় অমর অহং-এর কালাতীত বিচারের প্রতি আকর্ষণও নয়—নিতান্তই, সাধারণ জীবনও মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁর একাত্মতার জন্য। হুইটম্যান ভারতীয় সাহিত্যিকেরা পড়তে শুরু করেছেন এই শতাব্দীতে—মানুষের জীবনের সমগ্র রূপ উদ্ভাবনে যখন সাহিত্যিকেরা প্রয়াসী, যখন মানুষের বিচিত্র কর্মজালের মধ্য থেকে তাকে চিনে নিতে উৎসাহী, যখন তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় ভেদাভেদের মধ্য থেকে তার চিরমুক্ত সত্তার বন্দনার গান গাইতে শুরু করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের হুইটম্যানের অনুবাদ, কাজী নজরুল ইসলামের উজ্জ্বল বিদ্রোহের সুর, ওড়িয়া সাহিত্যে সবুজদলের প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শুরু, অসমীয়া সাহিত্যে 'সাধারণ' মানুষের ঐশ্বর্য আবিষ্কার, তামিল কবির ভারতীয় গণতন্ত্র ও সাম্যের প্রতি আকর্ষণ—সবই সাধারণ ঐক্য সূত্রে বাঁধা। ভারতী এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই, 'নকরম্' নামক প্রবন্ধে হুইটম্যানের সঙ্গে তামিল পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেন। এই প্রবন্ধে তিনি হুইটম্যানের আধ্যাত্মিকতার কথা উল্লেখমাত্র করেননি, উল্লেখ করেছেন Song of the Broad Axe-এর পঞ্চম অংশের, যেখানে হুইটম্যান স্বপ্ন দেখছেন ভবিষ্যতের এক মহানগরীর যেখানে বীরদের জন্য নেই স্মৃতি সৌধ, কথায় আর কাজে তাদের জন্য হয় শ্রদ্ধা নিবেদন; যেখানে নরনারী আইনের ভয়ে জর্জরিত নয়, যেখানে নেই ক্রীতদাস, নেই ক্রীতদাসের প্রভু; যেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনিঃশেষিত ঔদ্ধত্যের

বিরুদ্ধে জেগে উঠে দাঁড়ায় সমস্ত অধিবাসী। এই বিদ্রোহ, নরনারীর সাম্য, এককথায় সাধারণতন্ত্রের গণতন্ত্রের জয়গান—এই গানেই আকর্ষণ বোধ করেছিল নবীন ভারতীয় কবি। নজরুলের 'আমি সাম্যের গান গাই'র সঙ্গে সহজে ধরা পড়বে হুইটম্যানের Song of myself-এর ২১ নং কবিতার ঐক্য; কিংবা 'বিদ্রোহী'র সঙ্গে Song of myself-এর বহু জায়গায় মিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বরের সঙ্গেও ধরা পড়বে সেই ঐক্য। নবীন ভারতীয় কবি হুইটম্যানের মধ্যে দেখেছে তারুণ্যের আশা। বিদ্রোহের শক্তি এক অনাগত পৃথিবীর সৃষ্টির স্বপ্ন। রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল নায়কের মুখে তাই শুনি For we are bound where mariner has not yet dared to go, And we will risk the ship, ourselves and all; খাজা আহমদ আব্বাসের "ইনকিলাব" উপন্যাসের আরো সাধারণ নায়ক "আনোয়ার পরিচিত হল সেই স্নিগ্ধ প্রজ্ঞাবান দীর্ঘশ্মশ্রুসমন্বিত বৃদ্ধের সঙ্গে, মাথায় তাঁর বাঁকানো টুপি, হাতে একটি লাঠি, পূজারী যেমন দরদ দিয়ে ভগবানের জয়গান গায়, তেমনই দরদে তিনি গেয়ে চলেছেন মানুষের গান।"

হুইটম্যানের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও একেবারে নীরব নন। প্রকৃতপক্ষে কখনও কখনও হুইটম্যানের সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্যই ধরা পড়েছে Personality গ্রন্থে। হুইটম্যানের "ব্যক্তিত্ববোধ" ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Amos Bronson Alcott বলেছিলেন যে তাহল একটি বিশ্বাস "The ultimate reality of the world is a Divine person who sustains the Universe by a continuous act of creative will. রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও এর থেকে খুব পৃথক নয়। রবীন্দ্রনাথ Calmiss থেকে উদ্ধার করেছেন "I hear it was charged against me", Inscription থেকে "Begining my studies" আর By the Road side থেকে when I heard the learn'd Astronomer. শেষ কবিতাটির সঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন "The prosody of the stars can be explained in the classroom by diograms but the poetry of the stars is in the silent meeting of soul with soul, at the confluence of the light and the dark, where the infinite prints its kiss on the forhead of the finite, where we can hear the music of of the Great I AM pealing from the grand organ of creation thorough its countless reads in endless harmony." এই আধ্যাত্মিকতা কোন কোন কবির জীবনরহস্য সম্বন্ধে একটি বিশেষ অনুভূতিমাত্র। রবীন্দ্রনাথ হুইটম্যানের মধ্যে তার বেশী কিছু সন্ধান করেননি। রবীন্দ্রনাথের সমকালেই পুরনসিং হুইটম্যানকে বিচার করেছিলেন আধ্যাত্মিকতার আলোয়। পাঞ্জাবী সমালোচকদের লেখা থেকে জেনেছি যে পুরণসিং কাব্যের সঙ্গে হুইটম্যানের যোগ অতি গভীর, সেই সূত্রে পাঞ্জাবী কবিতায়। পুরণসিং হুইটম্যান সম্বন্ধে আলাদাভাবে লিখেছেন, সে সব লেখা এখনও ছাপার আলোর মুখ দেখেনি। কিন্তু তাঁর The Spirit of the Oriental Poetry-র মধ্যে তিনি হুইটম্যান সম্বন্ধে খুবই উচ্ছসিত। কিন্তু তাঁর বক্তব্য একান্তই ব্যক্তিগত মত মাত্র—অর্থাৎ সেই মন্তব্য থেকে ভারতীয় কবিদের মনে হুইটম্যানের স্থান কী তা জানতে পারা যাবে না। পুরণসিং এর কাছে কবিতা আর ধর্ম জিজ্ঞাসা বা ধর্মানুভূতি একই বস্তু। তাঁর মতে ভারতীয় সাহিত্যের যে আধুনিক পর্ব, বিশেষ করে বাংলাসাহিত্যের আধুনিক যুগ—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দী

থেকে যে সাহিত্যের শুরু—তা মূলত পশ্চিমী সাহিত্যের অনুকরণ—তার মধ্যে ভারতীয় সাহিত্যের প্রাণ নেই। আর কবিতা কি? তাহল আধ্যাত্মিক অনুভূতি। কবি কে? কবি তিনি, যিনি কবিতায় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। বাংলা দেশে, তাঁর মতে, শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁর মতে শেক্সপীয়ারের কাব্যের জগৎ ভারতীয় পাঠকের পথে অস্বচ্ছন্দকর, অস্বস্তিকর। কারণ তিনি জীবনের সত্যকে দর্শন করেননি। ট্র্যাজিডি খণ্ডিত সত্য মাত্র। এই পুরণসিং হুইটম্যানের মধ্যে পেয়েছেন ভারতীয় কাব্যের প্রাণবস্তু। হুইটম্যান পেয়েছিলেন, তাঁর মতে, 'glimpses of Cosmic conciousnes, and in him alone ; the human mind, so prone to inhdulge in analysis and explanation, even in poetry, is plunged again and again into the unknown wholeness of divine feeling." ভারতীয় আধুনিক কবিতার সঙ্গে এই "দেবী অনুভূতির অখণ্ডতার অজানা স্বাদ যেঅনেক দূর তা আমরা সবাই জানি।

১৯৩১এ সিটি কলেজে অনুষ্ঠিত হুইটম্যান স্মৃতিসভায় পাঠানো রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি মূল্যবান। তিনি হুইটম্যান সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "তোমাদের হুইটম্যানের কাব্যালোচনার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক, এই ইচ্ছা করি। প্রকাণ্ড একটা খনি, ওর মধ্যে নানান কিছুর নির্বিচারে মিশাল আছে। এ রকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন—আদিমকালের বসুন্ধরায় সেটা ছিল—তার কারণ তখন তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড—এই আগুনে নানা মূল্যের জিনিষ গলে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন যা—তা কাণ্ড করে বসেছে। জাগতিক সৃষ্টিতে যে রকম নির্বাচন নেই, সংঘটন আছে. এ সেই রকম ছন্দোবদ্ধ সব লণ্ডভণ্ড—মাঝে মাঝে এক একটা সুসংলগ্ন রূপ ফুটে ওঠে আবার যায় মিলিয়ে। যেখানে কোনো যাচাই নেই, সেখানে আবর্জনাও নেই, সেখানে সকলের সব স্থানই স্বস্থান। এক দৌড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে এই জন্যে সাহিত্যে এই জুড়ি নেই—মুখরতা অপরিমেয়,—তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ করছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ করতে হ'লে মরিয়া হওয়ার প্রয়োজন।" হুইটম্যান সম্বন্ধে সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। তাঁর কাব্যে নির্বিচারে ভাল-মন্দ বসেছে পাশাপাশি, পরিমার্জনার স্থান নেই কোথাও—অকারণ অতিপল্লবিত বাক্‌বিস্তারের পাশেই আছে সহজ সংক্ষিপ্ত অনিবার্য ব্যঞ্জনাময় ছোট বাক্য; ভাবের প্রগলভতার পাশেই আছে মিত, গভীর অনুভূতির তীব্রতা। প্রচলিত ছন্দকে ভেঙে উড়িয়ে দেবার সাহস ও নবীন ছন্দ স্পন্দনের সৃষ্টির শক্তির সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে ব্যর্থতা। সব মিলিয়ে হুইটম্যান।

আধুনিক ভারতীয় কবিতা, ইংলণ্ডের রোম্যান্টিক কবি, তার পরে ভিক্টোরীয় যুগের কবিদের স্রোত বেয়ে সোজা এসে পড়ল ইয়েটস্‌, তারপর এলিঅট, পাউণ্ডের জগতে। এর মধ্যে হুইটম্যান বিশেষভাবে স্থান পেলেন না। কিন্তু আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি বহু প্রেরণার উৎস লোক। রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতার প্রেরণা শুধুই উপনিষদ, বাইবেল থেকে পাননি; তাঁর স্বীকারোক্তি অনুসারে, হুইটম্যানের গদ্য কবিতার কথাও তিনি মনে রেখেছিলেন। ছন্দ গ্রন্থে। Saw in Louisiana a Live-Oak Growing কবিতাটির অনুবাদও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পুনশ্চ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য কবিতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯২২-এর আগেই তামিল সাহিত্যে ভারতীয় হাতে

জন্ম নিয়েছিলো "বচন কবিতাই" বা গদ্য কবিতা। তাঁর "ইনপম" কবিতাটি বিশেষভাবে স্মরণীয় এই কারণে যে হুইটম্যানের কবিতার রীতি সার্থকভাবে অনুসৃত হয়েছিল। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়, যে সময় ভাষায় গদ্য কবিতা এখন প্রতিষ্ঠিত, গদ্য কবিতার উৎসে আছেন রবীন্দ্রনাথ এবং হুইটম্যান। হিন্দী সাহিত্যের ছায়াবাদের যুগে অর্থাৎ ১৯২০ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী বা বাংলা কবিতা আর হুইটম্যানের আদর্শে রায়কৃষ্ণ দাস, বিয়োগীহরি কিংবা চতুর সেনশাস্ত্রী গদ্য কবিতা লিখতে শুরু করলেন। তবে হুইটম্যানের রীতির প্রতিষ্ঠা যথার্থভাবে হল না। চতুর সেনের 'অন্তস্তল' (১৯২২) পড়লে দেখলে দেখা যাবে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বা হুইটম্যানের কারো গদ্যকবিতারই সামান্য যোগ নেই। শুধু তাঁদের মতই এরাও সাহিত্যে নতুন আঙ্গিকের পথ নির্ণয়ের চেষ্টা করলেন মাত্র।

কাব্যের বিষয়বস্তুতে যেমন হুইটম্যান ভারতীয় কবিতায় আসেন নি, তেমনই আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও কোন প্রভাব সঞ্চার করতে তিনি পারেন নি। কিন্তু আঙ্গিকের ক্ষেত্রে হুইটম্যান ইউরোপীয় আধুনিক কাব্যেরও অন্যতম প্রেরণা। আমেরিকার সাহিত্যের ইতিহাসের কবিতার দুটো প্রধান স্রোতের প্রবর্তক পো আর হুইটম্যান। পো ছন্দময় বাক্যের স্রষ্টা, যাদুকরী স্বপ্নালু আবহাওয়ার কবি; প্রতীকীবাদের স্রোতের সঙ্গে তাঁর যোগ। হুইটম্যান পক্ষে স্বপ্নজগৎ, যাদুজাল থেকে নেমে এলেন তথ্যাকীর্ণ জগতে, বিজ্ঞান, যান্ত্রিকতা, সাধারণ জীবনের তুচ্ছতায়। এই দ্বিতীয় স্রোতের সঙ্গে আধুনিক কবিতার যোগ ঘনিষ্ঠতর। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও এজরা পাউণ্ড যাকে বলেছেন 'Prose tradition' তার সূচনা হুইটম্যানে। এজরা পাউণ্ড স্বীকারও করেছেন তাঁর The Poet কবিতায়

> I make a pact with you, Walt Whitman
> I have detested you long enough
> I come to you as a grown child
> Who has had a pig-headed father
> I am old enough now to make friends.
> It was you that broke the new wood,
> Now is a time for carving.
> We have one sap and one root—
> Let there be commerce between us.

হুইটম্যানের কবিতার ছন্দ আধুনিক গদ্যকবিতা থেকে পৃথক, রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক। ইংরেজি বাইবেলের গদ্যের স্বর তাতে স্পন্দিত, মিলের অভাব, নিয়ন্ত্রিত পদবিন্যাসের অভাব ঘোচাবার চেষ্টা তিনি করেছেন, হিব্রু ধর্মসংগীত রচয়িতাদের মত পুনরাবৃত্তি, সমদীর্ঘ বাক্যের উপস্থাপন, সুসমরূপক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরাজি অনুবাদ হবার পর অচিরেই অনেক সমালোচক হুইটম্যানের সঙ্গে তার মিল লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু এই মিল নিতান্তই অগভীর। রবীন্দ্রনাথের সংগীতের দোলা, মৃদু উত্থান পতনের সঙ্গে হুইটম্যানের উচ্চ নির্ঘোষ

শব্দপুঞ্জের কোলাহলের সুন্দর পার্থক্য। তবু হুইটম্যান 'নতুন কাঠ' সংগ্রহ করেছিলেন; আধুনিক কবির কারুকার্যের অন্যতম উপাদান। হুইটম্যান কবি, প্রফেট আর প্রচারক। প্রচারকের কাজ দ্রুত নিঃশেষ হয়। প্রফেটের সর্বজ্ঞতা, ত্রিকালদর্শিতা কাব্যে তত্ত্বকথার সৃষ্টি করে যত সহজে, কবিতা তত সহজে সৃষ্টি করে না। প্রচারক ও প্রফেট হুইটম্যান অনেক সময়েই আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, বিশাল ব্যস্ত জগতের সঙ্গে একাত্মতার বোধ জাগায়, অনেক সময়ই এক অপরিণত কবির কণ্ঠে ব্যক্তিত্বের রহস্যে বিস্মিত চিত্তের অনিবারণীয় উল্লাসধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু বোঝা যায় সেই কণ্ঠস্বরের প্রচারধর্মিতা ক্ষীণায়ু। প্রচারক নয়, প্রফেট নয়, কবি, শুধু কবি যে হুইটম্যান তিনি থাকবেন কাব্যের জগতে যেখানে প্রচার নয়, ত্রিকালদর্শিতার অহংকার নয়, শুধু মানুষের জীবনের অসংখ্য সুখ দুঃখ, অসংখ্য দীর্ঘশ্বাস, যেখানে রূপের উজ্জ্বলতা, মৃত্যুর ছায়া, যেখানে প্রতি কর্মে, প্রতিটি আচরণের মধ্য দিয়ে মানুষকে উপলব্ধি করার চেষ্টা, এমনকি রহস্যময় অন্ধকার পর্দাঢাকা জীবনাতীত সত্যের দিকে উঁকি মারার কৌতূহল—সেই জগতে আমরা তাঁর কাছে যাবো, তাঁর ছায়ায় বসব কয়েক মুহূর্তের জন্য। তখন অনাগত কবিদের জন্য তিনি যা বলেছিলেন হয়ত তা অর্থবান মনে হবে

> Indeed, if it were not for you, what would I be ?
> What is the little I have done except to arouse you ?

বিংশ শতাব্দীর ভাবিক সমস্যার কয়েকটি দিক

সুনীলকুমার নাগ

বিংশ শতাব্দীর দুই তৃতীয়াংশের বেশী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—এখন যদি প্রশ্ন করা যায় যে এমন ব্যক্তি কে বা কোথায় যিনি উনবিংশ শতাব্দীর ডারউইনের মতো এককভাবে গোটা শতাব্দীর চিন্তাধারা তর্কাতীতভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছেন ?—এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ হবে না।

আজকের বিজ্ঞান প্রায় ম্যাজিকের মত মনে হয়। সত্যি বলতে কি সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, অসাধারণ এমনকি বিশেষ বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান লোকের কল্পনাকেও বিজ্ঞান আকছার হার মানাচ্ছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মানুষের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন বা সাধারণ মননশক্তি মোটেই তাল রাখতে পারছে না। বর্তমান পৃথিবীর সঙ্কটের একটা প্রধান কারণ এই অক্ষমতার মধ্যেই নিহিত আছে।

এ অক্ষমতা অস্বীকার করা ভুল এবং অন্যায়। এ অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে তার উর্দ্ধে উঠবার জন্য মানুষ যতদিনে না সচেষ্ট হবে, ততদিনে পৃথিবীর এ সংকট কাটবে না, ততদিন বিংশ শতাব্দীর সমৃদ্ধ বিজ্ঞান সুন্দর পৃথিবীর বুকে ষোড়শ, সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর মরচে পড়া সমাজ বিজ্ঞানের টানা হেঁচড়া চলবে। পদে পদে মানুষকে হোঁচট খেতে হবে, লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষকে অকালে মরণের স্বাদ পেতে হবে।

দু'শ, পাঁচ শ' বছর তো দূরের কথা পঞ্চাশ, পঁচিশ এমন কি দশ বছর আগেকার বিজ্ঞানকেও দশ বছর পরের বিজ্ঞান হার মানিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ভাবজগতে তেমনটি হচ্ছে কৈ ? সেদিনের রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, ইবসেন, হুগো, টলষ্টয়, জোলা, ডিকেন্স, মার্ক্স বা আরো কিছু আগের গ্যয়টে, মিলটন বা শেক্সপীয়ার তো দূরের কথা, তিন হাজার বছর আগের ব্যাসদেব ও হোমার এবং আরো আগের বাল্মীকিকেই বা কে হারাতে পারছেন ? ওঁদের যদি আমরা হারাতে পারি তা হ'লে সেটা আমাদের চাইতেও ওঁদের পক্ষেই অধিকতর গৌরবের ব্যাপার হবে। জীবনটা চলমান। এ চলার কাজটা অস্বীকার করা শুধু উন্নতি বা প্রগতি বিরোধিতা করা, সর্বনাশকর এমন কি এটা আত্মহত্যার কারণ হ'তে পারে।

বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান যুগটাকে এক কথায় আত্মহত্যার সম্ভাবপূর্ণ যুগ বললে খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। গত শতাব্দীতে শিল্পভিত্তিক সভ্যতার গোড়াতে মানুষ যে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল সে বিপদ তার এখনো কাটেনি। বরং আরো ঘনীভূত হয়েছে সে সঙ্কট—এ সঙ্কট এখন একটা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে।

বোটানি, জুলজি, এ্যাস্ট্রোনমি, কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্সের যতই উন্নতি হক না কেন, তাতে মানুষের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—যদি না মানুষ তার সামাজিক জীবনে বিজ্ঞানলব্ধ ঐ সমস্ত কিছুকে ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পারে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে আজকের পৃথিবীর যা মূল সমস্যা তা হ'লো সামাজিক জীবনে বিজ্ঞানের এই প্রয়োগ পদ্ধতির সমস্যা। একদল বলছেন

এইভাবে চললে মানুষের বেশী ভাল হবে অন্য একদল বললেন তার বিপরীত কথা এবং এ সম্পর্কে মানুষের প্রথম মৌলিক খটকা লাগে গত শতাব্দীতে মার্ক্স—এঙ্গেলস্-এর Manifesto of the Communist Party—প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। জার্ম্মানীর দর্শন, ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতি ও রাজনীতি এবং ফ্রান্সের সাম্যবাদ, আর তার উপর গোটা মানব জাতির ইতিহাস মন্থন করে মার্কস্—এঙ্গেলস্ মানুষের সামাজিক সমস্যার সমাধান করার জন্য যে সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন তা মূলগতভাবে অন্য সকলের চাইতে ভিন্ন।

প্রথমে যা মনে হয়েছিল নিছক একটি খট্‌কা, পরে দেখা গেল তাই সন্দেহের সদর রাস্তা দিয়ে দ্রুত এগোতে এগোতে অল্পকালের মধ্যেই অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক এক কথায় বলতে গেলে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের পুরানো ভিত্তিতেই ভাঙ্গন ধরিয়ে দিয়েছে। মানুষের ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে সন্দেহ নতুন সত্যের সন্ধান দিয়েছে। এবারও তাই হ'ল। এ সন্দেহ কিছুকালের মধ্যেই নতুন সত্যের পথ দেখালো। সৃষ্টি হ'ল নতুন বিশ্বাস। দেখতে দেখতে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হলো, বাড়তে লাগলো এর পরিধি। যে জিনিষটাকে প্রথম মনে হয়েছিল ছোট্ট একটি পাথর কুচি, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেটি হিমালয়।

ভাল লাগুক আর না লাগুক, এ কথা আজ আর অস্বীকার করা যায় না যে স্থূল জগতের হিমালয়ের মত ভাবজগতের এই হিমালয়কে সামলানোই আজকের পৃথিবীর সমস্যা।

স্থূল জগতের হিমালয়টির আরাম-বিরামের একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। সংস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ একই জায়গায় পড়ে আছে। ভাব জগতের হিমালয়টির কথা সম্পূর্ণ আলাদা। একেত যেমন এর অবস্থানের নির্দ্দিষ্ট জায়গা নেই—ককেশাসই বলুন আর চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জর্মনী বা উত্তর কোরিয়াই বলুন আসলে এর কোনটিই ভাবজগতের এই হিমালয়ের স্থায়ী আস্তানা নয়। এ হিমালয় চলমান—প্রতি মুহূর্তে চলমান। এ হিমালয় আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে এমন কি ঘরের মধ্যেও আজ এ হিমালয় ছড়িয়ে পড়েছে।

মার্কস্ যদিও গত শতাব্দী শেষ হবার আগেই মারা যান, কিন্তু তাঁর ধারণাবলী প্রধানতঃ এ শতাব্দীর সুরু থেকেই কার্য্যকারী ভাবে ফল দেখাতে থাকে। কাজেই Posthumous award হিসাবে এ শতাব্দীর একক মালিকানা মার্কস্‌কে দেওয়ার একটা কথা উঠতে পারে, এবং এ কথায় একদল মনস্বী যদিও সঙ্গে সঙ্গেই সমর্থন জানাবেন কিন্তু আর একদল তার প্রাণপণ বিরোধীতা করবেন। আর মার্ক্স নিজে বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তার বিরাট দাঁড়ি গোঁফের আড়ালে একটু হেসে নিতেন আমাদের লড়াই দেখে; কারণ যে ব্যক্তি নিজে মালিকানা নস্যাৎ করবার জন্য প্রাণপাত করে গেলেন তাঁর কি আর মালিকানার নেশা থাকতে পারে—তা স্থূল জগতেরই হ'ক বা ভাব জগতেরই হ'ক?

এখন পর্য্যন্ত এ শতাব্দীতে এমন অনেকেই জন্মেছেন যাঁরা ঠিক এ শতাব্দীতে না জন্মে যদি আর দু'চার শ' বছর আগে আসতেন পৃথিবীতে, তা হলে পৃথিবীর মানুষ নিশ্চয়ই তাঁদের সে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবে স্বীকার করে নিতো। অর্থাৎ সে শতাব্দীর মালিকানা দিতো। বিংশ

শতাব্দী হ'লো এক কথায় সংঘাতের যুগ। শুধু সশস্ত্র সংঘাতই নয়, ভাবিক সংঘাত ও বটে। গত পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ যা ভেবেছে তার প্রায় প্রত্যেকটি ধারার বাহক বর্তমান পৃথিবীতে পাওয়া যায়। কথায় বলে মানুষ কোন কিছুই একেবারে পরিত্যাগ করে না। কোন বিশ্বাসই একেবারে বর্জন করতে পারে না। চরম অজ্ঞানতা পূর্ণ কুসংস্কারের জন্যও অনেকে এমন চমৎকার যুক্তি দেখাতে পারে যা যুক্তি বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তারা হয়তো কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। একদিকে যেমন মানুষ আজ স্পুটনিক ওড়াচ্ছে এবং গ্রহান্তরে যাবার জন্য আয়োজনে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ই আর একদল মানুষ হয়তো কোন কঠিন রোগ সারাবার জন্য মাদুলি ধারণ করে নিশ্চিন্ত আছে। এর মধ্যে কিন্তু একটা জিনিষ বেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। তা হলো বিজ্ঞানের কাছে অন্য সমস্ত কিছুর পরাজয়। কারণ যিনি মাদুলি ধারণ কচ্ছেন বা মাদুলি ধারণের পরামর্শ দিচ্ছেন, তিনিও সে জন্য একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। এটা বিজ্ঞানের জয় বৈকি। আজ সব কিছুই scientific ভাবে পুনর্গঠনের চেষ্টা চলছে—Scientific Religion, Scientific Politics ইত্যাদি।

চৈতন্যদেবের পর চার পাঁচ শ' বছর বলতে গেলে ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে ছিল। ওঁর পর বিশ্ব-মানবের ভাব-ধারাকে প্রভাবিত করবার মতো আর কয়েকজন মাত্র আজ পর্যন্ত জন্মেছেন ভারতবর্ষে। এঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বেপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রথম দু'জন যদিও এ শতাব্দী সুরু হবার আগেই দেহত্যাগ করেন, কিন্তু ওঁদের ভাবধারার বহুল প্রচার এই শতাব্দীতেই হয়। শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হয় যে খুব সম্ভবতঃ প্লেটোর পরে ওঁর মতো অতো গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কারো জন্ম হয় নি এ-পৃথিবীতে। এক বিদুষী মহিলা (মিস্ আন্ডারহিল) তাঁর একখানি বিখ্যাত বইয়ের এক জায়গায় লিখে গেছেন যে মানুষ মাত্রেই জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই হয় সে প্লেটোপন্থী আর না হয় অ্যারিস্টটল্-পন্থী হয়ে জন্মায়। অর্থাৎ হয় সে ভাবপ্রবণ আর না হয় বাস্তবধর্মী। সুকঠোর বাস্তবের সংঘাতে আজকের সমাজ জীবনে সর্বক্ষণ যে উত্তাপ সৃষ্টি করছে তাতে ভাব-প্রবণতার সূক্ষ্ম জিনিষগুলি পুড়ে ছাই হয়ে ভস্ম হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতো ক্ষণজন্মা পুরুষের ভাব-ধারণাকে আপাততঃ ছাপার অক্ষরের মধ্যেই গুমরে মরতে হচ্ছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভারতবর্ষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ বিশেষ করে উপনিষদের অত্যুচ্চ ভাবধারার সঙ্গে পশ্চিমের অনেক শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে সৃষ্ট ভাবধারার অনন্য সাধারণ সমন্বয় ঘটিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও মূলত প্লেটোপন্থী। সমাজের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য তাই আমরা তাঁর কাছে যাবো না। তবে এ কথা ঠিক যে, মানুষের ন্যূনতম দৈনন্দিন দাবী দাওয়াগুলি মেটবার পরই যখন তার আত্মার খোরাকের প্রয়োজন হবে তখন তাঁকে নিশ্চয়ই ভারতের এই চারজন মহা-মানবের সংস্পর্শে আসতে হবে—তা এ শতাব্দীতেই হ'ক আর এর পরের শতাব্দীতেই হ'ক।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সাহিত্যের অঙ্গনে ধর্ম-দর্শন-রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাদির ভিড়। অবশ্য এটা যে একান্ত ভাবেই বিংশ শতাব্দীর উদ্ভাবন তা নয়, তবে এ শতাব্দীতে সাহিত্যে ঐ সমস্ত ভাবধারার সজ্ঞান এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচার একটু বেশী হচ্ছে। এবং এ শতাব্দীতে এ কাজটা এতো ব্যাপকভাবে হচ্ছে যা আগে কখনো দেখা যায় নি।

সাহিত্যের মাধ্যমে নানা ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা বোধ হয় সাহিত্যের সূচনা থেকেই হয়ে আসছে। হোমর তাঁর ইলিয়াডে শুধুই কি কাব্যরস পরিবেশন করেছেন? না, আদৌ নয়। এ্যাডিসন তাঁর স্পেক্‌টেটরে একটি আলোচনায় লিখেছিলেন যে হোমরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল গ্রীক্ রাজকুমারদের চোখে আঙ্‌ল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া জাতীয় ঐক্যের মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা কতখানি। বিষ্ণুশর্ম্মা কি তাঁর পঞ্চতন্ত্রে শুধুই কতকগুলি মনোরম কাহিনী পরিবেশন করে গেছেন? না, তা মোটেই নয়, কারণ উনি কয়েকটি রাজকুমারের শিক্ষার ভার নিয়েই তাদের জন্য ঐ কাহিনীগুলি রচনা করেছিলেন। কাজেই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা দেওয়া—কাহিনীভাগ সেই মূল বক্তব্যের বাহন মাত্র। এবং সে কি শিক্ষা? ধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি। এতো গেল খৃ: পূ: শতাব্দীর সাহিত্যের কথা। তার পরবর্ত্তী কালেও অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সাহিত্যরস পরিবেশন করা ছাডাও এক একটি বিশেষ ভাবধারার প্রচার নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই হয়ে এসেছে। এবং সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ যতদিন থাকবে মানুষের ততদিন সাহিত্য স্রষ্টারা সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী মঙ্গলকেও তাদের সৃষ্টির সঙ্গে জনগণকে পরিবেশন করবেন।

ভাবধারা প্রচারের জন্য সাহিত্য যে কি অসীম—শক্তিশালী বাহন হতে পারে এ শতাব্দীতে প্রকাশিত একখানা উপন্যাসের কথা বল্লেই তা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিচার করলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে গোর্কির "মা" আমাদের শতাব্দীতে প্রকাশিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সভ্য পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষাতেই এ-বই অনূদিত হয়েছে। এবং এ-বইয়ের পাঠক সংখ্যা নিশ্চয়ই কোটির উপরে। গোর্কির 'মা' এর কাহিনী ভাগ এক কথায় captivating, বলার ভঙ্গী অত্যন্ত সরল, পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ বাস্তব, চরিত্রগুলি খুবই স্বাভাবিক, সাধারণ এবং জীবন্ত। কিন্তু তবু এর কোনটি বা এই সব কারণের জন্যই কি 'মা'-এর এতো জনপ্রিয়তা? এ গুণগুলির সমন্বয় তো 'মা'-এর পূর্ব্বে বা পরে আরো অনেক বইতেই হয়েছে। সে বইগুলি তাহলে অতটা জনপ্রিয় হয়নি কেন? হয়নি তার কারণ গোর্কির 'মা'-এ ঐ গুণগুলি ছাড়াও আরো একটি জিনিস আছে যা অনেক বইতে নেই। তা হলো গোর্কির message। কাহিনীটির মধ্যে ঐ সমস্ত গুণগুলির সঙ্গে গোর্কি তাঁর messageটা এমন নিপুণতার সঙ্গে এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন যা কদাচিৎ দেখা যায়। সবকিছু থেকেও যদি ঐ messageটি না থাকতো তাহলে গোর্কির 'মা' কোনদিনই এতো পাঠক পেতেন না কিন্তু তাতে আমাদের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হতো? কিছু হতো কি? নিশ্চয়ই হতো। শুধু আমাদের নয় গোটা সভ্য সমাজেরই অশেষ ক্ষতি হয়ে যেত। পৃথিবীর সাধারণ মানুষের পক্ষে নিজেকে খুঁজে পেতে, চলতি সমাজে তার স্থানটা কোথায়, কি ছিল তার অতীত এবং কি তার বর্ত্তমান আর কি তার ভবিষ্যৎ হতে পারে বা হওয়া উচিত তা বুঝে উঠতে তাকে আরো বহুদিন অপেক্ষা করতে হতো। গোর্কির 'মা' যে শুধু বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষ অর্থাৎ সাধারণ পাঠককে সমাজ-সচেতন করে তুলেছে, অন্ধকার হতাশার কূপে নিমজ্জমান মানুষকে আলোকোজ্জ্বল জীবনের পথ দেখিয়েছে তাই নয়, এ বই অনেক আচ্ছা-আচ্ছা ডিগ্রীওয়ালা পণ্ডিত, সমাজ-বিজ্ঞানী এবং

পেশাদার লেখকদেরও চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। গোর্কির যে massage তা শাস্ত্রের message, ইতিহাসের অর্থনীতির বা এক কথায় বলা চলে যে সমাজ-বিজ্ঞানের messege, কিন্তু গোর্কি শাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, তিনি ছিলেন মানবতন্ত্রী তাই ঐ messageটিকে তার কাহিনীর মধ্যে মিশিয়ে দেবার জন্য তাকে হয়তো অনেক রাত জেগে, বসে ভেবে ভেবে কাটাতে হয়েছে। গোর্কি যে messageটি তাঁর মা-এর মাধ্যমে পরিবেশন করে গেছেন তা আরো বিশদভাবে লেখা সমাজবিজ্ঞানের বইতে মা-এর আবির্ভাবের কয়েক যুগ পূর্ব থেকেই তো ছিল। পেশাদার সমাজ-বিজ্ঞানী ছাড়া আর ক'জন পাঠক সেসব বই নাড়াচাড়া করছেন? নিশ্চয়ই তাদের সংখ্যা খুব কম।

সমাজবিজ্ঞনী বা দার্শনিকদের প্রভাব এ যুগে কমে গেছে বললে ঠিক বলা হবে না। তাঁদের প্রভাব ঠিকই আছে, তবে সেটা প্রত্যক্ষ প্রভাব নয়, প্রধানতঃ সাহিত্যগ্রন্থের মাধ্যমে এই প্রভাবটা তাঁরা সৃষ্টি করেছেন। আর তাছাডা এরকম অনেক লেখকও দেখা যাচ্ছে এযুগে যাঁরা প্রকৃতিগতভাবে দার্শনিক, যাঁদের বক্তব্য দার্শনিক কিন্তু নিজ নিজ ভাব ধারণা পাঠকসমাজে পরিবেষণ করবার সময় যাঁরা পুরনো 'সলিড প্রোজ'-এর সাহায্য না নিয়ে কাব্য নাটক গল্প বা উপন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে যেভাবেই বুঝবার চেষ্টা করা যাক না কেন—গীতিকার রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ, গল্পকার রবীন্দ্রনাথ বা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ—যতই আলোচনা করা যাবে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে ক্রমবর্দ্ধমান আকারে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক বক্তব্য ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ, কাণ্ট, হেগেল বা ব্রাডলীর চাইতে অস্পষ্ট অর্থাৎ এদের তুলনায় অনেক কম গোছানো, সুসংবদ্ধ নয়, কিন্তু ফিকটে, শোপেনহাওয়ার, নীটশে, জেমস বা বোসাঙ্কের চাইতে অনেক বেশী স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ "সলিড প্রোজের"র মাধ্যমে দর্শনের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ করলে কি রকম লিখতেন সে কথা এখানে আলোচ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যপ্রতিভা নিয়ে মানুষের ইতিহাসে গোটা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত ক'জন জন্মেছেন? নিশ্চয়ই খুব বেশী নয়। তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে সর্বসাকুল্যে সাত কি আটজন জন্মেছেন যাঁদের আমরা রবীন্দ্রনাথের চাইতেও শ্রেষ্ঠ বলতে পারি। কিন্তু তার পরে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ আর কাউকেই আমরা দেখতে পাই না। এহেন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব কতোটুকু আজকের পৃথিবীতে? খুবই কম। তার কারণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ যদিও দুই শতাব্দীর মানুষ—কারণ তাঁর জীবনটা প্রায় সমানভাবে দু'টো শতাব্দী ভাগাভাগি করে নিয়েছে কিন্তু আমরা তাঁকে এ শতাব্দীর মনে করছি বিশেষ করে এইজন্য যে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ এই শতাব্দীতেই ঘটেছে। গতশতাব্দীর ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন তরুণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কি শক্তি আছে। সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ হতে তিরিশ বছর অর্থাৎ ১৯১০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যা লিখে গেছেন বক্তব্যের গভীরতা ও ভাবের ব্যঞ্জনার দিক থেকে বিচার করলে ঐ সময়ে পৃথিবীর কোন দেশের এক জন কবি সাহিত্যিক মিলেও তা করতে পারেন নি, একথা সত্যি। কিন্তু তবু এ শতাব্দীর

মালিকানায় তাঁর দাবী কতটুকু হতে পারে ? নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়। বেশি যে নয় তার কারণ তাঁর বিপুল রচনাবলীর অধিকাংশই অনুক্ষণ সংঘাতশীল বাস্তব জীবনকে একটা দুর্বোধ্য অবহেলায় পাশ কাটিয়ে গেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজোড়া পাঠকসমাজের অধিকাংশ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর রচনা পাঠ করে কিন্তু তারপর প্রাত্যহিক জীবনে তাঁর অতি সুকোমল, অতি সুকুমার, অতি সুললিত বক্তব্যের পাশ কাটিয়ে চলে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে এক সময়ে লিখেছিলেন : "আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারী। এই কারণেই জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাকতে আমার প্রবৃত্তি নেই।......আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব......।" (রায়তের কথার ভূমিকা) এ সবই রবীন্দ্রনাথ জানতেন, কিন্তু তবু তিনি জমিদারীর জমি আঁকড়ে ছিলেন এবং তিনি যতটা জমিদারীর জমি আঁকড়ে ছিলেন, তাঁর চতুর্গুণ জমিদারীর জমি তাঁকে আঁকড়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা হয়েও বক্তব্যের দিক দিয়ে এশতাব্দীকে প্রভাবিত করতে পারলেন না।

কতকগুলি ব্যাধি আছে রয়েসয়ে ধীরে ধীরে যার চিকিৎসা হয়, যেমন বাত। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি ব্যাধি আছে যা হওয়া মাত্র রোগীর অবস্থা এখন তখন হয়ে পড়ে, যেমন কলেরা, ম্যানিনজাইটিস বা গ্যালপিং থাইসিস। আজকের পৃথিবীর সমাজের অবস্থা এই শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যাধিগুলির মতো। সমাজের কাঠামো আজ এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলেছে যে প্রতিমুহূর্তেই তার এখন তখন অবস্থায় কাটছে। এই বাস্তব অবস্থার আলোচনা না করে নিছক মোলায়েম কিছু কিছু কথা শোনালে মানুষ তা দিয়ে কি করবে ?

সাহিত্য প্রতিভা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ গোর্কির চাইতে শতগুণ বেশি শক্তিশালী ছিলেন বললেও কম বলা হবে, কিন্তু তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে বাস্তবজীবনের অবস্থা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকার জন্য এবং সমস্যাসঙ্কুল সেই বাস্তব জীবনকে বাস্তব উপায়ে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য গোর্কি এ শতাব্দীর এক অদ্বিতীয় সাহিত্যস্রষ্টা, এক দুঃসহসী ভবিষ্যদ্রষ্টা, জীবনযুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত সাধারণ সংগ্রামী মানুষের কাঁধে কাঁধ ছুঁইয়ে চলতে সদা প্রস্তুত আর রবীন্দ্রনাথ সুসংস্কৃত উচ্চশ্রেণীর নমস্য ব্যক্তি।

আমরা গোর্কি ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের কোন তুলনামূলক আলোচনা করছি না। আমরা এঁদের দু'জনের নাম এখানে করলাম বিশেষ করে এইজন্য যে, ভাবজগতের যে হিমালয় মানবজাতিকে আজকের দিনে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে—এরা দু'জনে তার দু'দিকের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের পাঠক সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে তা ঠিক কিন্তু তিনি জীবনকে দেখে গেছেন বিগত শতাব্দীর দৃষ্টিকোণ থেকে, ইচ্ছায় হ'ক আর অনিচ্ছায় হ'ক 'জমিদারীর জমি' আঁকড়ে থাকবার জন্য তিনি জীবনের সমালোচনা করেছেন প্রধানতঃ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, তাদেরই কেন্দ্র করে যারা প্যারাসাইট, যারা পরাশ্রিত জীব অর্থাৎ শোষক শ্রেণী।

কালের অমোঘ শাসনে শোষকশ্রেণী ক্রমশঃ পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাচ্ছে। এশতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে কাজটা আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু চল্লিশ বছরের মধ্যেই আজ দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর

অর্ধেক মানুষ শোষক শ্রেণীর কবল থেকে নিজেদের কার্যতঃ মুক্ত করে ফেলেছে। পৃথিবীর যে অংশ এখনো কার্যতঃ মুক্ত হয়নি, তার মধ্যেও অসংখ্য ফাটল ধরেছে। কাজেই চল্লিশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ এশতাব্দী শেষ হবার আগেই পৃথিবীব্যাপী—মানবসমাজ শোষকশ্রেণীর কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে আশা করা যায়।

আজকের পৃথিবীর মূল সমস্যা হলো শোষিত মানুষকে মুক্ত করা। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আজ এক নিদারুণ জীবন মরণ সংগ্রামের মুখোমুখী এসে পৌছেছে। যাঁরা নিজেদের মুক্ত করেছেন তাদের প্রথম কাজ হলো আত্মরক্ষা করা, আর দ্বিতীয় কাজ হলো যাঁরা মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত তাদের সাহায্য করা। আর যাঁরা এখনও নিজেদের মুক্ত করতে পারেন নি তাঁদেরও কাজ দ্বিমুখী : মুক্ত যাঁরা হয়েছেন তাঁদের আরো শক্তিশালী করে তোলা আর দ্বিতীয়তঃ নিজেদের মুক্তির জন্যে চেষ্টা করা। তাই একথা অবশ্যই বলা যায় যে 'জমিদারীর জমি' নয়, শুধু 'জমি' আঁকড়ে যাঁরা আছেন এটা তাঁদেরই যুগ—এটা তাদেরই শতাব্দী। তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের সবকিছুর নতুন করে মূল্য বিচার করতে হবে।

রাজনৈতিক চেতনা যে পর্যন্ত যথেষ্ট প্রখর না হয়েছিল সে পর্যন্ত মানুষের একটা ধারণা ছিল যে সেই হলো সবচাইতে সাফ লোক যে লড়াই করে না, যে নিরপেক্ষ। কিন্তু আজকের মানুষ, বিশেষ করে সংগ্রামী মেহনতী জনতা একথা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে যে যখন দুই পক্ষে কোন ব্যাপার নিয়ে সংগ্রাম চলছে তখন তৃতীয় যে পক্ষ নিরপেক্ষ থাকে সে শত্রুর চাইতেও জঘন্য, চরম সুবিধাবাদী। আর তা ছাড়া কেউই কার্যতঃ নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। দুই যোদ্ধ শক্তির সামনে যে নিরপেক্ষ থাকে সে তার নিরপেক্ষতা দিয়েই অধিকতর শক্তিশালী পক্ষকে সাহায্য করতে থাকে। কাজেই সে আসলে অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির সুবিধাবাদী।

নিরপেক্ষতার মুখোস আজ খুলে পড়েছে।

মানুষের জীবনের নানা দিকের বিচ্ছিন্নভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করবার একটা রীতি আছে। আগেও ছিল এবং আজকের দিনেও অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। নিছক কাজের সুবিধার জন্য বা বিশ্লেষণ করবার শক্তির সীমাবদ্ধতার জন্যই ওরকম করা হয়ে থাকে। কিন্তু কাজটা ঠিক নয়। গোটা মানুষকে সমগ্রভাবে বিচার না করলে আমরা কখনই আসল সমস্যা বুঝতে পারি না। মানুষ যখন যা করে সমগ্রভাবেই করে, গোটা মানুষ হিসেবেই করে। মানুষের যে ভাবজগতের চাহিদা, তা তার সমগ্র সত্তার চাহিদা, মানুষ যেমন অবিভাজ্য তার প্রয়োজন ও চাহিদাও তেমনি অবিভাজ্য—এই প্রয়োজন আজকের সাহিত্যিকে মেটাতে হবে।

বলেন্দ্র-কাব্যে প্রেম চেতনা

শিবানী সিংহ

বাঙ্গলা গীতি কবিতার ইতিহাসে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বিস্মৃত প্রায় নাম। বলেন্দ্রনাথের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ পরিচয় গদ্য সাহিত্যিক হিসেবেই ; তবু তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি গঠন করতে হলে তাঁর স্বল্প সংখ্যক কবিতা সমষ্টির মূল্য নিতান্ত কম নয়। বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে গদ্য রচনার তুলনায় তাঁর কবিতার সংখ্যা কত অল্প। মাধবিকা (১৮৯৬) ও শ্রাবণী (১৮৯৭)—এই দুটি কাব্যগ্রন্থ এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলিসহ বলেন্দ্রনাথের কবিতা সংখ্যা ষাটটি মাত্র। এত অল্প সংখ্যক কবিতা দিয়ে কোন একজন কবির কৃতিত্ব বিচার করতে যাওয়া আপাতদৃষ্টিতে পণ্ডশ্রম মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখা দরকার বলেন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর সৌন্দর্য সন্ধানী মনেরই ভিন্নতর অভিব্যক্তি—তাঁর আত্মপ্রকাশের অন্যতম একটি পন্থা। গদ্য রচনার নিরবচ্ছিন্ন ধারার মধ্যে কাব্যচর্চার সেই নিদর্শনগুলিকে সেই কারণেই অবহেলা করা চলে না। শুধু তাই নয়, বলেন্দ্রনাথের কাব্য রচনাকালে বাঙ্গলা কাব্য এখনকার মত বিচিত্র সৃষ্টি সম্পদেও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। বাঙ্গলা কাব্যের সেই বিশেষ পর্বে, সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য হলেও, বলেন্দ্রনাথের কবিতায় রূপসৃষ্টির যে দক্ষতা এবং আন্তরিক ভাবাবেগের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা যায় তা নিঃসন্দেহে রসগ্রাহী পাঠক মাত্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কবি হিসেবে বলেন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি প্রেমের কবি—কারণ তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থেরই একমাত্র বিষয়বস্তু—প্রেম, নারী সৌন্দর্যের বর্ণনা। তবে একথাও ঠিক যে, বিহারীলাল থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় প্রেমের যে বহুমুখী অভিজ্ঞতার তীব্র আবেগ অনুভব করা যায়, বলেন্দ্রনাথের কবিতায় সে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তার কারণ, বলেন্দ্রনাথের স্বল্পায়ু জীবনে কাব্যচর্চার আগ্রহ গদ্য রচনার মত দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি ; জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ে, বিশেষ ধরণের অনুভূতির আবেগ প্রকাশের জন্যই কবিতাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। তারওপর, প্রেম সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের মনেও এক ধরনের সন্তুষ্টিবোধ বা সহজ পরিতৃপ্তির ভাব ছিল। সেইজন্য, বিরহ মিলনের বৈচিত্র্যে দোলায়িত প্রেমের দ্বন্দ্ব-মধুর রূপটিও সেখানে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত লিখেছেন—"এ কবিতা প্রেমের পরিণত হেমন্তের প্রতীক্ষায় আছে মাত্র। তরুণ মানসের রূপতৃষ্ণা, পৃথিবী এবং মানুষের বস্তুগত সৌন্দর্যের প্রতি উৎসুক আগ্রহ থেকে বলেন্দ্রনাথের কবিতার জন্ম। এমনকি প্রকৃতির বর্ণনা তার কবিতার উপজীব্য হয়নি। নারী প্রকৃতির দেহ লাবণ্য, বিশেষ করে জল এবং নারীর সখিত্ব বর্ণনাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। প্রাচীন সমালোচনায় এর নাম আদিরস। আদিরসই বলেন্দ্রনাথের কবিতার মূল প্রেরণা।" (১) এই উদ্ধৃতিতে ঐ 'প্রাচীন সমালোচনায়' কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ বাঙ্গলা কবিতার এমন একটা সময় ছিল যখন নর-নারীর দেহগত প্রেমকে নিয়ে সূক্ষ্ম কল্পনা-বিলাস ও স্বপ্নচারীতার ধারণা ছিল না কবিদের। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, জয়দেবের গীতগোবিন্দে এমন কি বৈষ্ণবপদেও অনেক ক্ষেত্রে দেহের বস্তু

সত্যকে মাত্র স্বীকার করে তৃপ্তির সহজ আত্মস্থতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে দেখা যাবে। কিন্তু প্রেমের রহস্য সম্পর্কে মনন প্রধান কৌতূহল ও কল্পনা বিস্তার—যা আধুনিক রোমান্টিক কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তা প্রায় অনুপস্থিত। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়; জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস অথবা গোবিন্দদাসের একাধিক পদে সেই রহস্যবোধের প্রতিভাটুকু আছে বলেই সেগুলি আধুনিক পাঠকের মনকে এত নাড়া দেয়। কিন্তু আধুনিক গীতিকাব্যে কল্পনার দিব্য আলোকে আদিরসের উপজীব্য, এই মর্ত্য-দেহ সর্বস্ব প্রেমকে অপার রহস্যে মহীয়ান করে তোলাই কবিদের সাধনা স্বরূপ হয়ে উঠেছে এবং সেইখানেই আধুনিক রোমান্টিক গীতি কবিদের সার্থকতা। জীবন সম্বন্ধে সুস্মিত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে অতি সামান্য বস্তুর মধ্যেও অসামান্যের আবিষ্কার, অতীত বর্তমানের সীমা অতিক্রমণশীল কল্পনার মুক্তপক্ষ অবাধ বিচরণ এবং সেই সূত্রে বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মলাভ—রোমান্টিক কবির বিশিষ্ট হৃদয়-ধর্মকে প্রকাশ করে; বলেন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার নাতিদীর্ঘ ইতিহাসটুকু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বলেন্দ্রনাথের মানসিক উপলব্ধিও সেই বিশিষ্ট ধারাকেই অনুসরণ করে চলেছেন। সুতরাং ভাবের দিক থেকে বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্র বর্ণিত আদিরসের কবিতা রচনা করলেও চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে তিনি নিঃসন্দেহে আধুনিকযুগের রূপদক্ষ রোমান্টিক শিল্পীদেরই পর্যায়ে পড়বেন।

বসন্ত ও বর্ষা এই দুটি ঋতু ভারতীয় সাহিত্যে যথাক্রমে সৌন্দর্য 'যৌবন এবং প্রেম' বিরহের প্রতীক স্বরূপ। বলেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য দুটির নাম দিয়েছেন 'মাধবিকা' এবং 'শ্রাবণী'। এই নামকরণের মধ্যেই তার কবিতার স্বভাব ধর্মের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যাবে। মাধবিকার প্রথম কবিতায় কবি বলছেন—

"পঞ্চ ঋতু থাক নিয়ে যাহে খুশী যার,
মধুমাস থাক প্রিয়ে তোমার আমার।
শুধু এই যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস,
অনুরাগ রঙ্গে ভরা নিত্য নব আশ,
এই তন্দ্রা, এই স্বপ্ন, এই নিশিশেষ
এই মনোমোহকর মদির আবেশ,
শুধু এই মুকুলিত আম্রকুঞ্জবন,
গন্ধভরা দিশাহারা প্রভাত পবন
শুধু এই পত্রে পত্রে মধুর মর্মর,
কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিত সঙ্গীত নির্ঝর,
এই স্বচ্ছ নীলাকাশ, কুলুকুলু নদী,
এই বর্ণ, এই গন্ধ, গীত নিরবধি,
এই প্রাণ, এই প্রেম, এ পূর্ণ পুলক
থাক যতক্ষণ থাকে দিনের আলোক।"

মাধবিকা, মাধবিকা

যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাসময় 'তোমার-আমার' এই যে একান্ত নিভৃত জগৎ—যার কাছে "সমাজ সংসার মিছে সব"—সেইখানেই—বলেন্দ্রনাথের কবি কল্পনায় ইন্দ্রপুরী রচিত হয়েছে। এমনকি বিশ্বপ্রকৃতিও যেন সেখানে গৌণ ;—তার বিচিত্র সৌন্দর্য যেন সেই একান্ত আত্মকেন্দ্রিক যৌবন-স্বপ্নের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে দেবার প্রয়োজনেই মাত্র কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মুগ্ধ বিস্মিত কবিদৃষ্টির সম্মুখে সৌন্দর্যের যে শতদল ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়েছে—সে সৌন্দর্য বিশেষ করে নারী রূপের। প্রেয়সী নারীর রূপ-বর্ণনার মধ্যেই কবির যাবতীয় সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রতিবিম্ব ঘটেছে। শুধু তাই নয়, সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির সেই অকুণ্ঠ উচ্ছ্বাস যেন পূজায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাস্তব নারীর রূপ-কল্পনায় সেইজন্যই স্বর্গীয় দেবত্বের স্পর্শ লেগেছে বারে বারে।

"কলঙ্কে মলিন যদি হয়ে থাকে কেহ
দেবী তুমি নহ, নহে তব শুভ্র দেহ
নবনী কোমল। নিত্য আছ আপনার
গরব গৌরবে তুমি, ওগো বসুধার
প্রিয় পরিজন, তপ্ত গৌরকান্তি তব
রয়েছে অম্লান শুভ্রযশে, নব নব
সুখরসে ভরিতেছ স্বর্ণ-প্রেমপাত্র
নিশিদিন ধরি' অবসর তিলমাত্র
নাহি চাহিবারে ফিরে এই ধূলিম্লান
ধরণীর পানে, (অকলঙ্ক—মাধবিকা)

একান্ত ব্যক্তিগত প্রেম-চেতনার যৌবন-তপ্ত আবেশের মধ্যে প্রেমের আদর্শান্বিত রূপের এই ধ্যানটুকু বলেন্দ্রনাথের রূপতৃষ্ণাকেও এক বিশেষ ধরণের শুচিতা দান করেছে। এইদিক থেকে তিনি তাঁর পিতৃব্যের বিশিষ্ট কবি-সংস্কারগত ঐতিহ্য বহন করছেন।

বিহারীলালের ধ্যাননেত্রে পার্থিব প্রেম শেষপর্যন্ত "কায়াহীন মহাছায়ায়" পর্যবসিত হয়েছিল ; রবীন্দ্রনাথের সাধনাও জগতোত্তীর্ণ অরূপ লোকের সাধনা ; কিন্তু মানবজীবনের বিচিত্র লীলাকে তিনি কোথাও অস্বীকার করেননি। তাঁর প্রথম জীবনের প্রেম কবিতায় সেই স্বীকৃতির মধুর ঝঙ্কার বারে বারেই ধ্বনিত হয়েছে। দেহ চেতনার বিচিত্র উপলব্ধির পথ বেয়েই বিদেহী প্রেমের ধারণায় উপনীত হয়েছেন কবি। কড়ি ও কোমলের একাধিক কবিতায় মর্তজীবনের গণ্ডীতে একান্ত পার্থিব কামনার স্বপ্নলোক রচনা করেছেন কবি। কিন্তু এই 'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যেই দেখা যাবে কবির সুদূর পিয়াসী রোমান্টিক মন, সেই বাস্তব বাসনার আলিঙ্গন থেকে মুক্তি লাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর স্বতন্ত্র হৃদয়ানুভূতি নিয়ে অনুভব করেছেন :—

"এ নহে খেলার ধন যৌবনের আশা
বোল'না ইহার কানে আবেশের বাণী।
'নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়োনা টানি।

এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব-ঐ মুখখানি।" পবিত্র জীবন কড়িও কোমল

মানবজীবনের বাস্তব বাসনার ওপর এই বিশিষ্ট কল্যাণ-বোধ স্নিগ্ধতার আবেশ রচনা করেছে এই ভাবেই। বলেন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেও এই দূরত্ব সন্নিধানের স্পৃহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে অনুভূতি বর্ণনার প্রকৃতি দুজনের এক নয়—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর এবং অধিকতর পরিণত; আর বলেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য—এক আশ্চর্য ধরনের নির্লিপ্ততা। যার জন্য জীবনকে দেখার মধ্যে যত মুগ্ধতা বা আন্তরিকতা থাক না কেন সেই দেখাটাই যেন কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে দেখা। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক সময়, বলেন্দ্রনাথের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুদীর্ঘ মন্তব্যে বলেছিলেন :—

"তিনি যেন পর্যবেক্ষক মাত্র; সংসারে তাঁহাকে যেন কেহ বাঁধিয়া দিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র, উহাতে আগ্রহের সহিত যোগ দিতে তিনি যেন অক্ষম। সংসারের বিচিত্র সৌন্দর্যকলার উপভোগের জন্য যেন তিনি উপস্থিত আছেন কিন্তু সেই সৌন্দর্যকে দৃঢ়স্পর্শে আঁকড়াইয়া ধরিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই।" (২)

বলেন্দ্রনাথের কবিতার ক্ষেত্রেও তাই দেখি প্রেমের তৃষ্ণাকে ব্যক্ত করলেও মিলনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যকে কবি পরিহার করেছেন। মিলনের আকাঙ্খায় দেহের আর্তি কখনও হয়তো তীব্র হয়ে ওঠে—

"বাহু চাহে বাহু বন্ধ, বক্ষ আলিঙ্গন
তৃষিত অধর চাহে অমৃত চুম্বন
শ্রবণ শুনিতে চাহে বাণী সরস্বতী
নয়ন নিমেষে ত্যজে হেরিতে মুরতি
পুলক কণ্টকি উঠে পরশের আশে
ঘ্রাণ চাহে তৃপ্ত হতে অঙ্গের সুবাসে,
তনু চাহে তনু অঙ্গে পাইতে বিলয়,
যৌবন করিতে চাহে আপনারে ক্ষয়
ওইরূপ বেলাতটে, লাবণ্য সৈকতে
ভক্তজন পূজে যেথা কামদ মন্মথে।" (বিরহের মিলন, শ্রাবণী)

অবশ্য এ আকাঙ্খার ধ্বনি বহু যুগ ধরে বহু কবি কণ্ঠে বারে বারেই শুনেছি আমরা; জ্ঞান দাস বলেছেন—

"রূপলাগি আঁখিঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

কড়ি ও কোমলে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও শুনেছি সেই একই বাসনার ক্রন্দন—

"প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন। (দেহের মিলন)

কিন্তু এই দৈহিক আকাঙ্ক্ষাই তো কবির একমাত্র বাণী নয়, তাতে তাঁর হৃদয়ের সমর্থন কতটুকু তাও শোনা প্রয়োজন ; কিন্তু সেক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথের ভাব-গম্ভীর হৃদয়ে সংক্ষিপ্ত উক্তি :—

"হৃদয় নীরব শুধু হৃদয়ের মাঝে
তোমারে হেরিয়া সেথা অভিনব সাজে।" (বিরহের মিলন, শ্রাবণী)

অর্থাৎ মিলনের আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে প্রিয়াকে হৃদয়ের একান্ত সান্নিধ্যে আবিষ্কার করার আনন্দেই তাঁর আকাঙ্ক্ষারও চরম পরিতৃপ্তি। এই সহজ সন্তুষ্টিবোধটুকু থাকার জন্যই তাঁর কাব্য নারী সৌন্দর্যের বর্ণনায় মুখর হলেও কামনার সুর সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেনি। কবির অন্তরের প্রধান বাসনা সুন্দরের আহ্বান এবং সৌন্দর্যের মধ্যেই আনন্দের আস্বাদন। বাসনার রঙে রঙিন যে জীবন তা কবিকে মুগ্ধ, বিস্মিত করেছে সেই বর্ণময় জীবনের বিচিত্র উপকরণ দিয়ে তিল তিল করে কবিতার মানসী প্রতিমার কল্পমূর্তি গড়ে তুলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেই তিলোত্তমার রূপ বর্ণনায় হার মানতে হয়েছে স্বয়ং কবিকেই—

"একে একে ফুরাইল সকল উপমা
বয়ান হেরিয়া লাজে মলিন চন্দ্রমা,
আঁখি লজ্জা দেয় হরিণীরে স্নেহভরে
পুষ্পশর ছাড়ে ধনু ভ্রূবিলাস ভরে
নাসিকায় শুকশিশু, অধরে প্রবাল
গ্রীবা দেশে হারে কম্বু, বাহুতে মৃণাল ;
অভ্রভেদী মহিমায় পয়োধর ভূমি
হিমগিরি ছাড়ি উঠে সপ্তলোক চুমি,
কেশরী মরিছে হেরি কটির তণিমা
সুপীন নিতম্বে মজে সকল প্রতিমা,
উরুদেশ হার মানে কদলী গঠন
দেহযষ্টি সুললিত লতার মতন ;
ত্রিভুবন আছে শুধু, অয়ি মনোরমা
তোমার অঙ্গের তরে যোগাতে উপমা।" —উপমা, মাধবিকা

প্রেয়সী কণ্ঠে এই হারমানা হার পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্যেই যেন তাঁর চরম পরিতৃপ্তি—তৃষিত হৃদয়ের ব্যর্থ হাহাকারের বেদনা সে তৃপ্তিকে স্পর্শ করতে পারে না এবং সেইখানেই বলেন্দ্রনাথের মনের পূর্বোক্ত নির্লিপ্ততা বা দূরত্ববোধের একটি সূত্র পাওয়া যেতে পারে। তাঁর কবিমন নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রেমের আনন্দ উপভোগের অভিলাষী আর সেই কারণেই প্রেমের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যেও ক্ষণিকতার আশঙ্কা কবির মনের ওপর যেন সম্ভাব্য দুর্ঘটনার কালছায়া ঘনিয়ে তোলে—

"……রেখেছ আবৃত
মৌনবক্ষতল মাঝে অতি সঙ্গোপনে
যে গভীর স্নেহ, অগাধ গাহনে তার
যদি মিলে তল, যদি থাকে সীমাহীন
বালুকার চর! শুষ্ক হয় পারাবার
যদি মন্থনের ভরে।" (আশঙ্কা, মাধবিকা)

এবং তারপরেই কবির স্বীকারোক্তিটুকু শ্রোতব্য :—

"আমি নহি নীলকণ্ঠ, নাহিক সে ক্ষুধা,
নিতে পারি যাহে বিষে সুধাসম করি,
হে সুন্দরী, তাই সদা ভরি মনে মনে
কি জানি গরল উঠে অমৃত মন্থনে।" (আশঙ্কা, মাধবিকা)

অর্থাৎ প্রেম ও বিরহ, বিরোধ ও শান্তি, সন্দেহ ও তার নিরসনের মধ্য দিয়ে প্রেমের বিচিত্র তরঙ্গসঙ্কুল গতি কবিকে আকৃষ্ট করেনি। প্রেমকে তিনি পেতে চান অখণ্ড সৌন্দর্য মূর্তিরূপে ; অধিক মন্থনে তার বিকৃতি সম্ভাবনার আশঙ্কাতে কবি যেন স্বেচ্ছায় একটি দূরত্বের ব্যবধান রচনা করে নিয়েছেন। তাই প্রেয়সী নারীর বহিরাঙ্গীঃরূপ-বর্ণনাই তার কবিতার প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়েছে—প্রিয়ার হৃদয়-গহনে প্রবেশ করার উৎসুক্য তাঁর ছিল না। কবির এই নির্লিপ্ততাকে পলায়নী মনোবৃত্তি মনে হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কবির স্বপক্ষে যুক্তি বিধানের উদ্দেশ্যে তাঁর মানসপ্রবণতার অন্যতর একটি অভিব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে—'মাধবিকা'র পরিণাম কবিতায় কবি বলছেন—

হে নারীর মনভূমি, হে বালির চর
প্রভাতে দেখেছি তোরে বড় মনোহর।
নদীপার হয়েছিনু লয়ে ভাঙ্গা তরী,
এইখানে চিরদিন রব আশা করি'।
সব শস্য ছড়াইনু তব বালুপরে
বাঁধিনু বালির ঘর মহা যত্ন ভরে।
ভাবিনু নির্জনে হেথা নদী কলগানে
স্বর্ণশস্য কাটি'লব সকল অঘ্রাণে।

মধ্যাহ্নে দেখিতে পাই একি রুদ্ররূপ
কঠিন বহ্নির মত জ্বলে বালুস্তূপ !
তপ্ত ঝড়ে গৃহ মোর কোথা গেল উড়ে
যত বীজ রোপেছিনু সব গেল পুড়ে।"

এই পংক্তিগুলির মধ্যে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ধারণা অনুপস্থিত নয়; কিন্তু বলেন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা প্রেমের এই তিক্ততার মধ্য থেকে আত্মরক্ষা করেছে রূপ-মুগ্ধতার সঞ্জীবনী মন্ত্রে। তাই প্রেমের প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির রহস্য বিশ্লেষণের পরিবর্তে তাঁর কাব্যে মুগ্ধ প্রেমিকের সহজ আত্মসমর্পণের ভাবটিই ফুটে উঠেছে। তাঁর নিজের ভাষায় :—

"দেবতার মতিগতি তাও বুঝা যায়
তোমারে বুঝিয়া ওঠা সেই মহাদায়,
হে ভামিনি ! কিসে যে প্রসন্ন হও কবে
কিসে বা বিমুখ, কোন শাস্ত্র নাহি ভবে
এ তত্ত্ব জানিতে পারি যাহে।"

প্রেম সম্পর্কে এই সহাস্য, কৌতুক স্নিগ্ধ, পরিতৃপ্ত মনোভাব বলেন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ প্রকাশ করছে। মাধবিকার মূঢ়তা, দুর্নিমিত্ত, বৃথাগর্ব্ব, মান ইত্যাদি একাধিক কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'মাধবিকা'র 'দোষ' কবিতায় কবির এই বিশিষ্ট মনোভাবের সুর আরো স্পষ্ট :—

"কেমনে বাঁধিয়াছিলে, বেঁধেছিলে শরে
কেমনে করিয়াছিলে গরলে জর্জর
জীবন যৌবনে মোর, সেকি আছে মনে—
শুধু সুধা মুখখানি জাগিছে স্মরণে।
ছুরিখানি দেখি নাই, দেখেছিনু হাসি
চুম্বনের মাঝে কোথা ছিল বিষ রাশি
সে কথা কি মূঢ়জন মনে করে রাখে,
সুন্দর তোমার লীলা মধুর বিপাকে
টানে অন্ধজনে। তাহে মরে যেই জন
তারে লাগে সর্বদোষ—বিধির লিখন।

অর্থাৎ যে নারী সৌন্দর্য অথবা নারী প্রেমকে উপলক্ষ করে মানবজীবনে শত সহস্র দ্বন্দ্ববিরোধ বেদনার উৎপত্তি, সে সম্বন্ধে কবি অজ্ঞ ছিলেন বলা বলে না এবং বলা ভাল, শিল্পরসিক মনের দাক্ষিণ্য নিয়ে গোলাপের কাঁটার মত প্রেমের জ্বালাকেও তিনি স্বীকার করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। শুধু তাই নয়, জীবনের সর্বশেষ বিশ্রামস্থল হিসেবে কবি নারী প্রেমকেই নির্বাচন করেছেন—সে প্রেম বাস্তব জীবনের কলুষমুক্ত, পবিত্র এবং কল্যাণময় 'কলবেদনা' (মাধবিকা) কবিতায় স্রোতস্বিনী কণ্ঠে কবি হৃদয়ের এই বিশেষ আশঙ্কার সুরটিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

......"অয়ি প্রিয়ে
মানব প্রেয়সি, চিত্ত উঠে আকুলিয়ে'
আলিঙ্গন আশে তব, ওই বক্ষোপরি
চাহে লভিতে বিরাম চিরদিন ধরি'
তপ্ত স্নেহতলে, কোমল পরশে তব
লভি নিত্য অনুপম শান্তি অভিনব
আনন্দ নিশ্চল।"

এই সহজ সুখ, বিশ্বজগতের শতদ্বন্দ্ব কোলাহলের বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হয়ে কল্যাণময় নারী প্রেমের মধ্যে এই পবিত্র শান্তিলাভের আশাই কবিকে যাবতীয় অতৃপ্তির খেদ থেকে রক্ষা করেছে। মাধবিকা থেকে শ্রাবণীর মধ্যে কবির ব্যক্তিগত প্রেমচেতনার ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যেতে পারে; এবং দেখা যাবে সংসারের কল্যাণী নারীর রূপকে ভিত্তি করেই কবির মানসসুন্দরীর পরিকল্পনা ও ধ্যান সম্পূর্ণ হয়েছে। শ্রাবণীর প্রথম কবিতায় কবি স্বয়ং সেই স্বীকৃতিই জানিয়েছেন—

"মধুমাস ছিল যবে তুমি ছিলে মধু
গোপন মর্মের মাঝে অয়ি নববধূ।
এখন ছেয়েছ তুমি প্রাবৃটের মেঘে
হৃদয় তমালকুঞ্জ, চিত্ত ওঠে জেগে
মত্ত ময়ূরের মত পান করি তব
স্নিগ্ধ সুধা বৃষ্টি ধারা,"—(শ্রাবণী, চিরনব)

দিনযাপন, মুকুরমায়া, গৃহলক্ষ্মী, বধূ, চুলবাঁধা ইত্যাদি কবিতাগুলি লক্ষ্য করলে মনে হয়, সংসারের দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিমগ্না কবির একান্ত কাছের জন গৃহবধূটির প্রতি তিনি যেন নির্ণিমেষে দৃষ্টি মেলে রেখেছিলেন এবং সেই জন্যই এইসব কবিতায় তাঁর বর্ণনাও এমন বিশ্বস্তভাবে বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে। প্রাত্যহিক জীবন-পরিবেশের সরলতা ও স্বাভাবিকতার মধ্য থেকে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করা উনিশ শতকীয় রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম বিশিষ্ট গুণ, বলেন্দ্রনাথের শেষ জীবনের প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেখা যায় লেখক কি আশ্চর্য মমতার সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ খুঁটিনাটির মধ্যেও সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করে ফিরেছেন। বলেন্দ্রনাথের উল্লিখিত কবিতাগুলি যেন তারই পূর্বাভাস মাত্র।

ক্রমশঃ তার রোমান্টিক দৃষ্টির আলোকে এই অন্তঃপুরচারিণী প্রেয়সী নারীই কবির অন্তরবাসিনী মানসসুন্দরীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। 'শ্রাবণী'তে সেই মানসসুন্দরীর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়েছে। বসন্ত শেষ হয়ে নববর্ষার আবির্ভাবে পৃথিবী শ্যামল হয়ে উঠেছে; সেই বর্ষণ সিগ্ধ প্রকৃতিই শ্রাবণী কাব্যের পটভূমি রচনা করেছে। ভারতবর্ষীয় কবি হৃদয়ের কাছে বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ দুরাভিসারের চিরন্তন ইশারা বহন করে আনে; কবি কল্পনার সেই বিশেষ আকাঙ্ক্ষা নিয়েই শ্রাবণী কাব্যের সূত্রপাত; হৃদয়বাসিনী মানসীর অনুসন্ধানে অতীত স্মৃতির রাজ্যে কবির মানসাভিসারের কাহিনীও শুনলাম আমরা

"মুগ্ধমন কোথা যেন করে অভিসার
কোন বৃন্দাবন ধামে—কোন মধু দেশে
কেতকী বেষ্টিত কোন্ নিকুঞ্জ উদ্দেশে
কার লাগি ; সেই মোর হৃদয়ের রাণী—
দিশে দিশে গীতিগন্ধে তাহারি বাখানি।" (চিরনব, শ্রাবণী)

তারপর এক সময় সব অভিসারের শেষে। অতীত বর্তমানের যাবতীয় তরঙ্গাঘাতের মধ্য থেকে উত্থিতা, কবির সেই মানসী প্রিয়াকে কবি তখন অন্তরের নিভৃত সান্নিধ্যে আহ্বান জানিয়েছেন—

"মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়ে,
তুমি এস নেমে এস হৃদয় গুহায়
অন্তরের মাঝে, অয়ি অন্তরবাসিনি।" (অন্তরবাসিনি, শ্রাবণী)

এরপর 'আবাহন' কবিতায় কবি যখন বলছেন—

নাহি কোন লাজ হেথা নাহি কোন ভয়,
এ আমার অন্তরের নিভৃত নিলয়।
হেথা তুমি রাণী শুধু নিজ মহিমায়
নহ কেহ বাহিরের বসন ভূষায়"—

তখন কবির সেই মানসসুন্দরীকে আর কোন মতেই বাস্তব দেহধারিণী মানবী মাত্র মনে হয় না—কবির এই কল্পমূর্তি যেন নিখিল কবি চিত্তের আরাধ্যা, কবিতার প্রেরণা সৌন্দর্যমূর্তি। বলেন্দ্রনাথের মানস-সুন্দরীর এই ক্রমোপরিণতির প্রতি লক্ষ্য করেই প্রিয়নাথ সেন বলেছিলেন—

"বসন্ত ও বর্ষার বিভিন্ন শোভা ও বিচিত্র প্রভাবের মধ্যে কবির অন্তরের প্রেম আর অন্তরতমা সুন্দরী 'দিশে দিশে গীত গন্ধে মুঞ্জরিত'। বিরহে মিলনে—অন্তরে বাহিরে শয়নগৃহে নদীবক্ষে প্রেমের সেই নিত্যনব বসন্ত উৎসব আর হৃদয়ের সেই বর্ষাঘন নিবিড় অনুরাগ। কিন্তু এ সুন্দরীর অবস্থান কোথায় ইহার নাম কি ? হৃদয়ের অন্তঃপুরে কল্পনার দোলায় বাস এবং নাম মানসী। এক কথায় কবি তাঁহার হৃদয়বাসিনীকে সকল সুন্দরীর সৌন্দর্যে সকল বিলাস কলার শোভায় মণ্ডিত করিয়াছেন—একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি।" (৩) কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যোন্মুখ চিত্তের এই আত্মবিকাশ কবিতার পথ ধরে দীর্ঘ দিন অব্যাহত থাকেনি। মাধবিকার প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে রূপমুগ্ধতার যে ভ্রমর-গুঞ্জন শুনেছি কাব্যশেষে সেই সুরের মধ্যে যেন কিছুটা ক্লান্তির সুরই শোনা গেছে—

"চুম্বন গুঞ্জন আর সরস বসন্ত
অদ্যাবধি হয়েছে বিস্তর, হোক অন্ত
তবে এ সবের। পুরাতন পুষ্পশরে
বিদায় করিয়া দাও এই অবসরে—
পুষ্পে তার পশিয়াছে কীট, ধনুকের

ছিলা গেছে ছিঁড়ে এতদিনে, শুধু এর
আছে মাত্র পূর্ব আস্ফালন ;

মনে রাখা দরকার বলেন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা এককভাবে সাহিত্য সাধনায় পর্যবসিত হয়নি। সাহিত্যচর্চার বাইরে নানা ধরণের কর্ম প্রচেষ্টার ব্যস্ততায় তাঁর উনত্রিশ বছরের সংকীর্ণ আয়ুষ্কাল সদাই কর্মচঞ্চল ছিল। বলেন্দ্রনাথের গদ্য রচনার বিষয় বৈচিত্রের মধ্যে সেই বহুমুখী কর্মধারা প্রসূত বিচিত্র চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া গদ্য রচনার বিপুল সংখ্যাধিক্য এবং রচনাভঙ্গীর সাবলীলত্ব থেকে সহজেই বোঝা যায় যে আঙ্গিকের দিক থেকে গদ্যই ছিল বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকাশের যথার্থ পথ। তাঁর স্বল্পসংখ্যক কবিতা যেন তাঁর চিন্তার ক্ষণিক বিশ্রামস্থল স্বরূপ। কিন্তু তাঁর স্বভাবকর্মী মন অচিরেই সেই বিশ্রাম-সুখ ত্যাগ করে পুনরায় কর্মজগতের ডাক শুনেছে। আর সেই স্বীকারোক্তি শুনিয়ে কবিতার মাধবিকা কাব্যের ইতি টেনেছেন—

"হে মোর সঙ্গীত তোর পতঙ্গের প্রাণ
এক বসন্তেই শুধু হল অবসান।
একবেলা নৃত্য শুধু একবেলা গান
ছড়ায়ে রঙীন পাখা কুসুম শয়ান।
একটুকু স্বর্ণরেণু পুষ্প পরিমল
একটুকু রবিকর শিশিরের জল
কিছুক্ষণ খেলাধূলা মুগ্ধ অভিনয়
তারপরে দিনশেষ—তার বেশি নয়।" (অবসান, মাধবিকা)

শ্রাবণী কাব্যের শেষেও কবির সেই একই খেদোক্তি শোনা গেল—

"মনে হয় শেষ করি কিন্তু কোথায়
বলিবার যাহা ছিল সব রয়ে যায়।" (অসমাপ্ত—শ্রাবণী)

অর্থাৎ অপ্রকাশের বেদনা নিয়েই কবির কাব্যচর্চার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কবির পরবর্তী সাহিত্যচর্চা প্রায় সম্পূর্ণভাবে গদ্যের পথ বেয়েই অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য স্বীকার করতে হবে জগৎ ও জীবনকে সুন্দরের অভিব্যক্তিরূপে উপলব্ধি করার স্বভাব প্রধানতঃ কবিরই। বলেন্দ্রনাথের চিত্তও ছিল কবিচিত্ত। সেইজন্য তাঁর রচনা—তা গদ্য অথবা কাব্য যাই হোক না কেন কবিগুণ সমন্বিত হয়ে উঠেছে। বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার সেইটেই শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

১। ভবতোষ দত্ত কাব্যবাণী : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ২৪৬।
২। ভূমিকা, বলেন্দ্রনাথের আদি গ্রন্থাবলী—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৩। স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি, প্রিয়নাথ সেন।

প্রাণতত্ত্ব

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

ওপারিনের সাথে বিশ মিনিট

সাংবাদিকের একটানা কর্মজীবনে যখন হঠাৎ কোনদিন গুণীজ্ঞানী মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য ঘটে, তখন সত্যিই নিজেকে শুধু ধন্য ব'লেই মনে হয় না, এক অপরিসীম পরিতৃপ্তিতে মনটা ভ'রে ওঠে। এইরকমই এক সৌভাগ্য ঘটেছিলো বারাণসীর তীর্থক্ষেত্রে কিছুকাল আগে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের সময়। সেবারে এক বৈজ্ঞানিক ঋষির আবির্ভাব হয়। তাঁর সারা জীবনের সাধনা—প্রাণতত্ত্বের মূলানুসন্ধান। ভারতে প্রথম এসেছিলেন সস্ত্রীক—রুশের যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সারা অধিবেশনে সাড়া পড়ে গিয়েছিলো—সকলেরই ঔৎসুক্য এই বিশ্ব-বৈজ্ঞানিকের প্রাণতত্ত্বের বাণী শুনবার জন্যে। এই মহামানবের নাম এ. আই. ওপারিন। তাঁর বয়স তখন হবে তিয়াত্তর বৎসর। বেশ সুঠাম ও সৌম্যমূর্তি। জৈব রাসায়নিক শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও নিতান্ত অকিঞ্চনতা যেন একাধারে মিশ্রিত হ'য়েছে এই মহর্ষির মধ্যে।

পূর্বে এঁর লেখা ও রচনা আমার কিছু কিছু পড়া ছিলো। বেদান্তের প্রাণতত্ত্ব ও মধুবিদ্যার মধ্যে আদিত্য—মাহাত্ম্যের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছি বহুদিন। মনে করলাম প্রাণের মূলানুসন্ধানকারী বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ওপারিণের সাথে দেখা করলে কি রকম হয়? সাংবাদিক হিসাবে হয়তো কোন বিশেষ সংবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তিগত পরিচয়ে একটু অনুসন্ধিৎসু মনের তৃপ্তি হবে সেইটাই হলো বড় কথা। আমাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ঋষিদের প্রাণ সম্বন্ধে বহু গবেষণা আছে। ভারতীয় দর্শনে প্রাণের স্পন্দনের সৃষ্টি বলা হয়েছে মহত্তত্ত্ব থেকে। সূর্যের সাথে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হ'য়েছে—খাদ্য হ'তে প্রাণের সৃষ্টি। খাদ্যই প্রাণের মূলাধার। প্রাণই শক্তি—প্রাণই বায়ু—সম্বর্গ। বেদান্তে প্রাণের ব্যাখ্যা প্রচুর আছে। সূর্যের সাথে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে জল পান করার পর জলের সূক্ষ্মাংশই প্রাণ (ছাঃ ৬-৫-২, ৩; ৬-৭-১; ৭-১০-১)। বিশ্ব শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যখন প্রাণ শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন প্রাণ অর্থে হিরণ্যগর্ভ (প্রাণস্য প্রাণঃ)। প্রাণের আণবিক-বোধ মনে হয় বেদান্ত দর্শনে এক অভিনব পরিকল্পনা। প্রাণ—অণুর বিষয় চিন্তা করতে গেলে সৌর জগতকে মনে পড়ে যায়—প্রাণ অণুগুলি সূর্যের চারিপাশে যেন ঘিরে রয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণকেই কেন্দ্র ক'রে কাজ করতে থাকে (ছাঃ ১-২-৯)। সকল বস্তুর উৎস হোল প্রাণ আর প্রাণের উৎপত্তি খাদ্য হতে (ছাঃ ১-৮-৪)। প্রাণই ব্রহ্ম এবং প্রাণই আনন্দ (বৃহঃ ৪-৪-১৮; ৫-১২-১)। আদিত্যই ব্রহ্ম একথাও বলা হয়েছে উপনিষদে (ছাঃ ৩-১৯-১) এবং আদিত্যই প্রাণ (প্রঃ ১-১-৫)। আদিত্যকে বলা হয়েছে পিতরম্ কারণ আদিত্য হ'তে সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে। সূর্যকে সবিতা বলার কারণ হলো সবিতা হতেই সকল বস্তুর

সৃষ্টি (সবিতা—প্রসবিতৃত্বাৎ)।

এখন বিশ্ব-বৈজ্ঞানিকের মতে প্রাণের ব্যাখ্যা কি হ'তে পারে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাণসৃষ্টি সম্ভব কিনা এই সব নানা প্রশ্ন ও তার উত্তর জানবার বাসনা নিয়ে অধ্যাপক ওপারিনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জড়বাদী রুশ-বৈজ্ঞানিকের কাছে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই জানতে চেষ্টা করিনি। শুধু জানতে চেয়েছিলাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রাণ কাকে বলে—মৃত্যু কি এবং মৃত্যুকে জয় করা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্ভব কিনা? প্রাণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমাদের শাস্ত্রাদিতে কম কিছু নেই। জানবার আগ্রহ ছিলো মৃত্যু কি দেহের জীব-কোষগুলির বিনষ্টি? প্রাণের সূর্যরশ্মির সমন্বয়কারী শক্তির সঙ্গে "ফোটোসিন্থিসিসের" কি সম্বন্ধ?

নির্দিষ্টদিনে বেলা দু'টোর সময় আমার সহকর্মীকে নিয়ে বারাণসীর এক বিখ্যাত হোটেলে উপস্থিত হলাম ট্যাক্সিযোগে। দরজায় টোকা দিতে আবির্ভূত হলেন এক সৌম্য শান্ত মূর্তি—সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন শ্রীমতী ওপারিন। কারণ পরে বুঝলাম অধ্যাপক ওপারিন ইংরাজী জানেন না। দু'জনেই ভারতীয় প্রথানুযায়ী করজোড়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। অধ্যাপক ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন আমাদের বসাবার জন্য। বেয়ারাকে কোন আদেশ দিলেন না। চেয়ারগুলো স্বয়ংই টেনে টেনে নিয়ে এলেন এবং আমাদের ইঙ্গিতে বসতে বললেন। শ্রীমতী ওপারিন বসলেন মাঝখানে। আমি প্রশ্নপত্র হাতে দিতেই একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বৃদ্ধা স্মিতহাস্যে স্বামীর দিকে তাকালেন। অধ্যাপক ওপারিন জানতে চাইলেন না আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাপ কতটুকু এবং আমরা তাঁর প্রশ্নের উত্তর বুঝবো কি না? আমার অভিজ্ঞতা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক পণ্ডিতের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত।

মনে মনে ভয় ছিলো হয়তো কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাবো না। কারণ রুশীয় বৈজ্ঞানিকেরা বাইরের কোন জাতিকে ধরাছোঁয়া দিতে চান না। কিন্তু সেদিন দেখেছিলাম অধ্যাপক ওপারিন মোটেই রক্ষণশীল নন। আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন—বিশদভাবে শ্রীমতীর মাধ্যমে।

জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অধ্যাপক উত্তরে বলেন—"সকলের সম্বন্ধে আমার বলা সম্ভবও নয় এবং কিছু বলা উচিতও হবে না। তবে জৈব-রসায়ণবিদ্‌দের সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলতে পারি। জৈব রসায়ণশাস্ত্র এখন বিজ্ঞান জগতে নিয়ে এসেছে নূতন সত্যের বাণী। এই শাস্ত্রের অবদান কিছু অংশে কম নয় অন্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের তুলনায়—তবে অন্যান্য দেশে যেমন বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্রে, আমেরিকাতে, রুশে এমন কি জাপানেও যতটা কাজ হ'য়েছে ভারতে এখনও তা হয় নি। অতএব জৈব-বিজ্ঞানে (বায়োকেমিষ্ট্রিতে) এখনও আরও বেশী কাজ করার আছে। এখানে জৈববিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য বহু প্রয়োগশালা ও ক্লিনিক খোলার আবশ্যকতা রয়েছে। আপনাদের দেশ বড়, নানা জীবজন্তু ও উদ্ভিদের সাম্রাজ্য বলা যেতে পারে সুতরাং পরীক্ষার এখানে কোন অসুবিধা নেই। তবুও আপনাদের বৈজ্ঞানিকেরা অনেক কাজ ক'রেছেন ও করছেন"।

জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম প্রাণ শব্দের দ্বারা আপনি কি বোঝাতে চান? উত্তরে বললেন "প্রাণকে বুঝতে হ'লে প্রাণের উৎপত্তি ও গোড়ার কথা বুঝতে হবে। প্রাণ একটি জটিল

পরিস্থিতি। প্রাণ জড়বস্তুরই বাধ্যতামূলক পরিণতি।" মনে মনে চিন্তা করলাম ছান্দোগ্য উপনিষদে তো বলাই হয়েছে খাদ্য হ'তে প্রাণের উৎপত্তি। অধ্যাপক তাঁর—"লাইফ এ্যাণ্ড ইট্‌স্ অরিজিন নামক পুস্তকে "প্রোটোপ্লাজম্" ও "অঙ্গার" (কার্বন) সম্বন্ধে বিশদ-আলোচনা ক'রেছেন। মনে হলো প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদী দু'ধারার মধ্যে প্রাণশক্তির মূলে জড়বাদকে স্বীকার করা হ'য়েছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রাণের মূল—জড়কে নিয়ে প্রয়োগশালায় বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণের দ্বারা সত্যকে খুঁজতে গিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন—প্রাণ জড়বস্তুর বাধ্যতামূলক পরিণতি—আর আমাদের দেশে প্রাণে জড়ত্ব স্বীকার করে নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না করে প্রাণকে কেন্দ্র করে সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর চিন্তায় ঋষিরা রত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত ব'লেছেন—প্রাণই ব্রহ্ম (বৃহঃ ৪-৫-১৮ ; ৫-১২-১)।

অধ্যাপক ওপারিন বললেন "বিশ্বে জৈব-রাসায়নিকেরা প্রাণ সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণায় রত হয়েছেন। প্রাণের কত কি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি করাও সম্ভবত হতে পারে ; আবার হয়তো সকল প্রচেষ্টা বৃথাও হতে পারে, কিছুই বলা যায় না তবে খুব কাজ করা প্রয়োজন আছে। যদি উপযুক্ত পরিস্থিতির সমন্বয় করা যায় প্রাণ সৃষ্টি করা হয়তো অসম্ভব হবে না। প্রাণের রহস্যের সাথে সূর্যের সমন্বয়কারী শক্তির অর্থাৎ 'ফোটোসিনির্থাসিসের' বিশেষ সম্বন্ধ।" মনে মনে ভাবলাম ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে উপনিষদে প্রাণ সৃষ্টির উপর সূর্যের কিভাবে প্রভাব পড়ছে তা প্রয়োগশালায় প্রমাণ ক'রে দেখান হয়নি, আবার অন্যদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বৈজ্ঞানিকেরা আংশিকভাবে প্রাণের ওপর সূর্যের প্রভাব প্রমাণ করেছেন প্রয়োগশালায় কিন্তু পূর্ণ প্রভাব কতখানি এবং তার পরিমাপ করতে এখনও পারেনান তবে হয়তো পরে সম্ভব হতে পারে।

জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মৃত্যু। বেশ মনে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। উত্তরে অধ্যাপক ওপারিন বলেন "মৃত্যু ? মৃত্যু জীবদেহে নির্মাণ প্রণালীর (মেটাবলিজম) বিনাশ যার ফলে জীবদেহে সুসংবদ্ধ গঠনগুলি আবাদা হয়ে যায় (ডিস্‌ইনটগ্রেশন অব অর্গানিজ্‌মস্) এই বিনষ্টি অরূপান্তরশীলও হতে পারে (নন্-কনভার্শেনেব্‌ল ডেষ্ট্রকশন অব মেটাবলিজম্)।

চিকিৎসাশাস্ত্র মতে শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার নাম হলো মৃত্যু (ফেলিয়োর অব কার্ডিয়ো রেসপিরেটারী সিস্‌টেম্)। মনে ভাবলাম তাই যদি হয় সমাধিবান পুরুষের সমাধি অবস্থাকে কি বলা হবে—তিনি জীবিত না মৃত ? কারণ সমাধি অবস্থাতে শ্বাস বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া কোনটাই থাকে না। এখনও যোগযুক্ত মহাপুরুষেরা এমনকি কোন কোন যৌগিক ব্যায়াম শিক্ষক ও শ্বাস ও হৃদযন্ত্র বন্ধ করার ক্রিয়া দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে মৃত্যুর ব্যাখ্যা যথাযথ নাও হতে পারে।

কোন কোন জীব বৈজ্ঞানিকের মতে জীবদেহে কোষগুলির ছত্রভঙ্গ হওয়ার নামই মৃত্যু (ডিস্‌ইনিউগ্রেশন অব সেলস্)। এও যথার্থ মৃত্যুর ব্যাখ্যা বলে মনে হয় না তাহলে আজ বৈজ্ঞানিক যুগে রোগীর দেহে কোন একটা অঙ্গ অকেজো হয়ে গেলে সেটিকে বাদ দিয়ে, মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদ

করে এনে পুনরোপণ করা সম্ভব হতো না।

উপনিষদশাস্ত্রে মৃত্যু শব্দ সাধারণতঃ দুই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আত্মা বা ব্রহ্মোপলব্ধির পথ হতে ভ্রষ্ট হওয়ার নামও মৃত্যু অর্থাৎ যে কার্যাবলী মানুষকে অমৃতত্বের দিকে নিয়ে যায় না, সেগুলি সবই মৃত্যুর কারণ বা মৃত্যুই। আর এক ব্যাখ্যা প্রাণবায়ু নিঃসরণ। (উৎক্রান্তি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৃত্যু-বর্ণনায় (৪-৩-৩৫) শঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে মৃত্যুর কারণ অনিশ্চিত (অনিয়তানি) এবং অসংখ্য (অসংখ্যাতানি)। মৃত্যুর উদাহরণে বলা হয়েছে যখন, কোন দেহীর দেহ জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ক্ষীণ ও শীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন যেভাবে একটি পাকা আম, বা ডুমুর বা অশ্বত্থগাছের ফল বৃন্ত হতে খসে পড়ে। ঠিক সেইভাবেই প্রাণ বৃন্তচ্যুত হয় এবং পুরুষ যেভাবে দেহ ধারণ ক'রেছিলো মৃত্যুর পর সেইভাবেই আবার চলতে থাকে প্রাণের বিকাশের বা পূর্ণতার জন্যে (বৃহঃ ৪-৩-৩৬)। উপনিষদের মৃত্যু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হতে বহুদূরে। বস্তুতঃ মৃত্যু দু'ধারার মধ্যে এক। উপনিষদের ব্যাখ্যা তুলনাত্মক, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মৃত্যু-প্রণালীর সাথে তার সম্বন্ধ।

জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম মৃত্যুকে জয় করা সম্ভব কিনা? এই প্রশ্নের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বা আত্মজ্ঞান লাভ করার পরঅমরত্ব লাভের কোন কথা ছিলো না। সোজা ও সাদা প্রশ্ন যার ভাব ও ভাষা হলো আমাদের এই দেহ চিরস্থায়ী হবে কি না? অধ্যাপক উত্তরে বলেন "অনুকূল পরিস্থিতি হলে হয়তো হবে। তবে মৃত্যুই জীবনের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক শেষ পরিণতি।

কাজ শেষ ক'রে, ধন্যবাদ জানিয়ে যখন উঠলাম, অধ্যাপক উঠে দাঁড়ালেন ; শ্রীমতীও উঠলেন একসাথে। ভারতীয় প্রথা অনুসারে দু'জনেই হাতজোড় ক'রে নমস্কার জানালেন, পরিতৃপ্ত হয়েছি আপনার সাথে পরিচয় ক'রে।

হোটেল পরিত্যাগ ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে ভাবতে লাগলাম—ইনিই বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক ওপারিন—এতো অমায়িক? শুধু মনে হচ্ছিলো কিভাবে তিনি নিজেই চেয়ারগুলো এনে আমাদের বসতে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

সৈদ খাঁ (দুর্গেঃ ১।৩) ॥

মানসিংহ বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তারূপে এসে সৈদ খাঁকে বঙ্গদেশে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন।

সৈয়দ আমির হোসেন (চন্দ্রঃ ৬.৩) ॥

উদয়নালার শিবিরে ইনি কুল্‌সমকে নবাবের কাছে আনায় সাহায্য করেছিলেন।

সৈয়দ হাসান আলি (রাজঃ ৩.৮) ॥

রূপনগরের রাজকন্যাকে আনতে যাবার সময় তিনি ছিলেন মোগল সেনাপতি। যেভাবে তিনি দরিয়ার নাচে ভুলে তাকে নিজ অশ্বারোহী সেনামধ্যে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁকে স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন বলতে বাধা নেই।

সোনা (কৃঃ উঃ ২।৬) ॥

প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের ভৃত্য। অর্থলোভী

হরদেব ঘোষাল (বিষঃ ৫ম পরিঃ) ॥

নগেন্দ্রের বন্ধু। তিনি বিদেশে থাকেন। উপন্যাসের এ চরিত্রটির উপস্থিতি নেই। এঁর সংগে কেবল নগেন্দ্রের পত্রবিনিময় হয়েছে। এই পত্রের দ্বারা নগেন্দ্রর মনের খবর পাওয়া যায়। হরদেব ঘোষালের পত্র থেকে বোঝা যায়, তিনি বিজ্ঞ এবং লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ। নগেন্দ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসাও প্রবল।

হরনাথ বসু (রজনী ১।৪) ॥

রামসদয়বাবুর বাড়ীর সরকার। এঁরই ছেলের সংগে প্রথমে রজনীর বিয়ের কথা হয়।

হরবল্লভ (দেঃ কৌঃ ১।২) ॥

ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভকে চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। এই অর্থপিশাচ, স্বার্থান্ধ, হীনমন্য চরিত্রটি আমাদের আশেপাশে একেবারে দুর্লভ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও নাকি তাঁরও পরিচিত কোন ব্যক্তির চরিত্র হরবল্লভে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন ব'লে শোনা যায়।

হরবল্লভ হৃদয়হীন। লোকের কথায় প্রফুল্ল ও তার বিধবা মাকে বাগদী অপবাদ দিতে তাঁর

বাধে না। তবে এটুকু সুখের বিষয় যে—'প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া যে হরবল্লভবাবু তাঁহাকে ঘৃণা করতেন তাহা নহে।'

হরবল্লভ টাকার লোভেই সাগরের সংগে ব্রজেশ্বরের বিয়ে দিয়েছিলেন। আবার টাকার প্রয়োজনেই নীতিমান বিসর্জন দিয়ে তিনি দেবীচৌধুরাণীর অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। সেই অর্থ ফেরৎ যাতে না দিতে হয় তার জন্য যখন তিনি সাহেবের কাছে গোয়েন্দাগিরি করতে গেলেন, তখনও পারিতোষিকের আশা ছাড়েননি। প্রফুল্লর সংগে ব্রজেশ্বরের পুনর্বিবাহে হরবল্লভ পুত্রকে নির্দেশ দান করেন—"তা তোমায় আর বলিব কি, তুমি ছেলেমানুষ নও—কুল, শীল, জাতি, মর্যাদা, সব আপনি দেখেশুনে বিবাহ করবে। (পরে একটু আওয়াজ খাটো করিয়া বলিতে লাগিলেন) আর আমাদের যেটা ন্যায্য পাওনা গণ্ডা, তাও ত জান?" (৩ ১০)।

হরবল্লভ বাইরে আস্ফালন করলেও আসলে তিনি অত্যন্ত কাপুরুষ। দেবীকে ধরিয়ে দেবার সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলেন। প্রাণের মায়া তাঁরা অত্যন্ত বেশি। তাই নৌকাডুবির ভয়ে নৌকাতে উঠতে চাননি। ভাগ্যক্রমে দেবীর নৌকায় উঠে তাঁর বিপদের অন্ত নেই। শূলে যাবার কথা শুনে "হরবল্লভ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।"

হরবল্লভের সহস্র দোষের মধ্যে একমাত্র গুণ ও দুর্বলতা—পুত্রস্নেহ। ব্রজেশ্বরের উপর তিনি কড়া শাসন চালালেও তার প্রতি স্নেহ তাঁর অসীম। প্রফুল্লর মৃত্যুশোকে মৃতপ্রায় পুত্রের কাছে "হরবল্লভ প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'এবার দেবতা ব্রজেশ্বরকে বাঁচাইলেন, আর আমি তার মন না বুঝিয়া কোন কাজ করিব না।" নিশি হরবল্লভের এই দুর্বল স্থানটুকুর সন্ধান জানে। তাই সে চলেছে—"ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতে পার? হরবল্লভ গর্জিয়া উঠিল। বলিল, "তোমাদের যা ইচ্ছা, তাহা কর। আমি তা পারব না।" (৩.৮) কাপুরুষ হরবল্লভের এই সাহসের উৎস পুত্রের প্রতি স্নেহ। ব্রজেশ্বরের নববিবাহিতা স্ত্রী প্রফুল্ল—একথা জেনে হরবল্লভ আর একবার স্বমূর্তি ধারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গিন্নী পুত্রের দোহাই দিয়ে কর্তাকে শান্ত করলেন।

প্রফুল্লের গুণে অবশেষে এই হরবল্লভ বশীভূত হয়েছিলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

হরমোহন দত্ত (ইন্দিরা ১ম পরিঃ) ॥ ইন্দিরার বড়মানুষ পিতা। গরীব স্বামীর কাছে কন্যাকে না পাঠাতে তাঁর অর্থের অহংকারই প্রকাশিত হয়েছে। আবার ইন্দিরার শ্বশুরের অবস্থা ফিরলে তিনি যেভাবে ব্যঙ্গ করেন, তাতেও তাঁর চরিত্রের খারাপ দিকটিই প্রকাশিত।

হরমণি (বিষঃ ৩৪ পরিঃ) ॥

হরমণি ব্রহ্মচারীর শিষ্যা। এঁর গৃহেই সূর্যমুখীকে উদ্ধার করে এনে ব্রহ্মচারী রেখেছিলেন। চরিত্রটির বিশেষ পরিচয় নেই। তবে হরমণির পরোপকার প্রবৃত্তি ও সহৃদয়তা, সূর্যমুখীর সেবা পাঠককে মুগ্ধ করে। হরমণির নিজের গৃহে পুড়ে মরার ঘটনাটি নগেন্দ্রকে বিভ্রান্ত করেছিল।

হরমণি ঠাকুরাণী (পৃঃ উঃ ১।২১) ॥ জমিদার বাড়ীর একজন পাচিকা।

হরলাল (পৃঃ উঃ ১।১) ॥

হরলালকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর খলচরিত্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তার মনটা কুটীল। তাই পিতার ন্যায্য উইলে সে সন্তুষ্ট হয় না। পিতাকে সে কুপরামর্শ দিয়ে উইল বদল করতে চায়।

হরলাল বাল্যকাল থেকেই দুর্দান্ত ও দুর্বিনীত। বাল্যকালে সে নাকি গুরুমশায়ের গোঁফ পুড়িয়ে দিয়েছিল। পিতার সংগে তর্ক করতেও সে দ্বিধা করে না। অবশেষে তাকে গৃহ ত্যাগ করতে হয়। তখন সে পিতাকে বিধবাবিবাহ করবার ভয় দেখায়। কিন্তু তাতেও সফল না হয়ে উইল জাল করবার চেষ্টা করে। উইল জালের পদ্ধতি, হাতসাফাই এবং দুষ্টবুদ্ধিতে সে পটু। ব্রহ্মানন্দের কাছে কাজ আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে সে রোহিণীকে অর্থপ্রলোভন দেখিয়ে উইল জালের কাজে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু তাতেও সফল না হয়ে রোহিণীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার আশ্বাস দিয়েছে। একজন নারীর সর্বনাশ করতেও তার বাধে না। কার্যসিদ্ধির পর রোহিণীকে বিবাহ করতে সে যেভাবে অস্বীকার করেছে তাতে তার চরিত্রটি আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উইল জালের প্রাথমিক প্রয়োজনে, উপন্যাসমধ্যে হরলালের উপস্থিতি। তারপর তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। এটাকে ক্রটিই বলতে হবে। উপন্যাসের শেষে যখন দেখি অন্য একজন এসে কৃষ্ণকান্তের সম্পত্তি ভোগ করছে, তখন পাঠক স্বভাবতঃই অনুসন্ধান করতে চায়—হরলাল, তার স্ত্রী ও শিশুপুত্র কোথায় গেল ?

হরি (কৃঃ উঃ ১।৪)।। কৃষ্ণকান্তের খানসামা। রাত্রে 'তাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত i'

হরিদাসী বৈষ্ণবী (বিষঃ ৯ম পরিঃ) ॥ এই ছদ্ম নামে স্ত্রীলোক সেজে দেবেন্দ্র নগেন্দ্রের অন্দর মহলে কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাতায়াত করত।

হরেকৃষ্ণ দাস (রজনী ২।২) ॥

রজনীর পিতা। গৃহিণীর মৃত্যু হওয়ায় এবং নিজেও রুগ্ন থাকায় সে তার শ্যালীপতিকে কন্যাটি প্রতিপালন করতে দেয়। কিন্তু—'তাহার কন্যাটির কতকগুলিন স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্যালিপতিকে দেয় নাই।'

হলায়ুধ (মৃণাঃ ২।১) ॥

খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইনি লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ছিলেন বলে কথিত আছে। ইনি 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

হারাণী (ইন্দিরা ৭ম পরিচ্ছেদ) ॥

শুভাষিণীর বাড়ীর ঝি। 'ইন্দিরা' উপন্যাসে এই ঝি-টি বিশিষ্টতামণ্ডিত হয়েছে। তারও

ইন্দিরার মত হাসির রোগ। কিন্তু সাধারণ ঝির মত তার স্বভাবচরিত্র খারাপ নয়। তাই ইন্দিরা যখন তাকে উপেন্দ্রবাবুর সংগে অভিসারের কাজে-সহায়তা করতে আহ্বান জানিয়েছিল, তখন সে দারুণ ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এমনকি টাকাও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তবে সে সুভাষিণীকে ভালবাসত। তাই সুভাষিণীর কথা শুনলাম। সে জানত সুভাষিণী অন্যায় কিছু বলবে না। অবশ্য সে ইন্দিরাকেও ভালবাসত। ইন্দিরার স্বামীর সংগে মিলনের খবর পেয়ে সেও খুব আনন্দিত হয়েছে।

হিরন্ময়ী (যুগঃ ১ম পরিঃ)॥

'যুগলাঙ্গুরীয়' আখ্যানের নায়িকা হিরন্ময়ী প্রেমের মহিমায় সমুজ্জ্বল। তিনি প্রাপ্তযৌবনা। বাল্যসখা পুরন্দরকে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু সেই প্রেম সংযত। তাই পিতার নিষেধকে বহন করে হিরন্ময়ী পুরন্দরকে বিদায় দিয়েছেন। কিন্তু পুরন্দরের স্মৃতি তিনি চিরদিন বহন করেছেন। তবে পুরন্দরের সংগে বিবাহ না হওয়ায় হিরন্ময়ীর মনকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে—একটি ছিন্ন চিঠির অংশ দেখিয়ে, যাতে তাঁদের বিবাহের অশুভ ইংগিত আছে। হিরন্ময়ী যে পিতৃআজ্ঞা অমান্য করেননি তার প্রমাণ বহুস্থানে আছে। পিতার আদেশেই তিনি চোখবাঁধা অবস্থায় বিবাহ করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর হিরন্ময়ী যেভাবে পিতৃঋণ শোধ করেছেন, তাতে তাঁর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের সময়েও অন্যের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ না করা তাঁর আভিজাত্যের পরিচায়ক।

হিরন্ময়ী যখন জানলেন রাজা মদনদেব তাঁর স্বামী তখন তিনি দুঃখিতই হলেন। কিন্তু পিতৃদেবের দেওয়া বিবাহকে অমান্য করতে পারলেন না। অবশেষে মনের মধ্যে যখন পুরন্দর ছাড়া আর কারো স্মৃতি খুঁজে পেলেন না, তখন বিদ্রোহ করলেন। হিরন্ময়ীর প্রেমের পরীক্ষা এখানেই। তাঁর প্রেমের কাছে রাজমহিষীর আসনও তুচ্ছ। এর পুরস্কার তিনি পেলেন প্রেমিক এবং স্বামী পুরন্দরের সংগে মিলনে।

হীরা (বিষঃ ৭ম পরিঃ)॥

ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী একটি বিখ্যাত চরিত্র। বঙ্কিমের হীরাও কম যায় না। হীরা মলিনীর মত সেও দেবেন্দ্রের কাছ থেকে কুন্দের প্রতি প্রেমনিবেদনে দূতী হবার কাজ পেয়েছিল। কিন্তু সেটাই হল তার কাল। সে নিজে ভালবেসে ফেলল দেবেন্দ্রকে।

হীরা দাসী কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়ে। সে বাল্যবিধবা। সে গরীব। তার এই ভাগ্যবিড়ম্বনা, তার চরিত্রটিকে স্বভাবকুটীল করে তুলেছেন। সূর্যমুখীর কর্তৃত্বে সে ঈর্ষা প্রকাশ করে। সূর্যমুখীকে সে জব্দ করতে চায়! তার উপায় হিসাবে সে সরলা কুন্দকে ব্যবহার করে। কুন্দকে গোপনে লুকিয়ে রেখে, চতুরতার সংগে নগেন্দ্র সূর্যমুখীর বিরোধ বাধায়। হীরার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—কুন্দ দত্তবাড়ীর গৃহিণী হলে বোকা কুন্দকে হাত ক'রে তার বেশ কিছু উপায় হবে।

হীরা বোকামি ক'রে বসল দেবেন্দ্রকে প্রাণ সমর্পণ ক'রে। দেবেন্দ্রের কাছ থেকে কুন্দকে সরাবার জন্যও নগেন্দ্র-কুন্দের মিলন ঘটান তার পক্ষে দরকার হয়ে পড়েছিল।

হাওড়ার প্রাচীন ভাস্কর্য্য (ও চিত্রাদি)

স্থাপত্য ও মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ে বহু প্রাচীন গ্রন্থাদি ভারতে লুপ্ত হয়েছে। স্থাপত্যবিষয়ে ১টি বিখ্যাত গ্রন্থ ভোজ রচিত (—১২শ শতাব্দী) 'সমরাঙ্গন সূত্রধার :'। এতে স্থাপত্যের প্রসঙ্গে এবং সম্ভবতঃ এর গৌণরূপে ভাস্কর্ষ ও চিত্রের সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে। মূর্তি সম্বন্ধে বরাহ-কৃত (—৬ষ্ঠ শতক) বৃহৎ সংহিতা ও পরবর্তী বহু হিন্দু ও বৌদ্ধগ্রন্থে বহু বর্ণনা আছে। ভাঃ শব্দের অর্থ—জ্যোতিঃ। বিশেষ জ্যোতি বা শোভা সৃষ্টি করে বলেই বোধ হয় ভাস্কর ও তৎকৃতি ভাস্কর্য্য বলে অভিহিত।

ভাস্কর্য্য বললে সাধারণতঃ প্রস্তর বা ধাতুর মূর্তি, ইষ্টকমূর্তি, ও দারুমূর্তির কথা আমরা বুঝি। ব্যাপক অর্থে নৌশিল্প প্রভৃতিও ভাস্কর্যের অধীনে ; অথবা ভাস্কর্ষ শিল্পের অধীনে।

মহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতিতে ভাস্কর্ষ চিহ্ন আছে। পাথর-খোদাই কাজ অন্ততঃ মৌর্য অশোকের কাল হতে চলছে। (১) মহাস্থানগড়ে (বগুড়ায়) প্রাপ্ত পাথরের প্ল্যাক্ বা চক্র শুঙ্গকালের। (২) দু-আড়াই হাজার বছর পূর্বের মাটির বা পোড়ামাটির পাত্র বা সীলমোহর তিলদহ প্রভৃতি (মেদিনীপুর) ও বেড়াচাঁপা (২৪ পঃ) প্রভৃতি হতে বার হয়েছে। (৩) কারও মতে ঐরূপ পুরাতন ও 'নদার্ণ-ব্ল্যাক্-পটারি'র অনুরূপ পাত্রাংশ হাওড়ার বেতড় অঞ্চল হতে পাওয়া গেছে। (৪) দিনাজপুরের পাথরের গরুড়স্তম্ভ গুপ্তযুগের। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের ভাস্কর্যের গুপ্তকাল বা তৎপূর্বের মথুরা প্রভৃতি স্থানের ভাস্কর্যের প্রভাব পড়েছিল, তা অনেকে বলেন। উত্তরবঙ্গে তাম্রপট্ট অন্ততঃ গুপ্তযুগ হতে পাওয়া যাচ্ছে। (৫) মুদ্রার দিক দিয়ে বলতে গেলে বর্দ্ধমানে সুপ্রাচীন 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি'তে বা নিকটে কণিষ্কের মুদ্রা ও কলিকাতার বেহালা প্রভৃতি অঞ্চল হতে স্বর্ণাদিনির্মিত ও গুপ্তযুগের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রঞ্জ-ভাস্কর্ষ বঙ্গে বোধ হয় তত পুরাতন নয়। (৬) পাহাড়পুর (রাজসাহী) মন্দিরে ৫ম-১১শ শতকের হিন্দু-বৌদ্ধ জৈন ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। পালযুগের প্রথমভাগে ৯মশতকে বরেন্দ্রের ভাস্করদ্বয় তথা চিত্রশিল্পী ধীমান ও পুত্র বীতপাল বহু মূর্তি নির্মাণে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ বিহারসংক্রান্ত ভাস্কর্যে, নূতন বা বিশিষ্ট ধারায় প্রবর্তন করে খ্যাতিলাভ করেন।

(১) হাওড়ায় বৈঁচিগ্রামে (শ্যামপুর থানায়) মাঠে খালের ধারে একটা দণ্ডায়মান প্রায় ২ হাত উচ্চ প্রস্তরমূর্তি আছে। স্থানীয় লোকেরা একে দক্ষিণদ্বার বা দক্ষিণরায় বলে ; মূর্তির বাহনরূপে বাঘ বা পশু নেই, দুই হাতের একহাতে ছোরা (বা অসি ?), প্রাচীন যক্ষমূর্তির সঙ্গে যেন সাদৃশ্য আছে। এটী কি পালযুগ বা তৎপূর্বে হাওড়ায় নির্মিত হয়েছিল—এই প্রশ্ন জাগে। (২) এর অদূরে বাছরি, খাদুরি প্রভৃতি গ্রাম। এই সকল অঞ্চলে ২।৩ হাত বা ৪।৫ হাত নিয়ে অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, পাথরের বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতি বার হয়েছে। প্রাচীন বাগদীরাজা বা

জেলে রাজার কাহিনী, কারও মতে বা ভাঙড় শনি রাজার কাহিনী, তাম্রলিপ্ত অধিপতিরক্রোধে এই রাজার রাজ্যধ্বংসের কাহিনী,—এই দিকের লোকের মুখে শোনা যায়। কোন পণ্ডিতের ধারণা যে এই অঞ্চলে এগুলি পালযুগের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এ সবের শিল্পীরা স্থানীয় হওয়াই সম্ভব। (৩) উলুবেড়িয়া থানায় জগন্নাথপুর গ্রাম আছে, এর পূর্বনাম নাকি মীরজাপুর বা সাতমহল। এখানে শ্রীকানাই মিস্ত্রীদের পুকুর হতে (আন্দাজ ৪০।৫০ বৎসর পূর্বে) কিছু পুরাবস্তু আহরিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২টী পাথরের প্যানেল বা চতুষ্কোণ খণ্ড এঁদের নিকটে আছে। এদের প্রত্যেকটার আয়তন আন্দাজ ৩´× ১/২'। একটীতে ২টী সারি আছে বোধ হয়, ফুলের মত ও শঙ্খ—বা সর্প আকৃতির মত অলঙ্করণ রয়েছে ; অপর প্যানেলের ডানদিকে ৩ বা ৪ মাথার মূর্তি ও পাশে বানরের মত (বোধহয় প্রস্তরহস্তে ধাবমান) মূর্তি রয়েছে। এগুলি অন্ততঃ কয়েকশত বৎসরের পুরাতন হওয়া বিচিত্র নয়। মীরপুর নামটা সত্য হলে মীর কথার সঙ্গে সেনানায়ক মীর হবিব বা মীর কাশিম বা ঐ ধরণের নামের সঙ্গে যোগ থাকতে পারে।

হাওড়ার বহু মন্দিরে বিশেষতঃ শিবমন্দিরে পোড়ামাটীর ভাস্কর্য দেখা যায়। পৌরাণিক কাহিনী বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীই প্রধানতঃ মন্দিরগাত্রে রূপায়িত হয়েছে। স্থূলতঃ দু-তিন শত বৎসর পূর্বের মন্দিরে এরূপ বহু ভাস্কর্য আছে। (৪) আমতায় মেলাইচণ্ডী মন্দিরে লিপির ব্যাখ্যায় (১০৫৬ বঙ্গাব্দের সংস্কৃত ; নির্মিত ?) ভাস্কর্যের নিদর্শন অল্প, চণ্ডীমূর্তিটা আদি হতে অকৃত্রিম কিনা জানি না। (৫) সুলতানপুরে শিবমন্দিরে (শ্যামপুর থানায় ; গাত্রস্থ বিবিধ লিপিমতে অন্ততঃ ২।৩ শত বৎসর পূর্বের), (৬) ধনা ও গুমাডাঙ্গীর বিরাট শিবমন্দিরে (দুইই জগৎবল্লভপুর থানায়, ১ম টীতে লিপিতে স্থাপনাকালে আছে, ২য় টীতে ঐরূপ লিপি ছিল ২০০ বৎসর পূর্বের) বহু পোড়ামাটীর ভাস্কর্য আছে। (৭) এইরূপ মাকড়চণ্ডী মন্দির ও অন্যান্য বহু মন্দিরে নানাবিধ ভাস্কর্য অল্পবিস্তর আছে। এই জেলায় বহু গৃহ, মসজিদ প্রভৃতিতেও নানা শিল্প আছে কিন্তু কম বেশী ২০০ বৎসরের এরূপ আছে জানি না। পোড়া মাটীর মূর্তিগুলি প্রায়ই জীবন্ত ও স্বাভাবিক বোধ হয়। মূর্তির সংখ্যাধিক্য ও একই প্রকারের বহু মূর্তি দেখে মনে হয় যে বহু মূর্তি 'ছাঁচে' তৈরী হত। (৮) বরদাবাড় গ্রামে (শ্যামপুর থানায়) 'গুড়ে' উপাধিধারীদের ১টী দেবালয় ও 'চাউলে' উপাধিধারীদের ১টী দেবালয় আছে। ২টী দেবালয়েরই সম্মুখভাগে ও পার্শ্বভাগে ১ জোড়া করে কাষ্ঠনির্মিত কপাট আছে। চৌকাঠসহ কপাটের আয়তন স্থূলতঃ ৪´×৩´। প্রত্যিটী কপাটে কয়েক সারি কাঠে খোদাই মূর্তি আছে। সম্মুখের দ্বারগুলিই বোধ হয় ভাস্কর্যে সমৃদ্ধতর। কোন একক শিল্পী একজোড়া বা তদধিক দ্বারে খোদাই করে থাকলে তা সুদীর্ঘকালের সার্থক পরিশ্রমের ফল বলতে হয়। এগুলির খোদাইকাল নিরূপণ সহজ নয়। স্থানীয় লোকেদের মতে বর্দ্ধমানের মহারাজের আমলে এই সব প্রতিষ্ঠিত বা কৃত। এ বিষয়ে দলিলপত্র হতে হয়ত কিছু জানা সম্ভব। তবে কোন কোন দারুমূর্তিতে মুসলমানি পোষাক বা টুপির ঢং দেখে মনে হয় যে মুসলমান যুগের প্রভাব আছে।

সোনা, রূপা, তামা, ব্রঞ্জ প্রভৃতির ভাস্কর্যের নিদর্শন ২০০ বৎসর পূর্বের আছে কিনা জানি না, ভাস্কর্য তথা তার আত্মীয় বা মাতৃস্থানীয় কারুশিল্পের যে কত শাখা এবং তার কি উল্লেখযোগ্য

প্রাচীন নিদর্শন হাওড়ায় রয়েছে তা বলা সহজ নয়। যখন নানা ধরণের ভাস্কর্যাদি অন্ততঃ বহু শত বর্ষ ধরে রয়েছে তখন খোঁজ করলে আরও কিছু শিল্পের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মালাকার, কর্মকার, কুম্ভকার, প্রভৃতি উপাধিগুলি বংশগত পেশা হতেই সৃষ্ট ; এদের বংশ ও উপাধির ইতিহাস সংগ্রহ করলে কতদিন ধরে বিবিধ ভাস্কর্য বা কারুশিল্প চলছে তার আভাস পাওয়া যাবে। শোলা হতে দেবতার সজ্জা বা শিশু প্রভৃতির আনন্দের বা প্রয়োজনের জন্য বিবিধ বস্তু তৈয়ার হয়। একে বিশেষ করে কামারের বা কুমারের কাজকে হয়ত ভাস্কর্য বলে ধরা হয় না কিন্তু এরূপ কর্মীদের স্থূলতঃ ভাস্কর বললে বোধ হয় খুব দোষের হবে না ; অন্ততঃ এরা ভাস্করেরই ব্যবসার অনুরূপ কিছু করে। গজদন্তাদির অলঙ্কারকে কি ভাস্কর্য ও শিল্প দুইই বলা যায় না ?

ভারতের বিভিন্ন স্থানে, অন্ততঃ দুই/আড়াই হাজার বছর পূর্বের আঁকা রেখাচিত্র বা নানা বর্ণের চিত্র আছে। মধ্যপ্রদেশের সিঙ্গানপুরে, বিহারের লৌরিয়া নন্দনগড়ে আদিম চিত্রশিল্প রয়েছে। গুহায়, পর্বতগাত্রে, পুঁথির পৃষ্ঠায়, অভিনয়াদির জন্য চিত্রিত পটে ও নানাভাবে চিত্রকলা ছড়িয়ে আছে। ষোড়শ শতকে লাসা তারানাথ ত্রিবিধ চিত্ররীতির কথা বলেছেন, তন্মধ্যে ১টী বঙ্গীয় বা বরেন্দ্রের রীতি। একটি একাদশ বা দ্বাদশ শতকের পুঁথিতে (এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত ; বাঙ্গালীর আঁকা কিনা জানি না), কলিকাতা প্রভৃতি স্থলে বিভিন্ন যাদুঘর বা চিত্রশালায় রক্ষিতপটে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে নানা চিত্র রয়েছে। দেবদেবীর চালচিত্রে রথে ও পূজাপার্বণে ও ব্রতাদি উপলক্ষে, নানাভাবে বিবিধ চিত্র অঙ্কিত হয়। মৃন্ময়াদি মূর্তিতেও চক্ষু প্রভৃতি তুলিদ্বারা অঙ্কিত হয়। নারিটের (আমতা থানা) ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুঁথিগুলির একটীতে (সম্ভবতঃ জ্যোতিষ বিষয়ে, আমার নিকটে রক্ষিত) নরমূর্তির চিত্র আছে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে উলুবেড়িয়ার পাশে গঙ্গা হতে দূরে বাণীপুর গ্রামে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু মহাশয়ের জন্ম হয়। এঁর আঁকা এক মানচিত্রে হাওড়ার ঝোড়হাট (বাণীপুর ও মহিষাড়ী অর্থাৎ মৌড়ীগ্রামের মধ্যে) গ্রাম দেখান হয়েছে। এখানে দুইশতাধিক বর্ষ পূর্বে কবি হরিদেব শর্মা জন্মেন। এঁর ও অন্য কবিদের রচিত বহু মঙ্গলকাব্যে বাণিজ্য-উদ্দেশ্যে বণিকদের গাঙ্গেয় নদীপথ প্রভৃতি পার হওয়ার কথা আছে ও বেতড, বেতাই প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ফলে নৌশিল্প সম্বন্ধেও হাওড়ার অধিবাসীদের কিছু জ্ঞানও ছিল মনে করা চলে। ১ম শতকে লিখিত 'পেরিপ্লাস্' গ্রন্থে সমুদ্রপথ ও বাণিজ্যবস্তু প্রসঙ্গে 'গাঙ্গা-রিদই' বা বঙ্গের স্বর্ণমুদ্রা 'কল্তিস্' ও উৎকৃষ্ট মস্‌লিন বস্ত্রের বর্ণনা আছে। ফলে বস্ত্রশিল্প ও ধাতুশিল্পের সঙ্গে হাওড়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ থাকা অসম্ভব নয়। হাওড়ার প্রধান ভূ-খণ্ড বা অংশ কলিকাতার মতই অন্ততঃ হাজার দুই বছর পূর্বে জলের তলে ছিল না। এ সম্বন্ধে আলোচনা আশা করি এই প্রথম।

রামপ্রসাদ মজুমদার

স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান দৃষ্টি ॥ ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য : আট টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাকাশের দুজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ। বিবেকানন্দের মত অভেদানন্দও ছিলেন পরমহংসদেবের পরম প্রিয়পাত্র। তিনি কালীপ্রসাদ অর্থাৎ অর্থাৎ অভেদানন্দকে একদিন বলেছিলেন—'নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, সেরকম তুইও পারবি।' পরমহংসদেবের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে কতখানি সত্য তা অভেদানন্দর পরবর্তী কর্মবহুল জীবন প্রমাণ করে দিয়েছে। বীরসিংহ স্বামী বিবেকানন্দের সার্থক গুরুভ্রাতা ও উত্তরসূরী যে স্বামী অভেদানন্দ এ কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত।

স্বামী বিবেকান্দের নাম বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের কাছে যেমন পরিচিত, স্বামী অভেদানন্দের পরিচিতি তেমন ব্যাপ্ত হতে পারে নি। এর কারণও আছে। অভেদানন্দের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছিল ভারতবর্ষের বাইরে পাশ্চাত্য দেশে। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি ছিলেন ইউরোপ—আমেরিকায়। আমেরিকার প্রতিটি মানুষ অভেদানন্দকে যেভাবে চেনে সেভাবে তাঁকে চেনার সুযোগ বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের মানুষের হয়নি। তাই বাংলা দেশ তথা ভারতের জনগণের কাছে স্বামী অভেদানন্দ আজও খুব সুপরিচিত নন।

বিখ্যাত ষড়দর্শনবিদ্ বেদান্তী ধনরাজ গিরি স্বামী অভেদানন্দ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'অভেদানন্দ অলৌকিকী প্রজ্ঞা'। সত্যিই তাই। অথচ এই প্রজ্ঞার যথার্থ মূল্যায়ন বাংলা দেশ 'বা ভারতবর্ষে' তেমনভাবে হয়নি। শতবর্ষ পূর্তি জন্মবার্ষিকীকে উপলক্ষ করেই স্বামী অভেদানন্দের মণীষা ও কর্মকৃতির পরিচয় উদ্ঘাটনের প্রয়াস সম্প্রতি বাংলা দেশে হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ অগ্রণী হয়ে স্বামী অভেদানন্দের কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের পরম পথচারী সাধক অভেদানন্দের বিস্তৃত পরিচয় জেনে অধুনা বাংলা দেশ শ্রদ্ধায় বিগলিত। এই শ্রদ্ধারই এক বিশিষ্ট অঞ্জলি ডঃ অমিয়কুমার মজুমদারের গ্রন্থ। 'স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-দৃষ্টি'। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি অভিনব ও মূল্যবান্।

বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞান-চেতনার যুগ। যুগোপযোগী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ডঃ অমিয়কুমার স্বামী অভেদানন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অনুসন্ধান করেছেন। অভেদানন্দ যে মনেপ্রাণে বিজ্ঞানী ছিলেন, ডঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে তা সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন।

ধর্মপ্রাণ অভেদানন্দ ছিলেন যথার্থই বিজ্ঞান প্রাণের অধিকারী। ধর্মশাস্ত্রকে, বিজ্ঞানের ক্ষুরধার

যুক্তি দিয়ে সর্বদাই বিচার করেছেন তিনি। বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি না থাকলে বর্তমান যুগে যে ধর্মের কোন মূল্যই নেই। একমাত্র বেদান্ত ধর্মকেই বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরে যাচাই করা যায়। আর এই বেদান্ত ধর্মেরই প্রবক্তারূপে বিশ্বের দরবারে স্বামী অভেদানন্দের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য স্থাপনে অভেদানন্দ বেদান্ত ধর্মকেই আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছেন এবং পাশ্চাত্যের জড়বাদী মনকে বশীভূত করেছেন। যথার্থ বিজ্ঞান মেজাজের অধিকারী না হলে তাঁর পক্ষে কখনই বেদান্তের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হত না এবং সেই ব্যাখ্যাতে বেদান্ত পাশ্চাত্য দেশে কখনই স্বীকৃতি পেত না।

অভেদানন্দের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ছিল যেমন সহজাত তেমনি ছিল অনুশীলন পুষ্ট। ডঃ অমিয় কুমার তাঁর গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে অভেদানন্দের জীবনী আলোচনা করে এই সহজাত ও বৈজ্ঞানিক মানসচিত্র অঙ্কিত করেছেন। পরে গ্রন্থের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনুশীলনপুষ্ট অভেদানন্দের বিজ্ঞান-দৃষ্টির আলোক কীভাবে বর্ষিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা করেছেন সুনিপুণভাবে। অভেদানন্দের গ্রন্থ থেকে বহুল উদ্ধৃতি এবং সেই সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতবাদ সবিশ্লেষণেও ডঃ মজুমদারের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তিনি এমন সহজ পরিচ্ছন্ন ভাষায় পাঠকের সামনে উত্থাপন করেছেন যে তাদ্বারা তাঁর পাণ্ডিত্যের ও উপলব্ধির গভীরতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না

ডঃ অমিয়কুমার তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন পর্বে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন তা বিভিন্নরূপ :

প্রথম পর্ব : স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা, দ্বিতীয় পর্ব : ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান ও স্বামী অভেদানন্দ, তৃতীয় পর্ব : অধ্যাত্ম বিদ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, চতুর্থ পর্ব : স্বামী অভেদানন্দ ও ক্রমবিবর্তনবাদ, পঞ্চম পর্ব : অভেদানন্দের দৃষ্টিতে পুনর্জন্মবাদ, ষষ্ঠপর্ব : অভেদানন্দের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ও আধুনিক বিজ্ঞান, সপ্তম পর্ব : আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও অভেদানন্দ, অষ্টমপর্ব : অতীত স্মৃতিচারণে অভেদানন্দ—ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, নবম পর্ব : বিজ্ঞান পরিবেক্ষণে স্বামী অভেদানন্দ—এক : জ্যোতির্বিজ্ঞান, দুই : অধ্যাত্ম চিকিৎসা, দশম পর্ব : বিজ্ঞানী সঙ্গমে স্বামী অভেদানন্দ, দ্বাদশ পর্ব : বৈজ্ঞানিক উপমা সংগ্রহে অভেদানন্দ ও ত্রয়োদশ পর্ব : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী।

এই গ্রন্থে আলোচিত পর্বগুলির মধ্যে চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্বের আলোচনা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। ক্রমবিবর্তনবাদ, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান প্রসঙ্গে অভেদানন্দের নিজস্ব বক্তব্য যে কতখানি বিজ্ঞানসম্মত ছিল, তা অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করে ডঃ অমিয়কুমার বিশেষ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। স্বয়ং বিজ্ঞানের ছাত্র বলেই তাঁর পক্ষে এই জাতীয় আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। বাংলা ভাষায় এবংবিধ গ্রন্থ রচনা করে ডঃ অমিয়কুমার বাঙালী পাঠকদের যে কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন এ বিশ্বাস অবশ্যই করা যায়। শেষে নামসূচী সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মজবুত বাঁধাই, ঝরঝরে ছাপা ও সুন্দরপ্রচ্ছদপট গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

অধীর দে

পূর্ব বাংলার লোক সংগীত॥ দিনেন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত। প্রকাশক: সান্যাল অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা-১২। দাম: আট টাকা।

'Folk-music is one of the things of this world which like freedom, health and prosperity, we value most when we are in danger of loosing it'.

Ralph Vaughan Williams

লোকসঙ্গীত সভ্যতার সমুদ্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। সভ্যতার জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন অথচ মানবচিত্তের নিগূঢ় জিজ্ঞাসায় বলিষ্ঠ পল্লীগীতিগুলি প্রাণ-প্রাচুর্যে আমাদের চিত্তের অনেক নিকটে।

বিশ্বজোড়া লোক সাহিত্য সংগ্রহ কর্ম চলিতেছে। আমাদের দেশ কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে যথেষ্ট সুচেতন নহে, বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আমাদের দেশে লোকসঙ্গীতের স্বরলিপি প্রস্তুত হইতেছে না। লোকসঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ হয়ত কিছু আছে। স্বরলিপির মাধ্যমে হয়ত এগুলি প্রকাশ সহজ সাধ্য নহে। কিন্তু সঙ্গীতগুলির কাঠামো করিয়া রাখা অসম্ভব নহে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন মূল স্বরলিপি করা সম্ভব সেরূপ আমাদের ধারণা লোকসঙ্গীতকেও সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করা যায়। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে এ জাতীয় মহৎ কর্ম সুষ্ঠভাবে নিষ্পন্ন করিবার শুভ প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই প্রসঙ্গে Bela Bartok, Hornbostel প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য। F. J. Child-এর বিরাট গ্রন্থ English and Scottish Popular Bollads-এর পূর্ণরূপ ও স্বররূপ, রেকর্ডরূপ করা সম্ভব হইয়াছে।

এ জাতীয় কর্মপ্রচেষ্টা আমাদের দেশে হওয়া প্রয়োজন। লোকসঙ্গীত, লোকগল্প, ছড়া প্রভৃতি এখন কিছু সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত সংরক্ষিত লোকসঙ্গীতগুলির স্বরলিপি যদি প্রকাশ করা যায় তাহা হইলে লোকসঙ্গীতের ক্রমোন্মেষ এবং নানা দিক হইতে সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। এই কার্যের দ্বারা সঙ্গীতের একটা বিরাটরূপ নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়।

সাম্প্রতিককালে লোকসঙ্গীতের স্বরলিপি তৈয়ারী করিবার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রসিদ্ধ লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের এবং বিখ্যাত লোকসঙ্গীতকার শ্রীযুক্ত সুরেন চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ইদানীংকালে প্রকাশিত শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরীর 'পূর্ববাংলার লোক সংগীত' পুস্তকটি আমাদের কিছু পরিমাণ আশার সঞ্চার করিয়াছে। শ্রীচৌধুরী লোকসংগীত গায়ক হিসাবে ইতিমধ্যেই একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছেন, আলোচ্য পুস্তকটি ৫০টি গানের স্বরলিপির সঙ্কলন। গানগুলি পূর্ববাংলার প্রচলিত গান। লেখক পুস্তকটি Academic form-এ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেজন্য বিশেষভাবে পুস্তকটি লোকসংগীত শিক্ষার্থীদের কাছে এক অমূল্য সংগ্রহ। এ জাতীয় পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন।

অসীমকুমার ঘোষ

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 June '69 (0'50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সপ্তদশ বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৭৬

তাড়াতাড়ি ডাকে দিন শিগ্‌গির পৌঁছবে
ডাকঘরগুলিতে একটি বড়-
ধরণের সমস্যা হলো-বন্ধ হওয়ার
সময়ে বেশী চিঠি ডাকে দেওয়া হয়।
এর ফলে চিঠি জমে যায়, দেরী হয়।
চিঠি তাড়াতাড়ি ডাকে দিলে শিগ্‌গির
পাঠানো হয় ও অবিলম্বে নির্দিষ্ট
স্থানে তা পৌঁছুতে পারে।
এখনই ডাকে দিন।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেন অপেক্ষা করে আছেন ?
ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরাজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

অবাঞ্ছিত সন্তান জন্মের ঝুঁকি না নিয়ে...
বিবাহিত জীবনের সমস্ত সুখ উপভোগ করুন।
আজকাল সব পুরুষই, জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে নিরাপদ ও সন্তোষ-
জনক উপায়টি কিনে নিতে পারেন, তা হলোঃ নিরোধ
পুরুষের জন্যে উৎকৃষ্ট ধরণের জন্মনিরোধক।
নিরোধ
পরিবার পরিকল্পনার জন্য
৩টির মূল্য ১৫ পয়সা
সরকারী সাহায্যে হ্রাস মূল্যে

সপ্তদশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

একটি মনে
রাখার মত
বিয়ের উপহার
usha
PRIMA

অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল অবিভক্ত বঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার পোনাবালিয়া গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু বৈদ্যপরিবারে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী। বাল্যকালে হেমচন্দ্র বরিশাল সহরে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠান হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় লর্ড কার্জনের ব্যবস্থায় বঙ্গভঙ্গের ফলে আসাম সহ পূর্ববঙ্গ একটি পৃথক প্রদেশ ছিল, হেমচন্দ্র এনট্রান্স পরীক্ষায় এই প্রদেশের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেমচন্দ্র অধ্যয়নার্থ কলিকাতায় আসিয়া জেনারেল এসেমব্লীজ্ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) প্রবিষ্ট হন। এই কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এই কলেজের ছাত্ররূপে তিনি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ডিগ্রী লাভ করেন। সকল বিষয়ের অনার্স ছাত্রদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় তিনি ঈশান ছাত্র-বৃত্তি (ঈশান স্কলারশিপ) লাভ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র ইতিহাস বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এম-এ ডিগ্রী অর্জন করেন। এই পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

গৌরবোজ্জল ছাত্রজীবনান্তে হেমচন্দ্র কলিকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক (লেক্‌চারার) পদে যোগদান করেন। অল্পকাল পরেই তিনি সরকারী শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি লাভ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তিন বৎসর কাল

এই কলেজে অধ্যাপনার পর তাঁহাকে চট্টগ্রাম কলেজে বদলী করা হয়। এই সময় হেমচন্দ্রের স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় তিনি সাতিশয় মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন, কলিকাতা হইতে দূরে বাস করাও তাঁহার মনোমত ছিল না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্ণধার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অবর অধ্যাপকের (লেক্‌চারার) পদ পাইয়া হেমচন্দ্র উচ্চবেতন যুক্ত সরকারী কলেজের অধ্যাপক পদত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯১৭ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হেমচন্দ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লেকচারার' রূপে কার্য করেন, ইহার মধ্যে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বৎসরকালের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রধানরূপে কার্য করিয়াছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধানাধ্যাপক (কারমাইকেল প্রফেসর) ডাঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের অবসর গ্রহণের পর হেমচন্দ্র তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৩৬ হইতে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ষোড়শবর্ষকাল হেমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হেমচন্দ্র এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করবেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীফীথ্‌ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন।

ভারত ইতিহাসের লুপ্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভাগগুলিকে আলোকিত করা হেমচন্দ্রের জীবনের অন্যতম কীর্তি। এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে সর্বপ্রথম রমেশচন্দ্র দত্ত এই চেষ্টায় ব্রতী হন কিন্তু অবসরের স্বল্পতা ও উপকরণের অভাবে তিনি এই কার্যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ইতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ্‌ (১৮৪৮-১৯২০) তাহার Early History of India (1904) গ্রন্থে কোন প্রকারে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহার পূর্ববর্তীকালের ইতিহাস রচনা করা কোনমতেই সম্ভব নহে বলিয়া তিনি এ বিষয়ে আর অগ্রসর হন নাই। এ যাবৎ কোন ঐতিহাসিক যে দিকে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই—সেই দুরূহ পথেই হেমচন্দ্র যাত্রা আরম্ভ করেন। বেদাদি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ, শিলালেখাদি প্রত্নবস্তু ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়া হেমচন্দ্র তাঁহার প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। পুস্তকটি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (১)। এই পুস্তকে মহাভারত নায়ক অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের রাজ্যভার গ্রহণের সময় হইতে মগধের গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তিমকাল পর্যন্ত মোটামুটি সার্দ্ধ সহস্রকালব্যাপী ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সময়ের ক্রমানুযায়ী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের মতে পরীক্ষিৎ খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। উপনিষদ বর্ণিত জনকের আবির্ভাব কাল হেমচন্দ্র কর্তৃক খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে নির্নীত হয়, এই জনক হেমচন্দ্রের মতে সীতার পিতারূপে বর্ণিত জনক নহেন। হেমচন্দ্রের এই গ্রন্থটিতে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বহু ভৌগোলিক তথ্যও সন্নিবিষ্ট হয়। খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ এক সহস্র বৎসর পূর্বকালীন তমিস্রাচ্ছন্ন ভারতের ইতিহাসকে কালানুযায়ী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার প্রথম কৃতিত্ব যে হেমচন্দ্রের প্রাপ্য এই বিষয়ে

বিশ্বের ঐতিহাসিক মণ্ডলী একমত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে বিম্বিসারের পরবর্তীকাল হইতে গুপ্তসাম্রাজ্যের কাল আলোচিত হয়। Early History of India গ্রন্থে ভিন্সেণ্ট স্মিথ পরবর্তী এই কালের আলোচনায় পদক্ষেপ করিলেও তাঁহার রচনা অপুষ্ট ও অপূর্ণাঙ্গ ছিল। বহু নূতন নূতন প্রামাণ্য তথ্যের সমাবেশ হেতু হেমচন্দ্রের গ্রন্থটি বিম্বিসার পরবর্তীকালের আলোচনাতেও স্মিথের ইতিহাস অপেক্ষা বহুগুণে সমৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়, ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার রচনায় প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্যগুলি উপস্থিত করিতে পারেন নাই। সমগ্র গ্রন্থ রচনায় পুরাণাদি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্য, পালি ও প্রাকৃতে লিখিত বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র-সাহিত্যের এবং শিলালেখাদির উপকরণগুলি হেমচন্দ্র তাঁহার রচনায় সবিশেষরূপে ব্যবহার করেন। অতীত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া হেমচন্দ্র যে সব প্রাচীন গ্রন্থাদির সাক্ষ্য উপস্থিত করেন সেই গ্রন্থগুলির কালক্রম এবং নির্ভরযোগ্যতাও তিনি সবিশেষ দক্ষতার সহিত প্রমাণিত করেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের কালানুক্রমিক রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস রচনার গৌরব একজন ভারতবাসীরই প্রাপ্য—ইহা বিশেষ গৌরবের বিষয়।

ভারতে বহুলভাবে অনুসৃত বৈষ্ণবমতবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়েও হেমচন্দ্রের চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং এই বিষয়েও তিনি একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন (২)। এই গ্রন্থে তিনি পুরাণ ও লোককথার নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষরূপে উপস্থাপিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক জীবন তথা ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে বহু বিচিত্র ও অজ্ঞাত পূর্ব তথ্য এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রচারিত বহু অলীক তথ্য ও মত হেমচন্দ্র কর্তৃক খণ্ডিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হেমচন্দ্রের কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধও গ্রন্থরূপে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (৩)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাঙ্গলার ইতিহাস গ্রন্থের তিনটি সুদীর্ঘ অধ্যায় হেমচন্দ্রের রচিত (৪)। ঐতিহাসিক ইয়াজদানি সম্পাদিত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস গ্রন্থেও হেমচন্দ্রের রচনা সন্নিবিষ্ট হয়। অপর ঐতিহাসিকদের সহযোগিতায় হেমচন্দ্র দুইখানি উপাদেয় ছাত্র পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেন (৫ ও ৬)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে হেমচন্দ্র নিজের বিভাগ ব্যতীত সংস্কৃত, পালি ও ঐস্লামিক ইতিহাস বিভাগেও অধ্যাপনা করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐস্লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রবর্তিত হওয়ার সময় এই বিভাগের পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম নির্দ্ধারণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। সময়ে সময়ে পালি ও সংস্কৃত বিভাগের পাঠ্যসূচী নির্দ্ধারণের দায়িত্বও হেমচন্দ্রের উপর অর্পিত হইত। হেমচন্দ্রের বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও বহু ভাষা জ্ঞান এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমণ্ডলীকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া হেমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেনেট' সভার সদস্য ছিলেন।

মৌলিক চিন্তা তথ্য নিষ্ঠা যুক্তি প্রবণতা, সতর্কতা ও প্রামাণিকতা হেমচন্দ্রের সমস্ত ঐতিহাসিক চিন্তা ও রচনাকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একস্থলে লিখিয়াছিলেন যে কোন তথ্য অথবা "সন্" "তারিখ" ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থাপিত হইলে তিনি রায়চৌধুরীর রচনা হইতে তাহা নিরসন করিয়া

লন। ঐতিহাসিকরূপে হেমচন্দ্রের নির্ভর যোগ্যতা সম্বন্ধে ডাঃ মজুমদারের উক্তিটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। হেমচন্দ্রের প্রগাঢ়পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে এমনকি বিশ্বের বিদ্বৎমণ্ডলীতেও পরিব্যাপ্ত হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র নিখিল ভারতীয় ঐতিহাসিক সম্মেলনের (Indian History Congress) প্রাচীন ভারতীয় বিভাগের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে আমাদের ভারতবর্ষে নানা বর্ণ নানা সংস্কৃতির লোক বাস করিলেও একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য আমাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আত্মবিশ্বাস পারস্পরিক প্রেম ও ন্যায়ধর্মের প্রতি আনুগত্য এই প্রাচীন দেশের ঐতিহ্য। আমাদের দেশের যেন একটি মহানব্রত আছে। আমরা যেন এই মহান ঐতিহ্যের যথার্থ উত্তরাধিকার লাভ করিয়া এই মহান ব্রতে ব্রতী থাকিতে পারি, সেই চেষ্টা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র এই সম্মেলনের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। মধ্যপ্রদেশের নাগপুর শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির 'ফেলো'রূপে গৃহীত হন। এই পদ বিশেষ সম্মানসূচক। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অতি বিশিষ্ট গবেষণার জন্য ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র এই সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত "বি. সি. লাহা. স্বর্ণপদক" লাভ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালেও হেমচন্দ্র একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তীকাল হইতে মুসলমান আক্রমণের প্রাক্-কালীন ভারত বিষয়ে একটি রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস রচনার জন্যে হেমচন্দ্র বহু তথ্য সংগ্রহ করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদ্বজ্জনোচিত দৃঢ় নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয় সত্ত্বেও ব্যক্তিগত জীবনে হেমচন্দ্র অতি মধুর স্বভাবসম্পন্ন ও বিনয়ী ছিলেন। সাংসারিক বিষয়ে তিনি উদাসীন ও ব্যবহারিক জগৎসম্পর্কে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলা চলে। ছাত্রদের তিনি পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন ও তাঁহাদের জ্ঞানস্পৃহা বর্দ্ধিত করার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিতেন।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে দক্ষিণ কলিকাতার ৪ নং মহীশূর রোডস্থ ভবনে হেমচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

---

(১) Political History of ancient India from the accession of Parikshit to the extinction of the Gupta dynasty—Calcutta University, 1923. Sixth Edition-1953

(২) Materials for the Study of Early History of Vaisnav Sect—Calcutta University, 1920&1936.

(৩) Studies in Indian Antiquities—Calcutta University, 1932&1958.

(৪) History of Bengal Vol. I—Hindu Period Ed. by Dr. R. C. Mazumdar.
Chap. I. Physical & historical geography. Chap. II. Legendary Period.
Chap. III. Early History from 326 B. C. to 320 A. D.
(By Dr. H. C. Roychowdhury)

(৫) Ground Work of Indian History—With Dr. S. N. Sen.

(৬) Advanced History of India—With Dr. R. C. Mazumdher and Dr. K. K. Dutta.

ধর্ম-সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ

নবেন্দু সেন

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের একটি দিকের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় অন্য আর একটি বিষয়ের প্রতি অতি ঔদাসীন্য দেখানো হয়েছে। ফলে সাধারণের নিকট বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধাদির মাধ্যমে তাঁর যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে তা ধর্মীয় বিচার বিশ্লেষণের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। বেদ বেদান্ত, শঙ্করাচার্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দ্বৈত এবং অদ্বৈতভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর জীবন ও কর্মের মূল্য বিচার করা তাই যেন একটা রীতি হয়ে উঠেছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের নাম অপরিহার্য, তাঁর সাহিত্যকর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মজিজ্ঞাসা তাঁর জীবনের একটি বড় অধ্যায় কিন্তু একমাত্র অধ্যায় নয়। ধর্মকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্য রচনার ইতিহাসও রচিত হয়েছে। অভেদাত্মক রীতি অনুসরণ করে বলা চলে দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম তাঁর সাহিত্যরচনার বহির্ভূত বিষয় নয়, অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি মূলত ধর্মসাহিত্য। তাই তাঁর ধর্মান্বেষণের মধ্যেও সাহিত্য-জিজ্ঞাসার অবকাশ রয়ে গেছে। আর এই অবকাশে দেবেন্দ্রনাথের যে সৃষ্টি প্রকাশিত তার স্বভাবও বিশিষ্ট। স্বতন্ত্র।

বাংলাসাহিত্যের প্রাচীনকালেই ধর্মবিষয়ক রচনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে প্রাচীন। কিন্তু এগুলি সবই কাব্য। গদ্যে ধর্মীয় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত উনবিংশ শতকে। কাব্যে প্রকাশিত এই ধর্মীয় রচনাগুলির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের গদ্যে লিখিত ধর্মবিষয়ক রচনাগুলির পার্থক্য আছে। চর্যা, বৈষ্ণব, শাক্ত, মঙ্গল প্রভৃতি ধর্মীয়সাহিত্যে জীবনরস আর ঈশ্বরবোধ আলোছায়ায় প্রকাশিত। অধ্যাত্মচিন্তার মহাসাগরে জীবনের অনাবারণ প্রকাশ নেই এখানে। না থাকার জন্য আক্ষেপ আছে। একটু ক্ষোভও তাই রয়ে যায়। লুকিয়ে জীবনের আস্বাদ পেতে হয় যেন। অর্থাৎ ঈশ্বরবোধ আর জীবনবোধ এখানে দ্বৈতমুখীন। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাহিত্যে এই বোধ দ্বৈতাদ্বৈতরূপে প্রকাশিত। ঈশ্বর আর মানবজীবন সেখানে পৃথক কিন্তু একত্রিত। দ্বিতীয় আর একটি বিষয়েও দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়েছে। মানবজীবন এবং ঈশ্বর জিজ্ঞাসার মধ্যে অস্পষ্টতা না থাকায় রচনার মধ্যেও রোমান্টিকতা এবং ভাব প্রকাশের কুহেলিকা সৃষ্টিও হয়নি কোথাও। ঈশ্বরকে সোজাসুজি যখন ইচ্ছা হয়েছে ডেকেছেন। সেখানে ভাষার ইঙ্গিতময়তায় ভাবকে আভাষিত করার প্রয়াস নেই। একেবারে ক্লাসিক রচনার স্পষ্টতা নিয়ে সরাসরি তার প্রকাশ ঘটেছে। দু'একটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(ক) "ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান্ করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়।

যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, আমাদের অন্তরাত্মা, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, তিমিরযুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতি দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। আমারদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবামাত্র তাঁহার চক্ষু আমাদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্বত্রই রহিয়াছে।"

(খ) "হে বিশ্ববিধাতা জগৎ-পিতা। তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু বহন করিতেছে, আবার তোমারি প্রসাদে ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান্ হউক, গো সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক।"

দুটি উদাহরণেই সর্বত্র প্রকাশমান জগৎ-পিতার উদ্দেশ্যে ভক্তের অনুভব ও আকুলতা বিশ্বাস ও ধারণা কার্য্য কারণের সহজ বিবৃতির মধ্যে প্রকাশিত। কোন রূপক ও রোমাণ্টিকতার আশ্রয়ে ব্যস্ত নয়। নিত্যবর্তমান এবং ঘটমান বর্তমান কালের 'ষ্টেটমেণ্টে' লিখিত। কিন্তু এ 'ষ্টেটমেণ্ট কোন থানার অভিযোগলিপি নয়। সাহিত্য সুরভিতে সম্পূর্ণ। ভাল গদ্যপাঠের আনন্দ এখানে বর্তমান। শব্দ নির্বাচন, শব্দসজ্জা, বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি, রূপক কল্পনা সর্বত্রই একটা সূক্ষ্ম ভাষাশিল্পের ছাপ স্পষ্ট। শব্দ নির্বাচনের কথা ধরলে দেখা যায় একমাত্র সর্বনাম শব্দ ব্যতীত অধিকাংশশব্দই তৎসম। যেমন: দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ, উষা, সন্ধ্যা,

উন্মীলন, সৌন্দর্য্য, স্থাপিত, সর্বত্র,

মুক্ত, বনস্পতি, বিশ্ববিধাতা, গো, দুগ্ধ -প্রভৃতি।

কিন্তু তৎসম শব্দগুলির বহুল ব্যবহারেও সংস্কৃত ঘেঁষা, আড়ষ্ট গদ্য হয়ে ওঠে নি। শব্দ সজ্জার ক্রমটিও মোটামুটি অক্ষুণ্ণ। কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া বাংলা বাক্যের এই ক্রমটি মেনে "……তাঁহারা দেখিতে পান", "……স্থাপিত দেখি;" "……বায়ু মধু বহন করিতেছে", প্রভৃতি শব্দ বিন্যস্ত হয়েছে। অবশ্য যে কোন বড় লেখক মাত্রেই ক্রম ভেঙ্গে নূতন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চান; দেবেন্দ্রনাথের এই রচনাংশের ক্ষেত্রেও তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে;—খ-অনুচ্ছেদে ঘটমান বর্তমান কাল নির্দেশক যে দুটি ক্রিয়া ('করিতেছে') এবং অনুজ্ঞা বাচক 'হউক' ব্যবহৃত হয়েছে তাতে প্রকৃত পক্ষে ৪টি স্বতন্ত্র বাক্যের সমাহার লক্ষিত হয়। অথচ "হে বিশ্ব……পিতা" বাক্যটির সম্বোধন থেকে 'দুগ্ধ দান করুক' পর্যন্তকে একটি বাক্যের মধ্যে গণনা করলেও ভাবগত সমৃদ্ধির কোথাও এতটুকু ক্ষতি হয়না। তেমনি ক-অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটির ঠিক পূর্ব বাক্যটির (আমারদের…… স্থাপিত দেখি) কর্তহীনতা (উহ্য), "তরুণ……দেখিতে পাই" বাক্যটির কর্তা না থাকায়ও সমগ্র অনুচ্ছেদটির রসাবেদনে কোথাও ব্যাঘাত ঘটায় নি।

বাক্যের বয়নে এই অসাধারণ নৈপুণ্য দেবেন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া গেলেও স্মরণ রাখা কর্তব্য সে সময় বাংলা গদ্য কেবল নির্মাণোন্মুখ। ভাল বাক্য রচনা তো দূরের কথা, স্বাভাবিক ক্রম বজায় রেখে শুদ্ধ বাক্য লেখা তখনো ব্যাপকতা লাভ করে নি।—কাজেই সে যুগের পটভূমিকায়, "উষার উন্মীলনের…উদিত হইয়া | যখন | অচেতন……রূপবান করে, তখন | সেই……দেখিতে পান" জাতীয় বয়ন কৌশল অবশ্যই দেবেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার শক্তি ও সার্থকতারই পরিচয় দেয়।

রচনার শ্রী সৃষ্টির সহায়ক অন্যান্য কয়েকটি ভাষাশিল্পের পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়

শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ ধীরেরা, প্রকাশবান বরণীয় পুরুষ, সূর্য্যের অন্তরাত্মা, সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য, জ্যোতির জ্যোতি, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছগুলিতে যথেষ্ট absructness থাকলেও প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রে ভক্তের হৃদয়ানুভূতি এবং সাধকের চিত্তোৎসারিত ঈশ্বরানুভবের নিবিড়তা আরো গভীরতরই হয়েছে।

ক্রিয়ার ব্যবহারে 'দৃষ্টি করেন' Verbal phraseটি এখানকার ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে pleonıstic মনে হলেও এরূপ ব্যবহার উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেও প্রচলিত ছিল। যেমন উত্তম পুরুষের বহুবচনে আমারদের ব্যবহৃত হয়। দেবেন্দ্রনাথের রচনায় এরূপ pleonastic ব্যবহার থাকলেও রচনার পাঠে কোন উচ্চারণ-প্রবাহের জড়ত্ব সৃষ্টি হয় নি কিন্তু। দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর গদ্য রচনার পার্থক্যও এখানে।

রচনার Context of situation সম্পর্কে কার্থ (একজন বৃটিশ ভাষাতাত্বিক) বলেন,—

"A text way, that is, be regarded as an 'utterance' which is part of a Complex Social process ; and therefore the personal, social, linguistic, literary, and ideological circumstancss in which it was written need, as literary scholars have always recognized, to be called upon from time to time when any serious examination of a literary text is being made, be it for the purpose of stylistic or indeed any literary study." (৩)

দেবেন্দ্রনাথের গদ্যেও Context situation আছে। ব্রহ্ম সাধকের হৃদয়োপলব্ধি বিষয়ক এই উদ্ধৃত রচনাংশের ভাষাও তাই abstractness এবং direct communication-এ ভরে উঠেছে। যেমন অন্তরাত্মা, অন্তরাকাশ, অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বর, প্রকাশবান, সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য কিন্তু অচেতন প্রাণী, সূর্য্যকিরণ, নিমীলিত নয়ন এবং গো সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক। অথচ প্রসঙ্গান্তরে ভাষার কী দারুণ পরিবর্তন হয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ নীচের উদ্ধৃত অংশটি দেখা যেতে পারে।

"শীঘ্রই ষ্টীমার কলিকাতাভিমুখে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কাশীতে পঁহুছিয়াই একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। কাপ্তান এক টেলিগ্রাফ পাইলেন যে, এ কার্গো-বোটের জন্য দ্বিতীয় ষ্টীমার আসিতেছে, তাহাকে অন্য কার্গো-বোটখানিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কাপ্তান এই টেলিগ্রাফ পাইয়া অস্থির হইল। সে বলিতে লাগিল, 'আমি আর গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিব না, গবর্ণমেণ্টের হুকুমের কিছুই ঠিকানা নাই।" (৪)

ষ্টীমার, কার্গো-বোট, কাপ্তান, টেলিগ্রাফ, গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতি বিদেশী শব্দের সঙ্গে হুকুম, চাকুরী জাতীয় আরবি ও ফারসী শব্দেরও সহজ ব্যবহার সহজ হয়ে উঠেছে। কারণ এটা পথযাত্রার বর্ণনা। যাত্রাপথেই তো অন্য ভাষা ভাষী লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, মাতৃভাষা ছাড়াও অন্যভাষার ব্যবহার হয়। তছাড়া জলপথে যাত্রার বর্ণনায় বোট, ষ্টীমার। কাপ্তেনের কথা আসবেই। যেমন ফুটবলের প্রসঙ্গে, গোল, হাফব্যাক, চার্জ, হেড, ফাউল, রেফারী প্রভৃতি শব্দ আসে। এখানে দেবেন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,—এতগুলি বিদেশী শব্দের ব্যবহার করা সত্বেও রচনার ছন্দস্পন্দন বা সামগ্রিক রসাবেদনটি সম্পূর্ণ অনাহত। সাবলীল এই গদ্যপ্রবাহে অনভ্যাসের হোঁচট খেতে হয় না কোথাও।

সম্পূর্ণ ধর্ম সক্রান্ত রচনার ক্ষেত্রেও ভাষাগত এই স্বাচ্ছন্দ্য থাকায় দেবেন্দ্রনাথের রচনায় যে

সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হয়েছে তার কিছু টুকরো উদাহরণ নিয়েও দেখা যেতে পারে। যেমন :

(ক) রূপহীন বস্তু.........রূপবান ক'রে,
সূর্য্যের অন্তরাত্মা
ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান হউক
সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য।

(খ) কেবল কাকের কা কা ধ্বনি সিমলার বিশাল আকাশকে পূর্ণ করিতেছে।
আম্র মুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল
সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল।

(গ) সন্ধ্যার ছায়ার ন্যায় মেঘের ছায়া পর্বতের উপর পড়িল।

উচ্চারণ গত ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টিতেও দেবেন্দ্রগদ্যের ছন্দমঞ্জরী বিচিত্র। স্ত, ষ্য, শ্র, ন্ধ, ত্ম, ন্দ, র্য্য, শ্ব প্রভৃতি যুক্ত ধ্বনিপুঞ্জের ব্যবহার, শ, স, ষ, র, ল, জ, ম, ধ, 'হ' প্রভৃতির উচ্চারণ, এবং অনুপ্রাস ও (ব্যঞ্জনে এবং স্বরে) উচ্চারণের প্রবাহজনিত গতি ও যতির উত্থান ও পতন তাঁর রচনায় যে শোভন মাধুর্য ও দীপন ঐশ্বর্য সৃষ্টি ক'রেছে তার তুলনা দেবেন্দ্রনাথের সমকালীন কোন গদ্যলেখকের রচনায় পাওয়া যায় না। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা চিন্তায় যেমন তেমনি রচানাতেও পিতৃ প্রভাব লক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীর রচনাগুলির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার তুলনায় এ সত্যই প্রমাণিত হয়।

যে যুগে বাংলাগদ্য তখনো নির্মাণের পথে সে সময় সাবলীল ও গতিময়, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত রচনা সৃষ্টি কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশেষত Religious prose বা ধর্মসাহিত্য নামক পৃথক আস্বাদনের বিষয় রচনার যে সম্মান ও গৌরব তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর এই সম্মান ও গৌরবের পূর্ণ অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মসাহিত্য রচনার যেদিক তিনি দেখিয়ে গেছেন বলা চলে, সেইদিকই এখনো একমাত্র আদর্শের পথ। পুত্র রবীন্দ্রনাথ পিতার এই রাজ পথেই অগ্রসর হয়েছেন। ধর্ম সাহিত্যের ভাব ও ভাষার যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং আস্বাদন তার পরিচয় তো প্রথম এখানেই মিললো। দেবেন্দ্রনাথের এই রচনা রামমোহনের ধর্ম বিষয়ক যুক্তি তর্কের গদ্য নয়, বিবেকানন্দের শিকাগোর বক্তৃতা নয়, রামকৃষ্ণের কথামৃত নয়, আবার চৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোক নয়। এ রচনায় ভাষার রাজৈশ্বর্য আর ভাবের ঋষি-মাধুর্য একত্রিত হয়েছে। রাজা ও ঋষির সাধ ও সাধনার সিদ্ধিপত্র যেন।

১। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (১৮৬১), ১২৪

২। অনুষ্ঠান পদ্ধতি (১৯১৭), ১২৪

৩। Spencer, John Gregory, Michael : An approach to the study of style and language (Ed. Enkvist, Spencer)

৪। আত্মজীবনী (১৮৯৮) (১৯৬২), ২৩৯

ছোট গল্পে পশুপ্রীতি

দেবনাথ দাঁ

মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার কথা পুরোণো বাংলা সাহিত্যে ছিল উপেক্ষিত। আমাদের সেকালের কবিরা ধর্মের বেদীতলে সমবেত হয়ে আরাধ্য দেবতার বন্দনাগান রচনা করে গেছেন ভক্তি ও আবেগ বিগলিত চিত্তে। আধুনিক কালের কবিরা কিন্তু দেবদেবীর অলৌকিক মহিমাতে ভুললেন না—তাঁদের হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে মর্ত্যের মানুষ। বঙ্কিম ও মধুসূদনের সাহিত্যলোকে যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, তারা আমাদের পরিচিত মানুষ। তবে ঠিক তারা আমাদের মতো পনের-আনা সাধারণ মানুষ নয়, হিংসায়-প্রেমে-সাহসে-উদারতায় সাধারণ মানুষের চেয়ে কিছু উর্দ্ধে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে নিয়ে এলেন কিন্তু সেই জীবন-ধারা যা বাংলাদেশের সবুজ মাঠের বুকে অফুরন্ত প্রাণ-ঐশ্বর্যে নিত্য-তরঙ্গিত। রবীন্দ্রোত্তর বাঙালী শিল্পীরা আর-একটু এগিয়ে প্রবেশ করেছেন নোংরা বস্তিতে, কল-কারখানায়, ক্ষেতখামারে। ভালোয়-মন্দে সাদায়-কালোয় জড়িত, তুচ্ছ জীবনের প্রতি এই অসীম কৌতূহল থেকেই এমন কতকগুলি ছোটগল্প জন্ম নিয়েছে বাংলা-সাহিত্যে যাদের বিষয় পশুপ্রীতি। মানুষের দৈনন্দিন সংসার-জীবনের কথা লিখতে গিয়ে কবিদের চোখে পড়েছে মানুষের সংসারকে ঘিরে গরু, ছাগল, বিড়াল প্রভৃতি যে সব প্রাণীর নিত্য-আনাগোনা তাদের পানে। শরৎচন্দ্রের মহেশ, প্রভাতকুমারের আদরিণী, তারাশঙ্করের কালাপাহাড়, বনফুলের গণেশজননী, শৈলজানন্দের পোড়ারমুখী, পরশুরামের লম্বকর্ণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দোসর এই ধরণের গল্প।

গল্পসাহিত্যের আসরে পশুপাখির অনুপ্রবেশ আধুনিক ছোটগল্পে অবশ্য নতুন নয়। খুব পুরোনো ভারতীয় সাহিত্যে তাদের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। পালিতে-সংস্কৃতে-লেখা জাতক পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের গল্পমঞ্জুষাতে শূকর, বানর, কচ্ছপ, খরগোস ইত্যাদি কতো না জীবজন্তুর ভীড়। কিন্তু একালের পশুপ্রীতিমূলক ছোটগল্পের সঙ্গে জাতক-পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের পার্থক্য অনেকখানি। জাতক-পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের পশুপাখিরা খানিকটা পশুপাখি, খানিকটা মানুষ। গাছের শাখায় বসে কাককে মাংস খেতে দেখে শিয়াল যখন লোভার্ত হয়ে উঠে, তখন তাকে শিয়াল বলে চিনতে কষ্ট হয় না, কিন্তু সেই মাংসখণ্ড লাভের আশায় যখন সে মধুর স্তাবকতা শুরু করে, তখন আর সে পশু থাকে না। তাছাড়া, পাঠক-পাঠিকাকে ভালো-মন্দ সৎ-অসৎ কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য সেকালের সাহিত্যিক মাষ্টার মশাইরা গল্পকথার এইসব মনোরম স্বর্ণজাল বিস্তার করতেন। হিতোপদেশের রচয়িতা স্পষ্টই জানিয়েছেন, তাঁর উদ্দেশ্য, কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে। আমাদের আলোচ্য একালের পশুপ্রীতিমূলক ছোটগল্পগুলো কিন্তু পশুদের নিয়েই লেখা—এখানে গরু গরুই। গরু, ছাগল, মেষ তাদের পালককে কতোখানি ভালোবাসে, এইসব অবোধ জীবদের প্রতি পালকদেরও মমতা কতোখানি সুগভীর, আলোচ্য গল্পগুলিতে সেই কথাই রূপে রসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এই ধরণের গল্পের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের মহেশের কথা। গ্রামের একান্তে কন্যা আমিনা আর গাভী মহেশকে নিয়ে গফুরের দুঃখদারিদ্র্যের সংসার। খাজনা অনাদায়ে সমস্ত জমিজমা তার জমিদারের কাছে বাঁধা। ঘরে অন্ন নেই, চাষের কাজ জোটে না, মুসলমান বলে প্রতিবেশী হিন্দুদের সাহায্য থেকে সে বঞ্চিত। এত অভাব-অনটনেও অক্ষম মহেশকে কিন্তু সে বিক্রি করতে পারে নি। মহেশকে সে আমিনার চেয়ে কিছু কম ভালোবাসে না। জ্বরের ছলনা করে গফুর নিজে উপবাসী থেকে তার সারাদিনের একমুঠো ভাত মহেশকে খাইয়েছে, জীর্ণ কুঁড়ের আলগা খড় টেনে খেতে দিয়েছে তাকে; বলেছে, "মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নে। কিন্তু তুই তো জানিস, তোকে আমি কতো ভালোবাসি।" গৃহপালিত পশুটির প্রতি গফুরের এই নিঃসীম মমতা কিন্তু মহেশ গল্পের একমাত্র দিক নয়। পশুপ্রীতির সঙ্গে এই গল্পে রয়েছে আমাদের হৃদয়হীন পল্লীসমাজের নিষ্ঠুর ব্যবহার। মহেশের শোচনীয় মৃত্যু, গফুরের এই মর্মান্তিক দুঃখ দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে? বাংলাদেশের মনুষ্যত্বহীন সমাজের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ শরৎসাহিত্যের অন্যতম মূল সুর, মহেশ রচনাটিতে তা অকপট ভাবেই অভিব্যক্ত। লেখকের সুতীব্র অভিশাপ দিয়ে এই গল্পের উপসংহার: "আল্লা', আমাকে তুমি যত খুশী সাজা দিও, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ কোরো না।" সমাজবিদ্রোহের এই সুউচ্চ সুর মহেশ গল্পের পশুপ্রীতিকে সম্পূর্ণরূপে দানা বাঁধতে দেয় নি।

মহেশ গল্পে যে-রসপরিণতিটি দ্বিধাবিভক্ত, প্রভাতকুমারের আদরিণী গল্পে তা নিটোল সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। পালিত হস্তীটির প্রতি জয়রামের মমতা এখানে বিনা বাধায় শতধারায় উচ্ছ্বসিত। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সংসারের বিত্তপ্রাচুর্যে টান পড়লে এই গ্রাম্য মোক্তারের পক্ষে হাতী পোষা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধুদের পরামর্শে জয়রাম অনেক দুঃখে আদরিণীকে বিক্রী করতে সঙ্কল্প করলেন। বিদায়ের পূর্বে জয়রাম বললেন, "আদর যাও মা, বামুন হাটের মেলা দেখে এসো।" কিন্তু হাটে হাতীটির উপযুক্ত মূল্য পাওয়া গেল না। বিক্রয়ের পরিবর্তে আদরিণী গৃহে ফিরে এলে পরিবারে আনন্দের ধুম পড়ে গেল। কিন্তু নাতনীর বিবাহের জন্য জয়রামের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং আবার দশক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জের বড়ো হাটে আদরিণীকে পাঠানো হল। পরদিন বিকেলে এক চাষীর চিঠিতে জয়রাম জানতে পারলেন, পথে তার আদরিণীর অসুখ। গিয়ে দেখলেন, আদরিণীর নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবনের ভিতর পতিত। হস্তিনীর শবদেহের পর লুটিয়ে পড়ে তার মুখে মুখ রেখে জয়রাম বললেন, "অভিমান করে চলে গেলি মা, তোকে বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলাম বলে তুই অভিমান করে চলে গেলি?"

উপরের গল্পদুটিতে পালিত জীবের প্রতি পালকের স্নেহ ও ভালোবাসা অকপট সুরে ধরা পড়লেও পালকের প্রতি গৃহপালিত প্রাণীর আনুগত্যের দিকটি অনুপস্থিত। গৃহকর্তার প্রতি অবোধ পশুর আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া গেল তারাশঙ্করের কালাপাহাড় গল্পে। রংলাল নদীর চড়ায় তার প্রিয় মোষ—কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণকে ছেড়ে দিয়ে যখন মধুর বিশ্রামসুখ উপভোগ

করতে থাকে, তখন এই দুই স্বেচ্ছাবিহারী প্রাণীর কান থাকে প্রভুর ডাকের প্রতীক্ষায়। রংলালের বারেক আহ্বান-মাত্র তারা ছুটে আসে। একদিন নিবিড় গুল্মবনের ভিতর রংলালকে একাকী পেয়ে এক চিতাবাঘ তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, এই দুই প্রাণী তার জীবনরক্ষা করে। চিতাবাঘের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে কুম্ভকর্ণকে কিন্তু প্রাণ হারাতে হয়। কুম্ভকর্ণকে হারিয়ে কালাপাহাড় ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠল। তার অস্বাভাবিক চীৎকার আর কান্না দেখে রংলাল তার একটা জোড়া কিনে আনলে। কিন্তু নতুন এই প্রাণীটিকে সহ্য করতে পারল না কালাপাহাড়। দুরন্ত কালাপাহাড় কেবল শান্ত থাকে রংলালের কাছে। রংলালের স্নেহ পেলে সে সব ব্যথা, সব শোক ভুলে থাকতে পারে। কিন্তু এমন এক মারমুখী দুর্দান্ত জীবকে গৃহে রাখা অসম্ভব। রংলালের নিষেধ উপেক্ষা করে বাড়ীর লোকেরা তাকে দূরের হাটে বিক্রি করে দিল। পাইকাররা নতুন-কেনা এই জীবটিকে কিন্তু হাট থেকে ঘরে নিয়ে যেতে পারে নি। দড়ি ছিঁড়ে কালাপাহাড় এপথে ওপথে পাগলের মতো উদ্দাম ছুটোছুটি করে রংলালকে খুঁজেছে। তার সর্বনাশা উন্মত্ততা থেকে সহরের লোককে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশকে রিভলবার ছুঁড়তে হল। কালাপাহাড়ের—এবং মহেশেরও—এই শোচনীয় পরিণতির মধ্যে ট্রাজেডির যে গভীরতা বর্তমান, তুলনায় আদরিণীতে তা ম্লান।

প্রভু ও পালিত পশুর-মধ্যে অন্তরঙ্গতার সুমধুর ছবিটি কালাপাহাড়ের ন্যায় বনফুলের গণেশজননীতেও বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রভাতকুমার হাতীটির নাম দিয়েছেন আদরিণী, বনফুল রেখেছেন গণেশ। অপুত্রক প্রভুদম্পতীর সমস্ত স্নেহ, সকল সঙ্গতি নিয়ে লালিত হয়েছে এই ভাগ্যবান জীবটি। তার স্বচ্ছন্দ চলাফেরার জন্য কর্তা বাড়ীর দরজাগুলো কেটে বড়ো করে দিয়েছেন। "গিন্নী যখন নাইতে যায়, বালতি গামছা শুঁড়ে করে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গণেশ পিছু পিছু যায়। গরমের দিনে রান্নাঘরে বসে গিন্নী যখন রাঁধে, ও শুঁড়ে করে পাখা ধরে বাতাস করে। ধনীগৃহের অধিক স্নেহ-আদরে মানুষ হলে ছেলেমেয়েরা একটু অভিমানী হয় জানি, কিন্তু পর্যাপ্ত মমতা হস্তীশাবককেও যে অভিমান শেখায়, সে খবর দিয়েছেন বনফুল। প্রভাতকুমারের আদরিণী সত্যই অভিমান করে চিরতরে চলে গিয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু গণেশ যে গৃহিণীর ভর্ৎসনাতেই অভিমান করে খাওয়া বন্ধ করেছিল, তা খুব স্পষ্ট। বাগান থেকে মালি দু'শ ল্যাংড়া আম বাড়ীতে রেখে গেলে কর্তাগিন্নীর অনুপস্থিতিতে গণেশ একাকী সব খেয়ে ফেলে। গণেশজননী তাই রেগে গিয়ে বলেছিলেন, "রাক্ষস সব খেয়ে বসে আছ, একটি রাখতে পারনি আমাদের জন্যে।" যাক হাতীকে এই কঠিন ভর্ৎসনা করার জন্য গিন্নীকে কম শাস্তি পেতে হয় নি। নিজের স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করে দূর থেকে ভালো ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল তাঁকে। সহৃদয় ডাক্তারবাবু অবশ্য কোনো পারিশ্রমিক নেন নি, তাঁর চিকিৎসার কোনো প্রয়োজন ছিল না, এরোগের ঔষধও তিনি জানতেন না।

গণেশজননী গল্পের মতো শৈলজানন্দের পোড়ারমুখী গল্পেও গৃহপালিত পশুকে আশ্রয় করে অপুত্রক স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা প্রকাশের পথ খুঁজেছে। পোড়ারমুখী বিড়ালটাকে গৃহিণী খুব ভালোবাসলেও তার নবজাত কালো কুৎসিত বাচ্ছাকে তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তাকে তিনি দূর করে দিলেন ঘরের বাইরে। সহজে কিন্তু আপদ এড়ানো গেল না। সন্তানের শোকে

পোড়ারমুখী রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশকে অশ্রান্ত কান্নায় ভরে তুলল, বন্ধ করল খাওয়া-দাওয়া। গৃহিণীর অনুরোধে কর্তাকে বিড়ালছানার সন্ধানে পথে বেরুতে হল। পথে বেরিয়ে তিনি খবর পেলেন, কতকগুলো ছেলে যথেচ্ছ প্রহার করে একটা বিড়ালছানাকে আধমরা করে ফেলে গেছে। আহত বাচ্চাটির কোনো সন্ধান না পেয়ে উকিলবাবু গৃহে ফিরছেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল, সন্তানহারা পোড়ারমুখী পথের ধারে পড়ে আছে গাড়ী চাপা পড়া অবস্থায়। বাড়ীতে এনে যখন তিনি পোড়ারমুখীর শুশ্রূষা করছেন, তখন হঠাৎ শুনতে পেলেন, কৃষ্ণবর্ণ ছানাটি ফিরে এসে ডাকছে মিউ মিউ করে। গল্পের এই মিলনান্ত পরিণতি চমকপ্রদ হলেও কষ্ট কল্পিত এবং সুলভ। স্ত্রীর অনুরোধে একজন উকিল-ব্যক্তির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিড়ালছানার সন্ধান করা খুব স্বাভাবিক নয়। পোড়ারমুখী নিঃসন্দেহে এই ধরণের গল্পগুলির মধ্যে নিকৃষ্ট।

পোড়ারমুখীর মতো পরশুরামের লম্বকর্ণও মিলনান্ত গল্প। পাঠক-পাঠিকাকে হাসাতে পাগল পরশুরাম তাঁর কল্পনার উপযুক্ত পশু ছাগলকে বেছে নিয়েছেন। জমিদার বংশলোচনবাবুকে অনুসরণ করে একটা ছাগল তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়। জমিদারবাবুর সঙ্গে তখন তাঁর পত্নী মানিনীর বিচ্ছেদের পালা চলছিল। ছাগলটিকে দেখে মানিনীর ক্রোধ ও অভিমান দুর্বার হয়ে উঠল। লম্বকর্ণকে অন্যের হাতে বিলিয়ে দিয়েও বংশলোচন রেহাই পেলেন না। পুনরায় সে ফিরে এল জমিদারগৃহে। পারিবারিক সুখলাভের চেষ্টায় একদিন বংশলোচন ছাগলটির গলায় ছোট টিনের কৌটা বেঁধে তাতে একখানি কাগজ রেখে তাকে ছেড়ে দিয়ে এলেন বেলেঘাটা খালের ধারে। প্রত্যাবর্তনের পথে প্রচণ্ড ঝড়ে-জলে তিনি চৈতন্য হারালেন। বৃষ্টি একটু থামলে গৃহিণী ও লোকজন এসে জমিদারবাবুকে গৃহে নিয়ে গেলেন। কর্তার এখানে আগমনের সংবাদ আগেই জ্ঞাপন করেছিল লম্বকর্ণ। তার গলায় বাঁধা কৌটার কাগজে লেখা ছিল "এই ছাগল বেলেঘাটা খালের ধারে পাইয়াছিলাম। প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেই খানেই ছাড়িয়া দিলাম।" যে লম্বকর্ণ অচৈতন্য স্বামীর সংবাদ দিয়েছে বাড়ীতে এসে, তাকে আর গৃহিণী বিদায় করতে পারলেন না। সেদিন সদ্য-বিপদমুক্ত স্বামীর ঘরেই গৃহিণীর শয্যা রচিত হল। পূর্বালোচিত গল্পদুটো থেকে এইটি একটু ভিন্ন। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ও মিলনের কৌতুককর দিকটি এখানে পশুপ্রীতিকে অতিক্রম করে প্রাধান্যলাভ করেছে। এবং এইটিই গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়।

উপরিলিখিত পশুপ্রীতিমূলক গল্পগুলি অহিংস গৃহপালিত জীবকে উপজীব্য করে বাণীরূপ লাভ করেছে। হিংস্র অরণ্যচর প্রাণীকেও কেন্দ্র করে দুটি আশ্চর্য গল্প রয়েছে আমাদের সাহিত্যে: তারাশঙ্করের নারী ও নাগিনী এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দোসর। সাপুড়েরা সাপের খেলা দেখিয়ে শুধু যে উপার্জন করে না, সাপ কখনো কখনো তাদের কতোখানি প্রিয় হয়ে উঠে, তার বিশদ চিত্র পাওয়া যায় নারী ও নাগিনীতে। উদয় নাগিনী খোঁড়া শেখের হাতখানি জড়িয়ে খেলা করে। খোঁড়ার স্ত্রী জোবেদা খলস্বভাব এই প্রাণীর নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে খোঁড়া বলেছে, "বিশ্বাস নাই ওদের বিষ দাঁতকে। নইলে ওরাও তো ভালোবাসে জোবেদা। বিষদাঁত নাই, কিন্তু আর দাঁত তো রয়েছে, কই, আমাদের তো কামড়ায় না। কেমন ভালো মেয়ের মতো বিবি আমার ফিরছে বল দেখি।'—বলেই সে সাপটার ঠোঁটদুটি চেপে ধরে তার

মুখে একটা চুমা খেয়ে বসে। সাপ ও মানুষের বিশস্ত অন্তরঙ্গতার ছবি এগল্পের একটি দিক। অন্যদিক, বিশ্বাসঘাতকতা নারীজাতির জন্মার্জিত স্বভাব। সাপিণীর প্রতি খোঁড়ার সুনিবিড় সৌহার্দ্য জোবেদা যেমন সহ্য করতে পারত না, তেমনি সাপিণীটিও জোবেদার পোষ মানে নি। সঙ্গীর সঙ্গে মেলবার জন্য খোঁড়াশেখ সাপিণীটাকে ছেড়ে দিলে সে ফিসে এসে জোবেদাকে দংশন করে।

খোঁড়া সেখের প্রতি সাপের ভালবাসা নারী ও নাগিনী গল্পে ভীষণ রমণীয়তায় ফুটে উঠলেও সাপের খলপ্রকৃতি ও নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা এখানে বাদ যায় নি। শূয়র হিংস্র বন্য জীব হলেও সাপের মতো এতোখানি মারাত্মক নয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দোসর গল্পে তাই পেলেম, বন্যপশুর নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সঙ্গীকে রক্ষা করার অপূর্ব কাহিনী। সহরের বাইরে পাহাড়ী নদীর চড়ায় নির্জন জঙ্গলে চাষ করতে করতে গিয়ে এক বন্য শূয়রের দেখা পেল চাষা-মানুষটি। শূয়রটিকে দেখলে প্রথম প্রথম লোকটির অত্যন্ত ভয় হত। তাকে মেরে নিজের জীবন নিরাপদ করার চিন্তাও সে করেছে। কিন্তু দিনে রাতে তার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হতেও শূয়রটি যখন কোনদিন তাকে আক্রমণের চেষ্টা করে নি, তখন সে-ও একদিন তাকে হত্যা করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করল। চাষী-লোকটির অনুমান, তার মতো শূয়রটিও এই নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত জঙ্গলে একা—তাকেই সে আজ দোসর করতে চাইছে। শূয়রটার প্রতি এমন একটা মমতা পড়ে গেল লোকটির যে, সহর থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক খবর নিয়ে শূয়রটাকে শিকার করতে এলে লোকটি তার সন্ধান দিল না কোনো। তারপর সমস্ত জঙ্গলকে ভাসিয়ে একদিন রাত্রির অন্ধকারে প্রলয়ঙ্কর বন্যা। বন্যার দিগন্তবিস্তারী বিপুল জলপ্রবাহে লোকটি যখন মৃতপ্রায় হয়ে ভেসে চলেছে, এমন সময় সে সাক্ষাৎ পেল শূয়রটার। শূয়রটার গলা জড়িয়ে সে ভাসছে। কিন্তু বন্যার জল তাকে ছিনিয়ে নিল শূয়টার আশ্রয় থেকে। সকালের আলোতে লোকটি যখন অচৈতন্য অবস্থা থেকে জেগে উঠল একটা চড়াতে, তখন সে শূয়োরটার কোনো সন্ধান পেল না—বন্যার জল তার দোসরকে সর্বনাশা মৃত্যুর দেশে নিয়ে গেছে। বাঁচলে কিছুতেই সে লোকটির সঙ্গ ছাড়ত না, অন্ততঃ লোকটির তো তাই বিশ্বাস।

বাংলা সাহিত্যে এমন গল্প আরো রয়েছে। কিন্তু তাদের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমাদের আলোচ্য গল্পগুলি থেকেই এই ধরণের গল্পের বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষের দিকটি চিনে নেওয়া যায়॥

ভারতীয় সঙ্গীতে জিজ্ঞাসা

সুধীন মিত্র

মানুষের মন যেন মোগলসম্রাটের তৈরী শিষমহল। কত সূক্ষ্ম তার চিন্তার এক একটা স্তর। যে মহাজিজ্ঞাসা থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি তার গভীর সমুদ্রে সে ডুবুরীর বৃত্তি গ্রহণ করেছে। কখনও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছে, 'মৃত্যু কি?' কখনও বা জীবন দর্শনের তাৎপর্য বুঝতে চেয়েছে গভীর জিজ্ঞাসায়। এই যে বিশাল সৃষ্টি আকাশে আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের অব্যক্ত চেতনালোকে নিত্য বিরাজ করছে, অন্তহীন মানবচরিত্রের মাঝে এই যে মনস্তত্ত্বের সুবিপুল পরিমণ্ডল রচনা করে চলেছে, এর স্বরূপ কি? এই যে দিনের কোলাহল, রাতের স্তব্ধতা, ভক্তির গাম্ভীর্য, প্রেমের স্নিগ্ধতা—এর মধ্যে কত বর্ণ-বিশ্লেষণে বিধাতা নিজের রূপটিকে মিশিয়ে দিয়েছেন নিপুণভাবে। একে মানুষ বুঝতে চেয়েছে, জিজ্ঞাসায় হয়েছে অভিভূত। অনন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ঘটছে তাতো বিনা কারণে ঘটে না। কারণ—শরীরেই যে বিশ্বসত্তার অবস্থান। তবে তার প্রাণের কেন্দ্র থেকে যে শক্তির প্রাচুর্য কর্মের মধ্য দিয়ে নিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে তার পেছনেই বা কারণ থাকবে না কেন? কী সেই কারণ যাকে ফ্রয়েড বলেছেন 'Secret causes', কী সেই কারণ যাকে অধ্যাপক ওয়ার্ড সমগ্র ব্যক্তিচেতনার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বসৃষ্টির নাভিস্থলে এই যে কারণ-অজ্ঞান প্রকৃতি একেই জানতে চেয়ে মানুষ আকুল হয়েছে বারবার।

যে কারণ-প্রকৃতি বিশ্বের আদি আত্মা, ভারতীয় সঙ্গীতেরও মূল ভিত্তি সেই কারণ-প্রকৃতি। বিশ্বশক্তির উৎস আমাদের সঙ্গীতও সেই কারণ-নাদে স্পন্দিত। এই যে কারণ-নাদ, জন্ম একে বাঁধতে পারে না, মৃত্যু এঁকে মুছে দেয় না, কোনও রকম পরিবর্তনই পারে না এর রূপকে বিকৃত করতে। এ অব্যয়। এই কারণ-রূপেই নিহিত সঙ্গীতের নাদ-তনু-ব্রহ্ম। বিশ্ব এই কারণনাদের সূক্ষ্ম কম্পনের ঘূর্ণিজালের চারপাশে আবর্তন করে। এ অসীম, এ বিরাট। মানব মনের গোপনে যে সব অজানা রহস্য প্রকৃতির মায়ায় আত্মগোপন করে আছে, অতীতের তীর থেকে অসংখ্য মানবজন্মের যে পুঞ্জীভূত জিজ্ঞাসা নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তার উত্তর খুঁজে ফিরছে, নিবিড় বিস্ময় নিয়ে এই যে নিঃশব্দ আকাশ হতবাক্ হয়ে পার্থিব বস্তুপিণ্ডের দিকে পরম কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে —এ সবই সেই কারণরূপের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণালি বিশ্লেষণ। মহাশক্তিরই এ যেন একটা নিরাকার রূপ। এ রূপের শেষ নাই। লাবণ্য যেন উচ্ছ্বলিত আবেগে এর থেকে ঝরে পড়ছে। শ্রুতি এর কর্ণ, স্বর এর কণ্ঠ, অলঙ্কার এর সৌন্দর্য, মূর্চ্ছনা এর আবেগ, তান এর গতি, রাগ এর প্রেম, তাল এর ছন্দ, লয় এর সংযম। এই কারণ-নাদই ত চিরন্তন মহাজিজ্ঞাসার সুরেলা আত্মপ্রকাশ। এই জিজ্ঞাসাকে তাই অনাদি অনন্তকাল ধরে আমরা লালন করেছি। তাই ত আমাদের দেশের সঙ্গীত স্রষ্টারা সুর ও সঙ্গীতকে নিছক সুর ও সঙ্গীত বলে মনে করে নিয়ে আত্মতৃপ্ত হতে পারেন নি। এঁকে ব্রহ্মের অংশ জেনে পরমশ্রদ্ধা ও সংযমের সঙ্গে ভূমার বৃহৎ সুরটির মাঝখানে মিলিয়ে দিয়েছেন। দার্শনিক আবেদনে স্নিগ্ধ করে তুলেছেন একে।

মহাজিজ্ঞাসাকে ভারতীয় সঙ্গীত ঋষিরা রাগ রাগিনীর প্রাণের প্রতিটি কোষে সঞ্চার করিয়ে দিয়েছেন। রাগ রাগিনীর ভাবকল্পনায়, ধ্যানমন্ত্রে। এবং স্বরযোজনায় তার প্রমাণ আছে।

ভৈরব রাগ শিবের প্রতীক, সুন্দরের প্রতীক, জাগরণের প্রতীক। ভৈরব নতুন দিনের স্বাগতম জানায় তার কোমল ঋষভ ও কোমল ধৈবতের সহায়তায় আলাপের রেশকে জাগিয়ে তুলে। আলোর ধারায় স্নান করিয়ে দেয় সে নির্বেদ চেতনাকে। ভৈরবের ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম শান্তরসের প্রকাশক; কোমল ঋষভ ও কোমল ধৈবতে সূচিত হয় করুণ রসের ধ্বনি। সব মিলিয়ে আসে একটা স্থির গাম্ভীর্যের সমাহিত ভাব। তাই ত ভৈরবের আলাপে নিদ্রাজনিত আলস্য ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে আপন সত্তা নবজাগরণের আলোয় আপন অন্তরকে উদ্দীপ্ত করে। এই যে জাগরণ—এ কিসের জাগরণ? এ জাগরণ বিশ্বাত্মাকে জানবার সাধনার পথে এক সার্থক পথ পরিক্রমা। কোথায় আমরা ছিলাম? কোথায়ই বা আমাদের যাত্রাপথের শেষ হবে? কেমন করেই বা সুন্দর এক প্রভাতে আমরা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হলাম? প্রথম আলোর চরণধ্বনি শুনতে গিয়ে এ কোন্ দিব্য সুরে পবিত্র হলাম? এ সুর কোন্ যাদুমন্ত্রবলে আমার চোখের সামনে বিশ্বের জড় নিদ্রা ঘুচিয়ে দিল? ভৈরব সুরের আলাপের রেশ যেন এমনতরো হাজারো জিজ্ঞাসার উত্তর যে জগতে মেলে সেই উপলব্ধির উচ্চতম মার্গে আমাদের পৌঁছে দেয়।

পুরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রু মোচন। এ অশ্রু দিনের আলোর সৌন্দর্য সুধাপান-বঞ্চিত আঁখির তপ্ত অশ্রু। সমস্ত দিন ত নিজেকে সৃষ্টির মধুর দীপ্তি মুগ্ধ করে রেখেছিল। আবার কোথায় কোন্ অন্ধকার তমসায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে? অন্ধকার জগতের মাঝে মৃত্যু কি সুন্দর না ভয়ঙ্কর? যে আত্মীয়তার ললিত বেষ্টনী দিয়ে সারাদিন আপনাকে বিশ্বের সঙ্গে বেঁধে রাখা ছিল তা কি আগামী মুহূর্তগুলিতে শেষ হয়ে যাবে? পুরবী রাগিনী যেন এই জিজ্ঞাসার আকুলতাকে সংযমের সঙ্গে প্রকাশ করছে।

বেহাগ চিন্তায় অনেক পরিণত। তার মধ্যে প্রতীক্ষা আছে, কিন্তু সেই প্রতীক্ষায় নিষ্ঠা আছে আকুলতা বা আবেগের আতিশয্য নেই। তাই তার জিজ্ঞাসায় অনেক বেশী গভীরতার ছাপ মেলে। কারও ওপর কোনও নালিশ নেই, অধৈর্য হওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ, তাই মনে যখন জিজ্ঞাসা জাগে তখন সে জানতে চায়, বিরহ মুহূর্তের অবসান ঘটবে কবে? বেহাগ মিলনের বিষয়ে নিশ্চিত। জিজ্ঞাসায় সে মুখর, কিন্তু পরিণতির কাছে আত্মসমর্পণেও কখনও তার আক্ষেপ নেই। হৃদয়ে রয়েছে অবিচল নিষ্ঠা। মনও প্রস্তুত। স্থিতধী হয়েছে সমস্ত স্নায়ু-উপস্নায়ু। সমস্ত দুঃখ, বেদনা, শোক, জয় করে, 'তুয়া অভিসারক লাগি, দূতর পন্থ গমন ধ্বনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি।' কবে বাঁধা পড়বে দুটি চোখ দুটি চোখে? দুটি অনুভূতি মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে কবে? বেহাগে জিজ্ঞাসায় একটা আশার প্রদীপ জ্বলছে। এ যেন প্রাজ্ঞ দুটি প্রেমের অকম্পিত ও সফল পরিণতির পূর্বাভাষ।

সৈন্ধবীর ধ্যানবর্ণনায় দেখি "পতির অদর্শনে সৈন্ধবী নিরাশ ও বিষণ্ণা। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। কই পতি ত এখনও এলেন না? কেন? তবে কি কোনও অঘটন ঘটল? আশঙ্কায় দুরু দুরু করে উঠল তাঁর মন। পরমুহূর্তেই আবার অন্য খাদে বইল তার চিন্তাধারা। 'বুঝেছি,

বুঝেছি, আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা।' কেন গো, আমার অপরাধ? আমি কি এতই অবহেলার বস্তু? তুমি কি বোঝো না, তোমার অদর্শনে আমি কত কষ্ট পাই? না কি আমাকে দুঃখ দিতেই তোমার এই স্বেচ্ছা-নিরুদ্দেশ যাত্রা? কান্নায় ভেঙে পড়লেন সৈন্ধবী। সৈন্ধবী অভিমানী। পতির অদর্শনে প্রথমে তার মনে হলো উদ্বেগ, তারপর এল ভয়, অতঃপর অভিমান। অভিমানী সৈন্ধবীর এই অভিমান থেকে এল বৈরাগ্য। 'কেন এই সাজ? নায়কেরই যদি আমার প্রতি অবহেলা তবে কেন এই কবরী বন্ধন, কেন অলঙ্কার দিয়ে নিজেকে রমণীয় করবার চেষ্টা? সৈন্ধবী স্পর্শকাতরচিত্তা রমণী। যে চিন্তা সেই কাজ। তৎক্ষণাৎ যোগিনীর বেশ ধারণ করলেন তিনি। রক্তবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করলেন। পরিবর্তে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করলেন। গলায় রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, শরীরে বিভূতি, কানে কন্দুকফুলের মালা, হাতে ত্রিশূল আর জপের মালা। সৈন্ধবী এখন পুরোপুরি যোগিনী। সৈন্ধবীর এই বহিরঙ্গরূপের পেছনে আসলে কিন্তু একটা জিজ্ঞাসাই আত্মগোপন করে আছে। প্রাচীন ভারতীয় সাধকদের এ'হল আকুল জিজ্ঞাসা। কেমন করে বৈরাগ্যকে রসস্নিগ্ধ পবিত্রতার বেদীমূলে স্থাপন করা যায়? বৈরাগ্যের উৎপত্তি কোথা থেকে? অভিমান থেকে যে বৈরাগ্য দেখা দেয় সে কি চিরস্থায়ী? এই জিজ্ঞাসাই সৈন্ধবী রাগিনীর আলাপের মাঝখানে কখনও প্রশ্নের আকারে, কখনও প্রতীক্ষার আকারে কখনও অভিমানের আর অন্বেষণের আকারে বিধৃত হয়ে আছে।

'মধুমাধবী' রাগিনীর ধ্যানবর্ণনায় পণ্ডিত দামোদর বলেছেন—'পত্যাসহ সংপরিভব্য কামং সংচুম্বিতাস্যা কমলায়তাক্ষী।'

এখানে নায়ক সুন্দর, নায়িকা প্রেম। কল্যাণময়ী প্রেম নায়ক সুন্দরের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধা ও চুম্বনরতা। তিলফুলকে রমণীয় করে শিশিরবিন্দু, নাসাগ্রকে রমণীয় করে তোলে নাকছবি সৌন্দর্যকে রমণীয় করে তোলে প্রেম। মধুমাধবী রাগিনী প্রেমের প্রতীক! আবার যৌবনের ঋতু বসন্তের প্রতীক প্রেম। বসন্তের দূত কোকিল। কোকিল পঞ্চমস্বরে তার কূজন তোলে। কোকিলের কণ্ঠ বিবাহের দ্যোতক বলে পঞ্চমস্বরের মুহুর্মুহু ব্যবস্থা প্রয়োগ যে কোনও রাগিনীতে বেদনার সঞ্চার করে। অন্যদিকে মধু শব্দের অর্থ কল্যাণও বলা যায়। (যেমন—'মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' ইত্যাদি)। কিন্তু একি? নবযৌবনবতী প্রেম সুন্দরের সঙ্গে মিলিত হবার মুহূর্তটিতে যাতনা জেগে ওঠে কেন নায়িকার বক্ষে? কেন চঞ্চল হয়ে ওঠে তার সমস্ত চেতনা? তবে কি প্রেমের সঙ্গে সৌন্দর্যের মিলন ক্ষণস্থায়ী? এই জিজ্ঞাসা মধুমাধবীর ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা নয়। আমাদের সঙ্গীত সাধকেরা এই জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে তার উত্তরও দেবার চেষ্টা করেছেন।

পতিকে অন্বেষণ করে চলেছেন বরাটী রাগিনী "তরুণী বনে সকরুণং গবেষয়ন্তী পতিং ভৃশং গৌরী। নীলাম্বরা বরাটী সুরতরুকুসুমোসং সুষমা॥ (পণ্ডিত সোমনাথ)

নীলাম্বরা তরুণী এবং পরম শোভাময়ী বরাটী প্রেমরসে প্রবীণা। আলস্যে স্খলিতপ্রায় তার শুভ্র বসন। সকরুণ তাঁর চোখের দৃষ্টি। আকাশকে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন—"ওগো তোমরা কি দেখেছো তাঁকে?' বাতাসের স্পর্শে বিচলিত হয়ে তাঁর দুই চোখ চারিদিকে খুঁজে ফিরছেন—'এ কার স্পর্শ? তিনি কি এলেন তবে?' পরক্ষণেই আবার ব্যর্থতা। শূন্য হৃদয়ে বরাটী পাহাড়ে

মেঘে সমুদ্রে বুকে তাঁর জিজ্ঞাসা রাখছেন বিলাপের সুরে—'উনি কোথায়?' নিজেকে প্রশ্ন করছেন বরাটী বুকে চাপড়ে—'বল না হতভাগী, তুই কী পাপ করেছিস? কেন বা তোকে এমন পতি-অদর্শন-বিরহ ভোগ করতে হচ্ছে?' এই জিজ্ঞাসার মুর্চ্ছনা সমস্ত বিশ্বে করুণ কম্পন তুলছে।

মল্লারের রূপ করুণ। বড়ই অন্তরস্পর্শী তাঁর হৃদয় বেদনা। মল্লার যেন আমাদের অতি পরিচিত আপনজনের মতো আমাদের মন জগতে তাঁর ভালবাসার স্থান করে নিয়েছেন। মল্লারের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি, বর্ষার শব্দকে অবিরল অশ্রুধারাকে, প্রত্যক্ষ করি শিল্পীর অনুভূতিকে, ভক্তের নিষ্ঠাকে, প্রেমিকের সংবেদনশীল আকুলতাকে। একটি একটি নিটোল বৃষ্টিবিন্দু, বিরহী বিশ্বের একটি একটি বাষ্পরুদ্ধ জিজ্ঞাসা। মল্লারের রূপবর্ণনায় পণ্ডিত দামোদর বলেছেন: "গৌরী কৃশা কোকিল কণ্ঠনাদা গীতচ্ছলেনাত্মপতিং স্মরন্তী। আদায় বীনাং রুদন্তী মল্লারিকা যৌবনদূনচিত্তা। আহা! কত কান্নাই না মল্লারের বুকে জমা হয়ে আছে। নিঃসঙ্গ রাত্রি। মেঘের বিরহে মল্লার মূর্ছিতপ্রায়। একাকিনী নায়িকা নায়কের সঙ্গে মিলন-প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন। বর্ষার ঝরঝর শব্দ চঞ্চল করে তুলেছে নায়িকার হৃদপিণ্ডের স্পন্দনকে। বর্ষার সূচনা তাঁর আবেগকে করেছে মথিত। বর্ষার ছন্দের মধ্যে যেন নায়কের পায়ের শব্দ ঝমঝম করে উঠছে। মল্লারের জগতে শান্তির জীবন্ত আশ্বাস মেঘ। মেঘ আর মল্লারের সত্তা অখণ্ড, মেঘের অন্তনিঃসৃত নির্যাসেইতো মল্লারের সৌন্দর্য রূপান্বিত। তাই ত এত আকুলতা, এত অন্বেষণ। মল্লারের এই যে প্রতীক্ষা, এ যেন সমস্ত বিশ্বমনের প্রতীক্ষা। মল্লার বিশ্বের বর্ষা। তাই তো জিজ্ঞাসায় মুখর হয়ে ওঠে প্রেমসিঞ্চিত বিশ্বহৃদয়। অশান্তি আর বিরহের রৌদ্রদগ্ধ আবহাওয়ায় একটুকরো আশা নিয়ে কবে আসবে নায়ক মেঘ ঈশ্বরের করুণাধারার মতো? বিশ্বমনের কানায় কানায় যে অশ্রুগঙ্গোত্রী কল্লোল তোলে তাতে দুটি স্নিগ্ধ চাহনি কখন ভেসে উঠবে? কখন, কখন ঝঙ্কার তুলবে পায়ের নূপুর? কি প্রকৃতির কাছে মানব প্রকৃতির এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় প্রেমের প্রতীক্ষা বিরহ অভিসার বেদনার ইথার তরঙ্গ আকাশের ব্যাপকতা আর গাছের মর্মরে দিগন্তরেখাটির মতোই নিজেকে ফেলেছে হারিয়ে।

তোড়ী রাগিনী সকালের রাগিনী। বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন, বাসকসজ্জা নায়িকা। লম্বমানা বেণী শোভিতা গৌরবর্ণা তোড়ী রাগিনী। অর্থাৎ ঠাসবুনোট আলাপের পরিপূর্ণ আবেদন নিয়ে তিনি উপস্থিত। পতিবিরহে কাতরা, এবং এই বিরহ যাতে জাগ্রত থাকে তাই তিনি পতির কথা স্মরণ করছেন। এই স্মরণ যাতে চিরস্থায়ী হয় সেজন্য পতিনাম জপ করছেন হাতের মালায়। এখানেও সেই নারীহৃদয়ের চিরন্তন প্রেমজিজ্ঞাসা উচ্চারিত হয়েছে। সেই একই অন্বেষণ। কিন্তু তবুও তফাৎ আছে। বরাটী রাগিনীর মতো তোড়ী রাগিনী চঞ্চলা নয়। বরাটী জিজ্ঞাসায় মুখর তোড়ী জিজ্ঞাসায় স্থিতধী। বরাটীর জিজ্ঞাসায় এসেছে আবেগের উত্তেজনা, তোড়ীর জিজ্ঞাসায় বেদনার করুণতা। এখানে সঙ্গতকারণেরই মনে করা যেতে পারে যে তোড়ী রাগিনী বেদনার প্রতীক। বেদনার সঙ্গে প্রেমের মিলন কেমন করে সার্থক হয়-সেই জিজ্ঞাসারই একটা সুর এখানে ধ্বনিত হয়েছে।

'কামোদ' রাগিনীর ধ্যানবর্ণনা দিতে গিয়ে 'রাগবিরোধ'-কার পণ্ডিত সোমনাথ বলেছেন—'পীতাংশুকা সুকেশী ক্ষিতিঃ স্মরন্তী প্রতিভয়াকুলদৃক পিকনাদের ক্দিনা কামোদী কাননে রুদতী' এ

রোদন কিসের রোদন ? এ কি শুধু বিশেষ একটি রাগিনীর কান্না ? বস্তুতঃ মানবমনের চিরজিজ্ঞাসাই এ কান্নার উল্টোপিঠ। এ জিজ্ঞাসা বিশ্বপতির কাছে বিশ্বমনের জিজ্ঞাসা। কবে তাঁকে পাবো ? কবে তাঁকে লাভ করব আমার চেতনায়, আমার প্রেমে, আমার কর্মে, আমার ক্ষেমে, আমার চাঞ্চল্যে আমার সংযমে, আমার বেদনায়, আমার আনন্দে, আমার বিচ্ছেদে, আমার মিলনে ? এখানে একদিকে মিলনের স্বপ্ন অপরদিকে মিলনের জিজ্ঞাসা।

মালকোষের আবেগ আছে, সংযম আছে। আকুলতা যেমন এতে আছে তেমনি আছে গভীরতার গাম্ভীর্য। বীর রৌদ্র ও অদ্ভুত রসের করুণরূপ অতি আশ্চর্যভাবে মিলেছে মালকোষ রাগে। তাই একটা প্রসন্নতা শান্ত নির্লিপ্ততা আর পরিমিত ব্যাকুলতা মালকোষ রাগের আত্মাকে অনির্বচনীয় সুরলোকে উত্তীর্ণ করেছে। মালকোষের আলাপের মধ্যে তাই শিল্পীর মনের কথাটি অতি নিপুণভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'কেমন করে হৃদয়ে আসবে পূর্ণতা ? শিল্প পৌঁছবে সার্থকতার পরম মিলনতীর্থে ?' অতৃপ্ত শিল্পীমনের এই জিজ্ঞাসা যেন গুমরে গুমরে কেঁদে ফেরে মালকোষের প্রতিটি মূর্ছনায়।

ললিতা বা ললিত নবজাগরণের উদ্বোধক। ললিতা খণ্ডিতা, তার নায়ক অত্যন্ত শঠ। তবুও তার আপন ভালবাসায় কোনও খাদ নেই। ভালবাসার অমৃত সে উজাড় করে দিয়ে পূর্ণ করে রাখে মঙ্গলকলস তার নায়কের জন্য। সেই ভালবাসায় অন্ধকারে আলো দেখা দেয়, ক্লান্তি আর অবসাদ মুক্ত করে। শান্তি আর শুভ্রতায় ভরিয়ে তোলে মন। অন্ধকার থেকে আলোয় এই যে উত্তরণ, এ উত্তরণ অজ্ঞানতার ধোঁয়াটে পরিবেশের সীমানা পেরিয়ে জ্ঞানের রাজ্যে উত্তরণ। শিল্পী বা ভাবুকের অনুসন্ধিৎসু চিত্তের অসংখ্য জিজ্ঞাসা এই উত্তরণের পথিকৃত।

কানাড়ায় অভিসারিকা নিশীথিনীর পথের জিজ্ঞাসা তার ত্যাগ-গম্ভীর, শান্ত, উদাসী ও নির্বিকল্পক আলাপের মধ্যে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

এমন উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে এখানে থামতে হ'ল। উপরে যে রাগরাগিনীরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে তাদের নিহিতভাব থেকে মোটামুটি একটা ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায়। দেখা যায়, এইসব রাগরাগিনীর মধ্যে একটা আকুল মন, একটা বেদনাময় সত্তা কাজ করে চলেছে। যদি বলি, এই বেদনা, এই আকুলতা, বিস্ময় নিবিড় এই শূন্যতা আর অন্বেষণ—জিজ্ঞাসা থেকে এর উৎপত্তি তবে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। শিল্পীর মনে যে শিল্পজিজ্ঞাসা, ভাবুকের মনে যে ভাবজিজ্ঞাসা, প্রেমিকের মনে যে প্রেমজিজ্ঞাসা দানা বেঁধে ওঠে তার সন্তোষজনক মীমাংসা না হলে এমন ধরণের নৈরাশ্য বেদনা দেখা দেয়। ভারতীয় সঙ্গীতঋষিরা এই বেদনাকে মুছে দিতে চাননি। কারণ বেদনার মৃত্যু মানেই জিজ্ঞাসার ক্ষয়। আর তার ফলে সভ্যতার অগ্রগতি, চিত্তের ঐশ্বর্য, জ্ঞানের গভীরতা আর মুক্তির সন্ধান ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা রাগরাগিনীর ভাবে, কল্পনায় এবং স্বর সংযোজনায়, জিজ্ঞাসাকে স্থায়িত্ব করতে, করুণরসের রসায়ণ ঘটিয়েছেন অতি নিপুণভাবে।

আমাদের দেশের মার্গ সঙ্গীত তো দেখতে গেলে জিজ্ঞাসার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। 'মার্গ' শব্দের অর্থ অন্বেষণ। অন্বেষণের পেছনে মানুষ যখন ছোটে তখন তার মনে বিচিত্র

জিজ্ঞাসার উদয় হয়। মার্গসঙ্গীতের স্বরসৃষ্টিত তাই আমাদের জিজ্ঞাসাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

সঙ্গীত-ইতিহাসের আর্চিকযুগে আমরা দেখি একটিমাত্র স্বরের ধ্বনি দিয়ে মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার রূপ দিয়ে চলেছি আমরা। কখনও তার উত্তর আমরাই বের করেছি, কখনও সে চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয়েছি। সৃষ্টির আদিম প্রভাতে আকাশই ছিল একমাত্র সৃষ্টির ফলশ্রুতি। আকাশ যার দৈর্ঘ নেই, প্রস্থ নেই, গভীরতার সীমা নেই যার, বর্ণ বর্ণনাতীত। আকাশের কাছ থেকে মানুষ অনন্তের ধারণা পেতে চাইল। চাইল, নীল অসীমের প্রান্তদেশে আপন হৃদয়খানা মেলে ধরতে। শুরু হল যাত্রাপরিক্রমা। মহাজিজ্ঞাসার হল উদ্বোধন। কেমন করে আকাশের মতো হবো? এই জিজ্ঞাসার বেশ ধরে হাজারো রকমের জিজ্ঞাসা এসে আশ্রয় নিল মানুষের চিন্তার রাজ্যে। সঙ্গীতের প্রথম স্বরও তাই আকাশ আর বরুণকে আশ্রয় করে সৃষ্টি হল। শিক্ষাকার নারদ বললেন—'যঃ সামগানং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ।"—মধ্যমই হল সেই স্বর। শিক্ষাকারের মতে মধ্যমই হল আদি স্বর। মধ্যম স্বরে যদি স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে জানবার আকুলতা সুরেলা কণ্ঠে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে তার কম্পন ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকে অতিক্রম করে বিশ্বজিজ্ঞাসার ব্যাপকতায় একটা গতিলাভ করে। মধ্যম স্বর, ভেবে দেখলে দেখা যাবে, ব্যাপক, পরিপূর্ণতার দ্যোতক। মধ্যমস্বরের বর্ণ আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে বলা হয়েছে, সাদা (কুন্দ)। এটা ত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, সাদা সাত রঙের মিলিত রূপ। কাজেই সুদূরপ্রসারী ব্যাপকতার দিক দিয়ে মধ্যমকে মানুষের জিজ্ঞাসা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমাদের চিরন্তন মহাজিজ্ঞাসাকে মধ্যমস্বরের ধ্বনিতে আমরা সৃষ্টিতরঙ্গের মাঝে মিলিয়ে দেবার সূচনা করলাম। যখন একটি স্বরই আমাদের ভরসা, তখন তা হওয়া উচিত এমন একটি ব্যাপক, গম্ভীর, বিচিত্র ও স্থিতিস্থাপক স্বর যাতে আমাদের জিজ্ঞাসার আবেদন সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে চিত্তবৃত্তির প্রতিটি কোষে।

কিন্তু এতেও ত সব হল না। সৃষ্টিজিজ্ঞাসা, জীবনজিজ্ঞাসা, মৃত্যুজিজ্ঞাসা—এমন আরও কত রকমের জিজ্ঞাসা আছে! কত অনুসন্ধিৎসার আবেগ, জিজ্ঞাসার কত বেদনা! এ কি একটামাত্র স্বরের সুর দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব? এলো গাথিক যুগ। বিচিত্র জিজ্ঞাসাকে অনির্বচনীয় রূপ দিতে হ'ল দুটি স্বরের সৃষ্টি। মধ্যমের সঙ্গে পঞ্চমের সহযোগিতা অসংখ্য প্রশ্নপরিবৃত মানবমনের অন্তর্চেতনায় অধিকতর স্থায়ী আবেদন নিয়ে এল। পঞ্চমের বর্ণ কৃষ্ণ। পঞ্চমের বাম পাশে মধ্যম—কুন্দবর্ণ রূপীর পাশে কৃষ্ণবর্ণ যেন রাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ মিলনের নিবিড়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মধ্যমের ধ্বনিতে যে গভীর ব্যঞ্জনা আছে, তা পঞ্চমের স্পর্শে একটা বেদনার রসে জারিত হল। আরও মধুর হয়ে উঠল আমাদের জিজ্ঞাসার ভাষা।

মোটকথা আমাদের জিজ্ঞাসা যত ব্যাপক হল, বিচিত্র হল, তত তাকে গভীর আর স্থায়ীকরে রাখবার চেষ্টায় আমরা আমাদের সর্ব ক্ষমতা আর চিন্তাকে কাজে লাগালুম। এরই ফলে এল সামিক অর্থাৎ তিন স্বরের যুগ; স্বরান্তর অর্থাৎ চারস্বরের যুগ, ঔড়ব অর্থাৎ পাঁচ স্বরের যুগ, ষাড়ব অর্থাৎ ছয় স্বরের যুগ এবং সম্পূর্ণ অর্থাৎ সাতস্বরের যুগ। এমনি ভাবেই সাতস্বরের আবিষ্কার হল। জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ও নীতি অনুযায়ী আমরা সাতস্বরের প্রয়োগ করলাম। এককথায় ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের একটি বৃহৎ অংশই জিজ্ঞাসার সার্থক রূপদানের প্রয়াসের ইতিহাস।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। শুধু আমাদের সঙ্গীত কেন, আমাদের সাহিত্যও তো জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে রচিত। সে ক্ষেত্রে শুধু সঙ্গীতকে বড় করে দেখানোর এত চেষ্টা কেন?

কারণ আছে। সাহিত্যের চেয়ে সঙ্গীতের উপরই জিজ্ঞাসার প্রভাব বেশী। সাহিত্য ও সঙ্গীত—উভয়ের উৎপত্তিস্থলই শব্দের (Sound) কম্পন থেকে। বাতাসই শব্দের কারণ। আমরা যখন কথা বলতে বা গান গাইতে ইচ্ছে করি, তখন আমাদের সেই ইচ্ছার সঙ্গে শব্দ এসে যুক্ত হয়। ফলে শব্দ দেহের পাঁচটি স্থানে ধাক্কা খায় এবং পরে সেই স্থানগুলিকে পেরিয়ে এসে বাইরে অগ্রভাগে স্থূলরূপে কথাও সুরের আকারে ধ্বনিত হয়। অতএব, শব্দের কম্পন থেকে সাহিত্যের যেমন উৎপত্তি হয়েছে, তেমনি হয়েছে সঙ্গীতের।

কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে সঙ্গীত আগে এসেছে না সাহিত্য এসেছে, সে আলোচনা এখানে নিরর্থক। যেটা দরকার তা হল সাহিত্যের চেয়ে সঙ্গীতের মধ্যেই যে জিজ্ঞাসার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী সেটা কেমন করে সম্ভব হল, তা বের করা।

সঙ্গীত সুরকেই প্রাধান্য দেয়, সাহিত্য দেয় ভাষাকে। মানুষের মনে ভাষার চেয়ে সুরেরই আবেদন বেশী। কারণ ভাষার আবেদন মস্তিষ্কের কাছে আর সুরের আবেদন হৃদয়ের কাছে। সুর এবং ভাষা, উভয়েই শব্দ কম্পনের সমষ্টি। সুরের কম্পনতরঙ্গ ভাষার চেয়ে সূক্ষ্ম। হৃদয়ের মধ্যে সুর তাই নিজেকে একেবারে মিলিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ভাষা বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে তার অর্থ আর ভাবকে মস্তিষ্কের মারফৎ হৃদয়ের কাছে পৌঁছোতে হয়। অবশ্য সাহিত্য আর সঙ্গীত উভয়েরই সুর এবং বাণী দুই-ই আছে। সাহিত্যের ধ্বনি হল তার সুর আর সঙ্গীতের স্বর হল তার ভাষা। পার্থক্যটা তবে কোথায়? সুর ও ভাষার রসায়নে দেখা যায় সঙ্গীতে সুরের আবেদন-এর অনুপাত কথার আবেদনের অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশী এবং সাহিত্যে এর বিপরীত। সুরের অনুপাত বেশী হওয়ায় মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয়ের অন্তঃপুরে সঙ্গীতের আসন। আর তাই মানুষের, শুধু মানুষের কেন তরুলতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতি জড় এবং সচল সমস্ত পদার্থের উপর তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু সাহিত্য তা নয়, কারণ তার সীমানা কেবলমাত্র মানুষের বুদ্ধির রাজ্যে, তাও বিশেষ ভাষাভাষী মানুষের। কাজেই সাহিত্য আমাদের জিজ্ঞাসাকে রূপ দিয়েছে আর সঙ্গীত দিয়েছে গতি ও প্রাণ।

সৃষ্টির জন্মলগ্নে কারণ-সলিলের আবরণে বিশ্ব ছিল ঢাকা। তমসায় আচ্ছন্ন ছিল সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড। এই অন্ধকার কি জিজ্ঞাসার প্রতীক? আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসার মূলে রয়েছে অজ্ঞানতা। আবার অজ্ঞানতা ত অন্ধকারেরই প্রতীক। জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। সুতরাং, অন্ধকার থেকে আলোতে, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের রাজ্যে, অবিদ্যার সীমানা পেরিয়ে বিদ্যার প্রাঙ্গনে প্রবেশের প্রধান দরজা। এই দরজা দিয়ে মানুষ ঢুকতে চাইল আলোর জগতে। অন্ধকারকে দূর করতে চাইল। অবিদ্যাকে পেরিয়ে যেতে চাইলো বিদ্যার রাজ্যে। জানতে চাইলো আপন স্বরূপকে, আত্মাকে। জ্ঞানের পিপাসা উঠল জেগে। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে মানুষ খুঁজল আপন চিত্ত-প্রকৃতিকে। এই অন্বেষণ সঙ্গে নিয়ে এলো অসংখ্য জিজ্ঞাসা। তপোবনকে করলেন আমাদের ঋষিরা সাধনার পরম ক্ষেত্র। কারণ বিশ্বপ্রকৃতির আত্মাকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে তাকে শান্ত রসাস্বাদ চিত্তে সংযতভাবে

পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতির সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে হবে। বিশ্বপ্রকৃতিকে জানবার এই ব্যাকুলতা নিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসা ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রকৃতির প্রাণের কেন্দ্রে। কোন্ পথে গেলে প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে পাওয়া যাবে? চলল গবেষণা। দেখা গেল, আমাদের সুরকে যদি প্রকৃতির ভিত্তিভূমিতে স্থাপন করতে চাই, তবে প্রকৃতির সুরকেও আমাদের চিত্তভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এবং প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে প্রকৃতির যে যে স্থানে সুর লুকিয়ে আছে সেখানে প্রবেশ করতে হবে আহরণের মনেভাব নিয়ে। এও দেখা গেল, প্রকৃতির এই সুর লুকিয়ে আছে পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বরে, নদীর কলতানে, বাতাসের মর্মরে, মেঘের গর্জনে, বিজলীর চকিত চমকনে। মানুষ আপন কণ্ঠে ধারণ করলো এদের ধ্বনি। এদের কাছে আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হল না।

ময়ূরের ডাকে স্নিগ্ধসজল মেঘবজ্জ্বস রূপটি মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই তৃপ্তির পবিত্র সৌরভে ভরিয়ে তুলল। শান্তির একটা বিনম্র রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। চাতকের মতো যে মনটা আমাদের বিশ্বচরাচরের প্রতিটি অনুপরমাণুর কাছে 'শান্তি কোথায়?' বলে জিজ্ঞাসা রাখছে তারই আবেগ অকস্মাৎ মথিত হয়ে উঠল। ময়ূর ঘোষণা করল বর্ষার আগমনবারতা। কেকাধ্বনি উঠল মেঘের ছন্দে। পেখম মেলে দিয়ে হাওয়ার তালে তালে নেচে উঠলো। শান্তিতে স্নিগ্ধ হল মানুষের সমস্ত অনুভূতি। ময়ূরের কণ্ঠস্বরকে সে ধরে রাখতে চাইল বর্ষার রূপকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, পঞ্চমকে হাল্কাভাবে ছুঁয়ে যদি কণ্ঠকে ষড়জ স্থানে স্থায়ীকরা যায় তবে ময়ূরের ডাকের অনুরূপ ধ্বনি পাওয়া যায়।

কোকিলের কুহু-ধ্বনিতে দক্ষিণদিক থেকে একটা মধুর হাওয়া মনকে আকুল করে তুলল। বকুল-পলাশের শোভায় চিত্রিত হল প্রকৃতি। পত্রপল্লবে ছেয়ে গেল নতুন মঞ্জুরিত সবুজবৃক্ষলতা। প্রকাশের সমস্ত ব্যাকুলতা হাহাকার করে উঠল বেদনার ভাষায়। 'কী কথা বলতে চাই, কী-সুর কণ্ঠে-ধারণ করতে'—মন তারই জিজ্ঞাসায় কাঁদতে বসল আনন্দে। এমন সময় কোকিল পঞ্চম স্বরে ডেকে উঠল। বিরহ মধুর হয়ে উঠল। প্রাণে উঠল খুশীর তুফান। সমস্ত সমস্যার সমাধান হল। কণ্ঠ খুঁজে পেল তার বেদনা প্রকাশের স্বর কোকিলের স্বরের মধ্যে। পঞ্চমকে সৃষ্টি করে মানুষ কোকিলকে স্বাগতম জানালো তার স্বরকে নিজের গলায় মিলিয়ে নিয়ে।

এই ভাবে বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনের দ্বারা দেখা যাবে ভারতীয় সঙ্গীতে যে বৃষের ডাকের অনুকরণে ঋষভ, ছাগলের ডাকের অনুকরণে গান্ধার, সারসের অনুকরণে মধ্যম, অশ্বের অনুকরণে ধৈবত এবং হস্তীর স্বরের অনুকরণে নিষাদ স্বরের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে (যেমন মাতঙ্গীতে আছে 'ষড়্জে বদতি ময়ূরো গাবো রম্ভন্তি চর্ষভে। অজ বদতি গান্ধারে ক্রৌঞ্চ নাদস্তু মধ্যমে॥ পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলঃ পঞ্চম স্বরে। অশ্বস্তু ধৈবত প্রাহ কুঞ্জরস্তু নিষাদবান্॥'), এর পেছনেও কাজ করছে মানুষের জিজ্ঞাসু মনস্তত্ব। কত রকম ভাবেই না আমরা আমাদের সঙ্গীতে এই জিজ্ঞাসাকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। অধিকন্তু আমাদের মার্গসঙ্গীতে যে বাইশ শ্রুতির (কারও কারও মতে তেত্রিশ) উল্লেখ আছে, মূর্চ্ছনায় প্রয়োগ আছে তা সঙ্গীতের এই জিজ্ঞাসাকে আরও বেগবান করেছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি—ফেলিক্স কেরি

দেবজ্যোতি দাশ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ফেলিক্স্ কেরি একটি অসম্পূর্ণ বিয়োগান্ত অধ্যায়। এ দেশের বিদগ্ধ সমাজের চিন্তায় বিসংবাদী আসন লাভ করলেও সাধারণের কাছে ফেলিক্স্ কেরির পরিচিতি ও স্বীকৃতি কম। শ্রীরামপুরের প্রখ্যাত মিশনারি উইলিয়াম কেরির দ্বিতীয় পুত্র ফেলিক্স্ মাত্র ৭ বছর বয়সে তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর কলকাতায় আসেন। বাংলা দেশে পদার্পণের পর প্রথম কয় মাস ফেলিক্স্‌কে পিতার সঙ্গে প্রধানতঃ দক্ষিণবঙ্গের নানা স্থানে যাযাবরের জীবন যাপন করতে হয়। আর্থিক অনটন ও ভবিষ্যৎ স্থিতির অনিশ্চয়তা সে সময়ে বালক ফেলিক্স্‌কেও নিশ্চয় অভিভূত করে থাকবে। আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে অন্য অনেক নবাগত ইওরোপীয়ের মত ফেলিক্স্‌ও ঐ সময়ে প্রাণসংশয়কর অসুস্থতা ভোগ করেছেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন থেকে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত তিনি অতিবাহিত করেন মালদহের মদনাবাটিতে, যেখানে তাঁর পিতা উইলিয়াম নিযুক্ত ছিলেন জর্জ উড্‌নি-র নীলের ব্যবসায়ে। ক্রমে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পিতা ও অন্যান্য পরিজনের সঙ্গে ফেলিক্স আসেন শ্রীরামপুরে। এখানে একাদিক্রমে ১৩ বছর কেটে যায়। এ সময়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মিশনারি ওয়ার্ড-এর সহকারী হিসাবে ফেলিক্স্ মুদ্রণের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। ১৮১৩ থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪ বছরের কিছু বেশি সময় ফেলিক্স্ মুখ্যতঃ ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এ সময়ে বর্মী ভাষায় তাঁর বিলক্ষণ দক্ষতা জন্মায়। ১৮১৮ থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪ বছর ফেলিক্স্ আবার শ্রীরামপুর মিশনে অতিবাহিত করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অধিকাংশ অবদানেরই সৃজনকাল এই সংক্ষিপ্ত ৪ বছরের মধ্যে। এদেশে পদার্পণের ঠিক ২৯ বছর পরে স্বল্পায়ু ফেলিক্স্ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর শ্রীরামপুরে পরলোকগমন করেন।

সমকালীন মিশনারি ও শাসকগোষ্ঠীর কাছে ফেলিক্স্ নানা কারণে নিন্দার্হ হয়েছিলেন, যদিও তাঁর কর্মশক্তি ও যোগ্যতা সম্বন্ধে অন্তত শ্রীরামপুরের মিশনারিরা সচেতন ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তার অবদানের সঠিক মূল্যায়ণের সময় আসতে তখনও এক শতাব্দী বিলম্ব ছিল। গ্রাহকের অভাবে তাঁর কৃত প্রথম বাংলা কোষগ্রন্থ "বিদ্যাহারাবলী"-র অকালমৃত্যু ঘটেছিল, স্কুল বুক সোসাইটির জন্য লিখিত "ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়" নামক ইতিহাসগ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে দুরূহতার অভিযোগ করেছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীরামপুর কলেজের জন্য লিখিত "কিমিয়া বিদ্যার সার" নামে রসায়নগ্রন্থে অনুবাদক ফেলিক্সের ঋণ স্বীকৃত হয় নি, "দিগদর্শন" পত্রিকায় তাঁর লিখিত বলে বিবেচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে রামমোহনের রচিত বলে পরিচিত হয়, মিলের লিখিত ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত পুস্তকটির ফেলিক্স্-কৃত বাংলা অনুবাদের সঠিক সন্ধান পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অথচ ধর্মীয় আবহাওয়ার সম্ভাব্য একদেশদর্শিতার উর্দ্ধে উঠে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে বাংলা ভাষার প্রথম পদক্ষেপ ঘটানোর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে

ফেলিক্স্ কেরির। ভাষা; ভাব ও লিখনশৈলীর তৎকালীন দৈন্যকে অতিক্রম করে দুরূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভুল বর্ণনা এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঠিক বিবরণদান তাঁর অসাধারণ ধীশক্তির পরিচায়ক। বিংশ শতাব্দীতেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার প্রশ্নে বহু বাঙালী শিক্ষাবিদ পরিভাষা সৃজনে ও ব্যবহারে অসুবিধা বোধ করছেন, অথচ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিরলসজ্জ সাহিত্যসেবী ফেলিক্স্ জীবনের মাত্র শেষ ৪ বছরে বিদেশী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অসংখ্য পরিভাষা রচনা ও চয়ন করতে দ্বিধা করেন নি এবং তাঁর ব্যবহৃত পরিভাষা আজও অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। "বিদ্যাহারাবলী"র প্রথম খণ্ড "ব্যবচ্ছেদবিদ্যা" শারীরসংস্থান অর্থাৎ অ্যানাটমি-বিষয়ক গ্রন্থ। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় লেখার পরিকল্পনা তাঁর সাহসিকতা ও স্বকীয়তার পরিচয়; অন্যদিকে এই দুরূহ বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় অনস্বীকার্য সাবলীলতা ভাষার উপর তাঁর অধিকারের সম্যক প্রমাণ। বাংলা ভাষার প্রথম বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক হিসাবে প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে আজও কিন্তু ফেলিক্স্ অনেকাংশেই বঞ্চিত।

প্রতিভাধর ফেলিক্স্‌কে প্রথম যুগের অন্যতম ইওরোপীয় প্রাচ্যভাষাবিশারদ বলা চলে। তৎকালীন ইওরোপীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন বাংলা ভাষায় সবচেয়ে পারদর্শী। এছাড়া হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত পালি ও বর্মী ভাষাতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য দক্ষতা ছিল। সংস্কৃত ভাষায় অধিকার থাকায় তাঁর পক্ষে বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য দুরূহ শব্দের পরিভাষা চয়ন ও সৃজনকরা সহজসাধ্য হয়েছিল। তাঁর লিখিত বাংলা গ্রন্থের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যের অভিযোগ করা চলে; কিন্তু বিশেষত: বৈজ্ঞানিক শব্দের জন্য পাশ্চাত্যে যেমন লাতিন গ্রীক থেকে শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে বাংলা ভাষাতেও তেমনি সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে পরিভাষা প্রণয়ন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না এবং তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে গিয়ে ভাষার কিছুটা দুরূহতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাছাড়া অন্তত: বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের ভাষা ও শৈলী সম্বন্ধে কোনও পূর্বানুসৃত রীতি না থাকায় তাঁকে এ বিষয়ে স্ব-পরিকল্পিত শৈলীই ব্যবহার করতে হয়েছে। এদিক দিয়ে তাঁর অবদানকে লঘু করে দেখার কারণ নেই। যাইহোক, ফেলিক্স্ কেরির মৃত্যুসংবাদ দিতে গিয়ে "সমাচারদর্পণ" পত্রিকায় তাঁর রচিত গ্রন্থের যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে "বিদ্যাহারাবলী", রামকমল সেনের সহযোগিতায় লিখিত "ইংরেজী-বাংলা অভিধান" প্রভৃতি বাংলা বই ছাড়া বর্মীভাষার ব্যাকরণ, বর্মীভাষায় রচিত বাইবেলের অংশবিশেষ, বর্মী অভিধান, সংস্কৃত অনুবাদসহ পালি ব্যাকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচ্যদেশীয় ভাষার পুস্তকের উল্লেখ আছে। এদিক দিয়ে ফেলিক্স্ কেরিকে প্রাচ্যবিশারদ উইলিয়াম জোন্স-এর উত্তরসূরী বলা চলে।

ধর্মনিরপেক্ষ জনহিতে ফেলিক্সের আর একটি অবদান চিকিৎসক হিসাবে। শ্রীরামপুরে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে টেলর নামে জনৈক চিকিৎসকের কাছে এবং পরে পরে কলকাতার হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শেখেন শল্যচিকিৎসা অভ্যাস করেন এবং নবপ্রবর্তিত বসন্তের টীকা সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পরে ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে তিনিই প্রথম সে দেশে টীকাদান প্রথা প্রচলিত করেন। আভা ও রেঙ্গুনে চিকিৎসকরূপে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি হয়। এককথায়, আধুনিক রোগনিরাময়বিদ্যা তাঁরই প্রচেষ্টায় ব্রহ্মের অরণ্যসঙ্কুল ভূভাগে প্রথম প্রবেশলাভ করে।

শ্রীরামপুরের মিশনারি সম্প্রদায় তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ কাজের উদ্যমে বিরক্ত হয়েছেন, ধর্মপ্রচারের তুলনায় ভাষার সেবায় এবং রোগনিরাময়ের প্রয়াসে তাঁর উৎসাহের আধিক্য তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রীতিকর ছিল না; কিন্তু ঠিক এই কারণেই বর্তমানে ফেলিক্স্‌কে প্রগতিপন্থীর পর্যায়ে বিবেচনা করা চলে।

ফেলিক্সের সংক্ষিপ্ত জীবনের তুলনায়ও তাঁর অবদান অসম্পূর্ণ। এর জন্য অংশতঃ দায়ী তাঁর মানসিক অস্থিরতা ও অন্যান্য ত্রুটি। চিত্তচাঞ্চল্য, কল্পনাবিলাস, আড়ম্বরপ্রিয়তা, উদ্দেশ্যহীনতা প্রভৃতি ত্রুটি তাঁর প্রতিভানুগ সৃজনাত্মক ক্রিয়াকে বহুবার ব্যাহত করেছে। কিন্তু এই বিপর্যয়ের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে পারিপার্শ্বিকের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব।

কলকাতার পদার্পণের পর প্রথম কয়মাস পিতার নিদারুণ আর্থিক সংকট এমন কি বাসস্থানেরও অনিশ্চয়তা নিশ্চয় তাঁর মত বুদ্ধিমান স্পর্শকাতর শিশুর মনে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের স্পর্শ লাগিয়েছিল। পিতার প্রতি মাতা ডরোথির নিত্যকার গঞ্জনা ও পারিবারিক অশান্তি ফেলিক্সের মনের বিকাশের পক্ষে অকল্যাণকর ছিল। মদনাবাটিতে কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর ডরোথির স্থায়ী মানসিক রোগ জন্মায় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঘরে বন্ধ করে রাখতে হত। মাতৃস্নেহের সম্পূর্ণ অভাব নিঃসন্দেহে ফেলিক্সের মনে নিরাপত্তার অভাববোধ সৃষ্টি করেছিল; এর বিকল্প হিসাবে পিতার অধিকতর সাহচর্য ও ব্যক্তিগত মনোযোগের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু চরম আদর্শবাদী উইলিয়াম নিজের কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে বালকের মানসিক বিকাশে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। নিঃসঙ্গ বালক ফেলিক্স্‌ মুন্সি রামরাম বসুর কাছে বাংলা ভাষার পাঠ নিয়েছেন, গ্রাম্য লোকজনের সাহচর্যে কথ্য বাংলা ও হিন্দুস্থানীতে দক্ষতা অর্জন করেছেন, পিতার প্রেরণায় সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষাও অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু সস্নেহ মনোযোগের অভাব তাতে দূর হয় নি। পিতার ব্যস্ততাজনিত সাহচর্যের অভাবে যে ফেলিক্সের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাও ব্যাহত হয়েছিল সে কথা ওয়ার্ড তাঁর রোজনামচায় এবং মার্শম্যান তাঁর "Life and Times of Carey, Marshman and Ward" গ্রন্থে অগোপনে স্বীকার করেছেন। মানসিক নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে অস্থিরতা, স্থির সংকল্প গ্রহণে ব্যর্থতা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। অংশতঃ মনে মনে অবহেলিত বোধ করার ফলে এবং অংশতঃ মাতার নিকটে প্রাপ্ত বংশগত প্রকৃতির জন্য ফেলিক্স্‌ একগুঁয়ে স্বভাবেরও হয়ে পড়েন।

ঘোরতর আদর্শবাদী উইলিয়াম ফেলিক্সের ১৩-১৪ বছর বয়সেই তাঁর স্কন্ধে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের মুদ্রণ-সম্পর্কিত কাজের গুরুভার অনেকটা ন্যস্ত করেছিলেন; ওয়ার্ডের রোজনামচা থেকে জানা যায় যে এ সময়ে ফেলিক্সের প্রায় সারাদিন কাটতো ছাপাখানার নানা কাজে। এর উপর ছিল শ্রীরামপুর মিশনে অনাকর্ষণীয় জীবন যাত্রার ধরণ—মিশনের হিতার্থে ব্যক্তিগত ব্যয়ের যথাসাধ্য সংকোচ, ধর্মীয় কাজ ও আলোচনায় বৈচিত্র্যহীন দিনযাপন। আদর্শবাদী ও প্রাপ্তবয়স্ক ধর্মযাজকের পক্ষে যা' ছিল আনন্দ ও তৃপ্তির, কিশোর মনের পক্ষে যা' একদিকে অত্যধিক শ্রমসাধ্য ও অপরদিকে সবিশেষ বর্ণহীন হয়ে দাঁড়ায় নিশ্চয়ই হয়তো এই গতানুগতিকতা থেকে উদ্ভূত বিরূপতাই পরবর্তী জীবনে ফেলিক্স্‌কে ধর্মপ্রচার থেকে অন্যতর কাজে আকর্ষণ করে, কিছুটা এজন্যই হয়তো ফেলিক্স্‌ বৈচিত্র্যের সন্ধানে চীনে যেতে চেয়েছিলেন এবং ব্রহ্মদেশে মিশনের কাজেও সোৎসাহে যোগ

দিয়েছিলেন। ফেলিক্স্ কেরি নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চসন্ধানী বৈচিত্র্যসন্ধানী ছিলেন। শ্রীরামপুর ত্যাগ করে ব্রহ্মদেশে যাওয়ার পিছনে আদর্শবাদী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতার সান্নিধ্যের বিরুদ্ধে অবচেতন মনে ধূমায়িত বিদ্রোহও থাকতে পারে অন্যতম সম্ভাব্য কারণ হিসাবে।

নিঃসঙ্গ মনের নির্ভরহীনতাই বোধ হয় ফেলিক্স্‌কে নারীর স্নেহ ও মমতার প্রার্থী করেছিল, মাতৃস্নেহের অভাব তিনি পূরণ করতে চেয়েছিলেন প্রেয়সীর আসঙ্গে। তাঁর প্রথম বিবাহ মাত্র ১৮ বছর বয়সে। শ্রীরামপুরে তাঁর প্রথমা পত্নীর অকালমৃত্যুর পর ব্রহ্মদেশে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন; ইরাবতীর তরঙ্গক্ষুব্ধ জলে স্ত্রী ও সন্তানদের সলিলসমাধি ঘটে। অনতিবিলম্বে রেঙ্গুনে তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করেন; তৃতীয়া পত্নীর মৃত্যুর পর শ্রীরামপুরে আবার তিনি পরিণয়বদ্ধ হন। বারবার স্নেহ ও শান্তির সন্ধানে তাঁর তৃষ্ণার্ত হৃদয় যেন নিষ্ফল প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে দেয়। পারিবারিক জীবনে স্থায়ী স্নেহ, প্রেম ও শান্তির অভাব তাঁকে আরও অস্থির ও উদ্দেশ্যবিরহিত করে তোলে। ব্রহ্ম প্রবাসজীবনের শেষদিকে তাঁকে যখন ব্রহ্মের রাজা রাজদূত হিসাবে কলকাতায় পাঠান, তখন ফেলিক্সের আচার-আচরণে অনাবশ্যক দম্ভ ও মাৎসর্য প্রকাশ পায়, নগরীর পথে পথে বর্ণাঢ্য পরিচ্ছদ-পরিহিত পঞ্চাশ জন কিংকরসহ রাজছত্র মাথায় তিনি শোভাযাত্রা করে যেতেন, মদ্যপান ও ব্যয়বাহুল্যের জন্য তিনি নিন্দিত হতে থাকেন। এরপর ব্রহ্মের রাজার বিরক্তিভাজন হয়ে রাজরোষের ভয়ে তিনি সেদেশে না ফিরে পূর্ব সীমান্তের কোনও বর্বর রাজার মন্ত্রী ও সেনাধ্যক্ষ হিসাবে প্রায় ৩ বছর অজ্ঞাত জীবন যাপন করেন। এককথায়, এ সময়ে তাঁর মানসিক স্থৈর্য ও বিবেচনাশক্তি প্রায় লোপ পায়; রেঙ্গুনে তৃতীয়া পত্নীর আর্থিক দুর্গতি চরমে ওঠে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কোন কর্তব্য পালনের আবশ্যকতাও বোধ হয় ফেলিক্সের মনে আসে নি। তাঁর জীবনের এই সংকটকে সম্পূর্ণভাবেই মানসিক অশান্তির প্রকাশ বলা চলে। পারিবারিক জীবনের ব্যর্থতা তাঁর সৃজনশক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে দেয়।

পূর্ব ভারতের অরণ্য থেকে ক্লান্ত হৃতগৌরব ফেলিক্স্ শ্রীরামপুর ফিরে আসেন। শ্রীরামপুর মিশনে তাঁকে দেওয়া হয় মুদ্রণ-সহায়কের সামান্য পদ। জীবনের শেষ ৪ বছর তিনি পিতার সাহচর্যে ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে যান। যে বিক্ষুব্ধ মন বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়েছে বারবার, অজানিত শান্তি ও প্রতিষ্ঠার সন্ধানে ব্রহ্ম ও ভারতের দুর্গম অরণ্যপ্রদেশে ছুটে বেড়িয়েছে, মাত্র শেষ ৪ বছরের শান্ত প্রহরগুলিতে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম অধ্যায়ের পাতায়। বহুমুখী প্রতিভায়, মানসিক অস্থিরতায় বিদেশের কল্যাণসাধনে, জীবনের পটপরিবর্তনে —ফেলিক্স্ কেরির সঙ্গে কিছুটা তুলনীয় আরব রাজনীতিতে খ্যাতিমান টমাস এডওয়ার্ড লরেন্স। লরেন্স জীবিতকালেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, ফেলিক্স্ কিন্তু আজও অনাদৃত।

বটতলার কথকতা

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাজিত হরিহর অপুর বাবা। জীবনের শেষ অধ্যায়টা তিনি কাশীতে গঙ্গার ঘাটে সমব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথকতা পাঠ করে জীবিকানির্বাহ করতেন। পল্লীগ্রামের স্মৃতি সঞ্চয় করেছেন অথচ সন্ধ্যার অন্ধকারে চণ্ডীমণ্ডপে জমিদারবাবুদের হ্যাজাক জেলে কথকতা শোনার স্মৃতি মনে পড়েনা এমন কেউ নেই বোধহয়।

কথকতার সৃষ্টি কথাটুকু সংবাদপত্র থেকে উদ্ধার করছি—"হিন্দুধর্মশাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা পরিত্যাগ অবধি যাবৎ শয়ন কাল দিবাকে ভাগে ভাগ করিয়া গৃহস্থের এক একটি কর্তব্যতার উপদেশ করিয়াছেন। ইতিহাস ও পুরাণাদি শ্রবণ দিবসের ষষ্ঠ ও সপ্তমভাগের কর্তব্য। হিন্দু শাস্ত্রকারের দিগের মতে এইটিই বিশ্রামকাল। বিশ্রামকালে নির্দোষ আমোদ প্রমোদের অনুভব অপ্রশংসনীয় নয়। ইতিহাস ও পুরাণাদির দ্বারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও জ্ঞানোপার্জনেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। পুরাণাদি সংস্কৃততে লিখিত, এদেশে সকলে সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, সুতরাং তাহা দ্বারা সাধারণের প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই। প্রথমে বাঙ্গালাদি ভাষায় পুরাণাদি ব্যাখ্যা প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই প্রথা হইতেই ক্রমে ক্রমে কথকতার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাখ্যাকর্তারা দেখিলেন, কেবল নীরস ব্যাখ্যায় সকলের মনোরঞ্জন হয় না, ক্রমে উহাতে স্বর ও গীত যোগ করিলেন।' এই উদ্ধৃতিতে বাংলাদেশে কথকতার জন্ম ইতিহাস মোটামুটি ধরা পড়েছে। একদা কথকতা অশিক্ষিত জনতার ধর্ম ও পুণ্যক্ষুধা লোভ মেটাবার ছিল একমাত্র উপায়। উৎসব পার্বণে বাড়ীতে কথকতা পাঠের আয়োজন করা ছিল সামাজিক সম্মানেরই অন্যতম সোপান।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্বল্পান্ধকার সভ্যতায় বহু মনোহারী বস্তুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিভিন্ন ডামাডোলে সৃষ্টিকর্তার নাম হারিয়ে যায়। যেমন ধরুন আখড়াই, একদা বাংলাদেশের অন্যতম আকর্ষণটি প্রথম কার 'অবদান' তা আজ গবেষণার বিষয়বস্তু। তাঁরই নাম শোনা যায় যিনি এই নতুন অবাদানকে বিখ্যাত করেন। রসগোল্লা কে প্রথম প্রর্বতন করেন মনে থাকে না, বরং কার তৈরি রসগোল্লা বিখ্যাত হয়ে ওঠে তা বলা সহজ। আখড়াইয়ের ক্ষেত্রেও তাই। কথকতার ক্ষেত্রেও তাই। "গদাধর শিরোমণি ইহার সৃষ্টিকর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।" গদাধর সম্পর্কে বিস্তৃত কোন তথ্য পাওয়া যায় নি তবে ১২৭০ সালের সংবাদপত্রে জানা যায় তিনি একশত বৎসরের অধিক দিনের লোক নহেন।" গদাধর বাঁশবেড়ের অধিবাসী। "যিনি ইহার প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন সন্দেহ নাই।" গদাধর একদা কথকতার জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন যেমন ছিলেন টপ্পার জন্য নিধুবাবু। স্বাভাবিক ভাবেই এর পর গদাধর শিরোমণি কিছুটা অহংকারী হয়ে পড়েন। এমনি একটা কৌতূহল জনক ঘটনাই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কথকতা শিল্পীকে পাদপদীপের আলোয় নিয়ে আসে। কুশদহের একজন ধনী বণিক একবার গদাধরকে বায়না দিয়ে আসে। কুশদহে গদা নেই, কৃষ্ণভক্ত নেই বলে বায়না নিয়েও গদাধর এলেন না, বায়নার টাকা

ফেরত দিলেন। কিন্তু অন্য কথক যথারীতি কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য এলেন। এখন কথকতা তো একা হয় না—'দোহার' বা ধারক দরকার।

এ নিয়ে গ্রাম্য রসিকতাও আছে। কথকতা সাধারণত বৈষ্ণবধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার—অন্তত আগে তাই ছিল। কিন্তু কথক সবাই বৈষ্ণব ছিলেন না। ব্যঙ্গ গল্পে জানা যায় দুজন মুচি জাত ব্যবসা ছেড়ে দিব্যি তিলক কেটে কথকতা গেয়ে বেড়াত। একবার তারা দুজনে ভিনগাঁয়ে 'কথকতা' গাইতে চলেছে। এমন সময় নির্জন মাঠে দেখল একটা মরা গরু পড়ে আছে। তারা অমন নধর গরুর মৃতদেহের কথায় ভাবল খাসা চামড়া হবে। তখন যে নেতা সে অন্যজন 'ধারক'কে বলল, 'তুই ফিরে যা গরুটার দেহ নিয়ে, তারপর চামড়া ছাড়িয়ে রেখে ফিরে আসবি। ততক্ষণ আমি একাই ম্যানেজ করে রাখব কথকতার আসর।' ধারকটির নাম ছিল হরিদাস। সে গরুটার ঠ্যাং ধরে টানতেই গরুটা নড়ে উঠল। আসলে গরুটা ঘুমোচ্ছিল—তাই দেখে এরা মরা ভেবেছিল। যাই হোক হরিদাস পুকুরে হাতধুয়ে হতাশ হয়ে আসরের দিকে চলল। গিয়ে দেখে জমজমাট আসর—তার 'গুরু' কথক একাই গান গেয়ে চলেছে। অশিক্ষিত গ্রাম্য জনতাকে ফাঁকি দিয়ে মুচি কথক গানের তালে গেয়ে গেল 'কি হইল হরিদাস!' হরিদাস এই ফাঁকে এক লাফে আসরে ঢুকে গেয়ে উঠল' 'চরণ ধরিতে খাইতে লাগিল ঘাস'। নিরক্ষর গ্রামবাসীরা বুঝতে পারল না তিলককাটা কথকদের (আসলে মুচি) প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

সে যাক্ শেষ মুহূর্তে গদাধর না আসায় অপর গায়ক কৃষ্ণহরি শিরোমণিও গাইতে পারছিলেন না 'ধারক' অভাবে। কুশদহ গ্রামেরই সন্তান রামধন তর্কবাগীশ। ব্যাকরণ সাহিত্য ন্যায়শাস্ত্র পড়ে তিনি শাস্ত্র ব্যবসায়ী এবং গ্রামেই একটি চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন গুরুর পরামর্শে। বিপদে পড়ে কৃষ্ণহরি রামধনকে কথকতার গোড়ার কথা শিখিয়ে নিয়ে ধারক করে গান শুরু করেন। কৃষ্ণহরির গুরু ছিলেন রামরুদ্র ন্যায়বাচস্পতি। তাঁর ইচ্ছা ছিল ছাত্র রামধন কথকতার বৃত্তি নিক।

যাঁরা নিধুবাবুর টপ্পা ও তাঁর শিষ্য মোহনচাঁদের কথা জানেন তাঁরা বুঝবেন যুগের চাহিদার তাল সামলাতে রামধনও গতানুগতিক পথ থেকে সরিয়ে ছিলেন কথকতাকে। কৃষ্ণহরির কাছে কথকতার 'মূল কথা' জেনে নিয়ে রামধন কথকতাকে ঢেলে সাজালেন। দুর্গাচরণ রক্ষিতের কুশদ্বীপ কাহিনীতে জানা যায় এ সময় রামধনের বয়স মাত্র আঠার। রামধনও কৃষ্ণহরির গতানুগতিক কথকতাতে বিরক্ত হয়ে গুরুর আদেশে 'নূতন' পথে কথকতা সুরু করলেন।

এই নূতন কথকতাটি জানবার আগে পুরানো ব্যাপারটাও জানা দরকার। 'যথার্থ কথা বলিতে কি, রামধনের পূর্বে গদাধর শিরোমণি ও কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য প্রভৃতি যে কথকতা করিতেন, তাহা মহাভারত ও ভাগবতীয় কথা বলিয়াই সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিত ও তাহাই লোকে একমনা হইয়া শ্রবণ করিত।' বলাবাহুল্য অন্ধভক্তিতে পুণ্যের লোভাতুর নিরক্ষরেরা বেশিদিন তৃপ্ত হতে পারেন না। তাই 'রামধন যে প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন, তাহা সাধারণের ধর্ম শিক্ষার ও ভক্তি আকর্ষণের যেমন মহাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল, উহার রচনা পারিপাট্য, সঙ্গীত সমাবেশ, সাময়িক বর্ণনা, সুললিত বাক্য বিন্যাস যোগ্যতা প্রভৃতিও লোকসাধারণের তেমনই প্রীতিকর হইয়াছিল।'

বলা বাহুল্য এরপর রামধনের জনপ্রিয় হতে দেরী হল না। কথকতাও জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

সখের যাত্রা, থিয়েটার, টপ, কীর্তন যেমটার মত জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার একটা নিষ্ঠুর দাবীও আছে। অন্যান্যগুলোর মত কথকতাতেও সে লঘু চটুলতা এল। সেকথা বলার আগে রামধনের জনপ্রিয়তার কথাই বলি। দীনবন্ধু মিত্র বলছেন—

'ভদ্রজন বাসস্থান, গরিফা নৈহাটী, | ভাটপাড়া যথা চতুষ্পাঠী পরিপাটী।
পণ্ডিত মণ্ডলী করে শাস্ত্র আলাপন, | ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড় দরশন।
এই স্থানে রামধন কথক রতন, | কলকণ্ঠ কলে কল করিত কলন।
সুললিত পদাবলী বিরচিত তাঁর, | সকল কথক সুরে করিছে বিহার।'

এই প্রসঙ্গে দুর্গাচরণ রক্ষিতের কুশদ্বীপ কাহিনী থেকে একটি কথা উদ্ধৃত করা যায়, যে কুশদহের অহংকার সেখানে অন্যান্য সুধীমণ্ডলীর জন্মস্থান না হলেও শুধু এক রামধনের জন্যই "কুশদ্বীপের মুখচন্দ্র স্বতঃ আলোকিত হইত এবং কস্মিনকালেও সেই বিমল মুখমণ্ডল কলঙ্কিত ও রাহুগ্রস্ত হইত না।" এমনি জনপ্রিয় ছিল রামধনের কথকতা। "রামধনের কথকতা এরূপ শ্রুতিমনোহর ও লোকশিক্ষায় অমোঘ উপায় হইয়া উঠিল এবং সাধারণে এতদূর আগ্রহ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করিত যে দ্বিসহস্র আবালবৃদ্ধবণিতার সমাবেশে একটা সামান্য সূচীপাত স্বর অনায়াসে শ্রুতি গোচর হইত। রামধন দুই পুত্র এককন্যা রেখে আনুমানিক যাট বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁরই অন্যতম পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ' আন্দোলনে তিনিই প্রথম বিধবা বিবাহ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সে স্বতন্ত্র ইতিহাস।

রামধনেরই ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণীধর রামধনের কাছে কথকতা শেখেন এবং জনপ্রিয় হন। কিন্তু কথকতা ক্রমশই বটতলার খেউড় মুখর সমাজে জনপ্রিয়তার পিছন অন্ধকারে হারিয়ে যেতে থাকে। ক্রমশ কথকতা এত 'অশ্লীল' হতে থাকে যে সোমপ্রকাশে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তার পর সম্পাদকীয়। "এক্ষণে আমাদিগের প্রস্তাব এই, বিষয়টি যখন এত দোষের আকর হইয়া উঠিয়াছে তখন ভদ্রলোকদিগের এ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া আর বিধেয় হয় না।"

ক্রমশ অশ্লীল কথকতা কেবল নীচঃশ্রেণীর পুরুষ ও মেয়েমহলে স্থান পায়। "অশিক্ষিত দলের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও নীচ লোকেরাই অধিকতর ভক্ত।" 'অশ্লীল' হলেত জনপ্রিয় হবারই কথা, অন্তত সেদিনের সমাজ। কিন্তু এক্ষণে দিনে দিনে হিন্দু সমাজের অবস্থা পরিবর্ত সহকারে যেমন লোকের মনে ভাব পরিবর্তিত হইতেছে, তেমনি কথকতার প্রাদুর্ভাব হ্রাস পাইতেছে।" এর বিভিন্ন কারণ—

(১) হিন্দুধর্মের প্রতি ঘৃণা দেখাতেন বলে ইয়ংবেঙ্গল কথকতা সহ্য করতেন না।

(২) যে সকল পুরাণাদি লইয়া কথকতা করা হয়, তদ্বারা সৎ ও অসৎ উভয়বিধ উপদেশ শিক্ষার সম্ভাবনা আছে। মানুষের মন অসৎ উপদেশ গ্রহণে যেরূপ অগ্রসর হয়, সদুপদেশ গ্রহণে সেরূপ হয় না। কৃষ্ণলীলা বর্ণনাবাসরে রাস ও বস্ত্র হরণাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অশিক্ষিত যুবতীর চিত্ত অবিচলিত থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু 'কথকতার অশ্লীল ভাগটি পরিত্যাগ করিয়া যদি গুণভাগ ও রাগরাগিনীর বিষয় পর্য্যালোচনা করা যায়, ইহা একটি উপদেশ লাভ ও মনোরঞ্জনের উত্তম উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই।'

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

হীরা (বিষ: ৭ম পরি) ॥

দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার ভালবাসার তীব্রতা দ্বারা হীরা চরিত্রের মালিন্য কিছুটা ধুয়ে গেছে। দেবেন্দ্রের পাপবাসনার সংগিনী না হয়ে সে দেবেন্দ্রের সহধর্মিনী হ'তে চেয়েছিল।

কুন্দকে বিষ দিয়ে হত্যা করার পিছনে হীরার কি উদ্দেশ্য ছিল তা সে নিজে দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় ব্যক্ত করেছে—"যে দিন তুমি আমাকে উৎসৃষ্ট করিয়া নাথি মারিয়া তাড়াইলে, সেই দিন হইতে আমি পাগল হইয়াছি। আমি আপনি বিষ খাইতে গিয়াছিলাম—একটা আহ্লাদের কথা মনে পড়িল—সে বিষ আপনি না খাইয়া তোমাকে কি তোমার কুন্দকে খাওয়াইব। সেই ভরসায় কয়দিন কোন মতে আমার পীড়া লুকাইয়া রাখিলাম—আমার এ রোগ কখন আসে, কখন যায়। যখন আমি উন্মত্ত হইতাম, তখন ঘরে পড়িয়া থাকিতাম; যখন ভাল থাকিতাম, তখন কাজকর্ম করিতাম। শেষে তোমার কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মনের দুঃখ মিটাইলাম; তাহার মৃত্যু দেখিয়া অবধি আমার রোগ বাড়িল। আর লুকাইতে পারিব না—দেখিয়া দেশত্যাগ করিয়া গেলাম। আর আমার অন্ন হইল না—পাগলকে কে অন্ন দিবে ? সেই অবধি ভিক্ষা করি—যখন ভাল থাকি, ভিক্ষা করি; যখন রোগ চাপে, তখন গাছতলায় পড়িয়া থাকি। এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।" (৫০ পরি:) ॥

হীরা চরিত্র যেমনি ঘৃণ্য, তার শাস্তিও তেমনি ভয়ানক। বঙ্কিম যে বিচারক তা তিনি ভোলেননি।

হীরার আয়ি (বিষ: ১৯ পরি:) ॥

হীরার পালিকা এই বৃদ্ধাকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। স্বল্প অবসরে চরিত্রটি সার্থক হয়ে উঠেছে। হীরার 'ইষ্টিরস' রোগের জন্য যেভাবে আয়ি 'কেষ্টরসের' বিধান এনেছে তাতে হাস্যরসের এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে।

হীরালাল (রজনী ১।৫) ॥

'রজনী' উপন্যাসের অল্প অবসরে হীরালালের ভিলেন চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম হীরালালের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—সে মদ খায়, গাঁজা খায়। একটি খবরের কাগজ করে জাঁকিয়ে বসল, কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিশের হাতে পড়ল। অবশেষে নাটক লিখতে বসল। কিন্তু তাতেও না চলায়, শেষ পর্যন্ত "হীরালাল চাঁপাদিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।"

রজনীর অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে হীরালালের প্রস্তাব ও নদীর মধ্যে এক নির্জন দ্বীপে ত্যাগ করে যাওয়া জঘন্যতম মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

বঙ্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্রের মতে 'রজনী'র হীরালাল চরিত্র তৎকালীন এক সংবাদপত্র-সম্পাদকের ছায়ানুসরণে রচিত। কিন্তু বঙ্কিম কালীপ্রসন্ন ঘোষকে পত্র দ্বারা জানান, ব্যক্তিবিশেষ কোন সম্পাদককে তিনি আক্রমণ করেননি। সেই সময়কার বহু সম্পাদকের সাধারণ চরিত্র বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়েছে।

হৃষীকেশ (মৃণা: ১।২) ॥

হৃষীকেশ মাধবাচার্যের এক শিষ্য। এঁর গৃহেই মাধবাচার্য মৃণালিনীকে রেখে এসেছিলেন। হৃষিকেশ সাধারণ মানুষ। নিজ পুত্রের দোষ তিনি দেখেন না। তাই মৃণালিনীকে তিনি কুলটা অপবাদ দিয়ে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছেন।

হে (কাপ্তেন, আনন্দ: ৩।১০) ॥ কাপ্তেন টমাসের সহযোগী একজন ইংরেজ সৈনিক।

হে (চন্দ্র: ৩।৩) ॥

ইংরেজ। অমিয়ট চলে গেলে নবাবের সংগে সাক্ষাৎ করবার জন্য নাকি হে-কে রেখে যায়—গুরগণ একথা নবাবকে বলেছেন।

হেমচন্দ্র (মৃণা: ১।১) ॥

হেমচন্দ্র চরিত্রটিকে দেশপ্রেম, বীরত্বে ও প্রেমের প্রকাশে আদর্শচরিত্ররূপে উপস্থাপন করা হয়েছিল সত্য, কিন্তু শেষপর্যন্ত সমস্ত গুণগুলিই অসংগত হয়ে উঠেছে।

হেমচন্দ্র হৃত পিতৃরাজ্য উদ্ধারকামনায় বক্তিয়ার খিল্‌জির সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি অন্যায়ভাবে সুযোগ বুঝে বক্তিয়ার খিল্‌জিকে মারতে চাননি। তাই তিনি বলেছেন—"আমি কি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শত্রু মারিব ? আমি মগধবিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধ-রাজপুত্র নামে কলঙ্ক।"

কিন্তু হেমচন্দ্রের সমস্ত বীরত্ব আস্ফালনে পরিণত হয়েছে তাঁর ছেলেমানুষীসুলভ আচরণে। মাধবাচার্য কর্তৃক যেভাবে হেমচন্দ্রকে বারবার যুদ্ধে উৎসাহ দান করা হয়েছে তাতে মনে হয় না যে শত্রু আক্রমণে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ আছে। তাছাড়া নবদ্বীপে গিয়েও তিনি যথার্থ সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি। যেভাবে শান্তশীলের কাছে তিনি বন্দী হয়েছেন, যেভাবে একাকী শত্রু-সেনামধ্যে গিয়ে পড়েছেন, তাতে তাঁর বুদ্ধিরও প্রশংসা করা যায় না।

হেমচন্দ্র একাকী তিনজন যবনসেনার সংগে যুদ্ধ ক'রে একবার বীরত্ব প্রকাশ করেছেন। নবদ্বীপে যবন অত্যাচারকালেও তাঁর বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর তিনি সেবাকার্যে ব্রতী হন।

মৃণালিনীর প্রতি হেমচন্দ্রের ভালবাসার স্বরূপ নির্ণয় করাও দুরূহ। যে মৃণালিনীকে দর্শনের জন্য তিনি পাগল, সেই মৃণালিনীর কুৎসা তিনি অনায়াসে বিশ্বাস করেন, এমনকি মৃণালিনীর সব কথা জানতেও তিনি নারাজ।

মনোরমার প্রতি ব্যবহারে হেমচন্দ্রের মনের সুকোমল ভ্রাতৃভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গিরিজায়ার প্রতি ব্যবহারে হেমচন্দ্রের সকল গুণ ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। গিরিজায়াকে হেমচন্দ্র বেত্রাঘাত করতে গেলে গিরিজায়া বলেছে—"বীর পুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিন্তু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরিবদুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।" তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাক, তুমি আমার যোগ্য নও।"

বাস্তবিক, বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে এমনিই হেয় ক'রে ফেলেছেন।

হেমা (ইন্দিরা ১৯ পরিঃ) ॥

সুভাষিণীর পাঁচ বছরের মেয়ে। "মেয়েটি বড় শ্লোক বলিতে ভালবাসিত।"

হৈমবতী (বিষঃ ১০ম পরি) ॥

দেবেন্দ্রের স্ত্রী। 'হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়না।" এর জ্বালাতেই দেবেন্দ্র চরিত্রহীন হয়েছিল।

হৈমবতী (মৃণাঃ ২।৬) ॥

মনোরমার প্রথমজীবনে নাম ছিল হৈমবতী। (দ্রঃ মনোরমা)।

হোসেন শাহা (দুর্গেঃ ১।৫) ॥

'বাঙ্গালার পাঠান সম্রাটদিগের শিরোভূষণ হোসেন শাহা'র নাম 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। বঙ্কিম বলেছেন—তাঁরই সেনাপতি ইস্মাইল গাজি গড়মান্দারণ দুর্গ নির্মাণ করেন।

রবার্ট ব্রাউনিংএর কবিতা

রসের লিখন অরসিকের কাছে নিবেদনের যোগ্য নয়। সর্বজনীনত্ব মানেই সার্থক নয়। স্বাতন্ত্র্য সকলের শ্রদ্ধেয় নাও হতে পারে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রেখাঙ্কিত দেদীপ্যমানতাই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে, নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাকে সযত্নে রক্ষা করে। স্বীয়কাল এবং নিরবধি কালের বিস্তৃত মোহনাতে একটি মানুষ ও তাঁর সৃষ্টিকে যা ঐহিক অমরতা দান করে তা' এই স্বাতন্ত্র্যই।

যতবারই ব্রাউনিং পড়েছি, ততবারই মনে হয়েছে যে ব্রাউনিং-এর মূল আকর্ষণ হলো এই স্বাতন্ত্র্য। ভিক্টোরীয় যুগের অন্যান্য কবিরা একদিকে; আর একদিকে ব্রাউনিং—একক ও নিঃসঙ্গ পদাতিক। একক, কিন্তু সামান্য নন। তাঁর অসামান্যতা এমনই অনিবার্য যে, তাঁর প্রকাশে ইংরেজী কাব্যাকাশে এক নতুন নক্ষত্রের আলোতে সব অসম্ভব জ্যোতির্ময়।

ব্রাউনিং সাধারণ পাঠকের জন্য সুলভ মনোরঞ্জনকারী কবিতা লেখেন নি। তাঁর কবিতা কেবলমাত্র বিদগ্ধ এবং সহৃদয় পাঠকেরই সম্পদ। কারণ "এক গভীর প্রজ্ঞাধর্মী আনন্দের স্বাদ" লাভই তাঁর কাব্য পাঠের নিশ্চিত ফলশ্রুতি।

আমাদের সৌভাগ্য যে ব্রাউনিং-এর পাঠক সংখ্যা অত্যন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক। মননদীপ্ত বৈদগ্ধ্য ব্যতিরেকে ব্রাউনিংএর পাঠ সম্ভবপর নয়। আর মস্তিষ্ক নামক বস্তুটি চিরকালই বড় বেশি দুর্লভ।

ব্রাউনিংএর কবিতা দুর্লভের সম্পদ। বারোয়ারী তলার হাটে বসে তা পড়ে বোঝা যাবে না। মনস্তাত্ত্বিক সত্যের উদ্‌ঘাটন ব্রাউনিংএর কবিতাকে এমনই এক দুর্লভের দুর্গম শীর্ষে স্থাপন করেছে কিংবা অতলান্তিক গভীরতার মধ্যে করেছে তাকে নিক্ষেপ, যেখানে পৌঁছাতে হলে অনেকদিনের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

বলা যেতে পারে, ব্রাউনিং নাবালক পাঠকের উৎক্রান্তিক মনোবিলাসীর আকর্ষণের বস্তু নন; সাবালক পাঠক ও স্থিতধী মনেরই সম্পদ হলেন ব্রাউনিং। তাঁর কবিতাতে উৎকট দেশপ্রেম (?), সাংস্কারিকের স্বপ্ন, বা তথাকথিত বিপ্লববাদ বা সমাজগড়ার আকাঙ্ক্ষা নেই। তাঁর কবিতায় প্রেম—যদিও প্রেমই তাঁর অধিকাংশ কবিতার মূল নিয়ন্ত্রণা, তথাপি তা আটপৌরে প্রেম নয়।

ব্রাউনিংএর কাছে প্রেম এমনই মূল্যমানে উন্নীত যার তুলনা করা যাবে না টেনিসন কী রসেটির সঙ্গে; ভুল হবে এই প্রেমকে কীটসের রূপ মনোরমতা দিয়ে বিচার করলে। ব্রাউনিংএর কাছে প্রেম এমনই এক অনুভূতি যাকে কোন বিশিষ্ট সংজ্ঞা বা প্রকরণে বাঁধা অন্যায়। তিনি প্রেমকে জীবনের এক নির্দেশিকা শক্তি বলেই মনে করতেন এবং এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল তাঁর মনে

যে প্রেমহীন জীবন উষর, অনাবাদী জমির মতন। তাঁর সঙ্গে এলিজাবেথ ব্যারেটের প্রেমের কাহিনী সাহিত্য পাঠকদের কারোরই অজানা নয়। প্রেমের ট্রাজেডি বা বিরহ বেদনার কথা ব্রাউনিংএর কবিতাতে কদাচিৎ মেঘমালা সঞ্চার করেছিল; কিছু কবিতাতে বিষাদ ঘনায়মান দেখাবার অবশ্য কারণ সেগুলি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরই লেখা। ব্রাউনিং মনে করতেন যে ভাগ্যকেও জয় করেছে এই প্রেম। অদৃষ্টকে পরিহাস করেছে সে। প্রেমেই জীবনকে দিয়েছে পরিপূর্ণতা। ভালোবাসা জেলে দিয়েছে বৈদূর্যমণি।

মৃত্যুতে অবসান ঘটেনা প্রেমের। এভিলিন হোপ ষোলো বছর বয়সে মারা গেল। সে জেনে গেল না যে তার প্রেমিক তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। বিষাদে মলিন হয়নি সে।

ব্রাউনিং প্রেমকে জীবনের এক বিশিষ্ট অনুভূতি বলে মেনেছিলেন যেহেতু তাই সম্পূর্ণ করে কাউকে পাওয়াতেই যে প্রেমের সার্থকতা একান্ত ভাবে নির্ভরশীল, একথা তিনি মানতেন না। পরন্ত প্রেমের স্মৃতিচারণে তাঁর তৃপ্তি ছিল বেশ অনেকটা। লাস্ট রাইড টুগেদার এবং লাভ এ্যামঙ দি রাইন কবিতাতে এই স্মৃতিচারণের কথাইতো উচ্চারিত হয়েছে।

প্রেমই ছিল ব্রাউনিংএর কাছে ঈশ্বর, আর ঈশ্বরই ছিলেন প্রেম। প্রেমও ঈশ্বরের এই অভিন্ন সত্তা ব্রাউনিংএর কবিতাগুলিকে এক অপার মহিমা দান করেছে সন্দেহ নেই।

ব্রাউনিং দুঃখ, হতাশা, ব্যথা বিষন্নতা ইত্যাদির কথা স্বীকার করা সত্বেও অন্যান্য কবিদের মতন তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন নি কোন সময়। হয়তো এটা ব্রাউনিংএর পলায়নী মনোবৃত্তি বলে ঘোষণা করতে চাইবেন অনেকে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ব্যক্তিগত ভাবে ব্রাউনিং প্রেমকে তাঁর আত্মশুদ্ধিরই মূল উৎস বলে ভাবতে ভালবাসতেন। প্রেম তাঁর কাছে ছিল অতি পবিত্র এবং দুর্লভ —ভগবানের আশীর্বাদের মতন।

ব্রাউনিংএর প্রেমে টেনিসনের দীপ্তি নেই; রসেটির উচ্ছ্বাস কিংবা তীব্রতা নেই, বায়রনের চাঞ্চল্যও নেই, সৌন্দর্যের আদর্শায়িতাও নেই কিন্তু এদের সকলের সংমিশ্রণের এক অদ্ভুত সংকর সম্পদই ব্রাউনিংএর প্রেমের কবিতাগুলির মর্মবাণী হয়ে মহাকালের দরবারে টিকে আছে। টিকে থাকবে।

প্রেম থেকেই ক্রমশ ব্রাউনিং সমগ্রজীবন দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছিলেন। যেহেতু ভালোবাসাই ছিল তাঁর সমগ্রকাব্য প্রয়াসের আত্মশক্তি, তিনি তাই জীবন সম্পর্কে কোনরকম নৈরাশ্য বা হতাশা পোষণ করেন নি তাঁর প্রাক্তন কি সমকালীন নতুবা পরবর্তীদের কারো মতন। বরং এক উজ্জ্বল আশাবাদই ব্রাউনিংএর যাবতীয় সৃষ্টিকে প্রেরণা যুগিয়ে গেছে। সবকিছুকে তিনি দেখেছেন ক্ষমাপ্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর মতন মানসিক স্থিতি খুব কম কবির মধ্যেই দেখা যায়। আর অস্থিরতা কখনোই গভীর মনোপ্রকর্ষের অনুকূল হতে পারে না।

মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে ধারণা ছিল ব্রাউনিংএর এবং জীবনের আশা নৈরাশ্য ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁর মনকে আলোড়িত করেছিল। কিন্তু যেহেতু তাঁর মধ্যে সর্বদা প্রাধান্যলাভ করেছিল এক অন্তর্মুখীনতা তাই তাঁর বহিঃপ্রকাশ ছিল সামান্যই। তিনি বিশিষ্ট বাক্যব্যবহারে কিভাবে মনের কথা বলতে হয় তা এত বেশী ভালো করে জানতেন যে তাই তাঁর কবিতার পাঠকসংখ্যা

টেনিসন কি রসেটির মতন গোড়ার দিকে বিপুলহারে বর্দ্ধিত হয়নি। নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠক—রসবেত্তা পাঠকই ব্রাউনিংএর কবিতায় অনুরাগী ছিলেন। সমমর্মী কিংবা সমধর্মী ভিন্ন অন্যকেউই ব্রাউনিং পড়তে সক্ষম ছিলেন না।

জীবনে সঙ্গীতের যে একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে, এবিষয়ে ব্রাউনিং বেশ সচেতন ছিলেন। কিন্তু ব্রাউনিংএর কাব্যে কোথাও এই সঙ্গীত এক উচ্চকিত কলতানের সৃষ্টি করে নি। পরন্তু এক রেশবাহী সঙ্গীত যা' জীবনকে দেয় আশা, দেয় আলো—জাগরণের মন্ত্র তাই ব্রাউনিংএর কাছে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা হয়ে বেজেছিল।

এই সঙ্গীতই তাঁর বাণীবহ ছিল, বলে বলা যেতে পারে। তা ছাড়া কোন আলাদা বাণী তিনি প্রচার করেন নি কোন প্রফেটের মতন। তাঁর কোন বিশেষ ধর্মমত, দর্শন বা মতবাদ ছিল না।

এক বলিষ্ঠ আশাবাদই ব্রাউনিংএর জীবনদৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। জীবনের নানান সমস্যা, নানান রকমের দ্বন্দ্ব, কোলাহল, গ্লানি সব কিছুর মধ্যে তিনি জীবনকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন আমাদের। তাঁর মধ্যে কোনরকম মনোবিকলন, হতাশা, নৈরাশ্য, বিষণ্ণতা, অবিশ্বাস আমরা কোনদিন লক্ষ্য করিনি।

কর্মময় জীবনের সাধক ছিলেন ব্রাউনিং। কাজের মধ্যেই সতত ডুবে থাকবার শিক্ষা দিয়েছেন তিনি আমাদের। আর এই কাজ করতে হবে ফলপ্রাপ্তির আশাকে পরিত্যাগ করে। জীবনে ভুলেরও মর্যাদা আছে বলে মানতেন তিনি। মনে করতেন এই ভুলের মধ্য থেকেই সত্য বেরিয়ে আসবে। অভিজ্ঞতাই শেখাবে শেষপর্যন্ত। অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি লাভের অভ্রান্ত সোপান এই অভিজ্ঞতা। ব্রাউনিং তাই বলেছেন—

Man—Creeps ever on from fancies to the fact,
And in this striving···
Finds progress···
Man's distinctive mark alone.

তাঁর জীবনদর্শনকে তাই প্রয়োগকারী দর্শন—প্রাগ্‌ম্যাটিক বলেই অভিহিত করবো আমি।

তিনি বলতেন যে ভালোকে চিহ্নিত করবার জন্যই জীবনে মন্দেরও অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দেয়। অন্ধকারই আলোর মহিমাকে তুলে ধরে। কাজেই মন্দ বলেই কোনকিছুকে বর্জন করতে হবে—এমন কথা তিনি উচ্চারণ করেন নি কোন সময়। অসাফল্য মানেই শেষ,—এমন মনোভাব ছিল না তাঁর কোনদিনও। বরং তিনি মনে করতেন যে অসাফল্যের অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালের প্রচেষ্টাকে আরও যত্নবান করে আমাদের সাফল্যের স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেবে। পৃথিবীর পর্বতপ্রমাণ অসাফল্যের কথা চিন্তা করে অন্যান্য কবিরা যে কালে দুঃখে, হতাশায় মুহ্যমান হন তখন ব্রাউনিং কেমন নিশ্চিন্তেই উচ্চারণ করেন—

Contrast,
Petty done and undone vast.

এ জীবনেই সবকিছুকে পেতে হবে, আর না পেলে হতাশাতে মগ্ন হয়ে যেতে হবে—এমন

কথা বলতে চাননি ব্রাউনিং। তাঁর মতে এজীবনে, এই পৃথিবীতে আমরা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত করছি এক অন্তজীবনের জন্য। এই দিন ইঙ্গিত করছে এক অনাগত দিনের। এই লোক এই ভুবন পথ দেখাচ্ছে পরলোকের॥

ব্রাউনিং পড়ে যতটা বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে তাঁর যুগে একমাত্র তিনিই সবচেয়ে বলিষ্ঠ মনোধর্মের অধিকারী কবি। এক দুঃসহবাদল দিনে তিনিই এনেছেন স্থায়ী সূর্যালোক—সেই তাঁর আশাবাদ। অন্যান্য আদর্শবাদী ইংরেজ কবিরা যে কালে জীবন সাঁয়রে পাড়ি দিতে গিয়ে কূলেই পড়ে কাতরতা প্রকাশ করেছেন তখন একমাত্র কবি ব্রাউনিংই খোলা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন। প্রতিহত তরঙ্গের লবণাক্ত দংশন গ্রহণ করেছেন। তিনিই ছিলেন সেইসব মুমূর্ষদের একমাত্র আবাল্য সুহৃদ যারা পীড়িত। অসুস্থ এই মানসিক রোগে, আধ্যাত্মিক ক্লৈব্য যাদের যন্ত্রণার কারণ।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

সমালোচনা

পাপুর বই ॥ প্রকাশক : ফণীন্দ্রদেব। কলিকাতা-৯ মূল্য ॥ পাঁচ টাকা।

গ্রন্থকার পাপু আজ সব সমালোচনার উর্ধে চলে গেছে। আর মাত্র কয়েক মাস বেঁচে থাকলে এই আলো-হাসি-মায়াময় পৃথিবীতে তার ন'টি বছর পূর্ণ হত। 'যেদিন রব না আমি মর্তকায়ায়,-সেদিন স্মরিতে হলে মন'। শ্রীমান পাপু ওরফে সুব্রত সরকারের বহু ছবি ও রচনার এই সংগ্রহ পাপুর বই। যত নির্লিপ্তি নিরাসক্তি নিয়ে বইটি গ্রহণ করেছিলাম। পাতা ওলটাতে ওলটাতে সেই নিরাসক্তি পরিণত হল কৌতূহলে। মনে হল, ব্যক্তিগতভাবে আমিও তার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি! একবারই তাকে দেখেছিলাম আর একদিন এসে ভাল করে তার ছবি দেখব।

তার বাবা আমার সহকর্মী। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। দু'মিনিট কথার মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম, বর্হিজগৎ সম্পর্কে তার জিজ্ঞাসা অফুরন্ত। কবে 'তির্যকে' কোন ছবি এঁকেছি, সেটা আমাকে জানিয়েই সে যথেষ্ট খুশী নয়। প্রকাশিত কোন ছবির পিছনে কোন সংবাদকে পশ্চাদপটরূপে ব্যবহার করেছি সেটাও সে নিখুঁতভাবে জানে। সেই কথার ফাঁকেই জেনে ফেললাম পাপুও ছবি আঁকে। কথা দিয়েছিলাম, আর একদিন এসে তার ছবি দেখে যাব। সে সুযোগ আর এল না। ছবি আঁকার ক্লান্তি দিয়ে ২রা জানুয়ারী শ্রীমান পাপু ছবির দেশে পাড়ি দিল। পাপুর বই সেই স্মৃতি রোমন্থনের যন্ত্রণা। পাপুর নিজের লেখা গল্প উপন্যাস কবিতা। কিছু সমাপ্ত, কিছু অসমাপ্ত স্থান পেয়েছে। তৎসহ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মেজাজে আঁকা কয়েকটি ছবি। প্রথমেই 'ছুটি'—

রবিবার আসিবে কখন
তারই অপেক্ষায় আমি আছি
ভগবান রবিবার দাও কাছাকাছি।

বাড়ীতে প্রধান সঙ্গী তার দিদি। তার কল্পনারবৃত্ত রচিত হয়েছে এই দিদিকে অবলম্বন করেই। আড়ি-ভাব, ভালবাসা-খুনসুরি সবই দিদিকে নিয়ে। সুখ-দুঃখ কবিতায়—

ওগো সম্রাট
তোমার কি মজা
খাচ্ছ দাচ্ছ ঘুমুচ্ছ
আহা কি আরাম।
আমাদের খেতে হচ্ছে বকুনি
নালিশ করলেই দিদির কছে বকুনি
খাবো দাবো ঘুমুবো। পুষবো শুধু ময়না

খাবো নাকো বকুনি, কাজে কাজে
দিদির ঝুঁটি ধরে ঝুঁকুনি।

একটু ছুটি, একটু মুক্তিলাভের ঝলকানি বারবার আকুল হয়ে উঠেছে। একাধিক রচনায় সেই ব্যাকুলতা সোচ্চার—

সময়ের বড় অভাব ভাই
একটুকু খেলার সময় না পাই
*   *   *
আজ রবিবার বলে নেই বাবার কাজ
ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে আজ।
এমনি করেই বিকেল হয়
সূয্যিমামা আকাশের ওপারে রয়

বিশ্ব ইতিহাসে পিতা-পুত্র, পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক, পারস্পরিক পত্রবিনিময় ইত্যাদি অনেকের জীবনকথায় প্রাধান্য লাভ করেছে। দেবেন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ, জওহর-ইন্দিরা পত্রালাপ কারো অবিদিত নয়। কিন্তু আমাদের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ অবসরে বহু পিতা-পুত্রই বন্ধুত্ব-চর্চ্চার মধ্য দিয়ে পরস্পরের জীবনকে আরও রমণীয় করে তোলার সাধনায় নিমগ্ন। তাদের ঘনিষ্ঠভাবে জানি। বড় বেশী কাছে থেকে দেখি, খ্যাতির দীপ্তি তাঁদের সামান্য চরিত্রকে অসামান্য করে তোলে না। ঘরে ঘরে প্রায় প্রতিটি পিতা-পুত্রই নিজেদের নিজস্ব সম্পর্ককে একান্ত আপন ও বিশিষ্ট করে রেখেছেন। পাপুর ক্ষেত্রেও দেখেছি, পিতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে বাৎসল্যের সঙ্গে সখ্যতার মিশ্রণে এক নবতর কোমল-গান্ধারের সৃষ্টি হয়েছিল। পাপুর মৃত্যু কেবল যে এক মহৎ সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করেছে তাই নয়, পিতৃহৃদয়ের একান্ত-নির্ভয় আশ্রয়টাও কালবৈশাখীর নির্বিচার নির্মমতায় উড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে ধূলিতে নিক্ষেপ করেছে।

চণ্ডী লাহিড়ী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ॥ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা। সংকলয়িতা—শ্রীপুলিনবিহারী সেন। দাম—৬'৫০

'যে সংসারে রবীন্দ্রনাথ জন্ম নিয়েছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন সে সংসারে বাস্তোষ্পতি এবং শক্তিকেন্দ্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বৈদিক অর্থে দম্‌পতি, সংস্কৃত অর্থে কুলপতি এবং ল্যাটিন অর্থে Pater familias ছিলেন।' (ডঃ সুকুমার সেন—রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ—বিশ্বভারতী পত্রিকা)

এই মহর্ষি পিতা কনিষ্ঠ পুত্রের দৃষ্টিতে ছিলেন 'nearest to God'। মহর্ষির সার্ধশতবর্ষ পূর্তি

উপলক্ষে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাই কনিষ্ঠ পুত্রের দৃষ্টি দর্পণেই মহর্ষিকে ধরতে চেয়েছেন ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ’ সংকলনে। সংকলক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন বলাবাহুল্য, একনিষ্ঠ পরিশ্রমে ও অকৃপণ শ্রদ্ধায় এই গ্রন্থ সংকলন করেছেন। সৌদামিনী দেবী রচিত ‘পিতৃস্মৃতি’ রচনায় যে রবীন্দ্রনাথের কলমই কাজ করেছিল (অন্তত আক্ষরিক অর্থেও) এই তথ্যের জন্যও তিনি প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে যাঁদের নিরবিচ্ছিন্ন প্রভাব পড়েছিল এবং তার সুগঠিত চিন্তাধারাকে সুবিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল তাঁদের অনেকের কথা স্বয়ং কবি জীবনস্মৃতি চারণ প্রসঙ্গে বলে গেছেন কিন্তু মহর্ষি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছড়িয়ে রয়েছে কবির সারা জীবনের ক্যানভাসে বিস্তৃত দর্পণে কলমে এবং জীবনেও। সেই বিশাল প্রভাবের ছাপকে একটি সংহত দর্পণে সংকলন করা মানসিক শ্রমসাধ্য কাজ। অবশ্য এখানে আপাতত কলমের কথাটাই আলোচ্য, জীবনে নয়।

বলা বাহুল্য তাই শ্রী সেন এ কাজে বিস্তৃত ভাবে নামেন নি। শুধু ছটি প্রসঙ্গের বিভাগে তিনি সংক্ষিপ্ত রেখেছেন বর্তমান সংকলনটি। মোটামুটিভাবে বলা যায় মূল বক্তব্য সব কিছুই এই ছটি প্রসঙ্গে কোন না কোন ভাবে ধরা পড়েছে। শ্রী সেন প্রস্তাবনাতেই পাঠকদের সম্ভাব্য অতৃপ্তি অনুমান করেই হয়ত বলেছেন “মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতী যে কৃত্যসূচী গ্রহণ করেন, বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত মহর্ষিদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একত্র সংকলন তাহার অন্যতম” এই স্পষ্ট বক্তব্যে স্পষ্টতর হতে পেরেছে সংকলকের কাজের বৃত্ত ছিল কতদূর বিস্তৃত। তবে আশার কথা, কৃত্যসূচী এখানেই শেষ নয়, সম্পূর্ণ তালিকা না জানলেও অনুমান করতে বাধা নেই এই ‘অন্যতম’ কাজটি শেষ হবার পর শ্রী সেন দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ সহজ-সম্বন্ধটিও পুরাতন তথ্য ও নতুন আলোকে দীপ্ত করবেন।

ছটি প্রসঙ্গের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে আমার বেশি ভাল লেগেছে চিঠিপত্র বিভাগটি। মূল চিঠিগুলো গত শীতকালে দেখতে পেয়েছিলাম শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে। সঙ্গে ছিলেন দুজন এই দিকের বিশেষজ্ঞ—‘রবীন্দ্রাথের চিঠিপত্রে’র শ্রীযুক্তা বীণা মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ—এণ্ড্রুজ পত্রাবলীর অনুবাদিকা শ্রীযুক্তা মলিনা রায়। এই চিঠিপত্র দেখে মনে হচ্ছিল দূরে থেকেও মহর্ষি কি অতন্দ্র পর্যবেক্ষণ রাখতেন কনিষ্ঠ পুত্রের ভবিষ্যৎ সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে! কবির উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা, জমিদারী শিক্ষা, পুত্রবধূর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিটি প্রসঙ্গে কি তীক্ষ্ণ তাঁর দৃষ্টিশক্তি! সেই সব চিঠিপত্রগুলো সংকলনে উপহার দেবার জন্য সংকলক নিশ্চয়ই ধন্যবাদ পাবেন সুধীজনের।

কিন্তু পাঠক হিসেবে আরো খুশি হতাম, এইসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনে মহর্ষি প্রসঙ্গটিও পেলে। যেমন ধরা যেতে পারে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রসঙ্গটি। মহর্ষির ট্রাষ্টীকে এ দান ছিল ‘কেবল ধর্মোন্নতির জন্য’। দেবজ্যোতি বর্মন লিখছেন ‘ট্রষ্ট ডীড সম্পাদনের চারি বৎসর পূর্বে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। ট্রষ্টডীডে বর্ণিত তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ করিবেন এ আশা মহর্ষির তখনই ছিল। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেন, ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উৎসবে তিনি সঙ্গীত করেন

এবং অবশেষে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহর্ষি সাগ্রহে সম্মতি দান করেন।' (শান্তিনিকেতন—দেবজ্যোতি বর্মন, প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৯)

আমরা আশা করব, শ্রী সেন শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে পিতাপুত্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্য্যসূচীর সামীপ্য সংক্রান্ত আরেকটি সংকলন আমাদের পরে উপহার দেবেন।

'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' সংকলনে অবশ্য কেবল রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত পিতৃপ্রসঙ্গেরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ ওঠে না হয়ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চিন্তায় মহর্ষির নির্দেশনা (guidance) যে কী অসীম প্রভাবশালী ছিল তার উদাহরণ হিসেবে বোধ হয় উৎসর্গ পত্রটির কথা মনে পড়তে পারে। "এই কাব্যগ্রন্থ পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণ কমলে উৎসর্গ করিলাম।" পিতৃদেবকে তিনি এ ছাড়াও তাঁর 'আলোচনা' উৎসর্গ করেছিলেন (উৎসর্গ পত্র—অমিতাভ চৌধুরী—কণ্ঠস্বর—শারদীয়া '৭৫), কিন্তু নৈবেদ্য প্রসঙ্গটি কবির চিন্তাধারা অনুসরণ প্রশ্নে বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। আর নৈবেদ্যর চিন্তাধারায় মহর্ষির প্রভাবটিও এ প্রসঙ্গে উজ্জ্বল হতে পারত। ডঃ সুকুমার সেন বলছেন "নৈবেদ্যর কোন কোন কবিতায় ও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ যখন ঈশ্বরকে রাজা ও পিতা রূপে দেখছেন তখন তাঁর সেই দৃষ্টিতে তাঁর পিতৃদেবের প্রতিচ্ছবি যেন প্রতিফলিত। ব্রহ্ম উপাসনায় একটি প্রধান মন্ত্র—উপনিষদের "পিতা নোঽ সি, পিতা নো বোধি' রবীন্দ্রনাথ যেন নিজ পিতৃদেবের মূর্তিতে কিছু উপলব্ধি করেছিলেন।" নৈবেদ্যর কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করে ডঃ সেন বলছেন এগুলো উৎসর্গ পত্রেও উদ্ধৃত হতে পারত অনায়াসে।

নৈবেদ্য কাব্যে কবির আধ্যাত্মিক আকৃতি তা বোধ করি প্রথম ধরা পড়েছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর 'দি টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরী' মাসিকের ১৯০১, ৩১শে জুলাই সংখ্যায় তিনি নৈবেদ্যের সমালোচনা করলেন 'নরহরি দাস' ছদ্মনাম "Naivedya is the essence of Bhakti made compatible with the knowledge of the transcendent Reality before whose splendour the shadow of relationship changed into light."

এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাসের উক্তিটিও স্মর্তব্য "বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নিসর্গ উক্তি সম্পূর্ণ ফলিতে বিলম্ব হইল না। ঠিক এক বৎসর তিন মাস ২৩ দিন পর ১৯০২ সালের ২৩ নবেম্বর ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ তারিখে কবিমণ্ডলের নিকটতম স্নেহঘন ছায়াটি অপসারিত হইল।'

পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সংকলনের সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা কি আছের পরিবর্তে 'কি নেই' কল্পনাতেই বেশি জোর দিচ্ছি। সংকলক এখানে প্রয়োজনীয় নিষ্ঠায় ও সংযমে শুধু মহর্ষি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্যদের রচনা স্মৃতিচারণ ইত্যাদিতেও মহর্ষি-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ থাকলেও তা আলোচনা করেন নি। বস্তুত সেটা সংকলকের আরব্ধ কার্যের বৃত্তে ছিলও না, পাঠকের মনে যেন 'নাল্পে সুখম্' জাতীয় অতৃপ্তি বাসা বাঁধে। হয়ত সংকলকের সুনামই পাঠককে লুব্ধ করে দেয়। তাঁরা ভাবেন, হয়ত আরো কিছু নতুন আলোর সন্ধান তিনি দেবেন। আমাদের অনুমান রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিনী প্রসঙ্গে যশোহরের পাড়াগাঁ থেকে বালিকাবধূ সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি দিয়ে

কনিষ্ঠ পুত্রের জীবনকে যে আরো উদ্ভাসিত হতে পরোক্ষ সাহায্য করেছিলেন (চিঠিপত্রে দ্রষ্টব্য) তাও বুঝি তিনি পরবর্তী কোন সংকলনে নিশ্চয়ই উল্লেখ করবেন।

ভাবতে ভাল লাগে, যে রবীন্দ্রনাথ প্রতিটি রক্তবিন্দুতে পিতৃদেবের অসীম প্রভাবের অনুরণন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতেন তাঁর সঙ্গেও বাবামশায়ের পছন্দ অপছন্দ নিয়ে তর্ক করতে সাহস পেতেন মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রবধূ। শ্রী সেনেরই সংকলিত মৃণালিনী প্রসঙ্গে উর্মিলা দেবীর কবি প্রিয়ায় জানা যায় "কবিপ্রিয়ার মধ্যে একটা জিনিষ খুব উজ্জ্বল হয়েছিল—আর সেটা তাঁর জীবনপথের আলো হয়ে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। সেটি শ্বশুরের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। কতবার যে তাঁর মুখে শুনেছি "বাবা মশায়ের মত এটা নয়, আমি এ কাজ কখনো করব না'। কবির সঙ্গে তর্ক করছেন—বাবামশায় এটা পছন্দ করেন না, এটা আমি করব না।' কিম্বা 'বাবামশায় থাকলে তুমি একাজ করতে পারতে ?'

মহর্ষিদেবের সন্তানদের মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন সর্বকনিষ্ঠটি। এই পুত্রবধূটির প্রতিও তাঁর স্নেহের অন্ত ছিল না।'

('কবি প্রিয়া'—উর্মিলা দেবী, বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ ১৩৫২)

তাই অবশেষে আবার বলব, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ'-এ যতটুকু আমরা পেয়েছি শ্রীসেনের কাছে এটুকু পেয়ে পেয়ে আমরা অভ্যস্ত। শ্রী সেনকে অনুরোধ করতে ইচ্ছে হয়, তিনি আমাদের আরো বলুন, আরো নতুন তথ্যের দিকে ইঙ্গিত করুন। দেবেন্দ্রনাথ যেন আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেন আমাদের কাছে। সেইজন্যই শ্রী সেনের সংকলনে বৃত্ত এত সুনির্দিষ্ট থাকা সত্বেও বৃত্তের বাইরে কি পাই নি তার হিসাব নিয়ে বসতে হয়েছিল আমাদের। আশা করি আগামী অন্ততর কোন সংকলনে তিনি মহর্ষি প্রসঙ্গ আরো উজ্জ্বল ভাবে উপহার দেবেন পাঠকদের।

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 July '69 (0'50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN

সপ্তদশ বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৭৬
সমকালীন

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিণামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

যে ক'টি সন্তান স্বচ্ছন্দে লালন পালন করতে পারবেন, ততটি সন্তানই হওয়া উচিত
১
আচ্ছা ভাই, তুমি কি করে এত আরামে আছো বলতে পারো? আমি তো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।
আমার বেশী খরচ হয়না — আমার মোটে দুটি সন্তান
কিন্তু আমার স্ত্রীর তো প্রত্যেক বছরেই একটি করে সন্তান হচ্ছে। আমি কি করি বলো তো?
আমি যা করি তাই করো — নিরোধ ব্যবহার করো।
জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তোমার হাতেই রয়েছে। এগুলি ব্যবহার করো।
পরিবার পরিকল্পনার জন্য নিরোধ ব্যবহার করুন
৩টির মূল্য ১৫ পয়সা, ১টি ৫ পয়সা
(সরকারি সাহায্যে হ্রাসমূল্যে)
বর্তমানে মাত্র কয়েকটি জেলায় পাওয়া যায়।

নিরহঙ্কার
গর্ব ...
দীন বাউলের গর্ব
তার একতারা।
একতারার তারে যে
সুরের ঝঙ্কার সে তোলে
তা লক্ষ প্রাণে সঞ্চারিত
হ'য়ে অপূর্ব আবেগের সৃষ্টি
করে। বাউল ও তার একতারা
আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের
সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত।
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রসারিত
অনাড়ম্বর রেলপথও আমাদের গর্ব।
বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্র গ্রথিত করে,
বিভিন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে; সমগ্র
দেশকে সে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।
পূর্ব রেলওয়ে

সপ্তদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মর্ডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

শ্রাবণ
তেরশ' ছিয়াত্তর

সপ্তদশ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

জীবনছন্দ

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

জীবনছন্দ—"বায়োরিদ্‌ম"—বিজ্ঞানজগতে নবীন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আমাদের হৃদয়ের অক্লান্ত ছন্দ এমন নিখুঁত লয়ে বাঁধা যে সাধারণতঃ এর যতি-পতন হয় না। লয় বাড়লেই শরীর হয় অসুস্থ আর যতি-পতন, ছন্দ-পতন আর লয়ের মন্থর গতি হলেই মানুষ হয় কোন এক অজানা পথের যাত্রী যার সন্ধান বহু চেষ্টা ক'রে আজও কেউ দিতে পারে নি।

জীবনছন্দ ব্যাপক বিষয়। শুধু যে হৃদয়তন্ত্রীতেই এই ছন্দ নিবদ্ধ তা নয় প্রতিটী রক্তকণা, শিরা, প্রশিরা এমন কি কোষগুলির মধ্যেও ছন্দ ও লয় আছে এবং বাহ্য জগতের সাথেও এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যখন কোন বাইরের সুর ও ছন্দ দেহাভ্যন্তরস্থ সুর ও ছন্দের সঙ্গে একাকার হয়ে ঝঙ্কৃত হয় তখন এক অভূতপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি হয়।

আমাদের দেশে যত সুর ও ছন্দের সৃষ্টি—সমস্তই শব্দ-ব্রহ্ম—ওঁকার থেকে হয়েছে বলা হয়। কোন যেন এক অজ্ঞাত দিনে কার যে বীণার তন্ত্রীতে এই ওঁকার ধ্বনি বেজেছিলো তার ঝঙ্কার কে শুনেছিলো জানি না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে "সাউণ্ড ভাইব্রেশনের" কথা কেউ কেউ ব'লে থাকেন। শব্দের ঝঙ্কার থেকেই বিশ্ব-সৃষ্টি। এই বিশ্ব-সৃষ্টি হলো সেই ঝঙ্কারে, অসংখ্য সৌরজগত মহানন্দে ছুটে চলেছে আমাদের এই ধরিত্রীর হাত ধ'রে—"বীণ-তারকা" পুঞ্জ—লায়রার ছবিটি বক্ষে ধারণ ক'রে নৃত্যের ছন্দে ও তালে।

নাদ ব্রহ্মের পর আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে পরব্রহ্মের কথা। সে অনেক পরের কথা। বর্তমানে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয় পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা, বেদান্ত শাস্ত্রেরও উদ্দেশ্য নয় পরব্রহ্ম সম্বন্ধে এক বাঁধা-ধরা পরিভাষা দিয়ে মানুষের চিন্তা শক্তির এবং

অনুভূতির এক গণ্ডী টেনে দেওয়া। বেদান্তে একদিকে যেমন বলা হয়েছে—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" অন্যদিকে বলা হয়েছে—"অবাঙমনসোগোচরং"। আপাত-দৃষ্টিতে যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা এই যে বিশ্ব-সৃষ্টি বাঁধা রয়েছে—স্থিতি ও প্রলয়ের ছন্দে। প্রতি মুহূর্তেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ছন্দ কাজ ক'রে যাচ্ছে অথচ আমরা যেন কিছুই অনুভব করতে পারছি না। আজও অগণিত গ্রহ-তারা নেচে বেড়ায় মহাব্যোমে এই প্রণব ধ্বনির জানা ও অজানা শ্রুতির সুরে, ছন্দে ও লয়ে। প্রতিটি গ্রহ, উপগ্রহ, ও তারার গতির মধ্যে ছন্দ আছে। আজও ধ্যানরত যোগী, সাধক সুর ও ছন্দের স্রষ্টাকে খুজতে গিয়ে হারিয়ে ফেলে নিজেকে এই প্রণবের মাঝখানে—শব্দ-ব্রহ্মের মায়াজালে। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের স্রষ্টা ব'লে যদি কাউকে ধ'রে নেওয়া যায় বা স্বীকার ক'রে নেওয়া হয় তিনি হয়তো পথিকের ব্যাকুলতা দেখে হাসেন বাণীহীন সুরের অন্তরালে ব'সে।

সুর ও ছন্দ সাধনায় যে সাধক অসীমতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে তার সুর সাধনার সার্থকতা কোথায়? আজ পর্য্যন্ত যত সুর ও ছন্দ রসস্রষ্টার বীণার তারে ঝঙ্কৃত হ'য়েছে যত ছন্দ উঠেছে এই পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, মহাশূন্যে গ্রহ তারকায়, এক সৌর জগত থেকে অন্য সৌর-জগতে কোনটিই তো নষ্ট হয় নি। সে সুর লহরী বিস্তৃত হয়েছে এবং আজও বিরাটত্বের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ কোন সে যোগী, কোথায় সেই সুর সাধক, কোন সে কবি, কে সে বৈজ্ঞানিক যে সেই প্রাক্তন সুর ও ছন্দকে খুঁজে বার করবে? কোথায় আজ সেই সঙ্গীত সাধক যার সুর সাধনার অন্তরালে বেজে উঠবে স্রষ্টার মৃত্যুহীন অশরীরী ঝঙ্কার বীণার অনুচরী তারের মত।

আমরা যে গ্রহে বাস করি ক্ষণকালের জন্যে তার সাতটি ছন্দ। উপগ্রহগুলির ছন্দ ও তালের সঙ্গে আমাদের গ্রহটি বাঁধা। তারকাপুঞ্জের মধ্যে ছন্দ আছে আবার সূর্যের সাথে সব গ্রহ উপগ্রহগুলিই অভিনব তালে নৃত্য করছে কোথাও অঙ্কের ভুলভ্রান্তি নেই জ্যোতিষ্কভূত বৈজ্ঞানিকেরা "এ্যষ্ট্রোফিজিসিষ্ট"গণ একথা ব'লে থাকেন। আমাদের সবিতার আলোকপুঞ্জের লহরীর মধ্যেও ছন্দ ও তাল। আমাদের গ্রহটিতে আলো আঁধারের ছন্দ—অক্ষরেখার সাথে বায়ুর ছন্দ বিজড়িত। আমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও বর্জন করি তার মধ্যেও বায়ুর ছন্দ ও তাল। আমাদের এই বিরাট বিশ্বে মানুষ, জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, পত্র, পুষ্প প্রত্যেকেরেই জীবন ছন্দময়—কেউ অনুচরী কেউ বা সহচরী আর কেউবা মূল লহরী। পুষ্প বল্লবীর মৃদু আলোড়নের মধ্যে ছন্দ নেই কি? বাঁশ গাছ থেকে যখন একটি পাতা ঝরে পড়ে সেই পাতা পড়ার গতির মধ্যে ছন্দ থাকে না কি? আমাদের জীবন লহরীর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টায় কতই না ছন্দের পরিবর্তন ঘটে।

জীব বৈজ্ঞানিকেরা (বায়োলজিষ্ট) ব'লে থাকেন প্রকৃতির প্রয়োগশালায় মানুষ একটি অসমাপ্ত জীব। অন্যান্য জীব জন্তুর মধ্যে কোন না কোন গুণের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে গুণ অর্থে বৃত্তি বুঝতে হবে। মানুষের কোন বৃত্তিরই পূর্ণ বিকাশ নেই। সামান্য একটু বুদ্ধি ও জ্ঞান, শক্তি তার আছে। মানুষের ক্রমবিকাশের পথ আজও উন্মুক্ত তার কাছে। মানুষের জীবনছন্দে দেখতে পাওয়া যায় প্রতিদিন তার জীবন-প্রণালীতে শিথিলতা আসে দু'বার—একবার রাত্রি তিনটার পর আর একবার বেলা দুটোর পর অপরাহ্নে। একে তার অসমাপ্ত পরিণতি অন্যদিকে তার জীবনপ্রণালীতে দিনে ও রাতে শিথিলতা বা মন্থরগতি। এইসব দেখেই বার্গসঁ প্রভৃতি

প্রগতিশীল জীব বৈজ্ঞানিকেরা (ক্রিয়েটিভ বায়োলজিষ্ট) বলেছিলেন মানুষকে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হ'তে হ'লে আর চেতনার বিকাশের পথেই এগুতে হ'বে অর্থাৎ চৈতন্ত-মার্গকেই প্রশস্ত করতে হবে।

আমাদের বেদান্তশাস্ত্রে বার বার চৈতন্ত-মার্গের কথা বলা হয়েছে। মানুষের চেতনার ক্রমবিকাশের জন্ম সতের-আঠারটি প্রণালীর উল্লেখ করা হ'য়েছে যেমন মধুবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, সম্বর্গবিদ্যা, সাবিত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে মানুষের চেতনার এমনকি অন্তর্মূখীন বৃত্তিগুলির ও ক্রমবিকাশের পথ একরকম বন্ধ। বহির্মূখীনবৃত্তি নিয়ে বহির্জগতে মানুষ চলেছে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কে জানে। বর্তমানের সভ্যতার ক্রমবিকাশ, সেটা যে ক্রমবিকাশ এ কথাও কোন মনীষীব্যক্তি নিশ্চয় করে বলেন না এবং এর যে কি পরিণতি তাও সঠিক জানা নেই।

বাহ্যিক অস্তিত্বে মানুষের জীবনছন্দ সূর্যের "সমন্বয়ধর্মী রশ্মি"র অর্থাৎ "ফোটোসিথিসিসের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ এমনকি কীটপতঙ্গ, প্রবাল-শৈবাল, সূর্যরশ্মির দ্বারা প্রভাবান্বিত। শুধু তাই নয় মানুষ ও উদ্ভিদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ—একজনের আর একজনের সাথে বিশেষ সখ্যতা। মানুষ ও গাছ পালার অটুট বন্ধনের মধ্যে সূর্য্যর ঘট্‌কালী আছে। ভারতীয় পরম্পরায় আমরা সূর্য্যকে পূজা করতে শিখেছি। আমাদের ধ্যানের ছবিতে—আমরা কোনদিনই সূর্য্যের ভৌতিকরূপ বিশ্লেষণ করে তার বিরাটত্ব ও কল্যাণ সাধনের বৃত্তিকে হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করি নি। সূর্য্যের সমস্তটাই "গ্যাস"—বায়বীয় পদার্থ এবং পৃথিবীর সব উপাদানগুলোই এর মধ্যে বায়বীয় অবস্থায় নিহিত আছে। সূর্য্যও আপন মেরুদণ্ডের চারিপাশে ঘোরে এবং এই ঘোরার মধ্যেও ছন্দ আছে। সবিতার এই নৃত্যের চরণরেখার সাক্ষ্য দেয় বড় বড় গাছের গুঁড়িগুলোর মধ্যে চক্রচিহ্নে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ডগলাসের এবিষয়ে গবেষণা দ্রষ্টব্য। সূর্য্যের দীপ্তিদ্যুত, সূর্য্যের তাপ-বিকীরণ সবই অণু-পরমাণুর খেলা।

একদিকে সূর্য্যের বিরাটত্ব—৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল ব্যাস অন্যদিকে উপরিভাগের তাপমাত্রা দশ-হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইটের উর্দ্ধে আর যদি সূর্য্যের কেন্দ্রে কোন উপায়ে পৌঁছাতে পারা যায় সেখানে তাপের মাত্রা হবে সাতকোটি বিশ লক্ষ ডিগ্রী। এতো বড়ো সৌদামিনী শক্তির আকর —পরমাণু শক্তির বিরাট বিকীরণ কেন্দ্রে—সূর্য্যের উষ্মা আর পরমাণু শক্তি জগদ্ধিতায় কাজ ক'রে চলেছে। এই সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে গ্রহ-উপগ্রহের বন্ধন—আমাদের সৌর মণ্ডল আবার ঐ সৌর-মণ্ডলের কতকটা প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই অণুর বিশ্লেষণের মধ্যে। সূর্য্যকে বেষ্টন করে যেমন গ্রহ-উপগ্রহের নৃত্যের ছন্দ তেমনি পরমাণুর অভ্যন্তরে সংযোগ তাড়িত-মুক্ত— "পজিটিভ্‌ ইলেক্‌ট্রন"—একটী কণিকাকে ঘিরে বিয়োগ তাড়িতযুক্ত—"নেগেটিভ্‌ ইলেক্‌ট্রন"—ও তার কণিকা গুলি নৃত্য করছে। (রাদারফোর্ড লেকচার অন ষ্ট্রাকচার অব ম্যাটর—৯২৭-৯২৮—এবং এ্যাটোমিক এনার্জী—গ্যামো দ্রষ্টব্য) এই-নৃত্যের দূরত্ব ও ছন্দের তাল গণিতশাস্ত্রের বিধি সম্মত কোথাও ভুল ভ্রান্তি নেই।

আবার আমরা এই সৌর-মণ্ডলের সূক্ষ্ম আলেখ্য দেখতে পাই প্রাণী-দেহে জীবকোষের মধ্যে।

জীবকোষগুলির অপূর্ব শিল্প সম্পদ—আশ্চর্য্য কর্মতন্ত্র। ব্যষ্টি জীবকোষ একটি সম্পূর্ণ প্রাণের ছবি। জীবকোষের মধ্যে দেখতে পাই জীবনপঙ্ক—প্রটোপ্লাজম—যার আদি পদার্থ-হ'লো প্রোটীন অর্থাৎ "প্রথম"। গ্রীক ভাষায় প্রোটীনের অর্থ "আদি" বা "প্রথম"। এই প্রোটীনাঙ্কুরকে ঘিরে জীবকোষে নানা কর্মপ্রণালী চলতে থাকে। জীবদেহে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হ'তে থাকে তাও এক রসায়ণ-চক্রের—"কেমিকেল সাইকেলের"—পরিণতি। জে-এ্যাগ্রেণ, ও উইল্যাণ্ডার এবং ঈঃ জোর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের—বায়োরিদ্‌মের ওপর গবেষণা দ্রষ্টব্য)।

ছন্দময় সৌর-মণ্ডল, পরমাণুতত্ব, জৈবধর্ম্মের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে দেখলে এক বিরাটত্বের অনুভূতি যেন মনের মধ্যে সহজেই উদয় হয়। বেদান্ত শাস্ত্রে, মানব মনকে বিরাটাভিমুখীন করার অহরহ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ব্যষ্টি-জীবনকে সমুদ্র-সৈকতের বালুকণা হ'তেও ক্ষুদ্র মনে হয়। এতো ক্ষুদ্রত্ব নিয়েও মানুষের কত অহঙ্কার! সে জন-মানবের সেবা করবে, দার্শনিক হবে, বৈজ্ঞানিক হবে, কবি হবে, ও লেখক হবে, ধন-কুবের হবে, এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে লাফালাফি ক'রে বেড়াবে, জানি না আরো কি কি করবে। কিন্তু এ সবার মূলে রয়েছে একদিকে মানুষের অন্তর্নিহিত মূল বৃত্তিগুলো অন্যদিকে বহির্জ্জগতের ছন্দ যেটা তার জীবনে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্ণপরিচয়ের নবতম গুরু রবীন্দ্রনাথ

প্রবোধরাম চক্রবর্তী

যে সব শিক্ষককে প্রথম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশতে হয়, তাঁদের কাছে অন্যান্য অনেক কঠিন সমস্যার মত তাদের বর্ণপরিচয় করানোও একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি অতি তীক্ষ্ণধী শিশুরবেলাতেও তাঁর রেহাই নেই। প্রমাণ শিশু রবীন্দ্রনাথ। পরিণত বয়সে তিনি লিখছেন—"তখন 'কর', 'খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা।" এ থেকে বোঝা যায় যে, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শিশু রবীন্দ্রনাথের কাছেও বর্ণপরিচয়ের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না এবং তাঁকেও অনেক চোখের জল ফেলে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক সকাল সন্ধ্যা স্মরণ করতে হয়েছে। তারপর অনেক তুফান পাড়ি দিয়ে কূলে এসে এক শুভদিনে তিনি আপন "চৈতন্যের মধ্যে" জল পড়া ও পাতা নড়ার মিলনানন্দ উপভোগ করতে পেরেছিলেন। জীবন-শৈশবে বর্ণপরিচয়ের এই বেদনার স্মৃতি পরিণত বয়সে তাঁকে বাংলা দেশের সকল শিশুর বর্ণপরিচয়ের বেদনা উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছিল বলে মনে হয়। নতুবা খ্যাতির চূড়া থেকে শিশুর পাঠশালা প্রাঙ্গণে নেমে এসে তিনি তাদের জন্য সহজ পাঠ—প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় ভাগও বটে রচনা করতে বসতেন না। অন্যদিকে "আদি কবির প্রথম কবিতা"—পাঠের আনন্দস্মৃতিও তাঁর মনে ছিল। ফলে বর্ণপরিচয়ের বন্ধুর পথ যাতে মধুর হয় সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

এই ভাবনা ও তার সার্থক রূপায়ন—সহজ পাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের কথা চিন্তা করলে তাঁকে নিঃসন্দেহে বর্ণপরিচয়ের নবতমগুরু বলা চলে।

কিন্তু তার পূর্বে বর্ণপরিচয়ের অন্যতম গুরু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। অবশ্য তাঁর প্রথম ভাগের বর্তমান সংস্করণ রবীন্দ্রনাথ-কথিত আদি কবির প্রথম কবিতাকে নির্বিচারে নির্বাসিত করেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বর্ণপরিচয়ের দিক থেকে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বিশেষ মূল্যবান। কারণ বাংলা ভাষার স্বরবর্ণের সংস্করণে, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের শাস্ত্রসম্মত পৃথকীকরণে, হলন্ত ও আকারান্ত শব্দগুলির উচ্চারণ নির্দ্ধারণে এবং ত-কারের ত ও ৎ এই দুই রূপ প্রদর্শনে তিনি যে শ্রম ও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা আজীবন শিক্ষাব্রতী এবং সংস্কারক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছেই আশা করা যায়।

অবশ্য একথা ঠিক যে, বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগে যথাক্রমে বর্ণানুক্রমিক শব্দানুক্রমিক এবং বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আগে বর্ণপরিচয় পরে বর্ণ যোজনা এবং সর্বশেষে বাক্য এসেছে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান এ পদ্ধতি স্বীকার করে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সে যুগে বর্ণপরিচয়ের শাস্ত্রসম্মত শিক্ষাবিজ্ঞান গড়ে ওঠে নি। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে যুগে বসেই এ কাজটি করেছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য দিক থেকেও এর মূল্যবত্তা আছে এবং সেটি আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মতও বটে। এ প্রসঙ্গে 'কর' 'খল' থেকে "অচল অধম" প্রভৃতি শব্দের ক্রমপর্যায়,

শিশুর পরিচিত পরিবেশ আহৃত শব্দে দিয়ে বাক্য গঠন এবং তার ক্রমবিস্তার প্রভৃতি ঔদাহৃত হতে পারে।

অন্যদিকে বর্তমান সংস্করণে আদি কবির প্রথম কবিতা না থাকলেও দুই একটি পাঠের বাণীচিত্র শিশুকে কল্পনার রাজ্যে না হোক অন্ততঃ মিলের রাজ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছে দেয়। যেমন "পথ ছাড়। জল খাও। হাত ধর। বাড়ী যাও।" ইত্যাদি। তেমনি "কাল পাথর সাদা কাপড়। হাত নাড়ে খেলা করে।" পড়তে গিয়েও শিশু ছন্দের দোলা অনুভব করতে পারে। আমার ধারণা যদি কোন শিশুকে ঔদাহৃত বাক্যগুলি বিচ্ছিন্নভাবে না পড়িয়ে একটানা পড়িয়ে দেওয়া যায়। তাহলে সে হাত নাড়তে নাড়তে এবং খেলা করতে করতেই বাড়ী ফিরবে।

অতঃপর প্রথমভাগের উদ্দেশ্য যেমন অসংযুক্ত বর্ণ শেখানো, তেমনি দ্বিতীয়ভাগের উদ্দেশ্য সংযুক্ত বর্ণ শেখানো। এর বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন—"ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগের শিক্ষা করিতে গেলে অতিশয় নীরসবোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্প বয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় এরূপ বিষয় লইয়া ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে।" এ থেকে বোঝা যায় যে, আধুনিক শিক্ষাবিদদের মত নীরস জিনিসকে সরস করে শিশুদের কাছে পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং সে যুগে যতটা সম্ভব তা করতেও তিনি ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তিনি শব্দ থেকে বাক্যে এসেছেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন সংযুক্ত বর্ণকে পরিচিত অপরিচিত সকল রকম শব্দের ভিতর দিয়ে শেখানো হলেও বাক্যগঠনের বেলায় ঐ সংযুক্ত বর্ণ বিশিষ্ট পরিচিত শব্দের দিকেই তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। বলা বাহুল্য বর্ণপরিচয়ে তা সে সংযুক্তই হোক আর অসংযুক্তই হোক আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান পরিচিত শব্দকেই গ্রহণ করেছে।

পরিশেষে বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এই দু'খানি বই তাঁর সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৩০৩ সালে "পরিবর্তন, পরিবর্জন, ও পরিবর্ধন" করেছিলেন। বই দুখানির বর্তমান সংস্করণ ১৩০৩ সালের সংস্করণেরই অনুরূপ। ঐ প্রসঙ্গে "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পথাবলম্বনে" কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রণীত বর্ণপরিচয় প্রথমভাগেরও নাম উল্লেখ করতে হয়। বর্ণপরিচয়ের দিক থেকে এতে কতটা লাভ বা লোকসান হয়েছে তার হিসাব পণ্ডিতেরা করুন। তবে কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগরপ্রণীত প্রথম ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা হ্রাস করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। অন্যদিকে পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র কৃত বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ পড়তে বসে বর্তমান কালের শিশু রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে "জল" পড়লেও 'পাতা' নড়েনি। তবে অন্য একটি পরম সম্পদ তারা লাভ করেছে এবং যে সম্পদ হ'ল প্রত্যেক বর্ণের নীচে এক একটি ছবি। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, বর্ণের সঙ্গে ছবির যোজনা বর্ণপরিচয়ের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ মনে রাখা উচিত যে, যে কালে "শিশুদের প্রতি সরস্বতীর মাতৃভাবের কোন লক্ষণ" ছিল না। বিদ্যারত্ন মহাশয় সেই যুগে বর্ণপরিচয়ে ছবির যোজনা করে সেই মাতৃভাব' এনেছিলেন। সুতরাং "আদি কবির প্রথম কবিতা"কে নির্বিচারে নির্বাসিত করার অপরাধে অপরাধী হ'লেও মাত্র এই কাজের জন্যই তিনি যেমন শিশু রবীন্দ্রনাথদের কাছে ক্ষমা

পাবেন, তেমনি পরবর্তীকালের শিক্ষাবিদদের কাছেও তিনি নমস্য হয়ে থাকবেন।

মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক শিক্ষাবিজ্ঞান বলে। শিশুর কাছে বর্ণকে নিঃসঙ্গভাবে উপস্থাপিত করো না। বর্ণপরিচয়ে শব্দানুক্রমিক পদ্ধতি যদি একান্তই গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সেখানেও বর্ণ, শব্দ এবং প্রাসঙ্গিক ছবির সমন্বয় ঘটাও। বিদ্যারত্ন মহাশয় এখানে এই মহৎ কাজটি করেছেন, যেমন বর্ণ-অ-অজগর ও নীচে প্রাসঙ্গিক ছবি।

অতঃপর বিগত কয়েক বৎসর ধরে বর্ণপরিচয়-সমস্যা নিয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে, তাতে এই সিদ্ধান্ত হল যে, বর্ণপরিচয়ের বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতিই শ্রেয় এবং মনস্তত্ত্বসম্মত। কারণ শিশু প্রথমে বর্ণ বলতে শেখে না শেখে শব্দ বলতে এবং সে শব্দও বস্তুবিবিক্ত নয়। তাছাড়া সে শব্দ তার কাছে বাক্য বিশেষই বটে। সে যখন বলে 'মা', তখন 'মা' একটি শব্দরূপে উচ্চারিত হ'লেও তার কাছে তার অনেক কথা অনেক অর্থ। অন্যের কাছে তার অর্থ অনুচ্চারিত এবং অসম্পূর্ণ থাকলেও তা সোচ্চার ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে ঐ শিশু এবং শিশুর মায়ের কাছে। কিন্তু বর্ণপরিচয়ে বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে ছবির প্রয়োজন আছে। কারণ নিষ্প্রাণ নিঃসঙ্গ বর্ণকে স-প্রাণ ও স-সঙ্গ করতে হলে প্রাসঙ্গিক ছবি চাই-ই চাই। ফলে অন্য কিছুর আকর্ষণে না হোক অন্ততঃ ছবির আকর্ষণে শিশু বাক্য এবং তার মাধ্যমে শব্দ ও বর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিদ্যারত্ন এত দূর আসতে পারেন নি। কিন্তু বর্ণ, শব্দ ও ছবির একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি পরবর্তী বর্ণপরিচয়-প্রণেতাদের কাজ অনেক সহজ করে দিয়ে গেছেন। তবে বর্তমানকালের শিশু রবীন্দ্রনাথের দল তখনও তৃপ্ত হয়নি। ইতিমধ্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত "হাসিখুশি" বর্ণপরিচয়ের ইতিহাসে আর একটি নূতন যুগের সৃষ্টি করল। বাংলার শিশুদের বর্ণপরিচয় করাতে গিয়ে বোধহয় তিনিই সর্বপ্রথম বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, করলেন বাক্য, বর্ণ ও প্রাসঙ্গিক ছবির সমন্বয় করে। কিন্তু সে বাক্যগুলি নীরস গদ্যকারে এল না—এল ছড়ার ভিতর দিয়ে ছন্দের দোলায় চড়ে দুলতে দুলতে আরও উল্লেখ্য বিষয় হল এই যে, সে সব ছড়ার শব্দ শিশুর অতিপরিচিত জগৎ থেকে আহৃত এবং কবির কলম থেমে প্রস্তুত। বস্তুতঃ বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের যে কেমন করে সাহিত্যের স্বাদও দেওয়া যায়, সে কৌশলও তিনিই আমাদের প্রথম দেখালেন।

মনস্তত্ত্ব বলে শিশুকে যদি কিছু শেখাতে চাও তাহলে ভাবানুষঙ্গ আন। এদিক থেকে "হাসিখুশির" মৌলিকত্ব লক্ষণীয়। বর্ণপরিচয়ের পালায় "অ-অজগর আসছে তেড়ে, আ-আমটি আমি খাব পেড়ে।" বা "গ—গরু বাছুর দাঁড়িয়ে আছে, ঘ-ঘুঘু পাখী ডাকছে গাছে।"—জাতীয় যে সব ছড়া বা কবিতা ভিড় করেছে, তাতে ভাবের ছবি, আঁকা ছবি, বর্ণ, শব্দ ও বাক্য শিশুমনে ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করে ছন্দের তালে তালে একসঙ্গে শোভাযাত্রায় বার হয়েছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শিশুর কাছে ছড়ার 'বক্তব্য' ফুরিয়ে গেলেও তার ঝংকারটা ফুরায় না। তার 'মিলটা কে" নিয়ে "কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা—" চলতে থাকে। এমনি করে হাসিখুশির বর্ণপরিচয়—অনুস্যূত শ্লোকগুলি আওড়াতে গিয়ে একদিকে সে পায় ভাবের ছবি—যা ছড়ার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে অথচ পড়তে গেলেই জেগে ওঠে অন্যদিকে আঁকা ছবি—যা শুধু তার চোখ ভোলায় না চোখ ফোটায়ও। এইভাবে সে চলে যায় সুরের রাজ্যে, রূপের রাজ্যে। ফলে হাসিখুশির ছবি শিশুর

চোখ ফোটায়, ছড়া তার কান জুড়ায় এবং তার চোখের জলে-ভেজা বর্ণপরিচয়ের পথ হাসির দীপ্তিতে খুশির আমেজে ভরে ওঠে।

আবার ১ থেকে ০ পর্যন্ত সংখ্যা শেখাতে গিয়ে তিনি একটি প্রাসঙ্গিক ছবির আমদানি করেছেন যে, তাতে শিশুর হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুটোতেই তরঙ্গ তোলে। এইভাবে 'মামার বাড়ী' এবং 'দশটি ছেলে'—এই দুটি কবিতায় প্রাথমিক যোগ ও বিয়োগ শেখানোর কৌশলটিও ভেবে দেখবার মত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় শিশুদের ছবির ভোজে নিমন্ত্রণ করলেও তাঁর ব্যবস্থাটি ছিল কৃপণের মত—বর্ণসংখ্যার সঙ্গে ছবির সংখ্যার ক্ষমতা রক্ষা করে একেবারে গোণাগুন্তি ব্যবস্থা। অন্যদিকে 'হাসিখুশি'তে ছবির ভোজে সরকার মহাশয় শিশুদের জন্য ঢালাও বরাদ্দ করেছেন কিন্তু অরুচি ধরিয়ে নয়। এই হিসেবে বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বর্ণ পরিচয়ের অন্যতম স্থপতি এবং সরকার মহাশয়কে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী বলা বোধ হয় অসংগত নয়। অতঃপর এ ধারার অনুসৃতি ঘটেছে বিভিন্ন বর্ণপরিচয়-প্রণেতাদের হাতে, হয়ত বা সার্থক অনুসৃতিও ঘটেছে কিন্তু সার্থকতর বুঝি আর হ'ল না।

এখন প্রশ্ন হ'ল রবীন্দ্রনাথ প্রণীত সহজ পাঠ প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগও বটে—বর্ণপরিচয়ের দিক থেকে কোন পর্যায়ে পড়বে? প্রথম ভাগের প্রথম পৃষ্ঠা উল্টালে যে নির্দেশ চোখে পড়ে তাহলো এই যে, "এই বই বর্ণপরিচয়ের পর পঠনীয়।" সুতরাং দ্বিতীয় ভাগের কথা আর না তোলাই ভাল। তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই যে, বর্ণপরিচয়ের বেদনা লাঘব করবার জন্য বাংলার শিশুর দল অন্য যার কাছেই যাক না কেন, শিশুদরদী রবীন্দ্রনাথের কাছে নৈবচ নৈবচ। কিন্তু যাঁর কাছে বর্ণপরিচয়ের পালায় আনন্দের চেয়ে স্মৃতি বেশী, যাঁর জীবন-সাধনা ছিল "পাঠশালা কারা"কে আনন্দ ও শান্তিনিকেতনে পরিণত করা, তাঁর কাছে শিশুর দল আসবে বর্ণপরিচয় সেরে ভিজে চোখে একথা যেন ভাবতেও পারা যায় না। বস্তুতঃ প্রথম ভাগ "বর্ণ পরিচয়ের পর পঠনীয়" এই মতবাদের যে কোন মূল্যই থাক না কেন, তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করলে প্রথম ভাগকে—দ্বিতীয় ভাগকেও বটে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও কৃতিবিবিক্ত করে দেখতে হয়।

অন্যদিকে মনস্তত্বভিত্তিক শিক্ষাবিজ্ঞানের দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্ণপরিচয়ে সে বিজ্ঞান যা কিছু এতদিন ধরে চেয়ে এসেছে তবে সব কিছুই এতে আছে এবং তার ওপরেও কিছু আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এতে বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি ধরে প্রথমে অসংযুক্ত বর্ণ শেখানো হয়েছে এবং যে বাক্য এসেছে কবিগুরুর কলমনিঃসৃত ছন্দকে আশ্রয় করে। এমনকি তাঁর গদ্যাংশেও সেটি আদৌ দুর্লখ্য হয়নি। দ্বিতীয়তঃ গদ্যাশ্রয়ী হোক আর পদ্যাশ্রয়ী হোক বাক্যগুলির শব্দ শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকে চয়ন করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ পাই শিশুর দৈহিক ও মানসিক বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রাখা বাক্যগুলির ক্রমবর্ধমান বহর ও পরিবর্তমান নৃত্যপর ছন্দ। এর উপর আছে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট ভাবের ছবি বা বাণীচিত্র এবং আচার্য নন্দলালের আঁকা ছবির সুদুর্লভ সমাবেশ। সুতরাং সহজ পাঠ প্রথম ভাগ বর্ণ পরিচয়ের পর পঠনীয় নয়, বর্ণপরিচয়েই পঠনীয়।

"ছোট খোকা বলে অ, আ, শেখেনি সে কথা কওয়া"—এই শ্লোক যে ছোট খোকা কথা বলতে শেখেনি তাকে যেমন কথা বলতে শেখায় তেমনি তাকে অ, আ' ও চেনায়। চেনায় ছন্দে,

চেনায় বাক্যে এবং চেনায় ছবিতে। কিন্তু পৃথকভাবে নয়, যুগপৎ, বিশ্লেষণ দিয়ে নয়, সংশ্লেষণ দিয়ে। এইভাবে যখন তাকে পড়ানো হয়, "ঘন মেঘ বলে ঋ দিন বড় বিশ্রী" বা "ক খ গ ঘ গান গেয়ে জেলে ডিঙি চলে বেয়ে।" তখন তার বাণীচিত্র তার মানসপটেও ভেসে ওঠে। তার উপর ওর ছন্দ ও বাণীচিত্রের সঙ্গে সঙ্গত করতে করতে চলা নন্দলালের আঁকা ছবিও তার চোখ ফোটায়। ফলে সে বর্ণ পরিচয় তার কাছে একাধারে নয়নভোলানো "রসনা রোচন ও শ্রবণবিলাস" হয়ে ওঠে।

আপাতদৃষ্টিতে এইসব ছড়া বা শ্লোকের উদ্দেশ্য বর্ণপরিচয় করানো হলেও এখানেই তারা শেষ হয় না। অধিকন্তু শিশুর অজ্ঞাতসারে তাকে রূপরস শব্দ গন্ধভরা পৃথিবীর সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয় করতে সাহায্য করে এবং বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে তাকে সাহিত্যপাঠেও দীক্ষা দেয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, শিক্ষাবিজ্ঞান এতদিন ধরে বর্ণপরিচয়ে এই সুদুর্লভ সমন্বয়ই কামনা করে আসছিল। এবং এই সমন্বয় যাঁর কাছে একান্তভাবে সিদ্ধবস্তু সাধ্যবস্তু নয়—তাঁর কলম দিয়েই লিপিবদ্ধ হল সহজ পাঠে। সুতরাং সহজপাঠ ১ম ভাগ শুধু বর্ণপরিচয়ের বই নয়, এটি একাধারে বর্ণপরিচয় এবং সাহিত্য পরিচয়েরও প্রথম ভাগ।

আবার সংযুক্ত বর্ণপরিচয়ের দিক থেকে বিচার করলে সহজপাঠ ২য় ভাগও ঐ শ্রেণীতে পড়বে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ প্রথমভাগের মত দ্বিতীয়ভাগেও রবীন্দ্রনাথ অতি সচেতন হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সংযুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দের চয়ন, বাক্যমধ্যে তার পাশাপাশি অবস্থান এবং সর্বোপরি সরলবাক্যের সংযোজনে এক একটি গদ্য বা পদ্যের গল্পরূপের দিকে তাকালেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যায়। প্রথমভাগের মত দ্বিতীয়ভাগেও রবীন্দ্রনাথ সচেতন মনে কলম ধরেছেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ আদৌ দুর্লক্ষ্য হন নি। না হয়ে ভালই হয়েছে। কারণ "অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে"র "কুঞ্জবিহারীর গুঞ্জন স্বরে" শিশু শুধু যে "ঞ্জ" কেহ চিনতে পারে তা নয়, তার কান মনও তৃপ্ত হয়, তাই পড়া শেষ হলেও কুঞ্জবিহারীর "খঞ্জনির ঝন্‌ঝনি" তার কানে লেগে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সহজ পাঠ ১ম ও ২য় ভাগ সম্বন্ধে একটি জটিল প্রশ্ন উঠতে পারে। সে প্রশ্ন হল এই যে, বই দু'খানিতে যে সব কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে তার সবগুলি কি বর্ণপরিচয় করতে থাকা শিশুদের কাছে উপযোগী? উদাহরণস্বরূপ ১ম ভাগ থেকে "আমলকী-বন কাঁপে, যেন তার বুক করে দুরু দুরু—পেয়েছে খবর পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু।" অংশটুকু নেওয়া যেতে পারে। আমার ধারণা "যাঁরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা" করে "কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয়" করতে চান তাঁরাই এর উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু যাঁরা জানেন "শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা" বুঝিয়ে দেওয়া নয়, "মনের মধ্যে যা দেওয়া"—যাঁরা জানেন ঐ জাতীয় কবিতার "আগাগোড়া" বুঝতে পারাই সকলের চেয়ে বড় লাভ" নয়, ওর "আনন্দ-আবেগ পূর্ণ" উচ্চারণটাই পরম লাভ তাঁরা যেখানে উপযোগিতা অপেক্ষা উপভোগ্যতাকেই বড় করে দেখবেন। ফলে সহজ পাঠ ১ম ও ২য় ভাগ, বর্ণপরিচয় করতে থাকা শিশুর হাতে দিলে লাভ বই লোকসান হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাসিখুসির সঙ্গে সহজপাঠের কয়েকটি পার্থক্য প্রণিধান যোগ্য। প্রথমতঃ প্রথমটিতে গদ্যের তুলনায় পদ্য বেশী এবং তার সঙ্গে আছে

প্রাসঙ্গিক ছবির অজস্রতা। অন্যদিকে সহজ পাঠে গদ্য ও পদ্য প্রায় আধাআধি এবং ছবির সংখ্যাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দ্বিতীয়তঃ "হাসিখুশি" বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে শিশুকে প্রধানতঃ বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত করে আর "সহজ পাঠ" ওটি করেও তাকে প্রকৃতির অন্তঃপুরে পাঠায় তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করতে। 'হাসিখুশি' শিশুকে হাসায়, "সহজ পাঠ" একাধারে হাসায় ও ভাবায়। হাসিখুশি প্রণেতা বর্ণপরিচয়ের নবগুরু, সহজ পাঠ-প্রণেতা নবতম গুরু। কিন্তু বর্ণপরিচয়ের ভিতর দিয়ে যিনি নবীন যাত্রীদের আপন মানসলোকের স্ফুট-অস্ফুট বর্ণচ্ছটার সন্ধান দেন, তাঁকে শুধু বর্ণপরিচয়ের নবতম গুরু আখ্যা দিয়েই কর্তব্য শেষ করা যায় না। তাঁকে নূতন প্রাণের দীক্ষাগুরু বলেও প্রণাম জানাতে হয়।

গ্রীক ট্র্যাজেডি

লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রাচীন গ্রীসে সাহিত্য শিল্পকলার আবির্ভাব। প্রথমে মহাকাব্য ও তারপরে গীতিকাব্য গ্রীসের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজমান ছিল এবং এই ধারার অনুসরণেই ট্র্যাজেডির জন্ম। প্রাচীন গ্রীসে আসব-দেবতা ডাওনিসাসের সম্মানে নাগরিকেরা আয়োজন করত বিপুল উৎসব-অনুষ্ঠানের এবং এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল—সম্মিলিত নৃত্যগীত (Chorus)। থেস্‌পিস্‌ নামে জনৈক ব্যক্তি ৫৩৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে অভিনয়ের জন্য সর্বপ্রথম একখানি 'ট্র্যাজেডি' (tragedoi) উপস্থিত করেন। এই নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া না গেলেও, পরবর্তীকালের বিপুল ট্র্যাজিক সাহিত্যের জন্মলগ্ন যে এখানে সূচিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বস্তুতঃ ট্র্যাজেডি একান্তভাবেই গ্রীক চিন্তা ভাবনা প্রসূত। গভীর জীবনবোধ প্রাচীন গ্রীকদের প্রেরণা দিয়েছিল জীবনের সৌন্দর্য ও রহস্যের যবনিকা উত্তোলনে। এর ফলে একদিন তাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হল এই সত্যটি যে মানব জীবনে অসৎ ও অমংগলের প্রভাব সর্বব্যাপী। সাহিত্যে একে রূপায়িত করতে ট্র্যাজেডি-ই যে সর্বোৎকৃষ্ট বাহন এটা বুঝতেও তাঁদের দেরী হল না। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চারজন ট্র্যাজিক নাট্যকারের তিনজনই ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের নাগরিক এবং সেক্সপীয়র ছাড়া আজ পর্যন্ত কোন সাহিত্য স্রষ্টা-ই এ্যাস্‌কাইলাস-সফোক্লিস-ইউরিপিদিসের সমকক্ষতা লাভ করতে পারেন নি।

'দেবতন্ত্রবাদ' প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু হোমারের মহাকাব্যে (খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী) দেবতাকুলের যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তা সুখপাঠ্য হলেও মানসিক, নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে এর অবদান সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে। এই সব দেবতার অবস্থিতি স্বর্গে, তাঁদের পান-ভোজন ও হাস্য পরিহাসজনিত মত্ততায় স্বর্গ প্রকাশিত হয়। তাঁদের চরিত্র ও নীতিবোধও প্রশ্নাতীত নয়। প্রয়োজনবোধে তাঁরা একে অপরকে প্রতারিত করেন; মর্ত্যের প্রাণীজগতের সংগে তাঁদের আচরণ একান্তভাবেই খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভরশীল। তারা বিদ্রোহী হ'লে অথবা অবাধ্য সন্তানের মত আচরণ করলে স্বর্গাধিপতি জিয়াস শাসন দণ্ডের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রাচীন গ্রীসে হোমারের প্রভাব ছিল সর্বাতিশয়ী এবং ইলিয়াড-অডিসী প্রায় বাইবেলের সমান মর্যাদা লাভ করেছিল। গ্রীসের ধর্মজীবনে পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায়ের কোন স্থান ছিল না। ব্যবহারিক জীবনে যাঁরা সাধারণ মানুষের স্তরে অবস্থান করতেন, সেই দার্শনিক, কবি এবং শিল্পী সম্প্রদায় ধর্মকে যুক্ত করেছিলেন জন-জীবনের সংগে। গ্রীসের মহান শিল্পীবৃন্দ যা অমূর্ত ও অবাস্তব, তাকে অপূর্ব সৌন্দর্য-মণ্ডিত ক'রে মূর্ত ক'রে তোলেন। তাই প্রাচীন গ্রীসের শিল্প-সাহিত্যে দেবতা ও মানুষের মধ্যে কোন বিভেদের প্রাচীর বড় হ'য়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। দেবতা নেমে এসেছেন সাধারণ মানুষের স্তরে, আর মানুষ তার সকল ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, দৈন্য অতিক্রম ক'রে নিজেকে উদ্ভাসিত করেছে দেবত্বের স্বর্গীয় আলোকে। কিন্তু দেবতাকে গ্রীসের মানুষ

অস্বীকার করেনি, মানুষের সকল কাজের মূলে আছে এক অমোঘ বিশ্ব-বিধান, যা লঙ্ঘন করলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

এ্যাসকাইলাসের মনে হয়তো প্রশ্ন জেগেছিল, মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী এই ঐশ্বরিক শক্তির স্বরূপ কি? সেই শক্তি যদি প্রকৃতই কল্যাণকামী অথবা সৎ হয়, তবে দুঃখ বেদনায় জর্জরিত হ'য়ে মানুষ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় কেন? অসৎ ও অমংগল বিশ্বে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে কি ক'রে? এই দুঃসমাধেয় দার্শনিক প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার একটা প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় 'প্রমিথিউস্ বাউণ্ড' নাটকে। দেবরাজ জিয়াসের আদেশ অমান্য ক'রে মানুষের কল্যাণার্থে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে শক্তিমান প্রমিথিউস্। ক্রোধান্ধ দেবরাজের আদেশে প্রমিথিউস্ নীত হয় এক পর্বতের সানুদেশে, যেখানে তাকে শলাকা বিদ্ধ ক'রে হত্যা করা হবে। প্রমিথিউস্ এখানে কল্যাণকামী মানবাত্মার প্রতীক, যে আত্মা তার ব্রত উদ্‌যাপনে সকল প্রকার কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত। এই ধারার অন্তর্গত আর দু'খানি নাটকের সন্ধান পাওয়া গেলে প্রমিথিউসের চরম পরিণতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অবকাশ থাকত। অনুমিত হয়—শেষ পর্যন্ত নাট্যকার দুটি বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে একটা সমন্বয়ের সেতু রচনা করেছিলেন। এ্যাসকাইলাসের চিন্তায় ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক এক মহত্তম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বকে সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্লেষণ রীতিমত কঠিন কাজ এবং এ্যাসকাইলাস এই পরীক্ষায় সাফল্যের সংগে উত্তীর্ণ হ'য়েছেন। উনিশ শতকের ইংরেজ কবি শেলী এই নাটক অবলম্বনে 'প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ড' রচনা করেন, কিন্তু শেলী তাঁর রচনায় দেবরাজ জিয়াসের পতন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, তা এ্যাসকাইলাসের কাছে অভাবনীয়।

এ্যাসকাইলাসের নব্বইখানি নাটকের মধ্যে মাত্র সাতখানি মহাকালের হাত অতিক্রম করতে সক্ষম হ'য়েছে। সৌভাগ্যক্রমে এক নাটকীয় সূত্রে আবদ্ধ তিনখানি নাটক (trilogy) অখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। 'অরেষ্টিয়া' নাটকের রচনাকাল ৪৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ—'এ্যাগামেমনন', 'খোয়েফোরি' ও 'ইউমেনাইড্‌স্' যেন একই নাটকের তিনটি অংক। কিন্তু এককরূপে প্রতিটি রচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কবি সুইনবার্ণ এই নাটক ত্রয়ীকে অভিহিত করেছেন—'মানুষের মহত্তম আধ্যাত্মিক সৃষ্টি' নামে। প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার সৃজনীপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে 'অরেষ্টিয়া-'তে। বংশ পরম্পরাগত অভিশাপ কাহিনীর মূল উপজীব্য। প্রথম নাটক ট্রয়ের যুদ্ধ-বিজয়ী এ্যাগামেমননের গৃহে প্রত্যাবর্তন ও স্ত্রী ক্লাইটেমনেষ্ট্রা কর্তৃক স্বামীর হত্যাসাধন, দ্বিতীয় নাটকের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে পুত্র অরেষ্টিস্ ও কন্যা ইলেক্‌ট্রার হাতে ক্লাইটেমনেষ্ট্রার মৃত্যু এবং তৃতীয় ও শেষ নাটকে মাতৃহত্যা জনিত পাপ থেকে অরেষ্টিসের মুক্তি ও পারিবারিক অভিশাপের অবসান বর্ণিত হ'য়েছে। ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার চরিত্র অংকনে নাট্যকার বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মনের প্রবল আবেগ ও নিরুদ্ধ বাসনার স্রোত দমন ক'রে হাসিমুখে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানানো, এ্যাগামেমননকে হত্যা করার পর তার প্রবল উল্লাস ও এই দুষ্কার্যকে মহত্তর রূপ দেবার প্রচেষ্টা এবং পরিশেষে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হতাশা ও অবসাদ—ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার চরিত্রকে দান করেছে প্রচণ্ড নাটকীয় গতি। এখানেও নাট্যকারের দৃষ্টি আবর্তিত হয়েছে মানুষের অসৎ প্রবৃত্তিজনিত সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে। তাই বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও নাটকেরই একমাত্র মূল সুর রক্তের বদলে রক্ত।

সমগ্র বিশ্বজগতে অসতের প্রভাব পরিব্যাপ্ত, যার পরিণাম নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও সর্বগ্রাসী অন্ধকার। মানুষ এখানে নিজেই তার ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। তাদের মানসিক দ্বন্দ্ব একান্তভাবেই দুটি বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া। দৈবকে অস্বীকার ক'রে ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রা চেয়েছিল তার প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে জয়ী করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরাট ব্যর্থতা ও হাহাকারের মধ্যে তাকে জীবন শেষ করতে হ'য়েছে। প্রবল দুঃখের আগুনে পুড়েই মানুষ নিজেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারে—নাটকের শেষে এই তত্ত্বটি-ই প্রাধান্য লাভ করেছে। অরেষ্টিস্ লাভ করেছে দেবতার ক্ষমা আর প্রতিশোধের বাসনা চরিতার্থকামী 'ফিউরি'রা পরিণত হ'য়েছে করুণার প্রতীকে।

সফোক্লিস মাত্র সাতাশ বছর বয়সে নাট্যপ্রতিযোগিতায় এ্যাসকাইলাসকে পরাজিত ক'রে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন ; সেই সময় থেকেই গ্রীক নাট্যজগতে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পঁচিশবার প্রথম পুরস্কার বিজয়ী সফোক্লিসের নাটকের সংখ্যা প্রায় একশ তেইশ। অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সফোক্লিস তাঁর যুগ ও ধর্মের প্রতি আনুগত্য সমভাবে বজায় রেখেছেন। জীবনের গতিপথ নির্ণয়ে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। এ্যাস্‌কাইলাসের রচনায় বিশালতা ও জীবন সম্বন্ধে একধরণের নেতিবাচক মনোভাব অথবা ইউরিপিদিসের মানবীয় করুণা ও প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—কোনটাই তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। ঈশ্বরের সংগে মানুষের সম্পর্কজনিত সমস্যা তাঁর নাটকের মূল উপজীব্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এ্যাসকাইলাস যেখানে মানুষের অসৎ প্রবৃত্তি ও তার দুঃখভোগের অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং ইউরিপিদিস্ যেখানে ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করেছেন—সফোক্লিস সেখানে এই বিশ্বনিয়ন্ত্রণকারী শক্তিকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন মানুষের বোধের অতীতরূপে।

ঈশ্বরের বিধান ও মানুষের তৈরী আইন—এই দুই এর সংঘাত 'এন্টিগোণ' নাটকের বিষয়বস্তু। নায়িকা এন্টিগোণ চায় ভ্রাতা পলিনিসের শেষকৃত্য গ্রীসের প্রথা অনুযায়ী সম্পাদন করতে। রাজা ক্রিয়ন ভিন্নমত পোষণ করে। তার মতে পলিনিস প্রথম আক্রমণকারী। সুতরাং পলিনিসের মৃতদেহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনই এর উপযুক্ত শাস্তি। যথাযোগ্য সম্মানের সংগে মৃতদেহের সৎকার, প্রাচীন গ্রীসের অধিবাসীদের কাছে ছিল সামাজিক রীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এন্টিগোণ রাজার আদেশ অমান্য করে এবং উপযুক্ত মর্যাদায় তার ভ্রাতার মৃতদেহ সৎকার করা হয়। এন্টিগোণ দণ্ডিত হয়—মৃত্যুদণ্ডে। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। এন্টিগোণের পাণিপ্রার্থী ক্রীয়নের পুত্র হেমন পিতাকে এই কাজ থেকে বিরত হ'তে অনুরোধ জানায়, পরিশেষে আত্মহত্যার দ্বারা জীবনের অবসান ঘটাতে বাধ্য হয়। পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে ক্রীয়নের স্ত্রীও মৃত্যু বরণ করে। ক্রীয়নের চরিত্রটি বিশেষভাবে ট্র্যাজিক। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে নিজের ধারণার ওপর তার প্রবল আস্থা। তাই আইনভংগকারীর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। কিন্তু মৃতদেহের প্রতি অসম্মান দেখানো মানেই ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা, তার শাস্তি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের মৃত্যু। নিজের ভুল সে বুঝেছে, কিন্তু অনেক দেরিতে, যখন তার সংশোধনের কোন পথ খোলা নেই।

এন্টিগোণের প্রতি আমরা গভীর সহানুভূতি অনুভব করি, অথচ আদর্শের প্রতি প্রবল নিষ্ঠা সত্ত্বেও তার অহংকারজনিত স্বার্থপরতা চরিত্রটিকে অতিমাত্রায় জীবন্ত ও বাস্তবানুগ ক'রে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ একটি মতের পরিপোষক হ'য়েও সফোক্লিস চরিত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে আদর্শায়িত করেননি, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। নাটকটির আর একটি বৈশিষ্ট্য, কোন অতিপ্রাকৃত চরিত্রের অবতারণা এখানে করা হয়নি, তৎসত্ত্বেও প্রতিটি ঘটনাতেই অতীন্দ্রিয় কোন সত্তার প্রভাব আমরা অনুভব করি।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে সফোক্লিসের 'ইলেক্ট্রা' ও এ্যাস্কাইলাসের 'খোয়েফরি' এক পর্যায়ের। কিন্তু সফোক্লিসের হাতে তা সম্পূর্ণ ভিন্নতররূপ পরিগ্রহ করেছে। গ্রীক পুরাণের কাহিনীতে যুগোপযোগী মানবিক রস সঞ্চার করতে নাট্যকার সেগুলির প্রয়োজনমত পরিবর্তন সাধন করেছেন। এ্যাসকাইলাসের রচনায় প্রধান চরিত্র—অরেস্টিস্, আলোচ্য নাটকের নায়িকা ইলেকট্রা। এ্যাগামেমননের হত্যাকে কেন্দ্র করে মাতা ও কন্যার সম্পর্ক প্রবল শত্রুতায় পরিণত হয়। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ভ্রাতা অরেস্টিসের সাহায্যে ইলেক্ট্রা ক্লাইটেমনেস্ট্রা ও তার প্রেমিক এজিস্থাসকে হত্যা করে। নাট্যকার এখানে তাঁর সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন নায়িকা ইলেকট্রার চরিত্র পরিস্ফুটনে। নাট্যকারের গভীর বিশ্লেষণাশক্তি ইলেট্রার চরিত্রের মর্মোদ্ঘাটনে বিশেষ সহায়ক হ'য়েছে এবং তা আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সফোক্লিসের মহোত্তম সৃষ্টি রাজা 'ঈডিপাস'। ভাব ও রূপের আশ্চর্য সমন্বয়ে নাটকখানি সমগ্র গ্রীক ট্র্যাজিক নাট্যজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে আছে। কাহিনী, চরিত্র, নাটকীয়গতি ও কবিত্বপূর্ণ সংলাপের জন্য এ্যারিষ্টটল নাটকখানিকে গ্রীক নাটকের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে অভিহিত করেছেন। সমগ্র কাহিনীটিকে ঘিরে আছে নিষ্ঠুর ভাগ্যের মর্মান্তিক পরিহাস। মানুষের পুরুষকার যতই প্রবল হোক না কেন, দৈব প্রতিকূলতায় তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ঈডিপাস বাল্যকালে দৈববাণী শোনে, পিতাকে হত্যা করে সে মাতাকে বিবাহ করবে। ভাগ্যের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করতে সে প্রয়োগ করে সর্বশক্তি; পরিশেষে একান্ত অসহায়ের মত ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে বাধ্য হয়। থিবস নগরীতে যেদিন ভয়াবহ মহামারীর আবির্ভাব হ'লো, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় ঈডিপাসের কৃতকর্মের ফলেই এই বিপর্যয়। ঈডিপাস থিবস্ নগরীর অধিপতি লেয়াসকে হত্যা ক'রে তার বিধবা পত্নী জোকাস্টার পাণিগ্রহণ করে। লেয়াস ঈডিপাসের পিতা এবং জোকাস্টা তার মাতা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ঈডিপাস স্বহস্তে চক্ষু উৎপাটন করে। হয়তো তার মনে হয়েছিল এই প্রায়শ্চিত্ত তার পাপের গুরুত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাই পরম প্রিয় থিবস নগরী পরিত্যাগ ক'রে সে যায়—স্বেচ্ছা নির্বাসনে। মহানুভবতা, ঔদার্য, সদাশয়তা ইত্যাদি গুণ থাকা সত্ত্বেও হটকারিতা, অবিবেচনা ও দুর্দমনীয় ক্রোধের অভিব্যক্তি ঈডিপাসের পতনের কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু দৈবচক্রের যে ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তাঁকে এই পরিণতির সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে তা অসংগত। এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাঁর নেই। স্বহস্তে চক্ষু উৎপাটন গ্রীক চিন্তাধারার বিরোধী, অথচ দেহগত কলুষ ও গ্লানি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই তাকে প্রবৃত্ত করিয়েছে এই কাজে। এক অর্থে ঈডিপাস স্বয়ং তার ভাগ্যের নিয়ন্তা। কারণ দৈবের

ওপর দোষারোপ ক'রে নিজের অপরাধ ক্ষালন করার সুযোগ তার ছিল। তা না ক'রে সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব সে নিজেই গ্রহণ করেছে, এবং এখানেই নাটকের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও সর্বজনীন আবেদন নিহিত।

সফোক্লিসের মন হয়তো ঈডিপাসের অন্ধত্ব ও স্বেচ্ছানির্বাসন জনিত পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারেনি, তাই তিনি জীবন সায়াহ্নে উপনীত হ'য়ে রচনা করলেন আর একখানি নাটক —'ঈডিপাস এ্যাট্ কলোনাস' অর্থাৎ কলোনে ঈডিপাস। বহুস্থান পরিভ্রমণের পর শেষ জীবনে ঈডিপাসের গ্রীসে প্রত্যাবর্তন ও স্বদেশের মাটিতে মৃত্যু, নাটকের বিষয়বস্তু। প্রথমে দেশবাসীর প্রবল ঘৃণা ও উপেক্ষা, পরিশেষে ঈশ্বরের নির্দেশে তার দুঃখের অবসান—এই নাটকখানিকে পরিপূর্ণ শান্তির আধার ক'রে তুলেছে। ঈডিপাস এখানে তার পূর্ব গৌরব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত; প্রবল দুঃখের অগ্নিতে পরিশুদ্ধ তার চরিত্র প্রায় দেবতার পর্যায়ে উন্নীত। নাট্যকার সফোক্লিস মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে নির্মাণ করেছেন একটি সেতু, সেই সেতু অতিক্রমের একটি মাত্র পথ—দুঃখভোগ।

ইউরিপিদিসের (৪৮০ খ্রীঃ পূঃ—৪০৬ খ্রীঃ পূঃ) জন্ম সফোক্লিসের জন্মের পনের বছর পরে, কিন্তু দুই স্রষ্টার মানসিক গঠনভংগীতে বিরাট প্রভেদ। এ্যারিষ্টোফেনাস রচিত 'দি ফ্রগ' প্রহসনে ইউরিপিদিসকে চিত্রিত করা হ'য়েছে এক বিষাদগ্রস্ত উন্নাসিকরূপে। গ্রীসদেশে এই সময়ে যে যুক্তিবাদী আন্দোলন (সফিষ্ট মুভমেণ্ট) সুরু হয়, তা ইউরিপিদিসের রচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই আন্দোলনের সংগে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ ব্যক্তির পেশা ছিল অধ্যাপনা। এঁরা চেয়েছিলেন জগৎ ও জীবন থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে। এঁদের মধ্যে যেমন জ্ঞানীগুণী উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, তেমনি অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন স্বার্থপর লোকেরও অভাব ছিল না। প্রাচীন আদর্শবাদ ক্রমশঃ শূন্যতায় পর্যবসিত হচ্ছিল। এই ভাবধারার আবর্তে পড়ে ইউরিপিদিসের চিন্তাধারায় দেখা দিল সন্দেহ ও সমালোচনার প্রবণতা। এ্যাসকাইলাসের কল্পনায় ঈশ্বর ছিলেন প্রচণ্ড শক্তির আধার; ইউরিপিদিস তার মূলে একটি আঘাত হানলেন। এথেন্সের প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীগুলির আদর্শগত মূল্য সম্বন্ধেও তাঁর মনে দেখা দিল সন্দেহের ভাব। তাই ইউরিপিদিসের রচনায় যে নতুন ভাবধারার প্রকাশ ঘটলো, পরবর্তীকালে তার মূল্যবোধ স্বীকৃত হলেও সেদিনের গ্রীক নাগরিকগণ তাকে স্বাগত জানাতে পারেননি। এ্যাসকাইলাস সফোক্লিসের নাটকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত যে দৃঢ়বদ্ধ সুসংহত ধারণার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে ইউরিপিদিসের রচনায় তা একান্তভাবেই অনুপস্থিত। বস্তুতঃ ইউরিপিদিসের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে প্রাচীন ঐতিহ্য বিশেষ কার্যকরী হয়নি। আধ্যাত্মিক প্রশ্নগুলি নিয়ে তিনি বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কিন্তু পূর্বসূরীদের মত কোন সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হ'তে পারেন নি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছে, অতীতের গৌরব সমুন্নতি থেকেও তারা অনেকটা বিচ্যুত। এই ত্রুটি সত্ত্বেও ইউরিপিদিসের রচনা গ্রীক ট্র্যাজিক সাহিত্যে এক অনন্যস্থান অধিকার ক'রে আছে, কারণ যে নতুন সুর তিনি শোনালেন তা তখনও পর্যন্ত প্রায় অশ্রুতপূর্বই ছিল।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে ইউরিপিদিসের 'ইলেকট্র্যা' নাটকের সংগে এ্যাসকাইলাসের

'খোয়েফোরি' ও সফোক্লিসের 'ইলেক্ট্রা'র কোন তফাৎ নেই। কিন্তু ইউরিপিদিস তাঁর রচনাকে পরিয়েছেন এক নতুন সাজ, যার মাধ্যমে তাঁর দৃষ্টিভংগীর বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। নায়িকার চরিত্র প্রথম স্রষ্টার হাতে রূপায়িত হ'য়েছে বীরত্বে মণ্ডিত হ'য়ে; দ্বিতীয়জন তাকে দেখেছেন এক আদর্শের প্রতীকরূপে; ইউরিপিদিস্ সেই ইলেক্ট্রাকে স্বর্গ থেকে নামিয়ে এনেছেন ধূলিমালিন্যভরা এই পৃথিবীতে। পুত্রকন্যার হাতে ক্লাইটেম্নেস্ট্রার মৃত্যু এই নাটকে আরও ভয়াবহরূপে প্রকাশিত। সে এখানে একজন সাধারণ রমণী ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই এই হত্যাকাণ্ডকে কোন আদর্শ বা মহত্ত্বের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়নি। নাটকের উপসংহার সম্বন্ধেও নাট্যকারের কোন পূর্ব নির্দিষ্ট সুপারকল্পিত ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। দেবতা এখানে আবির্ভূত হ'য়েছেন কিন্তু তাঁর ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। নারী চরিত্রাঙ্কণে নাট্যকারের অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে ইউরিপিদিসের ইলেকট্রা নাটক।

. নারীচরিত্রের আরও কয়েকটি দিক প্রকাশ পেয়েছে 'মিডিয়া', ও 'হিপ্পোলিটাস' নাটকে। নাট্যকার যেভাবে তাদের উপস্থাপিত করেছেন তার দ্বারা নারীচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর প্রভূত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'মিডিয়া' নাটকের নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্ব একান্তভাবেই বাস্তবানুগ। সন্তানের প্রতিভালবাসা ও অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা—মিডিয়াকে নতুন মহিমা দান করেছে। তার জিঘাংসা প্রবৃত্তির মূলে ছিল জেসনের প্রবল অস্মিতা। তার মনোগত অভিপ্রায় ছিল মিডিয়ার মাধ্যমে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ ও দেহগত বাসনার চরিতার্থতা। কিন্তু মিডিয়ার প্রকৃত পরিচয় জেসন তখনও বুঝে উঠতে পারেনি। তাই যাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার ক'রে সে উদ্দেশ্য সফল করতে চেয়েছিল, একদিন সেই পরিত্যক্ত অস্ত্রই তাকে হানলো চরম আঘাত। যে প্রেম একদা বর্বর মিডিয়াকে তার সমাজ থেকে সরিয়ে এনেছিল, নারীত্বের চরম অপমানে তা রূপান্তরিত হ'লো প্রতিশোধের দুরন্ত বাসনায়। সেই বাসনার লেলিহান শিখা শুধু জেসন ও তার নতুন প্রণয়িনীকে দগ্ধ করেই নিবৃত্ত হ'লো না, মিডিয়ার দুটি সন্তানও সেই আগুনে ভস্মীভূত হ'লো। প্রাচীন উপকথা অবলম্বনে রচিত 'মিডিয়া' ইউরিপিদিসের প্রগতিবাদী মনোধর্মের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিংশশতাব্দীর যে কোন শক্তিশালী নাট্যকার এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনা করতে পারেন।

'হিপ্পোলিটাস্' নাটকখানিও নায়িকাপ্রধান। রাজা থেসিয়াসের অবৈধ সন্তান হিপ্পোলিটাসের প্রতি রাণী ফেড্রার দুর্দমনীয় প্রেমাকাঙ্ক্ষা নাটকের মূল উপজীব্য। হিপ্পোলিটাস রাণীর এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনি। ফ্রেডা কলঙ্কের ভয়ে আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সে হিপ্পোলিটাসের বিরুদ্ধে রেখে গিয়েছে এক গুরুতর অভিযোগ। এই চক্রান্তের জাল ছিন্ন করা হিপ্পোলিটাসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাকে নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হ'য়েছে। বলা বাহুল্য নাট্যকারের সমগ্র দৃষ্টি এখানে নায়িকার প্রতি নিবদ্ধ। বিভিন্ন দেবদেবীর আচরণকেও কোন মতেই দেবসুলভ বলা চলে না। তাদের পারস্পরিক বিরোধই নির্দোষ হিপ্পোলিটাসের মৃত্যুর কারণ। দেবী আফ্রোদিতের পূজো না ক'রে দেবী আর্টিমিসকে সম্মান দেখিয়েছিল হিপ্পোলিটাস এবং এই জন্যই তার পতন অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। 'হেকিউবা' এবং 'এ্যাণ্ড্রোমেকি' নাটক দুখানিও

নারীচরিত্রের ট্র্যাজেডি। ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাত নায়িকা হেকিউবার নারীসুলভ কোমলতাকে রূপান্তরিত করেছে বর্বর প্রতিহিংসার বাসনায়, আর এ্যাণ্ড্রোমেকিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ মেনে নিতে হ'য়েছে। এই দু'খানি নাটকেও দেবকুল তাঁদের মাহাত্ম্য বজায় রাখতে পারেননি। এ্যাপোলো সম্বন্ধে ইউরিপিদিসের মনোভাব কোনদিনই অনুকূল ছিল না এবং এই দেবতাটির বিশ্বাসঘাতকতাই নিওপটলেমাসের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

ঈশ্বরের প্রতি নাট্যকারের এই নেতিবাচক মনোভাব গ্রীসের নাগরিকবৃন্দ প্রীতির চোখে দেখেননি। প্রকৃতপক্ষে ইউরিপিদিসের উদ্দেশ্য ছিল,—সকল প্রকার তুচ্ছতা ও দৈন্য সত্ত্বেও মর্তের মানুষকে তার যথাযোগ্য সম্মানে ভূষিত করা, দেবতা তাঁর কাছে কল্পিত ও বিভ্রমসৃষ্টিকারী অমঙ্গলের প্রতীক মাত্র! জীবনের শেষ পর্যায়ে ইউরিপিদিস এথেন্স ত্যাগ করে ম্যাসিডনে শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন। এখানেই রচিত হয় তাঁর শেষ নাটক 'ব্যাক্কি'। এই নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন, কিন্তু নাট্যকারের সংহত শক্তির সর্বোত্তম পরিচয় নিহিত আছে 'ব্যাক্কি' নাটকে—একথা কোন সমালোচকই অস্বীকার করেন না। নাটকের নায়ক আসবদেবতা ডাওনিসাস। রাজা পেন্থিয়াস চান নাগরিকদের ডাওনিসাসের উচ্ছৃঙ্খল প্রভাব থেকে মুক্ত করতে। তিনি মনে করেন ডাওনিসাসের প্রভাবেই নগরবাসীরা অতিমাত্রায় মত্ত হয়ে পড়ে। দেবতা সৃষ্টি করলেন মায়াজাল। মদ্যপানের ফলে অতিমাত্রায় উত্তেজিত একদল নারীকর্তৃক পরিবৃত হ'লেন রাজা পেন্থিয়াস। রাজমাতা স্বয়ং এই মত্ত নারীকুলের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি মত্ততাজনিত ভাগ্যের পরিহাসে সিংহ মনে করে পুত্রের শিরশ্ছেদ করলেন। পুত্রের কর্তিত মস্তক হাতে নিয়ে যখন তিনি প্রবল উল্লাসে মত্ত তখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। ইউরিপিদিস বুঝেছিলেন ডাওনিসাস ভক্তবৃন্দের মত্ততাজনিত উল্লাসের পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে। যুক্তিপ্রবণতা ও ভাবপ্রবণতা এদের যে কোন একটিকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিলে ফল কখনও শুভ হয় না বোধহয় এই তত্ত্বটিই তিনি 'ব্যাক্কি' নাটকে প্রতিপাদন করার প্রয়াস করেছেন।

গ্রীক ট্র্যাজেডির বিশালতায় দুর্বার গতি, সর্বোপরি প্রকৃত ট্র্যাজিক রস সৃষ্টিতে এর সার্থকতা, সেক্‌স্‌পীয়র ভিন্ন আর কোন নাট্যকারের রচনাতে দেখা যায় না। মনে হয়—সমাজ জীবনের বহুবিধ পরিবর্তন ও সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের চিন্তাশক্তির ক্ষেত্রও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। জীবনের গভীরে অবতরণ ক'রে সত্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন মানুষ পেয়েছিল ট্র্যাজেডি রচনার প্রেরণা, আজকের সমাজ জীবনের অবস্থিতি সেখান থেকে অনেক দূরে। অধ্যাপক নিকোলের ভাষায়—true tragic emotion is an exceedingly rare and precious thing, exemplified in only a very few plays in the theatre's history'—The theatre and the Dramatie Theory—1962. নিকলের এই মত হয়তো সকলের কাছে গ্রাহ্য হবে না কিন্তু আধুনিক কালের তথাকথিত ট্র্যাজিক নাটকের সংগে সেক্‌স্‌পীয়র অথবা প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির তুলনা করলেই শ্রেণীগত পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যাবে।

অ্যাবসার্ড নাটক ও বাঙালি নাট্যকার

বার্ণিক রায়

অ্যাবসার্ড নাটকের মর্মকেন্দ্রে অসাড়তা রয়েছে বলে অনেকের ধারণা, অনেকে বলেন বেদনা যদি অসাড় হয়ে যায়, তাহলে তা থেকে যে অর্থহীন কার্যকলাপ ও নিরর্থকতা লেগে থাকে, তা থেকেই অ্যাবসার্ড নাটকের সৃষ্টি। কিন্তু এই ধারণা কোন শিল্পরূপ সম্বন্ধে সত্যকে প্রকাশ করে না। উদ্ভট যে চিত্র ঘটনা চরিত্র আসছে, এই উদ্‌ভটত্ব শুধু পাঠক দর্শকের দিক থেকে সত্য নয়। চরিত্রের কাছেও সত্য এবং চরিত্রের কাছে সত্য হলে তাহলে অসাডতা আর থাকে না। আমি দেখছি আমার চোখের সামনে সব গণ্ডার, এই গণ্ডার দেখাটা সামাজিকরূপ থেকেই এসেছে, আমার বেদনা যদি অসাড হয় তাহলে অন্য যে গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে এবং গণ্ডারের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত এই বোধ কি করে গড়ে ওঠে। আমার মনের মধ্যে সেই শুভময় আকাঙ্খিতব্য গোডো আছে বলেই তো অপ্রাপনীয় বলেও তাকে গ্রহণ করতে চাই। ব্যর্থতাই তো চেতনাকে আরো তীক্ষ্ণ করে রাখছে। পৃথিবী ও জীবন অর্থহীন নয়, কিন্তু অর্থহীন হয়ে গেছে, এই অর্থহীনবোধ সম্বন্ধে সূচীতীক্ষ্ণ চেতনা জাগিয়ে তোলাই সমাজবাস্তবতা। কামু অর্থহীন চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু তাঁর লেখা চেতনায় তীক্ষ্ণ নয় একথা সাহিত্যে নির্বোধই বলতে পারেন। অ্যাবসার্ড সাহিত্যতত্ত্বের এই অর্থহীনতার সঙ্গে টেকনিকের বিপর্যয় অনেককে বিতৃষ্ণা জাগিয়েছে, আবার অনভিজ্ঞ নাট্যকারদের জীবনবিরোধী খামখেয়ালিপনা বিচ্ছিন্ন চিত্র আঁকতে সহায়তা করেছে। জীবনের বিপর্যয়ের সঙ্গেই টেকনিকের বিপর্যয় এসেছে। কাফ্‌কার ট্রায়াল উপন্যাসের নায়কের মতো অর্থহীনভাবে অর্থহীন অপরাধের জন্যে প্রকৃত সত্য খুঁজে বেডাচ্ছি কিন্তু সত্য খুঁজে পাচ্ছি না, অথচ সবই ঠিক আছে, পৃথিবী সমানতালে চলছে, সকলে নিদিষ্ট স্থানে কাজ করে চলেছে, অথচ নায়কের কাছে অর্থহীনতা চূডান্তভাবে ধরা দিয়েছে, সেখানে টেকনিকের মধ্যেও সেই নিরর্থকতা ও স্বাভাবিকতার বিপর্যয় আসতে বাধ্য। জয়েসের য়ুলিসিসের মধ্যে যে টেকনিক তা অবাস্তব নয়, কল্পিত নয়, তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় চেতনার কাছে পৃথিবীর বোধ অস্বাভাবিক অসম্ভবতার মাধ্যমে এলে ঐভাবেই তার প্রতিক্রিয়া ঘটে। অ্যাবসার্ড নাটক যেহেতু সুসযুক্তিপূর্ণ ঘটনা বহুল দৃশ্যের বর্ণনা করে না, সেই হেতু এর চরিত্র দৃশ্যঘটনা চেতনার মর্মমূলে অধিষ্ঠিত এবং এই চেতনার মধ্যে পৃথিবীর ইম্‌প্রেশন কতভাবে বিচিত্রধারায় কাজ করতে পারে, তারই বাস্তবচিত্র নাটকে প্রকাশ করতে নাট্যকারেরা ব্যস্ত। এই ইম্‌প্রেশনের মধ্যে বাস্তব অবাস্তব স্বপ্ন সত্য ইতিহাসরূপ মুখর বাচাল বা মূক, হাসিকান্না, বেদনা কৌতুক একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে! পিরান্‌দেল্ল যদি ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত এ্যাটম মনে করে থাকেন, সত্যকে আপেক্ষিক ভাবেন, তাহলে এ্যাবসার্ড নাটকের সুর আরও সুদূর প্রসারী, কারণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়ে জগৎকে দেখলে সত্য আর আজ শুধু আপেক্ষিক মনে হচ্ছে না, একটিই মনে হচ্ছে সেটি অর্থহীন। আপেক্ষিক বলার পেছনে ভালো আছে এটাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হয়, এবং যদি তা থাকে, তাহলে খণ্ডিত ব্যক্তিত্বকে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সেই শুভ সত্যে পৌছানো

অসম্ভব নয়, কিন্তু যেখানে আপেক্ষিকতা নেই, একটি মাত্র সত্যই আছে, অথচ যে সত্যের মধ্যে নিজেকে ডোবানো যায় না, সেখানে বেদনা ও যন্ত্রণা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। অ্যাবসার্ড নাটকে এই সত্যের প্রতি প্রশ্ন ও দাবি তুলেছে এবং এপ্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে, অ্যাবসার্ড নাটকে রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা চরিত্রের মধ্যে কচিৎ আভাসে ফুটে উঠলেও রোমান্টিক সর্বস্ব নয়। অনেকে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নাটক লেখে এবং আলোচনা করেন। আসলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিরাশ্রয় মানুষের ব্যক্তিত্বের সামগ্রিকতা প্রকাশই এই নাটকের ধর্ম। তাই আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদকেও ছাড়িয়ে গেছি। এই সাধারণ বক্তব্য বলবার পর আরও একটু বিস্তৃত হওয়া দরকার। অ্যাবসার্ড কথাটির বাংলা এর মূল দার্শনিকতত্ত্বকে প্রকাশ করতে পারে না, তাই অ্যাবসার্ড নামটি টেকনিক্যাল শব্দের মতো বাংলায় গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। লাতিনসম্ভূত অ্যাবসার্ড শব্দটির মৌলিক অর্থ হল কোনো কিছুর প্রতি কোন ব্যক্তির বধির হয়ে যাওয়া ab উপসর্গ বোঝাচ্ছে কোন কিছু থেকে বা কোন কিছুর প্রতি, surdus শব্দটি বোঝাচ্ছে বধির। ক্র্যাবের অভিধানে শব্দটির ব্যবহার চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে: it is absurd for a man to persuade another to do that which he in like circumstances would object to do himself. নিজে যা করতে পারছি না অথচ অন্যকে তা করতে প্ররোচিত করেছি। এই বিরোধই absurd-এর মধ্যে প্রধান কথা, ফলে যে ব্যক্তির প্ররোচনায় কাজ করতে হচ্ছে তার প্রতি বধির হওয়া ছাড়া আর কি উপায়। ফলে পরবর্তীকালে শব্দটিতে সামঞ্জস্যহীন 'অযৌক্তিক' 'হাস্যকর' অর্থ আসে। এবং এই অর্থ এই বিরোধের ফলেই সৃষ্ট হয়েছে।

কামুর Le Mythe Sisyphe-এ বইয়ে ১৯৪০-এর সময় অ্যাবসার্ড কথাটির আলোচনার প্রসঙ্গে এবং সিসিফাসের কাহিনী বিশ্লেষণ করে এই তাৎপর্যই নিষ্কাশিত করতে চেয়েছেন। কামুকেই অ্যাবসার্ড নাটকের পথিকৃৎ বলা চলে, অন্তত দার্শনিক ভিত্তি তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দেবতারা সিসিফাসকে শাস্তি দিয়েছেন যে পাহাড়ের ওপর অনবরত একটি পাথর তিনি ওঠাবেন, অথচ এই পাথরটা নিজের ভারেই পড়ে যাবে, কিন্তু যতবার পড়ে যাবে, সিসিফাস ততবারই ওঠাবেন। দেবতারা ভেবেছিলেন যে নিস্ফল ও আশাহীন পরিশ্রমের চেয়ে অন্য কোন মারাত্মক শাস্তি সিসিফাসের আর হতে পারে না।

সিসিফাসের অপরাধ তিনি দেবতাদের গোপনশক্তি চুরি করে নিয়েছিলেন। ইসোপুসের কন্যা ইজিনাকে জুপিটার নিয়ে যাওয়াতে ইসোপুস গভীরভাবে ক্ষুণ্ন হন, সিসিফাসের কাছে অভিযোগ করেন। সিসিফাস এই অপহরণের কথা জানতেন, তিনি শর্ত করলেন যে ইসোপুস যদি শহরের দুর্গে জল দেয় তাহলে তিনি অপহরণের কথা বলবেন। অলৌকিক বজ্রের কাছে জলের আশীর্বাদ চেয়েছিলেন এবং এই কারণেই দেবতার কাছ থেকে তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। হোমার একথাও বলেন যে সিসিফাস মৃত্যুকে বন্দী করেছিলেন, প্লুটো মৃত্যুহীন তার সাম্রাজ্যের শূন্য অবস্থা সহ্য করতে না পেরে যুদ্ধের দেবতাকে পাঠিয়েছিলেন মৃত্যুকে মুক্ত করবার জন্যে। এবং একথাও আছে মৃত্যুর সন্নিকটে এসে হঠাৎ তাঁর প্রতি স্ত্রীর প্রেম পরীক্ষা করতে চান। প্লুটোর কাছে অনুমোদন পেয়ে নিচের অন্ধকার জগৎ থেকে পৃথিবীতে যখন স্ত্রীর প্রেম পরীক্ষার জন্য এলেন, জগতের মুখ আবার

দেখতে পেলেন, সূর্য জলকে উপভোগ করলেন তপ্ত পাথর উষ্ণ সমুদ্র উপভোগ করলেন, তিনি আর নারকীয় অন্ধকার জগতে ফিরে যেতে চাইলেন না। দেবতাদের পুনঃআহ্বান, ক্রোধ, ধমকানি কোন কিছুই তাঁকে ফিরিয়ে নিতে পারলো না। ঢেউ খেলানো সমুদ্র দেখে, স্ফুলিঙ্গের মতো জলে ওঠা সমুদ্রে ও পৃথিবীর হাসি দেখে আরো অনেকদিন বাস করলেন। কিন্তু তারপর দেবতার অমোঘ বিধানের মতো মার্কারি এসে তাঁকে জোর করে অন্ধকার জগতে টেনে নিয়ে গেলেন।

কামু এই কাহিনী বলার পর ঘোষণা করেছেন যে সিসিফাস হচ্ছে অ্যাবসার্ড নায়ক। এখন প্রশ্ন হলো কেন তিনি অ্যাবসার্ড নায়ক।

প্রথমতঃ, মানুষের সঙ্গে ভগবানের কোনো সম্পর্ক নেই যদি সম্পর্ক থেকেও থাকে, তাহলেও তা ভগবানের কাছ থেকে শাস্তি পাবার। সুতরাং ভগবান যদি জগতের অমোঘ নিয়তি হয় তাহলে তাঁর কাছ থেকে অযথা শাস্তি পেতে হয়। সুতরাং ভগবানের প্রতি ঘৃণাই তার ব্যক্তিত্বকে মহীয়ান করে তুলেছে। দ্বিতীয়তঃ এই শাস্তির জন্যে তাঁর নিজের কোন অপরাধ ছিল না। কারণ হোমার নিজেই বলেছেন যে মর্ত্য মানুষের মধ্যে সিসিফাস হলেন সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিবেচক। ভগবানদের মধ্যে সর্বহারা, শক্তিহীন ও বিদ্রোহী। যেহেতু তিনি দেবতা নন, সেইহেতু দেবতাদের অন্যায়কে প্রকাশ করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। সুতরাং সিসিফাসের শাস্তি, যা তাঁর ভাগ্য, এ ভাগ্য তাঁর ব্যক্তিগত নয়, এ ভাগ্য অনিবার্য ও জঘন্য, কারণ সিসিফাস মানবের প্রতিনিধি ও প্রতীক। তৃতীয়তঃ, এই নিরন্তর শাস্তিভোগের মধ্যে তাঁর চেতনা অসাড় হয়ে যায়নি। বিরাট পাথরকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে ওপরে ওঠাচ্ছেন, প্রচুর শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে, পাহাড় চূড়া থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ছে নিচে। এই গড়িয়ে পড়বার সময়টুকুই তাঁর অবসর, বিশ্রাম। এই অবসর বিশ্রামের মধ্যেই তার চিন্তা ভাবনা, এই চিন্তা ভাবনা থেকেই সিসিফাস সচেতন হয়ে উঠছেন, সচেতন হয়ে উঠছেন তাকে আবার পাথর ওঠাতে হবে, নিরন্তর শাস্তি পেতে হবে, এই শাস্তি থেকে তাঁর মুক্তি নেই। এই সচেতন চিন্তার সঙ্গে পরিবেশের বিরোধে প্রকৃত ট্র্যাজিক বোধ জেগে উঠছে। ভবিষ্যতের আশাহীনতাই তাঁর ট্র্যাজিকবোধকে তীব্রতর করছে, অর্থহীন কাজ করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব অতি সচেতন। এই সচেতনতার মধ্যে দুটো জিনিস লক্ষণীয়, একটি হলো অন্যায় ভাবে শাস্তি লাভ করে দেবতাদের থেকে নীতিগতভাবে জয়ী হয়ে উঠেছেন, দ্বিতীয়টি হলো এই মনোভাব যে এই শাস্তির একটা শেষ আছে সমস্ত কিছু নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। তৃতীয়তঃ এই শাস্তি ভোগের মধ্যেই একটা সুখের ঝর্ণাধারা বয়ে যায়; সফোক্লিসের ইডিপাস যেমন জীবনের শেষ প্রান্তে পরম শাস্তি ভোগ করবার পরও ঘোষণা করেছিলেন: আমার অধিক বয়স, আমার আত্মার সহনীয়তা আমাকে সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য করছে যেসব কিছু মঙ্গল। সিসিফাসও দেবতাকে অস্বীকার, নিজের ভাগ্যকে স্বীকার করে নিয়ে নিষ্ফল কর্ম ও পরিবেশকে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আপন অবচেতন অন্তরের গোপন আহ্বান আমন্ত্রণ শুনতে পায় বলে, সব কিছু নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। সুতরাং অ্যাবসার্ড মানুষ ভাগ্যের ধারা অন্ধ, এই অন্ধ মানুষ রাত্রির শেষ আছে কিনা যে জানে তাকে দেখবার জন্যে আগ্রহী কিন্তু তবু সে যাত্রা করে থেমে থাকে না।

কামুর ভাষায় বলা যায় মানুষের বোঝা মানুষেরই। সিসিফাস আমাদের সেই আনুগত্য

শিক্ষা দিয়েছেন, যে আনুগত্য ভগবানকে বর্জন করে, পাথর ওঠায়, এই অ্যাবসার্ড মানুষ বলে, সব ভালো। সুতরাং এই ভাবে বিশ্ব প্রভুহীন হলেও বন্ধ্যা ও নিষ্ফল নয়। প্রতিটি বস্তুর সৌন্দর্যে জগৎ সৃষ্ট হচ্ছে। তার দিকে মানুষের সংগ্রামই তার হৃদয়কে পূর্ণ করে দিচ্ছে।

বলা বাহুল্য, সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের সঙ্গে এখানে কিছু প্রভেদও রয়েছে, কারণ সার্ত্র মুক্তি ঘোষণা করেন, মুক্তির মধ্যে ব্যক্তির দায়িত্ব রয়েছে, এই দায়িত্ববোধ তাকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। কিন্তু দায়িত্ব থেকে নির্বাচনের সাহায্যে একটি মূল্যবোধকে সে জাগ্রত করছে, যার সাহায্যে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। সম্ভবত কামুর অ্যাবসার্ডতত্ত্বে এই দায়িত্ববোধ মুক্তি, মূল্যবোধ আলোচিত হয় নি। কিন্তু দুজনেই ভগবান শূন্য কুকর্মে লিপ্ত জগতে ব্যক্তির নিরুপায় দশা দেখেছেন, এই নিরুপায় দশার মধ্যে কামুর অ্যাবসার্ড মানুষ সচেতনতার্থ ট্রাজিক হয়ে উঠেছে, নীতিবোধে দেবতার থেকে জয়ী হয়ে উঠেছে, জগতের সৌন্দর্যের প্রতি পরম বিশ্বাসেই সে স্বীকার করেছে, সব শেষ হয় নি এবং এই অ্যাবসার্ড মানুষ মানুষের সম্পর্ক ছাড়া জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিভূত, বিহ্বল, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর বেঁচে থাকল সীমা, এই সীমার মধ্যে তার পরম আশ্রয় এই জগৎ, তাই অন্ধকার জগৎ থেকে মর্তে ফিরে এসে সিসিফাস আর ফিরে যেতে চাইছে না. জগতের এই সৌন্দর্যের সঙ্গে অ্যাবসার্ড মানুষের প্রেমের গভীরতা বারংবার মনে পড়ে। সার্ত্রের মধ্যে তা নেই, বরং জগৎ থেকে দায়িত্ব বোধে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে স্বাধীন হবার স্পৃহা বেশী, স্বাধীনতার স্পৃহা থেকেই নির্বাচনের মধ্যে কর্মের মাধ্যমে সামগ্রিক মূল্যবোধ তৈরী করতে চাইছে। সার্ত্রের দায়িত্ববোধ জাত উদ্বেগ, ennui এবং অজ্ঞেয়ের আবর্তে পড়ে মানুষের অসহায়তা, না বুঝবার জন্যে অযৌক্তিকতা ও অর্থহীনতা বোধ থেকে nausia এ দুটো জিনিসই বেশি লক্ষ্য করা যায়।

অ্যাবসার্ড নাটকে দুজনের প্রভাবই আছে, তবে কামুর প্রভাব বেশি, সার্ত্রেরই ভাষায় এ শুধু বর্ণনা করেছে। কিন্তু অ্যাবসার্ডতত্ত্ব যে অসাড়তত্ত্ব নয়, দশাবাদের অযৌক্তিক খামখেয়ালির ধ্বংসলীলা নয়, এ যে জীবনকে বুঝবার জন্যে গভীর অনুধ্যান, যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রতিমুহূর্তে পরীক্ষিত হচ্ছে, সচেতনতার্থ তীব্র হচ্ছে, যাতে জগতের প্রতি গভীর বোধ ভালোবাসা সৌন্দর্য প্রীতি জাগছে, আত্মহত্যা ও মৃত্যুবোধিকারণার্থে দুষ্ট কর্ম থেকে, দুষ্ট কর্মের শাস্তি থেকে কর্মের সাহায্যেই মুক্ত হবার নির্ভর বাসনা পোষণ করছে অ্যাবসার্ড নাটক পড়বার সময় এসব আমাদের মনে রাখতে হবে। কামু সিসিফাস প্রসঙ্গে একজায়গায় লিখতে গিয়ে বলেছেন : 'আজকের শ্রমিকও প্রতিদিন তার জীবনে একই দায়িত্বে কাজ করছে এবং তার ভাগ্যও কম অ্যাবসার্ড নয়।' সিসিফাসের দেবতা এখানে সমাজ, মানুষ, আইন, নীতি সভ্যতা, তারি মধ্যে শ্রমিকদের নিষ্কাম কাজ করতে হচ্ছে, সচেতনতার ট্রাজিকবোধ, নীতিবোধের জয়ে, জগৎ ও অন্তস্তলের গভীর জ্ঞানের বিশ্বাসে, সবই ভালো। হয়তো এখানেই বিদ্রোহের বীজ।

কিন্তু এই বিশ্বাসের জল পরবর্তী কালের কোনো কোনো লেখকের লেখায় শুকিয়ে গেছে, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। ইয়োনেস্কো অ্যাবসার্ডের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন : 'অ্যাবসার্ড হচ্ছে সেটা যেটা উদ্দেশ্য শূন্য, ধর্মীয় আধ্যাত্মিক পারমার্থিক মূল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, মানুষ হারিয়ে

গেছে, তার সমস্ত কর্ম নিরর্থক, অ্যাবসার্ড অব্যবহার্য হয়ে উঠেছে;' বলা বাহুল্য কামুর অ্যাবসার্ড তত্ত্বের বহুদিকের একটা দিক, যেখানে জগতের সঙ্গে বিরোধে মানুষ একান্ত অসহায় হয়ে উঠেছে, নিয়তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরাজিত হচ্ছে, নিষ্ফল ও আশাহীনভাবে কর্মের পাথর ওঠাতে নামাতে হচ্ছে। কিন্তু কর্মে-যুক্ত ব্যক্তির অন্তস্থলের পরিচয় নেই। পরিচয় নেই একথাই বা বলি কি করে, ইয়োনেস্কো যদি জগৎকেই প্রকৃত ভাবে দেখান, যাতে ভালো মন্দ বিচারের আরোপিত বোধ নেই, তাহলে পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিচ্ছেন, এই দেখানোটাই একটা নিয়ম, একটা আদর্শ। ইয়োনেস্কো নিজেই বলেছেন: 'আমি লিখি কারণ আমি জগৎকে বুঝতে ইচ্ছা করি, কারণ, অন্ততঃ আমার জন্যে, প্রচুর বিশৃংখলার মধ্যে সামান্য শৃংখলা রাখতে চাই।' এই শৃংখলা যদি গভীরভাবে বিচার করি তাহলে দেখবো মানুষের কর্ম নিরর্থক হলেও মানুষ হারিয়ে গেলেও মানুষ নিয়তি, মৃত্যু, জগৎ, পরিবেশ সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন হয়ে উঠছে, যা অনিবার্য, তাকে না জানাও তো পাপ, পাথরের সঙ্গে তাহলে পার্থক্য কোথায়। 'হত্যাকারী' নাটকে ইয়োনেস্কো যে ভাবে নাটকীয় পরিণতি দেখাতে চাইছেন, তাতে হত্যাকারী মৃত্যু ও ভগবানরূপে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছেন, এর থেকে কারো মুক্তি নেই। মানুষ অমর হবার জন্যে জন্মেছে, কিন্তু সে মরছে। এই যে মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন বোধ জাগছে তাতে কি জগতের প্রতি ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হয়ে উঠছে, না যতোদিন বেঁচে থাকি, ততোদিন এই পরিবেশের গ্লানিকে মুক্ত করে সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মূল্যবোধে নীত হতে পারি না। গণ্ডার নাটকে গণ্ডারের দৃশ্যটাই তো একটা নীতিবোধকে জাগিয়ে তুলছে। গ্রীক ট্রাজেডিতে দর্শক যেমন সচেতন হয়ে ওঠে তার পরিত্যক্ত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, বাইরের শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তৎপর হয়ে ওঠে, বীরের মতো দেবতা ও নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সচেষ্ট হয়, নিজেদের জগৎ ও জীবনকে বীরের সংগ্রামে পূর্ণ করবার জন্যে দৃঢ় সংকল্প হয়, তেমনি এই অ্যাবসার্ড জাতীয় নাটকে মানুষের পরিবেশের উন্মাদনা পরিবেশের ধূসর অন্ধকার ভীষণতা নৈরাশ্য সম্পর্কে দর্শক সচেতন হয়, অন্তত এটা বুঝবার চেষ্টা করে, কোনো অধ্যাস বা ধর্ম বা আশা দিয়ে মানুষকে বাঁচানো যাবে না। কঠোর সত্যের মুখোমুখি হতে সাহায্য করে, এই, এই সত্য অনিবার্য শাশ্বত নিয়তিই হোক, অথবা সমাজ পরিবেশের নিষ্ঠুর নিয়তিই হোক। দর্শক বোঝে কিসের মধ্যে সে বাস করে এবং বুঝতে গিয়ে মুক্তিরও পথ খোঁজে। চিৎকার করে সমাজমূল্য প্রচারের চেয়ে পরোক্ষে এই সামাজিক বাস্তবতা অ্যাবসার্ড নাটক প্রচার করে। প্রশ্ন উঠবে সোজা বললেই তো হয়, হয় না, পরিবেশ পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনুভূতি বেঁকে গেছে, অনুভূতির ছবি দুমড়ে গেছে, মানুষের ব্যক্তিত্ব যদি এ্যাটমের মতো ভেঙে গিয়ে থাকে, তাহলে তাঁর অনুভূতির ছবি কি গাছ হয়ে থাকবে।

আর আশাবাদ নেই কেন বলছি, বেকেটের শেষ খেলা নাটকের ক্লভ নিষ্ঠুর নিয়তি হ্যামের কাছ থেকে মুক্তি চাইছে, ক্লভকে যদি মানবজাতির প্রতীক ধরি তাহলে সে অন্ধ খোঁড়া, বেরুতে চাইছে, মুক্ত হতে চাইছে, কিন্তু অন্ধ ভাবে জীবনের উদ্দেশ্যহীন কর্মের সঙ্গে বাঁধা। সে যেতে পারে না, দাঁড়াতে পারে না, সে বাস করতে পারে না, অথচ একই সময়ে ছেড়ে যেতে পারে না তার কাছ সময় অব্যবহার্য স্থির, সাধারণভাবে বয়ে যাচ্ছে কিন্তু তবু মুক্তি প্রত্যাশা করছে। এবং নাটকের

শেষে সে মুক্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্দীদশা থেকে মুক্তির পর জগৎটাও তার কাছে নিরর্থক লাগছে, তার মাথাটা এতো নুয়ে পড়েছে যে পা ও ধূলোর চিহ্ন আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তবু শেষের সুখের জন্য কান্নার কথাটি বিশেষ স্মরণীয়।

'I open the door of the cell and go. I am so bourd I only see my feet, if I open my eyes, and between my legs a little trail of black dust. I say to myself that the world is extinguished, though I never sat it lit. (Pause) It is easy going (Pause) when I fall I will weep for happiness.

আর ওয়েটিঙ ফর গোডো নাটকে গোডোর জন্য প্রতীক্ষাই তো কামুর সব ভালো এই আন্তর বিশ্বাসকে বলশালী করছে। যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিই ভগবানের বা কোনো সদর্থের প্রতীক্ষা শূন্যতার নামান্তর, তবুও নাট্যকার নাটক যেখানে শেষ করছেন সেখানেই মূল বক্তব্য ধরা পড়ছে। দ্বিতীয় দিনেও বালকের কাছ থেকে এস্ট্রাডন ও ভ্লাডিমার জেনেছে গোডো আজও আসছে না। এ শুনে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে মুখে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু কার্যতো তারা ওখান থেকে একটি পাও এগোতে পারছে না। এস্ট্রাডনকে যদি অস্তিত্ববাদী নাটকের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করি, তাহলে তার মধ্যে ennui এবং কোন কিছুকে না বুঝবার জন্য nausia দেখতে পাবো, কিন্তু ভ্লাডিমারের মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রত্যয় কাজ করছে, ভ্লাডিমারকে ছাড়বার জন্যে এস্ট্রাডন বহুবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন প্রকারেই ছাড়তে পারেনি, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গেই গোডোর প্রতীক্ষায় একই জায়গায় একটি গাছের প্রতীক ধরা শূন্য প্রান্তরের বিবিক্ত চাঁদের আলোয় ভক্তের মতো নিরন্তর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বালকের আগমন, তার ভেড়ার তদারকি সবই খৃষ্টের অনুসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ভ্লাডিমার এস্ট্রাডনের মধ্যে যেমন পুরনো ও নূতন জগতের প্রতীক রয়েছে, তেমনি পোজো ও লাকির মধ্যে নিষ্ঠুর অন্ধ নিয়তি এবং নিয়তি চালিত যান্ত্রিক মানুষকে দেখতে পাচ্ছি। পোজো হচ্ছে সেই নিষ্ঠুর অন্ধ নিয়তি, লাকি হচ্ছে সেই নিয়তি চালিত যান্ত্রিক মানুষ। শেষ খেলা নাটকে হ্যাম ও ক্লভের সম্পর্কের মধ্যে যা পাই।

অ্যাবসার্ড নাটকের উপাদান হয়তো পুরনো সাহিত্যে খুঁজলে কিছু পাওয়া যাবে, হয়তো সপ্তদশ শতকের পাস্কালের রচনায়ই ধরা দেবে। তার আগে শেক্সপিয়রের নাটকের দৃশ্যে গ্রীক কমেডির মধ্যে দেখা যেতে পারে। কিন্তু অ্যাবসার্ড মনোভাব যেমন আধুনিক মনোভাব, এর প্রকাশরীতিও আধুনিক। কামু অ্যাবসার্ড তত্ত্বপ্রচারক হলেও অ্যাবসার্ড নাট্যরচয়িতা নন। কারণ যুক্তিবিন্যস্তরীতিই তাঁর নাটকের প্রধান গুণ, সার্ত্রেরও। এসলিন ১৮৯৬ সালের জারির উচু রোয়াককে অ্যাবসার্ড নাটকের জনক ধরেছেন। জারির নাটকটি আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

অ্যাবসার্ড নাটক সম্বন্ধে দর্শক ও পাঠকের মনে বিসদৃশ্য মনোভাব জাগাবার প্রধান কারণ এর নাটকীয় রচনাকৌশল। আজও পর্যন্ত আমাদের সংস্কারের ও অভ্যাসের জড়তা বশত যেমন ইয়েট্‌স ও রবীন্দ্রনাথের নাটকের নাটকীয়তা উপলব্ধি করতে পারি না, তেমনি অ্যাবসার্ড নাটকের রচনাকৌশল পাঠক ও দর্শককে বিভ্রান্ত করে দেয়, তাদের চিত্তকে অসাড় করে। বিশেষ করে বাংলাদেশে। তার কারণ সাহিত্যে ও শিল্পে সাংকেতিক কবিতা ও চিত্র থেকে শুরু করে অস্তিত্ববাদী

চিন্তাধারা পর্যন্ত যাবতীয় সাহিত্য শিল্পের জ্ঞান আমাদের পরিচ্ছন্ন নয়, এবং জানবার চেষ্টাও করি না। ফলে বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে।

প্রথমেই বলা দরকার অ্যাবসার্ড নাটকের কাহিনী গল্প চরিত্র ঘটনা পরিবেশ তৈরী হয় চিত্রকল্পের মাধ্যমে। কবিতায় যেমন একটি চিত্রই একটি কবিতা অথবা একটি চিত্রই বহুবিধ উপাদানকে সংগ্রহ করে, কিন্তু একটি ভাবিক প্রেরণা জয়ী হয়ে ওঠে, অ্যাবসার্ড নাটকেও দুই তিন অঙ্ক ধরে একটি চিত্র বা সংজ্ঞা প্রণোদিত ভাবই চিত্রে প্রতিফলিত হতে থাকে। পাউণ্ডের imagist আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে, কাব্যিক চিত্রকল্পের নিজস্ব প্যাটার্ন তৈরি করে। সমস্ত নাটকে ওই প্যাটার্নটাই জয়ী হয়। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রতীকী কবিতার সংগীতধ্বনি, শব্দকে বাহন না ধরে শব্দের ব্যঞ্জনায় দিগন্তে উধাও হবার চেষ্টা, প্রতিটি শব্দের মধ্যে প্রতীকিত অর্থবোধ, শব্দের বাক্যের সংহতি, পরিবেশ রচনায় ব্যঞ্জনা ধর্মিতা, সংকেতের সুরের আধিক্য, নাটকীয় চরিত্রকে একই সঙ্গে ব্যক্তিচরিত্র ও টাইপ চরিত্রে রূপায়ন, উপরিস্তর ও নিম্নস্তরের পার্থক্য। হত্যাকারী নাটকের উপরিতলায় কৌতুককর হাস্যকর ঘটনা রয়েছে মনে হয় সবই নিরর্থক, শব্দের কারসাজি, কিন্তু গভীর স্তরে প্রতীক অর্থ জীবনবোধ একই সঙ্গে ইঙ্গিতবহ। সুতরাং কাব্যধর্মিতা এই জাতীয় নাটকের প্রধান গুণ। বিদ্যুৎ চকিতে একটি চিত্র নাট্যকারের মাথায় যেটি খেলে যায় তাকে ঠিক সেইভাবেই কাব্যিক অনুভূতিতে চরিত্র ঘটনা পরিবেশের সমবায়ে চিত্রিত করবার দুর্মদ প্রেরণা নাট্যকারদের পেয়ে বসে। এই প্রেরণা অনেকটাই স্বজ্ঞাজাত, তাই সুর রেয়ালিস্তদের রচনা রীতি ও চিত্ররীতি অ্যাবসার্ড নাটকের মর্মমূলে কাজ করছে। একদিকে জয়েস্ অন্যদিকে স্ট্রিণ্ডবের্গের স্বপ্ন জগৎ। এগুলিকে আত্মসাৎ করতে সে সচেষ্ট। তাই প্রচলিত নাটকের সুবিন্যস্তগল্প চরিত্র বিশ্লেষণ ও চরিত্র পরিণতি, সুযুক্তিপূর্ণ বিষয় বাস্তবের প্রতিরূপ, সুতীক্ষ্ণ সংলাপ অ্যাবসার্ড নাটকে পাওয়া যাবে না, বরং এর তুলনায় কাহিনী এখানে খণ্ডিত, গল্প মানে কিছু কথা, চরিত্র পুতুল, সংলাপ অসংলগ্ন শিশু ভাষা।

এ বাধার চেয়েও আরো মস্ত একটি বাধা আছে। কৌতুকের প্রতারক প্রচ্ছদ অ্যাবসার্ড নাটকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। বিরোধকে কেন্দ্র করে হাস্যকর পরিস্থিতির যে উদ্ভব ঘটে তাকে ভাড়ামির সাহায্যে, কৌতুককর অবস্থায় প্রকাশ করবার অদম্য প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। ফলে অ্যাবসার্ড নাটকের বাইরেটা অসম্ভব বিরোধজনিত কৌতুক গভীর পাঠকের মনে ও দর্শকের চিত্তে বিরূপ ভাবনা সৃষ্টি করে। কিন্তু এরা বিশ্বাস করতেন ফ্রয়েডের মতো নিরর্থক কৌতুক বা শিশু কবিতার মধ্যে আনন্দলাভের মধ্যে যুক্তি থেকে মুক্ত গভীর স্বাধীনতা লাভ করা যায়। যেহেতু এরা যান্ত্রিক যুগের জড়তা থেকে মুক্তি চাইতেন, তাই এই শিশুভাবের মধ্যে আনন্দ মুক্তি অন্বেষণ করেছেন। তাই আবোল তাবোলের মতো কবিতা বা শব্দ প্রয়োগ এর মধ্যে রয়েছে। এতে প্রচলিত জীবন থেকে মুক্তি, অন্যদিকে ধ্বনি ও ছন্দের সাহায্যে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা একই সঙ্গে কাজ করছে। এই কারণেই প্রায় সব অ্যাবসার্ডের নাটকের মধ্যে এই বিদূষকতা ভাঁড়ামি, পাগলের দৃশ্য শব্দের শিশুভাষ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে জগৎকে না বুঝবার জন্যে অথবা বুঝেও তাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে অথবা নিজের বধিরতর চেতনার তীব্রতা ভুলবার জন্যে এই সচেতন ভাঁড়ামি, অন্যদিকে

মুক্তিলাভের জন্যে এই ভাঁড়ামি নাটকের মধ্যে এসেছে। যদিচ ভুলবার চেষ্টা ও মুক্তির আনন্দ একই সঙ্গে জড়িত।

এই ভাঁড়ামি প্রসঙ্গেই পৃথিবীর যাবতীয় কৌতুক নাট্যের আলোচনা আসতে বাধ্য। লাতিন মূকাভিনয়, কমেডির হাস্যকর পরিস্থিতি, শেকস্‌পিয়রের ভাঁড়, ইতালীয় মধ্যযুগের কম্মেদিয়া দেল্‌আর্ত, স্বপ্ন নাটকের অবাস্তব ঘটনা ও পরিবেশ, শারাদ্‌, রাজসভার চাটুকার, সার্কাসের ভাঁড়, নির্বাক চলচ্চিত্রের অবাস্তব ও হাস্যকর দৃশ্য ঘটনা চরিত্র, তার স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন, যার মধ্যে উদ্দেশ্য নেই, বাস্তবের সঙ্গে যোগ নেই, প্রাচীন ভডভিল্‌ অর্থাৎ হাস্যকর নাচ গান, পুতুল নাচ, লোক নাটকের ঠাট্টা ইয়ার্কি সবই অ্যাবসার্ড নাটকের মধ্যে কমবেশি আশ্রয় নিয়েছে। গীতিনাট্যের ধ্বনি ও অঙ্গভঙ্গিও এর মধ্যে এসেছে।

এই কৌতুক নাটকগুলির ওপর জোর দেবার একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। কৌতুক নাটকে ভাঁড়ের ভাষায় আমাদের অভ্যস্ত ভাষা বিভ্রান্ত হবার ফলেই আঘাতের দ্বারা শব্দের সাহায্যে নতুন দিগন্তে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং এমনি ভাবেই লেখকের উদ্দিষ্ট ভাব দর্শকের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। হয়তো আধুনিক দার্শনিকতত্ত্বে ভাষা সম্বন্ধে যে চেষ্টা চলছে, তার মধ্যেও এই প্রবণতা রয়েছে। দ্বিতীয় ভাঁড়ামি ও কৌতুকের মধ্যে মঞ্চের কৌশল একান্তভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষে প্রহসন, ইতালীয় কমেডি ফার্স, কম্মোদিয়া দেলআর্ত, লাতিন যুগের ফার্সের সাহিত্যিক অস্তিত্ব খুব বেশি পাই না, কিন্তু এই হাস্যকর নাটকগুলি যে তৎকালে খুবই জনপ্রিয় ছিল তার ইঙ্গিত রয়েছে সর্বত্র। অর্থাৎ এগুলি ভাষা সাহিত্য নয়, মঞ্চের অভিনয় কল্পনা মাত্র। মঞ্চের জন্যে বিশেষ একটি রূপ কল্পিত হয়েছে, মঞ্চে সার্থকতা লাভ করবার পর কিছুদিনের মধ্যে তা হারিয়ে গেছে। নাটক যে মিশ্র শিল্প, সেই মিশ্র শিল্পের ভাষাগুণ এরা পরিহার করতে বাধ্য করেছে, অঙ্গভঙ্গি ধ্বনি গান মুখভঙ্গি বস্তুর বিন্যাসের সাহায্যে এটা করতে চেয়েছে। প্রাচীন যুগে এই সব নাটকের প্রযোজকেরা অশিক্ষিত ছিল বলেই ভাষার কাছে এগোতেন না। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাট্যকারেরা সচেতনভাবে এই উপাদান ব্যবহার করেন। প্রাচীন কৌতুক নাট্যে হাসিই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকের হাসিটা উপরিস্তরের মাত্র এর সাহায্যে রূপকের গভীরতায় সংকেতের ব্যপ্তিতে অনেক দূর নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং কৌতুক নাটকের উপাদান এখানে আধুনিক যুগের মতোই জটিল, অর্থবহ, ইঙ্গিতধর্মী, রূপকে মিশ্রিত সংকেতে দিগন্তগামী। এই কৌতুক নাটক অবলম্বন করার পেছনে আর একটি গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। ভাষাই আমাদের জড়তাকে অটুট রেখেছে, ভাষার জড়তাকে ভাঙতে হলে ভাষাকে ছড়াতে হবে, ইঙ্গিতে তাৎপর্যে আরো অঙ্গভঙ্গিতে সংগীতে ধ্বনিতে আরো দূরে নিয়ে যেতে পারা যায়। সুতরাং ভাষার যুক্তিই হলো এই জাতীয় উপাদান ব্যবহৃত করবার প্রধান যুক্তি। এও একরকম প্রচলিত নাট্যশিল্পের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, যেসব নাটকের শুধু কথা, ভাষা, বক্তৃতা, চিৎকার রয়েছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মিশ্রশিল্পে মঞ্চের যে স্থান আছে তা অস্বীকার করতে চাইতো। এঁরা মঞ্চটাকেই প্রধানভাবে ধরতে চাইলেন। আর্তো নিষ্ঠুর নাটকের প্রচারকল্পে মঞ্চ সম্বন্ধে একজায়গায় বলেছেন শব্দ সামান্যই মনের কাছে কিছু বলে : বিস্তীর্ণ স্থান ও বস্তু বলতে

পারে, নতুন চিত্রকল্প বলে, এমনকি নতুন চিত্রকল্পও শব্দের দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু শূন্য স্থান চিত্রকল্পের দ্বারা শব্দিত হয়ে ধ্বনির দ্বারা পূর্ণ হয়ে অত্যধিক কথা বলে, যদি কেউ জানে কিভাবে স্থানের যথেষ্ট বিস্তীর্ণতাকে এক সময় থেকে অন্য সময়ে নীরবতা ও স্তব্ধতার সাহায্যে বিক্ষিপ্ত করতে হয়। আর্তো'র এই চেতনাই পরবর্তীকালে 'বিশুদ্ধ মঞ্চ' পরিকল্পনা রূপায়িত হয়ে ওঠে। অ্যাবসার্ড নাটকের কাছে 'বিশুদ্ধ মঞ্চ' পরম উপাদেয় মনে হলো, কারণ এখানে বিমূর্ত দৃশ্যই মঞ্চের ওপর একটা ইমেজকে পরিপূর্ণ করে তোলে, যা ভাষার সাহায্যে পারে না। এই কারণেই সার্কাসের ভাষাহীন ধ্বনিযুক্ত পশু মানব পাখির, শূন্যের ও মাটির অসম্ভব দৃশ্য ও অসাধারণ অঙ্গভঙ্গী সংগীত নাটকের অসম্ভব দৃশ্য ও চরিত্র, জাদুকরের ভেল্কি, দড়ির ওপরে লাফানো, ষাঁড়ের লড়াই, মূকাভিনয়, পুতুল নাচ, ভাঁড়ামি প্রধানভাবে এসেছে। ভাষায় চিত্র নট যা আভাঁগার্দ কবিতার লক্ষণ, মঞ্চের সাহায্যেই চিত্র দর্শকের চোখের সামনে গড়ে তুলবার চেষ্টা করা হয়। এই কারণে অ্যাবসার্ড নাটক সাহিত্য বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বেকেটের ও ইয়োনেস্কোর নাটকে ব্যালে ও মূকাভিনয় লক্ষ্য করা যায়, তার দেহ অঙ্গভঙ্গি ধ্বনির সাহায্যেই বক্তব্য বলতে চেয়েছেন। অনেকে আর্তো-কথিত নিষ্ঠুর নাটকের সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের যোগসূত্র দেখতে পান। যদিও প্রায় প্রতি নাটকেই নিষ্ঠুর নিয়তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে তবু একে সম্ভবত ঐ নাটকের সঙ্গে যুক্ত করতে পারা যায় না, আর অ্যাবসার্ড নাটক রচনার আগেই তাঁর পুস্তিকা বেরিয়েছে। সাহিত্য বলতে বসে সাহিত্যহীন হবো—এ আশা দুরাশা। মালার্মেও চেয়েছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। তবে সাংকেতিক নাটকের ও কবিতার আদর্শে তাঁদের ব্যঞ্জনার প্রতি অত্যধিক ঝোঁক বিশেষ স্মরণীয়। বেকেট যদিচ সংগীতে নৃত্যনাটক, ব্যালে মূকাভিনয় ব্যবহার করেছেন, তথাপি তাঁর নাটকের ভাষা কাব্যিক, ইঙ্গিতপূর্ণ, ধ্বনিতে ব্যঞ্জিত, প্রতিটি শব্দ বুদ্ধির আবেগে কম্পিত। বেকেটই নাট্যকার হিসাবে সার্থকতম ব্যক্তি, যিনি চরিত্রের মধ্যে প্রতীক ও ব্যক্তিচরিত্র একই সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেন আবার সব মিলিয়ে মঞ্চের ওপর একটি চিত্রকল্প আঁকতে পারেন। এবং কাহিনী নেই বললেও সূক্ষ্ম কাহিনীর অগ্রগতি ও পরিণতি লক্ষণীয়, চরিত্রের পরিণতি ও পরিবেশ সুন্দরভাবে অঙ্কিত। সুতরাং কৌতূহল আগাগোড়া রাখতে সক্ষম। দর্শকের দিক থেকে নাট্যকারের দায়িত্ব তিনি বহন করেছেন। কিন্তু ইয়োনেস্কো অতি কথা বলেন, অতি কথার দ্বারা একটি চিত্রকেই প্রকাশ করে ইয়োনেস্কো বলতে চান। অতি কথা বলা মানেই কোনো কথা না বলা। আর বেকেটের কাছে কোনো কথা বলার নেই, তাই নীরব স্তব্ধ, শুধু মাত্র অঙ্গভঙ্গি। বেকেট বুদ্ধি প্রধান, বুদ্ধিটাই তাঁর আবেগ, শিশুর মতো কথা বলতে ভালোবাসেন এবং মঞ্চের ওপরে বিভিন্ন বস্তু সমাবেশ একটা চকিত বিস্ময় এনে দেয়, সাধারণ দর্শক মুগ্ধ অভিভূত হয়। হয়তো এই কারণেই তাঁর নাটক বেশি অভিনীত; তিনি নিজেই মঞ্চ সম্বন্ধে বলেছেন : 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মঞ্চের ওপর কাছিম আনতে চাই, একে ঘোড়-দৌড়ে পরিণত করতে চাই, তার পরে টুপি, গান, ড্রাগন এবং জলের ঝর্ণাধারা, মঞ্চের ওপর একজন যে কোনো করবার স্পর্ধা করতে পারে, এই সেই স্থান যেখানে কেউ সামান্যই সাহস করে। মঞ্চের যান্ত্রিক সীমা ছাড়া আমি আর অন্য কিছু সীমা মানতে চাই না। লোকেরা বলবে আমার নাটকগুলি মুাজিক হলের সুর অথবা সার্কাসের

অভিনয়। যা হয় তাই ভালো, থিয়েটারে সার্কাস মঞ্চস্থ করা হোক। নাট্যকারকে খামখেয়ালী হতে অভিযুক্ত করা হোক। হ্যাঁ থিয়েটার হচ্ছে সেই স্থান যেখানে কেউ খেয়ালী হতে পারে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এটা খেয়ালী নয়। কল্পনা খেয়ালী নয়। এ প্রকাশে উন্মুখ, আমি স্থির করেছি আমার কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ম আমি স্বীকার করবো না। যেহেতু কল্পনা তার নিজের নিয়ম মানে, এটাতেই আরো প্রমাণ হচ্ছে যে এর অন্তিম অবলম্বনে এটা খেয়ালী নয়।

সুতরাং অ্যাবসার্ড নাটক আলোচনার করবার সময় আমাদের সচেতন হতে হবে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর বিচার করতে হবে। সমগ্র নাটকে একটি বিশেষ কাব্যিক ইমেজ বা চিত্রকল্প বিভিন্ন চরিত্রে পরিবেশে ঘটনার সংকেতে সংঘাতে কেমন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, তাকে ধরাই মূল কথা। চরিত্রের পরিণতি দ্বন্দ্ব অবশ্যই থাকবে নাটকে, যদি সৎ নাটক হয়, কিন্তু আগে এই চিত্রকল্প। যেমন বেকেটের 'শেষ খেলা' নাটকে। একটি ফুল যেমন মূল বৃন্তকে ঘিরে পাপড়ি ছড়ায়, তেমনি ইমেজকে ঘিরে এই কাহিনী চরিত্র ঘটনা পরিবেশ আয়োজিত হতে থাকে। পাউণ্ডের সেই imagist movement-এর কথা এর বিচারে মনে রাখতে, প্রচলিত নাটকের চেয়ে কবিতার দিকেই ঝোঁক বেশি। কাব্য বিচারের মানদণ্ড মনে রেখে এই নাটক বিচার করলে নাট্যকারদের প্রতি সুবিচার করা হয়। মঞ্চের আলোচনাও সেইভাবে করতে হবে।

সার্ত্রে বলেছেন যে সমস্ত সাহিত্যকর্মই হচ্ছে এক আবেদন। যেকোনো লেখকই স্বাধীন, স্বাধীন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন' স্বাধীনতাই হচ্ছে তাঁর বিষয়বস্তু। সৃষ্টিশীল কর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নতুন করে সমগ্রভাবে জগৎকে সৃষ্টি করা। এটাই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। লেখকের কর্তব্য হচ্ছে একদিকে এই জগৎকে উদ্ঘাটিত করা এবং এই উদ্ঘাটিত জগৎকে পাঠকের উদারতায় সমর্পণ করা। কোনো কিছুর পাঠ হচ্ছে উদারতার ব্যায়াম, পাঠ হচ্ছে লেখক ও পাঠকের মধ্যে উদারতার চুক্তি। ফলত নান্দনিক আনন্দ দানই সাহিত্যের মূল কথা। লেখক হিসাবে আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে যেমন এটা ঠিক, পাঠক ও দর্শকের কাছে এই উদারতার চুক্তিও আমরা দাবি করতে পারি।

ইচ্ছে ছিল বেকেট ইয়োনেস্কো জেনের নাটকের স্বতন্ত্র আলোচনা করে অ্যাবসার্ড নাটকতত্ত্ব বোঝাবো। কিন্তু ভূমিকা করতেই সব সময় চলে গেল। জেনের নাটক আলোচনা করা দরকার। প্রথমত তাঁর নাটকে চিত্র বই পড়া অভিজ্ঞতা থেকে আসেনি, জীবন সম্বন্ধে যে নিরর্থকতা, নিষ্ঠুরতা, আদর্শের, বিশুদ্ধির উদ্দেশ্যের অনিবার্য অর্থ মূল্যায়ন তা তাঁর চৌর্যবৃত্তি জীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে এসেছে ; দ্বিতীয়ত সাহিত্যের সৃষ্ট চিত্র শুধু শিক্ষা থেকে আসে না, স্বজ্ঞার প্রভাব তার মধ্যে প্রচণ্ড। সুতরাং জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ তাঁর লেখাতে যতোটা পাই, অন্যের মধ্যে তা আরোপিত।

বাংলাদেশের অ্যাবসার্ড নাটক সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। কারণ নিজেও আমি এই নাট্য রচনায় নিযুক্ত। তবে বারবার মনে হয়েছে, মানুষের স্বরূপ পরিচয় তার আকৃতিতে নয়, তার বুদ্ধি বৃত্তিতে। বানরকে মানুষের পোষাক পরালে বাঁদর মানুষ হয় না, উদ্ভট, স্বপ্ন কাহিনী, রোমান্টিক অবাস্তবতা, অসংলগ্ন সংলাপ ও কাহিনী কোনো নাটকে থাকলেই সহসা বলতে পারি না এটা অ্যাবসার্ড নাটক। অ্যাবসার্ড নাটকের মূলধর্ম জীবনবোধের নিষ্ঠুরতায়, নিষ্ফল কর্মের

ক্লান্তিতে, জগৎ থেকে আলাদা হয়েও দায়িত্ববোধে উদ্বিগ্নতার সাহায্যে এক হবার বাসনায়। এর একপ্রান্তে যেমন অজ্ঞেয় অবস্থার মধ্যে সচেতনভাবে অসহায় আর্তি, অযৌক্তিক কদাচার জগতের মধ্যে জীবনের বিবমিষা, অন্যদিকে সংগ্রাম করবার অদম্য চেষ্টা, কর্মের মধ্যেই মুক্তির প্রেরণা, কর্মের মধ্যেই অন্তরে গর্ব আমি জয়ী অন্তরে বিশ্বাস সব শেষ হয় নি, অবচেতন অন্তরে প্রত্যয় সব মঙ্গল। অ্যাবসার্ড নাটকে জীবনের সঙ্গে ব্যক্তির অসহায়তায় জীবনবোধের নিষ্ঠুরতা একটা প্রধান অঙ্গ, কিন্তু সামগ্রিক নয়। বাংলাদেশে সবই আরোপিত, এক্ষেত্রেও যদি আরোপিত হয় তাহলে ব্যর্থ হতে বাধ্য। মাঝে মাঝে এই আরোপিত ভাব যে না দেখি তা নয় এবং ভয় এখানেই।

সর্বশেষে মঞ্চ যাঁদের হাতে তাঁদের প্রতি নিবেদন নূতন নাটকের অভিনয়ের জন্যে একটি সংস্থা গঠন করা দরকার। অ্যালবির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের আলোচনায় দেখলুম মার্কিণ দেশে একটি সংস্থা আছে, যেখানে তরুণ নাট্যকারেরা নাটক রচনা করলেই অভিনয়ের ব্যবস্থা সেখানে হয়, নিজেদের মধ্য থেকেই দর্শক নির্বাচন করা হয়। সার্থক হলে বাইরের মঞ্চে অভিনীত হয় শুধু তাই নয়, নাটকের কিছু কিছু দৃশ্য রচনা হবার পর কি হবে এ সম্বন্ধে দ্বিধা জাগলে খণ্ডিত অভিনয়ের ব্যবস্থা সেখানে হয়, ফলে পরীক্ষা নিরীক্ষণ করবার সুবিধে হয়। এতো দূর অগ্রগতি এই মুহূর্তেই বাংলাদেশে প্রত্যোশা করছি না, শুধু বলতে চাইছি প্রচলিত নাট্যমঞ্চের চিত্র থেকে সরে এসে নূতন নাট্যকারেরা যদি নূতন নাট্যমঞ্চ চিত্র তুলে ধরেন, তাকে উপস্থাপিত করবার জন্যে দলের স্বার্থের বাইরে সাহিত্যিক মর্যাদা উদ্বোধিত হবে না কেন।

পৌরাণিক যুগে সাংবাদিকতা

তারাপদ পাল

রামায়ণ

স্বর্গ-মর্ত-পাতাল—ত্রিভুবনে অবাধে বিচরণ করেন দেবর্ষি নারদ। তিনি যে শুধু ঘুরেই বেড়ান তা নয়, পরিভ্রমণকালে সকল স্থানের যাবতীয় খবরাখবরও সংগ্রহ করেন। ভ্রাম্যমান রিপোর্টার। সংগ্রহ করে যথাযথস্থানে পৌঁছেও দেন।

এইভাবে তিনি ঘুরতে ঘুরতে একদিন এলেন মর্তে। বাল্মীকির তপোবনে। বাল্মীকি তাঁর কাছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বগুণান্বিত রাজা কে? এবং তার কীর্তি কথা জানতে চান। উত্তরে নারদ তাঁকে ইক্ষাকুবংশের রাজা রামচন্দ্রের নাম করেন এবং তাঁর কীর্তিকথা বিবৃত করেন। যদিও নারদ রামায়ণের যাবতীয় সংবাদ বাল্মীকিকে সরবরাহ করেছিলেন, তবুও সমগ্র কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঘটনাবলী ও কাহিনীর সংগ্রহে ও বর্ণনায় বিভিন্ন সংবাদ-সংগ্রাহক বা রিপোর্টারের ভূমিকা রয়েছে। যাদের সম্মিলিত কাজের ফলশ্রুতি ও সংকলনই বাল্মীকির সফল সম্পাদনায় 'রামায়ণ'-এ পূর্ণরূপ নেয়। তাই এখানে নারদকে একদিকে যেমন রিপোর্টারের ভূমিকায় দেখা যায় তেমনি তার সাব-এডিটিংএর কথাও উপেক্ষার নয়। বাল্মীকির আগে তিনিই সেইসব কাহিনী সম্পাদনা করেন। সেগুলিকে প্রয়োজনমাফিক সম্পাদনা করে এবং তাদের স্থান নির্দিষ্ট করে বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ-এ সংকলিত করেন। তাঁর ভূমিকা পুরোপুরি বার্তা-সম্পাদকের। বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্বের এবং সম্পাদনায় যেমন ইদানিংকালের সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সংবাদাদি পরিবেশিত হয় রামায়ণ-এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এই সাংবাদিকতা কর্মে সাংবাদিকের ভূমিকায় না থেকেও ব্রহ্মা প্রধান পৃষ্ঠপোষকের কাজ করেন। মূলতঃ তাঁরই নির্দেশে জনকল্যাণ বা জনগণের স্বার্থে বাল্মীকি রামায়ণ সম্পাদন করেন। একদিকে নারদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সাংবাদিকরা যেমন বাল্মীকিকে সংবাদ সংগ্রহ ও সম্পাদনায় সাহায্য করেন, তেমনি লব ও কুশ তা জনগণের মধ্যে প্রচার করেন। বাল্মীকির সম্পাদনার সাফল্যে সব কাহিনীগুলিই একটি সংহত সূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্য রসপুষ্ট হয়ে মহাকাব্যের রূপ নিয়েছে।

রামায়ণের মূল আখ্যান শুরুর আগেই প্রস্তুতি পর্বের এই যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, এর সঙ্গে সাংবাদিকতা কর্মের সমতা লক্ষ্যণীয়। ব্রহ্মা এই কর্মকাণ্ডের কর্তা ও পরিচালক, নারদ প্রধান রিপোর্টার এবং সিনিয়র সাব এডিটর, বাল্মীকি প্রধান সম্পাদক এবং লব ও কুশ প্রচারের 'মিডিয়া' বা মাধ্যম, অর্থাৎ আজকের কালের খবরের কাগজ ইত্যাদির প্রতিভূ। এই সম্মিলিত কার্যটি সবদিক থেকে যে কতটা সাফল্য লাভ করেছিল এবং সেকালের জনচিত্ত-জয়ে সক্ষম হয়েছিল তারও ইঙ্গিত এই কাব্যের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ সর্গের অষ্টম ও নবম শ্লোকে আছে :

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥

রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভীরসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্॥

এ কালের সংবাদপত্র পাঠের সময়ও আমরা এই সব গুণগত সৌকর্যের সন্ধান করি। এবং যে কাগজে তা' পাই, সব মিলিয়ে যে কাগজে আকর্ষণ থাকে—রূপায়ণ ও সংবাদ পরিবেশনে—সেই কাগজেরই চাহিদা আমাদের কাছে সব থেকে বেশী। সেই গুণটিকেই আমরা 'তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্' বলতে পারি। শুধু সংবাদ নয়, তার রচনা-মাধুর্য, সত্যতা, সঠিকত্ব, স্থান-নির্বাচন ও রূপসজ্জা বা 'লে-আউট'—সব মিলিয়েই তার আকর্ষণ! সর্বোপরি তাকে সাহিত্যরসসমন্বিত করে তোলা রামায়ণের একটা বিশেষগুণ। সেই কারণে 'রামায়ণ' খবরের কাগজ না হয়ে 'মহাকাব্য' হয়ে উঠেছে। এবং দু'হাজার বছরের অধিককাল সময় ধরে আমাদের জীবন সমাজকে নানাভাবে গভীরতার সঙ্গে প্রভাবিত করে আসছে।

মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ, সমাজচিত্র ইত্যাদি হিসাবে এ-যাবৎকাল রামায়ণ নিয়ে বহু বিশ্লেষণ, অনুশীলন ও গবেষণা হয়ে আসছে। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ গবেষণার মাধ্যমে রামায়ণ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেগুলি—

(১) রামায়ণের মূল আখ্যান (রামের কাহিনী) ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর রচিত ; (২) রচনা কাল : ৪০০ থেকে ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ ; (৩) রাজনীতি, প্রশাসন, কূটনীতি, যুদ্ধ এবং 'অর্থশাস্ত্রে' বর্ণিত অন্যান্য বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে ; (৪) প্রাচীন সমাজচিত্র, নিসর্গবর্ণনা (ভৌগোলিক বিবরণও) এবং কৌতুকাবহ প্রসঙ্গও অনেক আছে ; (৫) একদিকে রামরাজ্যের গণতন্ত্র ও সৎসরকারী প্রশাসনের উপযোগিতা এবং অপরদিকে রাবণের শাসনের বৈপরীত্য তুলে ধরা হয়েছে ; (৬) বাল্মীকি তৎকাল প্রচলিত কথা রচনার রীতি ও নৈতিক আদর্শ অনুসারে নায়ক-নায়িকাদির চরিত্র বিবৃত করেছেন এবং (৭) রামায়ণ প্রাচীন আর্যসমাজ জীবন জ্ঞান ও সভ্যতার কোষ গ্রন্থ।—এই সব সিদ্ধান্ত থেকেও আর একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। তা হলো : রামায়ণে চিত্রিত কালের আর্যসমাজে সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে সংবাদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তা পরিবেশনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কেননা, সাংবাদিকতার মাধ্যমে চলমান জীবন সমাজ ও সভ্যতার দৈনন্দিন খতিয়ান না রাখলে রচনাকার যুগ ব্যাপী ঘটনাপ্রবাহকে পেতেন না। একালেও সংবাদপত্র ইতিহাস রচনার, কালানুক্রমিক যুগচিত্র তৈরীর, সমাজ জীবনের ধারাবাহিক চিত্র উদ্‌ঘাটনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। রামায়ণের মূল বিষয় যেহেতু ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণে লক্ষ্যণীয় এই 'ঐতিহাসিক ভিত্তি'র অবলম্বন কি। তিন থেকে সাত সংখ্যার সিদ্ধান্তগুলির বিষয়ভিত্তি নিঃসন্দেহে কেবল স্মৃতি থেকে সংকলিত নয়। 'ডকুমেণ্টারী এভিডেন্স' কিছু থাকতেই হবে। না হলে পণ্ডিতগণও কেবল অনুমানের ভিত্তিতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে আসতে পারতেন না। এবং ঐ সব বিষয়ে অত বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সম্ভব হতো না। সেই 'ডকুমেণ্টারী এভিডেন্স' কোন না কোন ভাবে সংরক্ষিত 'জার্ণাল' থেকে নেওয়া। সেই 'ডকুমেণ্টারী এভিডেন্স' 'জার্ণাল' হলো-লোকপরম্পরায় প্রচারিত ও পরিবেশিত সংবাদগুচ্ছ—যেগুলির পেছনে বহু খ্যাত অখ্যাত সাংবাদিকের কর্মকীর্তি সোচ্চার।

সেই সব সাংবাদিকদের মধ্যে ইতিপূর্বেই যেমন ভ্রাম্যমাণ রিপোর্টার ও সাব-এডিটার নারদ, বার্তা-সম্পাদক বাল্মীকি, সংবাদ প্রচারক লব-কুশ প্রমুখর উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি আরও কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা যায়। তারা হলো—সুগ্রীব, হনুমান, সরমা। এরা মূলতঃ রিপোর্টার। সুগ্রীব আবার বার্তা সম্পাদকও। এ-ছাড়া কয়েকজন ভাষ্যকারও আছেন, যেমন, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, গার্গ্য, কণ্ব, ধৌম্য, অত্রি, কশ্যপ, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ প্রমুখ। এদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে সেকালের সাংবাদিকতার কয়েকটি রীতি-বৈশিষ্ট্যও দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সঙ্গে একটি 'নিউজ্ এজেন্সী-'র কথাও জানা যায়।

পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনবাসে যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেলেন সারথী সুমন্ত্র। প্রয়োজন বোধে তিনি দৌত্য-কর্মও করে থাকেন। দু'দিনের যাত্রা পথে তিনি রামের সঙ্গে ছিলেন। তারপর তিনি ফিরে এলেন এক সন্ধ্যায়—নিরানন্দ নিঃশব্দ অযোধ্যায়। অযোধ্যাবাসীরা আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলো সুমন্ত্র'র প্রত্যাবর্তনের। কেন না, সুমন্ত্রর কাছ থেকেই তারা পাবে তাদের প্রিয় রাম-সীতা-লক্ষণের বনবাস-যাত্রার সংবাদ। তাঁরা কোথায় গেলেন, কেমন আছেন ? সংবাদ-পত্র বা রেডিও—এমন কিছু (এ-যুগের) মাধ্যম নেই, যা থেকে ঐ সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। অতএব সুমন্ত্রই তখন একমাত্র অবলম্বন। সুমন্ত্র ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকে ঘিরে ধরলো সেই সংবাদ জানার জন্য। সুমন্ত্র-র কাছ থেকেই তারা জানলো (এবং রাজা দশরথও জানলেন) যাত্রা শুরু থেকে কি ভাবে, কোন পথে তাঁরা গেছেন। তাঁরা নিষাদরাজ গুহকের গৃহে উঠেছিলেন। পরে সেখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে যাত্রা করেন আরও দূরে—দেশান্তরে।

আজকের দিনে দেশের 'ভি আই পি-'রা কোথাও গেলে তাঁদের সঙ্গে রিপোর্টার যায়। সেই রিপোর্টারের রিপোর্ট থেকে আমরা 'ভি আই পি'-দের কার্যকলাপ ইত্যাদির সংবাদ পেয়ে থাকি এবং সেই সব খবর পাওয়ার আগ্রহে আমরা রোজ খবরের কাগজ আর রেডিও-র খবরের প্রতীক্ষা করি। এক্ষেত্রে সুমন্ত্র-র সঙ্গে এই সব রিপোর্টারের কাজের সমতা লক্ষ্যণীয়।

রিপোর্টারদের সংগ্রহ করতে হয় বহুবিধ সংবাদ, জানতে ও প্রত্যক্ষ করতে হয় নানা রকম আনন্দ ও বেদনার ঘটনা। কিন্তু সেই আনন্দ বা বেদনায় তার মনকে ভাবাপ্লুত ও আবেগসিক্ত করা চলে না সংবাদ রচনা বা পরিবেশনের সময়। সেখানে তাকে থাকতে হয় ও-সবের ঊর্দ্ধে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই স্থানে সুমন্ত্র সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। রামের বিদায় তাঁর মনকেও বেদনা-বিদ্ধ করেছে। কিন্তু তাঁদের যাত্রার খবর জানাবার সময় তিনি নিজের যন্ত্রণা ও হৃদয়াবেগকে বুকের মধ্যে চেপে রেখে শুধু সংবাদটুকুই জানিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে রাম সীতা ও লক্ষণের প্রতিদিনের কাজ ও মানসিক অবস্থার প্রতিফলন জানাতেও ভোলেন নি।

রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পর, অপহৃতা সীতার সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ ও তাঁকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে সীতা সম্পর্কিত যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ ও সরবরাহের সব রকম দায়িত্ব সুগ্রীব নিলেন। তাঁর সহকর্মী ও অধীনস্থ কর্মীদের নিয়ে চারটি দল তৈরী হলো। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম—এই চারদিকে দল-চতুষ্টয় প্রেরিত হলো সংবাদ সংগ্রহের জন্য। সুগ্রীব এখানে বার্তা-সম্পাদক। ঐ সব কর্মীরা রিপোর্টার। যাত্রার

আগে প্রত্যেক দলকেই তিনি প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশ ও উপদেশ দেন। দেশ-কাল-পাত্র সম্পর্কে প্রত্যেক রিপোর্টারকে তিনি যথাযথ ভাবে ওয়াকিফ্‌হাল করে দেন। সেই সঙ্গে তাদের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে, কি ভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে, কোন পথে যেতে হবে জানাতেও ভোলেন নি। এখানে বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ববোধ এবং রিপোর্টারদের প্রতি তাঁর সঠিক পরিচালন ক্ষমতার পরিচয় স্পষ্ট। আরও লক্ষ্যণীয় তাঁর দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা। দক্ষিণাঞ্চলে রিপোর্টার পাঠাবার সময়ই তা অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই দিকেই রাবণের এলাকা। তাই বেছে বেছে তিনি তাঁর সেরা রিপোর্টাদেরই ঐদিকে পাঠান এবং পরবর্তী অংশে দেখা যায়, তাঁর সেই সিদ্ধান্ত ভুল হয় নি। দক্ষিণ-দিকে প্রেরিত রিপোর্টাররাই সীতার সকল রকম সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। এর পেছনে হনুমানের কর্মদক্ষতাই ছিল প্রধান।

এই কাহিনীটিকে ইদানিংকালের নিউজ-এজেন্সীর সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং সেই নিউজ এজেন্সীর সকল কার্যাবলীর নেতা সুগ্রীবের ভূমিকা নিউজ-এজেন্সীর সার্থক বার্তা-সম্পাদকের সঙ্গে তুলনীয়।

সীতা-সংবাদ সংগ্রহে হনুমানের রিপোর্টিং বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সমগ্র উত্তরকাণ্ড জুড়ে রয়েছে হনুমানের রিপোর্টিং ও তার ফলশ্রুতি। শতসহস্র যোজন দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম করে প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করে, নানাবিধ বাধাকে অতিক্রম করে তিনি পৌছলেন রাক্ষসপুরী লঙ্কায়। অনেক অনুসন্ধান করে সীতা দেবীকেও খুঁজে পেলেন তিনি। তারপরই সাক্ষাৎকারের পালা। সাংবাদিকদের কাছে তাঁর বৃত্তি-মূলক পরিচয়-পত্র বা নিদর্শন-পত্র থাকে—'প্রেস কার্ড'। তেমনি একটি 'প্রেস কার্ড' হনুমানেরও ছিল। সেটি হলো : রাম-প্রদত্ত স্মারক অঙ্গুরীয়। সেটি দেখিয়েই তিনি সীতার কাছে তাঁর বৃত্তির প্রমাণ রাখতে পেরেছিলেন। অন্যথায় সীতা তাঁকে কোন সাক্ষাৎকারের স্বীকৃতি দিতেন না।

সীতার কাছ থেকে তাঁর নিজের ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি জানার পরও তিনি লঙ্কা ও তার অধিকর্তা এবং অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। যে-সংবাদের ভিত্তিতে সীতা উদ্ধারের অভিযানে সমগ্র বাহিনী উপকৃত হয়েছিল। সীতা উদ্ধারের জন্য রাম-রাবণের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জেনেই লঙ্কা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের, 'ষ্ট্র্যাটেজি'সহ, সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। যখন কোন দেশে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে হয়ে ওঠে তখন সেই সব দেশে কর্মরত বিদেশী সাংবাদিক বা রিপোর্টাররা সেই দেশের প্রাক্-যুদ্ধকালীন অবস্থা পর্যবেক্ষণ, ষ্ট্র্যাটেজি জানার চেষ্টা করেন এবং সম্ভব হলে তা তাঁদের স্ব স্ব দেশের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। সেই অবস্থায় শত্রুপক্ষের দেশের রিপোর্টাররা থাকলে তারাও সেই চেষ্টা থেকে বিরত হয় না। এই ধরণের কাজের গুরুত্ব এবং ঝুঁকি অনেক। সে সময় সাধারণতঃ কোন দেশই জ্ঞাতসারে কোন সাংবাদিককেই এ ধরণের কাজ করতে দেন না এবং এ বিষয়ে বিধিনিষেধের কড়াকড়ি ও কঠোরতা যথেষ্ট প্রকট হয়। তা সত্ত্বেও সাংবাদিকতা বিশেষ করে বিপক্ষের ও তাদের মিত্র পক্ষের সাংবাদিকরা এ ধরণের কাজের ঝুঁকি যে নেন, তার দৃষ্টান্ত এ যুগেও বিরল নয়। ধরা পড়লে শাস্তিও পেতে হয় এবং কাজটি গুপ্তচরবৃত্তির পর্যায়ে পরলেও এরকম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহে সাহসী সাংবাদিকরা

যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করেন। কেননা, প্রয়োজনবোধে সাংবাদিককে যে গুপ্তচরবৃত্তি অবলম্বন করতে হয় না এবং করাটা কুকর্ম এমন কথা বোধ হয় সর্বাংশে সার্থক নয়। হনুমানের কাজের সঙ্গে এ-কাজের সমতা আছে। সুন্দরকাণ্ডের শেষের দিকে হনুমানের কিছু কাজ (লঙ্কাদাহ ইত্যাদি) অসাংবাদিক সুলভ হলেও রিপোর্টার হিসেবে তাঁর কার্যাবলীকে কোন ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।

যুদ্ধ চলাকালে দুই বিবদমান পক্ষ পরস্পর পরস্পরকে দুর্বল করে তোলার জন্যে যেমন মিথ্যা সংবাদ প্রচার, গুজব রটানো ইত্যাদি (এটা ইয়েলো জার্নালিজমের পর্যায়ে কিছুটা পড়লেও) হয়ে থাকে, রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় এমন ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় এবং ঐ সময় মিত্রপক্ষ থেকে শত্রুপক্ষের প্রচারিত সংবাদের গুজবত্ব ও অসত্যতা প্রকাশের জন্যও যেমন সত্য সংবাদ প্রচার করেন, তারও নিদর্শন আছে। রামপক্ষকে দুর্বল করার জন্য রাবণ পক্ষ বহুবিধ গুজব, মিথ্যা সংবাদ ও চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু সরমা ও বিভীষণ রামের মিত্রপক্ষ হিসাবে সেই সব অসত্যের রহস্য উদ্ঘাটন করে সত্য সংবাদ দিয়ে সৎ-সাংবাদিকের কাজ করেছিলেন। অপরদিকে সরমা নারী হলেও সীতার কাছে যুদ্ধের নিত্যকার সংবাদ এনে দিয়ে 'ওয়ার করেস্‌পন্‌ডেন্ট'-এর ভূমিকাও নিয়েছিলেন। এ থেকে সেকালে নারী-সাংবাদিকের অস্তিত্বের সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে।

আজকাল সংবাদ ব্যতীত সংবাদ-ভাষ্য, বাকগ্রাউণ্ডষ্টোরী, ফীচার, রস-রচনা—সবই সংবাদভিত্তিক প্রভৃতির আকর্ষণ ও ব্যাপক চাহিদা দেখা যায়। রামায়ণের কালেও এই জাতীয় সাংবাদিক-কর্মের পরিচয় কিছু পাওয়া যায়।

অপুত্রক রাজা দশরথ পুত্রকামনায় যজ্ঞের আয়োজন করেন। কেমন করে সেই যজ্ঞ সফল হবে? রাজার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে? জানা গেল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনতে পারলে সেই কাজ সফল হবে। কে সেই ঋষ্যশৃঙ্গ? কি তাঁর যোগ্যতা? যার ফলে তিনি এসে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ যজ্ঞ সফল করে তুলবেন? সেই প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া গেল সুমন্ত্র'র কাছ থেকে। উন্মোচিত হলো এক পুরনো কাহিনীর পটভূমি। সেই সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের 'প্রোফাইল'ও বটে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অযোধ্যাবাসীদের কাছে ঋষ্যশৃঙ্গমুনি তখন ভীষণ ইম্‌পরট্যান্‌ট্‌ পার্সোনেল! আজকের দিনে যেমন এমনি সব পার্সোনেলদের প্রসঙ্গ উঠলে তাদের সম্পর্কে দৈনিক সংবাদপত্রে 'প্রোফাইল' বা 'ফীচার' লেখা হয়, উক্ত ঘটনার সঙ্গে এর মিল বর্তমান। কশ্যপ মুনির পুত্র বিভাণ্ডক। বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি সর্বদা বনে বাস করে তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন করতেন। তাঁকে সেখান থেকে কৌশলে বীরাঙ্গনাদের সাহায্যে প্রলোভিত করে অঙ্গরাজ্যে আনানো হয়। অঙ্গরাজ লোমপাদ তাঁর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন। এবং ঋষ্যশৃঙ্গের পুণ্য আগমনে বৃষ্টিহীন অঙ্গরাজ্যে বর্ষণ দেখা দেয় এবং রাজ্যে মঙ্গল আসে।

'বালকাণ্ড'-এর বাইশ থেকে পঁয়ষট্টি সর্গ পর্যন্ত, বিশ্বামিত্রকে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যায়। যদিও এখানে তিনি ঠিক রিপোর্টার নন। বরং তাঁর ভূমিকা 'রিপোর্তার্জ' লেখক বা 'কলামনিষ্ট'-এর। রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যা থেকে মিথিলায় যাবার পথে তিনি বিভিন্ন স্থানে গেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করেছেন। এই যাত্রা পথের বিভিন্ন স্থানের বিবরণ ও পৌরাণিক কাহিনীর

বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলি প্রধানতঃ ভ্রমণকাহিনী জাতীয়। তা হলেও ইদানিংকার সংবাদপত্রে এ জাতীয় রচনার সমাদর আছে, চাহিদাও আছে। উত্তরকাণ্ডে কিছু ব্যাকগ্রাউণ্ড রিপোর্টিং বা ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্টিং-এর সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা অগস্ত্য, কৌশিক, গার্গ্য প্রমুখ ঋষিগণ। তাঁরা তাঁদের জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে অতীতের বহু ঘটনার সংবাদ এবং তার নেপথ্য ও প্রকাশ্য বহু তথ্য-সত্যের কাহিনী বলেন। যেগুলিকে নিউজ্-ফীচার, ব্যাক্গ্রাউণ্ড-ষ্টোরী বা সংবাদ ভাষ্য বলা যেতে পারে। এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনায় অধিকাংশ সময়েই বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা তা' করেও থাকেন। পৃথিবীর সব দেশেই এই জাতীয় রচনার সমাদর যেমন সুপরিচিত, তেমনি এই সব রচনায় কালের খ্যাতিমান বিদগ্ধজনদের ভূমিকা গ্রহণও তেমনি সম্মানের। অনেক প্রখ্যাত লেখকও এইভাবে সাংবাদিকের ভূমিকায় অংশ নিয়ে থাকেন। সেকালেও এই রীতির প্রচলন ছিল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের অনুষ্ঠান

রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের ছয়দিনব্যাপী রবীন্দ্রানুষ্ঠানের প্রথম উপহার 'মায়ার খেলা'। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের মধ্যে 'মায়ার খেলা' অন্যান্য গীতিনাট্যের তুলনায় কমই অভিনীত হয়। কারণ গীতিনাট্যে নাটকের গতি ও সঙ্গীতের সুষমা যুক্ত হয়ে সার্থক পরিণতি লাভ করে। 'মায়ার খেলায়' প্রথমটির অভাব। এটি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। গানই মুখ্য, গানের রস-মাধুর্য্যই হৃদয়কে আপ্লুত করে রাখে।

অভিনয়ের প্রথমে শান্তার ভূমিকায় শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র স্বচ্ছন্দ ন'ন। অবশ্য ষষ্ঠ এবং শেষ দৃশ্যে তিনি অনেক সপ্রতিভ। শ্রীঅশোক সাউ (অমর), শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জী (কুমার), শ্রীসুবীর ভট্টাচার্য্য (অশোক), এবং শ্রীমতী গীতা সেন (প্রমদা), তাঁদের উপর আরোপিত দায়িত্ব ভার সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। অমর, অশোক এবং কুমারের আবেগমণ্ডিত কণ্ঠস্বরে গানগুলি ভাল লেগেছে। সংযত ও সাবলীল অভিনয়ের জন্য কুমার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রমদার গানগুলি শ্রীমতী গীতা সেন অতি সুন্দর ভাবে গেয়েছেন এবং তাঁর অভিনয়ও বেশ সাবলীল। তিনি অতি সহজভাবেই মঞ্চে আনাগোনা করেছেন। মাঝে মাঝে তার সঙ্গীতে আরোপিত অভিনয় দর্শকের মনে ছাপ রেখেছে। তবু একথা বলতেই হ'বে যে মঞ্চে একক শিল্পীদের প্রত্যেকেই বিশেষভাবে মাইক সচেতন ছিলেন। যখনই তাঁরা মঞ্চে প্রবেশ করেছেন তখনই উর্দ্ধমুখ হয়ে মাইক লক্ষ্য করে এগিয়ে এসেছেন। মনে হয়েছে তাঁদের এক গতি। এক লক্ষ্য—মাইক। ফলে অনেক সময় অহেতুক নষ্ট হয়ে নাটকের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ করেছে।

মায়াকুমারীদের নৃত্য প্রথমে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল লেগেছে। মনে হয় আস্থার অভাবের জন্য একে অন্যকে ব্যর্থ অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। একক নৃত্যের চেয়ে সম্মেলন নৃত্য অনেক কঠিন। Drill এর মতন, যন্ত্রে বাঁধা যেন। কিন্তু তার পরিচয় কোথাও মেলেনি। অবশ্য শেষের দিকে অনেক উন্নত হয়েছে। সমবেত নৃত্যের মধ্যে পঞ্চ সহচরীদের বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁদের মধ্যে "অলি বারবার ফিরে আসে" সঙ্গীতের সঙ্গে একক নৃত্যটি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

সূচনায় সমবেত কণ্ঠে "আছে আছে দেখিতে না পাও" সঙ্গীতটি বিচ্ছিন্ন। বহু জায়গায় এ ক্রটি লক্ষ্য করা গেছে। আশ্রমিক সঙ্ঘের শিল্পীগণ সকলেই শিক্ষণ প্রাপ্ত এবং এঁদের মধ্যে গুণী ও যশস্বী শিল্পীর সংখ্যা কম নয়। তাঁদের কাছ থেকে এ ক্রটি আমাদের চোখে বড় হয়ে প্রতিভাত হওয়াই স্বাভাবিক। গানের সঙ্গে আবহসঙ্গীত সব সময় ঠিক সঙ্গতি রেখে চলতে পারে নি। সময় সময় গানকে চেপে দিয়ে ভাবরস নষ্ট করতে সাহায্য করেছে। মন্দিরার বেতালা ছন্দ বিরক্তিকর।

পরিচ্ছদ ও দৃশ্য পরিকল্পনা অতি সুন্দর ও শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী। আলোকসম্পাতে পরিকল্পনার অভাব ছিল। বার বার ষ্টেজ অন্ধকার করার জন্যে মায়াকাননের effect নষ্ট হয়েছে, এবং দৃশ্যান্তর বুঝতে অসুবিধে হয়েছে।

তাসের দেশ—এক নিয়মের দেশ। সেখানে প্রতি পদক্ষেপ নিয়মে বাধা। কেন এ নিয়ম সেটা কারও জানা নেই। নূতন যৌবনের দূত রাজপুত্র ও সওদাগর নৌকাডুবি হয়ে এই আশ্চর্য্য দেশে উপনীত হয়ে অবাক হ'ল ছকে বাধা তাসের দেশের লোকেদের দেখে। তারাও বিস্মিত হ'ল বিদেশীদের নিয়মজ্ঞানের অভাব দেখে। তাদের নব যৌবনের বাণী সকলের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। বহুদিনের জীর্ণ পুরাতন সংস্কার ভেঙ্গে পড়ল। নব চেতনারই জয় হল।

তাসের দেশ Costume Play। এর বর্ণাঢ্য পরিবেশ সহজেই দর্শকমনকে আকৃষ্ট করে। সেই সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের সমন্বয় প্রেক্ষাগৃহে মোহজালের সৃষ্টি করে। সেই সুযোগ আশ্রমিক সঙ্ঘের ছিল এবং তার অনেকটাই তাঁরা সদ্ব্যাবহার করতে পেরেছেন। চন্দ্রোদয় ঘোষ (রাজকুমার) ও মিহির ঘোষ (বণিক) নৃত্যে সাবলীল। অভিনয়ে রাজকুমারই স্বচ্ছন্দ। বণিককে মানিয়েছে ভাল কিন্তু অভিনয়ে সহজ নয়। তাসেদের ছন্দে ছন্দে প্রবেশ সহজেই মন জয় করে নিতে পেরেছে। এদের মধ্যে সোমনাথ চ্যাটার্জী (রুইতন) শ্রেষ্ঠ। রাজার সাড়ম্বরে রাজসভায় প্রবেশের দৃশ্যটি চমৎকার। পোষাক, চলন, বলন এবং চেহারায় রাজাকে মানিয়েছেও সুন্দর। রাজসভায় সমস্ত তাসেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাবেশ ও তাদের বর্ণাঢ্য পরিচ্ছদ দর্শকমনে রেখাপাত করেছিল। তাসকুমারীদের অনুশীলিত একযোগে যাওয়া আসা মনে রাখার মত। বল বল সখী, 'আমি ফুলিতে এলেম' 'ঘরেতে ভ্রমর এল'। "কেন নয়ন আপনি" সঙ্গীতগুলি সুগীত। সেই সঙ্গে যথাক্রমে ইন্দ্রাণী দেবরায় (টেক্কানী) ও পূর্ণিমা ঘোষ (হরতনী) এবং মঞ্জুষা গাঙ্গুলীর (ইস্কাবনী) নৃত্যও চমৎকার।

সামগ্রিক অভিনয়ে কয়েক জায়গায় কথা ভুলে যাওয়াটা (দহলা পণ্ডিত ও ছবি), মন্দিরার অসহ্য বেতালা ছন্দ ও ছন্দহীন অতি সোচ্চার লেজিম্ বাদন, মঞ্চের একপাশে সঙ্গীত ও যন্ত্র শিল্পীদের সমাবেশ এবং অন্যপাশে মন্দিরা ও লেজিম্-বাদকের অবস্থানের কারণ দুর্বোধ্য। উচ্চ গ্রামে সঙ্গীত (স্পীকার ভীষণ জোরে বেজেছে) অনেক সময়ে কর্ণ-পীড়াদায়ক হয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানও অনেক দেরীতে (প্রায় ৩০ মিঃ) আরম্ভ হয়েছে। এটাও বোধ হয় বাঙ্গালী সমাজের, তা তাঁরা যত শিক্ষিত ও অভিজাত হ'ন না কেন, একটা 'নিয়ম'। অবশ্য উদ্যোক্তারা একটা অজুহাত দেখিয়ে দর্শক শ্রোতাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিয়েছেন। আরও একটা কথা বলার আছে। প্রেক্ষাগৃহকে মনে হয়েছে 'আশ্রমিক সঙ্ঘ'র শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকদের স্বচ্ছন্দ পদচারণার ক্ষেত্র। তাঁদের অনবরত মঞ্চে ও প্রেক্ষাগৃহে আনাগোনা রসসৃষ্টিতে বাধা দেয় না? মঞ্চদৃশ্য, অঙ্গসজ্জা ও নৃত্য পরিকল্পনা অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ, চমৎকার ও সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

নির্মলেন্দু সান্যাল

* এ সংখ্যা প্রকাশিত হবার মুখে ভানু সিংহের পদাবলী, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা নৃত্যনাট্যগুলিও পর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে সেইজন্য এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

সমালোচনা

কালিকট থেকে পলাশী ॥ সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥ সাহিত্য সংসদ ॥ কলিকাতা। মূল্য ৬·৫০

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে ইংরাজরা যে যুদ্ধের প্রহসনে জয়লাভ করে পরবর্তী দু'শ বছরে ভারতের ভাগ্যবিধাতারূপে পরিগণিত হল, সে ইতিহাস অনেকেরই জানা আছে। আমরা জানি ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাই কবির কথায় আমরা বলি—বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে। কিন্তু কথাটা যত সহজভাবে উচ্চারণ করি, ঘটনাটি কিন্তু ঠিক তত সরল নয়। ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে ইংরাজরাই প্রথম আসেনি, তার পূর্বে এসেছিল—পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী, দিনেমার ও বেলজিয়াম। ইংরেজরা সর্বশেষে এসেও কিভাবে আধিপত্য বিস্তার করল তার ইতিহাস আলোচনা করেছেন শ্রীসতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই ইতিহাস মূলতঃ বাণিজ্যিক ইতিহাস। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মালাবারের কালিকট বন্দরে এই ইতিহাস সুরু এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার পলাশীর প্রান্তরে তারই পরিসমাপ্তি।

লেখক প্রথমেই এই বাণিজ্যবিজয় পর্বের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্য পটভূমিকা'টি পরিস্ফুট করেছেন। তা নাহলে ইউরোপীয়দের অভিযানের গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যেত না। এশিয়া ও আফ্রিকার ভূখণ্ডের সংযোগকারী ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলিই ছিল সেকালীন বাণিজ্যের কেন্দ্র। ভারতবর্ষেও সুরাট, কালিকট, মাদ্রাজ এবং বাংলাদেশ ছিল বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র। ইউরোপীয় দেশগুলির ভারতবর্ষ তথা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যযাত্রার প্রধান আকর্ষণ ছিল মশলা। সেকালে ইউরোপে মাংসই ছিল একমাত্র খাদ্য। সেই মাংস সুস্বাদু করতে এবং সংরক্ষণ করতে মশলার ছিল একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে মশলা উৎপন্ন হত না, তাই—"গোলমরিচের এক-একটি দানা তার সম ওজনের রূপার সঙ্গে বিনিময় হত বললেও অত্যুক্তি হয় না।" দ্বিতীয় অধ্যায়: পর্তুগীজ পর্ব। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভাস্কোডাগামা এসে পৌঁছলেন হিন্দুস্থানের কালিকট বন্দরে এবং তখন থেকেই সুরু হল ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের বাণিজ্য অভিযান। এই অভিযানে নৃশংসতা ও অত্যাচার সবই স্থান পেয়েছে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল স্পেনের পরাধীনতা লাভ করায় তার বাণিজ্যস্রোতে ভাঁটা পড়ে। হিন্দুস্থানের পরবর্তী অধ্যায়ে প্রাধান্য পায় ডাচ ওরফে ওলন্দাজগণ। এটিই বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে—ফরাসী, দিনেমার ও বেলজিয়াম-পর্ব আলোচিত হয়েছে। 'বিদেশীর চোখে বাঙালা' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়টির প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট ছিল। কারণ ইংরেজরা যে বাংলাকে আশ্রয় করেছিল সে বাংলার সে যুগের সমৃদ্ধি কি পরিমাণ লোভনীয় ছিল তার পরিচয় এখানে বিধৃত হয়েছে। এরপর ইংরেজ পর্ব। ইংরেজরাই যে শেষপর্যন্ত বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে স্থায়ীত্ব লাভ করল তার কারণ অনেকগুলি। একদা যে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'

প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার পশ্চাতে ছিল রাজার সমর্থন। ইংরাজেরা নৌবলেও যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। সর্বোপরি অন্যান্য পাশ্চাত্য বণিকজাতি ভারতবর্ষ অপেক্ষা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মশলা দ্বীপগুলিকেই বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন করেছিল, কিন্তু ইংরেজরা ভারতবর্ষকেই নিজেদের অবস্থানভূমিরূপে চিহ্নিত করেছিল।

'কালিকট থেকে পলাশী' এই আড়াইশো বছরের বাণিজ্যিক ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস বললে যে স্বাভাবিক নীরস তথ্যের সমাবেশ বোঝায় এই গ্রন্থ তার নিদারুণ ব্যতিক্রম। আগাগোড়া একটি সাবলীল গতি প্রবাহিত। কিন্তু তাই বলে ইতিহাসের নামে লেখক উপন্যাসের পসরা সাজিয়ে বসেননি। প্রতিটি ছত্রে তিনি তথ্যানুসন্ধান করে চলেছেন। তাঁর আলোচনার যে 'সংক্ষিপ্ত প্রমাণপঞ্জী' গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত হয়েছে, সেগুলি লক্ষ্য করলেই তথ্যসংগ্রহের সৌকর্য বোঝা যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গ্রন্থটি কোথাও উদ্ধৃতিকণ্টকিত নয়। পাণ্ডিত্য প্রকাশেরও অযথা চেষ্টা নেই।

গ্রন্থটিতে কয়েকটি সেকালীন মানচিত্রের সমাবেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। ছাপাই ও বাঁধাই-এর কাজ প্রশংসনীয়। কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ আছে। বিশেষ করে 'পর্তুগাল' কথাটি 'পতুগাল'রূপে বহুবার মুদ্রিত হয়েছে।

অশোক কুণ্ডু

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 August '69 (0'50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

সপ্তদশ বর্ষ । ভাদ্র ১৩৭৬

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
বিলাসরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

আমাদের শক্তি শুধু ইস্পাতেই নয়, মানুষেও। এই কিশোরটির চোখে যে নিশ্চিন্ততার ভাব স্পষ্ট তার মূলে আছে পারিবারিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। আর এই পারিবারিক সুখশান্তি পরিবার নিয়ন্ত্রণের সুফল। জামশেদপুরে পরিবার পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে চলেছে।

টাটা স্টীল

TS 7040 A

ক

যে ক'টি সন্তান স্বচ্ছন্দে লালন পালন করতে পারবেন, ততটি সন্তানই হওয়া উচিত
আচ্ছা ভাই, তুমি কি করে এতো আরামে আছো বলতে পারো? আমি তো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।
কিন্তু আমার স্ত্রীর তো প্রত্যেক বছরেই একটি করে সন্তান হচ্ছে। আমি কি করি বলো তো?
আমি যা করি তাই করো। নিরোধ ব্যবহার করো।
জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তোমার হাতেই রয়েছে। এগুলি ব্যবহার করো।
পরিবার পরিকল্পনার জন্য নিরোধ ব্যবহার করুন
৩টির মূল্য ১৫ পয়সা, ১টি ৫ পয়সা
(সরকারি সাহায্যে হ্রাসমূল্যে)
বর্তমানে মাত্র কয়েকটি জেলায় পাওয়া যায়।

সপ্তদশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মর্ডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আলঙ্কারিক প্রস্থানে বীভৎসরস ও অশ্লীলতা

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

নবরসমধ্যে অন্যতম প্রধান হইতেছে বীভৎস রস। কিন্তু সহৃদয় গোষ্ঠীতে ইহা শৃঙ্গার ও বীররসের ন্যায় পূজার অর্ঘ পায় নাই। কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় হাস্য ও বীভৎস পরস্পর 'জ্ঞাতি' হইলেও বীভৎস রসের স্থায়িত্ব ও গভীরতা হাস্যরস অপেক্ষা বেশী। বাঞ্ছনীয় না হইলেও সাহিত্যে বীভৎস দৃশ্যের সহিত প্রায়শঃই আমাদের সাক্ষাত ঘটে এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় না হইলেও সাহিত্যের ভোজে নবরসের পরিবেশনে বীভৎস কোনদিনই একেবারে উপেক্ষিত হয় নাই। আলঙ্কারিক সম্প্রদায় প্রদর্শিত পথে বীভৎসরসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার পূর্বে আমরা প্রথমে বহু পরিচিত বীভৎস পদটির যথার্থ অর্থ কি তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব।

বধ্ ধাতু হইতে নিন্দা বুঝাইতে স্বার্থিক সন্ প্রত্যয়ের পর কর্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া বীভৎস পদটি নিষ্পন্ন হয়। অথবা বধ্ ধাতুর উত্তর নিন্দার্থে সন্ প্রত্যয় করিয়া তাহার পর পুনরায় পচাদিত্বাদ অচ্। কর্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হইতে বীভৎস পদটি নিষ্পন্ন হইলে ইহা পুংলিঙ্গ এবং তাহা নিন্দাজনক বস্তুকে বুঝায়। ক্লীবলিঙ্গ বীভৎস পদটি 'রস'কে বুঝায়। রস হইতে গৌণভাবে ইহা রসযুক্ত মাংসশোণিত প্রভৃতিকে বুঝায়। বীভৎসের জনক কোন দ্রব্য হইলে তাহা তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইতে পারে। ঋগ্‌বেদে, অথর্ববেদে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, বাজসনেয়ি সংহিতায় কৌষিতকী ব্রাহ্মণে এবং আপস্তম্ব সূত্রে বীভৎস পদটির উল্লেখ আছে। ঋগ্‌বেদে অবশ্য 'বীভৎসু' পদটি 'গর্ভধারণেচ্ছা' এবং 'ভয়ে কম্পমান' এই দুই অর্থে ব্যবহৃত। নিন্দনীয় এই অর্থে বীভৎস পদটির ব্যবহার প্রথমে ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে তাহার পরে আপস্তম্ব সূত্রে এবং সর্বশেষে মহাভারতে দেখা গিয়াছে। মহাভারতে বীভৎস পদটি নিন্দিত বস্তু নিন্দনীয় কর্ম প্রভৃতি অর্থে একাধিক বার ব্যবহৃত

হইয়াছে। সুতরাং বীভৎস বলিতে সাধারণভাবে নিন্দাজনক বা কদর্যবস্তু এইরূপ অর্থই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বীভৎস রসকে তাহা হইলে 'নিন্দনীয় বা ঘৃণ্য বস্তু দর্শনের দ্বারা উদ্দীপিত কোন রস' এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেই আমরা প্রথমেই একটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হই,—অসুন্দর বা নিন্দিত বস্তু হইতে সুন্দরাস্বাদময় রস কিরূপে উৎপন্ন হইবে? কারণ, রস আনন্দস্বরূপ—সেই আনন্দই হইতেছে সত্য শিব ও সুন্দর। লৌকিক জীবনের অসৌন্দর্য রসানুভূতিতে সংলগ্ন থাকিলে তাহা রস হয় না। সুতরাং বীভৎসরস নবরসের অন্তর্গত হইয়াও ভিন্নজাতীয় কোন রস অথবা বীভৎসরস একেবারেই রস নহে এইরূপ অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রথমে বীভৎসরসের স্থায়িভাব ও তাহার উদ্দীপনগুলির স্বরূপ এবং তাহার পরে বীভৎস রসের নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বীভৎস রসের বিভাবগুলির একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে…"অথ বীভৎসো নাম জুগুপ্সা স্থায়িভাবাত্মকঃ। স চাহৃদ্যাপ্রিয়াচোষ্যানিষ্টশ্রবণদর্শনকীর্ত্তনাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে।"…

অনভিমতদর্শনেন চ গন্ধরসস্পর্শশব্দদোষৈশ্চ। উদ্বেজনৈশ্চ বহুভির্বীভৎসরসঃ সমুদ্ভবতি।"

পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য রূপ রস গন্ধময় জগতে যে কোন প্রকারের অনভিমত বস্তু দর্শন শ্রবণ বা গ্রহণ হইতে চিত্তে যে অপ্রীতির উদ্রেক হয় তাহা জুগুপ্সা। এই অনভিমত বস্তু দর্শন শ্রবণ গ্রহণও ও কীর্তন যে সকল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া সংঘটিত হয় তাহারা বীভৎস রসের উদ্দীপন। কাব্যদর্পণ ও রসগঙ্গাধরে এই অর্থটিকে বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে "জুগুপ্সা নিন্দ্যতাজ্ঞানং দোষসন্দর্শনাদিভিঃ" এবং "কদর্যবস্তুবিলোকনজন্মা বিচিকিৎসাখ্যশ্চিত্ত বৃত্তি বিশেষো জুগুপ্সা।" অতএব কদর্য বা অশোভনবস্তুই বীভৎস রসের বিভাব। সাহিত্যদর্পণে বীভৎসরসের আলম্বনবিভাবের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা আপেক্ষিক সঙ্কীর্ণ,—দুর্গন্ধ মাংস রুধির ও মেদকেই বীভৎসের আলম্বন বলা হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে সকল প্রকার চেতন অচেতন অসুন্দর বস্তু, দুর্গন্ধ, অচেতন মনুষ্য বা জীবের শব, বিস্বাদ দ্রব্য, বিরূপ শ্রবণ এ সকলই বীভৎস রসের বিভাব। অভিনবভারতী টীকায় মনস্তত্ত্বের একটি অভিনব তথ্যের পরিচয় দিয়া বলা হইয়াছে যে স্বাভাবিকভাবেই মনুষ্যের হৃদয়ে কোন কোন জিনিষ অপ্রিয় যেমন ব্রাহ্মণগণের রশুনের প্রতি স্বাভাবিক বীতরাগ। এবং এই নৈসর্গিক কারণেই অপ্রিয়, অহৃদ্য ও অশোভন বস্তুসমূহ হইতে বীতরাগের সৃষ্টি হয়। দৃশ্যমান স্থূল জগতে অসুন্দর ও নিন্দনীয় বস্তুর সত্তা একটি অনুভূত সত্য। সুতরাং ভাবজগতে বা মনোজগতে অসুন্দরের প্রতিক্রিয়াও অনুভববেদ্য সত্য। অসুন্দর বস্তু যাহাকে আমরা বীভৎসরসের বিভাব বলিয়াছি তাহার সহিত পরিচয় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহা হইতেছে 'জুগুপ্সা।' এজন্য জুগুপ্সা একটি স্থায়িভাব। আলঙ্কারিক পরিভাষায় "জুগুপ্সা স্থায়িভাবোঽপি বীভৎসঃ কথ্যতে রসঃ।' রস তাহাই যাহা মৌলিক চিত্তবৃত্তির অন্তর্গত, জুগুপ্সাও একটি মৌলিক চিত্তবৃত্তি। গুপ্ ধাতু হইতে জুগুপ্সা এই পদের জন্ম। গুপ্ অর্থে গোপন করা; কাহা হইতে গোপন করা এবং কাহাকে? স্বতঃই উত্তর আসে অসুন্দরের আঘাত হইতে। যাহা

কুৎসিত অশোভন বা ঘৃণ্য তাহা মানুষের চিত্তবৃত্তিকে আঘাত দিয়া প্রতিহত করে। ভারতীয় দর্শন মানুষকে স্বাভাবিকভাবে সত্য সুন্দর শিবরূপে স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য অসুন্দরের আঘাত গভীরস্তরে আত্মাকেই আঘাত করে। সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিচারের এই দিক্ ছাড়িয়া দিলে বাহ্যতঃ দেখা যায় যে জুগুপ্সা হইতেছে আত্মরক্ষার একটি গৌণ প্রবৃত্তি। রুধিরাক্ত দেহ, গলিত জীবের শব, দুর্গন্ধময় পরিবেশ বস্তু বা দৃশ্য, শ্মশানের অর্ধদগ্ধ নরদেহ, অস্থি চর্ম বসা, বমন বিরেচন, লালাস্রাব, পায়ুদেশ ও অধমাঙ্গঘটিত ক্রিয়াদি যে ভাবপরম্পরার সৃষ্টি করে তাহা চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত। ইহার মধ্যে ভীতি, সঙ্কোচন, ঘৃণা এবং "আমি যাহাতে ঐ অবস্থায় উপনীত না হই বা আমাতে উহার স্পর্শ না লাগে" এইরূপ আত্মরক্ষারমূলক মনোভাব। এই আত্মরক্ষার ভাবটি অত্যন্ত জটিল অথচ অনুভূতিগম্য। পক্ষান্তরে এই আত্মরক্ষা ও সঙ্কোচনী মনোভাব আংশিকভাবে আত্মপ্রীতি (অর্থাৎ আপনাকে ভালবাসার মনোভাব) হইতে উদিত হয়। জুগুপ্সা যে জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করে তাহার সহিত পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্ব দর্শিত loathsome, aversion এবং খানিকটা Scorn এই ভাবের সাদৃশ্য আছে। ভীতির ক্ষেত্রে ভীতিজনক বস্তু হইতে শারীরিক অপসারণের ইচ্ছা থাকে। জুগুপ্সায় ঐ বস্তুকে প্রত্যাখ্যান বা অপসারণের ভাব; উভয়েরই পশ্চাতে কোন না কোনভাবে আত্মপ্রীতি সুপ্ত থাকে। উৎস ও প্রেরণা ভিন্নমুখী হইলেও ইহাদের স্বরূপে এবং কার্যকারিতায় অপূর্ব সাদৃশ্য আছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা উপমার সাহায্যে এই প্রত্যাখ্যানের চেষ্টাকে বিশদ করিয়া থাকি। মনস্তাত্ত্বিক Macdongall এই ভাবগুলিকে (fear, repulsion, disghust প্রভৃতি) principal instincts-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

ঘৃণা এবং লজ্জা ইহারা অনেকক্ষেত্রেই জুগুপ্সার উদ্রেক করে। ঘৃণাজনক এবং লজ্জাজনক অনেক বস্তুই নিন্দনীয় এজন্য তাহারা জুগুপ্সাদায়ক। যেমন মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্য। অবশ্য জুগুপ্সা একটি ব্যাপক সত্তা,—ঘৃণা বিশেষ একটি বস্তু দৃশ্য অথবা অবস্থার সহিত সংযুক্ত।

লজ্জাও একপ্রকার আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি যাহাতে কেহ স্বয়ং অপরের চক্ষুতে হেয় প্রতিপন্ন না হয় সেইরূপ প্রেরণাজাত। অথবা ইহা একটি অনির্বাচ্য ও অজ্ঞাত আত্মরক্ষামূলক চেতনা। জুগুপ্সা একটি স্থায়িভাব হইলেও তাহার সহিত চেতনার গভীরস্তরে অনেক ক্ষেত্রেই লজ্জার ভাব যুক্ত রহিয়াছে।

অলঙ্কারশাস্ত্রে যে কিরূপ দূরদর্শিতা ও নৈপুণ্যের সহিত বীভৎসপ্রমুখ রসগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বীভৎসরসের উদ্বোধনকালে চিত্তের পরিবর্তনের বর্ণনা দিয়া বলা হইয়াছে যে বিকাশ বিস্তর ক্ষোভ ও বিক্ষেপ রসবর্ণনায় এই চারপ্রকার দশার মধ্যে বীভৎস যে অবস্থার সৃষ্টি করে তাহা হইতেছে 'বিক্ষেপ'। (বীভৎসঃ ক্ষেপমূলকঃ) বিক্ষেপ বা ক্ষেপ পদটি ক্ষিপ্ ধাতু হইতে আসিয়াছে—অর্থ "দূরে নিক্ষেপ করা।" আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন "বিক্ষেপো মরুতো যথা।" প্রবল ঝটিকায় যেরূপ একস্থানের সমুদয় সঞ্চিত বা স্তূপীকৃত দ্রব্য প্রবলবেগে সহসা অন্যত্র নিক্ষিপ্ত হয়, যাহার ফলে বদ্ধমূল মহীরুহ পর্যন্ত উৎপাটিত হয়,—বীভৎস জনিত বিক্ষেপেও সেইরূপ। সহজভাবে বলিতে গেলে বীভৎস অথবা ঘৃণিত যে সকল দ্রব্য উদ্দীপনরূপে গণিত তাহাদের দর্শন অথবা স্পর্শজনিত প্রতিক্রিয়া এরূপ প্রবল যে চিত্তের তাৎকালিক

অন্যান্য সকলভাব মুহূর্তের জন্য সঙ্কুচিত প্রতিহত বা তিরোহিত হইয়া যায়। অসুন্দর বিভাব দর্শন ও জ্ঞানজনিত ভাবের প্রচণ্ড সংঘাত চিত্তে প্রবল আলোড়ন আনিয়া সকল ভাবকে সরাইয়া দেয়। প্রকৃতির ধর্ম প্রকাশ করা এই প্রকাশধর্মকে আঘাত দেয় বীভৎস। এই আঘাত একাধারে আকস্মিক ও প্রচণ্ড অথচ ক্ষণস্থায়ী। ভয়ানক রসও যে ভাবসন্ততির জন্ম দেয় তাহা বীভৎস রসের অনুরূপ। কিন্তু ভয়ানকরসে চিত্তের সঙ্কোচন প্রধানতঃ আত্মরক্ষামূলক। জুগুপ্সায় ইহা গৌণ অর্থাৎ সেখানে পরিহারের চেষ্টা প্রধান। ইহাদের মধ্যে আরও পার্থক্য এই যে ভয়ানক রসের উদ্দীপনগুলির (যেমন সূচীভেদ্য তমসাচ্ছন্ন রাত্রি, বাত্যাতাড়িত বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র, বিরাট গহ্বর ধ্বংসকারী প্রলয়ঙ্কর দৃশ্য) বিপুলতা বীভৎস রসে নাই। ভয়ানক রসে বিরাটের নিকট আপনার ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি রহিয়াছে এবং ইহাতে ভীতির ভাবই প্রধান। বীভৎসরসে এই ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই প্রত্যুত আত্মপ্রীতি ও স্বাতন্ত্র্যের ভাব পরোক্ষে জাগ্রত থাকে। তথাপি রসচর্বণাজন্য চিত্তভূমির সাম্য এবং স্থায়িভাবের উৎপত্তিজনিত সাম্যের জন্য আলঙ্কারিকগণ বীভৎস হইতে ভয়ানকরসের উৎপত্তি মানিয়া লইয়াছেন। ইহার মৌলিক সত্য এইখানে যে বীভৎস রসের পটভূমি ভয়ানক রস হইতে ব্যাপক। জগতে যাহা কিছু অশ্লীল তাহাই বীভৎস রসের উদ্দীপন, কিন্তু ভয়ানক রসের উদ্দীপক অশ্লীল নহে। অসুন্দর বস্তুত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভীতিদায়ক নহে কিন্তু ভয়ানক বস্তু সর্বত্রই ভীতিপ্রদ।

কিন্তু এইগুলি হইতেছে বীভৎস রসের বিভাবসমূহের কার্যকারিতার মনস্তত্ত্বসম্মত দিক। রস নিষ্পত্তির দিক হইতে বিচার করিলে আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের সম্মুখীন হইতে হয়। মূলকথা এই যে বীভৎসরসে আলম্বন দুর্গন্ধময় রুধির মাংস ঘৃণ্য বস্তু, শ্মশানের অস্থি চর্ম অর্ধদগ্ধদেহ প্রভৃতি। কৃমিপতন, লালাস্রাব, সৃক্কনীলেহন প্রভৃতি উদ্দীপন। এই সকল নিন্দনীয় বস্তুর দ্বারা উদ্দীপিত ইহা বলিলেই আলম্বনের স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উদিত হয়। সাধারণতঃ রসসৃষ্টি হয় আলম্বন ও আশ্রয়ের উপস্থিতি হইতে। আশ্রয়ের মধ্যে উদ্দীপিত রসের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া বা ভাবকত্ব ভোজকত্ব ব্যাপারের দ্বারা অথবা সাধারণীকৃতিতে সামাজিক বা সহৃদয় স্ব স্ব হৃদয়স্থ রসের সাধারণীকরণে রসাস্বাদন ও আনন্দানুভব করে। হাস্যরসের ন্যায় বীভৎসরসেও কোন আশ্রয় নাই। অতএব রসনিষ্পত্তি কিরূপে হইবে? বীভৎস রসাত্মক শ্রব্যকাব্যে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকটিকে বা বর্ণ্যমান পদ্যাংশটিকেই আশ্রয় বলিয়া মনে করিলে সহজে রসনিষ্পত্তি কল্পনা করা সম্ভব। কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে কি হইবে? এ বিষয়ে আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন যে আশ্রয় অথবা আলম্বনের একটির অনুপস্থিতিতে তাহাকে আক্ষেপ করিয়া লইতে হয়। সুতরাং আশ্রয়কে আক্ষেপ করিয়া লইলে সামাজিককেই সেই স্থানে বসাইতে হইবে। তাহা হইলে আশ্রয়ের অভাবকে পূর্ণ করা হইল। কিন্তু এইরূপে রসনিষ্পত্তির মানসপ্রক্রিয়া যুক্তিসাধ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য হইলেও বস্তুতঃপক্ষে বীভৎস রসের নিষ্পত্তিতে দোষ থাকিয়াই যায়। কারণ সাধারণীকরণই রসানুভূতির মূল কথা। নিন্দনীয় বস্তু দেখিয়া কোন আশ্রয়ই সেইভাবে ভাবিত হইতে পারে না। সামাজিকের মধ্যে স্বাভাবিক অনীহা সঙ্কোচন ঘৃণা প্রভৃতি একপ্রকার ব্যবধান ও ভেদজ্ঞান জাগ্রত রাখে।

নাট্যদর্পণে এই তথ্যকে সুপরিস্ফুট করিয়া বলা হইয়াছে যে বীভৎস এবং ভয়ানক রসের

উদ্দীপক দ্বারা জুগুপ্সা স্থায়িভাব এবং ভয়স্থায়িভাব উদ্দীপিত হইলেও রসে পরিণত হইবার পথে তাহারা প্রাথমিক আঘাত দিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করে। পরে ক্রমে কবি ও নাট্যকার গ্রথিত বস্তুর মাহাত্ম্যে ব্যঞ্জনাশক্তির ক্রিয়া এবং কুশীলবগণের অভিনয় কৌশলে এই উত্তেজনা প্রশমিত হয় কিন্তু একেবারে তিরোহিত হয় না। যেমন অভিনয়ে শিরশ্ছেদ ভীতিপ্রদ হইলেও নটের যুদ্ধ ও প্রহারকুশলতা বাচনভঙ্গী প্রভৃতির মনোমুগ্ধকর প্রভাবজনিত বিস্ময়ে দর্শকগণ অভিভূত হইয়া বিস্ময়ের সহিত অভিনয়ের রসাস্বাদন করে। মূলতঃ করুণ, বীভৎস ও ভয়ানক দুঃখাত্মক হইলেও কবিনটকৃত শক্তি প্রভাবে যে চমৎকারিতার সৃষ্টি হয় তাহাতে সাময়িকভাবে ভ্রান্তিতে অথবা অন্যভাবে অভিভূত হইয়া পাঠক এবং প্রেক্ষকগণ একরূপ নৈর্ব্যক্তিক তাদাত্ম্যে উপনীত হয়। পানে যেরূপ একটির তীক্ষ্ণ আস্বাদ উত্তেজনার সৃষ্টি করিলেও সকল অনুপানের মিলিত প্রভাব আনন্দদায়ক, বীভৎস ও ভয়ানক রসেও সেইরূপ। কিন্তু রসে সাধারণীকরণ মুখ্যতঃ প্রধান নায়ক-নায়িকার সহিতই হইয়া থাকে, মহাকাব্যে ও প্রধান দৃশ্যকাব্য সমূহে বীভৎস কোথাও নায়ক নায়িকানিষ্ঠ প্রধান-রসরূপে স্থান পায় নাই কারণ বীভৎস রঞ্জনাপ্রধান। বীভৎসরসের স্থায়িভাব জুগুপ্সা হাস্যরসের স্থায়িভাবের ন্যায় সত্ত্বগুণবর্জিত। অথচ জুগুপ্সা গৌণভাবে শান্তরসের উদ্বোধনের সহায়ক। অভিনব গুপ্তের মতে বীভৎস একান্তই উপরঞ্জক। এই রঞ্জনা পূর্ণ আনন্দময় নহে, আনন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। রসাস্বাদন ব্যবধানযুক্ত হওয়ার দরুণ ইহা রঞ্জক স্বভাবের।

বীভৎসরস রঞ্জনাপ্রধান হওয়ার জন্যই ইহার সহিত অনেকগুলি মৌলিক রসের বিরোধ দেখা যায়। যেমন শৃঙ্গার বীর প্রভৃতি। কিন্তু এই বিরোধ কি জন্য সৃষ্ট হয়? আলঙ্কারিকগণ ইহার উত্তরে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হঠাৎ দমকা বাতাসে যেমন এক স্থানের সমস্ত বস্তু অতি সুদৃঢ় হইলেও স্থানান্তরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পূর্বাবস্থার আমূল রূপান্তর ঘটে বীভৎসরসজনিত চিত্তের যে অবস্থা তাহাতে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বা অপরিচিত একটি ভাবের দ্রুত এবং আকস্মিক আবির্ভাবে অন্যান্য সকলভাব সাময়িকভাবে স্তব্ধ হইয়া যায়। এ জন্যই শৃঙ্গারের সহিত বীভৎসের বিরোধের সৃষ্টি হয়। শৃঙ্গাররস চিত্তভূমিতে যে বৈচিত্র্য আনয়ন করে তাহাকে expansion এবং বীভৎস যে বৈচিত্র্য আনয়ন করে তাহাকে violent repulsion বলিলে ইহাদের পার্থক্য দেখান সহজসাধ্য হয়। বীভৎসের সহিত যথার্থ মৈত্রী একমাত্র করুণরসের, কারণ উভয়েই চিত্তভূমির মধ্যে বিক্ষেপের সৃষ্টি করে, তবে করুণরসে ভাবের মধ্যে উদ্বেল বিক্ষুব্ধতা থাকে, বীভৎসে থাকে প্রচণ্ড সংঘাত। রস গঙ্গাধর গ্রন্থে রস বিরোধের তাত্ত্বিকরূপ দেখাইয়া জগন্নাথ বলিয়াছেন যে বিরোধ দুই প্রকারের স্থিতিবিরোধ ও জ্ঞানবিরোধ। স্থিতিবিরোধ বলিতে বাধ্য ও বাধক রস দুইটির একই অধিকরণে অবস্থিতি, ইহা হইতেই বিরোধ। এই অসুবিধা অন্য আশ্রয়ে বিরোধী রসকে রাখিলে দূর করা সম্ভব। যেমন নায়কগত বীররস বর্ণনায় প্রতিনায়কে ভয়ানক রস স্থাপন। জ্ঞান বিরোধ বলিতে দুইটি রসের জ্ঞান যেখানে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। এইরূপ ক্ষেত্রে বিরোধী রসদ্বয়ের মধ্যে সন্ধিকর্তার ন্যায় অন্য একটি রসকে আনিয়া স্থাপন করিলে রস বিরোধ দূর করা যায়। ইহার প্রাসঙ্গিক উদাহরণটি এইরূপ—"সুরঙ্গনাভিরাশ্লিষ্টা ব্যোম্নি ধারা বিমানগাঃ

"বিলোকন্তে নিজান্ দেহান্ ফেরুনারীভিরাবৃতান্।"

এখানে দেবকন্যা ও মৃত শরীর ইহারা যথাক্রমে আলম্বন। ইহাদের অবলম্বন করিয়া শৃঙ্গার ও বীভৎস রস জন্মলাভ করিয়াছে এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বী রস দুইটির মধ্যে স্বর্গলাভরূপ বীররস নিবেশিত হইয়াছে। বাধ্যবাধক রসদুইটির মধ্যে বীররস উপস্থিত থাকায় পূর্ববর্তী দুইটি রসের চর্বণা কালের মধ্যে বীর রসের চর্বণা ও আস্বাদ অন্তরে জাগ্রত থাকায় বিরোধী রসের জ্ঞান সহৃদয় চিত্তে উদিত হইতে পারে না। রসের মধ্যে একটি অঙ্গী হইলে অপরটি অঙ্গ হয় সুতরাং অঙ্গ ও অঙ্গীর বিরোধ সম্ভব নহে। বাস্তব জগতে যেরূপ দেহ ও দেহীর মধ্যে বিরোধ সম্ভব নহে এক্ষেত্রেও সেইরূপ। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে একটি রস অঙ্গী হইলেও অন্য রসগুলি যাহারা অঙ্গ তাহারা যদি পরস্পর প্রবল বিরোধী হয় তাহা হইলে তো বিরোধ নিবৃত্ত হইবে না! অপ্লরাজের রসরত্ন-প্রদীপিকায় ইহার উত্তরে বলা হয় যে রাজার নিকটে যেরূপ দুইজন বন্দীর পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সুযোগ থাকে না প্রধান রসের সান্নিধ্যে অঙ্গরসেরও সেইরূপ কোন প্রাধান্য থাকে না।

সংস্কৃত সাহিত্যে বীভৎস রসের প্রয়োগ সুপ্রচুর না হইলেও বীভৎসরসপ্রধান রূপক বা উপরূপক রচনার তাত্ত্বিক অবকাশ আলঙ্কারিকগণ রাখিয়াছেন উত্তম মধ্যম ও অধমভেদে সামাজিকভেদ স্বীকার করিয়া। প্রধানতঃ বীভৎসরস প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র শিল্পক ও সংলাপক নামক উপরূপক কারণ এই রূপকগুলিতে শান্তরস ও হাস্যরস ভিন্ন অন্য রস অঙ্গী হইবে। ইহাতে নায়ক ব্রাহ্মণ হইলেও প্রতিনায়ক নীচ জাতীয় হইতে পারে এবং শ্মশান, শবদেহ, বিপদসঙ্কুল অরণ্য প্রভৃতির বর্ণনা প্রধানভাবে থাকিবে। ব্যায়োগ এবং ভিন্ন শ্রেণীর উপরূপকগুলির মধ্যে বীভৎসরসের সৃষ্টির যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং নাট্যশাস্ত্রে ও ভাবপ্রকাশে পরিস্ফুটভাবে বলা হইয়াছে যে ব্যায়োগেও বীর বীভৎস ও করুণ রসের সৃষ্টি হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে বৈষ্ণবরসপ্রস্থানে কৃষ্ণই প্রধান আলম্বন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সকল রসের সৃষ্টি। কিন্তু কৃষ্ণালম্বনে বীভৎস রসের সৃষ্টির অবকাশ নাই এবং সৃষ্ট হইলে তাহা উপরস হইবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বীভৎস রসপ্রধান কোন গদ্য বা পদ্যকাব্য নাই। কাব্যের একদেশে বা বিক্ষিপ্ত শ্লোকাংশে বীভৎস রস সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে বীভৎস উপরঞ্জক। তাহার সহিত চতুর্বর্গের কোন যোগ নাই। চপলার চকিত চমকের ন্যায় তাহা ক্ষণস্থায়ী আলোড়নের সৃষ্টি করে, দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবসন্ততির জন্ম দিতে পারে না। পাঠকচিত্তও ব্যবধানসহকৃত এই রসানুভূতিকে অন্য রসের অঙ্গরূপেই গ্রহণ করে। সংস্কৃত সাহিত্যে বীভৎস রসের বর্ণনা আছে মালতীমাধব নাটকে শ্মশানের দৃশ্যে। বালরামায়ণেও বীভৎসরসাত্মক দৃশ্য আছে। মহাভারতে ও রামায়ণে ২।১টি ক্ষেত্রে বীভৎসরস অন্যরসের অঙ্গরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

বাংলাসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের রচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে, হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা বর্ণনায়, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অথবা বিদ্যাসুন্দর কাব্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আশমানি ও গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের সংলাপে, মধুসূদনের নরক বর্ণনায়, সমরেশ বসুর কোন কোন উপন্যাস ও গল্পে এবং অবধূতের 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' নামক উপন্যাসধর্মী শিল্পে বীভৎস রসের উল্লেখ আছে। এইগুলির মধ্যে মধুসূদনের নরকবর্ণনা অন্য রসের অঙ্গ। একমাত্র 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'কেই বীভৎস রসের সার্থক

সৃষ্টি বলা যায়। এখানেও কিন্তু একই পরিবেশ বা বিভাবোদ্দীপিত একই প্রকরণের অন্তর্গত অঙ্গী বীভৎস রস। তাহাতে শৃঙ্গার ও করুণ ভিন্ন ভিন্ন আলম্বনে স্থাপিত। শৃঙ্গাররস রচনার মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে অনুস্যূত। যদিও শৃঙ্গার ও বীভৎসরস বিরোধী, শেষ পর্যন্ত বীভৎসরস অবিরোধী করুণরসের পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। বইটি পড়িবার পর তাহাতে শৃঙ্গার ও করুণের ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। একই লেখকের রচিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থে চন্দ্রকূপ বর্ণনায় একই সঙ্গে ভয়ানক ও বীভৎস রসের সৃষ্টি হইয়াছে এবং মরুভূমির মধ্যে বিবসনা নারীর বলিষ্ঠ বর্ণনায় বীভৎস রসেরই সৃষ্টি হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ক্ষেত্রেই বীভৎস অদ্ভুতরসের অঙ্গ হইয়া পড়ে।

বীভৎস রসের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সহজেই উদিত হয় যে বীভৎস ও অশ্লীল ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? বীভৎস অসুন্দর ও নিন্দাজনক, অশ্লীলও অসুন্দর এবং বীভৎসের সহিত সংযুক্ত বা বীভৎসের অনুষঙ্গ; তথাপি ব্যবহারে কোথাও যেন বীভৎস ও অশ্লীলের মধ্যে একটি সীমারেখা টানিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বীভৎস রসের উদ্দীপনগুলি প্রায়শঃই অশ্লীল কিন্তু কবিপ্রবন্ধে তাহা হইতে রসের সৃষ্টি হয়। অথচ অশ্লীল বস্তু ও অশ্লীলতা একটি রসদোষরূপে পরিগণিত। এ জন্য অশ্লীলতার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ও এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন।

মূলতঃ অশ্লীল একটি সংজ্ঞা, বীভৎস ইহার অন্তর্গত। অর্থাৎ কোন কোন বা একশ্রেণীর অশ্লীলবস্তু চিত্তে যেভাবের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহাকে বীভৎস বলিলে ইহাদের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। অশ্লীল বলিতে উদ্দীপক বস্তু বা তথ্য। অশ্লীলতা তজ্জনিত চিত্তবৃত্তি বা ভাব। বাচ্যবৃত্তিতে প্রধান হইলে অশ্লীলতা দোষ—গৌণবৃত্তিতে তাহা রসের উদ্দীপক। শৃঙ্গাররসে অশ্লীলতা থাকিতে পারে। অথচ শৃঙ্গার এবং বীভৎস বিরুদ্ধ। বীভৎসদ্রব্য অচেতন হইলেও হইতে পারে এবং বীভৎস ক্ষেত্রবিশেষে ভয়ানক হইলেও হইতে পারে। কিন্তু প্রচলিত অশ্লীল ভয়ানক নহে। সূক্ষ্মভাবে বলা যায় যে বীভৎস রসের যে অসৌন্দর্য তাহা অনেক বেশী মাত্রায় নগ্ন এবং রূঢ় তাহা চিত্তবৃত্তিকে খিন্ন করে। তথা কথিত অশ্লীলে এই রূঢ় নগ্নতা নাই তাহা কিছুটা সহনীয় এবং তাহার পরিধি স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে চেতন জগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

'অশ্লীল' পদটিকে ব্যুৎপত্তির দিক্ হইতে এইরূপে ব্যাখা করা যায়—ন শ্লীল অশ্লীল। শ্রিয়ং লাতি গৃহ্ণাতীতি শ্রী—লা+ক। রস্থানে ল আদেশঃ। শ্লীল অর্থে যাহা শ্রীযুক্ত। অশ্লীল অর্থে যাহা শ্রী বা সৌন্দর্যকে গ্রহণ করে না সুতরাং শ্রীহীন বা সৌন্দর্যবর্জিত। সৌন্দর্য বলিতে যেমন একটি ব্যাপক অথচ অনুভববেদ্য সংজ্ঞা বুঝায় অশ্লীল বলিতেও তেমন একটি ব্যাপক অথচ অনুভববেদ্য সংজ্ঞা সূচিত হয়।

তাণ্ড্যব্রাহ্মণে অশ্লীল পদটি নিন্দাব্যঞ্জক বাক্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে "যমশ্রুত্যা অশ্লীলা বাগৃচ্ছতীতি" এবং "যৈবৈনমসাবশ্লীলং বাগ্ বদতি।" এই দুই উদাহরণেই অশ্লীল বলিতে নিন্দাজনক বাক্য। ভাগবতেও "অশ্লীলা নিন্দারূপা বাক্" এবং "অশ্লীল মশ্রীকরম্" এই উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও বলা আছে "ভাস্বরা লোকনাশ্লীল পরিবাদাংশ্চ বর্জয়েৎ।" বেদে 'অশ্রীর' এই পদটিও পাওয়া যায়। ন শ্রীঃ অশ্রীঃ অস্ত্যর্থে র। 'অশ্রীর' বলিতে বৈদিক ঋষিগণ যাহা কিছু কুৎসিত ও অমঙ্গলজনক তাহাই বুঝিয়াছেন। ঋগ্বেদে

আছে 'অশ্রীর ইব জামাতা (৮।২।২০) এবং 'কৃশং' 'চিদশ্রীকরম্' (৬।২০।৬) ভাগবতে আরও বলা হইয়াছে "অশ্রীরঃ গুণৈর্হীনঃ কুৎসিত' ও 'অশ্রীরমমঙ্গলম্।"

সংস্কৃতে অশ্লীল পদটি লজ্জাজনক ও অমঙ্গলজনক বাক্যকে বুঝাইত। বর্তমানে বিশেষ করিয়া বাংলাভাষায় অশ্লীল বলিতে প্রধানতঃ মৈথুনক্রিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়াদির ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যক্ষ উল্লেখ এবং পায়ুদেশঘটিত ক্রিয়াদি সূচিত হয়। কিন্তু বেদে উল্লিখিত নিন্দাজনক বাক্যের পরিধি আরও ব্যাপক। সেখানে অশ্লীল বলিতে কটুবাক্য, লজ্জাজনক বাক্য নিন্দাজনক বাক্য মৈথুন ও নানাবিধ ঘৃণাজনক শারীরিক ক্রিয়াকর্ম, চিত্তবৃত্তির সঙ্কোচনকারী জুগুপ্সাজনক দৃশ্য এ সমস্তই অন্তর্গত। অতএব বীভৎস দৃশ্য এবং তাহার বিভাব অশ্লীলের অন্তর্গত। সুতরাং প্রশ্ন উঠে যে অশ্লীল পদটির বর্তমান অর্থে সংক্রমণ কিরূপে সম্ভব হইল? সংস্কৃতে আর একটি অনুরূপ ভাবব্যঞ্জক পদ আছে তাহা 'গ্রাম্য'। এই গ্রাম্য পদটিকে—বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে… ভণ্ডাদিবচনে অশ্লীলে হালিকাদিপ্রসিদ্ধবাক্যে,…গ্রাম্যত্বমধমোক্তিষু ও "কাণ্ডৈর্বিপর্যয়াদ্বাক্যং গ্রাম্যমিত্যপদিশ্যতে।"

আলঙ্কারিকগণের মতে গ্রাম্যতা একটি দোষ। ইহা শব্দগত এবং অর্থগত। গ্রাম্যতাদোষ যে রসসৃষ্টির প্রতিকূল ইহা দণ্ডীস্বীকার করিয়াছেন। যাহা কান্তিগুণের হানি করে তাহাও গ্রাম্য। দণ্ডী শব্দগত গ্রাম্যতার উদাহরণ দিয়াছেন 'মৈথুনাদি'…পদের উল্লেখ দ্বারা। তাঁহার মতে 'সভ্যেতরকীর্তন' অর্থাৎ গ্রাম্যজনের উক্তির মধ্যে গ্রাম্যতাদোষ দেখা যায়। পদার্থ এবং পদাংশ হইতেও দণ্ডীর মতে গ্রাম্যতাদোষের সৃষ্টি হয় যেমন 'যাভবতঃ প্রিয়া' এই পদ। এখানে 'যাভ' এই অংশটি একত্র উচ্চারিত হইলে অশ্লীল। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অশ্লীলপদ অশ্লীলতাদোষে পরিগণিত হইবে না সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"গ্রাম্যং ঘৃণাবদশ্লীলামঙ্গলার্থং যদীরিতম্। তৎ সংবীতেষু গুপ্তেষু লক্ষিতেষু ন দুষ্যতি"।

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলি হইতে একটি সত্য প্রধানভাবে প্রতীত হয় যে 'অশ্লীল' বলিতে সৌন্দর্যের হানিকর কোন সত্তাকেই আলঙ্কারিকগণ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সৌন্দর্যের সহিত সুরুচি কান্তি এবং মঙ্গলের অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে। সত্যং শিবং সুন্দরম্। সুতরাং যাহা সুরুচি কান্তি এবং মঙ্গলের বিপরীত তাহাই অশ্লীল। প্রথম দুইটি সূত্রে ভণ্ড ও অধম ব্যক্তিগণের বাক্যকে অশ্লীল বলা হইয়াছে এবং তাহার সহিত হালিক অর্থাৎ চাষাভূষা ব্যক্তিগণের বাক্যকে গ্রাম্য বলা হইয়াছে। সুতরাং হালিকাদির বাক্যও ভণ্ড ধূর্ত অধম ও নীচ চরিত্রের ব্যক্তিদের ন্যায় অশ্লীল মনে করিতে হইবে কি? বেদে গ্রাম্য পদটির বিশেষ উল্লেখ নাই। লৌকিক সাহিত্যে ইহার প্রচুর উল্লেখ এবং তাহা প্রধানতঃ 'গ্রামেভবঃ গ্রামজাতঃ' এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্যই। ইংরাজীতে vulgar পদটি প্রথমে সাধারণ গ্রামীনজনের কথাকে বুঝইত। গ্রাম্য পদের সহিত পরবর্তীকালে প্রচলিত অশ্লীলতার সংযোগ কিরূপে হইল?

সর্বকালের ও সর্বদেশের অজ্ঞ ও গ্রাম্যজনসমাজ চিরকাল নরনারীর মৈথুনাদি শারীরিক ক্রিয়াকলাপকে যেরূপে দেখিত সেইরূপেই বলিতে অভ্যস্ত ছিল। যে সূক্ষ্ম অনুভূতি অথবা চেতনা হইতে স্থুল ও সূক্ষ্ম ভেদজ্ঞান জাগ্রত হয় অথবা সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্যের বোধ হয় সম্ভবতঃ

তাহা হইতে ইহারা বঞ্চিত থাকায় গ্রাম্যজনের বচনকে vuglar ও গ্রাম্যতাদোষযুক্ত বলা হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণে শব্দগত গ্রাম্যতাদোষের মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতাদোষকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অশ্লীলকে অন্যত্র 'ব্রীড়াজুগুপ্সাহমঙ্গলার্থ' বলিয়া নির্দেষ করা হইয়াছে। এই অশ্লীলতা দোষই শব্দ ও অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শব্দের অশ্লীলতা অশ্লীলশব্দ হইতে বা ক্রিয়ার বর্ণনায় অর্থগত অশ্লীলতা ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। এই ব্যঞ্জনার অশ্লীলতাই মনের কদর্য ভাবকে জাগায়। ব্যঙ্গ অশ্লীলতা গৌণবৃত্তিতে প্রকাশিত হইলেও তাহা রসের সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা দোষযুক্তই। যে কাব্যে অশ্লীলতা বাচ্য বা ব্যঙ্গবৃত্তিতে প্রকাশিত তাহা কাব্যসম্পদযুক্ত হইলেও অধম কাব্য।

আলঙ্কারিকগণের সর্বসম্মতসিদ্ধান্ত এই যে সৌন্দর্যই অলঙ্কার। অশ্লীলতাদোষ সৌন্দর্যের হানিকর বিবেচিত হওয়ায় যাহা অশ্লীলতাবর্জিত তাহা সৌন্দর্যের পরিপোষক। কিন্তু কোন মহাকবি যদি কাব্যে এইগুলিকে ব্যবহার করেন তাহা হইলে কি তাহা সভ্যেতরকীর্ত্তন দোষে দুষ্ট হইবে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে 'তাৎসংবীতেষু গুপ্তেষু লক্ষিতেষু ন দুষ্যতি'। সংবীত অর্থে বহুকালপ্রচলিত ব্যবহার। ইহা একটি ছাড়পত্র বিশেষ। এবং এই ছাড়পত্রই মহাকবি সম্প্রদায়ের অনেক অশ্লীল রচনাকেই কৌলীন্য দিয়াছে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে যাহা রসের পক্ষে ও নায়কের পক্ষে অনু'চত অথবা বিরোধী তাহা পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। শাব্দী অশ্লীলতা দূরকরা যায় কিন্তু আর্থী নহে। এজন্যই অশ্লীলতা একটি অর্থদোষ। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে একই পদ যখন বাচ্যবৃত্তিকে অশ্লীল, ব্যঙ্গবৃত্তিতে সুন্দর তখন শ্লীলতা অশ্লীলতার নির্ণায়ক কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে কবির বিবক্ষাই শ্লীলও অশ্লীলের নিয়ামক। তাঁহার মনোজগৎই সুন্দর ও অসুন্দরের মূল উৎস। সমগ্র বিশ্বকে তিনি তাঁহার চেতনার রঙে যেরূপে দেখেন তাহাকে সেইরূপ বাঙ্ময় মাধ্যমে রূপায়িত করেন। এজন্য আনন্দবর্ধনের উক্তিই সার্থক—"যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ত্ততে।" অশ্লীলতা বস্তুত: অনেক কবির রচনাতেই আছে কিন্তু সেখানে তাহা সমগ্র কাব্য শরীরের ক্ষুদ্র অংশমাত্র। বিচ্ছিন্নাংশে তাহা অশ্লীল কিন্তু সমগ্রভাবে সুন্দরের অংশ। ধ্বনি ছন্দোবৈচিত্র্য ভাষা মাধুর্য ও ভাষা গৌরব—ইহাদের মিলিত প্রভাবে অশ্লীলতা সমুদ্রের জলবিন্দুর ন্যায় স্বসত্তা হারাইয়া সুন্দরের অঙ্গে পরিণত হয়।

অশ্লীলতা মুখ্য হইলে উহা সাহিত্যকোটীর বহির্ভূত। গৌণভাবেই উহা সাহিত্যের পরিপোষক এজন্য Croceর উক্তি দণ্ডীর উক্তির প্রতিধ্বনিমূলক—"that the ugly is admissible onfy when it can be overcome ; an unconquerable ugliness, such as the disghusting cr the Nauseating, being altogether encluded." অসুন্দর সুন্দর হয় কবির বিবক্ষায় ও গৌণবৃত্তিতে—বাচ্যবৃত্তিতে অশ্লীল অশ্লীলই থাকিয়া যায়। ঔচিত্যই শ্লীলও অশ্লীলের নিয়ামক। সুন্দরের সুষমা এই সামঞ্জস্যে বা ঔচিত্যে। অতএব কবির বিবক্ষাই শ্লীল অশ্লী লবিষয়ে মূল কথা। কবি সাহিত্যিক লেখক শিল্পী প্রত্যেকে যদি বাচ্যবৃত্তিতে অশ্লীলতাকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন তাহা হইলে অশ্লীলতা বাচ্য, যদি ব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাহা ব্যঙ্গ হইবে। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যিকগণ কবিকৃতির যে মান ও লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন তাহা সৎসাহিত্যের আদর্শ। ইহার মধ্যে বাচ্য ব্যঙ্গ কোন প্রকার অশ্লীলতারই স্থান নাই।

পৌরাণিক যুগে সাংবাদিকতা

তারাপদ পাল

মহাভারত

মহাকাব্য অপেক্ষা 'ইতিহাস' হিসাবে মহাভারতের প্রসিদ্ধি সর্বাধিক। রবীন্দ্রনাথ-এর কথায় : 'ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।' তাঁর মতে আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়িয়ে ছিল ব্যাসদেব সেগুলিকে একত্রিত করেছিলেন। 'জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত।' শুধু তাই নয়। 'মহাভারত অতি প্রাচীন সমাজ ও নীতি বিষয়ক তথ্যের অনন্ত ভাণ্ডার।' অর্থাৎ মহাভারতে আমরা সুপ্রাচীন সমাজের এবং তৎকালীন সভ্যতার একটা স্পষ্ট বিবরণ বা চিত্র পাচ্ছি। এবং তা থেকে সে-যুগের চলমান জীবনের প্রকৃতি উপকরণ ইত্যাদির পরিচয়ও পাই। সমাজতথ্যের এহেন অনন্ত ভাণ্ডার মন্থন করে সে-যুগের নিজস্ব ধারার সাংবাদিকতার রূপটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। জানা যায় : সে-যুগেও সংবাদাদি আদান-প্রদান হতো, সংবাদ সংগ্রাহক ছিলো, সম্পাদক ছিলো, সংবাদগুলিযথাযথ ভাবে সম্পাদিত হতো, জনমণ্ডলী নানাবিধ সংবাদের প্রতি আগ্রহশীল ছিল; জনমণ্ডলীর কাছে সেই সব সংগৃহীত সম্পাদিত সংবাদাদি পরিশোধিত হতো। এসব কাজের একটা বিশেষ রীতিও ছিল। তবে সব মিলিয়ে, বিশেষ করে আঙ্গিকের দিক থেকে আজকের সাংবাদিকতার সঙ্গে নিঃসন্দেহে অনেক পার্থক্য ছিল। তা'বলে সে যুগের সেই সাংবাদিকতাকে উপেক্ষা করার কোন কারণ নেই। সে যুগের সাংবাদিকতায় আমরা সঞ্জয় বিদুর-এর মতো সফল রিপোর্টার, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মতো সুদক্ষসম্পাদক, উগ্রশ্রবার মতো সংবাদ পরিবেশক এবং বেশ কয়েকজন সম্মানিত ভাষ্যকারের সন্ধানও পাই।

সমস্ত মহাভারত অনুধাবন করলে দেখা যায় যে তার সুবিস্তৃত পটভূমিতে রয়েছে অসংখ্য ঘটনা, কাহিনী, উপকাহিনী, কিংবদন্তী ইত্যাদি। এবং সে সবের সূত্র বিভিন্ন অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা নানাভাবে কথিত বা উপস্থাপিত। এই উপস্থাপনায় পটভূমিও ভিন্ন। কিন্তু কোথাও সূত্রগুলি উপেক্ষিত নয়। সকল ক্ষেত্রেই তাদের উপস্থিতি স্পষ্ট। কাহিনীবিন্যাসের এই আঙ্গিক বা কৌশল, মহাকাব্য রচনার একটা রীতি হলেও, বৈয়াকরণিক রীতির রক্ষণশীলতার বাইরে সমাজ জীবনের পটভূমিতে বিশ্লেষণ করলে একে সামাজিকতা-কর্মের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। এবং সেখানে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে কেবল কবি হিসাবে না দেখে একজন সফল বার্তা-সম্পাদক বলে চিহ্নিত করা যায়। মহাভারতে তাঁর ভূমিকা সংকলকের বার্তা-সম্পাদকের এবং কোথাও কোথাও রিপোর্টার ও ভাষ্যকারেরও। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্যে বিভিন্ন সূত্র থেকে নানাবিধ ঘটনা, তথ্য, সংবাদ, জনশ্রুতি প্রভৃতি কাহিনী সংগ্রহ সংকলন ও সম্পাদনা করে "মহাভারত" গড়ে তুলেছেন। এবং তার ফলেই বিস্তৃত কালের সমাজচিত্র হিসাবে মহাভারত সম্মানিত হয়েছে।

এ কালের সংবাদপত্র পাঠ করার সময় আমরা সংবাদগুলি যে বিভিন্ন রিপোর্টারের সংগৃহীত তা জানতে পারি তার উল্লেখ থেকে। যেমন ষ্টাফ রিপোর্টার নিজস্ব সংবাদদাতা, বিশেষ প্রতিনিধি কিংবা নিউজ-এজেন্সী পরিবেশিত সংবাদ হলে এজেন্সীর নামোল্লেখ ইত্যাদি। আবার রেডিও-র খবর শোনার সময়ও সংবাদপাঠক-এর (ঘোষক বা বার্তা সম্পাদক কিংবা রিপোর্টার) নাম উল্লেখিত হয়। মহাভারতেও তা হয়েছে। এবং একথা বললে তাই ভুল হয় না যে, মহাভারতের ঐসব ব্যক্তিরা কেউ রিপোর্টার, কেউ ভাষ্যকার প্রভৃতি।

আরও লক্ষণীয় : 'এই গ্রন্থে বহু লোকের হাত আছে।...বহু রচয়িতা...মহাভারত সমুদ্রে তাঁদের ভালমন্দ অর্ঘ্য প্রক্ষেপ করেছেন।' ব্যাসের পরবর্তীকালেও বহু রচয়িতা মূল কাহিনীর সঙ্গে মোটামুটি সংগতি রেখে বহু কাহিনী সংযোজন করেছেন।—এর থেকেও যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, তা হলো : বহু সাংবাদিক কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আগে পরে যা সংগ্রহ করেছেন তা মহাভারতের মধ্যে তুলে ধরেছেন। সেখানে হয়তো ব্যাসের পক্ষে সব সম্পাদনা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সে-কালের সংবাদমূল্যে সবই একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। বার্তা সম্পাদক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস থেকে শুরু করে সকল সাংবাদিকের মধ্যে তাদের রচনা-সৌকুমার্যের গুণের জন্য, এবং বিশেষ করে ব্যাসের সাহিত্য-রস সৃষ্টির অপরিসীম ক্ষমতার গুণে, সুসংহত গ্রন্থনায় সমগ্র গ্রন্থটি সাহিত্যরসপুষ্ট হয়েছে—হয়ে উঠেছে মহাকাব্য। এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে খ্যাত বার্তা সম্পাদক কোন ব্যক্তি বিশেষও হতে পারেন, আবার নামটি সমকার্যে রত ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের বৃত্তিগত পরিচয় জ্ঞাপক সম্মান নামও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, ঐ-কালের প্রথম বা সর্বাধিক সফল ও খ্যাতিমান বার্তা সম্পাদক ছিলেন ব্যাস। তাঁর পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে সেকালের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি বার্তা সম্পাদকের কাজে বৃত হয়েছেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই নিজেদের নামকে বড় করে তোলার চেষ্টা না করে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নামের আড়ালেই কাজ চালিয়ে গেছেন। তবে শেষোক্তোটির সম্ভাবনাই বেশী। এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের হাতে একই কাজ একই রকম হতে পারে না। তাই মহাভারতের মধ্যে কিছু কিছু 'ঘটনাগত অসংগতি, চরিত্রগত অসংগতি, আদর্শের পার্থক্য' ইত্যাদিও দেখা যায়।

মহাভারতের প্রস্তাবনাপর্বে আছে : সৌতি উগ্রশ্রবা নানা স্থানে ভ্রমণ সেরে ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হলেন নৈমিষারণ্যে। শৌনক ও অন্যান্য মুনিরা সেখানে বাস করেন। সৌতি দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিলেন। সৌতিরাই সেকালে সংবাদাদি সংগ্রহ করে এনে জানাতেন এবং তা সংগ্রহ ও জানাবার জন্য তাঁদেরকে ঘুরতে হতো। ফলে নৈমিষারণ্যের মুনিরা দীর্ঘদিন আশ্রমের বাইরের জগতের খবরা-খবর কিছুই পাননি। উগ্রশ্রবার উপস্থিতিতে তাঁরা দীর্ঘপ্রতীক্ষার পর তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন স্থানের নানাবিধ খবরাখবর জানার জন্য আগ্রহান্বিত হলেন। রীতিমতো একটা 'প্রেস কনফারেন্স' বসে গেল। আশ্রম তপস্বীরা প্রশ্ন করলেন : 'কোথা থেকে আসছ? এতদিন কোথায় ছিলে?' উত্তরে সৌতি উগ্রশ্রবা জানালেন : 'জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে গিয়েছিলাম। সেখানে মহাভারত শুনেছি। তারপর বহুতীর্থে ভ্রমণ করলাম সমন্ত পঞ্চকে গেলাম সেখান থেকে আসছি।' এই বলে তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, জনমেজয় ও তার সর্পযজ্ঞের বিষয় ইত্যাদির

বিবরণ ও ব্যাকগ্রাউণ্ড জানান। এবং শেষে মুনিদের আগ্রহে তাঁদেরকে মহাভারতের কাহিনীও শোনান। তাঁর কাছ থেকেই জানা যায় যে, মহাভারত রচনার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে তা শেখান। সর্পযজ্ঞ কালে জনমেজয় ও ব্রাহ্মণগণের বহু অনুরোধের পর ব্যাস বৈশম্পায়নকে মহাভারত শোনাবার নির্দেশ দেন। তারপরই বৈশম্পায়ন মহাভারত বর্ণনা করেন। সেই সঙ্গে মহাভারত বর্ণনার অবকাশে মহাভারতে সংগৃহীত ঘটনাবলীর পরবর্তীকালীন অনেক ঘটনার রিপোর্টও তিনি জানান। (মৌষলপর্ব দ্রষ্টব্য)। সেখান থেকে জেনে সৌতি উগ্রশ্রবা মুনিদের জানান। এখানে সৌতির একটি উক্তি স্মরণীয় : 'কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন. আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন।'

—এই ঘটনার থেকে জানা যায় যে, যে আগ্রহ নিয়ে খবরের কাগজ পড়া হয়, বেতার-সংবাদ শোনা হয়—দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে মহাভারতের যুগেও (এবং তা রচনার পরবর্তীকালেও) জন-মানসে একই আগ্রহ বিদ্যমান ছিল। সংবাদ সংগ্রাহক বা রিপোর্টার ছিল (সৌতি উগ্রশ্রবা যার একটা উদাহরণ)। সংবাদপত্র বা রেডিওর প্রতিমূর্তি হিসাবে কিছু ব্যক্তি সংবাদ প্রচারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা দীর্ঘসময় ধরে লোকপরম্পরায় বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে জনমণ্ডলীর কাছে সংবাদ প্রচার করতেন। একই সঙ্গে তাঁরা রিপোর্টারের কাজও করতেন। সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সংবাদ সংগ্রহ করে, পুরনো সংবাদের সঙ্গে সেগুলিও পরিবেশন করতেন। এবং এই সমস্ত সাংবাদিক-কর্মের নেতা ছিলেন বার্তা-সম্পাদক, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস।

প্রসঙ্গতঃ একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, আধুনিক সাংবাদিকতার প্রাথমিক পর্বে কৌতূহলী পাঠকের সংখ্যা যেমন সীমিত ছিল এবং এখনও বহু লোক আছেন খবরের কাগজের সঙ্গে যাঁদের সরাসরি যোগাযোগ নেই। দেশের এমন অনেক জায়গা (আগে আরও বেশী) আছে যেখানে নিয়মিত খবরের কাগজ পৌছায় না, এবং স্বাভাবিক কারণেই সেখানের লোকের সঙ্গে খবরের কাগজের দৈনিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পায় না। সুতরাং এখন থেকে দু'তিন হাজার বছর আগে সংবাদ কৌতূহলীদের সংখ্যা যে আরও সীমিত থাকবে তা' স্বাভাবিক ঘটনা। এবং দেশের সর্বত্র সংবাদ না পৌছানও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে কারণে আজকের 'মাস মিডিয়া জার্নালিজম'-এর সঙ্গে সে-কালের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রের পুরোপুরি মিল খুঁজে না পেয়ে সে-কালে 'সাংবাদিকতা'ই ছিল না একথা মনে করা ভুল হবে। সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, সে-কালে সাংবাদিকতার যান্ত্রিক-দিক পুরোপুরিভাবেই অনাবিষ্কৃত ছিল। তাই লোক পরম্পরায় সংবাদাদি পরিবেশিত হতো। তাই সে যুগে সংবাদ শোনার জন্য বহুলোক একত্রে এক একটা জায়গায় সমবেত হতো এবং সংবাদ-পরিবেশক বা কথক তাদের মধ্যে বসে তা শোনাতো। পাছে শুধু সংবাদের নিরস বর্ণন সকল শ্রোতাকে আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে তুলতে না পারে তার জন্যে সংবাদ গুচ্ছকে সাহিত্যগুণসমন্বিত, রসসিক্ত, মনোহর করে তুলতো এবং তার সঙ্গে নীতি, আদর্শ, ধর্মচেতনা ইত্যাদি মিশিয়ে দিতো। আজকের দিনে যেমন কোন কোন সংবাদকে বা ঘটনাকে বেশী আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নানা রকম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় ; ক্ষেত্র বিশেষে 'ইয়োলো-জার্নালিজম'ও করা হয়। পার্থক্যটা কেবল সে কালের ও এ কালের সমাজ চেতনার সঙ্গে।

কৃতি সাংবাদিকরা সমাজে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হন। তার কারণ কেবল সংবাদ সংগ্রহ ঘটনাবলীর অতি গোপন নেপথ্যে সত্য উদ্ঘাটন করা বা প্রচুর অর্থ-উপার্জন করা নয়। দূরদৃষ্টি, সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে বিচক্ষণতা ও জ্ঞান। বিদ্যা বুদ্ধি সততা, সঠিক বিশ্লেষণও ভাষ্যরচনার ক্ষমতা, স্থিতপ্রজ্ঞ চিন্তাশীলতা, প্রভৃতি একত্রে তার কৃতিত্ব ও সম্মানের ভিত্তি ভূমি। সে-সব দিক থেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না। সকলগুণই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান, এবং ক্ষেত্রবিশেষে কিছু বেশীই বলা যায়। সে কারণে মহাভারতের মধ্যে তাঁর আসন পরম শ্রদ্ধার ও সম্মানের। সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য ও মতামতের গুরুত্ব ও মূল্য অনেক। বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে সে সবের প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় শর সন্ধানে সাফল্য লাভ করার পর কুন্তীর নির্দেশে যখন পঞ্চ-পাণ্ডব দ্রৌপদীকে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করেন সে সময় দ্রুপদের সঙ্গে এই রকম এক সমাজনীতি-বিরোধী সিদ্ধান্তের জন্য যুধিষ্ঠিরের বিতর্ক হতে থাকে। কোন এক নারীর একাধিক স্বামী থাকা কেবল নীতি বিগর্হিতই নয়, সেই নারীর সতীত্বের কলঙ্কস্বরূপও। এবং বিরোধটা সে জন্যেই। দেশ ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের এ-হেন পারিবারিক ঘটনা, বিতর্ক নিঃসন্দেহে সে কালের জনমণ্ডলীতে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এবং এই ঘটনা সমগ্র সমাজকে কলঙ্কিত, আদর্শভ্রষ্ট এবং সমাজের সামনে একটা ভ্রান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে কি না—এসব নিয়ে নানাবিধ সরব আলোচনার ঝড ওঠাও স্বাভাবিক। উচ্চমহলের এ-হেন কীর্তি নীচের মহলে প্রভাব বিস্তার করে উচ্ছৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। এ মতাবস্থায় ব্যাস মুখর হবার প্রয়োজন বোধ করেন এবং এই ঘটনার শুভাশুভ নির্ধারণ করেন। একটি নেপথ্যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য এই ঘটনাটির যথার্থ প্রমাণ করেন। যুক্তি দিয়ে, ঘটনার উল্লেখ করে, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে পূর্ব-নির্ধারিত একটি চুক্তিরই যে পরিণতি তা প্রমাণসহ দেশবাসীকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্মরণ করিয়ে দেন। বিস্মৃত এই পূর্ব চুক্তিটি স্মরণ হওয়ায় সব বিরোধেরও অবস্থান ঘটে। (আদি পর্বের বৈবাহিক পর্বাধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বনপর্বে দেখা যায়: অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কুচক্রী পুত্ররা পঞ্চ-পাণ্ডবকে সদলে বধ করার ষড়যন্ত্র করেন। সেই ষড়যন্ত্রের কথা ব্যাস সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।. সঙ্গে সঙ্গে এর পরিণতিও তিনি অনুমান করেন। ঐ রকম একটা বীভৎস নক্কারজনক ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য তিনি নিজেই একটি ভাষ্যরচনা করেন। তাতে একদিকে যেমন সেই সম্ভাবিত ঘটনার বীভৎস পরিণতির সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন, তেমনি এই ঘটনা যাতে না ঘটে তারও চেষ্টায় উপদেশাত্মক নির্দেশ ঘোষণা করেন। তাঁর এই প্রচারের পর বিদ্বজ্জনরা এই ষড়যন্ত্র রোধের চেষ্টা করেছিলেন—তারও প্রমাণ আছে—যদিও তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এবং ব্যাসের অনুমান সে সত্য ছিল তাও পরবর্তীকালের ঘটনায় প্রমাণিত হয়ে তাঁর দূরদৃষ্টি ও চিন্তাক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অভিমন্যুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবপক্ষে শোকাকুল হয়ে যুদ্ধ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময় ব্যাস আর একবার সোচ্চার হন এবং যুদ্ধ বর্জন না করার জন্য যুধিষ্ঠির ও তাঁর পক্ষকে উৎসাহিত করেন। নারদ-সংগৃহীত একটি পুরনো ঘটনার উল্লেখ করে তিনি অভিমন্যুর মৃত্যুর শোকে সান্ত্বনা দেন। এটি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ্য।

এ জাতীয় ঘটনার উল্লেখ মহাভারতে আরও আছে। ঠিক সময়ে যোগ্য রিপোর্টার বা ভাষ্যকার কিংবা 'কলামনিষ্ট'কে দিয়ে উপযুক্ত তথ্যমূলক ঘটনা বা নিবন্ধের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। (বিদুলার উপাখ্যান স্মরণীয়)।

সেকালের 'ওয়ার করেস্পনডেন্ট' বা যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদদাতা সঞ্জয় কীর্তিমান রিপোর্টার হিসাবে এ-কালেরও প্রণম্য ব্যক্তি। মহাভারতের মূল কাহিনী কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সমগ্র ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে তাঁর রিপোর্টের মাধ্যমে। মহাকাব্যের বিন্যাসে দেখানো হয়েছে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে যাতে যুদ্ধের প্রতিদিনকার ঘটনার পুংখানুপুংখ বিবরণ পেতে পারেন, তার জন্য ব্যাস সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করে শোনাবার জন্যে নিয়োগ করেন। কবির দৃষ্টিতে এই বর্ণনা যেমনই হোক, ঘটনাটিকে এইভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়: কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—সে কালের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এবং আধুনিক কালের বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। এ যুদ্ধের সকল সংবাদ জানার আগ্রহ সকলেরই ছিল। তা'ছাড়া এর বিস্তৃত বিবরণ 'রিপোর্ট' করার আকর্ষণও সাংবাদিকদের কম নয়। তাই 'দিব্যচক্ষু'র রূপকে একজন সুযোগ্য 'ওয়ার করেসপনডেন্ট' তৈরী করা হয়েছে। যিনি 'অস্ত্রে আহত হবেন না, শ্রমে ক্লান্ত হবেন না, জীবিত থেকেই যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।' অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের মতো বিপদজনক স্থানে গিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহযোগে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের কলাকৌশলে সঞ্জয় পারদর্শীও ছিলেন। তাই তাঁকেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের সংবাদ-সংগ্রহ ও তা পরিবেশন করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। এই রকম যোগ্যতা এ কালের 'ওয়ার করেসপনডেন্ট'দেরও থাকা বাঞ্ছনীয়। এবং এই রকম একজন সুদক্ষ রিপোর্টারের সাহায্যেই ব্যাস কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সকল রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। ধৃতরাষ্ট্র এখানে সংবাদ জানার জন্য আগ্রহী জনগণের একটি প্রতীক মাত্র। মহাকাব্যে ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রোতা করে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বর্ণনা করে গেছেন।

সে যুগের কেবল সার্থক নয়, প্রথম সুযোগ্য 'ওয়ার করেসপনডেন্ট' সঞ্জয় সর্বকালের সাংবাদিকদের স্মরণীয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রত্যেক 'ওয়ার করেসপনডেন্টে'র ব্যক্তিগত যোগ্যতার নিদর্শন। এই সংবাদ সংগ্রহে ও পরিবেশনে কোথাও তাঁর কোন রকম শৈথিল্য দৃষ্টিগোচর হয় না। আরও লক্ষ্যণীয়: যে কোন রিপোর্টারের সাফল্য এবং যোগ্যতা কেবল রিপোর্ট সংগ্রহ ও তার জন্য ঝুঁকি নেওয়ার মানসিক শক্তির ওপরই নির্ভর করে না। সেই সঙ্গে দেশ-কাল-পাত্র সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান একটা বড় অবলম্বন। বিভিন্ন স্থানের, বিশেষ করে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিরোধের সময় সংশ্লিষ্ট দেশগুলির, ভৌগলিক পরিচয় ও রাজনৈতিক—সম্পর্ক প্রসঙ্গে জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা যে সাংবাদিকের যত বেশী হবে, সে তত সাফল্যের সঙ্গে তার করণীয় কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। এবং তার 'রিপোর্ট' থেকে পাঠকবর্গও পরিপূর্ণভাবে তাদের কৌতূহল মেটাতে পারবে। এই বিশেষ গুণটিও সঞ্জয়ের ছিল। তার প্রমাণ ভীমপর্বের প্রথম দিকেই পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে-সৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার 'ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড'ও তিনি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন নানা সূত্র থেকে। এমন কি যুদ্ধ চলা কালে উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের মনে

যে সব সন্দেহ, বিকার দেখা দিয়েছিল এবং চিন্তায় বিভিন্নতা ঘটেছিল—সে সবের তথ্য সংগ্রহেও সঞ্জয়ের কৃতিত্ব সমানভাবে প্রোজ্জ্বল।

একটি মাত্র বিশেষ দুষ্প্রাপ্য সংবাদ বা 'স্কুপ-নিউজ' সংগ্রহ করে সেকালের রিপোর্টিং-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিদুর তাঁর কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর এই সাফল্য পঞ্চ-পাণ্ডবকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। তা না হলে মাতা কুন্তীসহ যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাই একত্রে জতুগৃহে অসহায় অবস্থায় পুড়ে মরতেন। পঞ্চ-পাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার এই জঘন্য ষড়যন্ত্রটি হয়েছিল একটি গোপন বৈঠকে। দুর্যোধনাদি কয়েকজন এক 'ক্লোজ-ডোর কন্‌ফারেন্স'-এই ষড়যন্ত্র করেন এবং তা' যাতে কোন ভাবেই ফাঁস না হয়ে যায় তার জন্যেও তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তবুও বিদুর যেভাবেই হোক সেই অভিসন্ধির সংবাদ জেনে নিতে পেরেছিলেন।

কদ্রু ও বিনতা, দুই সতীন উচ্চৈঃশ্রবাকে কেন্দ্র করে এক বাজী ধরলেন। 'উচ্চৈঃশ্রবা-বাজী'তে জেতার জন্য কদ্রুপুত্র সর্পদের সাহায্যে এক ছলনার আশ্রয় নেয়। ফলে জয়লাভও তার হয়। কিন্তু তার পুত্রদের কেউ কেউ সে-সময় সেই ছলনায় অংশ নিতে অস্বীকার করায় মা হয়েও কদ্রু তাদের ধ্বংসের জন্য এক ষড়যন্ত্র করে। এদিকে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য জনমেজয় সর্পবংশ ধ্বংসের অভীপ্‌সায় সেই ষড়যন্ত্রকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করেন। এই রকম একটা ঘটনা রোধ করার জন্য তৃতীয় পক্ষ থেকে একটা 'প্রতিরোধ ব্যবস্থা'ও গড়ে ওঠে। সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থার (ষ্ট্র্যাটেজির) সংবাদ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রহ করে এলাপাত্র। বিপদ যখন শিয়রে বাসুকির নেতৃত্বে সর্পকুল চিন্তাভারাক্রান্ত, সেইসময় এলাপাত্র তৃতীয় পক্ষের নির্ধারিত ষ্ট্র্যাটেজি (কিংবা বলা যায় সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বিশেষজ্ঞদের নির্দেশিত পথ) প্রকাশ করেন। তারই দৌলতে, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ থেকে সর্পকুল শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়। জনগণের কল্যাণার্থে সংবাদ সংগ্রহ ও তা' প্রকাশ করার সে-কালীন-প্রচলিত এই রীতি বিদুর ও এলাপাত্রের উক্ত দুই রিপোর্টিং থেকে খুঁজে পাওয়া যায়।

উদ্‌যোগপর্বের এক জায়গায় আছে: কুরুক্ষেত্র মহাসমর আসন্ন। নানা ভাবে সেই যুদ্ধ বন্ধের ও শান্তির প্রচেষ্টা চলছে। বিশেষ করে পঞ্চ-পাণ্ডবরা সেই যুদ্ধ চাইছেন না। এমন সময় কৃষ্ণ শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে যাবার আয়োজন করলেন। কৃষ্ণ সে সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আসন্ন যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর সেই প্রচেষ্টাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সেই প্রয়াসের ফলাফলের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন ঘটনার ফলশ্রুতি জানার জন্য। নারদ, দেবল, মৈত্রেয়, পরশুরাম প্রমুখ ব্যক্তিরা ছুটলেন হস্তিনাপুরের দিকে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নও গিয়েছিলেন। তাঁরা হস্তিনাপুরে উপস্থিত থেকে কৃষ্ণের সেই প্রচেষ্টার ফলাফল জানার ও সমগ্র অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ সাম্প্রতিক কালের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ভিয়েৎনাম বিরোধকে নিয়ে যখন একটা সমাধানের প্রয়াসে 'প্যারিস-বৈঠক' চলছিল—তখন সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে বহু সাংবাদিক সমবেত হয়েছিলেন বৈঠকের ফলাফল কোনদিকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত কি ঘটে তা জানবার জন্য। এর সঙ্গে হস্তিনাপুরে নারদ প্রমুখ ব্যক্তিদের সমাবেশের মিল লক্ষ্যণীয়। সেখানে ওঁরাও গিয়েছিলেন 'হস্তিনাপুর-বৈঠকে'র রিপোর্ট সংগ্রহ

করতে। নারদ, দেবল, মৈত্রেয়, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরশুরাম প্রমুখ রিপোর্টারদের মধ্যে এ-কালের যে-কোন রিপোর্টারের থেকে আগ্রহ কম ছিল না।

'হস্তিনাপুর-বৈঠক' আলোচনায় বিভিন্ন স্তরে ঐ সকল সাংবাদিকরা সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পুরনো ঘটনার উল্লেখ করে নানা রকম সমীক্ষা করেছিলেন। সেই সঙ্গে বিবদমান দলগুলির কোন পক্ষ কত শক্তিশালী তার প্রামাণিক চিত্রও তুলে ধরেছিলেন। রাজা দম্ভোদ্ভব, সুমুখ ও গরুড, বিশ্বামিত্র গালব যযাতিও মাধবীর কাহিনীসমূহ সেই সব সমীক্ষা থেকে পাওয়া যায়।

মহাভারতে আরও অসংখ্য রিপোটিং ও রিপোর্টারের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সেগুলো সাধারণ রিপোর্টিং-এর পর্যায়ে পড়ে। বেশ কিছু 'ফ্রি-ল্যান্স জার্নালিষ্ট'-কেও খুঁজে পাওয়া যায়। যাঁরা রিপোর্টিংও করেছেন, বেশীর ভাগই বিভিন্ন 'সাম্প্রতিক-ঘটনার' পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডার বা 'ফীচার' পরিবেশন করেন। 'ফীচার' পরিবেশন করার সময় তারা সব সময়ই নিজস্ব বিষয়ের ওপরই সমীক্ষা করেছেন। অর্থাৎ যে বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, সেই বিষয় নিয়েই তিনি কাজ করেছেন।

বিশেষজ্ঞ ফ্রি-ল্যান্সারদের মধ্যে বৃহদশ্ব, মার্কণ্ডেয় ও ভীষ্মের কথা উল্লেখ করা যায়। পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডবেরা দুরবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে বৃহদশ্ব নল রাজার কাহিনী উল্লেখ করে একটি ফীচার উপহার দেন। যুধিষ্ঠিরের আগে পাশা খেলার মাধ্যমে রাজা নলও চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয়, একই প্রসঙ্গে রামের (উপাখ্যান) জীবনের দুর্যোগের ঘটনার উল্লেখ করেন। সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ভীষ্ম জীবনের শেষ পাদে এসে অনেকগুলি বিশেষ কাহিনী পরিবেশন করেন। মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন পর্বদ্বয় পুরোটাই ভীষ্মের অবদান।

এ ছাড়া পরাশর, অঙ্গারপর্ণ, শল্য প্রমুখর নাম উল্লেখ্য। আজকাল যে কোন দেশে কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্মান লাভ করলে (পূর্ব পরিচিতি থাকলেও এবং না থাকলেও) বা কোন কারণে সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থান পেলে তাকে নিয়ে ফীচার বা তার জীবন কথা (সংক্ষেপে) লেখা হয় কাগজে—রেডিওতে প্রচার করা হয়। সে কালেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু মৎসরাজ কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করবেন। তখন সত্যবতী এক বিশেষ সম্মানের অধিকারিণী। কিন্তু 'মৎস রাজার কন্যা' এটাই তার বড় পরিচিতি নয়। তার জীবন-কাহিনী খুঁজে বার করা হল। অতি গোপন সে কাহিনী। আর গোপন বলেই প্রয়োজন বেশী, আকর্ষণ বেশী। সেই কাহিনী সংগ্রহ করেন পরাশর। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যাবার অনেক আগে থেকেই অর্জুনের পরিচিতি সর্বজন বিদিত। কিন্তু তাঁর জীবনের আরও অনেক পরিচিতি তখনও অনুদ্ঘাটিত ছিল। তিনি কেবল কুরুবংশীয়ই নন, তাপত্যও। অর্থাৎ তপতী-সংবরণের বংশধর। তাঁর জীবন সম্বন্ধে এই রকম বহু তথ্য, যা পূর্বে জানা যায় নি, সে সবের গুরুত্ব বাড়ছিল তাঁর ক্রমবর্ধমান ইম্‌পরটেন্‌সের সঙ্গে সঙ্গে। সেই সব তথ্য সংগ্রহ করে জানান অঙ্গারপর্ণ। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন-কথাও জানা যায়।

তাছাড়া নারদ, কৃষ্ণ, বিদুর প্রমুখরাও ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড স্টোরী

শুনিয়েছেন। এসব থেকে, এ যুগের সাংবাদিকতার একটা যে বড় আকর্ষণ এবং অঙ্গ ফীচার বা তার সমজাতীয় রচনা, মহাভারতের যুগেও তার প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন দেশে মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট প্রমুখরা যখন বিদেশে বা স্বদেশের বিভিন্ন স্থানে সফরে বা ভ্রমণে যান, তা সে রাজনৈতিক কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, তাঁদের সঙ্গে রিপোর্টারও যান। এবং সাধারণতঃ সরকারী রিপোর্টার বা সরকার অনুমোদিত বেসরকারী সংবাদ বা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টার যান। সে-যুগেও এ-রেওয়াজ ছিল। বনবাসকালে যুধিষ্ঠিরাদিরা যখন তীর্থ যাত্রায় যান, সে-সময় ইন্দ্র ও নারদের নির্দেশে লোমশ নামক এক মুনি সাংবাদিক হিসাবে তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। নানা স্থানে ভ্রমণরত অবস্থায় তিনি তাঁদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা যে যে জায়গায় গিয়েছিলেন সে সব জায়গার বৈশিষ্ট ও ইতিহাসও সংগ্রহ করেন।

পরিশেষে সঞ্জয় সম্পর্কে একটি কথা বলার অবকাশ থেকে যায়। সংবাদ-সেবী হিসাবে সাংবাদিকের গুরুত্ব যতখানি, নাগরিক-দায়িত্বের ভার বেড়ে যায় অনেকখানি। প্রয়োজন হলে, তখন তাকে অন্যান্য নাগরিকের মতো অন্য সব বৃত্তি ছেড়ে সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। এটা শুধু তার নাগরিক দায়িত্ব নয়, জাতীয়-কর্তব্যও। মহাভারতের যুগেও এই কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সঞ্জয় এক আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের চরম মুহূর্ত, যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে তিনি কেবল সংবাদদাত'-পর্যবেক্ষকের ভূমিকা ছেড়ে যুদ্ধের অসি তুলে নিয়েছিলেন হাতে। তাঁর এই আদর্শ একালের সকল সাংবাদিকেরই স্মরণীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় মানসে রক্ষণশীল চেতনা

শিবপ্রসাদ হালদার

খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার, রামমোহন রায়ের ধর্ম সংস্কার তথা বৈদান্তিক একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা প্রয়াস, হিন্দু কলেজ ও ডিরোজিয়োর সংস্কার মুক্তির প্রেরণা, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর বৈপ্লবিক চিন্তাদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ জীবনের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করিয়াছে, তেমনি তাহার প্রতিক্রিয়ায় এ দেশীয় রক্ষণশীল সম্প্রদায় বিপুল প্রয়াসে সর্ববিধ শক্তি সংহত করিয়া এই প্রগতিশীল ও বিরুদ্ধ ধর্মচিন্তার সম্মুখীন হইতে চাহিয়াছে। উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস মূলতঃ ধর্মান্দোলনের এই বিভিন্ন ধারাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। রামমোহন রায় যখন মিশনারীদের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন রক্ষণশীল নেতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের সহিত যুক্ত হইয়া 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশে তৎপর হইয়াছিলেন। কিন্তু যে দাবানলের বার্তাবহ রামমোহন রায়, তাহাতে শতাব্দীর অরণ্যের শুষ্ক ও জীর্ণ দ্রুমরাজিও যে ভস্মীভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। রামমোহন রায় যখন এদেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিমার্জনা ও অনুশীলন সুরু করিলেন, তখন রক্ষণশীল সম্প্রদায় তাঁহার সহিত মতৈক্য রাখিতে পারেন নাই। 'সম্বাদ কৌমুদী'র সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ভবানীচরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ করিলেন। বলিতে গেলে সমাচার চন্দ্রিকাই সেই যুগের রক্ষণশীল সমাজের মুখপত্র ছিল এবং ইহার মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচার বা রামমোহন রায়ের কর্মপন্থার উগ্র বিরোধিতা প্রকাশ পাইত।

আবার রামমোহন রায় এ দেশীয় ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব হইয়া যে এতখানি অনাচার প্রকাশ করিবেন, ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন নাই। হিন্দু সমাজের একটি জঘন্য সংস্কার সতীদাহ প্রথাকে সম্মুখে রাখিয়া এই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। রামমোহনের উপযুক্ত নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ একটি সবল রূপ ধারণ করে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান সুরু করেন। তাহার ফলে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি রাজবিধি রচিত হয়। তাহাদের মধ্যে বলা হয়, সহগমনার্থিনী বিধবাকে প্রথমে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বা রাজপুরুষের নিকট অনুমতি পত্র লইতে হইবে। ইহার প্রতিবাদে হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকে রাজদরবারে আবেদন করিলেন। এই সময়ে রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। (১) রক্ষণশীল দলের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদে অগ্রণী হইয়া হিন্দু সংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইলেন। রামমোহনের 'সংবাদ কৌমুদী' এবং ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তুমুল বাদানুবাদ সুরু করে। রামমোহনের অগ্রগামী চিন্তা রক্ষণশীলদের নিকট ধিকৃত হইল। পথে প্রান্তরে তাঁহার কুৎসা রটনা চলিতে লাগিল, ইসকুলের ছেলেদের মুখে মুখে তাঁহার নামে ব্যঙ্গাত্মক গান শোনা যাইতে লাগিল : (২)

স্বরাই মেলের ফুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল
বেটা সর্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল,
ও সে জাতের দফা, করলে রফা
মজালে তিন কুল।

এই ধর্মান্দোলন তথা সামাজিক আন্দোলনকে বলবৎ করিবার জন্য স্বপক্ষে বিপক্ষে একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। ধর্মান্দোলনের ধারায় গৌড়ীয় সমাজ, একাডেমিক এসোসিয়েশন ব্রহ্ম সভা, একের পর এক নিজস্ব creed লইয়া গঠিত হইতে লাগিল। ধর্মান্দোলনের সহিত সেদিন আরো নানা প্রশ্ন জড়িত ছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও তাহার যৌক্তিকতা, নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান, স্বশাস্ত্র ও ধর্মের সংরক্ষণ ও তাহার পরিমার্জনা প্রভৃতি বহুমুখী চিন্তাকে কেন্দ্র করিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেকটির একটি বিশিষ্ট ভাবধারা ও কর্মসূচী ছিল। সেই যুগের চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদগণ ইহাদেরই ছত্রতলে সমবেত হইয়াছিলেন। আবার গৌড়ীয় সমাজের মত প্রতিষ্ঠানে যেখানে রক্ষণশীলদের স্বার্থরক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রগতিশীল নেতাদেরও যাতায়াত চলিত। গৌড়ীয় সমাজ যে একটি পুরোপুরি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান একথা অনুষ্ঠান পত্রে স্পষ্ট করিয়া বলা হয়। (৩) আবার খৃষ্টানী অপপ্রচার হইতে স্বধর্মরক্ষার জন্য শাস্ত্র গ্রন্থাদির সংকলন ও অনুবাদ প্রকাশও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। (৪) ইহার শিক্ষাত্মক দিকটির উপর প্রাধান্য দিয়া অন্যতম সদস্য রসময় দত্ত বলিলেন, "এই সভায় যদি কেবল বিদ্যা বিষয়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করা হয় তবে আমি ইহার মধ্যে আছি আর যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে ও আমারদিগের ধর্ম-শাস্ত্রের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তবে আমি তাহার মধ্যে নহি।" (৫) তবে ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা যে ইহাতে আসিয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ ছিল না। সেদিনের কোন আলোচনা বা বিতর্ক তদানীন্তন দেশ কালের চিন্তাধারাকে পরিহার করিতে পারে নাই। সেইজন্য উক্ত উক্তির সহিত অন্য উক্তিও ছিল। ইহার সদস্য উমাচরণ ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "আমারদিগের ধর্মশাস্ত্র নিন্দা করিয়া যদ্যপি কেহ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করে তাহার উত্তর অবশ্যই লিখিতে হইবেক।(৬) এইরূপ উভয় ধারার চিন্তা ছিল বলিয়াই বোধ করি ইহার মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তীর মত রামমোহনপন্থীদের এখানে সাক্ষাৎ মিলিত আবার রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি সনাতনপন্থীগণও এখানে জমায়েত হইতেন। একাডেমিক এসোসিয়েশনের মধ্যে সবুজ পত্রের যে সমারোহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, গৌড়ীয় সমাজে তাহাই দ্বিদল পত্রে বিভক্ত হইয়া নবীন ও প্রবীণকে সংযুক্ত করিয়াছিল।

পর পর কয়েকটি কার্যধারায় নবীন প্রবীণের স্নায়ুযুদ্ধ বিস্ফোরণের সম্মুখীন হইল। ডিরোজিওর সংস্কারনাশী দীক্ষায় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে নব্য শিক্ষিত সমাজ হিন্দুধর্মের কালাপাহাড় রূপে পরিগণিত হইলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহন কর্মসূচীর পরিণতি আনিলেন 'ব্রহ্ম সভা' স্থাপনে। হিন্দু সমাজ গভীরভাবে বিচলিত হইল। একমাত্র ভরসা রহিল রাজদ্বারে আবেদন—

সতীদাহ প্রথাকে তাঁহারা রহিত করিবেন কিংবা সংরক্ষণের অনুমতি দিবেন। রক্ষণশীল সমাজের মৃত্যুবান আসিল ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বেন্টিঙ্কের ঘোষণা :

"It is hereby declared, that after the promulgation of this regulation, all persons convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a Hindu widow by burning or burying her alive, whether the sacrifice be voluntary on her part or not, shall be deemed guilty of culpadle homicide and shall be liablo to punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment." (৭)

সতীদাহ প্রথা নিরোধে বেন্টিঙ্কের এই ঘোষণায় হিন্দু সমাজ বিপন্ন বোধ করিলেন। ইহার বিরুদ্ধে একটি সবল আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য এ দেশীয় রক্ষণশীল সমাজ অগ্রসর হইলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী 'ধর্ম সভা' প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার সভাপতি হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব এবং সম্পাদক হইলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার প্রথম অধিবেশনে বেন্টিঙ্কের ঘোষণার তাৎপর্য আলোচিত হইল। গভর্ণর বাহাদুর সতী নিবারণের যে আইন প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা রহিত হইবে না। যদি এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করিবার থাকে, তাহা হইলে বিলাতে রাজসমীপে আবেদন করিতে হইবে। (৮) সংস্কারান্ধ সদস্যবৃন্দ ইহার মধ্যেও ক্ষীণ আশার আলোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল রাজসমীপেই আবেদন করিতে হইবে। তবে ইহার সহিত যেন আরও প্রার্থনা থাকে, যে পর্যন্ত না আবেদন মঞ্জুর হয়, ততদিন পর্যন্ত ঐ প্রথা যেন প্রচলিত থাকে। শুধুমাত্র এই প্রথার বিরুদ্ধেই যে ধর্মসভার সিদ্ধান্ত ছিল, তাহা নহে। ধর্ম শাসন কর্তৃত্বাভাবে সাধারণভাবে যে ধর্মহানি ঘটিতেছে, তাহা হইতে স্বধর্ম, সদাচারও সদ্ব্যবহারাদি রক্ষার জন্য পন্থা নিরূপণও ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। (১০) ইহার জন্য ধর্মসভার নির্দেশ অত্যন্ত কঠোর ছিল। স্বধর্মত্যাগী হিন্দুদের সহিত সামাজিক সংযোগ বর্জন করিতে হইবে, এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। (১১)

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নিরপত্তা রক্ষণের এই ভূরি প্রমাণ আয়োজনকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি হইতে দেখিলে একান্ত ব্যর্থ বলিতে হয়। বিধর্ম চেতনার প্রসার ও স্বধর্ম আচরণের নিষ্ঠাহীনতা হইতে আত্মত্রাণ করিবার জন্য তাঁহারা হিন্দু সংস্কৃতিকে নির্বিবাদে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানরাশিকে তাঁহারা অনেকেই অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারই অনিবার্য পরিণতিকে যুবসম্প্রদায় যখন সংশয়বাদী হইয়া উঠিতে লাগিল, তখনই তাঁহারা প্রমাদ গণিলেন। একটি প্রবল বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাব ও একটি দেশজ উচ্ছৃঙ্খলতা ও উৎকেন্দ্রিকতা তাঁহাদের গভীরভাবে বিচলিত করিয়াছিল। সেইজন্য হিন্দুধর্ম নামাঙ্কিত যেকোন রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারকে তাঁহারা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। এই অর্থে ইঁহারাও চরমপন্থী তবুও ইঁহাদের রচনা ও আলোচনার মধ্যে হিন্দুধর্মের বিশেষ কোনদিক পরিলক্ষিত হইয়াছিল কিনা তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন।

রাজা রাধাকান্ত দেব ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের পুরোধা ছিলেন। ইঁহারা যে বিশুদ্ধ ভক্তিবাদকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা নয়। ধর্মচেতনাকে ইঁহারা কোন

আন্তরবিশ্বাস দিয়া গ্রহণ করেন নাই। ধর্মের পথে ইহারা traditionকেই গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য সনাতন ধর্মের প্রতি যে সামাজিক নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন এবং পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রতি যে আস্থা থাকা প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা দেখাইতে চাহিয়াছেন। সনাতন ধর্ম ও পৌরাণিক ধর্ম এক বিমিশ্র রূপ লইয়া লোকমানসে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহাই বিচিত্র আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে আচরণীয় হইয়াছিল। সেই আচরণ রীতিকে ইহারা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। একদিকে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার কার্যে অগ্রণী হইয়া তাঁহাদের অনেকে যেমন প্রগতিশীল চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি অনেকে সংস্কারের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য জানাইয়া মনে-প্রাণে রক্ষণশীল রহিয়া গিয়াছেন।

ধর্মবোধের কোন উজ্জীবন কার্যে রাধাকান্ত দেবের কর্তব্য নিয়োজিত হয় নাই। শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক কর্মেই তিনি অগ্রণী ছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই তিনি ইহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রথম অবস্থায়—১৮১৬ সনে কলেজ স্থাপনের জল্পনা হইতে ১৮৩১ সনে ডিরোজিওর কলেজ ত্যাগ পর্যন্ত—বিবিধ ঝড় ঝঞ্ঝা হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। কলেজের ছাত্রদের কৃতিত্বে তিনি আনন্দিত হইতেন। কিন্তু তাহাদের উগ্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। ইহাকে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মনে করিতেন। প্রাচীন আচার ব্যবহার রীতিনীতি পূজাপার্বণের উপর হিন্দু কলেজের যুবক ছাত্রগণের বীতরাগের এবং বিদেশী রীতিনীতি গ্রহণের বহু দৃষ্টান্ত আছে। (১২) তিনি সেগুলি সমর্থন করিতে পারেন নাই। খৃষ্টান পাদরীদের প্রচারক্রিয়ায় যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, রাধাকান্ত দেবের মধ্যে তাহারই প্রকাশ ঘটিয়াছে। এইরূপ প্রতিক্রিয়ায় এক একজন মনীষী এক এক দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। রামমোহন ধর্ম সংস্কৃতির মার্জনা করিতে চাহিয়াছেন, রাধাকান্ত দেব সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ঘটাইয়া এ দেশীয় জনসাধারণের দৃষ্টি প্রাচীন শাস্ত্র ও ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ধর্ম সভার মত প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া তিনি যেমন দেশীয় সংস্কার ও আচার নিয়মকে সংরক্ষণ করিতে চাহিয়াছেন, তেমনি 'শব্দকল্পদ্রুম' রচনা করিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় পথিকৃৎ হইয়াছেন। ম্যাক্সমুলারের নিকট পত্রে তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"My industry and application will, at least, be applauded when I may be considered as a humble pioneer of Sanskrit learning." (১৩)

সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন শাস্ত্র সংহিতাকে গভীর মূল্য দিয়াছেন। ম্যাক্সমুলার ঋকবেদের অনুবাদ প্রকাশ করিলে তিনি ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সতীদাহ প্রথা সমর্থনে রাধাকান্ত দেব শ্রুতির প্রত্যক্ষ অনুশাসনকে গ্রহণ করেন নাই। ম্যাক্সমুলার অনুমান করেন,

"The cnstom seems to have arisen with the warrior caste, and I still feel inclined to think that in its origin it was voluntary and arose from blind, Passionate love, and a strong belief in an immediate meeting again in a better world. (১৪)

এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিগ্রহ ক্রমে ক্রমে ট্র্যাডিশন হইয়া দাঁড়ায়। ইহাকে শাস্ত্রীয় অনুশাসন করিবার জন্ম পণ্ডিতকুল বেদের কোন লুপ্ত অধ্যায়ের-উল্লেখ করেন। রাধাকান্ত দেব যুক্তিপন্থী হইলে নিশ্চয় ইহা সমর্থন করিতেন না। সনাতনপন্থী হইয়া তিনি এই সংস্কারকেও বেদসমর্থিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (১৫)

ম্যাক্সমুলার রাধাকান্ত দেবকে 'conservative of the purest water' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার জন্যই তিনি সর্বপ্রকার প্রাচীন রীতিকে অন্ধ ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। সমসাময়িক কালের বিচারে প্রভূত প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় দিয়া তিনি অদ্ভুত রক্ষণশীলতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে যুক্তি জ্ঞান ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, রাধাকান্ত দেব সে দিক দিয়া যান নাই, লোকাচার ও লোক সংস্কারের সবল প্রতিভূ হইয়া দুর্বল কারণের জন্ম আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা স্মরণ করা যাইতে পারে। রামমোহনের সহযোগী ও প্রতিযোগী, হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষক ও পরিপোষক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের একজন বিদগ্ধ মনীষী। রামমোহনের সহিত চিন্তার সাধর্ম অনুভব করিয়াই তাঁহার সহিত যুক্তভাবে 'সংবাদ কৌমুদী' সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন। খৃষ্টান মিশনারীদের হিন্দু বিদ্বেষের প্রতিরোধে রামমোহন যখন সচেষ্ট হইলেন, তখন ভবানীচরণ তাঁহার সহিত একমত হইতে দ্বিধা করেন নাই। পরে সংবাদ কৌমুদীর সহিত সংস্রব বর্জন করেন। ইহার মূলে তাঁহার স্বতন্ত্র মনোভঙ্গীই দায়ী। সংবাদ কৌমুদীর অন্যতম সহকারী হরিহর দত্ত সহগমন প্রথার প্রতি বিরূপ সমালোচনা করিলে তিনি ধর্মহানীর আশঙ্কা দেখিয়াছিলেন। (১৬) রামমোহন ও রামমোহনপন্থীদের এই সংস্কার রীতিকে তিনি সমর্থন করেন নাই। সেইজন্য ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বতন্ত্রভাবে সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ করিলেন। নব্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় যখন হিন্দু কলেজের শিক্ষা দ্বারা বা মিশনারীদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া স্বধর্ম সম্বন্ধে বীতরাগ হইয়া পড়িতেছিল, তখন সমাচার চন্দ্রিকাই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের নিকট হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য তুলিয়া ধরিয়াছিল। একদিকে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও অন্যদিকে দেশধর্মে অনাস্থা এই উভয়বিধ সংঘাত হইতে স্বধর্ম রক্ষার জন্ম ভবানীচরণ আরও সক্রিয়তা ও সাবধনতা অবলম্বন করিলেন। ইহার ফল হইল ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা। এই সভার ছত্রতলে সেদিন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ ইহার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বকর্ম প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।

সমাচার চন্দ্রিকা সম্পাদনা বা ধর্ম সভার প্রতিষ্ঠার মত প্রতিষেধক ব্যবস্থা করিয়াই ভবানীচরণ ক্ষান্ত হন নাই। সমাজের নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করিবার জন্ম তিনি শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজিরও প্রকাশ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন, "প্রবল জলোচ্ছ্বাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে যেমন পদতলে শক্ত মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হয়, তিনিও সেইরূপ প্রতীচ্য ভাব সজ্ঘাতের সর্বনাশা প্রভাব হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্ম সনাতন সামাজিক আদর্শকেই একমাত্র অবলম্বনরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।" (১৭) ইহার

জন্য তাঁহার অনেক প্রয়াস হাস্যকর বলিয়াও মনে হয়। তুলট কাগজে গ্রন্থ মুদ্রণ এবং ব্রাহ্মণ কর্মচারী দ্বারা মুদ্রণ কার্য সম্পাদন ভবানীচরণের গোঁড়া হিন্দুয়ানীরই পরিচয় দিয়াছে।

পুরাণোক্ত তীর্থমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়া ভবানীচরণ বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। এইরূপ তীর্থ মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি 'শ্রী শ্রী গয়া তীর্থ বিস্তার' রচনা করিয়াছেন। সমাচার চন্দ্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়, এই তীর্থ মাহাত্ম্যে বায়ু পুরাণের সহিত ঐক্য রক্ষা করা হইয়াছে এবং ইহা উক্ত তীর্থবাসীদের মহদুপকার সাধন করিবে। (১৮) অনুরূপ ভাবে তিনি শ্রীক্ষেত্রধামের বিবরণ লিখিয়াছেন—'পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা'। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের মুদ্রণে তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা, উনবিংশ সংহিতা, শ্রীভগবদগীতা, রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি ইত্যাদি মুদ্রিত করিয়া তিনি হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও পোষক বলিয়া নিসংশয়ে গৃহীত হইয়াছেন। পৌরাণিক সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে যে আচাররাজি সংহিতা ও স্মৃতি গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে, তাহা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ জীবনে পুনঃ সঞ্চারিত করা যায় কি না তাহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এক্ষেত্রে তিনি রামমোহনেরই অনুবর্তী। তবে উভয়ের মত ও পথে পার্থক্য ছিল। রামমোহন যুক্ত চিন্তার আলোকে উজ্জ্বল করিয়া শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি তাহা করেন নাই; তিনি তদরূপেই সেগুলিকে দেখিয়াছেন, তাহাদের পুরাতন টীকাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। শতাব্দীর জীবন ধারায় পঙ্কলিপ্ত হইলেও তাহাদের পরিমার্জনা তিনি বোধ করেন নাই। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে এই রক্ষণশীল ভাবধারার আরও একজন পরিপোষক হইলেন ঈশ্বর গুপ্ত। রামমোহন, ভবানীচরণ কিংবা রাধাকান্ত দেবের মত তিনি যে কোন একটি মনোভাব পোষণ করিতেন না, ইহা সত্য কথা। তিনি স্বগোত্রেই পৃথক ছিলেন। তিনি মূলতঃ সাহিত্যিক, সমাজনেতা নহেন। সংবাদ প্রভাকর পরিচালনা করিয়া, সামাজিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া, ব্রাহ্ম ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া ঈশ্বর গুপ্তের বিশিষ্ট মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার জীবনে দুইটি দিক লক্ষ্য করা যায়—প্রথম দিকে উগ্র রক্ষণশীল এবং শেষ দিকে দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে উদারপন্থী। (১৯) মিশনারীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সেদিন যে রক্ষণশীল সম্প্রদায় অগ্রসর হইয়াছিল, ঈশ্বর গুপ্ত তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। বিধর্ম প্রচারের উগ্রতায় মাঝে মাঝে এ দেশের প্রবীণ ও নবীন সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া সম্মিলিত অভিযান করিয়াছেন। সেইজন্য ধর্মসভা যেমন খৃষ্টানী অপপ্রচারের সবল প্রতিরোধ রচনা করিয়াছে, তেমনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও তাহা নিরোধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের সম্মুখে এই সামাজিক আন্দোলনটি বর্তমান ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তিনিও ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া পরিয়াছিলেন। সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় ধর্মান্তরিত হিন্দুকে স্বধর্মে ফিরাইয়া আনা যায় কিনা, সে কথাও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। (২০)

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার সামাজিক প্রতিক্রিয়া ঈশ্বর গুপ্ত নির্বিবাদে মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না সত্য কথা, কিন্তু সেই শিক্ষা এ দেশের অন্তঃপুরিকাদেরও যখন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, তখন তিনি তাহাকে উত্তোলিত হস্তে অভিনন্দিত করিতে পারেন নাই। হয়ত এই শিক্ষা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ভারসাম্য রক্ষা করিবে, উৎকেন্দ্রিকতা আনিবে না, তাহাই তিনি চাহিয়াছিলেন; কেননা সংবাদ প্রভাকরে তিনি স্ত্রী

শিক্ষার সমর্থনও করিয়াছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্ত অনেক পরের কথা আগে চিন্তা করিয়াছেন। যে শিক্ষা ও রীতি নীতি ক্রমে ক্রমে একটি বিজাতীয় রীতি সংস্কৃতির মর্মে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত সুসহ সামঞ্জস্য বিধান করিবে, তাহা প্রথম দিকেই হইবার নহে। ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম দিকে সেই জিনিষই দেখিতে চাহিয়াছেন আর তাহা দেখিতে পান নাই বলিয়া তাঁহার ক্ষোভ, তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম বোধের একটি দার্শনিক ভিত্তি নির্ধারণ করা যায়। সাংসারিক দাবদাহে মানুষ যখন বিপুল আর্তি লইয়া বিশিষ্ট পথে অধ্যাত্মবিশ্বাসের দিকে আগাইয়া যায়, তখনই একটি বিশেষ সাধন মার্গের সৃষ্টি হয়। ইহা সকল সময় সচেতন প্রযুক্ত নাও হইতে পারে। আমাদের মনে হয় ঈশ্বর গুপ্ত সচেতনভাবে এইরূপ কোন সাধন মার্গের পথিক ছিলেন না। তবুও তিনি নিষ্ঠুর সংসার চক্রে নিষ্পেষিত, উত্তাল সংসার সমুদ্রে নিমজ্জমান, ভীষণ সংসারারণ্যে পথভ্রষ্ট এবং ক্ষণস্থায়ী সংসার নাটকের মিথ্যা সাজধারী মানবকে সেই পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে অনুপ্রাণিত করেন, তখন তাহার একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।" (২১) বস্তুতঃ রামপ্রসাদের মত গভীর আর্তি ঈশ্বর গুপ্ত জাগাইতে পারেন নাই সত্য, তাহা ও তাঁহার ভক্তিবাদে আন্তরিকতার অভাব দেখা যায় না।

এই পিতৃভাবে উপাসনার উৎস কোথায়, তাহা লইয়া অনেকে আলোচনা করিয়াছেন। পিতৃভাবে উপাসনার রীতি খৃষ্ট ধর্মে আছে। ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষে তাহার দ্বারা প্রভাবিত না হওয়াই স্বাভাবিক। অধ্যাপক ত্রিপুরাশংকর সেন অনুমান করেন ব্রাহ্ম ধর্মের উপাসনা পদ্ধতিতে যে পিতৃভাবে প্রার্থনার কথা আছে, তাহাতে প্রভাবিত হইয়া তিনি নিখিল বিশ্বের জনকরূপে ঈশ্বরের ভজনা করিয়াছেন। (২২)

বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মবোধটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পারমার্থিক কবিতায় নির্গুণ ও নিরাকার ঈশ্বর সম্বন্ধে এত বেশী উল্লেখ আছে যে, এ বিষয়ে তাঁহাকে মহর্ষির অনুগামী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।' (২৩)

ঈশ্বর নিখিল বিশ্বের জনক, মানব তাঁহার পুত্র—একাধারে এই অদ্বয় বোধ ও দ্বৈত চেতনাই ঈশ্বর গুপ্তের সাধনতত্ত্ব। এইরূপে "দর্শনের দিক থেকে ঈশ্বর গুপ্ত কৈবল্যদ্বৈতবাদীও নন, কিন্তু সাধারণ ভক্তিবাদিগণের ন্যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। সংসারাবস্থায়, জীবকে ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন বোধ হলেও জীব সর্বদাই ব্রহ্ম স্বরূপ, ব্রহ্মসত্তাময়, ব্রহ্মাত্মক। অপর পক্ষে মোক্ষাবস্থায়, জীবকে ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে বোধ হলে ও জীব সর্বদাই স্বীয় জীবসত্তা, পার্থিব সংকীর্ণ জীবসত্তা নয়, শাশ্বত, পরিপূর্ণ, প্রকৃত পরমার্থিক জীবসত্ত্বা রক্ষা করে চলে। সেজন্য বন্ধ, মোক্ষ সর্বাবস্থাতেই ব্রহ্ম ও জীব জগৎ ভিন্ন ভিন্ন ভক্তিবাদমূলক বেদান্তের এই মতবাদ ঈশ্বর গুপ্তেরও মতবাদ।" (২৪)

ঊনবিংশ শতকের সমাজ ও ধর্মের গভীর আলোড়নে স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া ঈশ্বর গুপ্ত এইরূপ এক সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক বিশ্বাস রাখিয়াছেন। ভবানীচরণ, রাধাকান্ত দেব নেতিবাচক কর্মসূচীতে যে

প্রতিরোধের প্রাচীর তুলিয়াছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তের অবরোধ তাহা অপেক্ষাও সুদৃঢ়। সমসাময়িক কালের বিবিধ ধর্মচিন্তা সুপরিকল্পিত উপায়ে যখন বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত তখন একান্তে থাকিয়া স্বমার্গে সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের বহু কেন্দ্রিক সাধনা; তাঁহার প্রখ্যাত শিষ্যকুল তাঁহারই পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়া পরবর্তী কালের সারস্বত সমাজে বরণীয় হইয়াছে, কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতিতে তিনি নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক। ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও এই উপলব্ধি তাঁহার ব্যক্তিগত। কোন প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের নৈষ্ঠিক অনুসরণে নয়, হৃদয়ানুভূতির আলোকেই তিনি ঈশ্বরকে বুঝিতে চাহিয়াছেন।

ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মনোভাবকে সমগ্র ভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহারা সনাতন ধর্ম ও রীতি নীতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কোন বিশিষ্ট যুক্তিবাদ বা ভক্তি বাদের ধার দিয়া তাঁহারা যান নাই। হিন্দুধর্মকে আচার নিষ্ঠার দিক হইতে কতখানি রক্ষা করা যায়, তাহাই মূলতঃ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে ধর্মের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি পরিলক্ষিত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতৃবর্গ ধর্মকে শুদ্ধাচার ও সদাচার দিয়া গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। ইয়ং বেঙ্গল প্রবল অমিতাচার ও সংশয় চেতনা লইয়া তুলাদণ্ডের একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও তেমনি অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কার লইয়া অন্য দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই উভয় ধারার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করিয়া যে ধর্মান্দোলনের বিশেষ রূপটি দেখা যায়, তাহাই ব্রাহ্ম আন্দোলন। উনবিংশ শতাব্দীতে পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রবল চেতনা।

১, ২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। ২য় সং। শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ৬৬

৩, ৪। বাংলার নব্য সংস্কৃতি—যোগেশচন্দ্র বাগল পৃঃ ৪

৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। Regulation of 4th December, 1829

১২। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। যোগেশচন্দ্র বাগল পৃঃ ৫৫

১৩, ১৩, ১৫। Rammohan to Ramkrishna—Max Muller P 37

১৭, ২৩। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সা, সা, চ।—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩১

১৯। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত পৃঃ ৪৫-৪৭

২০। "চন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন। পরে তিনি আবার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। আশা করা হইয়াছে যে এই বিধান দ্বারা মিশনারিদের প্রভাব রোধ করা যাইবে।—সংবাদ প্রভাকর ২৫ আশ্বিন ১২৬১, মিশনারি। সম্পাদকীয়।

২১। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী—বসুমতী সংস্করণ ভূমিকা

২২। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশংকর সেন পৃঃ ৪৫

২৪। কবি ঈশ্বর গুপ্ত স্মারকগ্রন্থ—ডঃ রমা চৌধুরী পৃঃ ৭৩

বটবৃক্ষমূলে

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

'একদিন সন্ধ্যার সময়, সালিকাগ্রাম হইতে কলিকাতায় আগমনকালে, এক বটবৃক্ষমূলে এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি।' উনবিংশ শতাব্দীর একটি মঞ্চসফল নাটকের মুদ্রিত ভূমিকা পড়ছিলাম। নাটকটি অভিনীত হয়েছিল বিডন স্ট্রীটের নাট্যশালায়। সালিকা গ্রাম বলতে এখানে গঙ্গার ওপারে 'সালিখা' বা 'সালকে' বোঝাচ্ছে বোধ হয়। সালকে থেকে গঙ্গা পেরিয়ে এপারে আসার ঘাট তখন আহিরীটোলায়। আর আহিরীটোলা থেকে বিডন স্ট্রীট যাবার পথেই বিখ্যাত বটতলা। ছেলেবেলার ছড়ায় আমরা জানি যাকে ভাজা চাল বলি তারই নাম মুড়ি। সাধুভাষার ভক্তরা যে সে যুগে খয়েরকে 'খদির' বলতেন এ ব্যঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রও করেছেন। তাই বোধহয় নাটকটির সাধুভাষার ভূমিকায় বটতলা হয়েছে বটবৃক্ষমূলে।

নাটকটির নাম 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'। একদা মঞ্চসফল। এ ছাড়াও অন্যান্য বহুবিধ কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই তুচ্ছ নাটকটির নাম জড়িয়ে রয়েছে। নাটকটির লেখকও ভূমিকা-লেখক মঞ্চাভিনেতা ও প্রযোজক উপেন্দ্রনাথ দাস। বহুবাজারের শ্রীনাথ দাস লেনের নাম আমাদের পরিচিত। শ্রীনাথেরই অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল পুত্র উপেন্দ্রনাথ। বিচিত্র চরিত্র এই অবাধ্য যুবকের। এর আগে তিনি একটিমাত্র নাটক লিখেই 'বিখ্যাত'। তবে সেটি রচিত হয়েছে দুর্গাদাস দাস ছদ্মনামে। সে হিসেবে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' তাঁর প্রথম স্বনামে প্রকাশিত বই। উপেন্দ্রনাথ সেকালের ধনী পুত্রের স্বাভাবিক সখ মঞ্চাভিনয়ে উৎসাহী ছিলেন। সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য দোষও ছিল। উপেন্দ্রনাথের এক 'বিধবা বিবাহ' সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মচরিতে সরস বর্ণনা রেখে গেছেন। উপেন্দ্রনাথের পিতা পুত্রের মুখ দেখবেন না পণ করেছিলেন। পরে উপেন্দ্রনাথের বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীর বিনীত অনুরোধে মৃত্যুশয্যায় উপেন্দ্রনাথ পিতৃমুখ দেখতে পেয়েছিলেন। শ্রীনাথকে রাজী করিয়েছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

উপেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন আমাদের আলোচ্য নয় তবু বর্তমান নাটকটির 'নাট্যকার' উপেন্দ্রনাথের পরিচয় হিসেবে উপরিউক্ত তথ্যের ইঙ্গিত করলাম। কৌতূহলী পাঠক শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, ইন্দ্র মিত্রের 'সাজঘর' এবং সূত্রধারের 'অঘটন ঘটিত' গুলো পড়ে দেখতে পারেন।

রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী সংগ্রহের প্রসঙ্গটি বাংলাদেশে একটি বিতর্কিত অধ্যায়। সেকালের হিসেবে অভিনেত্রী আনতে গিয়ে বাধ্য হয়ে পতিতা সংগ্রহের শেষ ছিল না। বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম যখন অভিনেত্রী আনার প্রস্তাব করে থিয়েটারের পাশে দর্শকদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য ক্যান্টিন গড়েছিলেন দরমা ঘিরে, তখন নিন্দুকেরা তাকে বলতেন আঁতুর ঘর।

উপেন্দ্রনাথ দাস এমনি একটি অভিনেত্রী এনেছিলেন। নাম গোলাপকামিনী বা গোলাপী। উপেন্দ্রনাথের প্রথম নাটক শরৎ সরোজিনীতে সুকুমারীর ভূমিকাতে অভিনয় করে গোলাপী বিখ্যাত হন। নাম হয় সুকুমারী। এছাড়াও সুকুমারীর অন্যান্য গুণে উপেন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

উপেন্দ্রনাথের আয়োজনে এ সময় অভিনেত্রী গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে সুকুমারীর বিয়ে হয়। ১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

আমি যথাসাধ্য মূল বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে সারলাম। এর ঘটনার আড়ালেও ব্যাপার ছিল কিছু। পরে সুকুমারী দত্তের লেখিকা পরিচয়ও আমরা পাই। সে যাক্, সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকে বিনোদিনী চরিত্রে অভিনয় করে সুকুমারী।

বাংলা নাটকে উপেন্দ্রনাথ 'মনোহর' ('রোমান্টিক' অর্থে) পর্ব আনলেন। এর জন্য ছিল খুন-জখম-মারপিট, বন্দুক, সাহেব অত্যাচার, হত্যার মশলা। জনসাধারণ এই উত্তেজনা উপভোগও করেছিলেন, নাটকগুলোর অভিনয় জনপ্রিয় হতে দেখে তাই মনে হয়। নাটকে খুন জখম দেশপ্রেমের বান ডাকিয়ে জনপ্রিয়তার এই সস্তারূপ অন্যান্য নাট্যকাররা বটতলায় নিতে শুরু করেন। এ সময় প্রমথনাথ মিত্র তার 'নগ নলিনী' নাটকে এ পথ ত্যাগ করেছিলেন তবু তাঁর নাটক দ্বিতীয় সংস্করণে পা দিয়েছিল এই গর্বে তিনি বিজ্ঞাপনে 'উপেন্দ্রনাথ দাসের জনপ্রিয় নাটক দুইটিকে লক্ষ্য করিয়া' লিখেছিলেন—"পাঠকগণ! নগনলিনী নাটক মধ্যে 'জয় ভারতের জয়' নাই 'পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ' 'দুরাচার যবন' নাই 'হায় স্বাধীনতা!' নাই, ফোর্ট' 'উইলিয়াম' নাই, পিস্তল, বন্দুক, লাঠি, প্রভৃতি কিছুই নাই,—ইহারও যে আবার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

বস্তুত বাংলা নাটকের ইতিহাসে উপেন্দ্রনাথ দাসের দুটি নাটক শরৎ সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী একটি 'যুগ' না হলেও একটি 'হুজুগ' তো সৃষ্টি করেছিল। খুন, জখম, রক্ত, মারপিট, সাহেব ঠ্যাঙানি ইত্যাদি বর্ণনার নাটক দুটি বাঙালীর অবদমিত স্বদেশ প্রেমকে দানা বাঁধতে ও তৃপ্ত হতে সাহায্য করত বোধ হয়। পরে উপেন্দ্রনাথের নকলে অজস্র এধরনের নাটক রচিত ও অভিনীত হতে থাকে। উপেন্দ্রনাথ কিন্তু আর এ পথে পা বাড়ান নি। 'দাদা ও আমি' নামক একটি প্রহসন এ বিষয়ে তাঁর শেষ কীর্তি আর নাট্য রচনায় তাঁকে পাই না। কিন্তু মঞ্চের ডিরেকটার হিসাবে উপেন্দ্রনাথ দর্শকদের চাহিদা কি যে বস্তু একনজরে বুঝতে পেরেছিলেন একথা কম নয়। উপেন্দ্রনাথের নাটকে স্বদেশপ্রেম ছিল জনপ্রিয়তার চাঁদমারি লক্ষ্য করে। অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। নাটককে জনপ্রিয় করার জন্য খুন জখম সাহেব হত্যা ইত্যাদি। মূলতঃ সুরেন্দ্র বিনোদিনী বটতলার সরস কথ্য ভঙ্গীরই ফসল। এ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ভূমিকাটির আবার স্মরণ নেওয়া দরকার। বটতলায় কুড়িয়ে পাওয়া পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সেখানে উপেন্দ্রনাথ দাস লিখছেন। "পুস্তকখানি (পাণ্ডুলিপিখানি) কিরূপ, দ্বিপদ, বা চতুষ্পদ, তাহা দেখিবার জন্য একবার অর্ধ্যদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলাম। বাবুটি অতি ভদ্র ও সদ্বিবেচক। তিনি পুস্তকখানি উন্টাইয়া পান্টাইয়া দণ্ডত্রয় ঘোর চিন্তা করিয়া, গম্ভীর ভাবে কহিলেন 'মন্দ নহে।' 'কি মজার শনিবার' প্রভৃতি পুস্তক অপেক্ষা নিশ্চয়ই কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ।

এখানে মনে হয়, উপেন্দ্রনাথ নাটকটি কাউকে দিয়ে (বটতলার কোন ভাড়াটে লেখককে দিয়ে) লিখিয়েছিলেন। তারপর শুভানুধ্যায়ী যোগেনবাবুকে দেখতে দিয়েছিলেন কেমন হয়েছে জানবার জন্য। বটতলায় অনান্য কোন কোন ভাড়াটে রচনা সম্বন্ধে এই ধরণেরই ইতিহাস লক্ষ্য

করেছি। সাধারণত ভূমিকায় তাঁরই নাম স্বীকার করা হত যিনি রচনায় 'সাহায্য' করতেন। এ 'সাহায্য' কি ধরণের প্রমাণ করা শক্ত বরং 'বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু'কে মেনে নিতে হয়। তবে সাধারণতঃ কোন চালু পত্রিকার সম্পাদককে দিয়েই এই কাজ করান হত। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সুযোগ্য সহঃ সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ ধরণের কিছু কাজ করেছিলেন মনে হয়।

উপেন্দ্রনাথ ভূমিকায় পরোক্ষভাবে যোগেন্দ্রনাথই সেই 'সাহায্য'কারী বলছেন বোধ হয়। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'জীবনবৃত্তান্ত' রচনার জন্য বিখ্যাত। এ সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে তাই তাঁর লেখা ম্যাটসিনি গারিবল্ডীর জীবনী চলত খুব। তাঁর বেনামী কলমে সুরেন্দ্র বিনোদিনীর পাণ্ডুলিপি বিচার খুবই স্বাভাবিক

বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত 'কি মজার শনিবার' বটতলার অন্যতম কুখ্যাত প্রহসন। লেখক চন্দ্রকান্ত শিকদার। অনেকেই বটতলার বইয়ের নমুনা হিসেবে এই বইটির উল্লেখ করে থাকেন। সপ্তাহান্তিক শনিবার (Week end) তখন ছিল বাগানবাড়ীর বেলেল্লাপনার প্রতীক। রক্ষিতা সহযোগে মদ্য মাংস মিথুনে সেযুগের বাবুরা শনিবারই বাগানবাড়ী যাত্রা করতেন ঘোড়ার গাড়ীতে। কি মজার ফ্রাইডে, বা কি মজার রবিবার ও অবশ্য এ সময়ে পাওয়া গেছে। আসলে যুগটাই ছিল 'মজার'—'সখের প্রাণ গড়ের মাঠ' বাবুদের বিকৃতি। তবে সুরেন্দ্র বিনোদিনীর গুরুত্ব সাহিত্য ইতিহাসে অন্য প্রসঙ্গে। আগেই বলেছি এ নাটকে উৎকট স্বদেশ প্রেম অজান্তে প্রচার করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ। কিন্তু তার আগে উপেন্দ্রনাথের আরেকটি নাটক অভিনীত হয়। ১৮৭৬ সালে যুবরাজ ভারতবর্ষে এসে হিন্দু-জেনানা দেখতে চান। হিন্দুজেনানা দেখান বকুলতলার জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। এ ব্যাপারটিকে ব্যঙ্গ করে উপেন্দ্রনাথ পরিবেশন করেন গজদানন্দ ও যুবরাজ প্রহসন। কর্তৃপক্ষ তখন থেকেই বিরক্ত। পরে নাম পালটে হয় 'হনুমান চরিত্র'। ১৮৭৬ সালের তেসরা মার্চ ভারত সংস্কারক পত্রিকায় জানা যায় 'ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য গজদানন্দ এবং যুবরাজ নামক যে ইতর রুচির নাটক প্রস্তুত হয়, পুলিসের রক্ত চক্ষু দেখিয়া নাট্যশাখার অধ্যক্ষগণ তাহা অভিনয় করিতে ক্ষান্ত হন। যুবরাজকে দিল্লীশ্বর হোরাঙ্গজীবের পুত্র এবং গজদানন্দকে হনুমান বলিয়া প্রকারান্তরে সেই নাটক অভিনীত হইতেছে। যাহা হউক এরূপ নাটকের জন্য গবর্ণমেন্টও মুদ্গর প্রস্তুত করিতেছেন।"

এ নাটক অভিনয় বন্ধ করার আদেশ হয়। ১লা মার্চ অভিনীত হয় সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক। সাহেব কর্তৃপক্ষ তখন জগদানন্দ প্রহসন প্রসঙ্গে ফুলছেন। কিন্তু 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' অভিনয় হয়ে গেল। ৪ঠা মার্চ হল 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্যের অভিনয়। এই গীতিনাট্য অভিনয় চলাকালীন পুলিস এসে ডিরেক্টার উপেন্দ্রনাথ দাস এবং ম্যানেজার অমৃতলাল বসু সহ আটজন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করল। রাগ গজদানন্দ প্রহসনের জন্য—পুলিস এল 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্য অভিনয়ের দিন। কিন্তু অভিযোগ জানা গেল 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র বিরুদ্ধে, তাও রাজদ্রোহাত্মক রচনা অভিনয়ের অভিযোগ নয়, অশ্লীলতার অভিযোগ।

অবশ্য সুরেন্দ্র বিনোদিনীতে হুগলী-ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘটনাটি সত্য ছিল। এর জন্যই নাকি নাটকটির অভিনয় জমেছিল। মনে হয় এ অংশে দেশপ্রেমী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ দেশপ্রেম

ছড়িয়েছিলেন সঙ্গে ছিল উপেন্দ্রনাথের খুন জখম রক্ত লাঠালাঠির বর্ণনা।

কিন্তু অভিযোগ এল অশ্লীলতার। একেই বলে পরিহাস। ৬ই মার্চ উত্তর ডিভিশনের ম্যাজিষ্ট্রেট ডিকেন্সের কোর্টে বিচার শুরু হল। ৮ই মার্চ আটজন অভিনেতা মুক্তি পেলেন। কেবল উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল শাস্তি পেলেন একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। পরদিনই তাঁরা হাইকোর্টে আপীল করলেন। ৯ই মার্চ বিচারপতি ফিয়ার ও মার্কবীর এজলাসে শুনানী শুরু হল। এটর্নী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের নির্দেশ মত ব্রানসন, এস. ঘোষ, টি. পালিত সমর্থন করলেন উপেন্দ্রনাথদের।

বিশে মার্চ হাইকোর্টের বিচারে বলা হল 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' অশ্লীল নয়। উপেন্দ্রনাথ অমৃতলাল মুক্তি পেলেন। সরকার কিন্তু সাবধান হয়ে গেছেন। নাট্যনিয়ন্ত্রণে এগিয়ে এলেন। মার্চ মাসেই কাউন্সিলে 'ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস কনট্রোল বিল' পেশ করা হল। বছরের শেষাশেষি তা আইনে পরিণত হল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন "এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসের প্রথম পর্বের সমাপ্ত হইল বলা যাইতে পারে।"

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে ঘটনাটির লক্ষ্য ছিল গজদানন্দ মার্কা প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করা কিন্তু উপলক্ষ ছিল 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'। তাই ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন "এই রূপে সুরেন্দ্র বিনোদিনীর অভিনয় বাঙ্গালাদেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে চিহ্ন রাখিয়া গেল।"

বটবৃক্ষমূল থেকে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকটি তাই ঘটনাচক্রের পরিহাসে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে রইল। নাটকটি জাত বিচারের প্রশ্ন তোলা আজ অর্থহীন কিন্তু বিদেশী শাসনের শক্ত বেড়ি যে নাটকটিকে ছল করে নাট্যাভিনয়ের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণে নামল সে নিশ্চয়ই স্মরণযোগ্য। ১৮৭৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় নাটক সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তীব্র হতাশা লক্ষ্য করা যায়। অনেক আবেদন নিবেদনও এ সময় শাসকদল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

কালের কপোলতলে উপেন্দ্রনাথ দাসের নাম আজ বিস্মৃতপ্রায়। বিনোদিনী ভূমিকাভিনেত্রী উপেন্দ্রনাথের প্রীতিধন্যা সুকুমারী দত্তকেও আজ ভুলে গেছি। শুধু পড়ে আছে বটবৃক্ষমূলে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত রূপটি যা আজ ইতিহাসের সাক্ষী। তাই সুরেন্দ্র বিনোদিনী বটতলার অন্যতম নাটক নয় শুধু, নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসেও এটি স্মরণীয়। গোড়াতে যে বলেছি ভাজা চাল মাত্রেই মুড়ি তা বোধহয় সব সময় সত্য নয়। যার মাথায় পাকাচুল তিনি কেবল বুড়ো না হয়ে বৃদ্ধ সৌম্য ঐতিহাসিক সাক্ষী তো হতে পারেন।

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

অর্ঘাভিহরণ (কৃষ্ণচরিত্র ৫র্থ খণ্ড)॥ অর্ঘাভিহরণ কথাটির অর্থ অর্ঘ চুরি। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন, তখন বহু রাজা সেখানে উপস্থিত হন। উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজাকে অর্ঘ্যপ্রদানের কথা উঠলে, ভীষ্ম প্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠরূপে অর্ঘপ্রদান ক:তে উদ্যত হন। কিন্তু রাজা শিশুপাল এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কৃষ্ণের নিন্দায় প্রবৃত্ত হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞস্থলে শিশুপালকে বধ করেন। এর পর থেকেই শ্রীকৃষ্ণের দেবমহিমা বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে দু'টি বিষয়ের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণ এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করেন। এরূপ নিকৃষ্ট কার্য গ্রহণ করার কারণ কি? ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন অথবা কৃষ্ণের বিনয়প্রকাশ! বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত, শিশুপালবধের ঘটনাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র সত্য বলেই গ্রহণ করেছেন। ভীষ্ম কৃষ্ণকে "তেজ: বল ও পরাক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ"রূপে অর্ঘ প্রদান করেছেন। কৃষ্ণ যে পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ তার প্রমাণ মহাভারতের সর্বত্র রয়েছে। আর বেদজ্ঞ বলে কৃষ্ণের যে খ্যাতি তার প্রমাণ কৃষ্ণকথিত ভাগবতের শ্লোকাবলী। বঙ্কিমের মতে বর্তমানকালে প্রাপ্ত ভাগবত কৃষ্ণরচিত নয়। তবে কৃষ্ণরচিত ভাগবতও ছিল। বর্তমানকালের ভাগবত কোন কৃষ্ণমতাবলম্বী লোকেরই লেখা।

অধঃপতন সঙ্গীত (গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক)॥ 'অধঃপতন সঙ্গীত' বাঙালী জাতির অবনতির কাহিনী। তৎকালে মদ্যপানাসক্ত কিছু কিছু বাঙালীর মধ্যে যে অবনতি দেখা দিয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তারই ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন। এখানে পরবর্তীকালের সমাজসংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। ঘরের স্ত্রীর প্রতি সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর বিরাগ এই কবিতায় এরূপ—

"ঘরে আছে পদ্মমুখী কভু না করিল সুখী
শুধু ভালবাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে।
নাহি জানে নৃত্যগীত, ইয়ারকিতে নাহি চিত,
একা বসি ভালবাসা ভাল লাগে কার?
গৃহধর্মে রাখে মন, হিত ভাবে অনুক্ষণ,
সে বিনা দুঃখের দিনে অন্য গতি নাই!
এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহি চাই॥"

অন্যত্র— "কি ছার সংসারে আছি, বিষয় অরণ্যে মাছি,
মিছা করি ভন্‌ভন্‌ চাকরি কাঁটালে।

মারে জুতা সই সুখে,   লম্বা কথা বলি মুখে,
উচ্চ করি ঘুষ তুলি দেখিলে কাঙ্গালে ॥
শিখিয়াছি লেখাপড়া,   ঠাণ্ডা দেখে হই কড়া,
কথা কই চড়া চড়া, ভিখারি ফকিরে।
দেখ ভাই রোখ কত, বাঙ্গালি শরীরে!"

আবার— "মনুষ্যত্ব? কাকে বলে?   স্পিচ দিই টৌনহলে,
লোকে আসে দলে দলে, শুনে পায় প্রীত।
নাটক নবেল কত,   লিখিয়াছে শত শত,
এ কি নয় মনুষ্যত্ব? নয় দেশহিত?
ইংরেজি বাঙ্গলা ফেঁদে,   পলিটিক্স্ লিখে কেঁদে,
পদ্য লিখি নানা ছাঁদে, বেচি সস্তা দরে।
অশিষ্টে অথবা শিষ্টে,   গালি দিই অষ্টেপৃষ্ঠে,
তবু বল দেশহিত কিছু নাহি করে?
নিপাত যাউক দেশ! দেখি বসে ঘরে ॥"

বঙ্গদেশের এ দুর্দশায় কবি ব্যথিত—

"মর্কটের অবতার,   রূপগুণ সব তার
বাঙ্গালির অধিকার, বাঙ্গালি ভূষণ!
হা ধরণি, কোন্ পাপে,   কোন্ বিধাতার শাপে
হেন পুত্রগণ গর্ভে, করিলে ধারণ?
বঙ্গদেশ ডুবাবারে,   মেঘে কিম্বা পারাবারে,
ছিল না কি জলরাশি? কে শোষিল নীরে?
আপনা ধংসিতে রাগে   কতই শকতি লাগে?
নাহি কি শকতি তত বাঙ্গালি শরীরে?
কেন আর জ্বলে আলো বঙ্গের মন্দিরে?"

তবুও আশাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র শেষপর্যন্ত অধঃপতিত বাঙালী জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন—

"মরিবে না? এসো তবে,   উন্নতি সাধিয়া সবে,
লভি নাম পৃথিবীতে, পিতৃ সমুজ্জল!
ছাড়ি দেহ খেলা ধূলা,   ভাঙ বাদ্যভাণ্ডগুলা
মারি খেদাইয়া দাও নর্তকীর কুল।
মারিয়া লাঠির বাড়ি,   বোতল ভাঙ্গহ পাড়ি,
বাগান ভাজিয়া ফেল পুকুর তলে।
সুখ নামে দিয়ে ছাই,   দুঃখ সার কর ভাই,
কভু না মুছিবে কেহ, নয়নের জলে,
যতদিন বাঙ্গালিকে লোকে ছি ছি বলে ॥"

এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় "বঙ্গদর্শন" অগ্রহায়ণ ১২৮১ সাল, পৃষ্ঠা—৩৮২-৩৮৪।

অনুকরণ (বিবিধ প্রবন্ধ) ১ম খণ্ড॥ প্রথম প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', পৌষ ১২৮১ সাল। 'অনুকরণ' প্রবন্ধটির প্রেরণা শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'সেকাল আর একাল'। গ্রন্থটিতে তুলনামূলকভাবে প্রাচীন এবং আধুনিককালের জীবনযাত্রার আলোচনা করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'অনুকরণ' প্রবন্ধটিতে, ব্যাঙ্গাত্মকভাবে আরম্ভ করে নির্দেশাত্মক সমাপ্তিতে এসে উপনীত হয়েছেন।

অনুকরণ প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। এই অনুকরণের দোষ ও গুণ দু'টি দিকই আছে। নিছক অনুকরণর যেমন দোষের তেমনি অনুকরণের দ্বারা বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে প্রতিভার স্পর্শে নূতন সৃষ্টি করা গুণের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমাজের দিক থেকে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কিন্তু বাঙালীর ক্ষেত্রে অনুকরণ দোষের এইজন্য যে তারা কেবলমাত্র ইংরেজজাতির দোষ এবং আড়ম্বরগুলিরই অনুকরণ করে, গুণের যথার্থ অনুকরণ করতে চায় না।

প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচটি সূত্রাকারে মূল বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধটিকে একদিক থেকে রাজনারায়ণবাবুর গ্রন্থের সমালোচনাও বলা যেতে পারে।

(ধর্মতত্ত্ব)॥

এই অধ্যায়ে মানবজীবনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলির অনুশীলন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বৃত্তিগুলিকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) শারীরিক ও (২) মানসিক। মানুষের যে শক্তিগুলির বিকাশে মনুষ্যত্ব পূর্ণ উন্মেষিত হয় সেগুলিকে এখানে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) শারীরিক (২) জ্ঞানার্জনী (৩) কার্যকারিণী (৪) চিত্তরঞ্জিনী। শিষ্য, গুরুকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এই অধ্যায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি হল ইউরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তার সংগে হিন্দুধর্মের আলোচনায় কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যাঁরা পাশ্চাত্যপ্রভাবের কথা চিন্তা করেন, তাঁদের ধারণা ভুল। বরং বিশাল হিন্দুধর্মের কিয়দংশই কোম্‌ত, হার্বার্ট স্পেন্সর বা স্পিনোজার মতবাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম ব্যাপক, এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তার বিস্তার।

নবরসের একটি রস !

এই দশকের বাংলা সাহিত্যে একটা রসের নিতান্ত অভাব ঘটেছে। সেটা হলো হাস্যরস। বাংলা সাহিত্যের সমস্ত শাখা থেকে তার যে ক্রমাবলুপ্তি এটা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করার মত। সেটা বিশেষ করে ঘটেছে হাস্যরসার্ণব রাজশেখর বসুর তিরোধানের পর থেকে।

আমাদের অবশ্য সৌভাগ্য যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আমাদের মধ্যে আজো আছেন কিন্তু তাঁর লেখনী যে আর গতিশীল নয় এটা অনস্বীকার্য। অবশ্য এও ঠিক যে মানুষের সৃজনীশক্তি সীমাহীন নয় এবং বয়সের ভার নতুন কিছু সৃষ্টি করার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আশ্চর্যের কথা আমরা নতুন কিছু কিছু লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এই দশকে কিন্তু তাঁরা সবাই সিরিয়াস। সাহিত্যের কোন শাখায় হাস্যরসের চর্চা নেই।

প্রথমে ধরা যাক কবিতা। দেখে শুনে মনে হয় বর্তমান কালের কবিরা হাস্যরসের ধার দিয়ে যান না। অবশ্য আধুনিক কবিতায় কোন রসের লক্ষণ প্রকট বা আদৌ সেগুলো সরস কিনা তা বলা খুব শক্ত। কোন কোন কবিতায় কিছু শৃঙ্গার রস বা বীভৎস রসের সন্ধান মিললেও মিলতে পারে কিন্তু হাস্যরস নৈব নৈব চ।

অধুনা বাংলা ছোটগল্প সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে থমকে দাঁড়াতে হয়। ছোটগল্প বেশির ভাগই গল্পহীন গল্প। সোনার পাথরবাটি বা কাঁঠালের আমসত্ত্ব! গল্প মানে যদি নায়কের বিশেষ মুড বা নায়িকার একটি প্রবৃত্তির সমসাময়িক বর্ণনা হয় তাহলে তাকে গল্প না বলে 'বিরস রচনা' জাতীয় আখ্যায় ভূষিত করাই উচিত। যেমন সৈয়দ সাহেবের রচনাগুলোকে আমরা রম্য রচনা বলে থাকি আর কি। যাই হোক এ নিয়ে তর্কবিতর্কে না গিয়ে এটুকু স্পষ্ট বলা যায় যে কোন আধুনিক গল্প উপন্যাস হিউমারাস বা হাস্যরসাত্মক নয়। কোন কোন লেখক ভাষার চাতুর্যে খানিকটা হাস্যরসের গোঁজামিল সৃষ্টি করেন বটে কিন্তু কেউ 'বরযাত্রী' বা 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' লেখেন না। বরং বেশির ভাগ আধুনিক গল্প উপন্যাসের মধ্যে একটা অসুস্থ ভাব যাকে বলে 'মর্বিডিটি' তার লক্ষণ প্রকট। মর্বিডিটি ও হাস্যরসের পারস্পরিক সম্বন্ধটা অহিনকুলের। যেখানে মর্বিডিটি প্রবেশ করে সেখান থেকে হিউমার প্রস্থান করে এটা স্বাভাবিক।

বাংলাসাহিত্যের নাট্যশাখা এই দশকে কিছুটা উজ্জ্বল। সেখানে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, আঙ্গিকের বৈচিত্র্য প্রযোজনার বৈচিত্র্য সব কিছুই ঘটেছে। নাটক দেখায়, নাটক পাঠে, নাটক রচনায় বহু ব্যক্তি অধুনা আগ্রহী। কিন্তু সেখানেও তথাকথিত 'সিরিয়াসনেসের' প্রাদুর্ভাব। মানুষকে শেখাতে হবে, জ্ঞান দিতে হবে এই একটা শিক্ষক মনোবৃত্তি সেখানেও জেঁকে বসেছে। হাসতে হবে মানুষকে হাসাতে হবে নির্মল হাস্যরসাত্মক আনন্দ পরিবেশন করতে হবে

এ চিন্তা নেই বললেই হয়। বাংলা নাটক বিশ্বসাহিত্যকে প্রায় গোগ্রাসে গিলেছে এই দশকে। প্রচুর ভাবানুবাদ, ছায়াঅবলম্বন, কায়ানুসরণ ইত্যাদি ঘটেছে—কিন্তু হাসির নাটক কই? সবই তো দেখি গম্ভীর ও গ্রাম্ভারী চালের বস্তু। সবাই যেন বেত হাতে রক্তচক্ষু নিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে দেখি পিরেনদেল্লা আয়োনেস্কো স্যামুয়েল বেকেট—খুঁজে পাই না মলিয়ের—খুঁজে পাই না শ এর পিগম্যালিয়ন।

কেন? কেন এমন হবে? সমস্ত জাতটা এমন গোমড়ামুখো হয়ে থাকবে কেন? এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা সে বচনটা কি লুপ্ত হয়ে যাবে! রঙ্গ মানে কি শুধু রাজনীতির রঙ্গ! ক্ষমতা দখলের মারপ্যাচের রঙ্গ? আমাদের সাহিত্যের রঙ্গসৃষ্টি কি আর হবে না? আমরা সরল, উদাত্ত, প্রাণখোলা হাসি আর হাসতে পাবো না? বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য দীনবন্ধুর জামাই বারিক দ্বিজেন্দ্রলালের নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির বিড়ম্বনা, অমৃতলালের খাসদখল বিভূতিভূষণের গণেশ ঘোঁৎনা কোম্পানী রাজশেখরের গড্ডালিকা—হনুমানের স্বপ্ন যে দেশকে মাতিয়ে রেখেছিল সে দেশের লেখকেরা ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবে অন্ধ অনুকরণের মোহে? বায়বীয় গল্প, অসুস্থ উপন্যাস, বিমূর্ত কবিতা যুক্তিবিবর্জিত নাটক লিখে পণ্ডিতম্মন্য হয়ে ঘুরে বেড়াবে শুধু? তারা এই তিলে তিলে মরে যাওয়া বাঙ্গালী জাতটাকে একটু হাসাবার চেষ্টা করবে না?

আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি।

প্রকাশ পাল

সমালোচনা

কবির ভণিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। ২'৫০

সন্ধ্যাসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পাঠান্তরপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয় সংকলিত ও সম্পাদিত। বিশ্বভারতী। মূল্য ৭'০০

রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন গ্রন্থের সূচনারূপে যে ভূমিকাগুলি লিখেছিলেন সেইগুলি একত্র করে কবির ভণিতা প্রকাশ করা হয়েছে। 'কবির ভণিতা' নামটি প্রভাতসংগীতের আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের ১নং গ্রন্থ হিসাবে এটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজের যতগুলি গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন সবগুলি যদি একসঙ্গে প্রকাশ করা যেত তাহলে তার সার্থকতা আমাদের বুঝতে কষ্ট হতনা। কিন্তু কেবল মাত্র রচনাবলীতে ব্যবহৃত হবার জন্য যে ভূমিকাগুলি লিখিত সেইগুলিই সংকলিত হল কেন আর অন্যগুলি বাদ গেল কেন এর কোন কারণ দর্শানো হয়নি। যদি সময়ের দিক থেকে নৈকট্য এগুলিকে একত্র গ্রথিত করার কারণ হয় তাহলে নবজাতকের ভূমিকাও এর মধ্যে পড়ে।

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প জাতীয় বেশ গুরুগম্ভীর একটি পরিকল্পনা চলছে তা কবির ভণিতা যদি তার প্রথম ফসল হয় তাহলে তার থেকে আশা করার কিছু নেই। এই জাতীয় গ্রন্থ পাঠক সমাজের প্রত্যাশার প্রতি ঔদাসীন্যের চিহ্ন বহন করে। এবং এর অসম্পূর্ণতা, পরিকল্পনার তরলতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের সুনাম ক্ষুণ্ণ করে।

আর একটি বিষয়ে আমরা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'কবির ভণিতা' নামটি ব্যবহার করা আমরা অযৌক্তিক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ ঐ নামে কোন বই রচনা করেন নি। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বহুদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশ করছেন। এই সব নামকরণ কারা করছেন জানিনা—শুধু সবিনয়ে জানাতে চাই যে 'কবির ভণিতা ও অন্যান্য সূচনা' জাতীয় নামকরণ হলে কবির প্রতি সংকলকের শ্রদ্ধা প্রকাশ পেতো।

বিশ্বভারতীর প্রকাশিত বই হাতে পেয়ে মন সম্পূর্ণ বিমুখ হল এই প্রথম। সংকলক ও পরিকল্পকের ব্যবসায়ী বুদ্ধিই কি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশের মান নির্ণয় করবে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের আগেকার সমস্ত রচনা রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যসাহিত্যের ধারা থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই যে পরিমাণ ভাববিহ্বলতায় আচ্ছন্ন তাতে সাহিত্যের রূপ সৃষ্টি খুব উন্নত আদর্শের হওয়া সম্ভব নয়। কবিতাগুলি দীর্ঘ, আবেগ প্রধান, অপরিমিত ফলে গীতকাব্যের সংহতি, সংগতি ও সুরগ্রন্থনার ঐশ্বর্য এগুলির নেই। তবু নানা

কারণে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশের সময় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কবির আপত্তি সত্ত্বেও সমস্ত সন্ধ্যাসঙ্গীতটিই প্রকাশ করেছিলেন এবং দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন।

বর্তমান সংস্করণে সম্পাদকদ্বয় পাঠান্তর সহ সন্ধ্যাসঙ্গীত, রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের ২য় গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথের পাঠান্তর নিয়ে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী একসময়ে আলোচনা সুরু করেছিলেন। শ্রীপুলিনবিহারী সেন সন্ধ্যাসঙ্গীত নিয়ে ইতিপূর্বেই সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় আলোচনা করেছিলেন। সেই পরিষদ পত্রিকার সংখ্যাতেই ডক্টর অমলেন্দু বসুও সাহিত্যে পাঠান্তর সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। অবশ্য ইংরাজী সাহিত্যে শেক্সপীয়রের পাঠান্তর সমস্যা আর রবীন্দ্রকাব্যের পাঠভেদ ঠিক এক জাতীয় বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনেই একটি মূল রচনাকে কাটাকুটি করে রূপ বদল করেছেন। তাঁর পরীক্ষার প্রত্যেকটি ধাপই সমালোচকদের কাছে স্পষ্ট। শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও জটিল। শেক্সপীয়র একটি অবস্থায় কি বলতে পারতেন তা নিয়ে যখন অনুমান চলে তখন সমালোচক শিল্পীর মনের ক্রিয়াকলাপ থেকে বাক্য পুনর্গঠনের দিকে যান। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমারা বিভিন্ন পাঠের বাক্যান্তর অনুসরণ করে কবি মনের পরিবর্তনশীল রহস্যের অনুগামী। সুতরাং বিভিন্ন পাঠ সুবিন্যস্তভাবে সজ্জিত হলে রসিক পাঠক কবি মনের আলোছায়ার রং পরিবর্ত্তনের লীলাটিকে অনুধাবন করতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থের এমন সূক্ষ্ম পাঠজনিত সমস্যা সম্বলিত সংস্করণ এই প্রথম পাওয়া গেল। টেকস্‌চুয়াল পঠনপাঠন এখনও রবীন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপ্রচলিত নয়। সাধারণ রসবিলাসী পাঠক এই পদ্ধতিতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করে না। কিন্তু কাব্যের সৌন্দর্য যেখানে শুধু মনের উপরতলাশ্রয়ী নয়, মনন যেখানে কাব্যপাঠের প্রয়াসের মধ্যে অনুপস্থিত নয় সেখানে একই অনুভবে ভাষান্তর প্রয়োগের কারণ জানতে চাওয়া নিছক কৌতূহল নয়।

সন্ধ্যাসঙ্গীত কবির শেষ জীবনে খুব পছন্দের কাব্য না হলেও একাব্যের সাতটি সংস্করণ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সাতটি সংস্করণের বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে, তাদের পাঠান্তরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সংস্করণ যথোচিত দক্ষতা ও যত্নসহকারে সম্পাদিত হয়েছে। রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের এই দ্বিতীয় গ্রন্থটি রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

Folk Music and Folk Lore : an anthology (Vol-1), Chief editor : Hemango Biswas, Folk Music and Folk Lore Reseach Institute, 2/1A, North Range, Calcutta-7. (Price : Rs. 10'00)

কলকারখানা ও শ্রমশিল্পের অতিবিস্তারের জন্যে শহুরে সভ্যতা ও নাগরিক সংস্কৃতি আমাদের আধুনিককালের জীবনে তার একটা স্থান করে নিয়েছে। ইউরোপ আর আমেরিকায় অনেক

আগেই এই রূপান্তরের পালা সুরু হয়েছে। আধুনিককালের ভারতবর্ষেও সমাজ ও জীবনের যে এই রূপান্তর ঘটে চলেছে তা প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানী মাত্রই স্বীকার করেন। কিন্তু একদা যেখানে জীবনের বনিয়াদ গড়ে উঠেছিলো—সেই দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের ক্ষেত, শ্লথ শিথিল গতি বিশালকায় নদী, ইতস্ততঃ গাছপালা আর ঝোপ জঙ্গল—সেই বহু শতাব্দীর নিস্তরঙ্গ জলের মত পরিবর্তনহীন পল্লীজীবন আজ বিশীর্ণ ভগ্নস্তূপে পরিণত বা একান্তই অবহেলিত। তাই এই দীর্ঘ দিনের অবজ্ঞার ও অবহেলার ফলে ভারতীয় লোক সংস্কৃতির এই ঐশ্বর্যময় ধারা—যা ছিল আমাদের সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের দর্পণ—তা আজ লুপ্ত হওয়ার পথে এগিয়ে চললো। ফলে আজকের দিনে 'জ্ঞানের সেই আদি নিকেতনে' ক্রমশঃ আমাদের প্রবেশ হয়ে উঠলো দুঃসাধ্য। আর এরই শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে এলো আজকের এই শহুরে সংস্কৃতি।

লোক সংস্কৃতির প্রতি এই ঔদাসীন্য ও অবহেলার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হোল বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত। একদা বাংলার এই লোকসঙ্গীত ছিল আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে হরিজনসম অচ্ছুত। স্কুল কলেজের লেখাপড়ার বিদ্যে দিয়ে তৈরী বুদ্ধিজাত গান নয় আটপৌরে জীবনের মুখোমুখি হয়ে নিরক্ষর পল্লীসমাজের মানুষেরা যা কিছু দেখেছে অনুভব করেছে—সে সবকেই সুরের বাঁধুনি দিয়ে গানেতে রূপ দিয়েছে। মনেরর সুদূরে নিয়ে যাবার মতো সুর আছে সেই গানে, কিন্তু রাগরাগিনীর আষ্টে-পিষ্ঠে বাঁধা নয়; তাল নেই হয়ত—ছন্দ তো আছে; আর সে ছন্দ হোল কথার ভাবকে অনুসরণ করে চলতে থাকা। তাই বাংলার এই লোকসঙ্গীত হ'য়ে রইলো ভদ্রলোকের দরবারে অপাঙ্‌ক্তেয়।

কিন্তু লোকসঙ্গীতের এই ঐশ্বর্য ও ভাবের গভীরতায় যার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং যিনি সর্বপ্রথম আমাদের কাছে লোকসঙ্গীতের অবদান তুলে ধরলেন তিনি হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন, 'সেই জন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোলা দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়, তাহারাই ইহার ভাঙ্গা ছন্দ এবং অপূর্ব মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে।'

রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে লোকসঙ্গীতের সন্ধান ও সংগ্রহের প্রচেষ্ট'য় অখ্যাত পল্লীসমাজের সাহিত্য ও সঙ্গীত মর্যাদা লাভ করায় শিক্ষিতশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষিত হোল ক্রমে ক্রমে। এবার থেকে লোকসঙ্গীত আর হরিজনের পর্যায়ে রইল না। একেবারে ভদ্র পঙ্‌ক্তিতে সসম্মানে উঠে এলো। বঙ্গ সংস্কৃতির বাজারে লোকসঙ্গীত হ'য়ে দাঁড়ালো দস্তুরমতো ফ্যাসান। বর্তমানকালে 'আকাশবাণী'র কল্যাণে লোকসঙ্গীতকে করা হয়েছে দুভাগে খণ্ডিত; প্রাচীন পল্লীগীতির পাশাপাশি আধুনিক পল্লীগীতি। নকলনবিশী যুগের ফরমাসী লোকসংগীত তার বিকৃতির সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে চলেছে। লোকসংগীতের আসল প্রাণশক্তি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। এই নকল লোকসঙ্গীতই ড্রইং রুমের অবসর বিনোদনের খোরাক জোটাচ্ছে। সে গানে না আছে পল্লীর স্নিগ্ধতা—মাটির সুরভি, না আছে আকাশের ছোঁয়া, না আছে নদীর বুকের ঢেউয়ের কম্পন। নকল গলায় নকল সুরের মধ্যে ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্য—তার সুরের কৌলিন্য।

লোকসঙ্গীতের এই রুচি বিকৃতির কালেই যাঁরা লোকসঙ্গীতের আত্মরক্ষার এই সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণায়, সন্ধানে ও সংগ্রহে মনোনিবেশন করেছেন তাঁদের মধ্যে 'ফোক মিউজিক এণ্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত উল্লিখিত সংকলন গ্রন্থটি (Anthology) যথার্থই আমাদের হতাশামুক্ত করতে সাহায্য করবে। সংকলন গ্রন্থখানি সুরুচি সম্মত ছাপা, চিত্রসম্পদ ও বাহ্যিক সৌষ্ঠব সুন্দর ও উচ্চাঙ্গের। লোকসংস্কৃতি গবেষণায় সম্পাদক মণ্ডলীর যে গভীর আন্তরিকতা, আগ্রহ ও মমত্ববোধ আছে—তা এই সংকলন গ্রন্থের সুষ্ঠু সম্পাদনার মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে এবং প্রত্যেক সংস্কৃতি প্রেমী মাত্রই এঁদের এই প্রচেষ্টাকে যে অভিনন্দিত করতে কুণ্ঠিত হবেন না—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

লোক যান (Folk lore শব্দটির পরিভাষা করেছেন ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এবং তাঁর মতে এর প্রতিশব্দ হল জীবনচর্যার এক দিক অর্থাৎ a way of life of the people) এবং লোকসংগীতের গবেষণার অর্থই হোল জনগণের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান যা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের খনিত্রের আঘাতেই শুধুমাত্র উদ্‌ঘাটন হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং এই বিষয়ক গবেষণা শুধুমাত্র কাগজ কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টাকে এড়িয়ে সম্পাদকমণ্ডলী মৌলিক তথ্য এবং সন্ধান ও সংগ্রহের উপরে ভিত্তি করে রচিত বহু সুনির্বাচিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধের স্থান দিয়েছেন এই সংকলনটিতে। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকসঙ্গীতের রূপরেখা নিয়ে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। বোঝা গেল, দেশ জাতি, ধর্ম ও সমাজ—সব কিছু সর্বদেশের আলাদা হ'লেও, সহজ অনুভূতির ক্ষেত্রে, সব দেশের সাধারণ মানুষের অন্তরের যন্ত্র একই সুরে বাঁধা ; বিষয় বৈচিত্র্যে ও ভাব ঐশ্বর্যে কোন দেশের বা কোন প্রদেশের লোকসংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর উর্দ্ধে রচিত এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে তারই এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। সর্বোপরি, বর্তমানকালে আমরা জাতীয় সংহতির সমস্যায় চিন্তিত ও বিব্রত ; কিন্তু এই সংকলন গ্রন্থ যেন চোখের সম্মুখে আমাদের জাতীয় সংহতির সমস্যা সমাধানের সেই স্বরপটিকে তুলে ধরেছে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীতের রূপরেখার মধ্যে। জাতীয় সংহতির সমস্যা সমাধানে লোকসঙ্গীত ও লোকযান যে একটি মাধ্যম হ'য়ে উঠতে পারে—তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হোল এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি। এযাবতকাল লোকযান ও লোকগীতি বিষয়ক যে সব সুচিন্তিত ও সুনির্বাচিত পুস্তকাদি প্রকাশিত হ'য়েছে, সেগুলির মধ্যে আলোচ্য সংকলন গ্রন্থখানি যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে খ্যাতিলাভ করবে—তা অনস্বীকার্য।

সুতরাং আলোচ্য সংকলন গ্রন্থের বিষয়সূচীর দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক্। প্রথমেই লোকসঙ্গীত ও লোকযানের উপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ থেকে। তারপর পরিবেশিত হ'য়েছে নিম্নলিখিত বিষয়সূচী :

কতিপয় বিহারী লোকসঙ্গীত। ভোজপুরী লোকযান ও লোকসঙ্গীত। উত্তর প্রদেশের লোকযান ও লোকসংগীত দক্ষিণরাঢ়ের লোকসঙ্গীত। মেদিনীপুরের লোকসঙ্গীতের রূপরেখা। বাংলার বাউল সঙ্গীত। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী লোকসঙ্গীত। টোটো : তাদের জীবন ও গীতি।

নেপালী লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের সমীক্ষা। একটি কিংবদন্তী থেকে গানের জন্ম—গোয়ালপাড়ার মাহুতের গান : (স্বরলিপি সহ)। আসামের লোকসঙ্গীত : একটি সাধারণ সমীক্ষা (স্বরলিপি সহ) খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের আদিবাসী সংগীত। (সংগৃহীত সঙ্গীতের স্বরলিপিসহ)। রূপকথা, লোকযান ও আধুনিক কাল। আমেরিকান লোকসঙ্গীত এবং লোকযানে নিগ্রো আত্মিকতা। আমেরিকায় লোকসংগীত জনপ্রিয় করণ। বাংলার লোকযানভিত্তিক কর্মপ্রচেষ্টার বিবরণ—আ'দ যুগ। ক্ষয়িষ্ণু লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীত : সংগ্রহ ও সম্পাদনার সমস্যা। গৌরবময় উত্তরাধিকার। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত লোকসঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক ও পুস্তিকার গ্রন্থপঞ্জী। এর মধ্যে আরও একটি বিষয়ে সম্পাদকমণ্ডলী নজর দিয়ে অশেষ ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন এবং তা হোল, বিভিন্ন লেখককর্তৃক রচিত প্রবন্ধের মধ্যে আলোচ্য লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিক এলাকা বা বিস্তৃতি সেই প্রদেশের বা রাজ্যের মানচিত্রের মধ্যে চি হ্নিত করে দেখানো হয়েছে—সহজেই যাতে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয়।

এখন উপরিউক্ত বিষয়সূচী দেখে মোটামুটি সকলেই একমত হবেন যে, সংকলন গ্রন্থটিতে যে মূল্যবান বিষয়গুলির অবতারণা করা হয়েছে—লোকসংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং আরও যা সর্বাঙ্গ সুন্দর ও স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল তা সমালোচনার খাতিরে বলতে গেলে পূর্বেই সম্পাদকমণ্ডলীর বহু চেষ্টা সত্বেও উড়িষ্যার ও মণিপুরের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করতে না পারার কৈফিয়তটি বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু তা হলেও, বিহারী লোকসঙ্গীতের বেলায় যেমন গীয়ার্সনের লেখার পুনর্মুদ্রণ করা হোল তেমনি মনিপুরী ও ওড়িয়া লোকসঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধের কি পুনর্মুদ্রণ করা যেত না? মনে হয় তাতে করে উৎসাহী পাঠক সমাজ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐশ্বর্যময় লোকসংস্কৃতির ধারাবাহিকতা, ঐতিহ্য ও তার উপকরণের বৈচিত্রগুলি সম্পর্কে সঠিক পরিচয় লাভ করে উপকৃত হোত।

লোকসঙ্গীতের সন্ধান ও সংগ্রহের উপর সম্পাদকমণ্ডলী যেমন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন স্বরলিপি প্রস্তুতের। স্বরলিপি তৈরীর প্রথাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও পাঠক সমাজকে অবহিত করেছেন সম্পাদকমণ্ডলী; সংগৃহীত গানের অক্ষরান্তরীকরণের (Transliteration) উচ্চারণভিত্তি সম্পর্কেও সম্পাদকমণ্ডলীর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং আজকাল লোকসংগীতে সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে যে যথেচ্ছাচার চলেছে তার বিরুদ্ধে আমাদের কোন বক্তব্য রাখতে গেলেই বা সংগৃহীত লোকসঙ্গীতের সংরক্ষণ করতে গেলেই প্রথমে আমাদের লোকসঙ্গীতের সুধু স্বরলিপি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সম্প্রতিকালে অনেকেই এই প্রয়োজন অনুভব ক'রে কিছু কিছু স্বরলিপি প্রস্তুতের কাজে হাত দিয়েছেন। আলোচ্য সংকলন গ্রন্থটিতে সনৎ বসুর সংগৃহীত বাউল গানের ভারতীয় ও সেইসঙ্গে পাশ্চাত্য ধরণের স্বরলিপি রচনা একান্তই অভিনন্দনযোগ্য। এছাড়া ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের কতকগুলি গানেরও যথোপযুক্ত স্বরলিপি প্রস্তুত করে সম্পাদকমণ্ডলী ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এ সম্পর্কে খালেদ চৌধুরীর পাশ্চাত্য স্বরলিপি প্রস্তুতের মুন্সিয়ানা একান্তই প্রশংসনীয়।

লোকসংগীতের আর এক প্রধান উপকরণ হল—তার বাদ্যযন্ত্র। কত বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র শুধু যে আমাদের এই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিলো—তার হিসেব পাওয়া যেতে পারে প্রাচীন

মঙ্গলকাব্যগুলির পাতায়। প্রসঙ্গত, সাধুবাদ জানাই শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয়কে—; তিনি তাঁর রচিত 'প্রাচীন বাংলার সংগীত' পুস্তকে বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে সংগ্রহ করে বহু বাদ্যযন্ত্রের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। এগুলির অনেকের আকার ও তত্র্যত্র প্রয়োগও আমরা জানি না। তবে আলোচ্য সংকলন গ্রন্থটিতে লোকসংগীতের এই সব বাদ্যযন্ত্রের সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে অঙ্কিত বহু স্কেচ দেওয়া হয়েছে—যা সাধারণ পাঠকের অনুসন্ধিৎসা দূর করতে সক্ষম হবে। এ ছাড়াও ভবিষ্যতে যাতে ছবিসহ আরও অন্যান্য লুপ্ত বাদ্যযন্ত্রের তালিকার খতিয়ান প্রকাশিত হয় সে জন্যে যথোপযুক্ত গবেষণার জন্যে সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। কারণ লোকসঙ্গীত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে লোকগীতির বাদ্যযন্ত্রেরও পরিচয় হওয়া একান্তই প্রয়োজন; যেহেতু একটি অপরের পরিপূরক হিসেবে গণ্য ব'লেই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা। সংকলন গ্রন্থটির প্রচ্ছদে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ বাদ্যবাদনরত:দের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে—তা সম্পাদকমণ্ডলীর যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে। আমাদের হারিয়ে যাওয়া লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে পশ্চিম-বাংলার গ্রামে গ্রামে বহু অবহেলিত মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলকে। সেকালের শিল্পীদের প্রস্তুত এমন বহু বাদ্যযন্ত্রের চিত্র খোদিত রয়েছে এমন সব মন্দিরগাত্রে যার আলোকচিত্র গ্রহণ করার ও যথাযথভাবে সংকলন গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডগুলিতে প্রকাশ করার প্রয়োজন অবিলম্বে দেখা দিয়েছে এবং এই কাজে যে এই সংগঠন উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

লোকসঙ্গীত এবং লোকযান বা লোকশ্রুতি বিষয়ক সংকলন গ্রন্থ ব'লে আলোচ্য গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে কিন্তু লোকসংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়গুলির যথাযথ ও বিস্তৃত আলোচনা হয়নি, (অবশ্য শ্রীযুক্ত উপাধ্যায়, শ্রীনীহার বড়ুয়া ও শ্রীগুরুঙ্গের লেখায় লোকসঙ্গীত ছাড়াও অন্য বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা আছে) এবং বিস্তারিতভাবে কোন লোক নৃত্যের আলোচনাও স্থান পায়নি। হয়ত এগুলি সংকলিত হলে প্রকাশ করা যায়নি স্থানাভাবের জন্যে। তাহলে গ্রন্থপঞ্জীতে শুধুমাত্র লোকসঙ্গীত বিষয়ক পুস্তকগুলিকেই স্থান দেওয়া হয়েছে কেন? লোক কথা, লোকনৃত্য ও লোকউৎসব বিষয়ক অন্যান্য আরও পুস্তকের উল্লেখ গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হলে গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত বলেই আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে, আলোচ্য গ্রন্থটির বৈজ্ঞানিক মূল্য তো আছেই, উপরন্তু সাংস্কৃতিকদিকও এটির আর একটি গুণ। তাই গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের কাছেই যে এই সংকলন গ্রন্থটি যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটি শুধুমাত্র যে একটি সংকলন গ্রন্থ তাই নয়—গভীর অনুসন্ধানের আঁধারে সংগৃহীত একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং সে ইতিহাস হল লোক সংস্কৃতির সন্ধান ও সংগ্রহ।

তারা সাঁতরা

Regd. No. C-815 Phone : 23-5155 September '69 (0'50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKA

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সপ্তদশ বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৭৬

সমকালীন

বলতো কে?
ও যে কে তা আপনি ভালোকরেই জানেন!
আপনার মেয়ে ছাড়া কেই-বা হবে?
আপনার ভালোবাসা, আপনার স্নেহ সবই যে ওর দরকার। তবেই তো সে ছোট্ট থেকে বড়ো হবে। আপনিও তো তাই চান। ও বড় হোক, লক্ষ্মী শ্রীমতী হোক্। সুতরাং পরবর্তী সন্তানকে এই দুনিয়ায় আনবার আগে একটু ভেবে দেখুন। টুকটুকি অন্ততঃ আর একটু বড় হয়ে উঠুক্। আর কয়েক বছরের জন্যে অপেক্ষা করুন না।
● ডাক্তারদের মতে দু'টি সন্তান জন্মের মাঝে তিন থেকে চার বছরের ব্যবধান থাকলে মায়েদের শরীর ভালো থাকে।
● আজকাল খুব সহজেই সন্তানজন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিজ্ঞানের সাহায্যে কিই বা না হতে পারে। আপনি এখন নিজের ইচ্ছে মতো বেশকিছু সময়ের ব্যবধানে সন্তান লাভ করতে পারেন।
সন্তান জন্ম আর দৈবের অধীন নয়। পরিবার পরিকল্পনার জন্যে নানা পথ রয়েছে। যে কোনও একটি বেছে নিন্।
কেমন করে তা করতে হবে, সে সম্পর্কে আপনার ডাক্তার কিংবা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সংগে পরামর্শ করুন।
আর এখন ছেলে নয়
তিনের পর কখনও নয়
davp-69/240

পুরুষগণ !
মাত্র 5টি পয়সা আপনাদের,
পরিবার সীমিত
রাখার ক্ষমতা
এনে দেয় ।
আগামী 28 বছরে ভারতের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে, কিন্তু দেশের সম্পদ দ্বিগুণ হবে না।
তার অর্থ হল প্রত্যেককেই অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অল্প জায়গা, অল্প শিক্ষা, অল্প বস্ত্র, অল্প খাদ্য।
এই ভয় দূর করা যায়। যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর এইখানেই আপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
এখনই কাজ আরম্ভ করুন। পরিবার সীমিত রাখুন।
জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এবারে আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে।
NIRODH
SUBSIDISED PRICE
15 PAISE FOR 3
নিরোধ
পরিবার পরিকল্পনার জন্য
এখন কয়েকটি জেলায় পাওয়া যাচ্ছে
উন্নতধরণের রবারের তৈরী জন্মনিরোধক
শুধু পুরুষের ব্যবহারের জন্য
15 পয়সায় 3টি
(সরকারী সাহায্যে হ্রাস মূল্যে)
davp 69/121

মলয় স্যাণ্ডাল সোপ ও মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক

দুয়ে মিলে
আপনাকে সারাদিন
চন্দন সৌরভে
ভরপুর রাখবে
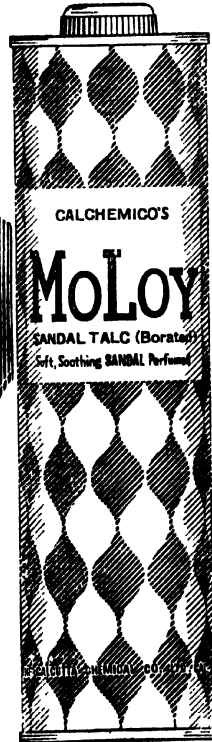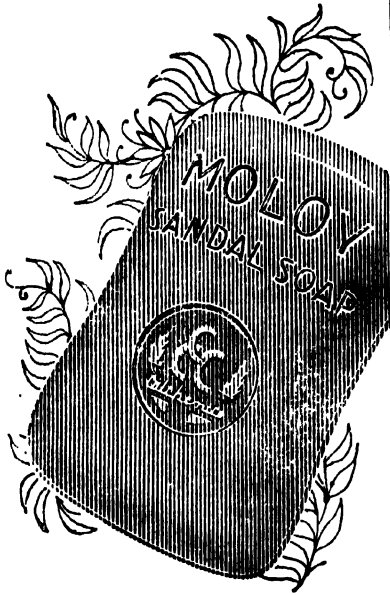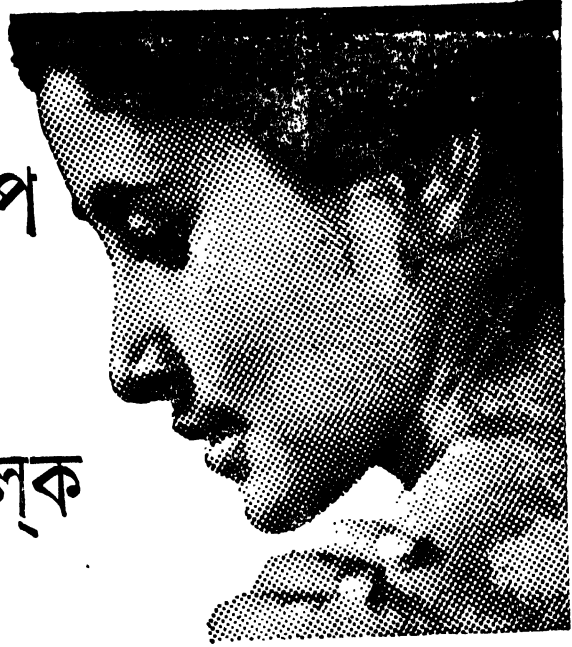
মলয় স্যাণ্ডাল সোপের মনমাতানো দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌কেও পাবেন। এই চন্দন-সুরভিত সাবান ও পাউডার—দুয়ে মিলে আপনাকে আরো রমণীয়, কমনীয় করে তুলবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপের স্নিগ্ধ ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দূর হয়ে আপনি সতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার গায়ের রঙ স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপ মেখে স্নান সেরে সারাদেহে মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক ছড়িয়ে দিন—দেখবেন দিন ভর কত ঝরঝরে ও হাল্কা বোধ করেন। মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌কের চন্দন-সৌরভ প্রখর গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত মুহূর্তগুলিতেও আপনাকে ঘিরে থাকবে।

দি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল কোং
লিমিটেডের তৈরী

MLT

রূপে যেমন
গুণে তেমন-
জগৎজোড়া
খ্যাতি
MADE IN INDIA

ছোটদের জুতো চাই
আজীবন
খুশি পায়ে চলতে
বাটার ছোটদের জুতো বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি।
এমনই এদের নকশা ও নির্মাণ-বৈশিষ্ট্য যে হাঁটতে চলতে
অবাধ সহজ। সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা, খাপখাওয়ানো
গোড়ালির গড়ন, আর এমন জুতোর তলি যা অনায়াসে পা
সঞ্চালনের সহায়ক। টুকটুকে রঙ, বাহারে নকশা, আর
আরামে পয়লা নম্বর—এমন জুতোই এখন মজুত
বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাদের,
এদের খুশি পায়ে শুরু হোক শরতের শোভাযাত্রা।
বাহার ৩.৫০
র‍্যাপ্ট ৯.৫০
Bata
বেবি ৯.৫০
মোকাসিন ৪.৭৫—৫.৫০
বুট ৯.৯৫
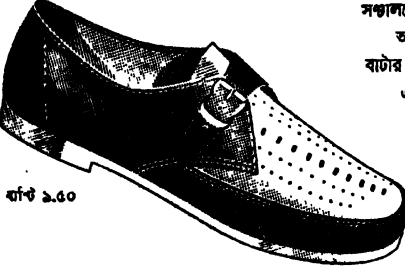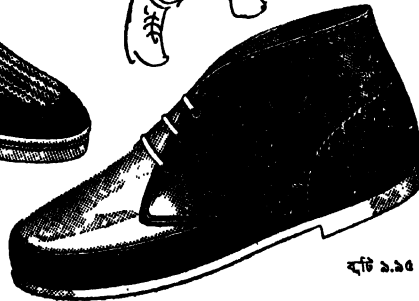
by the sweat of the brow...
A hard way to earn a living !
Yet, it is comforting to know
that today's hard work
will lead to a happy, relaxed
tomorrow.
For that you have to make
careful plans. You have to
save regularly for your future
and your family's future.
Save your hard-earned money
with UCOBANK where
it earns interest and grows
steadily to ensure a
secure future.
UNITED COMMERCIAL BANK
HEAD OFFICE:
CALCUTTA-1
You can save—
UCOBANK can help you
ASP/UCO-4/69

নরম
আরামদায়ক
অথচ টেকসই
গেঞ্জী,
আণ্ডারওয়ার,
মোজা প্রভৃতির জন্য ..
লেবেলটি দেখে নিন
CH/G/14
ক্যালকাটা হোসিয়ারী ওয়ার্কস
১৩৮, বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা-১৫
ব্রাঞ্চ—বিধান মার্কেট, শিলিগুড়ি

SAVAGE

পূর্ব রেলওয়ে

সপ্তদশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা   আশ্বিন তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ভারতীয়
শিল্প-প্রচেষ্টায়
প্রায়
২০০
বছরের
নিরবচ্ছিন্ন
সেবার
ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ
মার্টিন
বার্ন
গোষ্ঠী
mb
মার্টিন বার্ন লিমিটেড
MBGC-23 BEN

আশ্বিন
তেরশ' ছিয়াত্তর

সপ্তদশ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

চাঁদের দেশে

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রমার জলশূন্য ও বায়ুরহিত শান্তি সমুদ্রে মানুষের পদচিহ্ন অঙ্কিত হ'য়েছে যার স্থায়িত্ব বলা হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর। শান্তি সমুদ্রের বয়স নির্ধারণের প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করছেন ৫০ কোটি বছর। বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার বর্তমান যুগে বিস্ময়কর চরম পরিণতি হলো মানুষের এক গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পদার্পণ। এই কল্পনাতীত ঘটনাটি শুধু যে নবযুগের প্রবর্তন ক'রেছে তাই নয় চাঁদের সম্বন্ধে কত যুগের পুঞ্জীভূত কবি কল্পনা এক নিমেষে নিঃশেষিত করেছে। আজ সুধীজন চাঁদকে সৌন্দর্যের প্রতীক বা উপমারূপেও ব্যবহার করতে সঙ্কুচিত হবেন। চাঁদের সমতলক্ষেত্রে অসংখ্য অগ্নিমুখের (ক্রেটার) চিহ্নগুলিকে স্মরণ ক'রে কেউ সহজে বলতে সাহস করবে না—"আহা তার মুখখানি যেন চাঁদের মত।"—তাহলে আজকের দিনে কেউ যদি এ ধারণা করে তার মুখখানি হয়তো মসূরিকা রোগচিহ্নে চিহ্নিত, নেহাৎ ভুল করবে না। আজ ছাতে শুয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকে তার স্নিগ্ধতার কথা মনে করতেও দ্বিধা বোধ করবে।

চাঁদ কালিদাসের চাঁদ, সেক্সপীয়ারের চাঁদ, বিভিন্ন দেশে নানা কবির চাঁদ, বেরোসসের, আনাক্সাগোরাসের, কোপার্নিকসের ও গ্যালিলিয়োর চাঁদ কোন দিনই এক ছিলো না। কবি-কল্পনা চলেছিলো চাঁদের মাধুর্য নিয়ে আর অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক মন চিরদিনই চেয়েছে চাঁদের বাস্তবিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুষ, চাঁদের প্রকৃতরূপ জানবার জন্য যেদিন সশরীরে গ্রহান্তরে উপস্থিত হলো কতযুগের সঞ্চিত কবি কল্পনা যেন ফুৎকারে উড়ে গেলো অসীম অন্তরীক্ষে। ভবিষ্যতের কবি ও সাহিত্যিক হয়তো চাঁদ নিয়ে আবার সাহিত্য সৃষ্টি করবে কিন্তু আর কি দেখতে পাবে চাঁদের মধ্যে নির্মলতা, আর কি অনুভব করবে অনুপম স্নিগ্ধতা তার

২১৫ ডিগ্রী (ফাঃ) উত্তাপের পরিচয় পাওয়া সত্বেও ? চূর্ণীকৃত অঙ্গারকপূর্ণ, ধূসর বর্ণে রঞ্জিত প্রস্তরময় মরুভূমির কথা কি চাঁদের সৌন্দর্যবোধকে আঘাত করবে না ?

মানুষের সাফল্যমণ্ডিত চন্দ্রাভিযান, একদিকে যেমন চাঁদের সম্বন্ধে যত কল্পনা কবিতা, কুসংস্কার উপকথা, জ্যোতিষ গণনা ভীতি উল্লাস সব কিছুর ভিত্তিকে শিথিল করল অন্যদিকে চাঁদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের নানা মতবাদেরও মূল শিথিল হয়ে গেলো।

গ্রীসদেশে নানা দেবদেবীর নামের সাথে চাঁদকে যুক্ত করা হয়েছিলো—সেলেন, আর্টিথিস্, হেকাটী প্রভৃতি দেবীর নামে চাঁদকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। রোমদেশের উপকথায় পাওয়া যায় শিকারের দেবী ডায়না আধফালি চাঁদকে আকাশ থেকে পেড়ে এনে নিজের ধনুকের মত ব্যবহার করে শিকার করতেন। ভারতবর্ষে বলা হয় চাঁদের জন্ম হয়েছিলো সমুদ্রমন্থনের সময় এবং চাঁদের ভাই ধন্বন্তরী আয়ুর্বেদের স্রষ্টিকর্তা। উপকথায় আছে চাঁদের পত্নীর সংখ্যা ছিলো সাতাশটি। তিনি বেশী ভালবাসেন রোহিনীকে। প্রত্যেকেই ছিলেন দক্ষরাজার কন্যা। অবশিষ্ট ছাব্বিশটি বোনেরা পিতা দক্ষের কাছে গিয়ে বলেন তাঁরা পতিব্রতা হওয়া সত্বেও পতিপ্রেমে বঞ্চিতা। দক্ষরাজা রুষ্ট হলেন এবং চাঁদকে লুপ্ত করতে চাইলেন। শেষে কন্যাগণের অনুরোধে ও প্রার্থনায় চাঁদের শাস্তি হলো মাসে একবার ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া।

চাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনায় ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাসে নানা উপকথা আছে। শারদ-পূর্ণিমাতে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে নৃত্যে প্রথম যোগদান করে ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন। ব্রহ্ম যখন রতিপতি কামদেবের পাণিগ্রহণের জন্য এক সুন্দরী রমণীকে সৃষ্টি করেন তখন সব চাইতে উজ্জ্বল উপগ্রহ চাঁদ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। চাঁদকে কেন্দ্র করে আমাদের কত আনন্দ—উৎসব। কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে শিখেরা গুরু নানকের জন্মতিথি উৎসব করে। বুদ্ধ পূর্ণিমাতে বৌদ্ধগণ পর্বদিন উদ্‌যাপন করেন, গৌতমবুদ্ধ সেদিন নির্বাণলাভ করেছিলেন। মুসলমানদের যত পর্ব চাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। একদিকে যেমন চাঁদ উৎসব ও আনন্দের প্রতীক অন্যদিকে চন্দ্রগ্রহণ হিন্দুদের ভীতিপ্রদ বস্তু—ঐদিনে গঙ্গাস্নানের ও পুণ্য সঞ্চয়ের বিধি ব্যবস্থা। খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যীশুখৃষ্টকে যেদিন ক্রুশবিদ্ধ করা হয় সেদিন চাঁদ ঘোর লাল রঙে রঞ্জিত হয়েছিল।

জ্যোতিষশাস্ত্রে অর্থাৎ ফলিত জ্যোতিষে বলা হয় চন্দ্র রুষ্ট হলে নানা অঘটন ঘটতে পারে অতএব শাঁখের আংটি বা "মুনষ্টোন" ধারণের ব্যবস্থা। চাঁদের প্রতিচ্ছবি যদি জলের মধ্যে কাঁপতে দেখা যায় তার ফলাফল নাকি অমঙ্গলের সূচনা করে। চাঁদের অমঙ্গলকারী প্রভাবকে খণ্ডন করবার জন্য শিশুদের কপালে কাজলের ফোঁটা দেওয়া হয় এবং মেয়েরো কালো টিপ পরে। চাঁদকে কেন্দ্র করে নানা কুসংস্কার আজও প্রচলিত আছে। কিন্তু আজ মানুষের চন্দ্র বিজয়ের পর আমাদের অর্থাৎ এই গ্রহবাসীদের পক্ষে চাঁদকে উপকথার কুসংস্কারের বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে আর কি দেখা সম্ভব হবে ? ধর্মের নামে এবং জ্যোতিষের কতক ঠিক এবং কতক ভুল ভবিষ্যৎবাণীর দ্বারা ভারতবর্ষে সামাজিক শোষণ ও ব্যবসা বহুকাল ধরে চলে আসছে এবং আজও চলছে। ধর্মকে যে শোষণনীতির পৃষ্ঠপোষকরূপে ব্যবহার করা হবে কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি। চান্দ্রায়ণব্রত

এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে চন্দ্রলোক প্রাপ্তির বিধান দেওয়াও সমাজে অচল হবে না কি? বিজ্ঞান এ সবের মূল শিথিল করে দিয়েছে। একদিকে যেমন চাঁদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধর্ম চূর্ণ হতে চলেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা ও জ্ঞানের বিকাশের পথ সাথে সাথে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হবে।

বৈজ্ঞানিকদের চিরন্তন সমস্যা চাঁদ কোন উপাদানে গঠিত? কিভাবে চাঁদের উৎপত্তি হলো? আমাদের এই মাটির পৃথিবী চাঁদ উপগ্রহটিকে কি শুধু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারাই বেঁধে রেখেছে নিজের সাথে? বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস চাঁদ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কত কোটি বৎসরে ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে এবং এর দূরত্ব ২লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল। এর ব্যাস ২১৬০ মাইল এবং এর উপাদান জল থেকে ৩৷৷০ গুণ ভারী। আপন মেরুদণ্ডের ওপর ঘুরতে চাঁদের প্রায় এক মাস সময় লাগে। চাঁদের ওপর আমাদের পৃথিবীর মত হাওয়ার চাপ নেই সুতরাং এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকা সম্ভব নয়। চন্দ্রগ্রহণের সময় যখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে চাঁদের উত্তাপ তাড়াতাড়ি কমে যায়। চাঁদে এখনও ভূমিকম্প হয়।

আজ চাঁদ হতে সংগৃহীত উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করা আরম্ভ হয়েছে, সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো আরও হবে। বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্লেষণের ফলে অনুমান করেছেন চাঁদের পর্বতমালা আগ্নেয় (ইগনিয়স্) অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির গলিত খনিজ পদার্থ লাভা থেকে তৈরী, চাঁদের মৃত্তিকাতে অসংখ্য ছোটবড় কাচের গুলিকা (গ্লোবিউলস্) বর্তমান আছে, যেন মনে হয় কোন সময় চাঁদের ওপর কাচের গুলিকা বর্ষণ হয়েছিল। ভবিষ্যতে আরও নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

ব্যাবিলনের পুরোহিত বেরোসস্ তাঁর শিষ্যদের বলতেন চাঁদের অর্দ্ধগোলক আপন আলোকে আলোকিত, আনাক্সাগোরাস্ ভাবতেন চাঁদের সমতলক্ষেত্রে নানা প্রাণীর বসবাস, পুরাকালের জ্যোতির্বিদেরা মনে করতেন চাঁদ একটি শীতল উপগ্রহ এবং জল সিঞ্চিত, পাইথাগোরাসের বিশ্বাস ছিল চাঁদ একটি বিরাট নিবদ্ধী (ক্রীস্টালাইন) উপগ্রহ যেখান থেকে সূর্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, গ্যালিলিয়ো, টাইকো ব্রাহী এবং অন্যান্য পুরাতন বৈজ্ঞানিকেরা ভাবতেন চাঁদের গতিবিধি সম্বন্ধে এইভাবে উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত নানা চিন্তাধারা চলে এসেছে। খৃষ্টীয় বিশ্বাস ছিল পৃথিবী সাতদিনে সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের দ্বারা এবং চাঁদও ভগবানের সৃষ্টির একটি নিদর্শন। পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিকেরা ভাবলেন চাঁদের যেদিকটা পৃথিবীর দিকে অনাবৃত সেদিকটা একটু বেশী ফোলা এবং চাঁদের মধ্যে গহ্বরগুলি আগ্নেয়গিরির এক একটি উদ্‌গার মুখ। কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন চাঁদ আমাদের গ্রহের মধ্যে যেখানটিতে প্রশান্ত মহাসাগর, সেখান থেকে ছিটকে গিয়ে মহাশূন্যে নিজের স্থান সৃষ্টি করেছে এখানে সৃষ্টি হয়েছে সাগর। চাঁদ যে পৃথিবী হতেই সৃষ্ট হয়েছে স্যর জন দারউইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা এই মত পোষণ করেন, যদিও এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। ডক্টর ডোনাল্ড ওয়াইজ দারউইনের এই মতকে পরিবর্দ্ধিত করে চাঁদের ঘনত্ব (ডেনসিটি) ও আকার সম্বন্ধে গবেষণা করেন। মিঃ পীটার ষ্টব্ দারউইন ও ওয়াইজের সাথে একমত নন। ফরাসী গণিতশাস্ত্রী লাপ্লাস্ বিশ্বাস করতেন সবিতার জন্মের পর বিরাট ধূলিকণার গোলক নানা অংশে বিভক্ত হয়ে শীতল হতে আরম্ভ করে এবং বিভিন্ন গ্রহ ও

উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। কন উইজেকর ও ডক্টর জি. বার্ড কুইপার কিয়দংশে এই মতবাদটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু ফ্রেড্ ইয়েল বিশ্বাস করেন সবিতার চুম্বনক্ষেত্র (ম্যাগনেটিক ফীল্ড) হালকা বায়বীয় পদার্থকে (লাইটার গ্যাস) বিতাড়িত করে দেয় এবং অপেক্ষাকৃত ভারী খনিজ পদার্থ (মিনারেলস্) ও প্রস্তর গঠনের খনিজ উপাদানগুলি ধীরে ধীরে সূর্যের কাছে ঘনীভূত হয়ে পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি নানা গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

দার্শনিক কান্ট বিশ্বাস করতেন চাঁদের উৎপত্তি সৌর জগতে এক অভিনব পরিস্থিতি এবং এর মূলে আছে শীতলতা। আমাদের দেশে যদি পৌরাণিক উপকথাগুলি যেগুলিকে ধর্মের সাথে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, সেগুলিকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে দর্শন অংশে এবং বেদান্তশাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যাবে চাঁদকে ধ্যান, ধৃতি ও ধারণার সহায়করূপে ব্যবহার করা হয়েছে—বিশেষ করে তার প্রতিফলন (রিফ্লেক্‌সন) গুণটিকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে চাঁদের অন্তর্হিত তিনটি রঙের কথা বলা হয়েছে তার লালচে রং চাঁদের তেজ অংশ অর্থাৎ উষ্ণত্বের নির্দেশ করে, শ্বেতবর্ণ চাঁদের আর্দ্রতায় অংশকে ইঙ্গিত করে এবং কৃষ্ণময় বর্ণ অঙ্গারাত্মক মৃত্তিকার নির্দেশ দেয় (ছান্দোঃ ৬-৪-৩)। এখানে শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে মানুষের চন্দ্রগ্রহে পদার্পণ আজ এই তিনটি নির্দেশকেই প্রমাণিত করেছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে চাঁদকে মনের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে মৃত্যুর পর মানুষ চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রুতির উদ্দেশ্য হতে পারে চাঁদের প্রাণীহীনত্বকেই মৃত্যু শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা। কিন্তু এক্ষেত্রে চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ চন্দ্র যেমন সবিতার রশ্মিতে প্রতিফলিত উপগ্রহ, মন ও প্রাণের (বায়ো এনার্জী) প্রতিফলিত পরিস্থিতি। মৃত্যুর পর মন প্রাণের সাথে সম্মিলিত হয়—মোটামুটি সোজা ভাষায় এই রকম ভাবপ্রকাশ করে (বৃঃ উঃ ১—৩—১৬)। বৃহদারণ্যকে আরও কয়েক যায়গায় চাঁদকে প্রাণের উজ্জ্বলরূপ মনের সাথে তুলনা করা হয়েছে (বৃঃ উঃ ১—৫—১৩)। বলা যেতে পারে মানুষের মৃত্যুর পর তার মন চন্দ্রে প্রবেশ করে অর্থাৎ মনের বহির্মুখীন বৃত্তিগুলো মন-আকাশের ঘন তমিস্রা ভেদ করে প্রাণের সাথে সম্মিলিত হয়। তখন কেবল প্রাণশক্তিই বর্তমান থাকে। বিষয়টি মোটেই দুর্বোধ্য নয়। প্রতিরাত্রে সুষুপ্তির সময় মনের ক্রিয়া কিছুই থাকে না, মন প্রাণে সন্নিবিষ্ট হয়—আবার স্বপ্নাবস্থায় মনের ক্রিয়া চলতে থাকে। বহিরিন্দ্রিয়গুলো বন্ধ করে মনের একাগ্রতা আনার সময় অর্থাৎ ধ্যানরত হতে হলেও প্রথমটা চোখবন্ধ করলেই আমরা সম্মুখীন হই গাঢ় অন্ধকারের। বহির্জগতে অন্তরীক্ষও গাঢ় অন্ধকারময়। অন্ধকারের বুক চিরে অগ্রসর হওয়া বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে দুই ক্ষেত্রেই সমান। মানুষ অন্তরীক্ষের অন্ধকার ভেদ করে চাঁদে পদার্পণ করলো, এর পূর্বে মানুষ মনের ঘন অন্ধকার ভেদ করে, চোখ বন্ধ করে চন্দ্রাভিযানের পূর্ণ রূপটি ধারণা করেছে নিজের অন্তরের মধ্যে তারপর হয়েছে তার বহিপ্রকাশ।

চন্দ্র ও মনের একত্বের কথাও বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে (বৃঃ উঃ ৩-১-:৩)। চাঁদকে শুধু ব্যবহার করা হয়েছে সাধন পথের প্রতীকরূপে। মনের একাগ্রতা সাধনের কথা কেহই অস্বীকার করবে না। আজ চন্দ্রে মানুষের পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত করার মূলে রয়েছে বিরাট সমষ্টি মনের একাগ্রতা, প্রতিটি সাধারণ কর্মচারী হতে আরম্ভ করে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের একনিষ্ঠতা। তাই

সেদিনকার ভারতে মানসিক একাগ্রতা আনার জন্য চন্দ্রকে মাত্র প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়েছিলো। চন্দ্রকেই বলা হয়েছিল ব্রহ্ম এবং চন্দ্রই মুক্তি (বৃঃ উঃ ৩-১-৬) অর্থাৎ সেদিনের শিক্ষাও সংস্কৃতির চরম পরিণতি, সমাজ ও জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বৃহদারণ্যক বর্ণিত মধুবিদ্যার মধ্যেও চন্দ্রকে মনের সাথে তুলনা করা হয়েছে (বৃঃ উঃ ২-৫-৭)।

ছান্দোগ্য উপনিষদে নির্দেশিত চাঁদের উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও অঙ্গারময় মাটির কথা আজ মানুষ গিয়ে দেখে আসা সত্ত্বেও এখানে বলা সম্ভব হবে না আমাদের ঋষিরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে চন্দ্রলোকের গবেষণায় রত হয়েছিলেন। "এরোপ্লেন" দেখে আমাদের "পুষ্পক রথ" ছিলো এবং আমরাও অন্তরীক্ষ বিচরণ করতাম, বলে বুক ফুলিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু নেই। ঋষিদের চাঁদের সম্বন্ধে ধারণা হয়তো সমস্তটাই ছিলো কল্পনাপ্রসূত কিম্বা হতে পারে কোন যোগবল যার সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি একেবারে সব উড়িয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। বাস্তবিকতা হলো বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোথাও এই দু'ধারা যুক্ত বেণীতে পরিণত হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে না। আমাদের কাজ হলো এই দু'ধারার সাথে পরিচিত হওয়া। একের চিন্তাধারা দিয়ে অন্যকে প্রভাবান্বিত করতে যাওয়া কেবল ধৃষ্টতাই নয় অবৈজ্ঞানিকও বটে। কারণ তাতে প্রভাবিত ব্যক্তির সহজ চিন্তাশক্তির গতিরুদ্ধ হয়ে তার অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা পড়ে। অমুক এই কথা বলেছেন অতএব সেটা মেনে নিতেই হবে তারই বা যুক্তি কোথায়? তাঁর চিন্তাধারাতে ভুল থাকাও তো সম্ভব! কিম্বা দেশ, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়তো অমুকের কথা সে সময় ঠিক ছিলো আজকেও যে সেটা ঠিক থাকবে তার কোন কথা নেই।

আজ মানবের উদ্ভাবনী শক্তির চরম পরিণতি ও তার পুরুষাকারের শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা কেবল চন্দ্রে জীবিত অবস্থায় মানুষের অবতরণই নয় তার গ্রহের উপর পরিভ্রমণ এবং এখানেই এর পরিসমাপ্তি নয়। মানুষ বুধগ্রহে যাবে—হয়তো বা অন্তরীক্ষের দুর্ভেদ্য তমিস্রার বুক চিরে সে একদিন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে বেড়াবে তার বহির্মুখীন বৃত্তির সাহায্যে, মুক্ত করবে গ্রহগুলির রহস্যের অর্গল, পূর্ণ করবে জ্ঞানের ভাণ্ডার কিন্তু ভুলে যাবে কি এই পৃথিবীর মাটির মিঠে গন্ধ এর মায়ার বন্ধন এখানকার মানুষের স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা?

অথ বাক্য কথা

নবেন্দু সেন

সময় বলতে কি বোঝায় ?—এ প্রশ্নের উত্তরে অগাস্টাইন বলেছিলেন, if no one asks me, I know. If I am asked and try to explain it, I donot know." বাক্যবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের উত্তরও প্রায় অনুরূপ। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের সকল কথাবার্তাই নিরুপদ্রপে চলে ঠিকই কিন্তু একজনকে (ধরা যাক কোন সভার প্রখ্যাত এক বক্তাকে) যদি তাঁর কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে তাঁরই ব্যবহৃত একটি বাক্য উদ্ধার করে সে বাক্যটির বিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যায়, তাহলে প্রথমত অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জন্য তিনি বিস্মিত হবেন ; দ্বিতীয়ত (যদি সে প্রশ্নের উত্তর দেন) বাক্যটির বিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে দুটি পথ গ্রহণ করবেন ; (১) হয় বলবেন, বিশেষ্য, বিণ্‌, ক্রিয়া ইত্যাদি পদে গঠিত এই বাক্যটি জটিল (Complex) (জটিল না হলে মিশ্র বা Compound, অথবা সরল বা Simple)। (২) নতুবা Swift'র মত বলবেন, proper words in proper places, make the true definition of a sentence ; বলা বাহুল্য, উত্তর দুটিই ঠিক নয়। ঠিক নয় আরো বেশী stylistics'র পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ প্রথম উত্তরটি প্রচলিত ব্যাকরণের বন্ধনে আবদ্ধ সঙ্কীর্ণ উত্তর। পদ পরিচয়, সরল, যৌগিক বা জটিল বাক্যরূপ বাক্যবিন্যাসগত (structural) বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা নয়, ব্যাকরণগত প্রচলিত সমর্থন মাত্র। দ্বিতীয়টিও প্রচলিত আলঙ্কারিক মতবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। অতি সরল এবং ব্যাপক। মোটেই বিশিষ্ট সংজ্ঞা নয় (spceific definition)। আধুনিক ব্যাকরণ যত বেশী বিশ্লেষণাত্মক তত মতবাদ নির্ভর নয়। উনবিংশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় ব্যাকরণের ইতিহাস বর্ণনামূলক। ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলির ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব এখনো পুরাতন পাশ্চাত্য (প্রধানত ইংরেজী) ব্যাকরণের মত বর্ণনামূলক। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ থেকেই পাশ্চাত্যের ব্যাকরণের ইতিহাস আর ইতিহাসের মত বর্ণনামূলক থাকেনি, তা বিশ্লেষণমূলক হয়ে উঠেছে। জারমান ভাষা, ফরাসী ভাষা এবং ইংরেজী ভাষা তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

পুরাতন ব্যাকরণ রীতি কতকগুলি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে কতকগুলি সূত্র অনুযায়ী ভাষা বিচার করা হত। যেমন ধরা যাক Verbal noun : verb acts like a noun preceeded by 'the' followed by 'of' যথা I love the reading of the history book ; অর্থাৎ বিষয়টি এমন হবে এরূপ একটি অনমনীয় নিয়মের ছাঁচে ফেলা বাক্যের (তথা প্রচলিত ব্যাকরণের সব কিছু) শুদ্ধাশুদ্ধ রূপ নির্দ্ধারিত হয়। ফলে ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান বিষয়টিই সাধারণের নিকট নিয়মের তর্জনী তুলে হাজির হয়েছে। বস্তুত শতকরা ৯০ জন শিক্ষিত ভারতবাসী ভাষাতত্ত্বের কচকচানি থেকে দূরে থাকতে ভালবাসেন। একটা নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্য দিব্যি সরিয়ে রেখেছে। তার অন্যতম বড় কারণ, আমাদের দেশে সাহিত্যের যত উন্নতিই হোক না কেন ভাষা-

তাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত কোন নূতন বিকাশ সাধিত হয়নি। ফলে সাহিত্যেও দৈন্য অনিবার্য হয়ে উঠছে। পুরোনো ভাবধারা ও প্রাচীন মতবাদপুষ্ট ভাষাতত্ত্ব এবং ব্যাকরণের কয়েকখানি গ্রন্থ ছাত্র-পাঠ্য তালিকায় রেখে আমরা সন্তুষ্ট আছি। তার আধুনিক বিবর্তন ও নব বিকাশ নিয়ে কোন চর্চা এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে শুরু হয়নি। সংস্কৃত ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব থেকে বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব যে অনেক স্বতন্ত্র সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই। আসলে এই শাখাটি এখনো একটি উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের দেশে টিকে আছে। সেটি হল হল ভাষার ক্ষেত্রে ভুল হল কিনা তার বিচার করা। পান থেকে চূণ খসলেই ণত্ব ষত্ব বিধি বা বাক্য শেষে সমাপিকা ক্রিয়ার সুসম ব্যবহার ঠিক মত না হলেই পণ্ডিতের নিষেধের তর্জনী সবল হয়ে ওঠে। প্রাচীন সর্বপ্রকার মতামতের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও আমরা বলতে চাই, পান থেকে চূণ খসার প্রশ্ন তখনি ওঠে যখন 'পান' নামক বস্তুটি সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান জন্মায়। একই কথা 'চূণ' সম্পর্কেও। 'পান' ও 'চূণ' বস্তু দুটির সঙ্গে আগে পরিচিত হওয়া দরকার তারপর তার বিচ্যুতি-বিশ্লেষণ। ভাষাটা আগে জানা দরকার ; তারপর তার বিজ্ঞান রচিত হতে পারে। Discipline তো অবাস্তর নয়। order, arrangement, Syntax কার ? ভাষার। ভাষা কী ? শব্দ, বাক্য, শব্দের সংজ্ঞা, বাক্য বিন্যাস, ধ্বনি, যতি, অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, অধ্যায়, অলঙ্করণ এ সমস্ত নিয়েই তো ভাষা। ভাবের বাহন সে। ভাব আপনাতে আপনি বিকশিত হয় না। ভাষার রূপে ভাবের অরূপতা ব্যক্ত হয়। যত স্পষ্টার্থক, আবেদনপূর্ণ তত সে শক্তিশালী , স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যেই ষ্টাইল। হুবহু ব্যাকরণ সম্মত হলেই ষ্টাইল জন্মায় না। আবার ব্যাকরণের লঙ্ঘন মাত্রেই যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে রচনাশ্রী বিনষ্ট হবে তারও কোন মানে নেই। ব্যাকরণ অমান্যয় রচনাশ্রী যে কত বেশী হতে পারে বাংলা গদ্যে তার অনেক উদাহরণই আছে। এখানে মাত্র দুটি উদাহরণ রাখা হল।

(১) সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের স্বুবর্ণ মদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম, ঐশ্বর্য, কী অমত্ত কারাগার। দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর লুটাইতেছে, বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাবসি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া।

(২) আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রফা করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে।

প্রথম উদাহরণটির প্রথম বাক্যটি ব্যাকরণ অনুযায়ী শুদ্ধ নয়। বাক্যটির মধ্যে নিয়মমত কোন সমাপিকা ক্রিয়া নেই। কতকগুলি কর্ম, বিশেষ্য এবং বিশেষণবাচক পদ মাত্র। একটি বাক্য-সংযোজক অব্যয়ে (এবং) শব্দগুলি অন্বিত। দ্বিতীয় বাক্যটিও ক্রিয়াবিহীন। চতুর্থ বাক্যটিও 'দাঁড়াইয়া' অসমাপিকা ক্রিয়ায় সম্পন্ন, যা প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী ভুল।

দ্বিতীয় উদাহরণটির প্রথম বাক্যে ক্রিয়া নেই কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি একটি অসমাপিকা ক্রিয়া ('রফা করিয়া') ও একটি সমাপিকা ক্রিয়ায় (করিয়া আছে) সমাপ্ত, অর্থপূর্ণ বাক্য। কিন্তু বাক্যশ্রী বিচারে এই দ্বিতীয় বাক্যটি হতশ্রী। কেন ? 'রাগ করিয়া' ও 'মুখ ভার করিয়া' থাকার কোন অর্থ নেই। ভাষা ব্যাকরণ আশ্রয়ী কিন্তু ভাষার ঐশ্বর্য রীতি-নির্ভর। অতএব যেখানে ভাষার সংযমে ভাবের প্রকাশ আরো স্পষ্টতর হয় সেখানে অনর্থক বেশী শব্দের ব্যবহারে অমিতব্যয়িতার পরিচয়

দেবার প্রয়োজনও অনর্থক হয়ে পড়ে। 'রাগ করিয়া'র পরিবর্তে অনায়াসে 'রাগিয়া' ব্যবহার করা চলিত। ভাষার ধ্বনি প্রবাহজাত সুরসঙ্গতি তাতেও অনাহত থাকত। ঐ একটি মাত্র 'করিয়া'র ব্যবহারে বাক্যটি হতশ্রী হতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ব্যাকরণ এখানে ঠিকই আছে। এই একটি মাত্র প্রমাণই সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষে যথেষ্ট যে ভাষার, প্রথাগত বাক্যশ্রী ব্যাকরণগত নয়, রীতি তাত্ত্বিক (stylistic)।

লেখার মধ্যে ব্যাকরণ-বিদ্রোহ যে কত সুন্দর 'effect' সৃষ্টি করতে পারে তার উদাহরণ ঐ ক্রিয়াবিহীন বাক্যগুলি। কতকগুলি বাক্য থাকে নিতান্ত Contextual বা প্রাসঙ্গিক, অর্থাৎ পূর্বের বাক্যে বা বাক্যগুলিতে যে প্রসঙ্গ বলা হয়েছে এ বাক্যেও তারই রেশ ধ্বনিত হয়। এই বাক্যগুলি ক্ষুদ্র হলেও গুরুত্ব কম নয়। যেমন দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম বাক্যটি। বাক্যবিন্যাস সাধনা সাপেক্ষ। কেবল অসমাপিকা ক্রিয়াতেও যে বাক্য বয়ন সম্ভব এবং কেবল সম্ভব নয়, effect সৃষ্টিতেও যে কত কার্যকরী হতে পারে তার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রথম উদাহরণের শেষ বাক্যটি। খুব বড় শিল্পী না হলে ভাষার এই সাম্য ও সৌন্দর্য রক্ষা সম্ভব নয়।—বাক্য বয়নে শব্দগুলির নির্বাচনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহু শব্দ আছে যেগুলি বাক্যের ভাবগত আবেদন সৃষ্টিতে নিতান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও বক্তব্যকে যথাযথভাবে প্রকাশের জন্য বাক্যের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ও ব্যবহৃত হয়। এগুলি আপাতদৃষ্টিতে অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হলেও বাক্যবয়নে এ গুলির মূল্য যথেষ্ট। যেমন···তেমন, যেরূপ···সেরূপ, ইত্যাদি রূপের বাক্যগুলি এই কারণেই Balanced Sentence রূপে পরিচিত হয়। দু-একটি উদাহরণ দেখা যাক :

(১) এই জল-স্থল, আকাশ, এই চারিদিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা, এই উর্দ্ধ-অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল ; অথচ সে এই চঞ্চল মানবটিকে এক মুহূর্তের জন্যও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না।

(২) তাহারা **যেমন** আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন **সেইরূপ** তাহাদের নিকট অদৃশ্য।

(৩) সে আমাকে পাগল মনে করিল কিনা জানি না, **কিন্তু** তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি ৺অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমুকনাথ **বটে**।

শব্দগুলির গুরুত্ব কত তা এমনিতেই বোঝা যায়। চিহ্নিত শব্দগুলি বাদ দিলে বাক্য-ধৃত বক্তব্যও প্রকাশের দিক থেকে শিথিল হয়ে পড়বে সমগ্র বাক্যগত সুষমা ও সাম্য বিনষ্ট হবে।

রচনার ষ্টাইল বাক্যের গঠনে ও তার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। যেমন একই দৈর্ঘের পর পর ব্যবহারে একটি বা একাধিক অনুচ্ছেদ রচিত হলে রচনাশ্রী নষ্ট হতে বাধ্য। একটি উদাহরণ :

নানা রঙের আলোক সজ্জা। নিওন বাতি। চীনা অক্ষর। উপর থেকে নীচে। ছবির মতো দেখতে। রঙিন অক্ষর। আলোকিত অক্ষর। যেন রং মশাল জলছে।

রচনা পাঠের জন্য। তা নীরব পঠনই হোক আর সরব পঠনই হোক। আর পঠনে ধ্বনি তরঙ্গের উত্থান পতনে এক প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই প্রবাহ স্বচ্ছন্দ। পঠনকালে যতির দ্রুত

ব্যবহারে যদি সে গতি প্রবাহ বার বার আটকে যেতে থাকে তা'হলে পাঠের আনন্দ থাকে না, আড়ষ্টতা ও বিরক্তি সৃষ্টি হয়। এই উদ্ধৃতিটিতে শব্দ অনুযায়ী ৪ থেকে ২ শব্দ দৈর্ঘের এক একটি বাক্য মাত্র। মোট ২১টি শব্দ, ৮টি বাক্য। অর্থাৎ গড়পড়তা ৩টিরও কম করে শব্দ এক একটি বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে বাক্য দৈর্ঘ কত হবে তার কোন লিখিত নিয়ম নেই কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে ১৫-২৫ পর্যন্ত সাধারণ Sentence length ধরে আলোচনা করা হয়।— উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের বাক্য দৈর্ঘ ২০—৫০, ৬০ পর্যন্তও লক্ষিত হয়। কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে রচনাশ্রী সর্বদা আহত হয়নি। বস্তুত বাক্য দৈর্ঘের জন্য উনবিংশ শতকের বাংলা গদ্যসৌন্দর্য কোথাও বিনষ্ট হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যেও ৩০-৪০ দৈর্ঘের একাধিক বাক্য বিরল নয়। আসলে বড় বাক্যও যদি বার বার অনেকবার ব্যবহৃত হয় তাহলেও গদ্যশ্রী থাকে না। ছোট, বড়, মাঝারি বিবিধ দৈর্ঘের বাক্যের মিশ্রিত ব্যবহারে গদ্যের ছন্দ কাব্যের ছন্দের মত সুনিরূপিত নয়; এলোমেলো, উত্থান-পতনের অনিয়মতাই তার নিয়ম। ভাঙ্গা গড়ায়, ওঠা নামায় যে বিশৃঙ্খল-বিন্যাস তাতেই তার শৃঙ্খলা। ধ্বনি প্রবাহের তরঙ্গমুখরতায় তার শ্রী। শব্দের গঠনে, নির্বাচনে, সজ্জায়, যতি স্থাপনে, বাক্যের নির্মাণে, বিন্যাসে সেই ছন্দ, সেই শ্রী পূর্ণ হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রচিত গদ্যে একটি বাক্য ৪০০ শতাধিক শব্দের (সোম প্রকাশ, ১৫ই নভেম্বর ১৮৫৮, দ্রঃ বিনয় সরকার, (সম্পা) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩২৫।) বাক্যটিতে ২৫টি কমা, ৪টি সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যটি অতি দীর্ঘ সন্দেহ নেই, কিন্তু বাক্যটির নির্মাণ-কৌশল লক্ষণীয়। বয়নগত ত্রুটি কোথাও নেই। কিন্তু Style archaic, ক্লান্তিকর, একঘেয়ে। একই সুরের ধাঁচে বাধা। রাগ-বৈচিত্র্য বিহীন। কিন্তু নীচের অংশটির গদ্যরীতি?

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো তোমার শেষ হয়নি আমাদের গ্রামে বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়া ঘাটের সীমানায়। তোমার সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে. ইছামতি পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ার পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে, দেশ ছাড়িয়ে, দেশান্তরের দিকে সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্য্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে...দিন, রাত্রি পার হয়ে, জন্ম পার হয়ে, মাস বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়—তোমাদের মর্মর জীবন স্বপ্ন শেওলা ছাতা দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না।...চলে...চলে...এগিয়েই চলে...অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ...সে পথের বিচিত্র আনন্দ যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘর ছাড়া করে এনেছি...চল এগিয়ে যাই।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় (বলেন, ছাড়িয়ে, পার হয়ে, পাশ কাটিয়ে, ছেড়ে, এড়িয়ে প্রভৃতি) কেমন ভাষার ছন্দস্পন্দ ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে চলেছে এখানে। 'ঘরছাড়া করে এনেছি' সমাপিকা ক্রিয়ার সমাপ্ত বাক্যটিও যেন ঐ অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির দোলায় চঞ্চল। 'ঘর ছাড়া করে এনেছি'তেও তাই তার শেষ নেই। পূর্ণচ্ছেদ নেই, পথ আরো প্রশস্ত। খোলা। সেখানে পরিপূর্ণ মুক্ত আহ্বান—'চল এগিয়ে যাই'। যতি চিহ্নের এমনি ব্যবহার-নৈপুণ্য। থামায়, চলায়,

যতিতে, গতিতে এমনিতর এক গদ্যছন্দ ধ্বনি স্পন্দিত হয়ে উঠেছে যে এর অন্তরে সেই অনতিস্ফুট ভাষার সঙ্গীত বার বার আকৃষ্ট করে। 'সোনাডাঙার মাঠ', পদ্মভরা মধুখালি বিল, 'ধলচিতের খেয়া ঘাট' আর 'ইছামতি নদী' এখানে চিত্রময় ধ্বনিমুখর। অথচ সর্বত্র সেই সংযম। ফলত শিল্প-শোভন একপ্রকার স্বাদু গদ্য হয়েছে! বহু দৈর্ঘ্যের বিচিত্রবাক্য একাধিক শ্রেণীর যতিতে, ধ্বনিপ্রবাহে নিয়ন্ত্রিত। রুদ্ধ, মুক্ত দলে (closed and open Syllable) বিন্যস্ত, নির্বাচিত শব্দগুলি বাক্যের ছন্দ দোলায় তরঙ্গায়িত। সর্বত্র বিশৃংখলা কিন্তু সমগ্রতায় শৃংখলা, ছন্দ। Aristotle যথার্থ ই বলেছেন, The from of style must be within metrical or yet without rhythm.···prose style must have form, but not metre. (Lucas, F. L., The harmony of prose : Style, 1964 con., 190)

বাক্যের মধ্যে এই মহৎ কর্মের অনেক কিছু ঘটে। এক বা একাধিক বাক্যে গড়ে ওঠে অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে পরিচ্ছেদ; অধ্যায়। সমগ্র রচনা। তাই বাক্যের কথা সর্বাগ্রে। একটি বাক্য লিখবার পূর্বে বহুক্ষণ চিন্তার দরকার। রচনার প্রসাদগুণ আপনাআপনি গড়ে ওঠে না। মুখের ভুল বক্তব্য সংশোধন করবার অবকাশ থাকে। কিন্তু লেখায় সে অবকাশ কম। তাই যা বক্তব্য ঠিক তাই প্রকাশের জন্য ভাষার যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন; আর তার জন্য দরকার দীর্ঘ সাধনা, ধৈর্য ও সতর্কতা। মনে রাখা দরকার পুষ্প আপনাতে আপনি বিকশিত হয় না মাটি, জল, হাওয়া, আলো সবই দরকার। ভালো লেখার জন্যেও দরকার ভাষার আলোকিত বিষয়গুলির সাধনা।

অন্যান্য পাঠিতব্য গ্রন্থ :

১ Scott, A. F., Meaning by Style, London, 1928

২ Murry, Middleton., Problem of style, London, 1922, 1958

৩ Ullmann, Stephen., Style in the french novel, England, 1957

৪ Read, Herbert, English prose Style, London, 1928, 1956.

বিলুপ্ত জনপদ ফিঙ্গেডাঙা

তারাপদ পাল

পলিওলিথিক বা নিওলিথিক যুগের কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। তবে জনশ্রুতি অনুসরণে একথা বলা যায় যে, পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা চালালে হয়তো কোন অজানা ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। পাওয়া যেতে পারে অতীতের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া কোন রাজপাটের কাহিনী। বাঙলা দেশের ইতিহাস রচনায় কোন সত্য-সূত্রের যবনিকাও উন্মোচিত হতে পারে —যা লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির খেয়াল খেলায় মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু সে-সবই হল ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষকদের বিষয়।

জনশ্রুতির যে রাজপাট প্রায় দু'শতাব্দী ধরে মাটির নীচে আত্মগোপন করে আছে, ইতিহাসবেত্তার দৃষ্টিতে তার সত্যতা সম্বন্ধে যতই সন্দেহ থাকুক না কেন, স্থানীয় বাসিন্দারা আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে আজও তার স্মৃতিকে মনের মণি-কোঠায় সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছে। তাঁদের এই সরল বিশ্বাসকে একেবারে উপেক্ষাও করা যায় না।

আজও প্রতিবছর বর্ষার সময় প্লাবন ও বন্যার সম্ভাবনায় স্থানীয় ব্যক্তিদের মনে যেভাবে দুশ্চিন্তার কালো-ছায়া নেমে আসে, তাতে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়না যে তিন-শতাব্দী আগে এই সব জায়গা অধিকাংশ সময় দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের উন্মত্ত খেলায় জলময় হয়ে থাকতো। প্রকৃতির সেই খেলাই ভাগ্যান্বেষী মানুষের মনে এক ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার ইংগিত বহন করে এনেছিল। তাই একসময় গড়ে উঠেছিল জনপদ—যেখানে তার সম্ভাবনাও ছিল বিরল। শুধু জনপদই নয়, সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল রাজপাটও। কালের প্রকোপে সেই রাজপাটও যেমন একদিন হারিয়ে গিয়েছিল, তেমনি রাজনৈতিক কারণে সাময়িক ভাবে বিনষ্ট হয়েছিল জনপদ। কিন্তু তার অস্তিত্বকে, কোন কিছুই সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করতে পারেনি কোনদিন। সময়ান্তরে আবার সেখানে মানুষের ভিড় বেড়েছে। কোলাহল শোনা গেছে। সুখে দুঃখে গ্রামের মানুষ একসঙ্গে কেঁদেছে হেসেছে। প্রাসাদ তৈরী করেছে। ঐশ্বর্য-সম্পদ দেখা দিয়েছে। তার ধারা আজও অব্যাহত।

হাওড়া জেলার মাঝখান দিয়ে দামোদর নদ প্রবাহিত দক্ষিণমুখে। যেন পূর্বে পশ্চিমে ভাগ করে দিয়েছে সমস্ত জেলাটিকে। এর পূর্ব পাড়ে যেখানে আমতা শহর, আমতা বন্দর—তারই ঠিক বিপরীত দিকে দামোদরের পশ্চিম পাড়ে 'বেতাই'। 'বেতাই' আজ কেবল একটা নাম বটে— কিন্তু একসময় এ-ছিল বেতাই বন্দর। হাওড়া জেলার এককালের বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রস্থল। নাম ছাড়া তার কোন চিহ্নও আজ আর অবশিষ্ট নেই। বেতাই থেকে বরাবর পশ্চিম মুখে চলে গেছে একটা পিচ বাঁধানো সড়ক অমরাগড়ি পর্য্যন্ত। তারপর থেকে রাউতারা ও ঝিকিরা গ্রামের মধ্যে দিয়ে মাটির রাস্তা হাওড়া জেলাকে অতিক্রম করে চলে গেছে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার মধ্যে। আগে এই হুগলী ও হাওড়া ছিল একটি জেলা।

বেতাই থেকে মাইল দুই পশ্চিমে ঐ পিচ বাঁধানো রাস্তার পাশে, ডানদিকের গ্রাম 'খড়িঅপ'। এই খড়িঅপই তিনশ বছর আগে সেই রাজপাটের ঐতিহ্যের সাক্ষী। সেই কাহিনীর গৌরববাহী গ্রাম।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন অধিকাংশ সময়ই এই সব এলাকা দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে জলমগ্ন হয়ে থাকতো। জমি ছিল অসমান। অসংখ্য খাদ ও ছোট ছোট গাড্ডা। বন্যার জল নেমে যাবার পর ঐ সব খাদগুলোয় জল জমে থাকতো। সেই সঙ্গে ঐ সব জলায় থেকে যেতো অসংখ্য নদীর মাছ। ভাগ্যান্বেষী মানুষেরা ঐ-সব মাছ ধরে বিক্রী করে পয়সা উপার্জনের লোভে ঐ সব জায়গায় গিয়ে হাজির হতো। সেই ভাবে কয়েকঘর কোচ বা তিওর জাতীয় লোক এসে ঘর বাঁধে। সারা বছরই ঐ সব জলায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। তাই ওখানে বসবাস করতে তাদের কোন অসুবিধা হত না।

আবার ঐ প্লাবনের প্রভাবে জমির ওপর পলিজমে খাদগুলো যেমন ভরাট হত, তেমনি উঁচু হত। এবং সেই সব উঁচু জায়গায় স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের বসবাসের সুবিধা হত। জমিও হত উর্বর। একদিকে অধিকাংশ সময় এই এলাকা থাকতো জলে ডুবে, তেমনি ছিল অসংখ্য খড়িবন। খড়ি-র চাষ ছিল প্রায় প্রধানতম কৃষি-সম্পদ। জনশ্রুতি বলে: সেই খড়ি ও জল (অপ্) থেকেই গ্রামের নাম হয় 'খড়িঅপ'। আশে পাশের গ্রামগুলির নাম থেকে এই জনশ্রুতির সত্যতা যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। লক্ষণীয়: ধাঁইপুর (এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান চাষ হতো); থালিয়া (ভাল পাট চাষ হতো এবং সেই থেকে থলে তৈরীর শিল্প গড়ে উঠেছিল); কলবাঁশ (এখানে প্রচুর বাঁশ জন্মে)। এই খড়িঅপের সীমা আজকের সীমার থেকে অনেক বড ছিল। প্রকৃতপক্ষে আজকের ধাঁইপুর, কলবাঁশ প্রভৃতি গ্রামগুলি প্রাচীন খড়িঅপেরই অঙ্গ ছিল। পূর্বে এখানে প্রায় একশ' বিঘা পরিমিত এলাকা জুড়ে ছিল এক বিরাট দীর্ঘিকা। সেই দীর্ঘিকার পাড়গুলি ছিল খুব উঁচু এবং তাদের বিস্তৃতি ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাত করে। দীর্ঘিকার বকচরও ছিল কমবেশী ষাট হাত। সেই বকচর ও পাড়ই কালে বিভিন্ন গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। পশ্চিম পাড়ে গড়ে উঠেছে ধাঁইপুর, উত্তর পাড়ে বেড়ধান্যপুর, পূর্ব পাড়ে বর্তমান খড়িঅপ এবং দক্ষিণ পাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলবাঁশ।

বর্তমান খড়িঅপ গ্রামে বসু জমিদারদের জীর্ণপ্রায় বিশাল প্রাসাদের প্রায় লাগোয়া পশ্চিম দিকে পড়ে আছে বেশ খানিকটা অসমান জমি। উঁচু উঁচু ঢিপিতে প্রায় ভরা। মাঝে মাঝে খাদ বা গাড্ডা। ঢিপিগুলোর প্রায় সবগুলিই জঙ্গলময়। এই এলাকাটাই বর্তমানে 'ফিঞে ডাঙা' নামে পরিচিত। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস: এখানেই ছিল ফিঞে রাজার রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য সংলগ্ন গৃহাদি। সে-সবই কালের প্রকোপে মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে। খানিকটা দূরে রয়েছে একটি পুরনো শিবমন্দির। প্রায় জীর্ণ। এই মন্দিরের কিছুটা অংশ এখন মাটির তলায় বসে গেছে। মন্দিরটি কে নির্মাণ করেছিলেন তা' সঠিক ভাবে জানা যায় না। কেবল কিংবদন্তী

বলে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ফিঙ্গে রাজা। মন্দিরের পশ্চিম দিকের দরজার ওপরে একটা চারকোণা শিলাপটে লেখা আছে: "শ্রীনমঃ শিবায়। শকাব্দা ১৬০৩ শ্রীহরিকর্ম্ম"। এর থেকে বোঝা যায় যে ১৬০৩ শকাব্দে অর্থাৎ বর্তমান সময় থেকে প্রায় ২৮৭ বছর আগে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ ছিলেন না। "শ্রীনমঃ" শব্দটি তার প্রমাণ।

কিংবদন্তী অনুসারে মন্দিরটি যদি ফিঙ্গে রাজারই প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তিনি ২৮৭ বছরের আগেই ওখানে বর্তমান ছিলেন। যে একশ' বিঘা পরিমিত দীঘির কথা বলা হয়েছে, ১১৮ বছর আগেও সেখানে ছোট হয়ে এলেও বিরাট একটা জলাশয় ছিল। বর্তমানে তা আরও ছোট হয়ে ছোট্ট একটি পুকুরে পরিণত হয়েছে। এই পুকুরের পাড়েও দুটো ছোট শিবমন্দির আছে। তার একটির নিম্নাংশের সামনের দিক মাটির নীচে বসে মন্দিরটি হেলে গেছে। উক্ত দীঘি বর্তমানে ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

মাছ ধরাকে জীবিকা করে প্রথম যেসব কোচ বা তিওররা এখানে বসবাস শুরু করে, তাদের নেতৃস্থানীয় কিশোর বয়স্ক এক বালক—বর্তমান কাহিনীর নায়ক, নাম তার ভৃঙ্গ। জাতিতে ব্যগ্রক্ষত্রিয়। মাছ ধরা অপেক্ষা গোচারণ কাজ নিয়েই সে সময় কাটাতো। 'ভৃঙ্গ' শব্দটা পরবর্তী কালে লোকমুখে বিকৃত হয়ে 'ফিঙ্গে'তে দাঁড়ায়।

শোনা যায়, বালককালে একদিন মাঠে গরু চরাতে চরাতে ক্লান্ত ভৃঙ্গ মাঠে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সে সময় একটা বিষাক্ত সাপ ফণা বিস্তার করে তার মাথার ওপর রাখে। সে-সময়ে একটা ফিঙ্গে পাখি ঐ সাপকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই অতিলৌকিক ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে ভৃঙ্গ সম্পর্কে এই ধারণা হয় যে, সে নিশ্চয়ই কোন দৈবীক্ষমতার অধিকারী। স্বভাবতই ঐ বালকের প্রতি তখন তারা খুব সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। ক্রমে ভৃঙ্গও সকলের মন জয় করে এবং ঐ সকল কোচদের নেতার আসন দখল করে। নেতা বা মোড়ল হবার মতো বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, মানবিকতা প্রভৃতি গুণ তার ছিল বলে বিশ্বাস। ধর্ম কর্মের প্রতিও তার অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। এর কিছুদিন পর ভৃঙ্গের ভাগ্যের চাকা দ্রুততালে ঘুরতে শুরু করে।

দামোদরের বন্যায় সেবারও যথারীতি গ্রামগুলি জল-প্লাবিত হলো। কয়েকদিন পর বন্যার জল নেমে যেতে সবাই মিলে মেতে উঠলো মাছ ধরায়, মাছ ধরুয়াদের সঙ্গে ভৃঙ্গ গিয়েছিল মাছধরা দেখতে। মাছধরা দেখতে দেখতে হঠাৎ তার চোখে পড়লো পায়ের কাছে জমা পলির ভেতর থেকে কি যেন চিক্ চিক্ করে উঁকি মারছে। পলি সরিয়ে সেখান থেকে সে বের করলো কয়েকটি সোনালী রঙের ইট। বন্ধুদের সাহায্যে সেগুলো তুলে এনে, ধুয়ে, পরীক্ষা করে দেখলো—ধাতব পদার্থ, সোনার তাল।

রাতারাতি প্রচুর ঐশ্চর্যের অধিকারী হলো ভৃঙ্গ। গ্রামবাসীদের প্রয়োজনে সেই সব সম্পদ ব্যয় করতে সে কুণ্ঠিত হলো না। তার বিচক্ষণতা ও সহৃদয়তা তাকে যথাযোগ্য নেতৃত্বের মর্যাদা দিল। তার অমায়িক ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে সকলে তাকে 'রাজা' বলে অভিবাদন জানালো। এই ভাবে তার নামের সঙ্গে রাজোপাধি যুক্ত হয়ে গেল। তিওরগণ, শুধু তিওরগণই

নয়, স্থানীয় সকল শ্রেণীর লোক যেমন তার পরম অনুগত ছিল, তেমনি ভৃঙ্গও তার যথাসর্বস্ব দিয়ে তাদেকে আগলে রাখতো। এই এলাকায় তখন যে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ বাস করতো, তারাও ভৃঙ্গের ব্যবস্থায় ও সেবায় স্ব স্ব ধর্মকার্যে নিয়োজিত থাকতো পরম নিশ্চিন্তে। তাদেকে জীবিকার জন্য উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হতো না। এইভাবে সকলের মধ্যে একটা একতা এবং মানসিক সঙ্ঘবদ্ধতা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে।

এই সময়টা বাদশাহ আলমগীরের শাসনকাল। তাঁর প্রতিনিধি শায়েস্তা খান বাঙলার সুবাদার। বাঙলায় তখন সুদিন। চালের দাম টাকায় আট মণ। সেই সুদিনের বাঙলায় ছোট ছোট বহু রাজা ছিলেন। তাঁরা সুবাদারকে কর দিতেন এবং নিজ নিজ এলাকায় আপন আধিপত্য বিস্তার পূর্বক শাসন কাজ চালাতেন। শায়েস্তা খান ভৃঙ্গকেও সেই রাজন্যের মর্যাদা দিয়েছিলেন। বাদশাহের কাছ থেকে যথাযথ রাজ-মর্যাদা পেয়ে ভৃঙ্গ তার ছোট্ট রাজ্যকে সুখের করে গড়ে তোলে।

প্রায়ই দামোদরের বন্যায় গ্রামবাসীদের প্রচুর কষ্ট হতো। সেই কষ্ট দূর করার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, যত্নসহকারে সমগ্র গ্রামের চারদিক বেষ্টন করে উঁচু বাঁধ তৈরী করান ভৃঙ্গ। সেই বাঁধের পূর্ণ রূপের পরিচয় আজ আর পাওয়া যায় না। তবে তার অস্তিত্বের পরিচয় সামান্য এখনও আছে। এই বাঁধ ছাড়া রাজপাটকে ঘিরে পরিখাও নির্মিত হয়েছিল শোনা যায়। তার কারণও স্পষ্ট? যদিও সে-সময় দেশে সুখ শান্তি বিরাজ করতো, আর্থিক দুর্যোগ জনমানসকে কলুষ মুক্ত রেখেছিল, তবুও দুর্বৃত্তের উৎপাত যে একদম ছিল না, তা বলা যায় না। চুরি ডাকাতি অপেক্ষা লুণ্ঠনের প্রতি কিছু দুর্বৃত্তের বিশেষ আসক্তি ছিল। এ-সময়ে একদল মহারাষ্ট্রীয় দস্যু (বর্গীদল) বাঙলা দেশে দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। সে-কারণেই মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের, গ্রামের জমিদার ও রাজন্যদের চিন্তান্বিত, সাবধান ও সচেতন থাকতে হতো। কখন কোনদিক থেকে কি ভাবে যে তারা গ্রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তার কোন ঠিক ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে ঐশ্বর্যশালী পরিবারগুলি পরিখাবেষ্টিত করে গৃহাদি নির্মাণ করতেন। জনপ্রিয় ফিঞ্রেও তার গ্রামকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সেই মতো ব্যবস্থা করেছিলেন।

ফিঞ্রে রাজার বসতবাটীর পশ্চিমদিকে উত্তর-দক্ষিণে এক বিশাল জলাশয় নির্মিত হয়েছিল। এটাই পরবর্তীকালে 'ফিঞ্রে দীঘি' নামে খ্যাতিলাভ করে। দীঘির পূর্বপাড়ের বহির্ভাগের মধ্যস্থলে ছিল এক বিরাট বাগান। সেই বাগানের পরেই ছিল ফিঞ্রে রাজার ভদ্রাসন। এই ভদ্র'সন পরিচিত ছিল রাজপাট নামে। রাজপাটের উত্তর দিকে, গ্রামের বাঁধের দক্ষিণে দীঘির পূর্বদিকের পাড় থেকে আরম্ভ করে বরাবর পূর্বদিকে লম্বা একটা পুকুর ছিল। সেখানে রাজার রাজহংসের দল জলকেলি করতো। সেই থেকে এই পুকুরটির নাম হয় 'হাঁসগড়'।

বছর পঞ্চাশ আগে নিকটবর্তী একটা পুকুর খননের সময়, সেখানে মাটির নীচে একটা বাঁধানো ঘাট দেখা গিয়েছিল। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, পূর্বে এখানে বাঁধান ঘাট সমন্বিত পুকুর ছিল। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস ঐ পুকুরই ছিল ফিঞ্রে রাজার 'গোলাবাটীর পুকুর'। এই পুকুরের পশ্চিম পাড়ের দক্ষিণ সীমা থেকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি পাড়ের নীচে দীর্ঘ ইষ্টকময়

গৃহশ্রেণীর ভিত্তির চিহ্নও দেখা গিয়েছিল। ঐ ভিত্তি রাজার বৈঠকখানা গৃহের ভিত্তি বলে অনুমান করা যায়।

বৈষয়িক দিক ছাড়াও ফিঞ্রে রাজা যে ধর্ম-কর্মের প্রতিও আকৃষ্ট ছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপে আজও দাঁড়িয়ে আছে পূর্বোল্লিখিত শিব মন্দিরটি। ফিঞ্রে দীঘির উঁচু পাড়ের ওপর মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। দেবসেবার যাবতীয় খরচ তিনিই বহন করতেন।

এই শিব-সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, উক্ত দীঘি খননের সময় একটি প্রস্তরময় মূর্তি উত্থিত হয়। সেই মূর্তিই বর্তমান শিব। সে-সময় একজন ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শিবের সেবায়েত নিযুক্ত হন। তিনি কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন আজ আর তা নিরূপণ করা যায় না। কোন কোন ব্যক্তির মতে এই শিব অনাদিলিঙ্গ। সম্প্রতি ইনি 'খড়্গেশ্বর' নামে পরিচিত এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত হচ্ছেন।

প্রাচীন লোকপরম্পরায় শোনা যায়, ফিঞ্রে দীঘির চারদিকে ইটের তৈরী প্রশস্ত ঘাট ছিল। দামোদরের বন্যায় অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলি মাটির নীচে চলে যায়। শিবমন্দিরের কাছেই ছিল মন্দিরের ঘাট। ফিঞ্রেরাজা বেশীর ভাগ সময়ই সেই ঘাটে বসে নির্জনে সময় কাটাতেন।

সম্ভবতঃ ভৃঙ্গরাজার পর খড়্গেশ্বরের মন্দির সংস্কার করা হয়েছিল। শোনা যায়, হাওড়া জেলার অন্তবর্তী মেল্লক নিবাসী জমিদার মুকুন্দপ্রসাদ রায় মহাশয়ই সংস্কার কাজ করিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদ্বারা শিবসেবার ব্যবস্থা হয় এবং বর্ধমান-রাজ শিবোত্তর ভূমি প্রদান করেন।

চিরদিন সময় একভাবে কাটে না। সেদিনও কাটেনি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত অবস্থারও বদল ঘটে। মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা দুর্যোগের আকারে নেমে আসে খড়িঅপের ওপর।

সাজান রাজ্য ও রাজপাটের ধ্বংসের বীজ অঙ্কুরিত হয়। কেউ দেশ ছাড়ে, কেউ ধর্মান্তর গ্রহণ করে। শেষ রক্ষার সকল চেষ্টায় ব্যর্থ হন ভৃঙ্গরাজা। গ্রাম হয় জনশূন্য। অবহেলা আর অযত্নে জঙ্গল গ্রাস করে সাজানো রাজপাটকে। কালের কোলে হারিয়ে যায় ভৃঙ্গরাজার কাল—তার রাজ্য, রাজগৃহ গ্রাম।

তারপর কতবছর পার হয়ে গেছে। জঙ্গলাকীর্ণ খড়িঅপে আবার নতুন করে জনপদ গড়ে উঠেছে নূতন ইজারাদারদের প্রচেষ্টায়। এই নতুন জনপদ আজও বহন করে চলেছে ভৃঙ্গ রাজার সেই স্মৃতিকে। তারই স্মারক হয়ে বেঁচে আছে 'ফিঞ্রেডাঙ্গা', পুরনো সেই শিবমন্দির।

বিস্মৃত সাহিত্যসেবী ব্যোমকেশ মুস্তফী

দেবজ্যোতি দাশ

ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনে দুটি ধারার গুরুত্ব আছে একদিকে মৌলিক সাহিত্য সৃজন এবং অন্যদিকে সাহিত্যের নিয়মিত আলোচনা, বিশ্লেষণ ও তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা। মুখ্যতঃ শেষোক্ত ধারাটির সার্থক রূপায়ণে এবং শিক্ষার মাধ্যম ও জাতীয় ঐক্যের বনিয়াদ হিসাবে ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা সংহত করার কাজে সাহিত্যসংস্থা ও সাহিত্যসম্মিলন-জাতীয় সারস্বত প্রয়াসগুলির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা গবেষণার এ ধরনের বিদগ্ধ সংগঠন হিসাবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে এই প্রতিষ্ঠানটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে তার মাধ্যমে মাতৃভাষার ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করার কাজে মুষ্টিমেয় যে কয়জনের উদ্যম ও শ্রম নিয়োজিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ব্যোমকেশ মুস্তফীকে প্রথমেই স্মরণ করতে হয়।

ব্যোমকেশ মুস্তফী ১২৭৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন পিরালী ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর মুস্তফী উপাধিধারী মুখোপাধ্যায় বংশের লোক। তাঁর পিতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী বাংলার অভিনয়জগতে বরেণ্য ব্যক্তি ছিলেন; পিতামহের নাম শ্যামাচরণ মুস্তফী। ব্যোমকেশের মা শাকম্ভরী দেবী উত্তর কলকাতার তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই ব্যোমকেশ আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং শুধুমাত্র প্রখ্যাত পিতার পরিচয়েই শ্লাঘা বোধ করা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর জীবনশৈলীর মুখ্য নিয়ামক হয়ে উঠেছিল। কিশোর বয়সেই বন্ধু নন্দলাল সরকার ও নগেন্দ্রনাথ বসুর সাহায্যে বোমকেশ প্রথমে 'তপস্বিনী (১২৮৯ বঙ্গাব্দ) ও পরে 'ভারত' (১২৯১) নামে দুটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। এভাবেই পরবর্তী জীবনের ব্যাপকতর সাহিত্যকর্মের গোড়াপত্তন ঘটে।

কর্মসূত্রে ব্যোমকেশ কলকাতা হাইকোর্টের কোনও একটি বিভাগে সাধারণ বেতনভোগী কর্মচারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু একাজে তাঁর আগ্রহ কোনও দিনই খুব গভীর ছিল না। সুযোগমাত্রেই আদালতের পুরাতন নথির রাশি অতিক্রম করে এসে ব্যোমকেশ বহির্জগতের অবাধ আলোয় মনকে মুক্ত চিন্তা ও মননের অবকাশ দিতেন। উত্তরতিরিশ বয়সে দিনের অধিকাংশ প্রহরই ব্যয় হয়ে যেত বাংলা সাহিত্যে ও বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ পরিচর্যায়।

গতানুগতিক সংসারচিন্তা থেকে ব্যোমকেশের মুক্তি ছিল না। বটব্যাল চণ্ডীচরণ রায়ের কন্যা যজ্ঞেশ্বরী দেবীর সঙ্গে ব্যোমকেশের বিবাহ হয়; তাঁদের চার কন্যা ও তিন পুত্র ছিল।

অর্থোপার্জনে সময়ক্ষেপ করার বিষয়ে ব্যোমকেশের সহজাত অনীহা এবং অনায়াসলব্ধ পারিবারিক বিত্তের অভাব, এই দুই কারণে সারা জীবনই তাঁকে চরম আর্থিক অসংগতির মধ্যে যাপন করতে হয়েছে। তাঁর শেষ রোগশয্যা থেকে লিখিত 'রোগশয্যার প্রলাপ' প্রবন্ধের সরস ছত্রগুলির অন্তরাল থেকে বারবার উত্তমর্ণের তাগাদার রব কানে এসে পৌঁছায়, নিত্যসঙ্গী অভাবের

ক্ষুধাতুর মুখ সহসা চোখে পড়ে, কঠিন রোগের আশ্রয়ে এসে ঋণ পরিশোধের চিন্তা থেকে সাময়িক মুক্তির স্বস্তি অনটনের অসহায়তাকে প্রকট করে তোলে। নিদারুণ দারিদ্র্য, অর্ধাহার এবং অত্যধিক শ্রমের ফলে ব্যোমকেশের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত এই রোগেই তাঁর জীবনাবসান হয়। 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রের ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'শোক-সংবাদ' প্রসঙ্গের অন্তর্গত '৺ব্যোমকেশ মুস্তফি' প্রবন্ধে এবং ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'য় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর লিখিত 'শোক-সংবাদ' প্রবন্ধে ব্যোমকেশের মৃত্যু তারিখ ১৩২২ বঙ্গাব্দের ১৯ চৈত্র বলে উল্লেখিত হয়েছে।

সারা জীবন যে লোকটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কাজে নিজেকে নিঃশেষে দিয়ে গিয়েছিলেন, পরিষদে তাঁর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার আয়োজন দুটি চিত্রপ্রতিষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ। অথচ সমকালীন সাময়িক পত্রগুলির উদ্ধৃতি থেকে পরিষদের হিতার্থে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী ও অকাতর শ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' পর্যায়ে লেখা হয়েছিল :

"বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের জন্য তিনি বহুবৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে অবিরত নিঃস্বার্থ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন। ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে তিনি এই কার্য্যে অকাতরে সময় ও শক্তি নিয়োগ না করিলে পরিষদ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহার সেরূপ উন্নতি এখনও হইত না।"

১৩২৩ বঙ্গাব্দের জ্যেষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ'-এ শোক-সংবাদ' প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ৺ব্যোমকেশ মুস্তফি' প্রবন্ধে বলা হয়েছিল :

"স্ত্রী পুত্র কন্যার সহিত মানবের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ, সাহিত্য-পরিষদের সহিত ব্যোমকেশ মুস্তফির সম্বন্ধ বুঝি তাহা অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর ছিল।...এমন একাগ্রতা, এমন নিষ্ঠার সহিত পরিষদের সেবা আর কেহ করিতে পারেন নাই, একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে ; এবং ভবিষ্যতে কেহ পরিবেন কি না সন্দেহস্থল।...বস্তুতঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের আজিকার উন্নত অবস্থা একমাত্র ব্যোমকেশ মুস্তফির অক্লান্ত চেষ্টার ফল।"

আজকের পরিষদে ব্যোমকেশ অর্ধবিস্মৃত হলেও পরিসদের তৎকালীন কর্মাধ্যক্ষ ও কর্ণধারগণ তাঁর স্বার্থবিরহিত সেবাকে বারবার স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সমসাময়িক পরিষৎ-সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় 'শোক-সংবাদ' শিরোনামায় লিখেছিলেন :

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্তমানে যে উন্নত অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশই তাঁহার অবিশ্রান্ত উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।"

পরিষদের এককালীন সহ-সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ব্যোমকেশের জীবিতকালেই ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'মানসী' পত্রিকায় 'একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী' নামে ছন্দোবদ্ধ প্রশস্তিতে লিখেছিলেন :

"নিজ বক্ষ-রক্ত দিয়া করেছ গঠন,
বিপুল সাহিত্য-কেন্দ্র, মায়ের মন্দির,

ছেঁড়া-পুথি, ইট-কাঠ নানা উপচার—
অপূর্ব পূজার অর্ঘ্য এনেছ সুধীর !"

পরিষদের অন্যতম কর্ণধার এবং সমকালীন সহকারী সভাপতি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র পরিষদে অনুষ্ঠিত শোকসভায় মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেছিলেন :

"তাহার সমস্ত জীবনটা পরিষদের কর্মে নিযুক্ত ছিল ; পরিষদের কাজ করতেই,—পরিষৎকে ভালবাসিতেই, তাহার সমস্ত জীবনটা কাটিয়া গেল ; অন্য চিন্তার সে অবসর পাইল না—জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার তাহার অবসর ঘটিল না।" ('স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী', মানসী ও মর্মবাণী, বৈশাখ ১৩২৩)

আজথেকে অর্ধশতাব্দী পূর্বের এসকল উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রচারবিহীন সাহিত্যসেবায় ব্যোমকেশ ছিলেন অর্পিতপ্রাণ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে ব্যোমকেশের সম্বন্ধ ছিল প্রায় বিশ বছর। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৭ শ্রাবণ পরিষদের এক অধিবেশনে ব্যোমকেশ সদস্যপদে নির্বাচিত হন। তখন থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কোনও না কোনও প্রকারে তিনি অবিরত পরিষদের নানা কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ব্যোমকেশের লিখিত 'রোগশয্যার প্রলাপ' গ্রন্থের (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ লিখেছেন :

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উন্নতি, পুষ্টি ও প্রসারের জন্য একমাত্র ব্যোমকেশই শরীর, মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন।"

পরিষদে ব্যোমকেশের অবদানের বিস্তৃতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (পীরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ)' গ্রন্থের ১মখণ্ডের পরিশিষ্টে মন্তব্য করেছেন : "বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের পুস্তকালয়, চিত্রশালা, গৃহনির্ম্মাণ সমস্তই ব্যোমকেশের পরিশ্রমের ফল।"

সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই এবং পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচনের অব্যবহিত পর থেকেই বোমকেশ এই প্রতিষ্ঠানের সত্যকার উদ্দেশ্য আন্তরিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন, তার হিতসাধনের সঠিক পন্থা সম্বন্ধেও তাঁর সম্যক ধারণা হয়েছিল। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২ চৈত্র পরিষদের এক অধিবেশনে ব্যোমকেশ প্রাচীন কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ; সেই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'মানসী ও মর্মবাণী'তে 'স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী' প্রবন্ধে লিখেছেন :

"প্রবন্ধটি আমি অবহিত হইয়া শুনিয়াছিলাম—প্রবন্ধ শুনিয়াই আমার বোধ হইল, পরিষদের এইবার কথা ফুটিয়াছে ; পরিষদের এইবার কাজ জুটিয়াছে। বাঙ্গলার প্রাচীন লুপ্ত সাহিত্যের উদ্ধার করিতে হইবে—ইহা পরিষদের একটা প্রধান কাজ। কাহারও কাহারও মনে এই কথাটা অস্পষ্টভাবে জাগিতেছিল ; ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ তাহা স্পষ্ট করিয়া জাগাইয়া দিল। আমি বুঝিলাম, পরিষদের কাজ জুটিয়াছে, একজন কর্মীও জুটিয়াছে।"

ব্যোমকেশ দীর্ঘদিন পরিষদের সহ-সম্পাদক পদ অলংকৃত করেন (১৩০৬-২২ বঙ্গাব্দ)।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি পরিষদের প্রাচীন শব্দ-সমিতি (১৩০৪), ঐতিহাসিক-সমিতি (১৩০৫), কবিকঙ্কণচণ্ডী সমিতি (১৩০৫), গ্রন্থ-সমিতি (১৩০৫), নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতিরক্ষণ সমিতি (১৩১৫) প্রভৃতির সদস্য হিসাবে নানা গঠনমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সহ-সম্পাদক পদে থাকার সময়ে পরিষদের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজই তাঁর উদ্যোগ ও শ্রমে সম্পন্ন হত। সে সময়টা ছিল পরিষদের স্বর্ণযুগ। বাংলা সাহিত্যের সর্বোচ্চ মানের রথীরা ছিলেন সেকালের পরিষদের কর্মকর্তা। ব্যোমকেশের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে অন্যতম সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন বিনয়কুমার সরকার, মৃণালকান্তি ঘোষ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি কৃতবিদ্য পুরুষেরা। কিন্তু সকলের মধ্যে ব্যোমকেশই ছিলেন পরিষদের প্রকৃত প্রাণধারাটির প্রতীক। পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ বিবেচনায় সে যুগে অনেক সময়েই শ্লেষ করে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ওরফে ব্যোমকেশ মুস্তফী' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। পরিষদের এ সময়ের কার্যবিবরণীতে ছত্রে ছত্রে ব্যোমকেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বহু অধিবেশনেই নির্ধারিত প্রবন্ধলেখকের অনুপস্থিতিতে ব্যোমকেশ সেই প্রবন্ধ পড়ে শুনিয়েছেন, বিগত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করে সেটি অনুমোদনের প্রস্তাব এনেছেন, প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করে পরিষদে দান করেছেন, লোকান্তরিত সাহিত্যসেবীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন, পঠিত প্রবন্ধের আলোচনায় মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, এমনকি পরিষদের গৃহপ্রবেশ উৎসবে (১৩১৫,২১ অগ্রহায়ণ) পরিষৎ-ভবনের দ্বারে দাঁড়িয়ে সমাগত সাহিত্যস্রষ্টাদের মাল্যচন্দনে ভূষিত করেছেন। শেষোক্ত অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়ে 'সময়' নামে সাময়িক-পত্রে ব্যোমকেশের সৌজন্যপূর্ণ অতিথিসম্বর্ধনার বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের এবং বাংলার বাইরের বিভিন্ন শহরে সংগঠিত নানা সাহিত্যসংস্থাকে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত করে একটি সুসংহত সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াসে ব্যোমকেশ ঐ সব সংস্থার সঙ্গে পত্রালাপ ও আলোচনার দ্বারা যে প্রচেষ্টা শুরু করেন, তারই ফলস্বরূপ পরিষদের শাখা-সভাগুলির উদ্ভব হয়। মুখ্যতঃ তাঁরই চেষ্টায় ১৩১২ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দের মধ্যে মফস্বলের ১৬টি শাখাসভা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'বাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাহিত্য-সংবাদ' থেকে গৃহীত নীচের উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য :

"কিছুদিন হইল, রঙ্গপুরে ও ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই শাখা সভা স্থাপনের মূলে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ঐ দুই শাখা সভার স্থাপনকাল হইতে, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, শিলং, ময়মনসিংহ, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে পরিষদের শাখা-সভা স্থাপনের চেষ্টা ব্যোমকেশবাবু করিতেছিলেন।"

নগেন্দ্রনাথ বসুও তাঁর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (পীরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ)' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের পরিশিষ্টে ব্যোমকেশের এই অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন :

"মিরাট হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত পরিষদের শাখা স্থাপন প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই হইয়াছে।"

পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন ও সংঘটনেও ব্যোমকেশের

অবদান উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে তিনি ঐ সম্মিলনের পরিচালন-সমিতির সদস্য, অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সম্পাদক (১৩২০ বঙ্গাব্দ), সাহিত্য শাখার সম্পাদক (১৩২০), অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য (১৩২১) ইত্যাদি নানা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বিষয়-নির্বাচন, কার্যবিবরণ প্রণয়ন, অনুষ্ঠানের বিন্যাস প্রভৃতি কাজে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। ১৩১৪ থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রত্যেক অধিবেশনের অনুষ্ঠানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এ প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন :

"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনেও তিনি সুহৃদ্বর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।" ('বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস : পীরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ (১ম খণ্ড)', পরিশিষ্ট)। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতেও একাধিকার তাঁর এই ভূমিকার উল্লেখ আছে ; যথা :

"শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মুখ্যতঃ সাহিত্য-সম্মিলনসংক্রান্ত কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।" ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টাদশ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮)।

বহু সম্মিলন ও সংস্থায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একমাত্র বা অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে ব্যোমকেশ প্রেরিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখযোগ্য :

সংস্থা	অধিবেশনস্থল	অধিবেশনের তারিখ
মুসলমান শিক্ষা সমিতির প্রাদেশিক অধিবেশন	ত্রিপুরা	১৩১১, বৈশাখ ?
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন	বগুড়া	১৩১৫, ১৮-১৯ মাঘ
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন	গোয়ালপাড়া	১৩১৬, ৯-১০ মাঘ
মুসলমান শিক্ষা সমিতির অধিবেশন	কলকাতা	১৩১৮, আশ্বিন
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন	কামাখ্যাশৈল	১৩১৮, ২৪-২৫ চৈত্র

প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, বাংলা ব্যাকরণ, অভিনয়জগৎ, প্রত্নবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে ব্যোমকেশের আগ্রহ ছিল, উৎসাহ ছিল, অল্পাধিক অধিকারও ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত তাঁর প্রবন্ধগুলির বিষয়বৈচিত্র্য থেকে এবিষয়ে ধারণা করা যায় ; পরিষদে পঠিত ঐ প্রবন্ধগুলির দৃষ্টান্ত তালিকার আকারে দেওয়া হল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত ব্যোমকেশের প্রবন্ধ

প্রবন্ধের নাম	প্রবন্ধপাঠের তারিখ
কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল	১৩০৩, ২ চৈত্র
পাঁচালিকার ঠাকুরদাস	১৩০৪, ফাল্গুন
রাজকবি জয়নারায়ণ	১৩০৫ ?
মহাভারতের গঠন	১৩০৫
আদিশূর ও জয়ন্ত	১৩০৬ ?
বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত	১৩০৮, ১২ আশ্বিন
১৩০৯ সালের বাঙ্গালা সাহিত্য	১৩১০ ?
১৩১০ সালের বাঙ্গালা সাহিত্য	১৩১১, ২৬ বৈশাখ

১৩১১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ	১৩১২, ১৭ বৈশাখ
বাঙ্গালা নামরহস্য : ১ম ভাগ	১৩১২, ১৪ শ্রাবণ
গঙ্গারাম রচিত মহারাষ্ট্রপুরাণ	১৩১৩, ২ চৈত্র
বাঙ্গালা নামরহস্য : ২য় ভাগ	১৩১৪, ২০ পৌষ
মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও বঙ্গসাহিত্য	১৩১৪, ৩ ফাল্গুন
বাঙ্গালার উপসর্গ	১৩১৫, ৪ শ্রাবণ
প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্যসেবা	১৩১৬, ২৪ মাঘ
বাঙ্গালা-বিশেষণ-রহস্য	১৩১৭, ২৬ আষাঢ়
বাঁকুড়া-দর্শন	১৩২০, ১২ আশ্বিন
বাণীকণ্ঠের মোহনমোচন নামক ভক্তিগ্রন্থ	১৩২০, ১৪ অগ্রহায়ণ
চণ্ডীদাস-রচিত 'কৃষ্ণজন্মলীলা'	১৩২০, ১৫ চৈত্র
বরদাচরণ মিত্রের জীবন-রচিত	১৩২২, ২৩ শ্রাবণ

তালিকায় প্রদত্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বরদারচরণ মিত্রের জীবন-চরিত' প্রবন্ধটি নলিনীরঞ্জন সভায় পড়ে শোনান এবং 'বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধটি বিস্তারিত পাঠের সময়াভাবে রবীন্দ্রনাথের 'কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধের (একই দিনে পঠিত) পরিশিষ্টরূপে গৃহীত হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাইরে ব্যোমকেশ যে সব প্রবন্ধ পাঠ করেন তার মধ্যে ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৩য় অধিবেশনে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৩ ফাল্গুন তারিখে পঠিত 'বাঙ্গালা সম্বোধন রহস্য' নামে প্রবন্ধ এবং কামাখ্যাশৈলে উত্তরবঙ্গ সম্মিলনের ৫ম অধিবেশনে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৪ চৈত্র তারিখে পঠিত 'সাহিত্যের পুষ্টিবিষয়ে অনুবাদের স্থান' নামে প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। কোনও সাহিত্যবাসরে বোমকেশ স্বরচিত কবিতাও পাঠ করেছেন ; দৃষ্টান্তস্বরূপ নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ' কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক পূর্ণিমা-মিলন সভায় পঠিত ব্যোমকেশের কবিতাগুলির (যথা—১৩১২ বঙ্গাব্দের ২৬ মাঘ তারিখে পঠিত 'একাদশ পূর্ণিমা-মিলন') উল্লেখ করা যায়।

সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বোমকেশের গবেষণা-প্রবন্ধ, সরস প্রবন্ধ, কবিতা, আখ্যায়িকা প্রভৃতির মধ্যে কতকগুলির একটি তালিকা এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হল ; এ থেকেই তাঁর অধীত বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং দূরপ্রসারী আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাবে।

ব্যোমকেশের লিখিত প্রবন্ধের তালিকা

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার নাম	পত্রিকার সংখ্যা
কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	১৩০৩, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
বিবিধ প্রসঙ্গ	ঐ	১৩০৪, ৩য় সংখ্যা
কবি জয়নারায়ণ দাসের শ্রীকরুণানিধান লীলাগান (অসমাপ্ত)	মালা	১৩০৪, মাঘ
শীতলা-মঙ্গল	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	১৩০৫, ১ম সংখ্যা
পাঁচালিকার ঠাকুরদাস	ঐ	১৩০৫, ৩য় সংখ্যা

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার নাম	পত্রিকার সংখ্যা
রাজকবি জয়নারায়ণ	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	১৩০৭, ১ম সংখ্যা
সত্যনারায়ণ কথা (কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায় প্রণীত)	ঐ	১৩০৮, ১ম সংখ্যা
সত্যদেব-সংহিতা (দ্বিজ-রামভদ্র-রচিত)	ঐ	১৩০৮, ২য় সংখ্যা
বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত	ঐ	১৩০৮, ৪র্থ সংখ্যা
গতবর্ষের বাঙ্গলা সাহিত্য	সাহিত্য	১৩১০, ভাদ্র
দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রভিতা	ঐ	১৩১০, কার্ত্তিক
১৩১০ সালের বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবরণ	ঐ	১৩১১, শ্রাবণ
প্রশ্নোত্তর : হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কি উপায়ে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইতে পারে ?—উত্তর-৩	ভাণ্ডার	১৩১২, আষাঢ়
দশম পূর্ণিমা-মিলন (কবিতা)	বাণী	১৩১২, মাঘ
একাদশ পূর্ণিমা-মিলন (কবিতা)	ঐ	১৩১২, ফাগুন
অশোক-কীর্ত্তি	ঐ	১৩১২, চৈত্র
বাঙ্গালা-নামরহস্য (অসমাপ্ত)	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	১৩১৩, ২য় সংখ্যা ও ১৩১৫, ১ম সংখ্যা
কবিগঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ	ঐ	১৩১৩, ৩য় সংখ্যা
এ দেশের নট-জীবন	সাহিত্য	১৩১৫, অগ্রহায়ণ
বাঙালার উপসর্গ	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	১৩১৫, ৩য় সংখ্যা
কবি ৺ ঠাকুরদাস দত্ত	সাহিত্য	১৩১৫, চৈত্র
স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু	মানসী	১৩১৬, ভাদ্র
নববর্ষে	মানসী	১৩১৬, ফাল্গুন
মহাভারতের গঠন	বাণী	১৩১৭, আশ্বিন-কার্ত্তিক, মাঘ-ফাল্গুন, চৈত্র
বাঙলা-বিশেষণ-রহস্য (অসমাপ্ত)	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	১৩১৭, ৩য় সংখ্যা
বর্ষ-বর্তন	মানসী	১৩১৮, ফাল্গুন
নাট্যকার গিরিশচন্দ্র (অসমাপ্ত)	ঐ	১৩১৮, চৈত্র
রোগশয্যার প্রলাপ (শ্রীরোগাতুর শর্মা' ছদ্মনামে লিখিত)	ঐ	১৩১৯, অগ্রহায়ণ, মাঘ; ১৩২০, অগ্রহায়ণ, পৌষ ; ১৩২১, অগ্রহায়ণ, পৌষ ; ১৩২২, বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ; ১৩২৩, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ;
মহোষধ-পরিণয় (জাতক অবলম্বনে)	ঐ	১৩২৩, জ্যৈষ্ঠ,

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার নাম	পত্রিকারসংখ্যা
বাণীকণ্ঠের "মোহমোচন" নামক প্রাচীন গ্রন্থ	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	১৩২০, ৩য় সংখ্যা
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা	ঐ	১৩২১, ১ম সংখ্যা

উপরের তালিকার অন্তর্ভুক্ত 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'কবি জয়নারায়ণ দাসের শ্রীকরুণানিধান লীলাগান এবং 'স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু' প্রবন্ধ তিনটিতে লেখকের নামোল্লেখ ছিল না; কিন্তু 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (১৩১২) গ্রন্থে প্রথম প্রবন্ধটি, 'রাজকবি জয়নারায়ণ' (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১২০৭) এবং 'মানসী' পত্রিকায় প্রাসঙ্গিক লেখকসূচীতে তৃতীয় প্রবন্ধটি ব্যোমকেশেরই লিখিত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যোমকেশের রচনা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'মানসী ও মর্মবাণী'তে 'স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী' নামে প্রবন্ধে লিখেছেন :

"ব্যোমকেশ সাহিত্যরসে রসজ্ঞও ছিলেন। নিজে রস অনুভব করিতে—সরস রচনাদ্বারা অন্যকে সে রসের আস্বাদন দিতে পরিতেন।...পরিচয় কেবল রসজ্ঞতায় কেন, ব্যোমকেশের চিন্তাশীলতা ছিল, গভীরতা ছিল, তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। সকলের উপরে বৈজ্ঞানিকতা ছিল—পরিষৎ পত্রিকায় বাঙ্গালা ব্যাকরণের আলোচনায় তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে।"

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত ব্যাকরণ সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলির দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বাঙ্লা-বিশেষণ-রহস্য' প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যায়। প্রবন্ধটিতে আকারান্ত গুণবাচক, নঞর্থ আকারান্ত ক্রিয়াবাচক, কৃত-আকারান্ত এবং সমাসযুক্ত আকারান্ত, এই কয়প্রকার বিশেষণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও তালিকা দেওয়া হয়েছে ; প্রথম প্রকার বিশেষণের প্রায় ১৫০টি দৃষ্টান্তের শব্দ, অর্থ ও লিঙ্গভেদ, দ্বিতীয় প্রকার বিশেষণের প্রায় ১৩৯টি উদাহরণের পদ, বিশেষণার্থ ও বিশেষ্যার্থ এবং চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার বিশেষণের যথাক্রমে মোটামুটি ১৫৫টি ও ৫১টি উদাহরণের সাহিত্যিক রূপ, কথিত রূপ ও স্ত্রীস্বরূপ তালিকাগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে 'বাঙ্গালা-নামরহস্য' প্রবন্ধটির প্রথমাংশে যাঁটি সংস্কৃত, বাংলা বা হিন্দী নাম এবং সংস্কৃত, বাংলা হিন্দী বা আরবী-ফারসী ভাষার একটি থেকে গৃহীত নামপদ ও অন্য একটি থেকে গৃহীত নামাংশের সংযোগে উৎপন্ন নাম, এ ধরনের উৎপত্তি বিচার করে বাংলা প্রচলিত নামের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে; প্রবন্ধটির অসমাপ্ত শেষাংশে সম্মানসূচক ব্যবসায়সূচক, বৃক্ষনামসূচক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর উপাধির এবং গন্ধবণিক, তাঁতি, বৈদ্য, বাগদি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিবর্ণের উপাধির দৃষ্টান্ত সহ শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

'মহাভারতের গঠন' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও আলোচনা থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে বোমকেশের অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। মূল মহাভারতে উদ্ধৃতি ও বিচারবিশ্লেষণের দ্বারা ব্যোমকেশ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ব্যাস প্রথমে গণেশের সাহায্যে বহু উপাখ্যান ও লক্ষশ্লোক বিশিষ্ট আদি মহাভারত রচনা করেন এবং পরে সেই গ্রন্থ থেকে উপাখ্যানগুলি পরিত্যাগ করে পুত্র ও শিষ্যদের জন্য সংক্ষিপ্ত ভারতসংহিতার সৃষ্টি করেন।

জন্মান্ধ ও নিরক্ষর কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের 'দুর্গামঙ্গল'কাব্যগ্রন্থখানি ব্যোমকেশের সম্পাদনায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক ব্যোমকেশ গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়, কথাবস্তুর বিবরণ কবির পরিচয়সূচক পদ আলোচনার মাধ্যমে পরিচিত ও জীবনকাহিনী নির্ধারণ, গ্রন্থখানির প্রকৃত নাম 'ভবানীমঙ্গল' হওয়ার সম্ভাবনা, গ্রন্থকারের কালনির্ণয়, মূল পুথি ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ সুচারু আলোচনা করেছেন। প্রাচীন বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় কেবল এই গ্রন্থের সম্পাদনাতেই সীমাবদ্ধ নয়; 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল,' 'শীতলা-মঙ্গল,' 'পাঁচালিকার ঠাকুরদাস,' 'সত্যনারায়ণ-কথা,' 'কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ' ইত্যাদি বহু প্রবন্ধরচনায় মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, বিস্মৃত সাহিত্যসেবী প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও গবেষণার নিদর্শন পাওয়া যায়। অল্পখ্যাত এসকল কবি ও তাঁদের সাহিত্য-কীর্তির আলোচনা বিশেষ করে লোকসাহিত্যের ধারাবাহিক বিবর্তন বিচারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

প্রাচীন পুথি ও গ্রন্থের সন্ধান ও আহরণে ব্যোমকেশ সবিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর এধরনের কাজের ফলে সাহিত্যের প্রথম যুগ সম্বন্ধে কুয়াশার ঘোর বহুক্ষেত্রেই লঘু হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি 'রমণী নাটক' (১২৫৪ বঙ্গাব্দ) ও 'প্রেম নাটক' (১২৬০) নামে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত ও পদ্যে রচিত দুটি গ্রন্থ সংগ্রহ করে তাদের আলোচনার মাধ্যমে 'নাট্যকার গিরিশচন্দ্র' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে 'রমণী নাটক' বাংলা ভাষায় নাটকরচনার প্রাচীনতম প্রয়াসের পরিচালক এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' (১২১৯) ইংরাজী ধারার অনুসরণে লিখিত প্রথম খাঁটি বাংলা নাটক; তাঁর এ আলোচনায় আদি বাংলা নাটক সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের মত খণ্ডনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

'শ্রীরোগাতুর শর্ম্মা' ছদ্মনামে লিখিত 'রোগশয্যার প্রলাপ' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধটি তাঁর মৃত্যুরপরে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। মৃত্যুপথযাত্রী লেখক তাঁর অসহায়তার বর্ণনায় রঙ্গব্যঙ্গের হালকা পরিবেশ রচনা করেছেন, অথচ তার অন্তর্নিহিত পরম কারুণ্য এবং অকপট হৃদয়বোধের কোমলতা হাস্যরসের স্রোতের একান্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে।

ব্যোমকেশের রচিত অপর একটি গ্রন্থ 'ললাট লিখন' (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থটি 'লক্ষ্মী' (১-৫১ পৃষ্ঠা), 'হরিদাস' (১-৩৪ পৃষ্ঠা). 'গোবিন্দরাম' (১-১৫ পৃষ্ঠা) ও 'বিশুখুড়ো' (১-২৩পৃষ্ঠা),

এই চারটি গল্পের সংগ্রহ। গল্পগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় অমোঘ বিধিলিপি। কাহিনীর বিন্যাস ও ভাষা গতানুগতিক ও বৈশিষ্ট্যবিহীন

নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের ব্রাহ্মণকাণ্ড-এর অন্তর্ভূক্ত 'পীরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ'-এর ১ম খণ্ডটি ব্যোমকেশ ও নগেন্দ্রনাথ উভয়ের লিখিত। গ্রন্থটির ১ম থেকে ৫ম অধ্যায় (অর্থাৎ ১-১৬০ পৃষ্ঠা) এবং 'পরিশিষ্ট' অংশ নগেন্দ্রনাথের এবং ৬ষ্ঠ থেকে ১১শ অধ্যায় (অর্থাৎ ১৬১-৩৬০ পৃষ্ঠা) ব্যোমকেশের রচিত। মুদ্রণ বহুপূর্বে আরম্ভ হলেও গ্রন্থটি ব্যোমকেশের মৃত্যুর বহুকাল পরে ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে ব্যোমকেশের লিখিত অধ্যায়গুলির মধ্যে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে পিরালী সমাজের ঐতিহাস ও গুড়-চৌধুরী বংশ, ৭ম অধ্যায়ে আদি পিরালী গুড়-বংশের বিবরণ, ৮ম অধ্যায়ে আদি পিরালীর পুরোহিত বংশ ৯ম অধ্যয়ে মঙ্গলানন্দ বংশ, ১০ম অধ্যায়ে

কলকাতার ঠাকুরগোষ্ঠীর ইতিবৃত্তি এবং ১১শ অধ্যায়ে নীলমণি ঠাকুরের বংশের বিবরণ আলোচিত হয়েছে। ভাষা ও শৈলীর বিশেষত্ব অসাধারণ না হলেও তথ্যসংগ্রহের নিষ্ঠা ও পরিবেশনের কুশলতা প্রশংসার্হ। বাংলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনায় পিরালী সমাজ বর্ণনার গুরুত্ব ছিল, যদিও আজকের সমাজব্যবস্থার পটভূমিকায় সে গুরুত্ব নিশ্চয়ই কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

ব্যোমকেশ 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' (১২৯৮), 'মালা' (১৩০৪, মাঘ) প্রভৃতি কয়েকটি মাসিকপত্রেরও সম্পাদনা করেছিলেন। 'মালা' পত্রিকাটি মাত্র একসংখ্যা প্রকাশের পরেই বন্ধ হয়। উপন্যাসের নাট্যরূপ দান এবং নাট্যশালার ইতিহাস রচনায় তাঁর উৎসাহ ছিল। ভবিষ্যতে নাট্যশালার ইতিহাস রচনার পরিকল্পনায় ব্যোমকেশ সেবিষয়ে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন; তাঁর সংগৃহীত তথ্য সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

নগেন্দ্রনাথ বসুর সংকলিত 'বিশ্বকোষ'-এর ১ম সংস্করণের অন্যতম লেখক ও সাহায্যকারী হিসাবে ব্যোমকেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অবশ্য 'বিশ্বকোষ'-এর ১ম সংস্করণে প্রত্যেক প্রবন্ধের লেখকের নামোল্লেখ করার রীতি না থাকায় ব্যোমকেশের লিখিত প্রবন্ধগুলি সনাক্ত করা যায় না, কিন্তু উপরি-উক্ত গ্রন্থের ২২শ ভাগের 'মুখবন্ধ'-এ নগেন্দ্রনাথের স্বীকৃতি থেকে এ বিষয়ে ব্যোমকেশের অবদানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়:

"এছাড়া আর্থিক সাহায্য লইয়া এবং নানাভাবে বহু পণ্ডিত ও বহু সাহিত্যিক নানা শব্দ ও প্রবন্ধ লিখিয়া বিশ্বকোষের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর,...ও পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ অনাথনাথ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

ব্যোমকেশের রচিত কবিতাগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুসরণ এবং গ্রামীণ সারল্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। কতকগুলি কবিতার ছন্দ ও মান বিচার করলে ব্যোমকেশকে খুব সাধুবাদ দেওয়া যায় না।

ব্যোমকেশ মুস্তাফীকে প্রথম শ্রেণীর সৃজনধর্মী লেখক বলে প্রচার করার যৌক্তিকতা নেই। সাহিত্যে লেখক হিসাবে তাঁর অবদান মুখ্যতঃ সৃজনধর্মী নয়, ব্যাখ্যন ও বিচারধর্মী। কিন্তু লেখক হিসাবে তাঁর অবদান তাঁর যে গুরুত্ব, সাহিত্য-আন্দোলনের উদ্যোগী কর্মী হিসাবে গুরুত্ব তার তুলনায় অনেক বেশি। এই শেষোক্ত ভূমিকাই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের জগতে দীর্ঘ স্মরণীয় করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর প্রতি আজকের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্ধশতাব্দী পূর্বের সেই উপেক্ষিত ঋণ পরিশোধের সামান্য প্রয়াসমাত্র।

লাল গির্জার দ্বিশতবার্ষিকী

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

'লাল দিঘি' এখন কলকাতার তীর্থ। এ লালদিঘির নামকরণের কারণ অনুসন্ধানে গবেষকদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। কেউ বলেন লালদিঘির পাশেই ছিল সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারি বাড়ী। বর্তমান জি. পি. ও-র জমিতে ছিল এই বাড়ী। এ বাড়ীতে কাজ করতেন এনটনী ফিরিঙ্গির দাদু। দোলের দিন এই কাছারি বাড়ীতে 'আবিরে গুলালে' দেহ রাঙানিয়া উৎসব হত। সেই উৎসবের শেষ রেশ পড়ত লালদিঘির জলে! কেউ বা বলেন লালবাজারে তখন রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। শেঠ বসাকদের এই দেবতারও দোল উৎসব হত। তারই ফলে লালদিঘি কিনা জানি না কিন্তু নগেন্দ্রনাথ শেঠের তাই ধারণা। জানি না, 'লাল' রাইটার্স বিল্ডিং-এরই ছায়া পড়ত কিনা সেকালের লাল দিঘিতে।

কিন্তু লালদিঘির এ নামকরণের পেছনে আরও একটি অনুমান রয়েছে। লাল দিঘিরই পাশে ছিল একটি লাল গির্জা। ঠিক পাশে নয়, তবে অদূরেই। আর কোন পাকা বাড়ী ছিল কিনা সন্দেহ। বেলীর এক এনগ্রেভিং-এ দেখাচ্ছে সেকালের 'ট্যাঙ্ক স্কোয়ার'—লাল দিঘির ধারে-পাশে লাল গির্জাই একমাত্র পাকা ইমারত।

এখন এই লাল গির্জার কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। ইংরেজরা দেশ জয় করে একহাতে বাইবেল নিয়ে। তাই নতুন ইংরেজ এদেশে এসে থেকেই চার্চ শুরু করেছে। 'চিৎপুরের রাস্তায় বলপূর্বক ধর্মান্তরী করণ' কলকাতায় ইংরেজদের রাজ্যজয়েরই অন্যতম সিঁড়ি। কলকাতায় প্রথম চার্চ ছিল 'পাথরের গির্জা'। চার্চ লেনের এই চার্চ বিখ্যাত। চার্চ ইংরেজের শুধু ধর্ম প্রচার রাজ্যজয়ের উপায় নয়, মিলনস্থলও বটে। সেকালের ইংরেজরা প্রতি রবিবার গির্জায় আসতেন শুধু উপাসনার জন্য নয়, স্বদেশ থেকে আসা মেয়েদের ঠিকানা যোগাড় করতেও। পাথরের গির্জার কথা থাক। এরপর এল সেন্ট এ্যানড্রুজ চার্চ। রাইটার্স বিল্ডিং-এর পূর্বপাশের চার্চ। এই চার্চবাড়ীতে আগে কোর্ট বসত। নীলাম হত। নাচগান, সম্বর্ধনাও হত। ১৭৭৬ সালে বুর্সিয়ের এই কোর্টবাড়ী ইংরেজদের বিক্রি করেন। কিন্তু বাড়ীর অবস্থা তখন শোচনীয় তাই সরকার বাড়ীটা ভেঙে ফেলেন।

স্পষ্টতই এ সময় ইংরেজদের গীর্জা ছিল না। ১৭৪০ সালে ক্যায়েরননডার নামে এক প্রোটেষ্টাট পাদ্রী আসেন মাদ্রাজে। সম্ভবতঃ সেখানেই তার যোগাযোগ হয় বিশ্বখ্যাত ভাগ্যান্বেষী ক্লাইভের সঙ্গে। পলাশীর যুদ্ধে বাংলা দখল করে ক্লাইভ যখন খ্যাতির চূড়ায় তখন ক্যায়েরননডার কলকাতা এলেন। শোনা যায় এর আগে ক্যায়েরননডার যখন কুড্ডালোরে ছিলেন তখন কাউন্ট লালী কুড্ডালোর দখল করে ক্যায়ারননডারকে তাড়িয়ে দেন।

বহিষ্কৃত ক্যায়েরননডার কলকাতায় এসে ক্লাইভকে পরামর্শ দিলেন গির্জার জন্য। তার আগে সেন্ট এ্যানড্রুজ গির্জা ভেঙেছে। ইংরেজদের কোম্পানীর চ্যাপলেন রেভারেণ্ড হেনরী বাটলার

তখন ইংরেজদের উপাসনার জন্য নিয়ে যেতেন 'পর্টুগীজ চ্যাপেল' বা মুরগীহাটা চার্চে। প্রথম প্রথম চ্যাপেলন বাটলারের আদেশে ক্যায়রেননডারও এই চার্চে এসে উপাসনা করতেন।

পরের গির্জায় উপাসনা করতে যাওয়ার মধ্যে হীনমন্যতা আছে। বিশেষতঃ সে যুগে আবার ধর্মসংক্রান্ত রেষারেষিটা বড্ড বেশিই ছিল। গির্জায় গির্জায় চলত বংশানুক্রমিক লড়াই। পরবর্তী যুগে জমিদার ধনীদের মধ্যে বোধ হয় তারই ছায়া অনেকে দেখে থাকবেন। সেণ্ট এ্যান বনাম সেণ্ট এ্যানড্রুজ গির্জার চূড়া নিয়ে লড়াই চলেছিল অনেকদিন। সেণ্ট এ্যান গির্জা গড়ার সময় কলকাতার গির্জা ছিল সেণ্ট এ্যানড্রুজ। সেণ্ট এ্যানের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাইস্ ছিলেন স্কচ। তিনি ইংরেজদের গির্জাকে ডাউন করবার জন্য ঠিক করলেন তার গির্জার ডগায় থাকবে উঁচু চূড়া। চূড়ারও মাথায় আবার ওয়েদার কক। এ নিয়েই দ্বন্দ্ব। শেষে ঠিক হয় চূড়া তাই হবে কিন্তু ভেঙ্গে গেলে মেরামত করার সময় আর ওয়েদার ককটি রাখা হবে না। ১৭৩৭ সালের ঝড়ে সেই আটকোনা চূড়া পড়ে যায়। কিন্তু কেন জানি না, মেরামত করার সময় মুরগিটা থেকেই যায়, আজও আছে।

ক্যায়রেননডার তাই পরের গির্জায় উপাসনা করার ফাঁকে চাঁদাও তুলতে লাগলেন নিজস্ব গির্জা গড়ার জন্য নিজেদের মধ্যে। চাঁদা উঠল মাত্র দু'হাজার টাকা। ক্যায়রেননডার কিন্তু সত্তর হাজার টাকার প্ল্যান নিয়ে নামলেন গির্জা তৈরী করতে।

গির্জাটা হল কাউন্সিলের সদস্যদের বাড়ির কাছেই। ১৭৫৩ সালে উইলিয়ামস্ ওয়েলস সাহেবের আঁকা ফোর্ট উইলিয়াম ও কলকাতার একাংশের যে মানচিত্র আছে সেখানে দেখি ক্লেভারিং ও মনসন কাউন্সিলের এই দুই সদস্যের বাড়ির কাছে একটি থিয়েটার (প্লে হাউস) রয়েছে। মনে হয় ক্যায়রেননডার এখানেই গির্জা গড়তে গেলেন। লংসাহেব Selection of unpublished records of Government Vol I-এ দেখিয়েছেন লিডেনহল ষ্ট্রীট থেকে কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সদের লেখা চিঠিতে We are told that the building formerly made use of as a theatre may with a little expense, be converted into church or public place of worship; as it was built by the Voluntary contribution of the inhabitance of Calcutta, we think there can be no difficulty in getting it freely applied to the before mentioned porpose; especially when we authorise to fit it up decently at the Company's expense as we hereby do.*

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে বোঝা যায় "Company's exponse" ছিল লাল গির্জার পেছনে। তা না হলে মাত্র দু'হাজার টাকা চাঁদা তুলে ক্যায়রেননডার ১৭৬৭ সালে প্রায় সত্তর হাজার টাকার প্ল্যান নিলেন কি করে? অবশ্য বিপরীত সন্দেহ হয়। ক্যায়রেননডার ছিলেন কাউন্সিলের প্রিয় ভাজন। ক্লাইভের স্নেহধন্য। কাউন্সিলের সদস্যরা যে নিজেদের জন্য গির্জা তৈরী করবার পেছনে অর্থব্যয় করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। তখন পাথরের গির্জা ছিল ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামাঙ্কিত-প্রায়। পুরনো বইয়ে পাথরের গির্জাকে 'লাটসাহেবকা গির্জা' বলতে দেখা গেছে। লাটসাহেব কাউন্সিলেরই অন্যতম সদস্য। কিন্তু তার সম্বল ছিল বলা বাহুল্য বেশি। এ নিয়ে কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফিলিপফান্সিসের সঙ্গে তার মতান্তর ইত্যাদি ইতিহাসেই স্থান পেয়েছে।

যাইহোক, মনে হয় কাউন্সিলের সদস্য ক্লেভারিং ও মনসন তাঁদের জন্য গির্জা নির্মাণে অতিরিক্ত উৎসাহ অনুভব করে থাকবেন।

এছাড়াও একটি গুজব শোনা যায় যে ক্যায়রেননডার ছিলেন ধার্মিক পাদ্রী। গির্জা নির্মাণে তিনি চাঁদা মনোমত পাননি বলে স্ত্রীর গহনা বিক্রি করেও গির্জা নির্মাণ করেন। আবার বলি, গির্জাটি প্রকৃতপক্ষে নির্মাণ নয়, পুনর্গঠন। আগে থিয়েটার হত এখানেই। তাছাড়া ক্যায়রেননডার ঠিক পুরোপুরি ধর্ম নির্ভর ছিলেন না। তিনি একটি চ্যারিটি স্কুলও করেছিলেন। সেই শিশুবিদ্যালয়ে দু'শ পঞ্চাশটি শিশু পড়ত। গির্জা তৈরী শুরু হয় ১৭৬৭ সালে। শেষ হয় ১৭৭০ সালে। জনসাধারণের জন্য গির্জা উন্মুক্ত হয় ২৩শে নভেম্বর বড়দিন উপলক্ষে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৭৭৩ সালেই ক্যায়রেননডারের পত্নী পরলোকগমন করেন। এরপর ক্যায়রেননডার বিয়ে করেন ধনী বিধবা এ্যান উলীকে। কিন্তু তাতেও তার অর্থাভাব ঘোচেনি মনে হয়। বরং ১৭৭৬ সালে তার অবস্থা এতই খারাপ হয় যে গির্জার দরজা বন্ধ করতে হয়। কিন্তু এতে কাউন্সিল-কোম্পানীর মান বাঁচত না। বাধ্য হয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টার চার্লস গ্রাণ্ট এসে ক্যায়রেননডারের সমস্ত ঋণ মিটিয়ে দেন—গির্জা আবার খোলা হয়। গির্জা এতদিন ক্যায়রেননডারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল বোধ হয়—তাঁর ব্যক্তিগত দেনা অনাদায়ে তাই পাওনাদাররা গির্জাই ক্রোক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চার্লস গ্রাণ্টের চেষ্টায় গির্জা খুললেও ক্যায়রেননডারের বিপদ কাটল না। তিনি তখন দেনা এড়াতে কলকাতা ছেড়ে ডাচ চুঁচড়ায় পালান। পর্তুগীজরা তাঁকে আশ্রয় দেন। কিন্তু কলকাতায় সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করে ইংরেজ।

১৭৯৯ সালে ক্যায়রেননডার পরলোক গমন করেন। আর ১৮০০ সালে শিশু বিদ্যালয়টি ফ্রিস্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়। এরপর লাল গির্জায় একটি বিখ্যাত ঘটনা ঘটে—১৮৪৩ সালে এই গির্জাতেই খৃষ্টান হন মধুসূদন। তাঁকে দীক্ষা দেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলতে ভুলেছি, লাল গির্জার নাম যদিও হয়েছিল 'বেথ ট্যাফিলা' বা 'দি হাউস অব দি প্রেয়ার' কিন্তু সে বিখ্যাত ছিল Mission Church বলেই। সবচেয়ে পুরানো বলে এর নাম দাঁড়ায় ওল্ড মিশন চার্চ। পুরনো বলতে অবশ্য প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে। আর এই মিশন চার্চের নামানুসারেই সেকালের রাস্তা 'রোপ ওয়াকে'র নাম বদলে হয় মিশন রো। মিশন চার্চের দুশো বছরের ইতিহাসে বহু তথ্য ও ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে—পুরনো বইয়ের পাতায় তাকে পাওয়াও যায় হয়ত। অনুসন্ধিৎসু গবেষকরা এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে পারেন স্বচ্ছন্দে।

* থিয়েটার গৃহে গির্জা তৈরীর এই তথ্যটি প্রথম পেয়েছিলাম সমকালীনের পৃষ্ঠায়: শ্রীচণ্ডী লাহিড়ীর 'বিদেশীর চোখে বাংলা' গ্রন্থের শ্রীনারায়ণ দত্ত উত্থাপিত সমালোচনা প্রসঙ্গে। দত্ত মশাইকে ধন্যবাদ। ছোট্ট একটি ত্রুটির কথাও বলে রাখি, নারায়ণবাবু কিন্তু লাল গির্জার সঙ্গে সেণ্ট এ্যান গির্জার পার্থক্য রাখতে পারেন নি মনে হয়। 'সেকালের মেয়রস কোর্ট এখনকার লাল গির্জা' কথাটা ঠিক নয়, সেকালের মেয়রস কোর্টে প্রতিষ্ঠিত হয় সেণ্ট এ্যান চার্চ, আর লাল গির্জার কথা তো এখানে আলোচনাই করা হচ্ছে।

বাংলা নাটক ও নাট্যসাহিত্য

রণজিৎকুমার সেন

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে নাট্যশাখাই শ্রেষ্ঠ বলে গৃহীত। কারণ, নাটকের মধ্যে জীবনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির সঙ্গে একাধারে এসে সম্মিলিত হয়েছে সঙ্গীত, কাব্য, কাহিনী বা ইতিহাস, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আলোচনা, মনোবিশ্লেষণী চিন্তাশীলতা, আভিনয়িক আলঙ্কারিকতা, ভাবানুবন্ধ ও নন্দনতত্ত্ব। নাটকের প্রত্যক্ষ রূপায়নের মধ্য দিয়ে এই বিষয়গুলিকে দর্শক যত সহজে গ্রহণ করে চমৎকৃত হতে পারে, সাহিত্যের অন্য কোনো বিভাগের মধ্য দিয়ে পাঠকের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এখানে যেমন আছে বিরহ, মিলন ও প্রহসন, তেমনি আছে বীর রস, করুণ রস ও ব্যঙ্গ। সামাজিক সমস্যাবলীর সঙ্গে ঘটনাবর্তে এগুলি নানা আকারে সংশ্লিষ্ট। তাকে যথোপযোগি পরিবেশনার দ্বারা বাস্তবায়িত করে তোলা হয় নাট্যাভিনয়ে। নাটককে তাই জাতীয় জীবনের দর্পণ বলা যায়।

অথচ দুঃখের বিষয় যে, সাহিত্যের এই মহত্তম শাখাটি বহু যুগ ধরে আমাদের দেশে একরকম অনাদৃতই ছিল। মাইকেল মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি বহুভাবে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে প্রাণদান করলেও নাট্য-সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ তাতে সম্ভব হয় নি। প্রত্যেক যুগেই সমাজ তার নিজ নিজ সমস্যাবলীর দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু সে-যুগের নাটকে সামাজিক অভিব্যক্তির চাইতে পৌরাণিক কাহিনীর অভিব্যক্তিই ছিল প্রধান। দর্শককেও তাই নিয়েই খুশী থাকতে হতো। তারপর দেখা দিল ঐতিহাসিক রোমান্স। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী থেকে ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় দিয়ে রচিত হলো নাটক। তারপর ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গভিত্তিক স্বদেশী আন্দোলন সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকেও নিয়ে এলো দেশাত্মবোধের নতুন প্রেরণা। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে ও গানে এই দেশাত্মবোধ তখন সমধিক জাগ্রত হয়ে জাতীয় জীবনকে প্রেরণা দিয়েছে সন্দেহ নেই। যাত্রা-নাটকে মুকুন্দদাসও এই দেশাত্মবোধের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন সামাজিক অপকর্ষের নানা দিক নিয়ে ব্যঙ্গ ও প্রহসনমূলক সমালোচনা।

যদিও এই জাতীয় নাটকের অগ্রণী নাটক 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব', এবং এই জাতীয় নাটকের মধ্য দিয়ে যদিও সামাজিক কুসংস্কারগুলির পরিশোধনের প্রয়াস করা হয়, তবু একথা নিঃসন্দেহ যে, সে সব নাটকে সামাজিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ ঘটে নি। অথচ সামাজিক মন ছিল এই রূপায়ণেরই প্রত্যাশী। ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের ও সমাজের এবং ব্যক্তি-মনের সঙ্গে তার নিজের যে স্বার্থগত ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, তারই বাস্তব প্রতিফলন চাইল সে নাটকে। শরৎচন্দ্রের কিছু উপন্যাসকে নাট্যায়িত করে তার কিছু অভাব মোচনের প্রয়াস দেখা গেল বটে এসময়ে, কিন্তু তাও বেশীর ভাগ পেশাদার নাট্যমঞ্চাধিকারীদের প্রয়োজনেই, জাতির প্রয়োজনে তত বেশী নয়। পেশাদার নাট্যমঞ্চাধিকারীদের কাছে ব্যবসায়িক প্রেরণাই বড়, ফলে প্রয়োজনের খাতিরে নাটক তাঁরা নিজেরাই তাঁদের ছায়াপুষ্ট লেখকদের দিয়ে তৈরী করিয়ে নিয়েছেন। নাট্যসাহিত্যের

উন্নতির জন্য সাধারণ লেখকদের প্রয়াস বিশেষ একটা ছিলনা, পেশাদার রঙ্গমঞ্চও তেমনি নাট্যোন্নতির জন্য লেখকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি ; ফলে উভয়তঃই তাঁদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়ে চলতো। এরমধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালই বোধ করি প্রথম নাট্যকার লেখক—যাঁর সঙ্গে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষ যোগ না থেকেও তাঁর নাট্যাবলী সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের নিজস্ব মঞ্চে অভিনীত রবীন্দ্রনাথের নাটকাভিনয় এদিক থেকে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ শুধু এদেশের নন্, বিশ্বনাট্য সাহিত্যেরই তিনি একজন সার্থকতম স্রষ্টা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এদেশের পেশাদার রঙ্গমঞ্চ অদ্যাবধি তাঁর নাট্যাভিনয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে নি।

বাংলা নাটকের নতুন মোড় নিল এদেশের যৌথ পরিবারগুলি ক্রমে ভেঙ্গে যাবার ফলে। যৌথ পরিবারের যে বিভিন্ন চারিত্রিক দ্বন্দ্ব, তার অবসানে সমাজ এসে দাঁড়ালো ছোট ছোট পরিবারের স্বামী স্ত্রী ও একটি কি দু'টি সন্তানের ভিত্তিতে। এখানেও যে নাটকীয় দ্বন্দ্বের অবকাশ না রইল, এমন নয় ; পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর আদর্শগত সংঘাত নাট্যসৃষ্টির ইন্ধন জোগালো বটে, কিন্তু তারও চরম পরিণতি যেভাবে আশা করা গিয়েছিল বিবাহ বিচ্ছেদ বিল পাশ হবার মধ্যে, সে ভাবে সেই পরিণতি ঠিক এলো না। বিধবা বিবাহ বিল পাশ হবার ফলেও একদা আশঙ্কাজনক ভাবে অনুরূপ পরিণতি আসে নি। কারণ এদেশের নাড়ী এমন ভাবে গঠিত যে, এই সব ঘটনাবর্ত আইনের আশ্রিত হয়েও সমাজ মনে অধিক মাত্রায় নাড়া দিতে পারে নি। অন্যদিকে কৃষিকেন্দ্রিক পল্লীজীবনের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের সামাজিক অবস্থার তারতম্যটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যদিও বাংলায় নীলবিদ্রোহের ফলে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক একদা এদেশে বিপুল সাড়া এনেছিল, কিন্তু সেইটেই পল্লীজীবনের সমগ্ররূপ ছিল না। কৃষিজীবন প্রধানতঃ নাট্যসাহিত্য থেকে বহু দূরেই ছিল। পল্লী-সমাজ নিয়ে কিছু নাটক গ'ড়ে উঠেছে সন্দেহ নেই ; এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' প্রমুখ বিভিন্ন কাহিনী এবং পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের 'দুই-পুরুষ', 'কালিন্দী' প্রভৃতি নাট্যকাহিনীতে পল্লীজীবনের চিত্র সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের সমাজ বলতে আমরা বিশেষ কোনো সমাজকে পাই না—যাকে একটি নাটকে একচ্ছত্রভাবে ধরা যেতে পারে। এই-শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত এদেশে যে সামাজিক চরিত্র লক্ষ্য করা গেছে, ক্রমে তা ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছে এবং দেশ বিভাগের ফলে এদেশের সামাজিক চরিত্রের যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিল, তাও কর্পূরের মতো উড়ে যেতে দেরী হ'লো না। এখনকার সমাজ ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমাজ, ব্যক্তিই এখানে প্রধান। যেখানেই সামাজিক রূপায়ণের প্রয়াস, সেখানেই কোনো-না-কোনভাবে ব্যক্তি স্বার্থ প্রবল হ'য়ে উঠেছে। তাই সামাজিক বা পারিবারিক জীবন-ভিত্তিক নাটক এখন বিবর্তিত হ'য়ে প্রধানতঃ ব্যক্তিভিত্তিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বাংলার উপর দিয়ে মারী, মড়ক, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, বন্যা প্রভৃতি নারকীয় বিষয়গুলি ঘটে গেলেও বাংলা নাটকে তার রূপায়ণ উল্লেখযোগ্য ভাবে আসে নি। যদিও তুলসী লাহিড়ী, শচীন সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকারেরা তার কোনো কোনো বিশেষ অংশ নিয়ে কিছু সার্থক নাটক রচনার প্রয়াস পেয়েছেন, এবং উদ্বাস্তু জীবনের ভিত্তিতে কিছু ছিন্নমূল

জীবনকাহিনী উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা দিয়েছে, কিন্তু এই বিষয়সমূহের ও তজ্জনিত বাঙালী জীবনের সামগ্রিক চিত্রটি আমরা কোথাও বড় খুঁজে পাব না।

অপরদিকে শিল্পসম্প্রসারণ বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপ্‌মেণ্টের ফলে কারখানার পরিবেশ, শ্রমিক ও মালিকের জীবন বৈচিত্র্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যার ভিত্তিতে বেশ কিছু নাটক গ'ড়ে উঠলো। তার মূল ভিত্তি প্রধানতঃ শ্রমিক অসন্তোষ। তেম্‌নি এদেশে জমিদারীপ্রথা ও প্রজা বিদ্রোহ নিয়েও নাটক রচিত হয়েছে। এখানে সংঘাত আছে, নতুন সমাজ ব্যবস্থা পত্তনের প্রয়াসে জীবনের গভীর আবেগ আছে। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে যেমন, নাটকেও তেমনি এই বিষয়সমূহ সমাজ মানসে চিরন্তন ছাপ রেখে যেতে পারে না। এই প্রাণাবেগ এবং সংঘাতের পশ্চাৎপটে বিশেষ একটা সময়-সীমার নির্দিষ্টতা আছে। সেই সময় ও সমস্যা অবসিত হ'লে সেই বিষয়সমূহ ও মানুষের মনকে আর আবেগ মথিতভাবে স্পর্শ করতে সক্ষম হয় না। যদিও সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো নাটকেও সমসাময়িককালের ঘটনাবলীকে অস্বীকার করার উপায় নেই, তবু একথা ধ্রুব যে, এই ঘটনাবলীর দ্বারা পাঠক বা দর্শক চমকিত হ'লেও প্রায়শঃই অভিভূত হয় না। তার কারণ, এদেশের জলবায়ুতে যাদের জন্ম, এদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে যারা বর্ধিত, এদেশের লোকাচারের মধ্যে যাদের প্রাণস্ফূর্তি, তাদের কাছে এদেশের সামাজিক ও গার্হস্থ জীবনের বিচিত্র কাহিনীই প্রধানতঃ আকর্ষণীয়। কিন্তু সেই সমাজ এবং গার্হস্থ জীবনের মৌলিকতা আজ কোথায়? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিকজীবনে তার চিহ্ন যেমন একান্তই বিরল, তেম্‌নি গ্রামীণ সমাজও এখন আর পল্লীকেন্দ্রিক নেই, শিল্পনগরীর প্রভাব সেখানে অতিমাত্রায় প্রকট। বাংলা নাটকে যখন এই বাঙালী সমাজের রূপায়ণ ক্রমে দুর্লভ হ'য়ে উঠলো, তখনই দেখা দিল পার্শ্বচরিত্রের মতো খণ্ড খণ্ড ঘটনার প্রকাশ। বাংলা উপন্যাসের মতো নাটকেও এলো আঞ্চলিক জীবনভিত্তিক কাহিনী। তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' প্রমুখ নাটকসমূহ এই পর্যায়ের। কিন্তু তা নিয়েও দর্শক যেমন দীর্ঘকাল পরিতৃপ্ত থাকতে রাজি নয়, নাট্যকাররাও তাই। অথচ উত্তর-স্বাধীনতাকালে ভগ্ন সমাজ ও ভগ্ন মানসিকতার ফলে এমন একটা নৈরাজ্য উপস্থিত হ'লো যে, কোন্ বিষয় নিয়ে কিভাবে নাটক রচনা করলে দেশীয় মন তৃপ্ত ও জাগ্রত হ'য়ে উঠতে পারে, তা নিয়ে সহসা কেউ কিছু একটা ভেবে উঠতে পারলো না। ভাববার মতো পরিবেশেরই একান্ত অভাব হ'য়ে দাঁড়ালো। ফলে বিগত অর্ধশতাব্দীর সহস্র অভিনীত নাটকগুলিই ঘুরে ফিরে আবার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতে শুরু হ'লো, সেই সঙ্গে কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাট্যরূপ। এদিকে ততদিন সিনেমাশিল্পের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলা নাট্যমঞ্চকে সিনেমাশিল্প গ্রাস করতে উদ্যত। ফলে নাট্যমঞ্চের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নটি বড় হ'য়ে দেখা দিল। শুধু রিভলবিং স্টেজ বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নয়, তার সঙ্গে ক্রমে এসে যুক্ত হ'লো পর্দার ছায়া-অভিনয়—যাকে বলা হ'লো থিয়েটারস্কোপ। ধীরে ধীরে অভিনয়শিল্প ক্ষয়িষ্ণু হ'য়ে মঞ্চে পর্দা ও আলোকশিল্প প্রধান হয়ে উঠলো। নতুন বিষয়ের প্রতি মোহ মানুষের চিরন্তন। এই নতুনের প্রতি আকর্ষণেই নতুন করে আবার দর্শক ছুটে এলো মঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে।

কিন্তু দেশের প্রাণসত্তা সেই যান্ত্রিকমোহে অন্ধ হয়ে ছিল না। একাল পুরণো কালের অন্ধ

অনুভূতিতে বিশ্বাসী নয়। একালে জনগণের দাবী যেমন অধিকমাত্রায় সোচ্চার, এ রকমটা পুরণোকালে দেখা দেয়নি। তাই পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বাইরে নতুন করে গড়ে উঠলো গণনাট্য—যে নাট্যের সমস্ত অংশ জুড়ে থাকবে চিরকালের সমাজ-উপেক্ষিত মানুষ। বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদের বোধ থেকেই এই গণনাট্যান্দোলনের সৃষ্টি। বিভিন্ন নাট্যকারের বেশ কিছু নাটকের সন্ধান আমরা এখানে পেলাম। কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেল—সেগুলো বাস্তববোধের প্রয়োজন মিটিয়েও পুরোপুরি শাস্ত্রসম্মত রসোত্তীর্ণ নাটক হ'য়ে উঠেছে কিনা। ক্রমে দেখা গেল—সাধারণ সমাজবোধের চাইতে বিশেষ এক রাজনীতিক মতবাদের দিকে তার ঝোঁকটা অধিক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। ফ্যাসীবাদ বিরোধীতায় যার মূল শিকড় প্রোথিত, সাম্যবাদী আন্দোলনে তার শীর্ষদেশ উচ্চকিত। রাষ্ট্রদেহের এই বিবর্তন রূপটি গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধসাহিত্যের মত নাটকেও অবশ্যই স্বীকার্য, নইলে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচারিত নাটককে আমরা একদা স্বীকৃতি দিয়াছিলাম কি করে? কিন্তু এ সব নাটক প্রায়শঃই নাটকীয় মর্যাদায় উন্নীত না হয়ে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে বিলীয়মান হয়ে থাকে; তাই সেই প্রয়োজনের কাল উত্তীর্ণ হ'লে তার আবেদন আর দর্শকমনে নাড়া দেয় না। গণনাট্যের ক্ষেত্রেও অনেকাংশে তাই হল। কিন্তু একটা কথা অনস্বীকার্য যে, এ দেশে এতাবৎকাল নাটক নিয়ে যেমন কোন পরীক্ষ-নিরীক্ষা দেখা দেয়নি, সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নতুন নাট্যচিন্তার সূত্রপাত করল গণনাট্য। পৌরাণিক কাহিনী বা ইতিহাসাশ্রিত রাজা-উজীর বাদশা-বেগম নয়, প্রতিদিনের দেখা সাধারণ মানুষের জীবন-সমস্যার সার্থক প্রতিফলন চাই সাহিত্যে। বাংলা গল্প-উপন্যাসে যেমন তার অজস্রতা এল, তেমনি এল নাটকে। আর একবার নতুন মোড় নিল বাংলা নাটক।

এই রূপ বদলের ইতিহাসই বাংলায় নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস। যুদ্ধোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে যেমন এল নতুন নতুন কথাকার শিল্পী, নাট্যক্ষেত্রেও তেমনি এল নানা শক্তিমান রচয়িতা। সেই সঙ্গে গড়ে উঠল নতুন নতুন নাট্যসংস্থা, যেমন—বহুরূপী, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, শৌভনিক, থিয়েটার সেন্টার, রূপকার, চতুর্মুখ প্রভৃতি। প্রয়োজন হল পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বাইরে অধিক সংখ্যায় অপেশাদার নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠার। তারজন্যে প্রয়োজন ড্রামাটিক পারফরমেন্স এ্যাক্টের সংস্কার, এবং আরও প্রয়োজন সকলের জন্যে এক অনন্য জাতীয় নাট্যমঞ্চ—যার জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। এই প্রয়োজনের ভিত্তিতেই একদা গড়ে উঠলো সরকারী মর্যাদায় 'রবীন্দ্র সদন'। কিন্তু যে উদ্দেশ্যের জন্য এই নাট্যশালা আকাঙ্ক্ষিত ছিল, কার্যতঃ তার ফলপ্রসূতা খুব কমই দেখা গেল।

এ যুগে সাহিত্যের যে দু'টি শাখা জনপ্রিয়তার দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তা হচ্ছে কথাসাহিত্য ও নাটক। এখানে ছোট গল্পের মত একাঙ্কিকারও একটি বিশেষ স্থান আছে। বলতে বাধা নেই যে, অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ নাটকের চাইতে এই একাঙ্কিকা অধিক সার্থক হয়ে উঠেছে। একাঙ্কিকার সাম্প্রতিক শীর্ষমঞ্চে যাঁর স্থান, তিনি হচ্ছেন নাট্যকার মন্মথ রায়, তার পরেই সার্থক একাঙ্কিকা রচয়িতা হিসেবে নাম করতে হয় বনফুল ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

খণ্ড, ক্ষুদ্র ও ভগ্নাংশে বিভক্ত আজ বাঙালী জীবন। সেই জীবনকে নানা দিক থেকে রূপায়িত

করবার প্রচেষ্টা চলেছে আজ নাটকে। নাটকের পর নাটক এসে আজ ভিড় করছে দর্শকের সামনে। মৌলিক নাটক, বিদেশী নাটকের অনুবাদ, বাংলা-গল্প-উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়া নানা দিকে অবিরাম কাজ চলেছে এখন। এতে নতুন প্রেরণা ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলোও যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছে সন্দেহ নেই। তেমনি অনুপ্রাণিত হচ্ছে বাংলার যাত্রা অপেরাসমূহ। যাত্রা-নাটকেও এখন প্রগতির ঢেউ বয়ে চলেছে। বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের তারাও এক উল্লেখযোগ্য অংশীদার। বেতারেও নাটক যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে। এতদ্ব্যতীত আজকাল এমন অফিস বা প্রতিষ্ঠান নেই—যেখানে তাদের রিক্রিয়েশন ক্লাবের মাধ্যমে বাৎসরিক পর্যায়ে নাটক মঞ্চস্থ করা না হচ্ছে; এ ছাড়াও আছে পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। তারা প্রায়শঃই নাট্যাভিনয় করে দর্শকদের মনোরঞ্জন বিধান করে থাকে। ফলে নাটক চাই, নতুন নাটক, আরও নাটক। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাটকের সংস্থাপনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একদা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ যা পারেনি এবং এখনও সাহসী নয়, সেই রবীন্দ্রনাটকের সার্থক রূপদানে এগিয়ে এল 'বহুরূপী' প্রভৃতি নাট্যসংস্থাগুলি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটক ও নৃত্যনাটিকা-গুলোর প্রযোজনায় এগিয়ে এসেছে একালের বিভিন্ন সঙ্গীত শিক্ষায়তনগুলি।

লোকশিক্ষার অন্যতম আধার হচ্ছে নাটক। এ দেশে পাঠকের সংখ্যা এখনও বিশেষ উল্লেযোগ্য নয়; শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যারাও বা পঠন-পাঠনে অভ্যস্ত, বিদেশী নাটক পাঠের বাইরে দেশীয় নাটক-পাঠের আকর্ষণ তাদের নেই। পাণ্ডুলিপি আকারে বা গ্রন্থাকারে নাটক এতকাল তাদের কাছেই বিশেষভাবে গ্রাহ্য হয়েছে—যারা প্রধানতঃ নাট্যাভিনয়ে উদ্যোগী। নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়েই মূল নাটকের বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের সঙ্গে এতকাল জনসাধারণকে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়াস চলেছে। সাহিত্য হিসেবে নাটকপাঠের প্রতি অনীহার আর একটি বড় কারণ ছিল এতকাল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যতালিকায় বাংলা নাটক অন্তর্ভুক্তির অভাব। অথচ দীর্ঘকাল ধরে স্কুলে কলেজে ইংরেজী নাটক বাধ্যতামূলকভাবে পড়িয়ে আসা হচ্ছে।

সম্প্রতি অবশ্য এ ইতিহাসের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে সন্দেহ নেই; তবু গল্প-উপন্যাসের মতো নাটকপাঠের আগ্রহ এখনও জনসাধারণের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। গ্রন্থাগারের জন্য, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে উপহারের জন্য বা ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য বাজারে যে সমস্ত বইয়ের কাটতি, তার মধ্যে নাটক নেই। সাহিত্য হিসেবে নাটকের চাহিদার এই অভাবই নাট্য সাহিত্যবিকাশের অন্তরায়ের একটি অন্যতম কারণ। এ সম্পর্কে সঙ্গীত-নাটক-একাডেমী এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যশাখার যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। জনসাধারণকে শুধু মঞ্চাভিমুখী করলেই হবে না, তাদের মধ্যে নাটক পাঠের আগ্রহ গড়ে তুলতে হবে। আজকের নাটক যদিও মানুষের খণ্ড ছিন্ন জীবনের নানা সমস্যার এক একটি অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে। এবং যদিও আজ জাতির নৈতিক অধোগতিতে মনুষ্যত্ব ও চারিত্রউদ্বোধক নাটক গড়ে উঠছে না, তবু এ প্রত্যাশা বোধ করি অলীক হবে না যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে—যেদিন স্বাধীন ভারতের ঐক্যবোধের উপর আমাদের গোটা জাতীয় জীবনোন্মেষের এক সামগ্রিক রূপায়ণে বাংলা নাটক উজ্জ্বল ও সার্থক হয়ে উঠবে।

সাফো

শিশিরকুমার দাশ

প্লেটো, যিনি কবি হতে পারতেন, কিন্তু হলেন দার্শনিক, তাঁর একটি ছোট কবিতায় সাফো-কে বন্দনা জানিয়ে বলেছিলেন দশম কলালক্ষ্মী, তাঁরই লেখা থেকে জানা যায় ফাইড্রোস-এর সঙ্গে ইলিশসের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সক্রেটিস বলেছিলেন যে প্রেম সম্বন্ধে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হলেন 'সুন্দরী সাফো'। সক্রেটিস সাফোকে বলেছিলেন সুন্দরী, যদিও তিনি ছিলেন কৃশাঙ্গী, খর্বতনু। তাঁর গানের সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। স্ট্রাবো তাঁর নীরস ভূগোলের মধ্যে সাফোর কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন 'সাফো এক আশ্চর্য'! ইতিহাসের শুরুতে আর কোন নারীর কথা আমরা জানি না যিনি কবি রূপে সাফোর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন।' আর অভিড তাঁর 'হিরোইক এপিস্‌টল' কাব্যে সাফোর মুখ দিয়ে বলিয়েছে "কলালক্ষ্মীরা আমাকে তাঁদের কোমলতম সুরে দীক্ষা দিয়েছেন"। প্রাচীন ইউরোপের ইতিহাসের আদিযুগে সাফোই একমাত্র কবি যাঁর কবিতায় আমরা শুনেছি এক নারীর ভাষা পরীর কণ্ঠ। সেই কবি আজো সাহিত্যক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ অপরাজিতা।

নানা কিম্বদন্তীতে সাফোর জীবনকাহিনী আজ ঢাকা পড়েছে। তাঁর প্রেমিক কবি আলকাইঅস তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'ভায়োলেট-কুন্তলা, পবিত্র, মধুস্মিতা সাফো' তাঁর মৃত্যুর বহু পরে তাঁর মূর্তি তৈরী হয়েছিল, সে সব মূর্তি সুন্দরীর নারীর, আফ্রোদিতের দেহ-লাবণ্যের আদর্শে তৈরী। কিন্তু সত্যরূপের পরিচয় আমরা পাইনি। যদিও কেউ কেউ তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে সুন্দরী সাফো নামে তাঁকে অভিহিত করেছেন, কেউ কেউ তাঁকে বলেছেন 'কুরূপা'— ডানাভাঙা নাইটিংগেল। তাঁর জীবনের অন্য ঘটনাও নানা পরস্পর বিরোধী তথ্যে বা মতে আকীর্ণ। যতটুকু জানা গেছে সাফো, অ্যাটিক গ্রীক অনুসারে, সাপ্‌ফো; আর তাঁর নিজের ভাষা আইওলিক গ্রীকে, প্সাপফো, জন্মেছিলেন এজিয়ান সমুদ্রের একটি ছোট সুন্দর দ্বীপ লেসবস-এ। তাঁর জন্মস্থান এই পাহাড়ী দ্বীপের এরেসস বা মিটিলেন শহরে। মিটিলেনেই তাঁর জীবনের বেশীদিন কেটেছিল। খ্রীষ্ট জন্মাবার দশ বারো বছর আগে তিনি জন্মেছিলেন। হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানা গেছে তাঁর বাবার নাম ছিল স্কামান্দ্রোন্যুমস, ট্রয়ের নদী স্কামান্দর-এর থেকে এই নামের উৎপত্তি। মায়ের নাম ক্লেইস। সাফোর এক মেয়েরও নাম ছিল ক্লেইস। সাফোর দুই ভাইএর খবরও আমরা জানি। এক ভাই খারাকসোস। হেরোডোটাসের ইতিহাসে তাঁর সম্বন্ধে কিছু খবর আছে। খারাকসোস্‌ মদের ব্যবসা উপলক্ষ্যে মিশরে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে হ্রোদোপ্‌সিস নামে বারাঙ্গনার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। তিনি ক্রীতদাসী ছিলেন। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে খারাকসোস্‌ তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। হেরোডোটোসের সাক্ষ্য অনুসারে প্রতিটি গ্রীকই হ্রোদোপসিস-এর সৌন্দর্য ও খ্যাতির কথা শুনেছিল। সমকালীন অনেক কবিতায় খারাকসোস্‌ নিন্দিত হয়েছিলেন। সাফোর আর এক ভাই লারিখোস। মিটিলেন-এ তিনি ছিলেন মদের দোকানের কর্মচারী। আরো একজন

ভাইএর কথা কেউ কেউ বলেছেন : এউরিগিঅস, অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে কোন খবরই আমরা জানি না।

কেউ কেউ বলেছেন যে সাফোর সঙ্গে কেরকোলাস বা কেরকিলাস নামে এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তাঁর বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানার উপায় নেই। লেসবস-এ পরপর তিনজন রাজার—মেলানক্রস, মির্‌জিলস আর পিটাকস-এর আমলে সাফো বেঁচেছিলেন। সাফো যখন বালিকা, বোধ হয় তখন তাঁদের পরিবারকে রাজনৈতিক কারণে পিরহা শহরে পালিয়ে যেতে হয়। পরে সম্ভবত বিয়ের পরে তাঁর জীবন কাটে লেসবস-এর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে—মিটিলেন শহরে।

সাফোর কবিত্বের খ্যাতি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর নগর ছাড়িয়ে অন্য নগরে। তিনি এক নতুন শ্রেণীর কবিতার অন্যতমা জন্মদাত্রী। হোমার মহাকাব্য ধারার কবি। সাফো গীতিকবিতার। সাফোর আগেই গ্রীক সাহিত্যে গীতিকবিতার জন্ম হয়েছে—আরখিলখোস সাফোর জন্মাবার পঞ্চাশ বছর আগেই লিরিক লিখেছেন, যার কিছু অংশ আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে। টিরটেউস, মিম্‌্নেরমুস, আলকেউস ইত্যাদি আরো কয়েকজন কবি গীতিকবিতার ধারা সৃষ্টির আদিপুরুষ। সাফো-ই প্রথম নারী যিনি এই নবীন কাব্যধারায় যোগ দিলেন, সজীবতা আনলেন, পূর্ণতা দিলেন। সাফোর একটি ছোট কবিতা আছে, যার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

এসো, পবিত্র কূর্মচর্ম, আমার বীণা
আমার বাণীর জন্ম দাও

সাফো এক নতুন বাণীর জন্ম দিয়েছেন। মূল গ্রীক যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করা হয়েছে 'গিগ্‌নেও' তার অর্থ 'পরিণত হওয়া', কখনও কখনও 'সত্তায় পরিণত হওয়া'। সাধারণ বাণীকে সাফো পরিণত করেছেন এক নতুন সত্তায়। সাফোর বহু কবিতা বা কবিতাংশ যা বর্তমানে আমাদের হাতে পৌঁচেছে, তার ভাষা কাব্যিক অলঙ্কার বর্জিত, তার অনেকগুলিই চিঠি, পত্রসাহিত্য নয়, বন্ধুবান্ধবীকে লেখা চিঠি, তাদের ভাষা সহজ, সরল, প্রাত্যহিক। সাফো একটি কবিতায় লিখেছেন—

শুরু করি, হাওয়ার তৈরী কথা দিয়ে
তবু তাই (শোনায়) মধুর

সমগ্র গ্রীসের অভিজাত ও কাব্যরসিকেরও কানে মধুর জানিয়েছিল সেই সহজ ভাষার মাধুর্য।

তাঁর সমকালে সাফো তাঁর কবিতার জন্য ছিলেন খ্যাত এবং বন্দিত। তাঁর কবিতার বিষয় প্রেম—প্রেমের আনন্দ বেদনা। কখনও তাঁর কাব্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রেমের আবির্ভাবে যৌবনের বিহ্বলতা, কখনও নিঃসঙ্গ যৌবনের জ্বালা।

পাহাড় থেকে বাতাস এসে যেমন অকস্মাৎ
আছড়ে পড়ে বনস্পতির গায়
তেমনই বুকের ওপর আজকে ভালবাসা,
কাঁপায় শাখা, পাতারা ঝরে যায়

ডুবে গেছে শশিকলা
সাত ভাই, মধ্য নিশীথিনী
কাল কাটে, কাল কাটে তবু
অভিলাষী, আমি একাকিনী।

তখনও প্রেমের যন্ত্রণায় অধীরতা, "তুমি আমায় পোড়াও (ভালবাসায়)", কখনও কখনও

মৃদুস্বরে প্রেমের আহ্বান, সৌন্দর্যের বন্দনা, কখনও ঈর্ষা, কখনও তীব্র আর্তস্বরে কৌমার্যের পুনর্জাগরণের জন্য প্রার্থনা। একটি ছোট সংহত কবিতায় শুনি—

"হে কৌমার, হে কৌমার্য, আমাকে ছেড়ে চলে যাও কোথায় ?
আমি আর কখনও তোমার কাছে ফিরব না, আমি ফিরি না।"

সাফো লিখেছেন অনেক কবিতা যেগুলি তাঁর সঙ্গিনীদের বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়ানো। হয়ত সেগুলি অনেক পরিমাণেই প্রথাগত। অনেক সঙ্গিনীকে চিঠি লিখেছেন, সেগুলিও ব্যক্তিগত প্রেমের কামনায় উজ্জ্বল। বিবাহ উপলক্ষ্যেই বোধ করি লিখেছেন "হে কুমার, আমরা কুমারীরা আজ তোমার দ্বারে এসেছি। তোমার ও তোমার বধূকে আজ সারারাত্রি শোনাব প্রেমের গান।" কখনও লিখেছেন "গান বন্ধ কর তরুণীরা, ভোর হয়ে এল"। আবার শুনি "সুখী কুমার, এই তোমার বধূ, প্রার্থনার শেষ হল, যে কুমারীর জন্য প্রার্থনা করেছিলে, সে আজ তোমার। তার সুন্দর মুখ উজ্জ্বল হয়েছে ভালোবাসায়।" আবার কখনও শান্তকণ্ঠে বিদায় সম্ভাষণ, "বিদায়, সুখী হও কুমারী, বর ও বধূ, বিদায়, সুখী হও বধূ ও সম্মানিত বর।" এমন সম্পূর্ণভাবে প্রেম, শুধুই প্রেমকে কাব্যের বিষয়বস্তু করেন নি কেউ সাফোর আগে। কামদেবতা, এরোস-এর উদ্দেশ্যে এভাবে আগে কেউ বলেন নি—

"স্বর্গমর্ত্যের শ্রেষ্ঠ উপচার প্রেম"

সাফো কত কবিতা লিখেছিলেন আজ স্পষ্ট করে বলা অসম্ভব। কিন্তু প্রমাণ আছে যে তিনি বহু লিখেছেন। জানা যায় নি তিনি প্যাপিরাসের ওপর কবিতা লিখতেন কিনা, অন্য কোন ভাবে লিখতেন কিনা, অথবা মৌখিক ধারাতেই তারা দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলো কিনা। তাঁর মৃত্যুর বহু পরে আলেকজান্দ্রিয়ায় যখন ব্যাকরণ চর্চার ব্যস্ততা, তখন সেই ব্যাকরণ-কারেরা তাঁর কবিতার কয়েক সহস্রাধিক পংক্তি নটি ভাগে সাজিয়ে ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে খ্রীষ্ট জন্মাবার তিন বছর পরেও কোন কোন রসিকের সাফোর সমগ্র পদবলী কণ্ঠস্থ ছিল; কিন্তু মূলত সাফোর কবিতা বেঁচেছিল ব্যাকরণকারদের কল্যাণে—তাঁরা সাফোর বিভিন্ন কবিতাংশ, পংক্তি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতেন।

আজ সাফোর কয়েক সহস্রাধিক পংক্তির, (প্রায় পাঁচশ কবিতার) থেকে মাত্র সাতশ'র মত বোধ্য পংক্তি পাওয়া গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। প্রাচীন ব্যাকরণবিদদের ব্যাকরণ থেকে, আর কিছু মিশরের পিরামিডের ভেতর থেকে, মমির সঙ্গে রাখা জিনিষপত্রের সঙ্গে। প্রাচীন গ্রীসের বহু সাহিত্যসৃষ্টিই হারিয়ে গেছে। অনেক বেঁচেছে। হারাবার কারণ অনেক—শুধুই জল হাওয়ার প্রতিকূলতা নয়, রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে জড়ানো শহর নগর দেবালয় ধ্বংসের উন্মত্ততা-ই নয়; প্রাকৃতিক দুর্যোগই শুধু নয়—আর এক একটি কারণ মানুষের রুচি, মানুষের নীতি, মানুষের ধর্মের শাসন। খ্রীষ্টীয় পিতারা যদি প্লেটো-কে স্বীকার না করতেন তাহলে হয়ত প্লেটোও আজ কিম্বদন্তীতে পরিণত হতেন। সাফো-র বিরুদ্ধতা করেছে পরবর্তী যুগের ধর্ম এবং নীতিশাসিত কাব্যরুচি। ওভিদ্ সাফো সম্বন্ধে লিখেছিলেন, তিনি আমাদের কী শিখিয়েছেন, Lesbia quid docuit Sappho nisi amare puellas ?—কেমন করে মেয়েদের ভালবাসতে হয় এছাড়া আর কি

শিখিয়েছেন লেসবিয়ার সাফো ? ওভিদ্ যে অর্থেই বলুন না কেন পরবর্তীকালে যিনি ভালবাসতে, যিনি শুধু কামনাদীপ্ত প্রেমের গান লিখেছেন, নিতান্ত মানব-মানবীর দৈহিক আকর্ষণ, এবং অনেকের মধ্যে সমকামিতার আকর্ষণের গান লিখেছেন, তাঁকে খুব প্রশ্রয় দিতে চায়নি।

মধ্যযুগীয় নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানদের চোখে সাফোর কবিতা তাই নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা, কামুকের তীব্রআর্তি। প্রেম তাঁর কাছে "বিষামৃত", "অপ্রতিরোধ্য", তা দেহকে করে উজ্জ্বল, চঞ্চল, উদ্দাম। কাজেই সেই কাব্যের নির্বাসনই নীতিজ্ঞের কাম্য। ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌স্টান্টিনোপল-এর বিশপ সেন্ট গ্রেগরীর আদেশে সাফোর লেখা পুড়িয়ে ফেলা হল। এরও প্রায় দু'শ বছর আগে থেকে শুষ্ক সন্ন্যাসীরা সাফো-র কবিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন। আসিরিয়ার সন্ত টাশিয়ান বলেছিলেন, "সাফো বারাঙ্গনা, কামার্ত, আর নিজেই বলেছেন নিজের লাম্পট্যের কথা"। ৩৯১ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত পাঠাগার যখন ধ্বংস করা হল (এই পাঠাগার ধ্বংস করেছিলেন গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা, আরবরা নয়) তখনও সম্ভবত সাফোর কিছু কবিতা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। আবার ১০৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পোপ সপ্তম গ্রেগরীদের আদেশে রোমে আর কনস্টান্টিনোপল-এ সাফোর গ্রন্থাদির বহ্ন্যুৎসব করা হল। আরও কিছু ধ্বংস হল চতুর্থ ক্রুসেডের সময় যখন কনস্টান্টিনোপোল আক্রান্ত হয়েছিল—আর সম্ভবত ১৪৫৩-য় যখন কনস্টান্টিনোপলের পতন হল।

তবু সাফো বেঁচে রইলেন। পঞ্চশর যাঁকে দগ্ধ করেছিল, তাঁর কবিতাকে সন্ন্যাসীর ক্রোধাগ্নি নিঃশেষ করতে পারলেন না। তিনি বেঁচে রইলেন ব্যাকরণকারদের লেখায়। আবার রেনেসাঁসের সময় ইউরোপ যখন নতুন করে প্যাগান-গ্রীসকে আবিষ্কার করল তখন আবার খুঁজে পেল সাফোকে। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে হোরেস লিখেছিলেন, "সেই প্রেম এখনও জাগ্রত, সেই শিখা এখনও উজ্জ্বল—সেই আইতোলিয়ান মহিলা তাঁর লায়ারে যে প্রেমের গান গেয়েছিলেন।" রেনেসাঁস যুগের সাহিত্য সমালোচকেরা খুঁজে পেলেন সাফোর নূতন মূল্য—লংগিনাসের আর ডিওনিসিওস-এর লেখা থেকে পাওয়া গেল দুটি কবিতা—একটি চার স্তবকের কবিতা—ঈর্ষাদগ্ধ সাফোর করুণ স্বগতোক্তি—আর একটি দীর্ঘ কবিতা—আফ্রোদিতের কাছে প্রার্থনা—প্রায় যেমন প্রার্থনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কামদেবতার কাছে।

ধীরে ধীরে সাফোর লেখা সংগৃহীত হতে শুরু হল। ব্যাকরণ থেকে যে সব লাইন পাওয়া গেল। যে সব শব্দ পাওয়া গেল প্রত্যেকটি একত্র করা হল। ১৮৭৯-তে মিশরে ক্রোকোডিনপলিস-এর কাছে এক মরুস্থানে পাওয়া গেল একটি পুরোনো পাণ্ডুলিপি। ১৮৯৭-তে আবার মিশর থেকে দু'জন ইংরেজ পণ্ডিত সংগ্রহ করছেন আরও কয়েকটি গ্রীক পাণ্ডুলিপি। এসব থেকে সাফোর-কবিতার আরো অংশ বিশেষ পাওয়া গেল। তারপর আকস্মিকভাবে মমি জড়ানো কাগজে পাওয়া গেল সাফোর কবিতা। কিন্তু দুর্ভাগ্য কাগজগুলি লম্বালম্বিভাবে ছিঁড়ে যাওয়া। কবিতার একটি শব্দ, দু'টি শব্দ করে উদ্ধার করার চেষ্টা চলেছে। মিশরে পাওয়া মমি-জড়ানো কাগজের থেকে যা উদ্ধার করা গেছে তা দেখলে হঠাৎ মনে হবে বুঝি কামিংসের কবিতার মত সাজানো। বহু পণ্ডিত এই খণ্ড খণ্ড কবিতার থেকে সাফোর কবিতার অখণ্ডরূপ আবিষ্কারের জন্য জীবনপাত করেছেন।

সাফো-কে লুপ্ত করে দিয়েছিলেন খ্রীষ্টান-কুলপতিরা। সাফোকে পুনরায় রসিকের সামনে এনেছেন ব্যাকরণকার, সাহিত্য-সমালোচক ও অধ্যাপকগণ। সাফোর-জীবন সম্বন্ধে পরবর্তীকালে নানা কিম্বদন্তী শোনা গেছে, কিছু বিদ্রূপ, কিছু ব্যঙ্গ, কিছু কুৎসা। তার হয়ত অনেকটাই সত্য। অনেকটাই মিথ্যা। একসময় তাঁর চরিত্র নিয়ে যেমন নানা অপবাদ সৃষ্টি হয়েছিল, একালে অনেকেই চেষ্টা করেছেন সাফোকে সেই কলঙ্ক থেকে মুক্তি দিয়ে এক নতুন সাফোর সৃষ্টি করতে, যে সাফো বলেছিলেন "শিশুর মত আমার হৃদয়।"

সাফোকে নিয়ে অপবাদমূলক কিম্বদন্তী রচিত হল কেন ? তার কারণ স্পষ্ট করে বলা কঠিন। তবে অনুমান করা চলে। সাফোর অনেক নারী সঙ্গিনী ছিলেন—আনাক্টোরিয়া, আথিস, গিরিনা ইত্যাদি। আনাক্টোরিয়া, আথিস—সকলেরই নাম পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। এঁরা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তার জন্য সাফোর বেদনা কোন কোন কবিতায় তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন আনাক্টোরিয়া তাঁর বিয়ের জন্য সার্ডিসে যান এবং সাফোর কাছ থেকে দূরে যান। সাফোর কবিতায় আনক্টোরিয়াকে তিনি প্রেমের জন্য দূর যাত্রাকে আনন্দে স্বীকার করেও বলেছেন "যদিও তুমি দূরে, তোমার প্রিয় বন্ধুদের ভুলে যেও না, আমি তোমার কোমল চরণধ্বনি শোনার প্রতীক্ষা করব, লিডিয়ার সজ্জিত সৈন্যদের আর উজ্জল রথের শোভাযাত্রার চেয়ে অনেক বেশী করে দেখতে চাইব তোমার লাবণ্যময় মুখ।" আথিস-এর উদ্দেশ্যে সাফোর অনেকগুলি লেখা পাওয়া গেছে, সেখানে সুর আরো অন্তরঙ্গ। সেই চিঠির মধ্যে আনাকটোরিয়ার কথাও আছে। একটিতে লিখছেন "আমাদের প্রিয় বন্ধু (আনাকটোরিয়া) সুন্দরী আথিসের ভালবাসার কথা (প্রায়ই) ভাবে, তার বুকের ভেতর প্রত্যাশা। সে এখানে আসার জন্য কাঁদে। আমরা শুনতে পাচ্ছি রাত্রির বহু কণ্ঠ সমুদ্রের পার থেকে তার কান্না নিয়ে আসে।" আথিসের একটি চিঠির অংশ থেকে বুঝি সাফোর প্রতি আথিস-এর ভালবাসাও ছিল গভীর। তিনি লিখেছেন "সাফো, যদি তুমি না আস, শপথ করলাম আর তোমাকে ভালো বাসবো না।" আবার লিখছেন আজ, জগতে সবচেয়ে সুন্দরী সাফো আমাদের মধ্যে আসবেন, যেমন করে মা আসেন মেয়েদের মধ্যে।"

নানা জায়গা থেকে অনেক তরুণী সাফোর কাছে আসতেন। সম্ভবত এইসব তরুণীদের মাতাপিতারাই তাঁদের সাফোর কাছে পাঠাতেন শিক্ষার জন্য। সম্ভবত মিটিলেন শহরে এই রকম কারো কারো কাছে তাঁরা পাঠাতেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম পাওয়া যায় সাফোর লেখায় তিনি আন্দ্রোমিডা—সাফোর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। সাফো শুধু কবি ছিলেন না, সম্ভবত তিনি অন্যান্য কোন কোন শিল্পে কুশল এবং বিদূষী ছিলেন। তরুণীরা বিয়ের আগে তাঁর কাছে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে আসতেন। অনুমান করা চলে, সাফোর একদল ছাত্রী ছিল। সাফোর মত অনান্য শিক্ষয়িত্রীও ছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে সাফো ছিলেন একটি ধর্মীয় ছোট গোষ্ঠীর নেত্রী। এই সব ছাত্রীদের সঙ্গে সাফোর সম্পর্ক ছিল প্রীতির। আথিস-এর চিঠি থেকে মনে হয় সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। কখনও কখনও সাফোর কবিতায় তাঁদের সেই মধুর সম্পর্কের উল্লেখ আছে

"বলেছিলাম, বিদায়, সুখী হও
বলেছিলাম, আমায় মনে রেখ,
মনে রেখ তোমার প্রতি আমার ভালবাসা
আজ তোমাদের করাতে চাই স্মরণ
সেই আমাদের মিলিত দিনগুলি
যখন তুমি কাছে ছিলে, যখন
ভয়োলেটে, গোলাপ দিয়ে তোমার
সাজিয়ে নিতে কবরীদাম, আর
কণ্ঠে থাকত শতেক মঞ্জরী।"

এই সম্পর্ক নিয়ে পরবর্তীকালে কথা উঠেছিল—উঠেছিল সমকামিতার অভিযোগ। সাফোকে বলা হয়েছে 'লেসবিয়ান'—অস্বাভাবিক সম্পর্কসৃষ্টির শিক্ষাদাত্রী। এই অভিযোগ কতদূর সত্য তা বলা কঠিন। পরবর্তী পণ্ডিতেরা সাফোকে একটি "থিয়াসোস" বা ধর্ম-গোষ্ঠীর প্রধানা পুরোহিত বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন—তাও কতদূর সত্য বলা কঠিন। কোন কোন প্রাচীন লেখা থেকে জানা যায় যে আসলে দুজন সাফো ছিলেন—একজন কবি; আর একজন বেশ্যা, তিনিও কবিতা লিখতেন। গ্রীসে কিম্বদন্তী ছিল সাফো ফাওন নামক এক যুবকের অনুরক্ত ছিলেন।* ফাওনের আরো বহু প্রেমিকা ছিলেন। সাফো তাঁর প্রেমে পাগল হয়ে লেউকাডিয়ান পাহাড়ের চূড়ো থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। স্ট্রাবোর ভূগোলেও এর উল্লেখ আছে। ওভিদ এই কাহিনীর সূত্র ধরেই তাঁর 'হিরোইক এপিস্টল' কাব্যের পঞ্চদশ পত্রটি (ফাওনের প্রতি সাফো) রচনা করেন। আলেকজাণ্ডার পোপের ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি সূত্র তুলছি

"Ah, canst thou doom me to the rocks and sea,
O far more faithless and more hard than they ?
Ah, canst thou rather see this tender breast
Dashed on these rocks than to thy bosom pressed ?
This breast, which once, in Vain ! You liked so well ;
Where the loves played, and where the Muses dwell.
Alas, the Muses now no more inspire ;
Untuned my lute, and silent is my lyre :
My languid numbers have forgot to flow
And fancy sinks beneath the weight of woe."

এ্যাটিক কমেডিতে সাফো হয়ে উঠেছিলেন এক রহস্যময়ী চরিত্র। অন্তত দুটি নাটকে সাফোর চরিত্রের উপস্থিতি ঘটেছিল। সাফোর ব্যক্তিত্ব, বিশেষ করে তাঁর যৌন জীবনের কাহিনী সম্পর্কে কিম্বদন্তী হয়ত রঙ্গমঞ্চের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

কয়েক হাজার বছর ধরে সাফোর কাব্য বিনষ্ট হয়েছে নীতিবিদদের অন্ধ আক্রমণে, সাফোর ব্যক্তিত্ব বা জীবন অবগুণ্ঠিত হয়েছে নানা কিম্বদন্তীতে, লোক-মনে ধারণা জন্মেছে সাফো ছিলেন এক গূঢ় সাধনার সাধিকা, তাঁর যৌনজীবন সম্বন্ধে জনশ্রুতি বিস্তর। অন্যপক্ষে রেনেসাঁসের সময় থেকে একদল পণ্ডিত—যাঁদের ধারার আধুনিকতম পরিচয় বাওরা-র Greek Lyric Poetry

(১৯৬২)-তে তাঁরা সাফো এই "পাপ" মুক্ত করতে চাইছেন। রসিকের কাছে অবশ্য দুই অবান্তর। গ্রীক সাহিত্যের পরবর্তীকালে লেখকেরা, হোরেন এবং ওভিদ্ সাফোর জীবন সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী মেনে নিয়েছিলেন তাতে যেমন সাফোর কবিতার আস্বাদনে কোন বাধা হয়নি, আজ যদি কেউ প্রমাণ করেন সাফো ছিলেন আদর্শ সতী রমণী তাতেও তাঁর কবিতার কোন পরিবর্তন হবে না। সক্রেটিস যাঁকে বলেছেন "সুন্দরী", বহু প্রাচীন লেখক তাঁকে বলেছেন "কুৎসিত"; টাসিয়ান যাঁকে বলেছেন "গুনাইভন পোরণিথোন" অর্থাৎ "বারাঙ্গনা", আলকাইওস, সাফোর সমকালীন কবি, তাঁকে বলেছেন "আগ্না" অর্থাৎ "পবিত্র"। সাফোর সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসার তাই একমাত্র পথ এখন তাঁহার কবিতায়। "কবিরে পাবে না কবির জীবন চরিতে"— আর সাফোর জীবনচরিতই নেই। যে সাফোর ছবিই আমরা আঁকতে যায় না কেন—তা হবে আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। তাঁর কবিতা পড়েই বহু কবি সাফোর মূর্তি এঁকেছেন কল্পনার রঙ-এ। পালাটিন কাব্যসংগ্রহের মধ্যে এইরকম কত পদ আছে। আন্টিপাত্রোস লিখেছেন "আমার নাম সাফো। পুরুষের মধ্যে যেমন হোমারের গান, নারীর মধ্যে তেমনই আমার।" নসিস লিখেছেন, "হে বিদেশী, যদি যাও মিটিলেনে। সুন্দরী নৃত্যের শহর মিটিলেন। সাফোর সৌন্দর্যের মশাল জ্বালিয়েছিল এই নগরী।" একজন লিখেছেন "সুকুন্তলা লেসবিয়ান মহিলাদের মধ্যে সাফো একটি রত্ন।" আর একজন লিখেছেন "সাফোর চুম্বন মধুর, মধুর তার শুভ্র জঙ্ঘার আলিঙ্গন; মধুর তার দেহ। কিন্তু হৃদয় তার অনমনীয় কঠিন। তার প্রেম অধর পর্যন্ত এসে থমকে গেছে, তার শরীর কুমারী। কে সহ্য করতে পারে এই প্রেম? যে পারে, টান্টলস-এর পিপাসাও সে সহ্য করতে পারে।"

সাফোর কবিতাই, খণ্ড খণ্ড কয়েকটি কবিতাই, আজ সাফোকে বুঝবার একমাত্র অবলম্বন। "আমায় দেখো না এমন করে, আমায় দেখ না বাহির হতে"—সাফো সম্বন্ধে রসিকদের কাছে এই মিনতি করা চলে। সাফো সমকামী হন, কামুক হন, অথবা সন্ন্যাসিনী হন তাতে খুব বেশী কিছু এসে যায় না—কারণ তাঁর কবিতার অর্থ তাতে বদলাবে না। যেমন আমাদের দেশে বিদ্যাপতি ও বিশেষ করে চণ্ডীদাসের জীবনে ব্যর্থ প্রেমের অভিশাপ ছিল কি ছিল না এই তথ্য জানার ফলে তাঁদের কবিতার মূল্য বদলায় না। চণ্ডীদাসের কবিতায় আমরা বিপন্ন, বিষণ্ণ প্রেমিকের-দীর্ঘশ্বাস, অপ্রাপনীয় প্রেমের সৌরভ, সমাজের নিয়মে বন্দিনী নায়িকার নীরব নিবিড় অসহায় বেদনার পরিচয় পেয়েছি। কোন ব্যাখ্যায় তার স্বরূপ বদল হয় না। সাফোর কবিতায় আরো স্পষ্ট, আরো তীব্র, আরো উচ্চস্বরে নারীকণ্ঠে শুনেছি প্রেমের বিচিত্র কাহিনী। যৌবন বা কৌমার্য সাফোর চোখে

মধুর আপেলের মত ধীরে ধীরে রক্তিম উজ্জ্বল
সবচেয়ে উঁচু গাছের সবচেয়ে উঁচুতে, অলক্ষিতে,
না, অলক্ষিতে নয়, মালীদের নাগালের থেকে দূরে
একটি হায়াসিন্থ-ফুলের মত, পাহাড়ে
রাখালের পায়ের তলায় দলিত হয়ে মাটির ওপর পড়ে থাকে
তবু মৃদুলাল ফুটে বেরোয়।

সাফোর কবিতায় যৌবনের বন্দনা নয়, যৌবনের সঙ্গে ভালবাসা। যৌবনের যত মাধুর্য, যত সৌন্দর্য, যৌবন হারানোর যত বন্দনা। প্রকৃতির সব সৌন্দর্যকে সাফো ভালবেসেছেন, সব সৌন্দর্যই যে যৌবনের অনুষঙ্গ বয়ে আনে। তাঁর কবিতায় একাধিকবার আমরা দেখেছি সন্ধ্যাতারার কথা যাকে তিনি বলেছেন "সবচেয়ে সুন্দর তারা" ; শুনেছি সন্ধ্যার কথা, যে দিনের বেলায় ছড়িয়ে থাকা সব কিছুকে ফিরিয়ে আনে, মেষশিশু, ছাগল শিশুকে গোঠে আনে, শিশুকে মায়ের কোলে ; শুনেছি সেই পাখির কথা যে বসন্তের অগ্রদূত ; বারবার পরিচিত হয়েছি হায়াসিন্থ, ভায়োলেট আর রক্তিম গোলাপের সঙ্গে যারা সুন্দরীদের কেশ-সৌন্দর্য, যারা তরুণীদের উচ্চমান, আর বারবার সুরার পাত্র ও মদিরার কথা, বিবাহ সভার উচ্ছল আনন্দের সঙ্গে যার যোগ ; আর স্বর্ণের কথা—"খ্রোনোস"—স্বর্ণ, জীবনানন্দ দাশ যার পরিচয় দিয়েছেন "মহিলার প্রতিভায় যে ধাতু-উজ্জ্বল"। কখনও সাফোর কবিতায় সোনালি পাদুকা পরা উপচারের মত তাঁর ঘরে ঢোকে, কখনও রাণী আফ্রোদিতে সোনার পাত্রে ঢালেন স্বর্গীয় সুধা, কখনও স্বর্ণবর্ণা হেকাটের কথা, কখনও আফ্রোদিতের চুলে সোনালি ফুল ; আর একটি কবিতায় স্বর্ণ আর প্রেম এক। সাফো বলেছেন

স্বর্ণ, সে যে দেবতা সন্তান　　　　স্বর্ণ করে জয়
কীটেরা পারে না কুরে খেতে　　　　সবচেয়ে শক্তিমান নরের-হৃদয়।

জগতের ফুল, পাখি, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র শব্দ, ঝিঁঝিঁর ডানা ঝাপটানোর শব্দ, নাইটিংগেলের ডাক, "রাত্রির বহু কণ্ঠস্বর" ; আপেলকুঞ্জকে ঘিরে ঘিরে দেবতার উদ্দেশ্যে জ্বালানো আগুনের ধোঁয়া, দুগ্ধ-শুভ্র বসন, উদ্দাম সমুদ্রঝড়ের আর্তনাদ, দেবতার চোখের জল, মৌমাছিদের উড়ে যাওয়া—সব সাফোর কাছে তাঁর কবিতার উপকরণ।

সাহিত্যে সাফোর কণ্ঠে আমরা প্রথম শুনলাম একটি ব্যক্তির কণ্ঠস্বর। নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যথা, উচ্ছ্বাস, বেদনা ও ব্যর্থতার গান। প্রেম যাঁর কাছে অপূর্ণ, সেই সাফো কবিতার মধ্যে মুক্তি খুঁজেছেন। কবি ও পাঠকের মধ্যে অন্তরাল নেই। কবিতা এই প্রথম সাহিত্যে একান্ত নিবিড় অভিজ্ঞতার বাহন হল। এই লিরিকের ধারাই পরে ইউরোপীয় সাহিত্যকে প্লাবিত করল। মহাকাব্যের স্বর্ণআবাস থেকে কলালক্ষ্মী এলেন পর্ণকুটিরে। সাফো একটি কবিতায় বলেছেন

ডেউরো ডেউটে, মোইসাই, খ্রুসিওন লিপোইসাই [ড্রোমা]
হে কলা লক্ষ্মীগণ তোমাদের স্বর্ণগৃহ ত্যাগ করে আমার কাছে এসো।

মহাকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের কাছে এই প্রথম মানবীকণ্ঠের আমন্ত্রণ—গীতিকবিতার জন্মের শুভক্ষণ।

---

* ফাওন সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি ছিলেন মাঝি। লেসবস আর গ্রীসের মাঝখানের সমুদ্রে তিনি খেয়া পারাপার করতেন। একবার ভেনাস এক বুড়ির ছদ্মবেশে নৌকায় ওঠেন। ফাওন তাঁকে বিনা কড়িতেই পার করেন। দেবী খুশি হয়ে তাঁকে একটি মায়া-অঞ্জন দেন। সেটি ব্যবহার করলেই নারীরা তাঁর প্রেমে লুব্ধের মত ছুটে আসত। ফাওনকে নিয়ে গ্রীক ভাষায় প্রবাদও গড়ে উঠেছিল। পাহাড়ের ওপর থেকে সাফোর ঝাঁপ দেওয়ার সূত্র ধরে লেউকাডিয়ানদের মধ্যে একটি উৎসবও প্রচলিত হয়েছিল।

বঙ্গভাষার উদ্ভব ও বঙ্গলিপি প্রসঙ্গে

আমাদের এই দেশে মহেঞ্জোদড়ো-বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি সভ্যতার নিদর্শন থাকলেও দীর্ঘকাল বিদেশী আক্রমণ ও পরাধীনতার ফলে স্বাধীন মনোবৃত্তি ও গভীর গবেষণাশক্তি নানাপ্রকার এখনও প্রায় লুপ্তভাবে রয়েছে। ফলে আর্যশব্দকে জাতিবাচক মনে করা, বাঙ্গালীকে মূলতঃ অনার্য-রক্তপ্রসূত মনে করা এমন কি কোন কোন বৈদেশিকের মতে বঙ্গভাষাকেও মূলতঃ অনার্য মনে করা অসম্ভব হয়নি ও এরূপ নানা মতের ভক্তও অনেকে। এ সম্বন্ধে বিশেষ তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়ে প্রধানতঃ স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার সহায়তায় বঙ্গভাষার উদ্ভব ও বঙ্গলিপি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু বলতে চাই। যুক্তি বা পাদটীকা দিয়ে এই প্রবন্ধ ও আমার মস্তিষ্ককে তেমন ভারাক্রান্ত করতে আমার ইচ্ছা নেই; যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কতকগুলি বক্তব্য পাঠকদের বিচারের জন্য তাঁদের সামনে তুলে ধরছি, খুঁটিনাটিতে ত্রুটি থাকলেও মূল বক্তব্য হয়ত কিছু সত্যের সন্ধান দেবে—এই ভরসা।

প্রথমেই দেশ বা স্থানের অর্থে শব্দের প্রয়োগ সুপ্রাচীন তা বলে রাখি, কিন্তু শব্দটি আর্যভাষার (অর্থাৎ সংস্কৃত জাতীয়) না অনার্যভাষার এবং ঐ শব্দদ্বারা কতখানি স্থান বোঝাত তা বলা কঠিন। বঙ্গশব্দের সুপ্রাচীন প্রয়োগ ঐতরেয় আরণ্যকে দেখা যায়। সামান্য পাঠভেদ (ঋক্ বা অন্য শ্লোকের প্রথম পাদে) থাকলেও উক্ত আরণ্যকে এইভাবে শ্লোক রয়েছে :

প্রজা হ তিস্রোঽত্যায়মাসং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাস্ত্যন্যে অর্কমভি তো বিবিশ্র ইতি ॥

এর স্বাভাবিক ও সরল অর্থ মোটামুটি এইরূপ : তিন (জাতীয়) প্রজা বা লোক (পথ ? সুপথ ?) অতিক্রম (লঙ্ঘন) করেছিল, সেই তারা বয়ঃ (=পক্ষী ?? পক্ষীসদৃশ ?)। অন্য (—স্থানে ?) বঙ্গ (—দেশীয়) (অ)বগধ (—দেশীয়) ও চেরপাদ বা ইরপাদ (—দেশীয়) গণ সূর্যের দিকে ছুটে গিয়েছিল। বহু পরবর্তী অর্থাৎ ১৩শ শতকের পরে দু'জন বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়ণাচার্য ও আনন্দতীর্থ শ্লোক দুটির মধ্যে বহু শব্দকে পৃথকভাবে ধরে পৃথক অর্থ করেছেন। মাক্সমূলর প্রভৃতি এর মধ্যে বঙ্গ, বগধ বা মগধ ও বেরপাদ এই তিন দেশের সন্ধান পেয়েছেন এবং এইমত একণে গ্রাহ্য হয়েছে। তবে রং দিয়ে অনেকে বলেছেন—বাঙ্গালী পাখীর মত (কিচির মিচির করত), বিপথগামী ও রক্তে অনার্য ইত্যাদি। ভাষ্যকারদ্বয় কিন্তু বিপথ-গামিতা ছাড়া অন্য ত্রুটি বা নিন্দার কথা বলেননি। একভাষ্যমতে তিন জাতীয় প্রজা হচ্ছে 'ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রাঃ'। আনন্দতীর্থের মতে 'বঙ্গা(ঃ)' শব্দের অর্থ 'বং জ্ঞানং গময়ন্তি' (যে তে)। ক্ষত্রিয়াদি অবৈদিক বা অনার্য নয়, বঙ্গের উক্ত ভাষ্যার্থ সম্মানজনক। তাছাড়া ঋগ্বেদে 'বয়ঃ সুপর্ণা' প্রভৃতি এমনকি বহু 'সর্প' প্রভৃতি ঋষি ও তাঁরা ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে সম্মানিত। ঋগ্বেদের স্বস্তিবাচন মন্ত্র "স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ..." আজও বিখ্যাত।

এক তৃতীয় ভাষ্যকার বা পণ্ডিতের মতে (তাঁর নাম মনে পড়ে না। তিনি বোধ হয় অর্ক শব্দে কাল ভিন্ন: শব্দে তিনকাল কল্পনা করেছেন) বঙ্গ প্রভৃতি ত্রিকালজ্ঞ।

তিনশব্দের পাশাপাশি প্রয়োগ হতে ভাণ্ডারকর মনে করেন যে বঙ্গ মগধ ও চেরপাদ অঞ্চলগুলি পাশাপাশি ছিল। তা যদি সত্য হয় তাহলে মগধ ও বঙ্গ পাশাপাশি ছিল। বি. সি. লাহার মতে বঙ্গশব্দ অনার্য "বোঙ্গা" দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বহু পরবর্তীকালে আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মতে সুবা 'বঙ্গালহ্'-এর মধ্যে বিহার-উড়িষ্যার অংশও আছে ও তৎপরবর্তী ভৌগোলিক পুঁথি দেশাবলীবিবৃতি প্রভৃতি হতে বঙ্গ ও বঙ্গদেশ শব্দদ্বয়ের মধ্যেও পার্থক্য বোঝা যায়। বঙ্গদেশীয়ের নিন্দা (রক্তগত জাতির দিক দিয়ে কিন্তু নয়) বৌধায়ন স্মৃতি প্রভৃতিতে আছে বটে, কিন্তু তাদের বিশেষতঃ সুহ্ম প্রভৃতি অঞ্চলের ও 'তক্কনলাড' বা দক্ষিণলাডের বীরত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন জৈন আচারাঙ্গসূত্রে, কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় ও রামায়ণ মহাভারতাদির মধ্যে বহু কথা আছে। বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁরা দ্রাবিড়-মঙ্গোল রক্ত খুঁজে পান তাঁদের যুক্তিই কি বৈজ্ঞানিক বলতে হবে আর পুরাণাদি বিশেষতঃ মনু-প্রোক্ত-সংহিতার মধ্যে যে দ্রাবিড়াদি পতিত ক্ষত্রিয় এই বলা আছে—তা কি নিশ্চিত মিথ্যা? এ সম্বন্ধে বহু যুক্তি অন্য প্রবন্ধে দিয়েছি, এখানে এর শেষ করি। এ সব বলার উদ্দেশ্য যে প্রাচীন বাঙ্গালী বিশেষ করে বাঙ্গলাভাকে আর্য ও আর্যভাষ্য বলা যায়। বিবর্তনবাদী ডারুইনের মত বর্তমানে বহু জাতিতত্ত্ববিদ্ ও জীবতত্ত্ববিদ্ 'একজাতিত্ববাদের' পোষক।

সংস্কৃতের সঙ্গে কিছু মিল দেখে গ্রীক্, লাতিন্ ও ইংরাজী প্রভৃতিকে আর্যভাষা বলা হয়, এমন কি ঐ ভাষাভাষীরা নিজেদের আর্য বলেও গৌরববোধ করেন। সংস্কৃতের (প্রকৃত বা ব্যাপক অর্থে তৎসহ তার আত্মীয় পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশের) সঙ্গে ভারতীয় ভাষাগুলির বিশেষভাবে উত্তরভারতের ভাষাগুলির ব্যাপক সম্বন্ধ দেখা যায়। প্রাচীন ইংরাজী প্রভৃতির বহু (বোধকরি বার—চৌদ্দ আনা) শব্দ ও প্রত্যয়ের সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্য দেখা যায় না, সেজন্য কিন্তু ঐ ভাষাগুলিকে অনার্য কেউ বলেন না কিন্তু বাংলা-হিন্দী প্রভৃতির বেলায় একদল বলতেন যে প্রাচীন বাঙ্গালী প্রভৃতি অনার্যেরা আর্যভাষাদি ধার করেছে ;—কি দুঃখের কথা!

বেদ-সংহিতার পূর্বের ভাষা আছে কি? কতকগুলি নিবিদ্ মন্ত্র ও উক্তি পৃথকভাবে ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে আছে, এগুলি প্রাচীনতর হতেও পারে। তবে ঋক্ সংহিতা বা ব্রাহ্মণাদিতে অল্পবিস্তর সরস ধরণের (অর্থাৎ পাণিনির ব্যাকরণ অনুযায়ী) ঋক্ মন্ত্র বা "শ্লোক" পাওয়া যায়। এরূপ মন্ত্রকে অনেকে পরবর্তী মনে করেন ও মন্ত্রে দুর্বোধ্য শব্দ-প্রত্যায়াদি দেখে প্রাচীনতর মনে করেন। এ ধারণা ঠিক কি? পাণিনি নিজে অন্ততঃ ৬৪ জন বৈয়াকরণের পরবর্তী ও সংগ্রাহক, আর দুর্বোধ্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ভাষার মধ্যেই "অত্র শ্লোকা:" বলে প্রাচীনতর প্রমাণ দেখান হয়েছে। সেই শ্লোকাদি পাণিনীয়-তা বলেছি। ফলে দীর্ঘকাল বিবিধভাষা বা উপভাষা পাশাপাশি চলত ও যজ্ঞাদির সাহিত্যে ব্যবহৃত হত বলা যায়। প্রাকৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বহু নিয়মে বা নিয়মহীনতায় বৈদিক ব্যাকরণের (যার আলোচনা পাণিনিও করেছেন) সাদৃশ্য। এইসব দেখে বেদে প্রাচীনতম প্রাকৃতের নমুনা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন, আমারও তাই মনে হয়। গত দু'হাজার বছরের মধ্যে যে সব প্রাকৃত বা পালি (অনেকের মতে পালি প্রাকৃতেরই অঙ্গ) ব্যাকরণ লিখিত হয়েছে তার

অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং সংক্ষিপ্ততর ও 'শেষং সংস্কৃতবৎ' এই স্পষ্ট মন্তব্য রয়েছে অথবা এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক। সংহিতার কাল—২০০০—খৃঃ পূঃ বলে অনেকেই মনে করেন, পালি-প্রাকৃতের নমুনা স্থূলতঃ মহাবীর, জিন, বুদ্ধ বা অশোকের কাল হতে। তা হতে জাত ও সাধারণভাবে পরিচিত অপভ্রংশ ভাষায় দৃষ্টান্ত—১১০০—খৃঃ হতে দেখা যায়। সংস্কৃত (যেমন সংক্ষিপ্তসারে অষ্টমাধ্যায়ে) ব্যাকরণে ও হেমচন্দ্র প্রভৃতির ব্যাকরণ বা কাব্যে ও ছন্দোগ্রন্থাদিতে-এর নমুনা দেখা যায়। পূর্বভারতীয় (মাগধী, গৌড়ীয় প্রভৃতি) প্রাকৃত বা তৎকল্পা অপভ্রংশ হতে বাংলা ভাষার জন্ম—এই হচ্ছে সাধারণ মত।

বাংলাভাষার রূপের দিকে চেয়ে অনেকে কিন্তু তার জননী পূর্বী অপভ্রংশের সাহিত্য বা রূপ দেখতে পাচ্ছেন। প্রাচীনতম বাংলা বলে সাধারণতঃ চর্য্যাপদকে ধরা হয়। সন্ধ্যা বা সঙ্কেতের ভাষায় রচিত এই পদ বা শ্লোকের মধ্যে বিহারের হিন্দীভাষীরাও হিন্দীজননীকে দেখে; মৈথিলী বা নেপালীরাও হয়ত তা মনে করতে পারে। চর্য্যাপদকে ১২শ-১৩শ শতক বা পরের রচনা মনে করা হয়, কেউ বা তার বহু পূর্বের মনে করেন; তবে অপভ্রংশের পরের স্তরে প্রাচীন বাংলাভাষা এটি স্বীকৃত মত। এ সম্বন্ধে সহজে ও কয়েকপৃষ্ঠায় আলোচনা শেষ করা বোধ হয় অসাধ্য। প্রাকৃতের শাখা বা ভগিনীরূপে এক অপভ্রংশ ভাষা যে ছিল তা খৃঃ পূঃ ২য় শতকের মহাভাষ্য ও ৬ষ্ঠ শতকের কাব্যাদর্শ প্রভৃতি হতে জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নাম দিয়ে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবিষয়ক এক পুঁথিকে কেউ কেউ খাঁটি ও প্রাচীনতম বাংলা মনে করেন; কিন্তু তার কাল—১৪০০—খৃঃ বা সন্দিগ্ধ। জয়দেবের গীতগোবিন্দের শ্লোক-বিশেষের মধ্যে সহজ বাংলোর রূপ দেখাও বোধহয় বাতুলতা নয়। ছন্দ, রাগের নাম প্রভৃতির দিকে চাইলে গীতগোবিন্দ, চর্য্যাপদ ও উক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতির মধ্যে কিছু সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। তাল বা স্বরাঘাতের দিকে চাইলে এদের সঙ্গে মধ্যযুগের সংস্কৃত ভাষায় মোহমুদগর প্রভৃতির রচনার সাদৃশ্য আছে বোধ হয়। গীতগোবিন্দের

'বীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী' এর সঙ্গে চর্য্যার

'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল...' ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের

'কে না আজি বাএ বডাই...'আর মোহমুদ্গরের

'মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং...'—এদের সাদৃশ্য সাধারণভাবে পড়লে বোঝা যেতে পারে। এরূপ নানা সাদৃশ্য তুলনামূলকভাবে দেখা যায়। তবে পড়ার ভেদে বা ছন্দোনামভেদে অন্য মত হতে পারে।

এর উপসংহারে এইটুকু বলতে ইচ্ছা হয় যে বাংলায় বহু শব্দ ও ধাতুর প্রত্যয়ের সঙ্গে সংস্কৃতের যোগ সহজে দেখা যায় না; সেগুলিকে দেশী বা দ্রাবিড়ভাষ্য প্রভাবিত বলে অনেকে মনে করেন; কিন্তু এরাও সংস্কৃত প্রভাবিত হতে পারে। যেমন বহুবচনে প্রযুক্ত-'গুলি' কে দক্ষিণ ভারতের ঐ অর্থে প্রযুক্ত '-গল্' এর সংশ্লিষ্ট বলে অনেকে মনে করেন, কেউ বা সংস্কৃতের পৃথক শব্দ ফুল এর সঙ্গে যোগ দেখেন। বাংলায় এমন শব্দ আছে যার সঙ্গে তার অল্প প্রাচীনতর প্রয়োগের যোগ দেওয়া যায় না, কিন্তু সুপ্রাচীন প্রয়োগ বা সুদূরের আর্য্যভাষার

সঙ্গে যোগ দেখা যায় বা তা থাকা সম্ভব; অসম্ভবই বা কেন হবে? বাংলা 'ভাল' কথার সঙ্গে ইংরাজীর well, জার্মান wohl (হ্বোল্ বা ভোল্) ও ঋগ্বেদের 'ভন্ন' (সায়ণভাষ্যে 'ভদ্রবাটী') এদের সাদৃশ্য; 'জিনিয়া' (জয় করিয়া) এর ধাতুর সঙ্গে সংস্কৃত ধাতুর মিল সন্দেহজনক কিন্তু বেদে 'জিন্নতি'র ধাতুর সঙ্গে মিল আছে বোধ হয়, প্রাকৃতেও এরূপ প্রয়োগ মনে হয় আছে। বাংলায় ধাতুপ্রত্যয় (—ই) বারের সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ার 'তে' অর্থে লাতিন (তথা ইতালীয় ও ফরাসী)-are র যোগ থাকাই কি অসম্ভব? ভারতচন্দ্রের 'কহিবারে পারি' ইত্যাদির 'কহিবারে' প্রভৃতির সহজ অর্থ 'কহিতে'। কেউ কেউ এরূপ প্রয়োগকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য রূপে ধরেছেন, অবশ্য যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে; কিন্তু পূর্বোক্ত যুক্তি কি নিশ্চিত বাতুলতা? এখানে মনে রাখতে হবে যে 'বারে' প্রভৃতির ব-b বা v (অর্থাৎ অন্তঃস্থ ব) হতে পারে।

এবারে বঙ্গলিপি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করি। 'বঙ্গ' দেশ বা সুহ্ম রাঢ় প্রভৃতি অঞ্চল বা 'জনপদ' যখন বহুপূর্বে ছিল তখন সেখানে লোক, ভাষাও ছিল, তবে সেই ভাষা মূলতঃ এক না বহু তা নিয়েও বিতর্ক করা যায়। তবে এ পর্যন্ত যে নমুনা প্রাচীন ও ব্যাপক সাহিত্য হতে পাওয়া গেছে তাতে আর্য্যভাষার প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে, তা পূর্বেই বলেছি। কমবেশী দুহাজার বছর পূর্বে বঙ্গলিপিও ছিল বলা যায়। বুদ্ধদেবের জীবনী ও শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (-১ম-শতকের অশ্বঘোষের) বুদ্ধের লেখা ৬৪ লিপির মধ্যে অঙ্গ-ও মগধ-এর মধ্যে 'বঙ্গলিপি'র উল্লেখ আছে। নালন্দায় প্রস্তর-মন্দিরে বাস্তবে স্তূপের মত) কয়েকটী বিরাট প্রস্তরে লেখা কতকগুলি পদ ও প্রতীকের সংগ্রহ করেছি; এক বিশেষজ্ঞ দুটীর পাঠোদ্ধার মৌখিকভাবে করেছেন। নালন্দা-বিশেষজ্ঞ হীরালাল শাস্ত্রীর মতে উক্ত মন্দিরে দৃষ্ট কয়েকটি প্রস্তর লিপি খৃঃ ৬ষ্ঠ-৮ম শতকের পরের নয়। আমার সংগৃহীত লেখের সবগুলি বা কতকগুলির বিষয়ে ঐ কথা খাটতে পারে ও উক্ত পাঠোদ্ধার সত্য হলে এটা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে অত পূর্বের স ও ব (অন্ত্যস্থ), যা 'কেসব' (—কেশব) শব্দে ব্যবহৃত, প্রায় মধ্যযুগের ও এখনকার বঙ্গাক্ষরের মত। ঐ মন্দিরের ভিত্তি-প্রাচীরে কয়েকটি ভাস্কর্যে পাহাড়পুরের (রাজসাহী) ভাস্কর্য্যের প্রভাব আছে, অন্ততঃ বিশেষ সাদৃশ্য আছে, তাছাড়া পালযুগে ও বরেন্দ্রভাস্কর্যের উন্নতিকালে নালন্দাও পাল-শাসনে ছিল। ফলে বাঙ্গালীর প্রভাব উক্ত অক্ষরে থাকা সম্ভব, অন্ততঃ দুটী বাঙ্গালা অক্ষরের প্রাচীনতম রূপ বা মাতৃস্থানীয় রূপ ওখানে আছে বোধ হয়। এ সম্বন্ধে Asiatic soc-র মে, ১৯৬৯ এর মাসিক বুলেটিনে আমার প্রবন্ধ-সার দ্রষ্টব্য। এটী বাদ দিলে প্রায় ১১শ শতকের বা ১২শ-১৪শ শতকের পুঁথিতে প্রথম বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত, এটাই প্রচলিত মত বলে মনে হচ্ছে। বর্ত্তমান যুগেও যেমন ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের অক্ষরগুলির সাদৃশ্য ও স্বাজাত্য আছে পূর্বেও তা ছিল। ব্রাহ্মী বা তার আত্মীয় বর্ণমালা হতে স্থূলত ভারতীয় বর্ণমালার উদ্ভব। বুদ্ধদেবের বহু লিপিশিক্ষা সেজন্য সত্য হতে পারে, তাছাড়া প্রাচীন কামসূত্রের ৬৪ কলার ব্যাখ্যায় মধ্যযুগীয় যশোধর লুপ্তলিপির পাঠোদ্ধারকেও একটী কলা মনে করেছেন, অন্ততঃ তিনি বা অন্য প্রাচীন টীকাকার তাই করেছেন।

বঙ্গলিপিতে কিন্তু নানা জটিলতা ও কুটিলতা কালক্রমে এসে গেছে। প্রথমতঃ আমরা

সংস্কৃত বর্ণমালা বা অধিকতর বর্ণতে ইত্যাদি ব্যবহার করি বটে কিন্তু উচ্চারণে অনেক বর্ণের (যেমন মূর্দ্ধণ্য ণ) স্থান প্রায় নেই। তাছাড়া অতিরিক্ত শব্দ বা ধ্বনিও বাংলা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতিতে চলে (যেমন ইংরাজী zর মত শব্দ, র এর প্রকারভেদ), আবার অঞ্চলভেদে বিকৃতি ত আছেই। মিথিলা ও উত্তর পশ্চিম ভারতে অদ্ভুত উচ্চারণ ছিল; যেমন বিবিধ লেখ বা পুঁথি প্রভৃতিতে ষ-খ বা ষ স্থানে খ; (বর্ষা-বর্খা), বা 'বহ' (এক বর্ণে অন্ত্যস্থ ব ও হ ভ—ভাষাতত্ত্বমতে বর্গীয় ব্+হ)। যে বর্ণের পর অন্যবর্ণের উচ্চারণ হয় সে স্থলে পরবর্তী বর্ণের পরেই বসা স্বাভাবিক, অন্ততঃ পূর্বে নয়। ব্রাহ্মীতে সংযুক্ত পরবর্তী স্বরবর্ণ প্রথম বর্ণের উর্দ্ধে বা নিম্নে ব্যবহৃত হত, আর 'ক্+ই লিখতে আমরা লিখি 'কি', অর্থাৎ ই পূর্বে দিয়ে। উচ্চারণে বর্ণ হসন্ত হলেও লেখায় হসন্ত চিহ্ন বহুস্থলে আমরা দিই না; উচ্চারণ-রীতিতে বেশী লিখতে গেলে বেশী লেখা বা লেখাপড়া হবে কি। মিথিলা প্রভৃতির প্রসঙ্গ তুলনার জন্য বা বাঙ্গালী-প্রভাবযুক্ত ছিল বলে তুললাম।

সমস্ত ত্রুটীর সংশোধন করা যায় না, কারণ ত্রুটী ও সংশোধন নিয়ে মতভেদ হবে। তবে মনে হয় যে বিভিন্ন ভাষার নূতন ধ্বনি বা প্রকৃত উচ্চারণ দেখানোর জন্য অন্ততঃ বিশেষস্থলে তার প্রতীক বর্ণ বা চিহ্ন বাঙ্গালা ভাষাতেও রাখা উচিত। প্রাকৃত—অপভ্রংশে বর্ণসংখ্যা অল্প, ফলে কেউ কিছু প্রচলিত ও কল্পিত বানানের ব্যাতিক্রম ঘটালে তা সর্বত্র দোষের বলে মনে করা ঠিক নয়। চিন্তা ও জ্ঞানের প্রসারই বড় কথা; দুটো বানান ভুলই বড় কথা নয়। লেখমালা ও বহু পুঁথিতে বড়-ছোট লেখকদের যে সব বানান বা ভাষাজ্ঞানের নমুনা দেখা যায় তার কিছু তালিকা চোখের সামনে রাখলে ফেল করা ছাত্ররাও হয়ত বলবে 'আমরা কি কম পণ্ডিত?'

রামপ্রসাদ মজুমদার

এখন রাজা। নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। অস্মিষ্ট প্রকাশনী। ৯১।১'এ, লক্ষী দত্ত লেন, কলিকাতা-৩ দাম—দু' টাকা।

'এখন রাজা' কবিতাগ্রন্থ নিরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'এখন রাজা' পাঠ করতে গিয়ে, বিশেষত কবির প্রথম গ্রন্থ হিসাবে পাঠ করতে গিয়ে লক্ষ্য করবার মতো যে কবি কখন যে তাঁর নিজস্ব কাব্যদক্ষতায় পাঠক হিসেবে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন অনেক বয়সী দক্ষ কবির মধ্যে যে ঋজুতা বর্তমান—লক্ষ্যণীয় ভাবে কবি নিরঞ্জন প্রথম প্রচেষ্টাতে তা অনেকাংশে অর্জন করেছেন বলেই অনেকের মনে হবে। কবি নিরঞ্জনের মানসিকদর্শন এক অন্যতর ভাবনায় প্রতিভাত; গ্রন্থারম্ভেই 'দিনলিপি' অংশে কবি তাঁর কাব্যভাবনা সম্পর্কে এক প্রস্তাব রেখেছেন: জীবনের অর্থ কি? জীবনের অর্থ আমার কাছে সরল অংকের মতো। জীবনের অর্থ সুন্দরকে পাওয়ার চেষ্টা। সুন্দরের অর্থ—গান কবিতা ছবি নারী। জীবনের অর্থ অস্তিত্ব। অস্তিত্বের অর্থ আনন্দ।

এক অন্যতর প্রবল রোমান্টিকতার পাশাপাশি সুতীব্র যন্ত্রণা 'এখন রাজা'র মর্মে অণুরণিত: 'তুমি আমার স্বপ্নের সাধনা। আমার অস্তিত্বের অর্থ। আমার বেঁচে থাকার নিশানা। | এবং 'তুমি আকাশের মতো উঁচু সমুদ্রের মতো গভীর | বনানীর মতো সবুজ' (তুমি) এবং পাশাপাশি 'কুমারী পৃথিবী ছিল— | ঈশ্বরের অসীম প্রত্যয় | আর ছিল নীল জল শুধু নীল জল | মাছরাঙা পাখিদের ডাক | পানকৌড়ি পাখিদের মেলা | বুলবুলি পাপিয়ার তরল প্রণয় | ' 'আজ শুধু দিন যায়, দিন চলে যায় | পলল প্রাণের সাক্ষী, | অমৃত কোথায়?' (অমৃত কোথায়) ইত্যাদি। কবির অনুভবে, বিশ্বাসে অস্তিত্বের আনন্দই যেন 'এখন রাজা'য় প্রতিধ্বনিত। বিশেষত কবি যখন বলেন:

'অনেক হিরণ্য গন্ধ ঈথারের বর্তুল বিস্ময়
আমি উত্তাপের কাছাকাছি
আরও কাছাকাছি
বুকে বুক
মুখে মুখ
তোমাদের নিরুচ্চার বর্ণনা শুনেছি।
অথচ এখনো ঢাখো অনেক সূর্যই
জীবনের আনন্দের সাথে
ক্লান্তি চায় বার বার
বনলতা অথবা স্বতন্ত্র কোন নিজস্ব ছায়ায়।' (অনেক সূর্যের মৃত্যু)

অথবা, 'আমি—

আহত ঈশ্বরের স্তব শুনে

তোমার শরীর খুঁজি।' (আহত ঈশ্বরের স্তব)

তরুণকবি নিরঞ্জন ভট্টাচার্য লিখেছেন অল্প, কিন্তু তিনি তাঁর কাব্য ভাবনায় নিজস্ব একটা ধারণা ব্যক্ত করে গিয়েছেন; পাঠক অনায়াসেই তাঁর প্রতিবেদনের শরিক হয়ে ওঠেন। 'কবি মর্মমানসীর অনুসন্ধান করেছেন, বিরুদ্ধ প্রহরেও কবির বেঁচে থাকার, উদ্বোধিত হবার আকাঙ্খা প্রবল: 'অথচ অমোঘ ন্যাখো তুমিই আমার কবিতার উৎস' এবং পরবর্তী বক্তব্যেও তাঁর মানসিক ভাববিস্তার দৃঢ়প্রত্যয়ে দীপ্ত: 'কিন্তু দিব্যি আমি বেঁচে আছি | রাত্রির স্মৃতির গন্ধে | সকালের রাজপথে নির্মন ফুৎকারে আমি বেঁচে আছি আমি বেঁচে আছি।'

সুখের কথা, কবি স্বকীয় ভাবনায় বিশ্বাসী তিনি—নিজে যা অনুভব করেছেন, জীবনকে যে রঙে বিস্তারিত, সঙ্কুচিত হতে দেখেছেন সহজ বিন্যাসে তাকেই প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছেন 'এখন রাজা'র। ক্ষেত্রে বিশেষে ছন্দে কোথাও শৈথিল্য, চিত্রকল্প রচনায় অমনোযোগ থাকলেও অকারণ কাঠিন্য, পরিশ্রমী অতি আধুনিকতার চাতুর্যের আশ্রয় নেন নি নিরঞ্জন—ভাবনায় নিরঞ্জন বরং নদীর মতো, ভালবাসার মতো, অমল মেঘের মতো। পাঠকের সেজন্য তৃপ্তিরই কারণ বোধকরি ঘটবে।

বেদনার কথা, কবি নিরঞ্জন 'দরজা খোলা রেখে' চলে গেছেন—অকালে কবি পরলোকগমন করেছেন। 'এখন রাজা'য় তিনি সম্ভাবনা-উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন; এই বিয়োগ নিঃসন্দেহে নিদারুণ দুঃসংবাদ। কিন্তু বলবো, নিরঞ্জন বেঁচে আছেন, কেননা নিরঞ্জন বেঁচে থাকার ভাবনায় উৎসাহিত ছিলেন, নিরঞ্জন বেঁচে থাকার প্রার্থনাকে ভালোবেসেছিলেন। আলোর মধ্যে অনেক গভীর রঙের বাহার | মিলিয়ে গেল···মিলিয়ে গেল' (এখন রাজা), তবু ক্ষতি নেই কেননা নিরঞ্জন যে জানিয়ে গেছেন 'আমি বেঁচে আছি। আমি আছি।' নিরঞ্জন বেঁচে আছেন, বেঁচে আছেন ভালোবাসায়, তাঁর কবিতায়।

'এখন রাজা'র গ্রন্থসজ্জা মনোরম, এবং অজয় গুপ্ত কৃত প্রচ্ছদ প্রসংসার্হ!

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচী : সাফল্য ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য

পরিবার পরিকল্পনা ভারতে সমাজকল্যাণ কর্মসূচীর একটা সম্পূর্ণ নতুন দিককে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্য এই কার্যসূচী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে নতুন এক দিগন্তের সূচনা করেছে পরিবার পরিকল্পনা।

প্রজননশীল বয়সের প্রায় দশকোটি দম্পতী অর্থাৎ ২০ কোটি নারী পুরুষের পরিবার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনের সঙ্গে আমাদের পরিবার পরিকল্পনার সমগ্র কর্মসূচী জড়িত। উল্লিখিত সংখ্যাটি আমেরিকার মোট জনসংখ্যার সমান। এ থেকেই সমস্যা এবং কর্মসূচীর বিরাটত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

ভারতে শহরের সংখ্যা ৩ হাজার। গ্রামের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬০ হাজার এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকই গণসংযোগের মাধ্যমগুলোর সঙ্গে পরিচিত নন। বিরাট এই দেশে রয়েছে আচার-ব্যবহার, ভাষা ঐতিহ্যগত বৈচিত্র ও পার্থক্য। তাছাড়া শিক্ষিতের হারও ভারতে কম। দ্রুত ও আধুনিক ধরণের পরিবহন ব্যবস্থারও এখানে অভাব। কিন্তু এইসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেই সমগ্র দেশব্যাপি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়নের জন্যে একটি সংস্থা সংস্থাপন করতে হয়েছে।

এ ধরণের একটি বিরাট প্রকল্পের কথা চিন্তা করা এবং রূপদান করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। সংস্থাটিকে অত্যন্ত ব্যাপক ভিত্তিতে গঠন করা হয়েছে। জনগণকে সেবা করবার জন্যে এই সংস্থাটিকে জনগণ তাদের প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও একাজে জড়িত করতে হয়েছে। জনগণের মধ্যে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মনোভাব সৃষ্টি করা এভাবেই সম্ভব।

পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ন—উভয় ক্ষেত্রেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে জড়িত করা দরকার। একথা আজ বলতে কোন বাধা নেই, প্রশাসন যন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রচনাও রূপায়ণ করে নি, করেছে এমন একটি সংস্থা যে সংস্থা জনগণের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর আর একটা বড় সাফল্য এই যে, জনগণকে আগ্রহী করে তুলবার জন্যে এর আগে কখনো এত বড় এবং সমবেত প্রয়াস চালানো হয়নি। শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে বড় বড় অভিযান চালান হয়েছে বটে, কিন্তু তা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে। পক্ষান্তরে আমাদের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত ব্যাপারে ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের পরিবর্তন ঘটানো। আমাদের এই প্রয়াসের ফলে ভারতীয় সমাজে যে এর মধ্যেই অনেক বিবর্তন দেখাদিয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। লোকে আজকাল যেভাবে খোলাখুলি পরিবার পরিকল্পনা ও যৌন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন, এর আগে কখনো তা করতে পারতেন না। সুতরাং এমন আর বেশী দূর নেই যেদিন ছেলে মেয়ের সংখ্যা কত হওয়া উচিত তাও প্রকাশ্যে তারা আলোচনা করতে পারবেন।

সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এরকম একটি বিরাট কর্মসূচীতে কোন ঝুঁকি নেয়া যায় না।

তাই পরিবার পরিকল্পনায় যেসব পদ্ধতি সুদীর্ঘ ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষায় সাহায্য সন্দেহাতীতভাবে ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে সে সব পদ্ধতিগুলোই কেবল চালু করা যায়।

এভাবে পরিবার নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে আগ্রহী করে তুললেও সরকার কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি জনগণের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন না; বরং জনগণ তাদের প্রয়োজনানুযায়ী যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিচ্ছেন।

পরিবার পরিকল্পনা সূচীর ক্ষেত্রে আমাদের একটু তড়িঘড়ি করতে হবে। সময়-১৯৭৬—৭৭ নাগাদ জন্মহার হ্রাসের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্র আমাদের অর্জন করতে হবে। সময়-সীমার ব্যাপারটা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। কারণ এর সঙ্গে আমাদের অর্থনীতি এবং অগ্রগতির কর্মসূচীর ক্ষতির প্রশ্নটি জড়িত।

সাফল্যের কথা বাদ দিলে এই কর্মসূচীর সীমারতি রয়েছে প্রধানত প্রশিক্ষণ, গবেগণা এবং মূল্যায়নের দিক থেকে। আমাদের এই কার্যসূচীর জন্যে দরকার হচ্ছে ২৫ হাজার শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী। কিন্তু যতদিন না এত অধিক সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী না পাওয়া যায় ততদিন পর্যন্ত তো অপেক্ষা করে থাকা যায় না। কর্মসূচী রূপায়ণ এবং প্রশিক্ষণ দুটোই একসঙ্গেপাশাপাশি চলবে কর্মীদের শিক্ষণদানের জন্যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন ও এই সব প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্যে প্রশিক্ষণ তৈরীর জন্যে সময়ের প্রয়োজন। এজন্যেই প্রধানত এক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি মন্থর।

অনুরূপভাবে গবেষণার ক্ষেত্রের একুশটি গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণালব্ধ তথ্য এখন পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের কর্মক্ষমতা বাড়াবার জন্যে এক গবেষণার জন্যে নতুন নতুন সমস্যার উপলব্ধির পক্ষে এই গবেষণালব্ধ তথ্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। প্রতিষ্ঠান কলাকৌশল, পদ্ধতি এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্পর্কে মূল্যায়নের কাজও খুব একটা এগোতে পারেনি। সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়ণের যে কাজ হচ্ছে সে সম্পর্কে তথ্যাজ্ঞাপন এবং রেকর্ডরক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়নের ফলে ২০ লক্ষ শিশুর জন্ম রোধ করা হয়েছে। বর্তমান হারে যদি জন্মহার হ্রাসের প্রয়াস চালানো হয় তবে ১৯৭৬—৭৭ সাল নাগাদ আমরা বছরে ১২৫ লক্ষ শিশুর জন্ম রোধ করতে সক্ষম হবো। তখনি আসবে এমন একটা সমান্তরাল যখন আমরা দাবী করতে পারবো যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছি। আর তখনি আমরা সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির একটা নতুন যুগে প্রবেশ করতে সক্ষম হবো।

এই কর্মসূচী রূপায়নে আমরা সর্বতোভাবে প্রয়াস চালাচ্ছি। কিন্তু যা করছি তাই যথেষ্ট নয়। বর্তমান প্রয়াসকে আমাদের বহুগণিত করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে তা পূরণ করতে হবে। অর্থ, লোকবল এবং জিনিষপত্রের কোনো অভাব আমাদের নেই। কাজেই এক্ষেত্রে ব্যর্থতার কোনো ক্ষমা নেই।

আমাদের কর্মসূচীর দক্ষতা এবং এতে জনগণের অংশ গ্রহণের পরিমাণেই প্রমাণিত হবে কর্মসূচীর সাফল্য আমার বিশ্বাস, প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকলে ইতিমধ্যে যে অগ্রগতি ঘটেছে তা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা মিলিয়ে দেশের জনসংখ্যা সমস্যা আমরা নিশ্চিত সমাধান করতে পারবো।*

---

* *লেখক পরিবার পরিকল্পনা কমিশনার।*

he other half !
Wife takes one half. She needs you, your time and attention— a good half of you. What do you do with your other half, the working half?
Travelling to and from work, keeping appointments on time, meeting people, reaching children to school and all the other chores. And, of course, the little relaxing trips for pleasure.
Wherever you go, let Ambassador take care of you. Lean back, stretch out and relax. Steer her wherever you want to go. She obeys you silently. She is dependable. She is beautiful (next to your wife). She is smooth, she is strong. She'll go a long way and even take a lot of beating. She'll make you feel important, she'll make you feel wanted.
She will share you with your family, ungrudgingly. As your other half, Ambassador Mark II will respond to your tender handling.
AMBASSADOR
HM
HINDUSTAN MOTORS LTD.
CALCUTTA
SALES & SERVICE THROUGHOUT THE COUNTRY
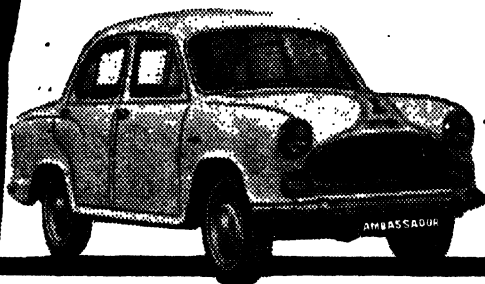
Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 October '69 (0'50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সপ্তদশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৭৬

সমকালীন

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিণামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

INDIAN
POST OFFICE SAVINGS BANK
PASSBOOK
আধুনিক হ'ন

কার্তিক তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব॥ বঙ্কিমচন্দ্র ২০'০০

ডঃ ভবতোষ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে আধুনিক যুগের পদসঞ্চার শুরু হয়। সে যুগের অনেকগুলি আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। গুপ্ত কবি বিভিন্নভাবে এই সব আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভূমিকা নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখায় সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নি, তিনি গুপ্ত কবির জীবনের যেটুকু চিরন্তন সত্যের ভাণ্ডারে তুলে রাখার যোগ্য, সেটুকু উদ্ধারেই তাঁর চিন্তাশক্তি ব্যয় করেছেন। ডঃ দত্ত তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বঙ্কিমের রচনাটিকে সুসম্পাদিত করে গুপ্ত কবির পূর্ণাঙ্গ জীবনপরিচয় পাঠক সমাজে উপস্থিত করেছেন।

ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য॥ দীনেশচন্দ্র সেন ১২'০০ দীনেশচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করেছে, এ কথা প্রবাদ স্বরূপ। বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজে তিনি 'আচার্য দীনেশচন্দ্র' নামে খ্যাত। শিক্ষকতা দীনেশচন্দ্রের জীবনের ব্রত ছিল। শিক্ষকতাসূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রে কথোপকথন বেশ কৌতুকোদ্দীপক।

আমি বলিলাম, 'ক্লাশ পড়াতে দিয়ে দেখুন না, বেশ তো, দেখি আপনার ছেলেরা বাঙালকে কি করে ঘায়েল করতে পারে?'

বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'তোর তো বেশ সাহস আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনা, তুই পারবি। বাঙালের কর্ম নয়······

বলা বাহুল্য দীনেশচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তুষ্ট করতে পেরেছিলেন ক্লাশে পড়িয়েই, কিন্তু মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতা তিনি করেন নি।

সঙ্গীতে সুন্দর॥ ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য ৫'০০ চারুকলা আমাদের দেশে মূলত গুরুমুখী বিদ্যা হয়েই রয়েছে, বিশেষত সঙ্গীত। চারুকলাকে উচ্চশিক্ষার স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বহুদিন থেকেই। এবং এমন একদিন আসবে যেদিন চারুকলা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে গড়ে উঠবে এবং সঙ্গীত ও গুরুমুখী-বিদ্যার স্তর অতিক্রম করে প্রয়োগ (প্র্যাকটিক্যাল) এবং তত্ত্ব (থিয়োরেটিক্যাল) সমন্বিত বিদ্যায় পরিণত হবে। সে দিন হ্যান্‌স্‌লিক-এর দি বিউটিফুল ইন মিউজিক (সঙ্গীতে সুন্দর) আমাদের শ্রদ্ধা ব্যাপকভাবে লাভ করবে।

ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেণ্ট : রেভল্যুশনারীজ ইন অ্যামেরিকা ১০'০০

কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পরাধীন ভারতের নাগপাশ ছিন্ন করার জন্য ভারতীয়দের বিপ্লব প্রচেষ্টা দেশের সীমান্তেই আবদ্ধ থাকে নি, য়ুরোপে আমেরিকায় তার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথকে সংযুক্ত করা হয়েছিল স্যান ফ্র্যানসিস্‌কো ট্রায়ালে : "secret papers introduced by the Government purported to show that Sir Rabindranath Tagore···had enlistedthe interest of Counts Okuma and Terauchi, formers Japanese Premier and present Premier respectively in the movement to establish an independent Government in India·········

ডঃ সুশীলকুমার দে

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী (১৭ই মাঘ, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ) উত্তর কলিকাতার এক অভিজাত কায়স্থ পরিবারে সুশীলকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডঃ সতীশচন্দ্র দে একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সুশীলকুমার কটক রাভেনস কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি সরকারী বৃত্তি পান। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি আইন বিষয়েও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সুশীলকুমার কিছুদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপনা করেন, পরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুশীলকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ইহার মধ্যে কিছুকাল তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বিভাগের সহিতও অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুশীলকুমার বাঙ্গালা ভাষার ইউরোপীয় লেখকদের সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীফীথ পুরস্কার লাভ করেন (১)। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রেম-চাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপ" (P.R.S.) প্রাপ্ত হন। এই নিবন্ধে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি অজ্ঞাত অধ্যায়কে সমুজ্জ্বল করেন। ১৯১৯

খ্রীষ্টাব্দে এই নিবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকটির একটি পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইংরাজ শাসনাধিকারের ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতির অনুধাবনে এই পুস্তকটির অপরিসীম মূল্য আছে (২)।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুশীলকুমার "লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েণ্টেল ষ্টাডিজ"এ অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পর কিছুকাল তিনি বর্তমান পশ্চিম জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক য়াকোবির নিকট ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আবাল্য স্কুল কলেজে ইংরেজী অধ্যয়ন করিলেও, সুশীলকুমার সঙ্গে সঙ্গে যত্নের সহিত মাতৃভাষা বাঙ্গলা ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। সুপণ্ডিত পিতার সংস্কৃত ও বঙ্গভাষানুরাগ সুশীলকুমারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পিতার নিজস্ব বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহের সদ্ব্যবহার দ্বারা সুশীলকুমার ছাত্র জীবনেই এই দুই ভাষার উপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। লণ্ডন স্কুল অফ্ অরিয়েণ্টেল ষ্টাডিজে অধ্যয়নকালে সুশীলকুমার প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-বিচার শাস্ত্র বা অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতি বিষয়ে গবেষণা করেন। সংস্কৃতভাষায় অলঙ্কারশাস্ত্র বহু বিস্তৃত ও বহু শাখা প্রশাখা সমন্বিত। বিশ্ববাসীর নিকট প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিচারের ধারা ও তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উপস্থাপন সুশীলকুমারের জীবনের একটি পরম কীর্তি। এই গবেষণা দ্বারা সুশীলকুমার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, লিট উপাধি অর্জন করেন। তাঁহার এই গবেষণা দুইখণ্ডে প্রকাশিত হওয়ার পর দেশে ও বিদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতবেত্তা পণ্ডিত হিসেবে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকটির দ্বিতীয়সংস্করণ কলিকাতা হইতে একখণ্ডে প্রায় ৭০০শত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে (৩)।

সংস্কৃত অলঙ্কার বা সাহিত্যবিচার শাস্ত্রের ধারাবাহিক ও সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় পথিকৃতের আসন যে সুশীলকুমারেরই প্রাপ্য এ বিষয়ে দেশে-বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কোন মতদ্বৈধতা নাই।

এই সময়েই সুশীলকুমার কুন্তক রাজানক রচিত "বক্রোক্তি জীবিত" নামক অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পাদন করিয়া সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। পণ্ডিত কুন্তক রাজানক দশম-একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন, পরবর্তীকালের আলঙ্কারিকেরা পণ্ডিত কুন্তকের মতাদর্শ অনুসরণ করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাম উল্লেখ করেন—কিন্তু কুন্তক রচিত বক্রোক্তি জীবিতের কোন একটি সম্পূর্ণ খণ্ড একত্র পাওয়া যায় নাই। মাদ্রাজ ও রাজস্থান হইতে প্রাপ্ত খণ্ড খণ্ড পুঁথির পাঠ মিলাইয়া সুশীলকুমার এই দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থের একটি সংস্করণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই পরম উপাদেয় গ্রন্থটির এ যাবৎ তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। (৪)

সংস্কৃত পুস্তক সম্পাদনা প্রসঙ্গে সুশীলকুমার সম্পাদিত দেববোধাচার্য রচিত "জ্ঞান-দীপিকা", রূপ গোস্বামী রচিত "পদ্যাবলী", বিল্বমঙ্গল রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত, কালিদাস রচিত মেঘদূত, নীতিবর্মণ রচিত কীচকবধম্, "পুরানেতিহাস সংগ্রহ" প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। (৫)

১৯২৩ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুশীলকুমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের রীডার ও পরে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য বিভাগীয় প্রধান মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চেষ্টায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সুশীলকুমার হরপ্রসাদের অধীনে এই বিভাগের রীডার নিযুক্ত হন। হরপ্রসাদের অবসর গ্রহণের পর সুশীলকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ইংরাজী বিভাগ হইতে সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধানরূপে কার্য করার সুযোগে সুশীলকুমারের সংস্কৃতচর্চার বিশেষ সুবিধা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকার সময়ই পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এর অনুরোধে সুশীলকুমার কিছুকাল ছুটি লইয়া পুনায় অবস্থান করেন এবং প্রায় দুই বৎসরকাল তথায় অবস্থান করিয়া মহাভারতের দ্রোণপর্ব ও উদ্যোগপর্ব (প্রস্তাবিত উনিশটি খণ্ডের) তিন খণ্ডে সম্পাদন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অবিরত চেষ্টায় ভাণ্ডারকর ও ওরিয়েণ্টেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্ট কর্তৃক মহাভারতের প্রামণিক সংস্করণ প্রকাশ সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়াছে। সুশীলকুমার সম্পাদিত পর্ব দুইটি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ সাত হাজার শ্লোক সমন্বিত ও দুশ অধ্যায় যুক্ত। ইহার প্রতিটি শব্দের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত ও বিভিন্ন বর্ণমালায় লিখিত প্রায় ষাটটি পুঁথি মিলাইয়া করা হইয়াছে। সুশীলকুমারের অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য ওরিয়েণ্টেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কর্মধারাকে গৌরবান্বিত করে। এই কার্যের জন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিটের কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকালেই সুশীলকুমার বাঙ্গলা ও সংস্কৃত আকরগ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণব মতবাদের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেন। এই পুস্তকটি বৃহৎ আকারের ৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাস নির্ণয়ে এই পুস্তকটির অপরিসীম মূল্য আছে (৬)। সংস্কৃত সাহিত্যে কান্তারসাশ্রিত ভাবধারার বিশ্লেষণ পূর্বক সুশীলকুমার ইংরাজীতে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, ইহার মধ্যে প্রথমটি ঢাকাতে কার্যকালেই রচিত হয় (৭-৮)। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ উইন্‌ট্যার নিট্‌স রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের পরিপূরকরূপে মহাভারত রামায়ণোত্তর যুগের (ক্লাসিক্যাল) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও সুশীলকুমার দের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য, দৃশ্যকাব্য ও গদ্যসাহিত্য সংক্রান্ত পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠা সুশীলকুমার কর্তৃক লিখিত হয় (৯)।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সুশীলকুমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় স্বগৃহে বসবাস আরম্ভ করেন। এই বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষায় বিশিষ্ট সেবার জন্য তাঁহাকে "সরোজিনী পদক," প্রদান করেন। ১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুশীলকুমার কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে স্নাতকোত্তর গবেষণা বিভাগে সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করেন। ১৯৫৬ হইতে ১৯৬০ পর্যন্ত তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকরূপে বৃত ছিলেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরস্মৃতি বক্তৃতামালা প্রদানের

আহ্বান পাইয়া সুশীলকুমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নন্দনতত্ত্বাধ্যয়নে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের উপযোগিতা বিষয়ে কয়েকটি ভাষণ দান করেন। এই ভাষণমালাও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১০)। প্রথম যৌবনে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার যে অনুরাগ ছিল, পরিণত বয়সে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সেই অনুরাগ শিথিল হয় নাই। ভারত ও ভারতের বাহিরে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র বা রসতত্ত্ব চর্চ্চার ক্ষেত্রে সুশীলকুমার একজন দিক্‌পাল রূপে পরিগণিত হন।

সংস্কৃত গ্রন্থের সুষ্ঠু সম্পাদন, সংস্কৃত রসশাস্ত্রের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ ও যুগের আলোচনা ও ইতিহাস রচনাতেই সুশীলকুমারের সারস্বত সাধনা সীমাবদ্ধ হয় নাই। সুশীলকুমার রচিত ইংরাজীতে বাঙ্গলা সাহিত্যের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (২)। ডঃ দে কর্তৃক মাতৃভাষায় লিখিত রচনার পরিমাণও অল্প নহে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তাঁহার বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ('ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম বাঙ্গলা মুদ্রিত পুস্তক কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' সা. প. প—১৯১৬, 'রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন, সমাচার দর্পণ' ঐ ১৯১৭ ; বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন বন্দ্যো সহ ইত্যাদি)। সুশীলকুমার রচিত গবেষণা ও সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংগ্রহ নানা নিবন্ধ গ্রন্থটির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (১১)। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুশীলকুমারকে শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতামালা দিতে আমন্ত্রণ করেন। "দীনবন্ধু মিত্র" আখ্যায় এই ভাষণমালা প্রকাশিত হয় (১২)। এই গ্রন্থে প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য কৌশল ও সমসাময়িক সাহিত্যে তাঁহার প্রভাবের বিষয় নিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নয় হাজারের অধিক বাঙ্গলা প্রবাদ সংগ্রহ, সম্পাদন ও প্রকাশ সুশীলকুমারের অন্যতম কীর্তি। ৯০ পৃষ্ঠা ভূমিকা ও সত্তর পৃষ্ঠার নির্ঘণ্টসহ এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন বাঙ্গলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ে সুশীলকুমারের "বাঙ্গালা প্রবাদ" একটি অমূল্য গ্রন্থ। শুধু এই একটি গ্রন্থ সম্পাদনের জন্যই যে কেহ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারিতেন (১৩)।

সুপণ্ডিত সুশীলকুমারের মনীষা শুধু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গলা ভাষায় তিনি কয়েকখানি অতি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন (দীপালি, প্রাক্তনী, লীলায়িতা, অন্ততনী, ক্ষণ-দীপিকা, সায়ন্তনী প্রভৃতি)। সংস্কৃত কবি সমাজের সৌন্দর্যানুভূতি ও রসিকতা আশ্রিত এই কাব্যগ্রন্থগুলি বাঙ্গলা ভাষায় বিশিষ্ট সম্পদরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। নিপুণ শব্দ-চয়ন, সুঠাম পদ-বিন্যাস ও ধ্বনি মাধুর্য সুশীলকুমারের কবিতাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

স্বদেশে ও বিদেশের পণ্ডিত-মণ্ডলী কর্তৃক সুশীলকুমার বহু সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে সোসাইটির সম্মানিত সদস্য বা 'ফেলো' শ্রেণীভুক্ত করেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল ষ্ট্যাডিজে এর ভিজিটিং প্রফেসর নিযুক্ত হন, প্রথম যৌবনে তিনি এই মহাবিদ্যালয়েরই অন্তেবাসী ছিলেন। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত সংস্কৃত-কমিশনের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন (১৯৫৭—৫৯)। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত

সুশীলকুমার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৫০ ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতিপদে বৃত ছিলেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা ভাষার বিশিষ্ট সেবার জন্য আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী পরিণত বয়সে কলিকাতাস্থ স্বীয় ভবনে সুশীলকুমারের জীবনান্ত হয়। তাঁহার সাধ্বী পত্নী তাঁহার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেই পরলোক গমন করেন। সুশীলকুমার অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাসন্তান পিতামাতার মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সুশীলকুমার ব্যক্তিগত জীবনে রুচিশীল বিদগ্ধপুরুষরূপে পরিচিত ছিলেন। সুহৃৎ ও ছাত্রবৎসলতার জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। বহু কৃতী শিষ্যের তিনি গুরু বা গুরু স্থানীয় ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে সুশীলকুমার গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। সুশীলকুমারই হরপ্রসাদের একমাত্র যোগ্য উত্তরসাধক যিনি বহুমুখী প্রতিভার সাহায্যে বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বীয় কৃতিত্বের সাক্ষর রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

(১) The early European Writers in Bengali—1915

(২) History of Bengali literature in the Nineteenth Century (1800—1825), Calcutta University, Calcutta 1919 , Revised 2nd Edn—(from 1757 to 1857), Calcutta, 1962.

(৩) Studies in the History of Sans Poetries (2 Vols), London, 1923—25 2nd Edn—Calcutta, 1960.

(৪) বক্রোক্তি জীবিত—Ed. with Critical notes and introduction, 1923 ; 3rd Edition—1961.

(৫) জ্ঞান দীপিকা—1944 ; কৃষ্ণ কর্ণামৃতম্—1938, মেঘদূতম্—১৯৫৬, (সাহিত্য একাডেমি), পদ্যাবলী—১৯৩৪ ; পুরাণেতিহাস সংগ্রহ—(সাহিত্য একাডেমি)—১৯৫৯ (ডাঃ রামচন্দ্র হাজরা সহ), নীতিবর্মন-কীচকবধম্—১৯২৯।

(৬) Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal from Sanskrit and Bengali Sources—Calcutta, 1942 ; Second Edition—1961.

(৭) Treatment of Love in Sanskrit Literature, Calcutta—1929.

(৮) Ancient Indian Erotics and erotic literature, Calcutta—1959.

(৯) A History of Sanskrit Literature—classical period—Dasgupta & De, Calcutta University—1947.

(১০) Sanskrit Poetics as a study of aesthetic, Tagore Memorial Lectures at the University of Chicago, 1961 ; California, 1963

(১১) নানা নিবন্ধ—মিত্রঘোষ, কলিকাতা, ১৯৫৩।

(১২) দীনবন্ধু মিত্র—কলিকাতা, ১৯৫১, ২য় সং—১৯৬০ (এ. মুখার্জি)।

(১৩) বাঙ্গলা প্রবাদ—প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৪৫ ; ২য় সং—১৯৫২, কলিকাতা।

পুরনো কলকাতা ও একটি জীবনীকাব্য

নারায়ণ দত্ত

তেলিনীপোতা আবিষ্কারের মত আসুন আমরা কল্পনার গরুর গাড়ী জুতে অজ এক পাড়াগাঁয়ের চৌহদ্দীর মধ্যে ঢুকে পড়ি। এখানে ওখানে ইতিউতি কয়েকখানা চালাঘর ক'জনই বা বাসিন্দা তাদের নাকে নথ, পায়ে মল, শান্তিপুরে ডুরে সাড়ীপরা বউ পুকুর থেকে জল আনতে গিয়ে পিছু ফিরে একবার আগন্তুক আমাদের দেখে নিয়ে তার সলজ্জ ঘোমটাটা নথের কানাত পর্যন্ত টেনে দেবে। চড়কা তকলিতে কাটা সুতো নিয়ে গামছা মাথায় হাটমুখো কোন মানুষ হয়ত বা থমকে কৌতূহলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে; তারপর চাকার একটা ক্যাঁচ কোঁচ শব্দের রেশ যতক্ষণ না একেবারে মিলিয়ে যায়, ধূলোর মেঘ তুলে দুই গাড়ীর শেষ অস্পষ্ট রেখাটাও যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়, ততক্ষণ চলতে চলতে পিছু ফিরে দেখবে, আর ভাববে, এ' কারা এল এদেশে। কিসের প্রয়োজনে?

হাটখোলা হলে না হয় কথা ছিল, সেখানে নৌকা করে, ডিঙি করে, ভাউলে করে, লোক আসে, তিন দেশের মানুষরা আসে—হুগলী. সাতগাঁ, ফরেসডাঙা, রাধানগর, শালকে থেকে। আজকাল সাহেব মহাজনরা আসতে শুরু করেছে—লালমুখো গোরা। তাদের সঙ্গেও দিশি লোকেরা থাকে। তারা 'গস্ত' করে, সুতো কেনে। আবার গঙ্গার হাওয়ায় পালতুলে তাদের নৌকা খুলে দেয়।

কিন্তু গ্রামের জীবন শান্ত, নিস্তরঙ্গ। তার চারিদিকে জলা, দু'এক টুকরো বা ধানজমি। তাতে ফসল হয়, রঙ পাল্টায়, সবুজের সমারোহ একসময় সোনা রঙ হয়। এক কোণে বা কলাবাগান, দু'এক কাঁদি বলা কলা। তাছাড়া শুধু হোগলার বন, আর বাঁশের জঙ্গল। জলার চারিদিকে শোলা আর লম্বা লম্বা পাতা ছড়ান একরকম জলজ গাছ। তাদের পাতার ডগায় হলদে হলদে ফড়িং বসে থাকে। তারা মাঝে মাঝে উড়ে কেমন বৈচিত্র্য এনে দেয়। তারপর ফের ঘুরে এসে বসে।

এখানে রাস্তায় গ্রীষ্মের গোড়ালিডোবা ধূলো। শুকনো পুকুরের তলদেশে ফেটে চৌচির হওয়া পাঁকের স্তর। তাপদগ্ধ তামাটে নীল আকাশে ডাহুকের ক্লান্ত চিৎকার। বর্ষায় ব্যাঙের ঐক্যতান। আর বানভাসিতে গ্রাম-জলা-রাস্তা-ঘাট একাকার। একসময় সেই জল সরে যায়। পড়ে থাকে একরাশ মাছ। পচে, দুর্গন্ধ ওঠে আর মড়ক লাগে। আর সবকালেই যা সমানভাবেই থাকে, তা' ভ্যানভেনে মাছি আর অসংখ্য মশা। সাহেব-বাঙালী-দিশি-বিদেশী কিছুই মান্য করে না। কামড়ে গায়ে চাকা চাকা দাগ ফুটিয়ে দেয়। জলুনি আর থামতে চায় না। এইত গাঁ।

হ্যাঁ গাঁয়ের নাম সুতানুটি। পাশেই কলকাতা, আর কলকাতা পেরোলেই গোবিন্দপুর। যেখানে দিনে রাতে শুধু খট্ খট্ শব্দ অনবরত চলছে শেঠ-বসাকদের দাদনী তাঁতিদের কয়েক হাজার তাঁত। কাপড় বুনছে, গামছা বুনছে, রুমাল বুনছে। অবশ্য ওই রুমাল গঙ্গা পেরিয়ে রাধানগরেরই

ভালো হত। অন্তত: আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন তাই বলেছেন।

কিন্তু, যে কথা হচ্ছিল। গাঁয়ের নাম সুতানুটি। আর তারই একটু বাড়বাড়ন্ত অঞ্চল হাটখোলা। চওড়া গঙ্গায় নাচতে নাচতে দিন-রাত নৌকা যায়-আসে। আসে সেই দূর বঙ্গোপসাগর থেকে। অবাধে। পর্তুগীজ থানা পেরিয়ে। আর তার লোকজন সব নামে হাটখোলা। গ্রাম সুতানুটির সম্ভ্রান্ত অঞ্চল। এখানে নিয়মিত হাট বসে। বলতে কি, সব জাতের আসর। 'কসমপলিটান মার্কেট।' সুতোর হাট। এই সুতো ঐ দাদনী বণিক শেঠ বসাকদের তাঁতিদের হাতের। আর সেই সুতো কিনে গুদামজাত করা হয় হাটের একপাশে হোগলা পাতায় ছাওয়া জনকোম্পানীর গুদাম ঘরে। যে ক'দিন হাটে থাকবার এখানে থাকে। আর তাদের যেন ছেড়ে চলে যেতে অপেক্ষা। একটা ঘরও থাকে না। গাঁয়ের হয়ে যায়। আবার হয়ত বা, বর্ষার আগের কালবৈশেখীর ঝড় আর বর্ষণে ফুলবার ভাঙা কুঁড়ের মতই এইসব হোগলার ঠাট উড়ে যায় ভেঙে যায়। এলে আবার নতুন করে ঠাট ফেলতে হয় সাহেবদের।

এই তো পুরোনো কলকাতা। সতের শ' কিংবা তারও কিছু আগেরকালের কলকাতা, হাটখোলা যার প্রাণকেন্দ্র—আর গ্রাম সুতোনুটির চৌহদ্দী যার আরও পুবে। সেখানে এ'সব কর্মচাঞ্চল্য নেই। সন্ধ্যা হলেই শিয়ালডাকে। ঝিঁঝিঁ পোকা সুর ধরে। গাছের পাতায়, আসস্তাওড়া আর কন্টিকারী বনে অজস্র জোনাকীর মেলা বসে। সেই শান্ত-স্থবির পটভূমিকায় হঠাৎ একদিন লোকজনের মেলা বসে গেল। শামুকের ডাঁই-এ আগুন দেওয়া হ'ল। ইটের পাঁজা সাজান হ'ল।—কি ব্যাপার? না, দালান হবে। কার? না. সে এক বিচিত্র ব্যক্তি—নন্দরাম সেনের। পুরনো কলকাতার প্রাণপুরুষ। সদ্য সংগৃহীত নন্দরামের অধস্তন পুরুষ জয়ন্তীচন্দ্র সেনের পয়ারে লেখা রচিত এই কাব্যগ্রন্থের মতে—

'প্রসিদ্ধ সকলে জ্ঞাত কলিকাতা ধাম। শোভা বাজারের কুল সেন বংশ নাম॥
দীর্ঘ গঙ্গা নামে স্থান সেন কুলোদ্ভব। তদপূর্ব্বের বার্তা জানা নাহিক সম্ভব॥
সুতানুটি গোবিন্দাদিপুর বলিখ্যাত। এবে কলিকাতা যথা সে স্থান বিখ্যাত॥
ইংলণ্ডীয় অধিকার বহু পূর্ব কথা। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যথা॥'

এই দীর্ঘ গঙ্গা কি দে গঙ্গা? এবং সেখান থেকে সেন বংশের আদি পুরুষ নন্দরাম এলেন শোভাবাজার। বন কেটে বসত করতে। জয়ন্তীচন্দ্র বলেছেন:

'এলেন পুরুষ মহা দীর্ঘ গঙ্গা হৈতে।
জঙ্গল কাটিয়া বাস এখানে করিতে॥'

নন্দরাম আগে নাকি মুর্শিদাবাদে কাজ করতেন:

'মুর্শিদাবাদে কর্ম করিতেন তিনি।
শুনিয়াছি লোক মুখে স্থির নাহি জানি॥'

এই তথ্যটি বিশেষ মূল্যবান। কেননা, মুর্শিদাবাদে রাজকার্যে অভিজ্ঞতা ছিল বলেই মনে হয় বিশেষ করে খাজনা আদায়, জমির পাট্টা ব্যবস্থা, জমি জিরেত বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজে জন কোম্পানীর ব্ল্যাক ডেপুটি নন্দরাম সেন প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাতে পেরেছিলেন। জমিদার রালফ

শেলডনের এতটা আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন। আপাততঃ যে রহস্তের সি. আর. উইলসন সাহেবও কোন কিনারা করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে যে মুখ্য অভিযোগ—তহবিল তছরূপ সম্বন্ধে, সেটাও প্রকারান্তরে সেন মশায়ের জমিদারী ব্যাপারে দক্ষতারই কথা বলে। এবং এই জীবনীগ্রন্থে তাঁর বিষয় বুদ্ধিরও যথেষ্ট পরিচয় আছে। কেননা, জঙ্গল কেটে বাড়ী তৈরী করলেও, নন্দরাম অর্ধেক শোভাবাজারের পাট্টা আনিয়ে নিয়েছিলেন :

'প্রায় অর্ধ শোভাবাজারের দিব্যস্থান।
পট্টক করিয়া লন তিনি বুদ্ধিমান॥'

শুধু শোভাবাজারের নয়। সেনজী যখন তাঁর মায়ের ব্রত পালনের জন্য এলো বারাসতে পুকুর প্রতিষ্ঠা করেন, তখনও বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে এইসব জমির পাট্টা নিতে ভোলেননি। অন্ততঃ তাঁর জীবনীকার তাই বলছেন :

'পত্র লিখিলেন তবে বর্ধমান ভূপে।
পেলেন ভূমির পাট্টা যথা বিধিরূপে॥'

সে যাই হোক, বনজঙ্গল কেটে নন্দরাম যখন বাড়ী তৈরী করতে এলেন শোভাবাজারে, তখন কি রকম ছিল কলকাতা? আইন-ই আকবরীর হিসেবে যে মহল কলকাতা থেকে বছরে বছরে তেইশ হাজার টাকার মত খাজনা আদায় হত সম্রাট আকবরের, সেই শিয়ালডাকা কলকাতার স্মৃতি ভেসে আসে। কেননা, পুরোনো কলকাতায় এক বিচিত্র ব্রতের কথা রয়েছে এই চব্বিশ পাতার খণ্ডিত গ্রন্থটিতে। বলা হয়েছে :

'নিত্য সেবা স্থির হয় সকল দেবের।
শিবাবলি ব্রত হয় সন্ধ্যার পুণ্যের॥'

শিবাবলি ব্রতটা কি? না, ঠাকুর চাকর রেখে রোজ রাঁধা হত ভাত, পায়েস, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। শুধু তাই নয় রোজ রোজ নতুন পাত্রে রন্ধন; নতুন থালা বাসনে সব জামাই আদরে সাজিয়ে দেওয়া হল। খাবে কে? দাঁড়ান, দাঁড়ান। সন্ধ্যে হোক। আকাশের বুকে সূর্য তার রক্তিম রশ্মির শেষ ছোঁয়া দিয়ে করুণ চোখে বিদায় নিক, একটা, আধটা করে সারা নীল আকাশে হাজারো তারা ফুটে উঠে মেলা বসাক, দেখবেন :

'সন্ধ্যা পরে লক্ষ লক্ষ শিবা উপস্থিত।
প্রত্যেকেতে আলাহিদা খায় পরিমিত॥
সর্বরাত্রি বাটিমধ্যে থাকিত শুইয়া।
প্রাতেতে মঙ্গলধ্বনি সকলে করিয়া॥
অরণ্যে যাইত চলি দিবা আগমনে।
পুনঃ সন্ধ্যা কালে পৌছে খাইত সেখানে॥

এই হচ্ছে সেই বিস্মৃত কলকাতার শিবাবলি ব্রত। এবং নন্দরাম সেন নাকি এই ব্রত পালনে এক অট্টালিকা বানিয়ে দিয়েছিলেন!

নন্দরামের আর এক পরিচয়, তিনি ভাটপাড়ার বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ, তর্কালঙ্কারের শিষ্যত্ব

অর্জন করেছিলেন। জীবনীকার বলছেন, এটাও ঐতিহাসিক ব্যাপার কেননা,

'ভাটপাড়া দেবগণে শূদ্রশিষ্য নাই।
ভক্তি দেখি বিচলিত হলেন গোঁসাই ॥'

জয়ন্তীচন্দ্র তাঁর আদি পুরুষের কীর্তিকাণ্ড সম্বন্ধে স্বভাবতই বেশ অত্যুৎসাহী। তবে এই সব পুণ্যকর্ম করার রসদ নন্দরাম কিভাবে সংগ্রহ করলেন, সে ব্যাপারে কোন আলোকপাত করার চেষ্টা করেননি তিনি। এবং কেনই বা তিনি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে এলেন, পিছনে ফেলে রেখে এলেন—তাঁর পিতৃপুরুষ যেথায় মানুষ, সে মাটি সোনার বাড়া—দে গঙ্গার মাটি, তার কোন হদিশ নেই। তবে সম্রাট ফররুক শীয়রের ফরমান অনুযায়ী ইংরেজরা যখন কলকাতা, ডিহি কলকাতা, সুতানুটি গোবিন্দপুর কিনে নিয়ে রাজপাট বসালেন, তখন বহু বাঙালীই নবাবের নৈরাজ্য ছেড়ে কলকাতায় এসে আস্তানা গেড়েছিল, গড্ডালিকাস্রোতেই কি এসেছিলেন নন্দরাম সেন? বলা শক্ত। তবে তাঁর এই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রকারান্তরে কি ইংরেজদের অভিযোগই প্রমাণ করে না যে সামান্য দু' টাকা মাইনের চাকুরে সেনমশায় খুব একটা সহজপথে এই অর্থ সংগ্রহ করেন নি? অবশ্য ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাও তো অস্বীকার করেননি, যে পরিবেশে এরা বাস করছেন, যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছেন, যে আলোকে চোখ চেয়েছেন, তার সবই অস্বস্তিকর। অন্ধকারাচ্ছন্ন। ক্লেদাক্ত। 'করাপসন'-কট্।

তবে নন্দরামের যে কীর্তির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি মোটামুটি সত্য। কলকাতার নন্দরাম সেন স্ট্রীটে রামেশ্বর শিবের মন্দির আজ বর্তমান। তাঁর রথ, রথতলার ঘাট সবই আছে। এই শিবের মাহাত্ম্য খ্যাপনও করা হয়েছে এই জীবনী গ্রন্থে এবং সে এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী, যদিও তার ইতিহাস বলতে কিছুই নেই। জয়ন্তীচন্দ্র বলছেন,

'কোথা হতে মহারাষ্ট্র জাতীয় বিশেষ।
দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বাস পূর্বদেশ ॥
দঙ্গল বাঁধিয়া এক অধ্যক্ষ লইয়া।
লুট করে দেশে দেশে বেড়ায় ভ্রমিয়া ॥
আসি উপস্থিত হয় গোবিন্দপুরেতে।
তন্নিকটে সুতানটি পারিল জানিতে ॥

এটা নেহাৎই কল্পকাহিনী, কেননা, বর্গীরা কোনদিনই কলকাতা আসেনি। শিবপুর থানা পর্যন্ত তাদের অগ্রগতির খবর জানা যায়। এছাড়াও অসঙ্গতি রয়েছে বর্ণনায়। বর্গীরা কলকাতা আসবে গোবিন্দপুর দিয়ে কেন? শিবপুরের কাছে গঙ্গা পেরিয়ে? অন্ততঃ তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। বর্গীর হাঙ্গামার কাল সতেরশ' একচল্লিশ থেকে একাত্তর। সে সময়ে কলকাতা বেশ জমজমাট। বন কেটে বসত হয়েছে সারা সুতানুটি ভরে। কলিকাতার আদ্যিকালের বড়বড় বাঙালীদের তখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেশ বাড়বাড়ন্ত। কাজেই জয়ন্তীচন্দ্র যে বলছেন যে সুতানটীতে আর বড়লোক বাঙালী ছিল না, কথাটা যথার্থ নয়। আর কেউ না থাকুক কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের তখন যথেষ্ট বোলবোলা। সাঁইত্রিশ সালের ঝড়ে

তাঁর ব্ল্যাক প্যাগোডা নবরত্নের মন্দিরের চূড়া ভেঙে পড়লেও সেটা তখনও দিবারাত্র ধরে বকের মত উঁচু গলায় কলকাতার ভালোমন্দ পর্য্যবেক্ষণ করে। কাজেই এই যে বলা হয়েছে—

'দেশেতে ধনাঢ্য কেহ না ছিল তখন।
রক্ষা হইবেন কিসে সংশয় জীবন॥'

সেটাও ভ্রান্ত! তবে বর্গীর উপদ্রবে সুতানুটীর লোকজনের যে পালাবার ছবি এঁকেছেন তার সঙ্গে গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে আঁকা ছবির বেশ মিল আছে। গঙ্গারামের বর্ণনা :

তবে সব বরগী গ্রাম লুটিতে লাগিল।
যত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোগর বাইনা পলায় কত নিক্তি-বড়গি লইয়া।
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া যত
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত।'

নন্দরাম সেনের জীবনীতে রয়েছে : নন্দরাম সেনও পালালেন। আর পালালেন সপরিবারে।

'স্বর্ণরূপ্য মুদ্রা আদি যত অলঙ্কার।
সঙ্গেতে লয়েন সবে যে ছিল যাহার॥
সুতানুটি গ্রামবাসী আর যতজনে।
পলাইয়া গেছে সবে দস্যু আগমনে॥'

সে যাই হোক, এই নাটকীয় মুহূর্তে নন্দরামের জীবনে এলেন—যষ্টি হাতে শিরে পাকাকেশ পরিচ্ছন্ন দেবরূপা অতি শুভ্রবেশ লক্ষ্মীদেবী। তিনি আশ্বাস দিলেন যে সেনজী আবার ঘুরে না আসা পর্যন্ত তিনি সেনবাড়ীতে অধিষ্ঠান করবেন। লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর শোভাবাজারের বাড়িটি সমর্পণ করে নন্দরাম চললেন হিজলী। আর এদিকে রামেশ্বর তার মাহাত্ম্য দেখালেন। লক্ষ্মীদেবী নন্দরামের পুঁতে রেখে যাওয়া সম্পত্তি বর্গীদের দেখিয়ে দিলেন। তারা সেগুলি খুঁড়ে নিয়ে বলল, আর কোথা? লক্ষ্মীদেবী বললেন, দেখবাবা, শিবের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার হার আছে। ধনরত্ন আছে। লোভপরবশ দস্যুরা যেই মন্দিরে প্রবেশ করতে গেল—

'কপাট সংস্পৃষ্ট ছিল খুলিবা মাত্রেতে।
ভিতরে জলন্ত অগ্নি পাইল দেখিতে॥
দ্বার খুলিবাতে সেই অগ্নি নিঃস্বরিল।
সম্মুখে যাহারা ছিল বদন পুড়িল॥

জনসাধারণের সেবায় নন্দরাম যে কটি কাজ করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে কমসে কম বারটা জলাশয় প্রতিষ্ঠা। কারণটা অবশ্য তার বৃদ্ধ মায়ের ব্রত। জলসংক্রান্তির ব্রত। বৈশাখ মাসের গনগন করছে রোদ। একটা বিরাট তৈলকটাহে যেন সারা পৃথিবী ভাজা-ভাজা হচ্ছে। নন্দরামের বুড়ী মা বললেন, জলসংক্রান্তি ব্রত করব। পণ্ডিতদের ডাক পড়ল। তাঁরা বিধান দিলেন, দ্বাদশ কুম্ভ জল দান করতে হবে। কুম্ভ, কিন্তু কিসের কুম্ভ। সোনা, রূপা,

বোতল না মাটির। অবশ্যই কলসীতে জলদান শ্রেষ্ঠদান। কিন্তু সেনমশায় বললেন এর চেয়ে ভালো বিধান দিন। ব্রাহ্মণরা বললেন,

'স্বর্ণকুম্ভ হৈতে শ্রেষ্ঠ যদি হে মনন।
পুষ্করিণী কিম্বা কূপ করহে খনন॥'

কিন্তু সেনমশায় বিপদে পড়লেন। হাতে সময় তো একটি বছর। বারটা পুকুর কাটা হবে কি করে? আর হ'ল যদি, বারটা পুকুর একই দিনে উৎসর্গ হবে কি করে। এই সমস্যার সমাধান করলেন তাঁর ভাটপাড়ার গুরুদেব বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ। তিনি স্বপ্নাদেশ দিলেন, এগারটা পুকুরের জল একটি পুকুরে এনে সেই পুকুরটা উৎসর্গ করলেই সব কয়টি উৎসর্গ করা সম্ভব হবে। পরে মাকে নিয়ে সব পুকুরে ঘুরলেই হবে।

যাই হোক, কলকাতার চারিপাশে জলকষ্টের জায়গা খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন নন্দরাম। তখন:

'গাড়ী ঘোড়া নাহি ছিল ডুলি মাত্র সার।
বহিত ধনাঢ্য লোকে দেশস্থ কাহার॥
বহুবিধ লোকসঙ্গে হলেন বাহির।
উত্তর দিকেতে যান সুবুদ্ধি সুধীর॥'

লক্ষ্যণীয়, নন্দরাম ডুলি করে চলেছেন উত্তর দিকে। কেননা, সেকালে একটা প্রথাই ছিল, উত্তর দিকে যাবার জন্যে ডুলী বা পাল্কী ব্যবহার। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে এই মুঘলই আদবের কথা লেখা রয়েছে—ইট ওয়াজ দি কাষ্টম ফর এ কিং গোইং টু কনকোয়েষ্ট টু রাইট এ টাস্কড এলিফ্যাণ্ট ইফ্ প্রোসিডিং টুওয়ার্ডস দি ইষ্ট, অর এ হর্স ওফ ওয়ান কলার ইফ মুভিং টুওয়ার্ড দি ওয়েষ্ট: ইফ টুওয়ার্ডস দি নর্থ, এ প্যালানকুইন অফ্ লিটার (ডুলি) ওয়াজ ইউজড, হোয়াইল ইফ টু দি সাউথ এ কার অর কার্ট ওয়াজ দি প্রপার কনভিএন্স। (মেমআর্স প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৪০) যাই হোক, সেনের ডুলি যখন এলোবারাসতে এসে পৌঁছালো তখন দেখেন সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। দুইটি মেয়েছেলেতে ধুন্দুমার। কোন্দল। ঝগড়া। কি নিয়ে—না জল নিয়ে। একজন অপরের কাছে জল ধার নিয়েছিল। অনেকদিন হয়ে গেল শোধ দেয়নি, তাই। ডুলি থেকে নামলেন সেনমশায়।

'জিজ্ঞাসেন মিষ্ট ভাষে তিনি উভয়েরে।
হেন অকৌশল কেন অল্পবারি তরে॥
কহিতে লাগিল তাঁরে যেই দিল ধার।
দীন যে দরিদ্র মোরা নির্ব্বাহি সংসার॥

জল তো নয় জীবন। অনেক কষ্টে বিশমালা জল বাঁচিয়ে একে ধার দিয়েছিলাম, মেয়েটি বলতে লাগল, এমন অকৃতজ্ঞ, আজ পর্যন্ত শোধই দিলে না। নন্দরাম সেনের দিব্যচক্ষু খুলে গেল। নিদারুণ জলকষ্ট এখানে বুঝতে তার কষ্ট হল না? বর্ধমান মহারাজকে লিখে বিরাট একটা ভূখণ্ডের পাট্টা নিয়ে নিলেন। তারই একাংশে বামুন বসালেন। অশ্বত্থবৃক্ষ রোপন করলেন।

আর সেই অশথতলায় পঞ্চানন শিব প্রতিষ্ঠা করলেন। বারাসাতে পুকুর প্রতিষ্ঠা করে নন্দরাম থামলেন না। সাইমাগ (সাইবাগ?) দে গঙ্গা ও গোপালনগরে তো পুকুর কাটালেন। গোপালনগরের সেনবধূ পুষ্করিণী একশ' বছর আগেও বজায় ছিল, জয়ন্তীচন্দ্র তার সাক্ষ্য ছিলেন।

গোপালনগরের 'সেন বউ' পুকুর কাটাতে কাটাতে ভাদ্রমাস এসে গেল। বাড়ীতে লক্ষ্মীপুজো আছে। শোভাবাজারে তাঁর বাড়ীর ভেতরই কয়েকটা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন তিনি। এল দুর্গাপূজা। আর সপ্তমী পূজার দিন হল পূজার ব্যাঘাত। সেনজীর ভাগ্যরন্ধ্রে শনি প্রবেশ করলেন।

'হইল সপ্তমীপূজা যথা বিধি মতে।
বলির ব্যাঘাত ঘটে শনির খেলাতে
মসিবর্ণ ছাগ ছিল বলির কারণ।
শনির আবাস দিব্য জানে সর্ব-জন॥'

এখন হয়েছে কি, বলির জন্য ছাগ আনা হয়েছে কিন্তু খর্পরের পাত্র আনতে ভুল। কাজেই কে যেন আনতে গেছে। আর এই অবকাশে ছাগশিশু কাঁপতে কাঁপতে উঠে পড়ল নন্দরামের কোলে। করুণা কাতর সেন মশাই বললেন, প্রাণী বলি বন্ধ। ছাগশিশুটিকে তিনি পুষতে লাগলেন। আর এইভাবে ছাগরূপ ধরে তাঁর গৃহে ঢুকল শনি আর তার ফলে :

'অল্পে অল্পে রবিসুত আরম্ভেন হানি।
অদ্ভুত শনির লীলা অপূর্ব বাখানি॥
গাভীগণ হাম্বারব ছাড়ে গাভীশালে।
আহারেতে তৃপ্ত নয় বিপাক কপালে॥
সে মহাপুরুষ ক্রমে হ'ন বন্ধুহীন।
ব্যাঘাত সকল কর্ম বুঝেন প্রবীণ॥

নন্দরামের কর্মজীবনে যে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে শ্লেলডনের মৃত্যুতে, এই ঘটনা কি তারই ইঙ্গিত বহ? বলা শক্ত। কেননা, এর পরেও আর একবার অভিশাপ কুড়িয়েছিলেন তিনি—কোন সত্যপীরের ফকিরের। সত্যপীরের ফকির ঢুকে পড়েছিল তাঁর শিবমন্দিরে। নন্দরাম স্বভাবতঃই তাঁকে বেরিয়ে যেতে বললেন। আর ক্রুদ্ধ হয়ে সে অভিশাপ দিয়ে বলল :

'বহু ক্রোধ দেখাইয়া সেনজীরে কয়।
অভিশাপ করি তোমা ফলিবে নিশ্চয়॥
অট্টালিকা ঘরবাড়ী হয়েছে বিস্তর।
এই জন্যে আছে তব গর্ব্বিত অন্তর॥
তাহাতে সম্পত্তি যাহা বংশেতে থাকিবে।
যবন রাজার ঘরে অবশ্য যাইবে।"

জন কোম্পানীর বিচারে নন্দরাম সেনকে যে তিনহাজার টাকার নগদ খেসারত দিতে হয়, এই কাহিনী কি তার ইঙ্গিত দিচ্ছে না? জয়ন্তীচন্দ্রের মতে উমিচাঁদের সঙ্গেও গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল

নন্দরামের। এই কাব্য গ্রন্থে রয়েছে :

'শ্রী শেখ অমিন চাঁদ কতকাল পরে।
পৌছে কলিকাতা বাস করিবার তরে॥
ধনাঢ্য প্রকাণ্ড দাড়ি জানিত সকলে।
বন্ধুত্ব সেনের সহ হইল কৌশলে॥
দুই কর্মে অন্তক দু'জন বিখ্যাত।
মনে কর যেবা শুনিয়াছ অবিরত॥
বিখ্যাত সকলে অমিন চাঁদের দাড়ী।
জানিত বৃহৎ ছিল নন্দরাম বাড়ী॥"

নন্দরামের সম্বন্ধে অবশ্যই এটা নতুন খবর। তবে এঁদের দুজনের মিতালী কোন খাতে রয়েছিল, কলকাতা আক্রমণের সময় উমিচাঁদ যখন জেলে, নন্দরামই বা তখন কি করছিলেন, সেই ডামাডোলের বাজারে কিভাবে নিজেদের গা বাঁচিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদই পরিবেশন করতে পারেননি নন্দরামের জীবনীকার।

তা' না পারুন, তবু এই খণ্ডিত পয়ার গ্রন্থটির মূল্য তা বলে ফেলবার নয়। এই ঘটনাগুলির অতিরঞ্জনের খোলস বাদ দিয়ে দেখা যায় মানুষ নন্দরাম সেনকে। তাঁর কীর্তি কম নয়। এক বৃহৎ পরিবারের আদিপুরুষের যে বিরাটত্ব থাকা প্রয়োজন, তার সকল মালমসলা রয়েছে তাঁর চরিত্রে। দুর্জ্ঞেয় নিয়তির সঙ্গে সকল বিরাট পুরুষের মতই তিনি হাসতে হাসতে পাঞ্জা লড়েছিলেন এবং হার-জিত নিয়ে খুশী মনেই জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন। দোল-দুর্গোৎসব রাস, রথ সেকালের সকল পালপার্বণ নিয়ে যে বাঙালী জীবনের জন্ম হচ্ছিল কলকাতায়, তাঁকেও খুঁজে পাওয়া যায় এই গ্রন্থে এবং এইভাবেই এককালকে আর এককালে সঞ্চারিত করেছেন কবি। সার্থকতা এইখানেই।

এ ছাড়াও কথা আছে। সন ১২৭৩ সাল অর্থাৎ আজ থেকে একশ তিন বছর আগে এই বই লেখা। নন্দরামের সঙ্গে লেখকের দূরত্ব চার-পাঁচ পুরুষের। কাজেই নন্দরামের শ্রুত জীবনীর উপর ভরসা হোক বা না হোক, সে কালের শেয়াল ডাকা, ডাকাতপড়া, বার ব্রতের কলকাতার ছবি পছন্দ না করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তার দামও কম নয়!

'স্বর্ণশৃঙ্খল' ও দুর্গাদাস কর

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

খাস কলকাতার বুকে 'নাটক' রচনা ও অভিনয়ের হিড়িক পড়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। কলকাতার ফ্যাশন বাসি না হতেই যেমন মফঃস্বলের হাটে ফেরীওয়ালা নিয়ে যেতে থাকে তেমনি নাট্যাভিনয়ের হুজুকও কলকাতা থেকে মফঃস্বলে হানা দিয়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

আজ থেকে একশ বছর আগে মফঃস্বলে প্রথম নাট্যাভিনয় সুরু হল। ১৮৬৯ সালের ৮ই আগষ্ট 'ঢাকা প্রকাশে' জানা গেল বরিশাল নগরে নাটকাভিনয় হয়েছে। 'এই ক্ষুদ্র নগর বরিশালে যে নাটকাভিনয় হইবে ইহা আমরা একদিনের জন্যও মনে করি নাই।' মফঃস্বলে এই প্রথম নাটকাভিনয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে এই নাট্যাভিনয় হয়েছিল।

নাটকটির নাম ছিল স্বর্ণশৃংখল। বাংলা দেশে পৌরাণিক নাটকের এই সুরু। অবশ্য পৌরাণিক নাটকের বহু রীতি আছে। ভক্তি রস প্লাবিত পৌরাণিক নাটক বলতে বাংলা দেশে যে নাটক বুঝি, স্বর্ণশৃংখল তার ভগীরথ। ডঃ সাধন ভট্টাচার্য্যের মতে পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরস থাকা ক্ষতিকর। কারণ ভক্তিরস এসে নাটকে রসাভাস সৃষ্টি করে। কিন্তু বাংলাদেশে এ রীতি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বিশেষত গিরিশচন্দ্র ঘোষের কলমে ও অভিনয়ে। গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক জনার পূর্বাভাষ আঁকা আছে স্বর্ণশৃংখলে। অন্ততঃ ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাই স্বীকার করেছেন। বাংলা পৌরাণিক নাটকে ভক্তি রসের অনুপ্রবেশের ইতিহাসে তাই জনার অনেক আগে স্বর্ণশৃংখলের নাম করা দরকার প্রবর্তক হিসেবে। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন স্বর্ণশৃংখলের পথে প্রথমে আসেন মনোমোহন বসু তারপর গিরিশচন্দ্র।

স্বর্ণশৃংখল জনপ্রিয় পৌরাণিক প্লটে রচিত। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। এ প্লটটি পরে নাট্যকারদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া এই প্লটের একটি সুবিধাও ছিল বোধহয়। এতে ছদ্মবেশে রাজদ্রোহ প্রচারের দুর্নামের সম্ভাবনা ছিল না।

রহস্যটা স্পষ্ট করা দরকার। স্বর্ণশৃংখল রচয়িতা ডাক্তার দুর্গাদাস কর। ডাক্তার হলেও এ পরিবারটি বিশেষ নাট্যামোদী ছিলেন। দুর্গাদাসের বংশধারায় এ তথ্যটি সুপ্রমাণিত। আমরা পরে এ বিষয়টি আলোচনা করব। কিন্তু দুর্গাদাস কর ছিলেন সরকারী কর্মচারী। সরকারী-কর্মচারীরা এ সময় রাজদ্রোহের দুর্নাম এড়াতে চাইতেন। একথাটির অর্থ এই নয় যে তাঁরা স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন না। বরং কিছু বেশীই ছিলেন। কিন্তু জীবিকার প্রশ্নে তাঁরা স্বদেশপ্রেমকে পরশপাথরের মত লুকিয়ে রাখতেন আন্তরিকতার উষ্ণ যত্নে। সময়টা ছিল সিপাহী বিদ্রোহের বিভীষিকা-উত্তর। সাহেবরা তখন যত্রতত্র রাজদ্রোহের দুর্গন্ধ পেতেন। আর এই সন্দেহের বেদীতে প্রথম সহজ স্বীকার হতেন হাতের কাছের সরকারী কর্মচারীরা।

এই সময় পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে নীলদর্পণের বীজ ছড়াতে লেগেছে। গুপ্ত ঘৃণার উষ্ণ আভাস ছড়িয়ে পড়ছিল সবল কৃষক তোরাপদের অত্যাচারিত পেশীতে। এই অঞ্চলের নীলকরদের অকথ্য অত্যাচার তখন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হতেও থাকে। ঢাকায় তখন দীনবন্ধু মিত্র ডাকঘরের ইনস্পেক্টর আর দুর্গাদাস কর সরকারী ডাক্তার। সৌভাগ্যক্রমে এঁরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে গুপ্ত ঘৃণা যখন ধূমায়িত হচ্ছিল তখন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ঘৃতাহুতির কাজ করে। দীনবন্ধু জানতেন তাঁর নীলদর্পণ সরকারী কোপ এড়াতে পারবে না। তিনি ছদ্মনামেই প্রকাশ করেছিলেন নীলদর্পণ। দুর্গাদাস করের পুত্র রাধামাধব কর জানাচ্ছেন 'ঢাকায় একটি ছাপাখানায় নীলদর্পণ মুদ্রিত হইতেছিল। প্রত্যহ রাত্রি ৯।১০টার সময় দীনবন্ধুবাবু আমাদের বাসায় আসিতেন, বাবা তাঁহাকে লইয়া তাঁহার নিজের শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া দুজনে নীলদর্পণের প্রুফ সংশোধন করিতেন' অর্থাৎ নীলদর্পণ প্রসঙ্গেও দুর্গাদাস দীনবন্ধুর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। এখন এমন দুর্গাদাসের কোন বই প্রকাশিত হলে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁর হয়ত চাকরী নিয়েই টানাটানি পড়ত। বইয়ে রাজদ্রোহ না থাকলেও দুরাত্মার ছলের অভাব হত না। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি উপেন দাসের গজদানন্দ ও যুবরাজ প্রহসনে রাজদ্রোহের জন্য সরকার রেগে গিয়ে ধরেছিলেন উপেন দাসের অন্য নাটক সুরেন্দ্র বিনোদিনীকে। তাও রাজদ্রোহের অভিযোগে নয়, অশ্লীলতার অভিযোগ। সে অভিযোগও আদালতে প্রমাণিত হয় নি।

সেইজন্যই আমরা দেখছি দুর্গাদাস তাঁর নির্দোষ পৌরাণিক নাটক স্বর্ণশৃংখল ছাপাতেও ইতঃস্তত করেছিলেন। স্বর্ণশৃংখল রচিত হয় ১৮৫৬ সালে। কিন্তু তখনও দুর্গাদাস বরিশালে। তাই প্রকাশ করা স্থগিত থাকে। 'বরিশালে অভিনয় করিবার প্রত্যাশায়' স্বর্ণশৃংখল রচিত হয়েছিল বলেছেন প্রকাশক ১২৭০ সালের ৩০শে আষাঢ় লিখিত ভূমিকায়। তাও আটবৎসর আগে। তারপর (১৮৫৮ সালে) দুর্গাদাস ঢাকায় বদলি হলেন। তখন স্বর্ণশৃংখল প্রকাশিত হয়। তাও লেখকের স্বনামে নয়। তাঁর সহকারী বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৩ সালের জুলাই মাসে নাটকটি প্রকাশ করেন। 'নাটকখানিতে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও, সরকারী ডাক্তার-রূপে বরিশালে অবস্থিতিকালে ডঃ দুর্গাদাস করই ইহা রচনা করেন।'

সুখের কথা এ নাটকটির জন্য দুর্গাদাসকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয় নি। কিন্তু দুর্গাদাসের লেখকখ্যাতির কারণও নয় নাটকটি। তাঁর পুত্র রাধামাধব কর বলছেন 'ভৈষজ্য রত্নাবলী' গ্রন্থ রচনা করিয়া বাবা (দুর্গাদাস কর) বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।' নাট্যকার দুর্গাদাস কর ছিলেন ডাক্তার। ডাক্তারি ও নাট্যোৎসাহ দুটি বৈশিষ্ট্যই পুরোপুরি পেয়েছিলেন তার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাগোবিন্দ কর। শ্যামবাজারের আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ তার পেশার সাক্ষ্য। কিন্তু তাঁর নেশা ছিল নাট্যাভিনয়। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি রসরাজ অমৃতলাল বসুর সতীর্থ ছিলেন। অমৃতলালের কথায় জানা যায় তাঁর ডাকনাম ছিল গোবি। তিনি নীলদর্পণে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নাটক বিশেষতঃ প্রহসন রচনায় তাঁর অনুৎসাহ ছিল না। অমৃতলালের নেতৃত্বে

তিনি অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে একটি প্রহসন রচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু ডাক্তারিও তাঁর নেশা ছিল। বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সমন্বয় হয়েছিল কয়েকটি ক্ষেত্রে। নীলদর্পণ অভিনয় করা হয়েছিল নেটিভ হাসপাতালের সাহায্যার্থে। সে রাত্রির টিকিট বিক্রির টাকা ডাক্তার ম্যাকনামারার হাতে দেওয়া হয়। নেটিভ হাসপাতাল মানে বর্তমান মেয়ো হাসপাতাল। তাই অমৃতলাল বলেন 'আর একটি কথা আপনি নোট করিয়া লইতে পারেন। যে গোবি একদিন মেয়ো হাসপাতালের উদ্দেশ্যে টাকা তুলিবার জন্য সৈরিন্ধ্রী বেশে টাউন হলে অভিনয় করিয়াছিল, সে এখন এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল ও কলিকাতার উত্তরাংশে আর একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে সফল প্রযত্ন হইয়াছে।'

রাধাগোবিন্দের চেয়ে একবছর পাঁচমাসের ছোট রাধামাধব কর। তিনি 'মাধু' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বলছেন শৈশব থেকেই গানের দিকে তাঁর একটা সহজ প্রবণতা ছিল। 'জীবনে আমি প্রথম গান শিখি ঢাকা শহরে'। ঢাকায় তাঁদের বাড়ীতে একটি মুসলমান পরিচারিকা ছিলেন। তিনিই গানের ঝোঁক এনে দেন শিশুর কানে। ১৮৬৫ সালে তিনি বাঁশী বাজাতে শেখেন। পরে কলকাতায় তিনি নাট্যাভিনয় মহলে ঢোকেন এই বাঁশী দিয়েই। পাথুরেঘাটার বড়রাজার জামাই পুণ্ডরীকাক্ষ তার বন্ধু। পুণ্ডরীকাক্ষ সহ অন্যান্যবন্ধুরা তাঁকে পাথুরেঘাটার নাট্যামোদী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত করে দেন। সেখানে গানের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন এবং পাথুরেঘাটা ঠাকুর বাড়ীর নাট্যাভিনয়ের আসরে নিয়মিত প্রবেশাধিকার পান। লেখাপড়া ছেড়ে বাঁশি ধরলেন রাধামাধব। 'বাঁশী আমার প্রেয়সী হইল।'

এর পর অভিনয়। শুধু অভিনয় নয়, অভিনয় শিক্ষাও। 'এইখানে আপনাকে বলিয়া রাখি 'উষা অনিরুদ্ধ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'লীলাবতী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক আমরা অভিনয় করিয়াছিলাম, সমস্তগুলির স্ত্রীলোকের ভূমিকার শিক্ষকতা আমাকেই করিতে হইত।' পাঠকের স্মরণে আছে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীচরিত্র অভিনয়ের জন্য নারী আনাকে অনেকে নিন্দা করেছিলেন। এই মেয়েরা সবাই ছিলেন পতিতা।' সামাজিক আঙ্গিকে পতিতাদের সঙ্গে শিক্ষিত যুবকদের এই মিলিত অভিনয়কে 'অসামাজিক মেলামেশা' বিবেচনা করা হত। রাধামাধব কর শুধু মেয়েদের সঙ্গে অভিনয় করতেন না। অর্দ্ধশিক্ষিত দেহ ব্যবসায়িনীদের অভিনয় শেখাতেনও। পতিতাদের অভিনয় গিরিশচন্দ্রও শেখাতেন। অশিক্ষিত পতিতাদের মুখস্থ করার সুবিধার্থেই তিনি তার নাটকে গৈরিশ ছন্দের প্রবর্তন করেন বলে শোনা যায়। এতে মেয়েদের মুখস্ত করতে সুবিধে হত। সেই গিরিশচন্দ্রও নাকি একজায়গায় লিখেছিলেন "শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর থিয়েটারের শিক্ষকতার দাবী রাখেন।' রাধামাধব কর একটি মনোহর নাটকও লিখেছিলেন বসন্তকুমারী নাটক। নাটক রচনা, অভিনেত্রীদের অভিনয় শেখান ছাড়াও রাধামাধব বাবু স্বয়ং অভিনয় করতেন। বেলেটির জমিদার ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের 'প্রকৃত বন্ধু' বলে নাটক অভিনীত হয়। বিনোদিনী জানিয়েছেন "এ নাটকে (প্রকৃত বন্ধুতে) নায়ক সাজলেন স্বর্গীয় মাধুবাবু। এঁর পুরা নাম রাধামাধব কর। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ আর জি করের ভাই। আমি যখন থিয়েটারে যাই, তখন এই মাধুবাবুও আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন। ইনি অভিনেতাও

ছিলেন ভাল, সুগায়কও ছিলেন। শিক্ষক বলেও এঁর খ্যাতি ছিল খুব। মাধুবাবু নায়ক, আমি বয়সে ছোট হলেও নায়িকা।' লীলাবতী নাটকে রাধামাধব অভিনয় করতেন ক্ষীরোদবাসিনীর ভূমিকায়।

দুর্গাদাস করের কনিষ্ঠপুত্র রাধারমণ করও নাট্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর একটি নাটক 'সরোজা' সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলছেন…'সরোজা' নামক ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য নাটকটিতে বাঙালী-সংসারের বিধবা ননদের বধূবিদ্বেষের একটি উজ্জ্বল স্বাভাবিক চিত্র পাইতেছি। রচনায় নাট্য-কৌশলের ও লিপিচাতুর্যের বিশেষ পরিচয় আছে। সরোজা এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

শুনেছি রাধারমণ করের কন্যার সঙ্গে প্রখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিবাহ হয়।

বরিশাল গ্রাম হিসেবে কলকাতার বাসি ফ্যাশন নাট্যাভিনয় (চলতিকথায় 'থ্যাটার') নকল করে মফঃস্বলে সর্বপ্রথম নাট্যাভিনয়ের কৃতিত্ব নিয়েছিল। কিন্তু উত্তরসূরীর সে ঋণ যে সুদে আসলে শোধ করেছিল পরবর্তীকালে। দুর্গাদাস করের বংশই বাংলা তথা কলকাতার নাট্যান্দোলনে অন্যতম নেতৃত্বের আসনও গ্রহণ করেছিল। নাটক হিসেবেও স্বর্ণশৃংখল কলকাতার জনপ্রিয় পৌরাণিক নাটকগুলোর পুর্বসূরীর কৃতিত্ব অংশত দাবি করতে পারে বইকি। বরিশালের অখ্যাত নাটক ও তাঁর রচয়িতার বংশধরদের স্বর্ণশৃংখলে বন্দী হয়েছিল পরবর্তীকালের কলকাতার নাট্য আন্দোলন।

রবীন্দ্রনাথ ও জনশিক্ষার মিউজিয়ম

তারা সাঁতরা

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে এক শতাব্দী আগে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে উক্তি করেছিলেন সেই উক্তির যাথার্থতা আজও উপলব্ধি করা যায় আমাদের দেশের শিক্ষা সমস্যার দিকে দৃষ্টি ফেরালে। সেকালের বিদ্যাশিক্ষার কাঠামোটি কেন্দ্রীভূত ছিল শুধুমাত্র চাকরীর জন্যে একটা প্রয়োজনীয় পাশপোর্ট পাওয়ার সাধনা। পরাধীন দেশে ইংরেজ প্রবর্তিত এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে বিদ্যাসাগর তাই লিখেছিলেন, 'আমাদের যে সব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নেই পাখা ফি নেই, একজামিনেশন ফিই নিয়ে কলের দোর খুলি—দেখাইয়া দিই এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দোয়াত পেন্সিল সিলেট সবই আছে বলিয়া তাহাদের কলের ভিতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাশ দিয়া, কেহ এণ্ট্রেন্স হইয়া, কেহ এল. এ. হইয়া, কেহ বি. এ. হইয়া, কেহ বা এম. এ. হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে I has ; এক পাকের তৈরী কি না।'

বিদ্যাসাগরের কাল শেষ হয়েছে বহুদিন আগে। রবীন্দ্রনাথের চোখে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শটি কিভাবে ধরা পড়েছিল তার আলোচনায় আসা যাক। রবীন্দ্রনাথও বিদ্যাসাগরের মতই আক্ষেপ করেছেন এই প্রতিধ্বনি তুলে: 'ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি—সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার অংশ সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারের মুখও চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন। ছাত্ররা দু'বার পাতকলে ছাঁটাবিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার মার্কা পড়িয়া যায়।'

মোটামুটি এই হল আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ। শুধু বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ কেন, ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কেরাণী গড়ার সঙ্কীর্ণ আদর্শকে বহু সজ্জনই তীব্র সমালোচনা করেছেন। শিক্ষাব্যবস্থার এই গুরুতর গলদটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'এ শিক্ষাকলের প্রণালী হইতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখী বনিয়া যায়।' তাঁর মতে, 'যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস কর্ম করার দক্ষতা থাকে না।' প্রচলিত পুঁথি পাঠের বিদ্যেকে সমালোচনা করে তিনি তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে যে বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন তা হল,…'কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিষকে দেখিয়া শুনিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মনন শক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল।' আরও পরিষ্কারভাবে তিনি তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করলেন এই বলে, 'অতএব একথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো নির্জীব ও

নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।'

রবীন্দ্রনাথ কথিত এই প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে সংগ্রহের মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করা যায়—তারই বাস্তব পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনার অন্ত ছিল না। এক সময়ে তিনি ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন সন্ধান ও সংগ্রহ করার আহ্বান জানিয়ে। তাঁর মতে স্বদেশকে ভালবাসার প্রমাণই হোল, যারা স্বদেশের সঙ্গে সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হতে চায়। তাই এই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 'দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায় পল্লীর কৃষি কুটিরে···স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য···দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশ প্রেমকে সার্থক করো।' শুধুমাত্র সংগ্রহ নয়—সংগৃহীত বস্তুগুলির যথাযথ প্রদর্শন করার উপযোগিতা সম্পর্কে 'সাহিত্য সম্মিলন' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'প্রদেশের উপভাষা, ইতিহাস, প্রাকৃত সাহিত্য, লোক বিবরণ···প্রাচীন দেবালয়, দীঘি ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের ফটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুঁথি পুরালিপি প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে তাহা বলা বাহুল্য।'

সর্বোপরি দেশের নিরক্ষর মানুষদের প্রতি দেশের শিক্ষিত সমাজের চরম ঔদাসীন্য ও অবহেলার প্রতি কটাক্ষ করে এবং ঐ আপামর জনসাধারণের লোক শিক্ষার জন্যে করণীয় কিছু থাকতে পারে কিনা সে সম্পর্কে গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে প্রসঙ্গত তিনি লিখেছিলেন, 'কেরাণী তৈরীর কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক রাজত্বে স্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্ক-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদ্‌গতি। সেইজন্যে উমেদারিতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই জন্যেই আমাদের দেশে প্রধানতঃ দেশের কাজ কংগ্রেসের পাণ্ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধমালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা-উদ্‌ঘোষণের মধ্যেই পাক খাচ্ছিল।

ওই দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেইজন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয়নি যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসমর্থের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্পস্বল্প কিছু করতে পারা যায় কিনা এতদিন এই কথাই ভেবেছি। মনে করেছিলুম, সমাজের একটি চিরবাধাগ্রস্ত তলা আছে, সেখানে কোনো কালেই সূর্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চলবে না, সেই জন্যেই সেখানে অন্তত তেলের বাতি জ্বালাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগা উচিত।'

সুতরাং সমাজের অনাদরে বঞ্চিত মানুষের চিত্ত সম্পদের এই অপব্যয় রবীন্দ্রনাথকে যেমন ব্যথিত করে তেমনি এই চিরবাধাগ্রস্ত তলায় সূর্যের আলো প্রবেশ করানোর উপায় সম্পর্কে পথের সন্ধান পাওয়াটাই তাঁর কাছে একটি বড়ো প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়।

১৯৩০ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া পরিভ্রমণে যান। সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন, রাশিয়ায় অবস্থিত সে দেশের বেশ কিছু মিউজিয়ম, মিউজিয়মের

সংগ্রহ এবং তার শিক্ষামূলক কার্যাবলী দেখে। প্রতিদর্শনমূলক সাহায্যের মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষাকে আরও ত্বরান্বিত ও আগ্রহী করে তুলতে পারা যায়, এবং দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে 'লোক শিক্ষার' বিষয়টিকে কিভাবে উপস্থাপিত করা যায়—তা সবিশেষ অনুধাবন করেছিলেন রাশিয়ায় এসে। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—'শিক্ষা ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যুজিয়ম। নানা প্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা সমস্ত গ্রাম শহরকে জড়িয়ে ফেলেছে। সে ম্যুজিয়ম আমাদের শান্তি নিকেতনের লাইব্রেরীর মতো অকারী (passive) নয়, সকারী (active)"।

এই মিউজিয়ম চেতনা রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা জানা যায় তাঁর বিদেশ-যাত্রায় যখন তিনি বহু দ্রষ্টব্য স্থানের আকর্ষণকে গৌণ করে—মিউজিয়ম পরিদর্শনকে মুখ্য করে তুলেছিলেন এবং তিনি যা মন্তব্য করেছিলেন, তা এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন, 'এ জায়গায় অনেক দেখবার আছে। আমি তেমন দেখনেওয়ালা নই এই দুঃখ। কিন্তু তবু ম্যুজিয়মে যাবার লোভ সামলাতে পারিনি। দেখবার এত জিনিষ খুব অল্প জায়গায় পাওয়া যায়।'

তাই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ হতে হয়েছিল—বিদেশের বিভিন্ন ধরণের মিউজিয়মের কার্যকলাপ দেখে। এই মিউজিয়ম কিভাবে দেশের যাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে রাশিয়ার চিঠিতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, 'বিজ্ঞান-শিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বার আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের ম্যুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই ম্যুজিয়ম শুধু বড় বড় শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লী গ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচর।' সমাজ জীবনে মিউজিয়মের কার্যকারিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আমাদের দেশের সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের কাছে যে একান্তই মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয় তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেছিলেন সন্ধান ও সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে। বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাধা গণ্ডী পেরিয়ে পুঁথির ইস্কুলকে যদি প্রকৃতির আসরে এনে হাজির করা যায়—তখনই সম্পূর্ণ হতে পারে তার প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃতি পরিচয় বা ইংরেজীতে যাকে বলে Nature Study-এই গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'পথে ও পথের প্রান্তে' তার চিন্তাভাবনায় যে বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, তা এখানে উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছিলেন, 'ফুল ফোটে গাছের ডালে, সেই তার আশ্রয়। কিন্তু মানুষ তাকে আপনার মনে স্থান দেয় নাম দিয়ে। আমাদের দেশে অনেক ফুল আছে যারা গাছে ফোটে, মানুষ তাদের মনের মধ্যে স্বীকার করেনি। ফুলের প্রতি এমন উপেক্ষা আর কোন দেশেই দেখা যায় না। হয়তো বা নাম আছে কিন্তু সে নাম অখ্যাত। গুটিকয়েক ফুল নামজাদা হয়েছে কেবল গন্ধের জোরে অর্থাৎ উদাসীন তাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করলেও তারা এগিয়ে আসে গন্ধের দ্বারা স্বয়ং জানান দেয়। আমাদের সাহিত্যে তাদেরই বাঁধা নিমন্ত্রণ, তাদেরও অনেকগুলির নামই জানি, পরিচয় নেই,

পরিচয়ের চেষ্টাও নেই। কাব্যের নাম মালায় রোজই বারবার পড়ে আসছি যূথী জাতি সেঁউতি। ছন্দ মিললেই খুশি থাকি, কিন্তু কোন্ ফুল জাতি কোন্ ফুল সেঁউতি সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারও উৎসাহ নেই জাতি বলে চামেলিকে, অনেক চেষ্টাই এই খবর পেয়েছি, কিন্তু সেঁউতি কাকে বলে আজ পর্যন্ত অনেক প্রশ্ন করে উত্তর পাইনি। শান্তিনিকেতনে একটি গাছ আছে তাকে কেউ কেউ পিয়াল বলে কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে বিখ্যাত পিয়ালের পরিচয় কয়জনেরই বা আছে। অপর পক্ষে দেখো, নদীর সম্বন্ধে আমাদের মনে ঔদাস্য নেই, নিতান্ত ছোটো নদীও আমাদের মনে প্রিয় নামের আসন পেয়েছে—কপোতাক্ষী, ময়ূরাক্ষী, ইচ্ছামতী। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের সম্বন্ধ। পূজার ফুল ছাড়া আর কোন ফুলের সঙ্গে আমাদের অবশ্য প্রয়োজনের সম্বন্ধ নেই। ফ্যাশনের সম্বন্ধ আছে অচিরায়ু সীজ্‌ন্ ফ্লাউয়ারের সঙ্গে—মালীর হাতে তাদের শুশ্রূষার ভার— ফুলদানিতে যথারীতি তাদের যাতায়াত। একেই বলে তামসিকতা, অর্থাৎ মেটীরিয়ালিজ্‌ম্—স্থূল প্রয়োজনের বাইরে চিত্তের অসাড়তা। এই নামহীন ফুলের দেশে কবির কী দুর্দশা ভেবে দেখো, ফুলের রাজ্যে নিতান্ত সংকীর্ণ তার লেখনীর সঞ্চরণ। পাখি সম্বন্ধেও ঐ কথা, কাক, কোকিল, পাপিয়া, বৌ-কথা কও'কে অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু কত সুন্দর পাখি আছে যার নাম অন্তত সাধারণে জানে না। ঐ প্রকৃতিগত ঔদাসীন্যও এই স্বভাব-বশতই প্রবল। পরীক্ষা-পাসের জন্যে ইতিহাসপাঠে উপেক্ষা করবার জো নেই আমাদের স্বাদেশিকতা সেই পুঁথির ঝুলি দিয়ে তৈরী, দেশের লোকের 'পরে অনুরাগের ঔৎসুক্য দিয়ে নয়।'

রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপ-উক্তির মধ্যে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যে পুঁথি সর্বস্ব ভাব বিদ্যমান রয়েছে—তা স্পষ্টই বোঝা যায়। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি এই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন বলেই—তাঁর পক্ষে এই উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ পথের হদিশ খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণে এসে রবীন্দ্রনাথ ঐ দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন স্থানীয় তথ্যানুসন্ধানের উদ্যোগ। এই তথ্যানুসন্ধানের কাজে সোভিয়েট রাশিয়ার মিউজিয়মগুলি কীভাবে সাহায্য করতে পেরেছে তারই বর্ণনায় তিনি লিখেছেন: রাশিয়ার Region Study অর্থাৎ স্থানিক তথ্য সন্ধানের উদ্যোগ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।...এসব কেন্দ্রে তত্তৎ স্থানের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান হয়। তাছাড়া যে সব জায়গার উৎপাদিকা শক্তি কি রকম শ্রেণীর কিম্বা কোনো খনিজ পদার্থ সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে কিনা, তার খোঁজ হয়ে থাকে। এইসব কেন্দ্রের সঙ্গে যে সব ম্যুজিয়ম আছে, তারই যোগে সাধারণের শিক্ষা-বিস্তার একটা গুরুতর কর্তব্য। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতির যে নবযুগ এসেছে, এই স্থানিক তথ্যানুসন্ধানের ব্যাপক চর্চা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ম্যুজিয়ম তার একটা প্রধান প্রণালী।'

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষা ও তথ্যানুসন্ধানের কাজে মিউজিয়মের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে তিনি প্রসঙ্গত তাঁর নিজ দেশের প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন:...'এই রকম নিকটবর্তী স্থানের তথ্যানুসন্ধান শান্তিনিকেতনের কালীমোহন কিছু পরিমাণে করেছেন, কিন্তু এই কাজের সঙ্গে আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের এতে কোন উপকার হয়নি।

সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে সন্ধান করার মন তৈরী করা কম কথা নয়। কলেজ বিভাগের ইকনমিকস্ ক্লাশের ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এই রকম চর্চার পত্তন করেছেন শুনেছিলুম; কিন্তু এ কাজটা আরও বেশি সাধারণভাবে করা দরকার, পাঠভবনের ছেলেদেরও এই কাজে দীক্ষিত করা চাই।' পরিশেষে এই সমস্যাটির সমাধানকল্পে মিউজিয়মের ভূমিকাকে কিভাবে ঐ প্রচেষ্টার রূপায়নে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়—তারই পথ নির্দেশ দিয়েছেন এই বলে…'আর এই সঙ্গে সমস্ত প্রাদেশিক সামগ্রীর ম্যুজিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক।'

মিউজিয়মের মূলতঃ ভূমিকা হোল সন্ধান ও সংগ্রহ। এই সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে মিউজিয়ম স্থাপনের উপযোগিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা বোঝা যায়—বাংলার গ্রামীণ লোকশিল্পের সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে তাঁর আত্মনিয়োগ করা থেকে। রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি বহু কারণে বাংলার এই চিরন্তন লোকশিল্পের ধারাটির দ্রুত অবলুপ্তি ঘটায় রবীন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন—এগুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এর ফলে, সংগৃহীত এইসব বস্তুর দ্বারা একদিন হয়ত বাঙ্গালীর অতীত সংস্কৃতি পরিচয় এইভাবেই জানা যাবে মিউজিয়মের প্রদর্শন কক্ষে। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে তাই উৎকণ্ঠিত হয়ে কবি-সমালোচক মোহিতলালকে লিখেছিলেন, আমি কিছুকাল যাবত একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি; বাংলার নিজস্ব আর্ট, আইডিয়া ক্রমে বিদেশীয় প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রচেষ্টা কখনই ম্লান হয়নি। বাংলার লোকশিল্পের নমুনা সংগ্রহের কাজে দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়কে একটি চিঠিতে তিনি তাই লিখেছিলেন।

'চাটগাঁ অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প যা কিছু প্রচলিত আছে, সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপূজা, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে সমস্ত আলপনা এঁকে থাকে সেইগুলি কোন শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙে আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাঁটি সেকেলে জিনিস হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালীর শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিষ চাই—চাটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়েঘর আছে তার ফটো বা অন্য কোনো রকমের প্রতিকৃতি।…ওখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির কড়ির বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কিরকম চলিত আছে ভালো করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন।"

সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে মিউজিয়মের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি অন্যত্র আরও বিশদ আলোচনা করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে উপযুক্তভাবে মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা সংগঠনের অভাবে দেশের পুরাতাত্ত্বিক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক সম্পদ কীভাবে নষ্ট হ'তে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হোল পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী দেশগুলি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখি যে, ১৯০৫ সালে 'প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ আইন' প্রচলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশেরও

বহু মূল্যবান পুরাবস্তুও লুণ্ঠিত হয়েছে এবং কতকাংশ অবহেলায় ও উদাসীনতায় নষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে পুরাতন চীনের ক্ষেত্রেও তাই। সাম্রাজ্যবাদের শোষণে পুরাতন চীনের এই মূল্যবান শিল্পবস্তু ও প্রত্নতত্ত্ব সামগ্রীর অবাধ লুণ্ঠনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন 'য়ুরোপের সাম্রাজ্য ভোগীরা পিকিনের বসন্তপ্রাসাদকে কি রকম ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, বহু যুগের অমূল্য শিল্প সামগ্রী কিরকম লুটে পুটে ছিঁড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে উড়িয়ে পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিষ জগতে আর কোনদিন তৈরী হতেই পারবে না।'

চীনের এই সাংস্কৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনে রবীন্দ্রনাথ যেমন ব্যথা অনুভব করেছিলেন, অপরদিকে সোভিয়েট রাশিয়ায় বিপ্লবোত্তর যুগে দেশের মূল্যবান শিল্প ও প্রত্নবস্তু সামগ্রী সংরক্ষণের কাজে মিউজিয়মের ভূমিকায় চমৎকৃত হয়েছিলেন একান্তই। তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাই লিখেছেন, 'ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকরা, অর্ধঅভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা কিছু রক্ষা যোগ্য জিনিষ সমস্ত উদ্ধার করে য়ুনিভার্সিটির ম্যুজিয়মে সংগ্রহ করতে লাগলো।...বিপ্লবীরা ধর্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি করে দিয়েছে। যেগুলি পূজার সামগ্রী সেগুলি রেখে বাকি সমস্ত জমা করা হচ্ছে ম্যুজিয়মে....' কিন্তু এখানেই শেষ নয়; মিউজিয়মে বস্তুগুলির শুধুমাত্র প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। তাই তিনি পুনরায় লিখেছেন : 'এই তো গেল সংগ্রহ, তারপরে এই সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে, লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা।'

এই প্রসঙ্গে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শিল্পবোধের অভাব সম্পর্কে অভিযোগের উত্তরে আক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে, 'আর্ট' সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে একটা দুর্বোধ্য ভাব সৃষ্টি করে একটা অজ্ঞানতার প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়। এই অন্তসার শূন্য মনোভাবকে বিদ্রূপ করে লিখেছেন, 'আমাদের দেশে পলিটিক্স্‌কে যারা নিছক পালোয়ানি বলে জানে সবরকম ললিতকলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে রেখেছে।' তাই এক্ষেত্রে আমাদের দেশে আর্টের অবদান সাধারণের কাছে অবহেলিত হয়ে রয়েছে। অথচ এই ধরণের আর্ট-মিউজিয়মে নিযুক্ত পরিচায়ক অর্থাৎ আজকালকার যুগের 'গাইড্‌-লেকচারার' মারফৎ কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে আর্টের বক্তব্য অর্থাৎ 'চিত্রবস্তুর সংস্থান (Composition), তার বর্ণ কল্পনা (Colour Schemes), তার অঙ্কন, তার অবকাশ (Space), তার উজ্জ্বলতা (Illumination), যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক (technique)'—এ সবই তুলে ধরা যেতে পারে—তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনি সংস্থাপিত করেছিলেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় ছবির মিউজিয়মের কার্য্যাবলীর বর্ণনা দিয়ে। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আর্টের বোধ ক্রমে ক্রমে এদের মনে জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। এদের মতো আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্য প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমত বোঝা অসাধ্য। দেয়ালে ছবি দেখে দেখে এরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে প্রায় সব ম্যুজিয়মেই উপযুক্ত পরিচায়ক রেখে দেওয়া হয়েছে। ম্যুজিয়মের শিক্ষা বিভাগে কিম্বা অন্যত্র তদনুরূপ রাষ্ট্রকর্মশালায় যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্মী আছে তাদেরই মধ্যে থেকে পরিচায়ক বাছাই করে নেওয়া হয়। যারা দেখতে আসে তাদের সঙ্গে এদের দেনা পাওনার কোনো কারবার থাকে না। ছবিতে যে বিষয়টা প্রকাশ করছে সেইটে দেখলেই যে ছবি দেখা

হয়, দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই।

...এই জন্যে পরিচায়কের বেশ দস্তুরমত শিক্ষা থাকা চাই, তবেই দর্শকদের ঔৎসুক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখতে পারে। আর একটি কথা তাকে বুঝতে হবে, ম্যুজিয়মে কেবল একটিমাত্র ছবি নেই, অতএব একটা ছবিকে চিনে নেওয়া দর্শকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, ম্যুজিয়মে যে সব বিশেষ শ্রেণীর ছবি রক্ষিত আছে, তাদের শ্রেণীগত রীতি বোঝা চাই। পরিচায়কদের কর্তব্য কয়েকটি করে বিশেষ ছাঁদের ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া।...কিন্তু দর্শকের মন একটুমাত্র শ্রান্ত হলেই তাদের তখনই ছুটি দেওয়া চাই।'

সাধারণ দর্শকদের জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় মিউজিয়মের উদ্যোগে কীভাবে ছবি দেখতে শেখানো হয়—তার মোটামুটি বিবরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। আমাদের দেশেও শিল্প ও চিত্রকলার বহু অতুলনীয় সম্পদ বিভিন্ন মিউজিয়মে সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর যুগে সাধারণ মানুষের মনে শিল্পবোধ সৃষ্টির কাজে আমাদের দেশের মিউজিয়মগুলি কতখানি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন—তা আজ একান্তই অনুসন্ধিৎসার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপর দিকে মিউজিয়ম যে একটি জড়বস্তুর মজুত ঘর তাই নয়—বর্তমানকালে মিউজিয়মের ভূমিকা হোল সমাজের বিভিন্ন বয়সের নাগরিকের কাছে একটা আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা। রাশিয়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই ধরণের একটি খেলনার মিউজিয়ম দেখে রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনেও অনুরূপ একটা খেলনার মিউজিয়ম স্থাপন করার। 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি লিখেছেন..."এদের এখানে খেলনার মিউজিয়ম আছে। এই খেলনা সংগ্রহের সংকল্প বহুকাল থেকে আমার মনের মধ্যে ঘুরছে। তোমাদের নন্দনালয়ের কলা-ভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও হোল। রাশিয়া থেকে কিছু খেলনা পেয়েছি অনেকটা আমাদেরই মতো।'

আমাদের এই কৃষি প্রধান দেশের অধিকাংশ নিরক্ষর মানুষের কাছে প্রগতিশীল কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগে শ্রুতি দর্শন মূলক শিক্ষার মাধ্যমে মিউজিয়মগুলি যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে—সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আভাস দিয়েছিলেন রাশিয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সময়। তিনি লিখেছেন, 'মস্কোতে একটি কৃষিভবন দেখতে গিয়েছিলুম। ওটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ায় সমস্ত ছোটো বড়ো শহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এ সব জায়গায় কৃষিবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় করেছে এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকল প্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ের ম্যুজিয়ম।'

পরিশেষে, রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন মিউজিয়ম পরিদর্শন করে এবং তার কার্য্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলেন যে, বিভিন্ন ধরণের মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের দেশেও এক সৃজনধর্মী শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর সহজাত সৃজনাত্মক শক্তিকে এবং এছাড়াও আমাদের দেশের অগণিত নিরক্ষর মানুষের বোধশক্তিকে শ্রুতিদর্শনমূলক সাহায্যের মাধ্যমে পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করে তোলাই হোল

মিউজিয়মের মুখ্য উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার এই সার্বজনীন অবদানকে মিউজিয়মের মাধ্যমে তুলে ধ'রে আপামর জনসাধারণের জীবনকে দৈন্যের তলা থেকে মুক্ত করে সুন্দর ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন—তা আজও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তথা সরকারী শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছোয়নি। আমাদের দেশে মিউজিয়ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে—রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন ক'রে—তাঁর স্মৃতির প্রতি কি আমরা যথার্থ মর্যাদা দিতে পারিনা? আমাদের দেশের শিক্ষা বিভাগ রবীন্দ্রনাথের এই মিউজিয়ম পরিকল্পনা সম্পর্কে কি বলেন?

শিল্পসমালোচনায় বলেন্দ্রনাথ

শিবানী সিংহ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে সাহিত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সাধনা দীর্ঘ ইতিহাস সৃষ্ট করেছে—চারুকলা। শিল্পী হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথের নাম আজ আর নতুন কোন পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না; শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে সব ছবি এঁকেছেন তাও রসিক সমাজের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবশ্য এরও একটা পারিবারিক পশ্চাৎপট আছে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গুণেন্দ্রনাথ একসময় একই সঙ্গে তদানীন্তন সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলেন ছবি আঁকা শেখার জন্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচ খাতায় সে যুগের ঠাকুর পরিবারের ছোটবড় প্রায় সকলের মুখের ছবি পাওয়া যায়। অন্যদিকে, সখের আঁকিয়ে হলেও গুণেন্দ্রনাথও পরিচিত মহলে শিল্পী হিসেবে সমাদর পেয়েছিলেন। শিল্পচর্চার ব্যাপারে এই ধরণের পারিবারিক দৃষ্টান্ত এঁদের উত্তর পুরুষদের অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু সে সময় বড়দের সাহিত্য বা শিল্পচর্চার সঙ্গে বাড়ীর শিশুদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের অধিকার ছিলনা। অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন:

—"ছবি দেখাতো দূরের কথা, আমরা কি তাঁদের ঘরে ঢুকতে পেরেছি কখনো?" (জোড়াসাঁকোর ধারে) কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ শিল্পবোধের ব্যাপারে ঠাকুর পরিবারের ছেলেদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি নিজস্ব বলিষ্ঠ ধারা আছে। অবনীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলি কে কবি, কে শিল্পী, কিবা তুমি কিবা আমি এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে যেদিন অতিথি হলেম, রসের পূর্ণপাত্র তো কারুর সঙ্গে ছিল না; একেবারে খালি পাত্রই নিয়ে এলেম, এলো কেবল সঙ্গের সাথী হয়ে একটুখানি পিপাসা (বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী) আমরা জানি ঠাকুরবাড়ীর গুণী ছেলেদের ক্ষেত্রে সে পিপাসা প্রায় সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের পিপাসা—যা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি যাবতীয় সুকুমার কলার মূলকথা। এই পিপাসা ছিল বলেই শহরের ইট-কাঠের বন্ধনের মধ্যে থেকেও বাইরের মুক্ত প্রকৃতির দিকে এ বাড়ীর শিশুদের চোখ ছুটে গেছে বারবার। শৈশব অভিজ্ঞতার সেই সব বর্ণনার জন্য "জীবন স্মৃতি"কে নিছক জীবনকাহিনী মাত্র বলতে পারি না—কারণ ঐ দেখা শিল্পীর চোখ নিয়ে দেখা—"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি"ই তার সার্থক শিরোনামা। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালে সেই দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন বলেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ। প্রথমজনের আত্মপ্রকাশের বাহন সাহিত্য—দ্বিতীয়জনের পথ শিল্পের। শিল্পচর্চার সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও সাহিত্চর্চা করেছেন বটে কিন্তু তাঁর কলম সেখানে চিত্রকরের রঙে ডোবানো তুলির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অপর পক্ষে বলেন্দ্রনাথ কোনদিন রঙ তুলির চর্চা করেছিলেন বলে শোনা যায় না—কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি জগৎকে দেখেছেন—প্রকৃত শিল্পবোধ নিয়ে ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার সমালোচনা করেছেন। পাশাপাশি বাড়ীর বাসিন্দা, প্রায় সমবয়স্ক এই দুটি প্রতিভাবানের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান তাঁদের দুজনের প্রতিভা বিকাশের পথে কতখানি সহায়ক হয়েছিল তার ঐতিহাসিক মূল্যটুকু তুচ্ছ করা চলে না। অবনীন্দ্রনাথ যেমন ভারতীয় চিত্রকলাকে নবজন্ম

দিয়েছেন তেমনি বাঙ্গলাভাষায় কলা সমালোচনার পথ প্রদর্শক হিসেবে বলেন্দ্রনাথের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যে যেখানেই অতীত স্মৃতিচারণা সেখানেই বর্ণনা আর নিছক বর্ণনা থাকে নি যেন চিত্রকলার বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

১২৯৫ সনের ভারতী ও বালক পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'রঙ ও ভাব' রচনায় কিশোর বলেন্দ্রনাথ লিখছেন—"প্রকৃতিতে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যেমন বিভিন্ন সুরের প্রাদুর্ভাব, সেইরূপ স্বতন্ত্র রঙেরও প্রাদুর্ভাব। বসন্তে, বর্ষায়, শরতে এক একটা নূতন রঙ প্রকৃতিতে আধিপত্য করে। আমাদের হৃদয়ের উপরেও তাহাদের প্রভাব সামান্য নহে। বিভিন্ন রঙে যেন স্বতন্ত্র ভাব লুকাইয়া আছে, সুরের মতন ধীরে ধীরে তাহারা প্রাণে আসিয়া আঘাত করে। আমাদের হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের বিকাশ হয়। প্রকৃতিতে ভাববিহীন রঙ নাই—রঙ মাত্রেরই সঙ্গে একটা ভাবের বিশেষরকম যোগ আছে। বলা বাহুল্য, এ আবিষ্কার শিল্পীর। বলেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী এই শিল্পবোধ সম্পৃক্ত। বলেন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটেছে। তাঁর 'ঘরোয়া' অথবা জোড়াসাঁকোর ধারে অথবা আপন কথা একদিকে রূপকথা অন্যদিকে যেন ছবির প্রদর্শনী—বিষয়বস্তু ঠাকুরবাড়ীর জীবনধারার বিচিত্ররূপ। বর্ত্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাবে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সাধনার সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের শিল্পবোধের একটি আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পাচার্য্য হিসেবে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছেন—আর বলেন্দ্রনাথ তাঁর ২৯ বছরের আয়ুষ্কালের গণ্ডীতে সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের অধিকারটুকু অর্জ্জন করার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখাযাবে সেই স্বল্পসময়ের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালী শিল্পীদের সামনে অনেক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়ে গেছেন। বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার প্রথম পর্য্যায়ের সঙ্গে তার একটি ঘনিষ্ট সংযোগ আছে।

গগনেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের সৌখীনতা এবং শিল্পসংগ্রহের নেশায় দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ৫নং বাড়ীটি দিনে দিনে কিভাবে সুসজ্জিত হয়ে উঠেছিল তার নিপুণ বর্ণনা আছে অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়া সাঁকোর ধারে'তে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদবোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। (জীবনস্মৃতি) হিন্দুমেলার অন্যতম প্রধান প্রেরণাদাতা এঁরা দুই ভাই। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তাঁর বাবার আমলেও আর্ট বলতে বিলিতি রুচির জিনিসকেই বোঝাত। দেশবিদেশ থেকে বাক্স বোঝাই হয়ে কত বিচিত্র ধরণের অপূর্ব সব শিল্পদ্রব্য আসতো তাঁদের বাড়ী সাজানোর জন্য। তাঁদের লাইব্রেরী ঘরের শোভা বাড়াতো বিদেশী ছবির সংগ্রহ। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মনটি পড়ে থাকতো তাঁর ছোট পিসিমার ঘরে যেখানে দেশী ধরণের অয়েল পেন্টিং পৌরাণিক ছবি আর কৃষ্ণনগরের পুতুলের মেলা। স্বদেশী শিল্প ও চিত্রকলার প্রতি তাঁর অনুরাগের সূত্রপাতও সেইখানে। বলেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে মাত্র এক বছরের বড়, পাশাপাশি বাড়ীর বাসিন্দা হিসেবে একে অন্যের খেলার সাথী—সুতরাং তিনিও যে মাঝে মধ্যে সে

ঘরে উপস্থিত হতেন না একথা কে বলবে ? দেবেন্দ্রনাথের বসতবাড়ীতে হিন্দু দেবদেবীর স্থান ছিল না। কিন্তু ১৩০০ সনে সাধনার (পৌষ) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের "হিন্দু দেবদেবীর চিত্র" শীর্ষক আলোচনাটি যারা পড়েছেন তাঁরা দেখবেন শ্রীকৃষ্ণ, শ্যামা বা মদনভস্মরত মহাদেবের ছবিরই সমালোচনা করেছেন লেখক। ছবিগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলে বর্ণনা অত নিপুণ হওয়া সম্ভব নয়। ভারতশিল্প সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের আশৈশব আকর্ষণের সূত্র নির্দেশ করার পক্ষে এই তথ্যটি বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি। "হিন্দু দেবদেবীর চিত্র" রচনার দু বছর আগে ১২৯৮ সনের সাধনার পৌষ সংখ্যার চিত্রকলা সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা 'দেয়ালের চিত্র' প্রকাশিত হয়। রচনার বিষয়বস্তু—দেশবিদেশের কয়েকটি ছবির বর্ণনা। এখানেও মনে হয় লেখক যেন চোখের সামনে ছবিগুলি দেখতে দেখতে বর্ণনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এর বাস্তব উৎস কোথায় ? জোড়াসাঁকোর ৫নং বাড়ীর লাইব্রেরী ঘরে এক সময় এই ধরণের দেশী বিদেশী ছবির সংগ্রহ ছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে ; আলোচ্য রচনার প্রেরণা সেই ঘরটি কিনা বলা দুষ্কর। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়—বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছুকাল পরে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁদের বিদেশীবন্ধু মিঃ উডরফ ব্লাণ্ট ইত্যাদির উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর ওরিয়েণ্টাল আর্ট' নামে একটি আর্ট সোসাইটির পত্তন হয় ; এই সোসাইটি আয়োজিত প্রদর্শনীর ক্যাটালগে প্রত্যেক ছবির নীচে ইংরেজীতে গল্পের মত সাহিত্যিক বর্ণনা থাকতো। বলেন্দ্রনাথের ঐ ধরণের চিত্র বর্ণনাগুলি সেই পরিকল্পনার প্রেরণা জুগিয়েছিল মনে করা যেতে পারে। জীবিত থাকলে, বাঙলায় ঐ ধরণের চিত্র পরিচিতি রচনার ভার যে বলেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই গ্রহণ করতেন তাতে সন্দেহ কি ? বলেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে এই ধরণের কোন চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না ; তবু প্রশ্ন জাগে পূর্বোক্ত আর্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার আনুমানিক দু-তিন বছর আগে, ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিলিয়ার্ডরুমে আয়োজিত যে চিত্রপ্রদর্শনীর কথা 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন সে সময় কি বলেন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন ? অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক ওকাকুরার নামোল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কোন সময় ঐ প্রদর্শনীটি হয়ে থাকবে। অথবা অবনীন্দ্রনাথ যদি ভ্রম ক্রমে ওকাকুরার নামোল্লেখ করে থাকেন তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে দেয়ালের চিত্রর উৎস অবনীন্দ্রনাথদের ঐ প্রদর্শনী।

শিল্পসমালোচক হিসেবে বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি ঘটে 'দিল্লীর চিত্র শালিকা' (ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৫) প্রবন্ধে। কিন্তু তার আগে এই ব্যাপারে তাঁর মানসিক ক্রমপরিণতির ধারাটুকু লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

১২৯৯ সনে জমিদারীর কাজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথও উড়িষ্যা যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন দেবক্ষেত্রের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য কীর্তিগুলিও দেখে আসেন। ১৩০০ সনের সাধনার বৈশাখ সংখ্যা থেকে উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দির সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ রচনাগুলি একে একে প্রকাশিত হতে থাকে। তাতে ভারতের শিল্প সুন্দর জীবনধারা সম্বন্ধে এসব ভারতীয় শিল্পীদের মহিমান্বিত শিল্পকৃতিত্ব সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের মুগ্ধ বিস্ময় সুস্পষ্ট। একাধারে শিল্পরসিক ও পুরাতত্ত্ববিদের

অনুসন্ধান দৃষ্টি নিয়ে লেখক ভগ্ন মন্দিরগুলি পরিভ্রমণ করেছেন। কোনারক সূর্যমন্দির সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথ লিখছেন—

"ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুদিগের মূর্তিগুলিই বা কি সুন্দর! এমন সুগ্রীব তেজে ভরা অশ্ব, এমন সুন্দর সুঠাম করিবর! কেবল সিংহ দুইটি প্রকৃতির অনুরূপ নহে—কিন্তু তাহাও উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের সিংহের সহিত তুলনায় কতকটা সিংহের মত বটে। আর সেই অতুল্য শিল্প নবগ্রহ; উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাষাণ খণ্ডে মুদ্রিত কয়েকটি বুদ্ধসদৃশ প্রশান্ত হাস্যবদন, হস্তে কাহারও জপমালা, কাহারও অর্দ্ধচন্দ্র, কাহারও বা পূর্ণঘট। এখন এই নবগ্রহ মূর্তি মন্দির হইতে প্রায় চারিশত হস্ত দূরে ইংরাজের লৌহরথোপরি শায়িত—কলকাতায় আনিতে আনিতে আনা হয় নাই; পথিকেরা তাহার গায়ে সিন্দুর লেপনপূর্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়; কিন্তু এই নতুনলব্ধ ভক্তি এবং প্রীতি লাভ করিয়াও আর কিছুকাল পড়িয়া থাকিলে এই অক্ষুণ্ণ প্রাচীন কীর্তি শ্রী ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।"

এই উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কনারক প্রবন্ধ যখন লেখা হয় (সাধনা, ভাদ্র, ১৩০০) তখন ভারতশিল্প সম্পর্কে জনগণের আগ্রহের পরিমাণ প্রায় শূন্য অঙ্কের কাছাকাছি ছিল; গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের সক্রিয় প্রচেষ্টা এ ব্যাপারে বাঙ্গালীর মানসিক যুগান্তর ঘটিয়েছে বললে ভুল হবে না। তদানীন্তন সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাভেল ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি কয়েকজনের নামও তাঁদের সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু সেটা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের কথা। তারও অনেক আগে বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পনিদর্শনগুলির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই ইঙ্গিতটুকু দিয়েছেন অভূতপূর্ব এবং অমূল্য। উড়িষ্যা সংক্রান্ত অন্যান্য রচনাগুলিতেও দেখা যাবে বলেন্দ্রনাথ তার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন মন্দির গাত্র সংলগ্ন ভাস্কর্য থেকে অতীত ভারতের প্রচলিত সাজসজ্জা, পোশাকপরিচ্ছদ, আসবাবপত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা নিদর্শন আবিষ্কার করে ফিরেছেন। প্রসঙ্গত: স্মরণীয় অতীত ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের এই অনুসন্ধান তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারের সংস্কৃতিক জীবনের বৈচিত্র্য বিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তাঁর উড়িষ্যা সংক্রান্ত রচনাবলী প্রকাশের সময় ১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। লক্ষ্য করলে দেখা যায় সমসাময়িককালে ঠাকুর পরিবারের সাহিত্য সংস্কৃতি চিত্রকলা অভিনয় ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয়ের চর্চ্চা হয়—গৃহসজ্জার। গৃহসজ্জার শান্তিনিকেতনী আঙ্গিক বলতে আজকের দিনে যে একটি সর্বভারতীয় ভাবধারা ও অলঙ্করণ পদ্ধতি-ভিত্তিক শিল্পসম্মত সুরুচি স্নিগ্ধ, নয়ন মনোহর সজ্জা-প্রকরণ আমাদের মানসচক্ষে ভেসে ওঠে—ঠাকুর পরিবারে তার সূত্রপাত ঘটে এই বিশেষ সময়েই তবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বদেশীয় কুটীর শিল্পের সমন্বয়ে একটি সুরুচিপূর্ণ, সর্বভারতীয় গৃহসজ্জা প্রকরণের পরিকল্পনা গড়ে তোলা এবং তদ্দ্বারা বিদেশী সভ্যতার মোহগ্রস্ত স্বদেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করার জন্য বলেন্দ্রনাথই সর্বাগ্রে মুখর হয়ে উঠেছেন। প্রাচীন উড়িষ্যা সংক্রান্ত রচনাগুলিতে যার সূত্রপাত পরবর্তীকালে লিখিত 'প্রাচ্য প্রসাধনকলা (ভারতী, ভাদ্র, ১৩০৫) গৃহকোণ (ভারতী, মাঘ, ১৩০৫) ইত্যাদি সামাজিক প্রবন্ধের মধ্যে বলেন্দ্রনাথের বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ উপলক্ষ্যে এবং 'স্বদেশী ভাণ্ডার' স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের

বিভিন্ন প্রদেশের কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের যথেষ্ট ধারণা জন্মেছিল (১৮৯৫—১৮৯৮।৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি অনুভব করেছিলেন সেই উন্নত শিল্পনৈপুণ্য সম্পন্ন স্বদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে জনগণের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এর ফলে, কুটীরশিল্পগুলির সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সভ্যতার অনুকরণ মোহ থেকেও স্বজাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। তাঁদের প্রতি বলেন্দ্রনাথের পরামর্শ—"দেশের সূর্য্যালোকের সহিত, চতুষ্পার্শ্বের ঘনায়মান প্রকৃতির সহিত আমাদের অন্তরের যুগযুগান্তরাগত শুভভাবের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আমাদের চিরন্তন সজ্জাকলাটিকেই আধুনিক কালোপযোগী করিয়া অভিব্যক্ত করিয়া, তুলিতে হইবে (গৃহকোণ) ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০৬, ভাদ্র) বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়; তার কয়েক বছর পরে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের উৎসাহে ঠাকুর পরিবারের গৃহসজ্জায় আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। বাড়িতে ভারত শিল্পের আবহাওয়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তাঁরা দামী দামী বিদেশী আসবাবপত্র বিক্রী করে সেই জায়গায়—অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন "মাদ্রাজী মিস্ত্রী ধনকোটি আচারি, তাকে এনে লাগিয়ে দিলুম কাজে। নিজে নমুনা দিই, নক্সা দিই, আর তাকে দিয়ে আসবাব করাই। সব সাদাসিধে আসবাব করালুম তাকে দিয়ে ঘর জুড়ে জাপানী গদি করালুম। এই যে আজকাল তোমরা খাটের পায়া দেখছ এ কোত্থেকে নেওয়া জানো? মাটির প্রদীপের জেলখো থেকে।" (জোড়াসাঁকোর ধারে) প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় ইতিপূর্বে "পুরাতন পিলসুজের সরু ডাঁটার উপরে মাটির প্রদীপের ঈষৎ স্নেহসিক্ত শলিতাগ্রভাগের মিটি মিটি আলোটুকু" বলেন্দ্রনাথের মত গভীর মমতাসহ আর কে লক্ষ্য করেছেন? স্বদেশীয় পদ্ধতিতে আপ্যায়নভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ লিখছেন—"ঘরের দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছাইয়া দিলেই অতিথিকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলা যায়। গৃহীর অবস্থাভেদে সে মাদুর মোটা কাঠির কখনওবা রেশমবস্ত্রবৎ কোমল মেদিনীপুরী মছলন্দ, কখনও বা দন্তিদন্তারুনাভ মনিপুরী শীতল পাটি। এই মাদুর আমাদের অভ্যর্থনাগৃহের প্রধান আসবাব। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এমন আরামের আসন অল্পই আছে।...এই চারু আস্তরণোপরি মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গুটিকয়েক উপাধান এবং এক একখানি তালবৃন্ত হইলেই মোটামুটি আমাদের গৃহসজ্জা একরূপ সম্পূর্ণ হয়। তাহার পর সঙ্গতি অনুসারে এই শুভ্র স্নিগ্ধ ভাবটি রক্ষা করিয়া আরও অনেক করা যায়। এমনকি এতদূরও যাওয়া যায় যে তাহাতে কার্পণ্য অপবাদের কোনরূপ সম্ভাবনাই থাকে না। কেবল সকল খুঁটিনাটির প্রতি একটুকু নিজের চিত্ত এবং চিন্তা প্রয়োগ করিতে হয়।" (গৃহকোণ) জোড়াসাঁকোর ৫নং বাড়ির গৃহসজ্জার নতুনত্বের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনার কি গভীর যোগ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঐ বাড়ীর লাইব্রেরী ঘরের বর্ণনা থেকে; অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন—

"আচারিয়াকে দিয়ে দাদামশায়রা নিজেদের ডিজাইনে নীচু তক্তাপোশ, চেয়ার, টেবিল, আলমারি করিয়েছিলেন। কার্সাগারকে দিয়ে দেয়ালের গায়ে কাঠের ফ্রেমে 'শীতলপাটি' লাগিয়ে দেয়াল ঢেকে দিয়েছিলেন। লাইব্রেরী ঘরের মেঝেতে ফরাশ, জাজিম, শতরঞ্চি, কার্পেটের বদলে পেতেছিলেন বেত-বোনা ঠেস আর তাকিয়া।" (দক্ষিণের বারান্দা) পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের

উদয়ন, কোনার্ক ইত্যাদি বাড়ীগুলির সজ্জা পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের চিত্ত ও চিন্তা প্রয়োগের সাহায্যে বাঙলা দেশের শীতলপাটিকে কি বিচিত্রভাবে কাজে লাগিয়েছেন তা একটি দর্শনীয় বিষয়। বলেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের কথা তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন। সুতরাং গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে মাধ্যম হিসেবে ধরে নিলে বলেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে রথীন্দ্রনাথের মধ্যে ঠাকুর পরিবারের গৃহসজ্জার মৌলিক ধারাটির ক্রমপর্য্যায় ও পরিণতি আবিষ্কার করা কঠিন নয়। ১৩০০ সনের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার সাধনায় বলেন্দ্রনাথের 'রবি বর্ম্মা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর পরিবারের তদানীন্তন চিত্রকলা চর্চা সম্পর্কে কিছুটা আলোক সম্পাতের প্রয়োজনীয়তা আছে।

পূর্বোক্ত কটক ভ্রমণ কালেই রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা নাটক রচনা শুরু করেন। কলকাতার আর্ট স্কুলের তদানীন্তন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ইটালিয়ান আর্টিস্ট গিলার্ডির কাছে চিত্রকলার পাঠ শেষ করে অবনীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীতেই ষ্টুডিয়ো সাজিয়ে বসেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি এঁকে দিলেন এবং ১২৯৯ সনে সেই সচিত্র চিত্রাঙ্গদার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হোল। এরই সমসাময়িক কালে দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী রবি বর্মা কলকাতায় আসেন; তিনি জোড়াসাঁকোর ৫নং বাড়ীতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ছবির ভূয়সী প্রশংসাও করে আসেন। সম্ভবত সেই উপলক্ষে বলেন্দ্রনাথের রবি বর্মা প্রবন্ধের সৃষ্টি। এই প্রবন্ধে রবিবর্মার চিত্রকলার দোষ-গুণ বিচারের সঙ্গে সঙ্গে, বাঙলাদেশের তদানীন্তন আর্ট স্কুলে চিত্রকলার নামে যে অসার করণ-কৌশল (technique) প্রচলিত ছিল তারও যথোপযুক্ত সমালোচনা করেছেন। সমসাময়িক যুগ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক—বাঙলা চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। কলকাতায় আর্ট ষ্টুডিয়োর পত্তন হয়েছে—কিন্তু চিত্রকলার নামে সেখানে যা শেখানো হত তাতে স্বদেশী অথবা বিদেশী কোন ভাবধারারই সুস্পষ্ট প্রকাশ ছিল না। আবার দুটি ধারার যথার্থ সমন্বয়ে একটি সার্থক চিত্রণ প্রণালী গড়ে তোলার মত সৃজনী প্রতিভারও সৃষ্টি হয়নি। এদেশীয় ছাত্ররা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ভারতীয় দেবদেবীর চিত্রাঙ্কণ শুরু করেছিলেন বটে কিন্তু বলেন্দ্রনাথের ভাষায়—"কালিঘাটের পয়সা পটের সহিত কাগজের উৎকর্ষতা ও বর্ণবৈচিত্র্যের অধিকতর ঘনঘটা ভিন্ন তাহার প্রভেদ অল্পই,...ঐ সকল বিচিত্রবর্ণ চিত্রে কোথাও কোনও ভাবের বিকাশ হয় নাই, শরীরের কোনরূপ গঠন পারিপাট্য প্রকাশ পায় নাই এবং বর্ণবিন্যাসে সৌন্দর্য্যবোধ আভাসেও আপনাকে ব্যক্ত করে নাই।...আর্ট ষ্টুডিয়োর চিত্র মনে কেবল একটা ভাববিহীন কুৎসিত কাষ্টপুত্তলিকার মূর্তি স্থাপনা করে এবং তাহাতে বিরক্তি ভিন্ন মনে কোন প্রকার সাধুভাবের সঞ্চার হয় না।" তখন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের পর্য্যন্ত তৃপ্তি মিলছে না ছবি এঁকে। তিনি লিখছেন—

"বাঁধা গতের মত তুলি দিয়ে ধীরে ধীরে আঁকা সে আর পোষাল না। আগে গাছপালা আঁকার মধ্যে তবু কিছু আনন্দ পেতুম। কিন্তু ধীরে ধীরে আর্ট স্কুলের রীতিতে তুলি টানা আর রঙ মেলানো তা আর কিছুতেই পেরে উঠলুম না। ছ'মাসের মধ্যে ষ্টুডিয়োর সমস্ত শিক্ষা শেষ করে সরে পড়লুম।" অবনীন্দ্রনাথের তৎকালীন অতৃপ্ত সাধনার পাশাপাশি চিত্রকলা সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের একটি অমূল্য চাহিদার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি; তিনি লিখছেন—

"য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পে আমাদের ভাবের, দেশীয় কল্পনার পৌরাণিক সৌন্দর্য্যের কোনরূপ বিকাশ লক্ষিত হয় না—সুতরাং তাহা তেমন সহজে অবিলম্বে আমাদের অন্তরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে না। সেইজন্য, পৌরাণিকী কল্পনাকে তুলিকার স্পর্শে মূর্তিমতী করিয়া তুলিতে পারেন আমাদের মধ্যে এইরূপ এক প্রতিভার আবশ্যক হইয়াছে। ভাষায় যাহা কতকটা বর্ণনায় কতকটা আভাসে কতকটা লেখকের রচনায় কতকটা পাঠকের মনে মনে গঠিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সেই সুন্দর ভাবগুলিকে সমগ্রভাবে যে অংশ ব্যক্ত ও যে অংশ অস্ফুট, মিলাইয়া রেখায় রেখায় অনুবাদ করিতে হইবে।" চিত্রকলার এহেন পরীক্ষা-প্রত্যাশার সময় কলকাতায় স্বয়ং রবি বর্মা ও তাঁর চিত্রাবলীর আগমন বলেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ চিত্ররসিক ও শিল্পীর মনে নতুন আশার সঞ্চার করল। রবি বর্মার ছবির প্রধান বিষয়বস্তু—ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী। পাশ্চাত্য পদ্ধতি গ্রহণ করলেও রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ভাব, আকৃতি এবং পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত করার আন্তরিক চেষ্টা তাঁর ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার সেই বিশিষ্ট স্বাদেশিকতাটুকু বলেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর মতে—"পৌরাণিক চিত্র এমন সুন্দরভাবে এদেশে ইতিপূর্ব্বে কখনও অঙ্কিত হয় নাই এবং খুঁটিনাটি ত্রুটী থাকিলেও রবি বর্মাই এদেশের প্রথম প্রতিভাশালী চিত্রকর।" এই রচনার পাঁচ বছর পরে ১৩০৬ সনের প্রদীপ পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় রবি বর্মা সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি অসমাপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়। ঐ পাঁচ বছরের ব্যবধানে রবি বর্মার ছবির সঙ্গে দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের পরিচয় গভীরতর হয়েছে;—ইতিমধ্যে বলেন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টিও নিঃসন্দেহে আরও পরিণত হয়ে উঠেছিল; ১৩০৫ সনে তিনি যখন 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' রচনা করেছেন তখন পাশের বাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথের সাধনা পরিণতির পথ খুঁজে পেয়েছে। তাঁর বৈষ্ণবপদাবলী, কৃষ্ণচরিত্র, বুদ্ধচরিত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ছবিগুলি এই সময় (১৮৯৮-১৯০০) রচিত। অন্যদিকে কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন ভারত শিল্পের প্রকৃত বোদ্ধা ও পৃষ্ঠপোষক E. B. Havell—ঠাকুর বাড়ীতে তাঁর আনাগোনাও শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ভারত শিল্পের পুর্ণ জাগরণের শুভ সূচনা ঘটেছে বলা চলে। সেই সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রভাবিত অধিকতর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বলেন্দ্রনাথ যখন রবি বর্মার ছবিগুলির পুনর্বার বিচার করতে গেছেন তখন স্বভাবতই তাদের অন্যান্য অসঙ্গতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে পৌরাণিক বিষয়বস্তু ও তার ভাবধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে রবি বর্মা বাস্তবিকই পৌরাণিক যুগের মর্মস্থলে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছেন কিন্তু সেগুলি যে সব দিক দিয়ে পৌরাণিক আদর্শ বজায় রাখতে পেরেছে একথা বলা চলে না। বরং মাঝে মাঝে আধুনিকতার স্পষ্ট প্রভাব লেখকের চোখে পড়েছে—যেমন, "বিরহিণী যেখানে করতলে কপোলবিন্যস্ত করিয়া একান্তমনে ধ্যান করিতেছেন সেখানে তাঁহার পার্শ্বের আলিসাটি হয়ত নিতান্তই আধুনিক স্থাপত্যানুযায়ী ইতালীয় কলসসজ্জিত। সেকাল তাহাতে সহসা মনে আসে না।" এই সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি ও ঔচিত্যবোধ ছিল বলেই বলেন্দ্রনাথের চিত্র সমালোচনা একদেশদর্শীতা মুক্ত হতে পেরেছে। আলোচনার উপসংহারে বলেন্দ্রনাথ লিখছেন—যখন ভারতবর্ষে অনেক চিত্রকরের অভ্যুদয় হইবে এবং আমাদের চিত্র সম্পদ অজস্র হইয়া উঠিবে

তখন আমরা সুন্দরবিচারের অধিকারী হইব। এখন যাহা পাওয়া যায় তাহাই পরম বলিয়া মনে হয়।" বলেন্দ্রনাথের এই প্রতীক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি—পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসু প্রমুখ তাঁর স্বনামধন্য শিষ্যদের চিত্রসাধনার অভূতপূর্ব সাফল্য তার প্রমাণ। বলেন্দ্রনাথের পথনির্দেশ তাঁদের কতখানি সাহায্য করেছিল তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৩০০ সনের মাঘ সংখ্যার সাধনায় পূর্বোক্ত হিন্দু দেবদেবীর চিত্র প্রকাশিত হয়। বলেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন বাঙ্গলাদেশের তথাকথিত চিত্রকরদের তুলিতে ভারতীয় দেবদেবীর যে সব চিত্র অঙ্কিত হয় তাতে দর্শকহৃদয়ে সৌন্দর্য্যানুভূতির উন্মেষ ঘটা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে দেবত্বের মহিমাও সেখানে অদৃশ্য। সেই অপরিণত এবং দীন কল্পনার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষপাত করতে লেখক দ্বিধা করেননি—"মানব দেহের বর্ণ মানুষের মত না হওয়া, গঠনে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এবং মুখশ্রীতে সকল ভাবের আত্যন্তিক অভাব, ইহাই এখন আমাদের চিত্রশালার গৌরব। গৌরাঙ্গ পীতবর্ণ; কারণ কাব্যে গৌর অঙ্গের সহিত সহিত তপ্তকাঞ্চনের সাদৃশ্য উল্লিখিত হইয়াছে এবং তপ্তকাঞ্চনে হরিদ্রার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। রাধার প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ যেন যুগ যুগ ধরিয়া সর্বাঙ্গে প্রাণপণে নীল পেন্সিল ঘষিয়াছেন; এবং এই বহু পেন্সিল ঘর্ষণের ফলে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকার হৃদয় নহে কিন্তু বাঙ্গলার রাধিকাগঞ্জন ধর্মচিত্রকরদিগেরও হৃদয়মন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রণোন্মাদিনী শ্যামা এই অঙ্গার ধূমোদ্গারী কলিযুগে মূর্তিমতী রাণীগঞ্জ-গঞ্জিনী অবিশ্রাম আলকাতরা লেপন ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাও মানবশরীরে সে বর্ণের আভাস ব্যক্ত করিতে অক্ষম।" (হিন্দু দেবদেবীর চিত্র) সেযুগের শিল্পীদের দুর্ব্বল কল্পনাশক্তির প্রভাবে দেবদেবীর রূপ সংস্কৃত আদর্শ থেকে কতদূর সরে এসেছে বলেন্দ্রনাথ তাও দেখিয়েছেন। পুরুষ সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ—বৈরাগ্য ও গার্হস্থ্যের মূর্তিমান সমন্বয়—উমাপতি শিব বাঙ্গলাদেশের চিত্রপটে পেশীবিহীন গঠন, বাবুমুখশ্রী তাম্বুলরাগ রক্ত অধর ও নিস্প্রভ ভাব' সংযোগের ফলে সম্পূর্ণরূপে শিবত্ববিহীন। মদনভস্মের চিত্রে মহাদেবের দীপ্ত রোষানলের প্রতীক হিসেবে মহাদেবের ললাটদেশে 'তাম্রলোহিত ঝাঁটাটি' সংযুক্ত করার স্থূল পরিকল্পনা বলেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ করেছে। বাঙ্গলাদেশের চিত্রকরদের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন—"চিত্রকরেরা যদি কিছুকাল স্ব স্ব মানসী সৌন্দর্য্যকে মনান্তরিত করিয়া দিয়া মানবী মডেল দেখিয়া চিত্র আঁকিতে সুরু করেন, তাহা হইলেও দেবতারা ইহলোকে কতকটা প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন।" চিত্রনবিশ মাত্রই বলেন্দ্রনাথের এই উপদেশের যৌক্তিকতা স্বীকার করবেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়—১৮৯৩-১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ এই ভাবে মডেল সহযোগে প্রতিকৃতি অঙ্কনের পাঠ গ্রহণ করছিলেন। এইভাবে শেখার সুফলটুকু বলেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করে থাকবেন—এবং স্বদেশী শিল্পীদের কল্যাণে সেই অভিজ্ঞতা নিয়োগ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। এই প্রবন্ধে উপসংহারে লেখক লিখছেন—"একটি রাজনৈতিক অধিকার লাভ অপেক্ষা জাতির হৃদয়ে একটি সুন্দর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা গুরুতর কার্য্য। এই গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের প্রাচীন সৌন্দর্য্য সমূহকে যে চিত্রকর অক্ষুণ্ণ বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন মহাত্মা।" প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—বলেন্দ্রনাথের এই উক্তি যেন পরবর্ত্তীকালের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী শিল্পী নন্দলাল বসুর আবির্ভাবের 'শুভশঙ্খধ্বনি' স্বরূপ। তাঁর 'সতীর দেহত্যাগ, কালী, তারা, মহাদেব, অন্নপূর্ণা ও শিব, রাধা, পার্থসারথি, উমার তপস্যা প্রভৃতি চিত্রাবলী স্বদেশ ও বিদেশের চিত্র সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। নন্দলাল বসুর জীবনীকারের ভাষায়—"নন্দলালের এই সব ছবির আদল বলেন্দ্রনাথের ঐসব প্রবন্ধের সূতিকাগারে যেন সযত্নে লালিত হয়েছিল। তাঁর পৌরাণিক চিত্রচিন্তার আদর্শ স্থাপনে প্রভূত রসদ জুগিয়েছিল প্রবক্তা বলেন্দ্রনাথের রচনাবলী।"

১৩০৫ সনের বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে অবনীন্দ্রনাথের উপহার পাওয়া একটি পার্শিয়ান ছবির বই অবলম্বনে লিখিত বলেন্দ্রনাথের বিখ্যাত রচনা 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য চিত্রকলার করণকৌশল সম্পর্কে এদেশী শিল্পীদের বেশ কিছুটা জ্ঞান জন্মেছে। গিলার্ডি ও পামারের কাছে চিত্রবিদ্যা সমাপনান্তে অবনীন্দ্রনাথ পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকা শুরু করেছেন। রবিবর্মার আঙ্গিক অনুসরণে তাঁর মায়ামৃগ, শকুন্তলা প্রভৃতি ছবি অঙ্কিত হয়েছে (১৮৯৪-৯৫) অবনীন্দ্রনাথের মত চিত্রকলার চর্চা না করলেও স্বভাবগত কৌতূহলবশতঃ পাশ্চাত্য চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বলেন্দ্রনাথেরও যথেষ্ট জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তিনি ঐ পার্শিয়ান চিত্রসংগ্রহটির মূল্যায়ন করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন 'ভাব, বর্ণবিন্যাস বা রচনাপ্রণালীর দিক থেকে পাশ্চাত্য চিত্রকলার সঙ্গে এই প্রাচ্য চিত্রকলার কোন মিল নেই। পাশ্চাত্য চিত্রকলাসুলভ আলোছায়ার সূক্ষ্মবিন্যাস (light and shade) অথবা "তুলিকার সে দুরান্তসূচী লঘুস্পর্শ" (depth of space and transperancy) এখানে দুর্লভ, কিন্তু স্বদেশীয় বিষয়বস্তু এবং রবিকরোদ্ভাসিত বর্ণাভাসের জন্য প্রাচ্য চিত্রকলার এই নিদর্শনগুলি লেখকের মন হরণ করেছে। শুধু তাই নয় আমাদের গৃহাভ্যন্তরে এই চিত্রগুলির বিন্যাস ব্যাপারেও তিনি প্রকৃত রসজ্ঞমূলক পরিকল্পনা দিয়েছেন।' সেই সঙ্গে লক্ষ্যকরার বিষয় সুনির্ব্বাচিত শব্দময়ী বর্ণনার সাহায্যে লেখক কিভাবে সেই বিশিষ্ট চিত্রকলার রূপরেখা ও বর্ণ সম্বন্ধে পাঠকের মনেও একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে এই বিশিষ্ট চিত্রকলার অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু মন্তব্য করেছেন। 'প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ শ্রেষ্ঠ চিত্রকলার উদ্দেশ্য নয়; ভাবের সুসঙ্গত প্রকাশই তার লক্ষ্য।' বলেন্দ্রনাথের মতে "সেইজন্যই নিপুণ চিত্রকরেরা ছোটখাট সকল খুটিনাটিতে প্রকৃতির বাহ্যরেখা ও বর্ণবিন্যাসটুকু মাত্র নকল না করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত মর্মানুসারে নিজ নিজ রচনায় বর্ণবিন্যাস করিয়া থাকেন। এবং তাহাতেই আমাদের মনে সেই মোহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়েন—যাহাতে সমগ্র চিত্রখানি তাহার স্বাভাবিক সঙ্গতিতে আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।" এই বিচার অনুসারে আলোচ্য চিত্রাবলীতে অশ্বের আসমানী ও হরিদ্বর্ণ অথবা জনতার মুখমণ্ডলের বিচিত্র বর্ণাভাস আনুপূর্ব্বিক স্বভাবানুযায়ী না হওয়া সত্ত্বেও লেখকের দৃষ্টিতে সমধিক শোভা সম্পন্ন মনে হয়েছে। তাঁর মতে "এই প্রয়োগবিজ্ঞানের অমোঘ পটুত্বই আমাদের ভারতবর্ষীয় শিল্পীর প্রধান গৌরব।" এই প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলার পরিপ্রেক্ষিতগত (Perspective) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও লেখক তাঁর নিজস্ব ধারণা প্রকাশ করেছেন। তিনি লক্ষ্য

করেছেন আমাদের দেশের প্রাচীন চিত্রকলায় সূক্ষ্ম অলঙ্করণের দিকে বেশী লক্ষ্য দেওয়া হয়। এর কারণ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য—গৃহাকাশের প্রস্তর-নিবদ্ধ চতুঃস্পার্শে এবং স্থাপত্যের কৃত্রিম গঠন প্রণালীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যই এদেশীয় চিত্রকলায় ঐ বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য চিত্রকলার ধরণ কিছুটা স্বতন্ত্র। "শিল্পী সেখানে যে উচ্চভূমিপরে দাঁড়াইয়া সম্মুখের দৃশ্যপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে রেখাবর্ণের প্রত্যেক সূক্ষ্ম বিভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বৃহৎ প্রকৃতি সেখান হইতে সমগ্রভাবে ভালরূপ চোখে পড়ে।" এই ধরণের চিত্রাবলীর রসগ্রহণ করতে হলে ছবি ও দর্শকের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সঙ্কীর্ণ গৃহ পরিবেশে এই ধরণের চিত্রবিন্যাস করা হ'লে লেখকের ভাষায়—"তাহার দূরানুস্যূচিতা অনেক সময় গৃহভিত্তির চতুঃসীমামধ্যে প্রতিহত হইতে থাকে এবং বাহিরের মুক্তাকাশের ছায়ালোকও বোধকরি, বদ্ধগৃহে কথঞ্চিৎ অসঙ্গত হইয়া উঠে।" সেদিক থেকে বিচার করলে আমাদের নাতিদীর্ঘ গৃহ পরিবেশে ঐ সূক্ষ্ম কারুকার্য সম্বলিত, আলোচ্য পার্শিয়ান চিত্রাবলীর বিন্যাসের বিশেষ সুবিধা এই যে সেখানে দর্শকের পক্ষে ছবির একান্ত নিকটবর্ত্তী হয়ে তার প্রকৃত রসগ্রহণ করা সম্ভব। বলেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন ছবির বিবরণী হিসেবে পারসী বয়েৎএর ব্যবহার এই চিত্রসংগ্রহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্যটি অবনীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এই চিত্রসংগ্রহ লাভের অব্যবহিত পরে বৈষ্ণবপদাবলী অবলম্বনে অঙ্কিত তাঁর রাধাকৃষ্ণ সিরিজের (১৮৯৫-৯৭) চিত্রাবলীতে ঐ পার্শিয়ান চিত্রকলার অনুকরণে, প্রতি ছবির তলায় বিষয়ানুসারে বিভিন্ন বৈষ্ণবপদের অংশবিশেষ পারসী অক্ষরের ছাঁদে লিখিত হয়। এঁরই কাছাকাছি সময় একখানি কারুকার্য্য অলঙ্কৃত 'আইরিশ মেলডিজ' অবনীন্দ্রনাথের হাতে আসে। অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন—"তখন সেই আইরিশ মেলডির ছবি ও দিল্লির ইন্দ্রসভার নকশা যেন আমার চোখ খুলে দিলে। একদিকে আমার পুরাতন ইউরোপীয়ান আর্টের নিদর্শন ও আর একদিকে এদেশের পুরাতন চিত্রের নিদর্শন। দুই দিকের দুই পুরাতন চিত্রকলার গোড়াকার কথা একই।" (জোড়াসাঁকোর ধারে) সম্ভবতঃ বলেন্দ্রনাথও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐ দুটি চিত্র সংগ্রহ পাশাপাশি রেখে তার রসগ্রহণ করেছিলেন তাই তাঁর এই রচনাতেও পারস্য বয়েৎএর প্রসঙ্গে ইংরেজী লিপিরঞ্জনী চিত্রকলার প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে বর্ণবিন্যাসের ব্যাপারে প্রাচ্যচিত্রকলার এই নিদর্শনটি পাশ্চাত্য চিত্রকলার ঐ বিশেষ আঙ্গিককে অতিক্রম করে গেছে। তাঁর দৃষ্টিতে এই সংগ্রহে যেন কালিদাসের কাব্য, কাদম্বরীর বর্ণনা, তাজমহলের স্থাপত্য, দিল্লীর রাজঅন্তঃপুরের প্রসাধন বিলাস, কাশ্মীরী শাল, পারস্য গালিচা, ঢাকাই মসলিন, কটকী রূপার কাজ, দক্ষিণের চন্দন খোদাইশিল্প—এই সমস্ত কিছু অপূর্ব ঐক্যসূচক সমন্বিত। বলেন্দ্রনাথের ভাষায় "এই ঐক্যসূত্রেই ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা চির-সজীব এবং ইহাতেই আমাদের পুরাতন কলাভবন এত চিত্তহারী।" প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের নাম 'কলাভবন' রাখা হয়। বলেন্দ্রনাথের রচনাতে এই বিশেষ শব্দটির বারংবার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

বলেন্দ্রনাথ স্বয়ং চিত্রশিল্পী ছিলেন না, কিন্তু চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর কি গভীর আগ্রহ ছিল—

বর্ত্তমান আলোচনায় আশাকরি তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধিরও একটি নিজস্ব ধারা ছিল; জানবার আসল আগ্রহ এবং রস গ্রহণ করার আশ্চর্য্য আন্তরিকতায় তা মহিমান্বিত। শুধু তাই নয়, তাঁর শিল্পবোধ তাঁর সমগ্র সাহিত্যের পটভূমি রচনা করেছে; ভাব এবং ভাষাকে শোভন সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করে তোলাই তাঁর সাহিত্যসাধনার মূলমন্ত্র ছিল। বলা বাহুল্য এ প্রবণতা শিল্পীর, সেই অর্থে বলেন্দ্রনাথকেও আমরা শিল্পী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত (কৃষ্ণচরিত্র ১মখণ্ড)

কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার মধ্যে মহাভারত অন্যতম। কিন্তু মহাভারতের সবটুকুই যে আদি এবং অকৃত্রিম এমন চিন্তা করার কোন কারণ নেই। বিশেষতঃ আদি মহাভারত ব্যাসদেবকৃত হলেও আমরা তা পাইনি। বৈশম্পায়নের উক্তিতে অনেকক্ষেত্রে মহাভারত বর্ণিত হয়েছে। আবার বিভিন্ন কবির মহাভারতের উল্লেখও পাওয়া যায়। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি বাদ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু সেই প্রক্ষিপ্ত অংশ কোন্‌গুলি। তাঁর মতে—কৃষ্ণ কর্তৃক যে সমস্ত অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলি প্রক্ষিপ্ত। কারণ কৃষ্ণ ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন একথা স্বীকার করে নিলেও—যেহেতু তিনি মানবজন্ম ধারণ করেছেন সেইজন্য তাঁর কার্যকলাপ মানবজীবনেরই আয়-ত্বাধীন হবে।

আকবর শাহের খোষ রোজ (গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক)॥ প্রথম প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ ১২৮৫, পৃঃ ১২-১৬।

এক উৎসব উপলক্ষে আকবরশাহের রাজপুরীমধ্যে রূপসী রমণীদের হাট বসে গেছে। সেই উৎসব দেখতে গিয়ে এক রাজপুতরমণী পথ হারিয়ে ফেললেন। এমন সময় আকবরের সংগে তার দেখা। আকবর জোর করে সেই রমণীর হস্তধারণ করলেন। রমণী দৃপ্ততেজে নবাবের তরবারি কেড়ে নিয়েই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন। আকবর রমণীর এই বীরত্ব দেখে স্বেচ্ছায় পরাজয় মানলেন এবং ভগিনী সম্বোধন করলেন। রমণীও আকবরকে যথোচিত উপদেশ দিয়ে সম্রাটের সহযোগিতায় বাইরে এলেন। রাজপুত রমণীর বীরত্ব বর্ণনা করাই এই কবিতার উদ্দেশ্য। এরকম নারী চরিত্রের উদাহরণ পরবর্তীকালের 'রাজসিংহ' উপন্যাসেও পাওয়া যায়।

এই কবিতাটির আখ্যানবস্তুর সংগে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শূরসুন্দরী"র কাহিনীটি সংক্ষেপে এরূপ, মোগল সম্রাট আকবরের শ্যালক মানসিংহ জাতে ওঠার জন্য রাণাপ্রতাপের সংগে একত্র আহারের নিমিত্ত তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রতাপ তাঁর সংঙ্গে একত্রে খেতে রাজী হননি। এই অপমানের কথা মানসিংহ আকবরকে জানাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতাপের সংঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু বারংবার যুদ্ধেও প্রতাপকে পরাজিত করতে না পেরে মেবারের কুল মর্যাদা খর্ব করার জন্য তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন। নৌরজাহাট নামক এক উৎসবের সূচনা করেন। এই হাট প্রতিমাসে দিল্লীর প্রাসাদে বসবে। এটিতে কেবলমাত্র আমীর ওমরাহদের পুরস্ত্রীরা কেনাবেচা করতে পারবে, পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকবে না। বাইরে আকবর ভাব দেখালেন যে বিভিন্ন নারীদের মধ্যে মেলামেশাই এই হাটের উদ্দেশ্য।

কিন্তু তাঁর গোপন উদ্দেশ্য হল তাঁরই আশ্রিত বিকানীরের রাজভ্রাতা পৃথ্বিসিংহের পত্নী সতীর, যিনি রাণা প্রতাপের ভগ্নী, অপমান করা। সতীও অন্যান্য নারীদের মত নৌরজাহাটে এলেন। আকবর সন্ন্যাসীবেশে তাঁর ওপর নজর রাখলেন। এদিকে আকবরের ব্যবহারে সম্রাজ্ঞী যোধাবাঈয়ের সন্দেহ হওয়ায় তিনিও আকবরকে লক্ষ্য রাখলেন। সতী রাজপ্রসাদে পথ হারিয়ে ফেললে আকবর তাঁকে একাকী পেয়ে প্রেম নিবেদন করেন। কিন্তু যোধাবাঈ সেখানে অলক্ষ্যে একটি তরবারি রেখে যান। সতী সেই তরবারি নিয়ে সম্রাটের বুকে লাথি মেরে তাঁকে কাটতে যান। তখন আকবর সতীর কাছে ক্ষমা চান এবং লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে আর কোন রাজপুত ললনাকে অন্তঃপুরে আনবেন না।

আকাঙ্খা (গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক) ॥ প্রথম প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন' জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, পৃষ্ঠা—৭৯-৮০। কবিতাটি সুন্দরী এবং সুন্দরের কথোপকথনরূপ দু'টি অংশে বিভক্ত। সুন্দরী রাধা বলেছেন—তাঁর প্রাণবল্লভ যদি যমুনার জল, যমুনাতরঙ্গ, মলয় পবন, কাননকুসুম, চাঁদের কিরণ, চিকন বসন, বা জগতের সবকিছু সুন্দরের মধ্যে বিরাজ করতেন তাহলে কতই না ভাল হত। অপরপক্ষে সুন্দর শ্যাম রাধার আকাঙ্খিত জিনিষগুলি হতে পারলে নিজেও কত সুখী হতে পারতেন, সেকথা ব্যক্ত করেছেন। রাধা-কৃষ্ণের খোলস থাকলেও কবিতাটি সাধারণ প্রেমিকারই মনের বাসনা প্রকাশ করেছে।

আকাশে কত তারা ? (বিজ্ঞানরহস্য) ॥ প্রথম প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন' ১২৭৯, অগ্রহায়ণ। 'একথালা সুপারি, গণতে পারে না ব্যাপারী'—এই ধাঁধাটি শিশুমনে যেমন জাগায় কৌতূহল, তেমনি আকাশের অগণ্য নক্ষত্ররাজির দিকে তাকিয়ে সাধারণ মানুষেরও বিস্ময়ের অন্ত নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাপারীরা সেই একথালা সুপারী গণনার চেষ্টা করেছেন বহুকাল ধরে। বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতামত উদ্ধার করে আকাশে কত তারা আছে সে সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন।

আগামী বৎসরে প্রচার যেরূপ হইবে (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত) ॥ প্রথম প্রকাশ 'প্রচার' জ্যেষ্ঠ ১২৯১, পৃঃ ৩৬১-৬২। শ্রাবণ মাস থেকে 'প্রচারে'র দ্বিতীয় বর্ষ সুরু হবে। দ্বিতীয় বর্ষে প্রচারে 'সীতারাম' উপন্যাসের বাকি অংশ ধারাবাহিকভাবে এবং ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করবার কথা বলা হয়েছে। তার ফলে পত্রিকার কলেবর যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি দামও বাড়বে।

প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ মন ॥ অলোক রায় ॥ বাগর্থ ॥ তিনটাকা ॥ পৃঃ ৬৪।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত বাঙালী-মনীষী সাহিত্য এবং সমাজসাধনায় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি তাঁর আদর্শকে অনেকক্ষেত্রে প্রকাশ করেছেন বলে শৈল্পিকবিচারে কিছু কিছু নিন্দাভাগী হয়েছেন। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রশ্ন সচরাচর আসে না। বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কারবাদী মন প্রবন্ধের কলমে তাই বহুক্ষেত্রে নিশ্চিন্ততা ও স্বস্তিলাভ করেছিল। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে 'কমলাকান্তের দপ্তর'কেই চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধপাঠে আগ্রহ প্রকাশ করিনি, তাঁর প্রবন্ধাবলীর যথাযথ মূল্যায়নেও অগ্রণী হইনি। সেদিক থেকে অলোক রায়ের বর্তমান গ্রন্থটিকে সর্বাগ্রেই অভিনন্দন জানাবার প্রয়োজন আছে।

লেখক রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ থেকে প্রারম্ভেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বার্তার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তার শেষাংশটি হল 'রাজবদুন্নতধ্বনির।'

যাইহোক লেখক প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে আলোচনা করেছেন। 'প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙালী সমাজ-মন' প্রবন্ধটি তার সূচনা। এই অংশে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁর সঠিক পটভূমিকাটি আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম ইউরোপীয় রেনেসাঁর সংগে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত ভারতীয় রেনেসাঁর পার্থক্য কোথায়? আমাদের মনে হয় ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালী মনে একটা অভিঘাত সঞ্চারিত হলেও তা প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার পরই হিন্দুসংস্কৃতিমুখীন হয়েছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে একদিকে দেখি পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ মিল-বেন্থামের প্রতি অনুরাগ; অন্যদিকে 'কৃষ্ণচরিত্রে' ও 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র ভক্তিবাদ। একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের রসগ্রাহী সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের গুণগ্রাহী পাঠক। তুলনামূলকভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্য-প্রিয়তাই অধিক। সে যুগের অন্যান্য মনীষীদের মত বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুরাগ, ইতিহাস-চেতনা, যুক্তিবাদী মনন, দেশপ্রেম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত। এই অধ্যায়ে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত এবং সেই যুগ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কি পরিমাণে ঋণী তার একটি সমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

লেখক বলেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের মনের মধ্যে বিরোধ একটা গোড়া থেকেই ছিল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কার, ইংরেজীয়ানা ও স্বদেশীয়ানার অনুকূল-প্রতিকূল টানবাহানা। একদিকে যুক্তিমার্গ,

অন্যদিকে আবেগধর্মী দেশীয় সংস্কার। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে মত পোষণে, বিদ্যাসাগর ও কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহিত্যকৃতির অস্বীকৃতিতে, রায়তের দুঃখে কাতর হয়েও জমিদারের স্বার্থরক্ষার অনডতায়, বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণের পরিচয় দিয়েছেন এবং এই দ্বিধা উনবিংশ শতাব্দীর সমাজমনের। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিত্যে এই সমাজ-মনেরই প্রকাশ হয়েছে।" বঙ্কিমচন্দ্রের মননে এই দ্বিধার ভাবটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বর্তমান থাকলেও, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তার প্রকাশ দুর্লভ। উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন রোহিণীর বিড়ম্বিতা নারীজীবনের হাহাকারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও শাস্তিবিধানে বাধ্য হয়েছেন, কিংবা ছন্দের নিষ্পাপ জীবনকে স্বীকার করেও তাকে সংসারের সুখ দিতে পারেননি; প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সেরকম দ্বিধা কোথায়? তিনি আগাগোড়াই সেখানে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও মতবাদকে স্বীকরণ করে দেশীয় ছাঁচে ঢেলেছেন। তাই 'কমলাকান্ত' ডি-কুইন্সির 'কন্‌ফেসন্' হল না। তাই 'সাম্য' প্রবন্ধ 'মার্কস্‌ইজম্'-এর বাংলা অনুবাদ হল না। হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক দৃষ্টিতে কিছুটা রক্ষণশীল কিন্তু তাঁর প্রবন্ধগুলির চিন্তাধারায় কোন দ্বিধা ছিল না। তিনি তাঁর মতবাদের স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্ট চিন্তাধারা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।

'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা' নামক প্রবন্ধটিতে তুলনামূলক সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে-যুগের তুলনামূলক সমালোচনার রীতিতে এই জাতীয় আলোকপাতই করা হত। শুধু সেযুগে নয়, বর্তমান যুগেও তুলনামূলক আলোচনার কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। তাই আলোচককে তাঁর নিজস্ব বোধ ও বুদ্ধির দ্বারাই দুই বিপরীতধর্মী সাহিত্যের মধ্যে তুলনা করতে হয়। যাইহোক এই অধ্যায়টি বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ হয়েছে।

'বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনচিন্তার' মধ্যে ধর্মচিন্তাও অন্তর্ভূত। কিন্তু পরিসর সংক্ষিপ্ত হওয়ায় কোনটিই সুস্পষ্ট হয়নি। 'বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচিন্তা' ও 'বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা' আরও দুটি প্রবন্ধ। আরো একটি প্রবন্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানচিন্তা' থাকলে ভাল হত। যে বিজ্ঞাননিষ্ঠতা উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত চিন্তাধারায় প্রতিফলিত, তাকে সাহিত্যিক হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞানরহস্যে' প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর এই কৃতিত্বকে অস্বীকার করবার নেই।

গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিসরে বহুবিতর্কিত বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় আলোচনা কম। আরও বিস্তৃত আলোচনা হলে সামগ্রিক ধারণা বা তৃপ্তির মনোভাব ভালো করেই গড়ে উঠতো। চিন্তাশীল পাঠক এ গ্রন্থে বহু খোরাক পাবেন। বঙ্কিমচর্চায় গ্রন্থকারের নিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

অশোককুমার কুণ্ডু

A
R
U
N
A

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 November '69 (0'50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN

দ্বি-শততম সংখ্যা

সমকালীন

সপ্তদশ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

SALES & SERVICE THROUGHOUT THE COUNTRY

ইভা ১০.৯৫—১৭.৯৫

Bata

সপ্তদশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

অগ্রহায়ণ
তেরশ' ছিয়াত্তর

সপ্তদশ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

দ্বি-শততম সংখ্যা

একটি প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকার ক্রমান্বয়ে দুইশতটি সংখ্যার প্রকাশ বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ঘটনা। এই দ্বিশত সংখ্যাটিকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করে রাখার জন্যই এত পুনর্মুদ্রিত করা হলো প্রথমতঃ সমকালীনে প্রকাশিত তাঁদেরই কয়েকজনের রচনা, যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এবং যাঁদের স্নেহ-ভালবাসা ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমকালীন দ্বিশত সংখ্যার প্রকাশ-গৌরব অর্জন করতে পেরেছে। আরও কয়েকজনের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা গেল না শুধু স্থানাভাবের জন্যই। দ্বিতীয়তঃ দুইশত সংখ্যায় প্রকাশিত সামগ্রিক সূচীপত্রগুলিকে বিষয়সূচী অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট করে প্রকাশ করা হ'ল। অনেক শ্রদ্ধাভাজন বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্য-অভিজ্ঞ, সমকালীনের দশমবর্ষপূর্তির সময়েই এই বিষয়-সূচী প্রকাশ করতে বলেছিলেন। সপ্তদশবর্ষে তাঁদের সস্নেহ পরামর্শের মর্যাদা রাখতে পেরে নিজেকে ধন্য বলে মনে করি।

৪৯নং পার্ক ষ্ট্রীট

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী

সে কী আজকের কথা, সে যেন কতযুগ আগে। সেদিনকার কথা আজও মনে পড়ে। মনে হয় সে যেন অন্য গ্রহের অন্য জন্মের কথা। কবি বলেছেন একটি জন্মে আত্মা নতুন রূপ গ্রহণ করতে পারে। কবির সেই কথা কত সত্যি আজ তা' বুঝতে পারি। অস্পষ্ট অতীতের মধ্যে থেকে কতকগুলো ঘটনা ভেসে ওঠে, অন্ধকারে জ্বলে ওঠা জোনাকীর মতো, দূর থেকে-দেখা রেল ষ্টেশনের কুয়াশা ভেদ করে আসা আলোর মতো।

মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে হাতে শ্লেট নিয়ে, ৪৯নং পার্ক ষ্ট্রীটের ওপরের তলায় গুণ গুণ করে সুর ভাঁজছেন আর 'মায়ার খেলার' গান রচনা কচ্ছেন। তখন কাকীমা আর বেলাকে নিয়ে তিনি ওইখানেই থাকতেন। বেলা তাঁদের প্রথম সন্তান। বেলা যে কী সুন্দর ছিল। একদিন মনে আছে, দুধে গোলাপী রঙের মোমের পুতুলের মতো টুকটুকে বেলা আমাকে স্কুল থেকে নিতে এলো। পাহাড় থেকে বেড়িয়ে ঠিক সেইদিনই ওরা ফিরেছিল। অবাক করে দিয়েছিল আমাকে। কী ভালোই যে ওকে লেগেছিল সেদিন।

আমার পিসিমা স্বর্ণকুমারী দেবী লেখিকা হিসাবে প্রসিদ্ধা ছিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি 'সখী সমিতি' নাম দিয়ে একটি মেয়েদের প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। সেই সখী সমিতির সাহায্যের জন্য শ্রীমতী সরলা রায় (মিসেস্ পি. কে. রায়) বেথুন কলেজের প্রাঙ্গণে 'মায়ার খেলা' অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে ফুলের দোকান করেছিলুম আমি। টিস্যুকাগজে মোড়া সেই গোলাপগুলির ছবি, মেয়েদের কেশপ্রসাধনের অপরিহার্য অঙ্গ সেই হলদে গোলাপগুলির গন্ধ কালের প্রান্তর পেরিয়ে আজও ভেসে আসে আমার কাছে। সেদিনকার 'মায়ার খেলায়' বাড়ীর মেয়েরাই সব চরিত্রে অভিনয় করেছিল। গাঢ় রঙের সাটিনের সালোয়ার আর পাঞ্জাবী পরে কেউ সাজলো বয়-ফ্রেণ্ড; গোঁফ লাগানোতে কাউকে কাউকে তাদের বাপের মতো দেখাচ্ছিল; মায়াকুমারীদের মাথার উপর বিজলী বাল্‌ব্ তারার মতো জ্বল্‌ছিল আর নিভ্‌ছিলো। সেকালের ষ্টেজ সাজানোর সেই রীতিগুলো আর এই ধরণের ছেলেমানুষী সাজগোজ আধুনিক-আধুনিকাদের ওষ্ঠে হয়তো বাঁকা হাসি টেনে আনবে—আমার মনের মনিকোঠায় স্মৃতির এই আলোর কণাগুলি আজও জ্বলজ্বলে হয়ে রয়েছে।

মায়ার খেলা! এই মিষ্টি নামটার সঙ্গে কত যে মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে—কত গান, কত কথা, নিজের জীবনে, বাইরের জীবনে। অবাক হয়ে ভাবি স্মৃতির দান থেকে বঞ্চিত হলে মানুষ কি খুসী হতে পারতো। দার্শনিক আলোচনায় না গিয়েও তো বেশ বুঝতে পারি স্মৃতিকে বাদ দিলে মানুষ তার মনের জগতে কত গরীব হোত। তা'ছাড়া আনন্দ-ভরা এই গীতিনাট্যের সঙ্গে মধুর স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই তো জড়িয়ে নেই। কত নির্ভাবনা, সহজ সরল যাওয়া আসা ছিল সেদিন আমাদের,—ভুলে যাওয়ার ঘোমটায় সেই দিনগুলি আজও

ঢাকা পড়েনি।

ঠিক করে বলতে পারবো না 'মায়ার খেলা'ই প্রথম বাংলা গীতিনাট্য কিনা। বোধহয় নয়। কারণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে এর আগেই অন্য গীতিনাট্যের অভিনয় হয়েছিল—আমাদের সময়েই হয়েছিল। কিন্তু একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা যে গীতিনাট্য হিসাবে মায়ার খেলা সেরা নাট্যগুলির একটি। তাছাড়া এর একটা নিজস্ব মূল্যও আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতি প্রিয় বক্তব্যটিকেই মায়ার খেলায় বলেছেন—স্বপ্ন-পাগল প্রেমিক ঘরের শান্তিভরা আত্মদানতৃপ্ত প্রেমকে উপেক্ষা করে নূতন ভালবাসার সৌন্দর্যে দীপ্তিতে বিমুগ্ধ হয়ে ছুটে চলে গেল দূরে। তারপর যেদিন মোহভঙ্গ হলো সেদিন ঘরে যে প্রেম অপেক্ষা করছিল তার কাছে এসে আশ্রয় খুঁজলো। তাঁর প্রথমদিকের কাব্যসৃষ্টি 'ভগ্নহৃদয়'-এর মূল সুরটিও বোধহয় এই। আরও পুরানো গীতিনাট্য নলিনীতেও তিনি এই কথাই বলেছেন। 'মায়ার খেলা'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি 'নলিনী'র উল্লেখ করেছেন।

১৮৮৮ সাল। ঠিক পঁয়ষট্টি বছর আগে। পঞ্চাশের কোঠা শেষ করে আরও পনেরো বছর হয়ে গেল—নিঃসঙ্কোচে ফাঁকি দিয়ে চলেছি কালকে।

আজকে যেখানে ক্যালকাটা ক্লাব, সেইখানে আমাদের বাড়ী ছিল। বির্জিতলাও এর সেই পুরানো জীর্ণ বাড়ী কত যে স্মৃতি ডেকে আনে মনে। কিছুকাল পরে, সঠিক তারিখটা মনে নেই এই বির্জিতলাও-এর বাড়ীতেই মায়ার খেলা অভিনীত হয়েছিল। দেয়াল যদি শুনতে পেত তবে কত যে অভিনয়ের কথা বলতে পারতো—বলতে পারতো রাজারাণীর প্রথম অভিনয়ের কথা, সীমান্তবাসী যুদ্ধপ্রবণ হুণ্ডাদের নাচের কথা। সেদিনকার অভিনয়ে মায়াকুমারীদের বদলে মদন আর বসন্তের আবির্ভাব ঘটলো। একটি বসন্তের রাত্রি কাটানোর জন্য যে মায়ার খেলা তারা সৃষ্টি করলো পৃথিবীর মানুষের পক্ষে সে খেলার পরিণাম অতি কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। মদন আর বসন্তের ভূমিকায় সেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেছিলেন। মনে আছে সেদিন শান্তার পাঠ আমিই করেছিলুম—পরেছিলুম একটা পাড়হীন নীল শাড়ি; আজকালকার ফ্যাসানের পূর্বাভাস যেন আমার সেদিনকার সেই বেশে ছিল। কিন্তু আমার শাড়ীতে কাজ-করা আঁচল ছিল না, অপরিহার্য ব্যাগটিও ছিল না, একটি কথাও ছিলনা আমার। অভিনয়ে আমার দক্ষতা নেই কোনদিনই—কী ষ্টেজে কী ষ্টেজের বাইরে।

সেইদিন থেকে মায়ার খেলা যে কতবার হোল, কত অভিনেতা অভিনয় করলো কত পরিচালক পরিচালনা করলো। বির্জিতলাও-এর অভিনয়ই বোধহয় একমাত্র অভিনয় যাতে ফাণ্ড তোলার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অভিনয় করে চাঁদা তোলার ব্যাপারেও বোধহয় ঠাকুরবাড়ীর লোকেরাই প্রথম পথ দেখালেন। বেশ মনে আছে বহুকাল আগে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্যের জন্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ে মা আমাকে অভিনয় করতে দেন নি। আর একবার মনে রাখার মতো 'মায়ার খেলা'র অভিনয় হয়েছিল। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাই তাতে অংশ নিয়েছিল—কী সুন্দর যে হয়েছিল সেই অভিনয়। এই সঙ্গে মনে পড়ছে মায়ার খেলার

কয়েকটা সুর এত চমৎকার হয়েছিল যে বাবার সঙ্গে সাতারায় থাকার সময় দেখেছি সেখানকার সাহেবরাও সানন্দে কোরাসে যোগ দিত। 'ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেনো তবে কেনো ?' এই গানের ঐ শেষের অংশটুকু 'তবে কেনো তবে কেনো' তারা উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠতো। 'অলি বার বার ফিরে আসে, অলি বার বার ফিরে যায়' গানটি রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল গানটি। সঙ্গীতের আবেদন কত বিশ্বজনীন-এর থেকেই বোঝা যায়।

এমনি কত কথাই যে মনে আসে, কত ছবিই ভেসে ওঠে মনের পটে সব যদি ধরে রাখা যেতো।

বিজয়া

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

আমি চতুর্নবতি বর্ষ অতিক্রম করেছি, নানাবিষয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু সে সব জগজ্জননীর কৃপা ব্যতীত কিছুই নয়। আমি যে আপনাদের সম্মুখে ব'সে কথা বলতে পারছি, এ-ও তাঁরই কৃপা। আমি আপনাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছি; অনেকে আমার প্রতি অনুরক্ত আছেন। আমি আপনাকে ধন্য মনে করছি। ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম।

এই যে বিজয়া দশমী হয়ে গেল, আপনাকে আমি তার অর্থ শুনাতে চাই। গত শনিবার সন্ধ্যায় দুটি কন্যা আমার কাছে এসেছিল।

"কেন এসেছ?"

"বিজয়া করতে।"

"বিজয়া কি?"

"কেহ বললে. জানি না।"

কেহ বললে, "প্রণাম করা।"

শতকে উনশত জন এই উত্তরই দিবেন। কেহ বলবেন, "ত্রেতা যুগে রাম রাবণকে আশ্বিন শুক্লানবমীর দিন বধ ক'রেছিলেন; এই জন্য তার পরদিন দশমীতে বিজয়োৎসব হয়।" কিন্তু শরদৃঋতুতে যুদ্ধ হয় না, রাম-রাবণের যুদ্ধও হয় নাই। আর রামের বিজয়ে আমাদের ইষ্টানিষ্ট কি আছে? প্রকৃত কথা এই,—

প্রাচীনকালে শরৎ ঋতুতে বৎসর আরম্ভ হ'ত। আমি যদি বেদের কালে থাকতাম, তা হ'লে বলতাম ৯৪ শরৎ অতিক্রম করেছি। সে-কালে "জীবেম শরদঃ শতম" এই প্রার্থনা ছিল। বিজয়া-দশমী শরৎ বর্ষের প্রথম দিন। যদি রবিবারে দশমী হয়ে থাকে, আজ শরৎ বর্ষের চতুর্থদিন। এর পূর্ব্বে হিমবর্ষ প্রচলিত ছিল। সেটা বহু প্রাচীন। বিজয়া দশমীর উৎসব প্রকৃত পক্ষে নববর্ষোৎসব। সেদিন আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে উত্তম দ্রব্য ভোজন করতে হয়, আমোদ আহ্লাদ করতে হয়। বিশ্বাস এই, বৎসরের প্রথমদিন সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটলে সারা বৎসর এইভাবে কাটবে। 'বিজয়া' নাম কেন? সাধারণ অর্থ,—নববর্ষে আমাদের বিজয় হউক; একটি বর্ষ সুখে-দুখে অতীত হ'ল, এখন নূতনবর্ষে বিজয় হউক; সকল বিষয়ে সুখ-সৌভাগ্য আসুক। বঙ্গদেশে আমরা তেমন উৎসব করিনা, পাঞ্জাবে দশমীর দিন খুব উৎসব হয়। সেদিন বণিকেরা নূতন খাতা করে, এখানে যেমন ১লা বৈশাখ করা হয়। আমরা ১লা বৈশাখ নববর্ষ মনে করি, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। সেদিন আমাদের দেবার্চ্চনা, নববস্ত্র পরিধান, উত্তমদ্রব্য ভোজনাদি কোনও কৃত্য নাই। এটা বণিকের নববর্ষ হতে পারে, তারা হালখাতা করে।

এখানে একটা কথা মনে পড়ল। বাঁকুড়ায় ১৩ই বৈশাখ কেহ হালখাতা করে। এতো অদ্ভুত কাণ্ড! এমন তো কোথাও নাই, আছে কেবল আসামে। কোথায় বাঁকুড়া আর কোথায়

আসাম! ১৩ই বৈশাখ হালখাতা কেন হয়, কে গবেষণা করবে? আমি অতি অল্পই অনুসন্ধান করেছি। এইটুকু বলতে পারি, খৃষ্ট জন্মের ৪৭১ বৎসর পূর্বে যখন সূর্য, ভরণী নক্ষত্রে প্রথম প্রবেশ করতেন, এটা তখনকার স্মৃতি। আরও আশ্চর্য কথা। ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত ভরণী নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে জন্মেছিলেন। এই বৃত্তান্ত ধরেই আমি খৃ-পূ ৫৭১ অব্দ পেয়েছি। এই সব তত্ত্ব বাঁকুড়ায় আছে। কে বা অনুসন্ধান করে? যাক সে কথা।

এখন বিজয়ার দিন কৃত্য কি? কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠকে প্রণাম করে, আশীর্বাদ চায়। দেখতে পাই কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠের সঙ্গে কোলাকুলি করছে; এটা আচারভ্রষ্টতা, এটা অশিষ্টাচার। বন্ধুতে বন্ধুতে করমর্দন, আলিঙ্গন বা কোলাকুলি চলতে পারে। সেদিন আত্মীয়বন্ধুদের নিয়ে উত্তম ভোজন করবে; দেবতার ও গুরুজনের আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে। ঋগ্‌বেদের কালে শরৎ হইতে শরৎ, বৎসর গণনা হ'ত। নূতন বৎসরের প্রথম সূর্যকে যেন দেখতে পাই, এইরূপ প্রার্থনা ছিল। গুজরাটে 'গর্বা' নামে একপ্রকার নৃত্য প্রচলিত আছে। এক বর্ষীয়সী নারী একটা শতচ্ছিদ্র হাঁড়িতে শাদা রং মাখিয়ে ভিতরে একটি দীপ জ্বেলে দেয়; সেই হাঁড়ি মাথায় নিয়ে এ-বাড়ী সে-বাড়ী নৃত্য ক'রে বেড়ায়; অন্য নারীরাও মণ্ডল করে তাকে ঘিরে নৃত্য করে। সে দেশে ভদ্র নারীও প্রকাশ্যে নৃত্য করে, এটা দূষ্য নয়। গর্বা, গর্ভশব্দের অপভ্রংশ। সেই শতচ্ছিদ্র হাঁড়ির ভিতর যে দীপ, সেটিই গর্ভ, মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ। দীপটি নববর্ষের নবসূর্যের দ্যোতক। দশমীর দিন নবসূর্যের উদয় হবে, এই আনন্দে নৃত্য। গর্বানৃত্য একদিন নয়, ৯ দিন চলতে থাকে। ভারতের অন্যত্র নবরাত্রি ব্রত হয়। তখন চান্দ্রমাস ও চান্দ্রদিন বা তিথি গণনা প্রচলন ছিল। রাত্রি না হ'লে চন্দ্র দেখা যায় না। তাই ৯ রাত্রি গণনা। ভারতের বহুস্থানে 'দশেরা' অর্থাৎ দশরাত্রির উৎসব হয়। বিজয়া দশমীর তুল্য উৎসব। উদ্দেশ্য একই। শরৎ ঋতু আসছে, নববর্ষ আসছে, বৎসরটি যেন সুখে যায়।

এ কোন কালের কথা বলছি? কত বৎসর পূর্বে আর্যঋষিগণ এই শরৎবর্ষ গণনা আরম্ভ করেছিলেন? এখন হ'তে ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে। নিশ্চয় তখন কোনও দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হ'ত। সে কোন্ দেবতা? রুদ্র। এখন আমরা সে দিন রুদ্রাণীর পূজা করছি। রুদ্রাণী রুদ্র শক্তি, তিনিই দুর্গা। তাঁর অসংখ্য নাম। তিনি শক্তি, মহাশক্তি বিশ্বশক্তি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, যখন দেবতারা মহিষাসুরকে পরাস্ত করতে পারলেন না, তখন তাঁদের সম্মিলিত তেজে যে দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল, তিনিই দুর্গা। দেবতা কে? এই যে আমি কথা বলছি, এই যে বাতাস বইছে, ঐ যে সূর্য উঠেছে, এ সমস্তই শক্তির প্রকাশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা' কিছু ঘটছে সবই শক্তির প্রকাশ। এই শক্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তিই দেবতা। কত দিকে কত কর্ম হচ্ছে, কে তার ইয়ত্তা করবে? তাই তেত্রিশকোটি দেবতার কল্পনা। আমরা কর্ম দেখতে পাই, কিন্তু শক্তি দেখতে পাই না। সকল শক্তির যিনি সম্মিলিত শক্তি, তিনিই মহাশক্তি, মহামায়া, দুর্গা। তিনিই আদ্যাশক্তি, বিশ্বজননী; তিনিই সিদ্ধি, ঋদ্ধি; তিনিই সাবিত্রী। নববর্ষে আমরা সেই দেবীর পূজা করি, তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে "যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে; যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" ইনি সেই শক্তি। তিনিই নিদ্রা, রাত্রি, মোহরাত্রি, কালরাত্রি; তিনিই শান্তি, ক্ষান্তি, দয়া। তিনি সর্বভূতে বর্তমান। জগৎটাই যেন শক্তি?

নিশ্চয় শক্তিমান্ একজন আছেন। সেই শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। পরমহংস রামকৃষ্ণের ভাষায় অগ্নি ও দাহিকাশক্তি যেমন অভিন্ন, তেমনিই শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। কিন্তু সাধারণ মানুষ শক্তি ও শক্তিমানকে পৃথক করে দেখে। যোগিগণ ধ্যানের দ্বারা শক্তিমান্‌কে জানতে পারেন। তিনিই ব্রহ্ম। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই। চণ্ডীদাসের একটা প্রসিদ্ধ উক্তি সকলেই জানেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" এই 'মানুষ' কে? সাহিত্যিকেরা মানবিকতা; মহামানবিকতা ইত্যাদিরূপে এর ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। কিন্তু এটা মস্ত বড ভ্রম। humanity শব্দ থেকে এই শব্দগুলো এসেছে। সাহিত্যিকেরা কতকাল এই ভুল করতেন, কে জানে। আমি দেখিয়েছি, চণ্ডীদাসের 'মানুষ' প্রকৃতপক্ষে 'মনের মানুষ,' ব্রহ্ম। কারণ চণ্ডীদাসই আবার বলেছেন। বাঘও বলিতে মানুষ বুঝায়, সাপও বলিতে তাই।

মানুষ ছাড়া এ বিশ্ব জগতে আর যে কিছুই নাই।।"

কিন্তু সাধারণ লোকের জ্ঞান-বুদ্ধি অতদূর যায় না, তাই ব্রহ্মের যিনি শক্তি, তাঁর কাছেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। বঙ্কিমচন্দ্র "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং" ব'লে যার বন্দনা করেছেন, তিনি তো কেবল মাটি নন, তিনি ভূমিরূপা, বিশ্বজননী। রাত্রির জ্যোৎস্নায়, পুষ্পিতদ্রুম-দলে তিনিই সেই মাতাকেই দেখেছিলেন, তাই তিনি ঋষি। মাতা কেবল সৌম্যা নন, তিনি রৌদ্রাও বটেন। ত্রিংশকোটিকণ্ঠের ধ্বনিতে, খরকরবালের ঝনৎকারেও তিনিই আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আরও অন্তরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, "বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি"। এত মার্কণ্ডেয় পুরাণেরই দুর্গাস্তুতি। শেষে তিনি বললেন, "ত্বং হি দুর্গা।" আমাদের যত কিছু ধর্ম-গ্রন্থে, বেদে-পুরাণে এই ভাব এমন প্রকট হয়েছে যে কাকেও শিখিয়ে দিতে হত না। ইদানীং বলতে হয়, শেখাতে হয়।

বহুকালের একটা কথা মনে পড়ল। তখন আমার বয়স ২০ বৎসর। কলেজে পড়ি। তখন আমরা Winter Vacation পেতাম। ছুটি বাড়ী যাব, উমেশ বাগ্দী নামে এক চাকর আমায় নিতে এসেছে। শীতকাল। দামোদরের এক হাঁটু জল পেরিয়ে সে পারে গিয়ে দেখি, চারদিকে প্রচুর বড় বড় তরমুজ ফলেছে।

"ওহে উমেশ! এখানকার চাষীরা তো বড় বাহাদুর হে, এমন সুন্দর তরমুজ ফলিয়েছে।"

উমেশ বললে, "চাষির সাধ্য কি, যিনি ফলাবার, তিনিই ফলিয়েছেন।"

আমি বললাম, "তবে মাটির গুণ বলতে হ'বে।"

উমেশ বলে, "মাটিতে কি করবে, যিনি ফলাবার, তিনিই ফলিয়েছেন।"

বাঃ! কেনোপনিষদের সেই উপাখ্যান মনে পড়ে যায়। দেবগণ এক মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি দেখলেন। তিনি উমা। উমা অগ্নিকে বললেন, "এই তৃণটি দগ্ধ কর।" অগ্নি পারলে না। উমা বায়ুকে বললেন, "এই তৃণটি উড়িয়ে দাও।" বায়ু পারলে না। এযে অবিকল উমেশ বাগ্দীর কথা। এই আমাদের দেশ! তারা বিদ্বান্ না হতে পারে, কিন্তু অজ্ঞান নয়।

বলতে গেলে শেষ হবে না। আজ এইখানেই শেষ হোক। সেই দেবী, বিশ্বশক্তি, বিশ্বজননী, বিশ্বাত্মা নববর্ষে আমাদের সকলের বিজয় করুন।

মনের ছবি

হেমলতা ঠাকুর

স্বামী, শ্বশুর হারিয়ে সংসার বন্ধন যেদিন নির্মূলভাবে ছিন্ন হয়ে গেল, দুনিয়ার দিকভোলা পথে এসে সেদিন উদাস দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়ালুম। মাথার উপর খোলা আকাশ, পায়ের তলায় শ্মশান জাগানো ধূ ধূ মাঠ ছাড়া মনের সামনে যখন আর কিছুই রইল না, মন যখন কোথায় যাবে, কি করবে কোন দিশা পাচ্ছে না, কি জানি কেমন করে কোন পথ ধরে মনের কাছে একটি ডাক এসে পৌঁছল।

ভুবনডাঙ্গার মানুষগুলি এসে বললো, আমাদের জল নাই, জলের বড় কষ্ট। সমস্ত ডাঙ্গাটার মধ্যে কুয়ো নাই, ইঁদারা নাই, একমাত্র বাঁধের জল ভরসা। এতগুলি লোকের স্নান, পান, গরুবাছুর খাওয়ান নাওয়ান, ডাঙ্গাটাকে অস্বাস্থ্যকর কোরে তুলেছে দিনে দিনে। ভুবনডাঙ্গা আমাদের বহুদিনের পরিচিত গ্রাম, গ্রামের লোকগুলি আমাদের একান্ত আপনার। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে বাঁধের জলটুকু দেখে মহর্ষিদেব তার পাশে তাঁবু ফেলে যেদিন প্রথম বসলেন, ভুবনডাঙ্গার মানুষদের সঙ্গে সেইদিন থেকে তাঁর সম্বন্ধ গড়ে উঠতে শুরু হল। সেই সম্বন্ধ স্থায়ী হয়ে গেল মহর্ষি পরিবারের সঙ্গে যেন চিরদিনের মত ভুবনডাঙ্গার লোকেদের।

দ্বারিক সর্দ্দার, সুচাঁদ, হরিশ মালী, বঙ্কু মালী, হরি, মহর্ষিদেবের সময়কার লোক। এরা সবাই জাতিতে ডোম, কেবল বঙ্কু মালি হাড়ি, এরা প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত ও প্রভুপরায়ণ। মহর্ষির সংসর্গই এদের কাছে প্রথম উচ্চশ্রেণীর মানুষের সঙ্গলাভ। শান্তিনিকেতনের পুরাতন আশ্রমবাসী লোকেরা সবাই এদের চেনেন। আমি তো শান্তিনিকেতন দর্শন ও ভুবনডাঙ্গাবাসীদের দর্শন একই সঙ্গে পেয়েছি, তাই আমার মনের কাছে এই সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

দ্বারিক সর্দ্দারের ছেলে সুচাঁদের দুই মেয়ে নীরি ও কুমি (ডাকনাম) নীচু বাংলায় আমাদের নতুন বাড়ী তৈরী হলে দুপুরে আমার কাছে এসে পড়া শিখতো। আমার বয়স তখন আঠার উনিশ হবে। তাদের এক দুই গুনতে ও অ আ পড়াতে শিখিয়ে আমার কি আনন্দ। ক্রমে দল ভারী হল, রামুর বৌ সুবাসিনী প্রভৃতি আরও কয়েকটি বৌ মেয়ে এসে জুটলো পড়ার সময়, যেন পাঠশালা বসে গেল আমাদের বাড়ীতে দুপুরে। এমনতর পড়া পড়া খেলা মনের মধ্যে কি উল্লাস জাগিয়ে তোলে যে কখনও এমন খেলা খেলেছে, এমন খেলাঘর গড়ে তুলেছে সেই তা জনে।

প্রথম শ্বশুর ঘরের আনন্দ স্ফূর্তির সঙ্গে এই সব ছোট ছোট মেয়েগুলির স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে আজও মনের মধ্যে। তারপরে স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষের স্ত্রী মনোরমা দেবী ও তাঁর বিধবা ভাগিনেয়ী প্রভাময়ী আমার কাছে ছোট্ট ইংরাজী বই নিয়ে পড়তে আসতেন। এই পড়ার সূত্রটুকু ধরে শেষে প্রভাময়ী ট্রেনিং পাশ করে কলিকাতা কর্পরেশনের ছোট ছোট স্কুলগুলিতে উচ্চবেতনে চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন গৌরবের সঙ্গে। ঘর সংসারের কাজ ছাড়া এই ছিল আমার একটা সখের কাজ, যেখানে কোন দাবী নাই অথচ কাজ আছে। আর আমার শিশুতুল্য ভোলানাথ

শ্বশুর মহাশয়কে সন্তানাধিক যত্নে লালন পালন করা ছিল আমার আর একটি পুণ্য কাজ। তাঁর সেবায় আমার কাছে স্বর্গ মর্ত্য মোক্ষ সব যেন এক হয়ে যেত। এমন বৃদ্ধ শিশু মানুষ কোথাও কখনও দেখি নাই। কি আশ্চর্য্য উজ্জ্বল জ্ঞান ভাণ্ডার সঞ্চিত ছিল তাঁর মন ও বুদ্ধিতে।

এই সব কাছের জিনিষ, কোলের জিনিষ, হাতের জিনিষ হারিয়ে যখন আমি একেবারে ফাঁকা তখন এই ভুবনডাঙ্গার লোকেরাই আমার মনের মধ্যে প্রথম সাড়া জাগাল ডাক দিল জল নেই বলে। পরদিন বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ভুবনডাঙ্গার মাঝখানে একটি ইঁদারা খোঁড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন শ্রীনিকেতনের কর্মী কালীমোহন ঘোষ। ইঁদারা খোঁড়ার চুক্তি হোল গ্রামবাসী নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ মুসলমান আতাবদ্দিনের ভাগিনেয় এবাদতের সঙ্গে চারশো টাকায়। ইঁদারা খোঁড়া দেখার একটা আকর্ষণ আছে মানুষের মনে। মাটির গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত সে যেন মানুষের মনকে টেনে নিয়ে যায়। মাটির কোলে যে একটি মাতৃস্নেহের সুন্দর স্নিগ্ধ ভাব আছে মানুষকে সেটা অনুভব করায় নিবিড়ভাবে। আমার মনে একটা ঝোঁক জাগলো, রোজ ইঁদারা খোড়া দেখতে যাওয়ার। আমার শূন্য মনে একটি সহজ শান্তির ভাব এনে দিতে লাগলো। যখনই যেতুম পাড়ার ছোট বড় মেয়েরা আমাকে ঘিরে দাঁড়াত। তারাও মন দিয়ে ইঁদারা খোঁড়া দেখতো। আমার উদাস মনে মেয়েগুলির সংসর্গ একটা সুখ জাগাতে লাগলো। ভালবাসার এ এক অপূর্ব রাগ। ক্রমে সেইখানে বসে ভুবনডাঙ্গার বুড়োরা মহর্ষিদেবের গল্প, বাবামহাশয়ের (শ্বশুর মহাশয়) গল্প আমার স্বামীর গল্প জুড়ে দিত খুসীর সঙ্গে। আমার স্বামী ভুবনডাঙ্গার লোকদের খুব ভালবাসতেন। ভুবনডাঙ্গার ডোমের ছেলে অমূল্য, বয়স কুড়ি বৎসর, আমার স্বামীর কাছে বেয়ারার কাজ করতো। তার বাপ অসুস্থ, দীর্ঘদিন ভুগছে, মুড়ি ও ভাত ছাড়া তাদের ঘরে অন্য কোন খাদ্য নাই। আমার স্বামী প্রতিদিন রাত্রে খেতে বসে নিজের খাবার কিছু কিছু তুলে অমূল্যর হাতে দিতেন। তার বাপের জন্য সে বাড়ী নিয়ে যেত। ভুবনডাঙ্গার ইঁদারা খোঁড়া দেখতে দেখতে আমার মনে পড়তে লাগলো সেই সব স্মৃতি। মনে হতে লাগলো আমার স্বামীকে যেন তাদের মধ্যে পাচ্ছি। আমার শ্বশুর পরিবারে সকলেই খুব ভৃত্য-বৎসল। মহর্ষিদেব তাঁর পুত্রেরা ও পৌত্রেরা সকলেই ভৃত্যদের প্রতি একান্ত স্নেহশীল।

একদিন এক ব্যক্তি মহর্ষির ভৃত-প্রীতি লক্ষ্য করে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন, মহর্ষির এতগুলি পুত্র, তাতেও তাঁর সাধ মেটেনি, আরও পালিত পুত্রের প্রয়োজন। আমার ভোলানাথ শ্বশুর মহাশয় টেবিলে খেতে বসে ভৃত্যের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে নিজের খাবার থেকে তুলে তাদের হাতে দিতেন। তারা সামনে দাঁড়িয়ে খাবে তাতে তিনি বড় আনন্দ পেতেন। কাকামশাই (রবীন্দ্রনাথ) ভৃত্য উমাচরণকে কি ভালবাসতেন বলার নয়। তিনি দার্জ্জিলিং যাবেন, ট্রেনে চড়েছেন, বনমালীর কি কান্না প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, কাকামহাশয় বললেন, কেঁদনা, আমার জিনিষগুলি নেড়েচেড়ে ঝেড়ে ঝুড়ে রেখ, আমিতো আবার আসবো। সে স্নেহের সম্বন্ধ. চাকর মনিব সম্বন্ধ নয়।

ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

গৌতমের ধর্মসূত্র থেকে তুলনায় অনেক অর্বাচীন যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্মশাস্ত্র পর্য্যন্ত নানা পুঁথিতে 'বাকোবাক্য' নামে বিদ্যার উল্লেখ আছে। টিকাকারেরা ব্যাখ্যায় বলেছেন প্রশ্নোত্তর রূপবিদ্যা। সহজেই অনুমান হয় বিদ্যাটি গ্রীকেরা যাকে বলেছে "দিয়ালেগ"। প্লেটোর দার্শনিক রচনার কাঠামো 'সক্রেটিক ডায়লগ' যার অতি প্রসিদ্ধ উদাহরণ। আমাদের দেশে "মিলিন্দ-প্রশ্ন" যার সুপরিচিত নমুনা। এই প্রশ্নোত্তর বা দিয়ালেগের মূল থেকেই আমাদের দেশে ও গ্রীক তর্কশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। বিতর্কে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ ভেদের স্পষ্ট নামকরণে তর্কশাস্ত্রের এই আদি ইতিহাস আমাদের দেশে বেঁচে আছে।

গ্রীক 'দিয়ালেগ' শব্দ থেকে "ডায়লেক্‌টিক" কথাটি তৈরী হয়েছে। দার্শনিক হেগেল বিশ্বের সৃষ্টিরহস্যের এক চাবি আবিষ্কার করেছিলেন। বিশ্বের এবং বিশ্বের সবকিছুর বিকাশ ও প্রকাশ হয় ত্রিকের ছকে ছকে। যে কোন বস্তু, ব্যাপার ও প্রতিজ্ঞার মধ্যেই রয়েছে একটা স্ববিরোধ। এই স্ববিরোধের চালনায় বস্তু, ব্যাপার বা প্রতিজ্ঞা তার বিপরীতে পরিণত হয়। কিন্তু 'রীত' ও "বিপরীতের" সহাবস্থানের অসংগতির তাড়নায় দু-এর মধ্যে আসে একটা সমন্বয়। এক ত্রিক সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু সমন্বয়ের মধ্যেও আবার সেই স্ববিরোধ। ফলে সমন্বয় পরিণত হয় তার বিপরীতে। এবং আবার আসে এক নূতন সমন্বয়। এইরকমে প্রতিজ্ঞা, বিরোধ ও সমন্বয়ের ত্রিকের পর ত্রিক চলতে থাকে, যতক্ষণ না পরব্রহ্ম বা 'এ্যব্‌সোলিউট্‌'-এর পূর্ণ বিকাশ হয়। যে 'এ্যাব্‌সোলিউট্‌'—থেকে গতি আরম্ভ হয়েছিল, তাতেই সব পরিণত হয়। জন্মাদ্যস্য যতঃ।

হেগেল যখন তাঁর বিশ্বসৃষ্টির এই ডায়লেক্‌টিক্ তত্ত্ব প্রথম প্রচার করেছিলেন তখন ইউরোপের অনেক দার্শনিক মহলে জয়ধ্বনি উঠেছিল। যাক, সব বোঝা গেল; রহস্য কিছু থাক্‌লো না। দার্শনিক জ্ঞান চরমে পৌঁচেছে। দার্শনিক তত্ত্বের ধ্রুব কাঠামো চিরকালের জন্য খাড়া হয়েছে। এরপর আর সব দার্শনিক চিন্তা ঐ কাঠামোর মধ্যেই খুটখাট। পরে অবশ্য 'এক চাবি-তে সব তালা খোলার' দর্শনের যা ঘটে হেগেলের দর্শনেরও তা-ই ঘটলো। অভিনবত্বের আকস্মিক চমক কাটলে সমালোচনা প্রশ্ন জাগলো এ তত্ত্বের কতটুকু তথ্য, কতটা কল্পনা। দু-একটা তালা খুলতেই সাফল্যের অত্যুন্মাদনায় চাবিকে 'মাষ্টার কি' মনে করা অবিদ্যার বিভ্রম কিনা। তর্কের শেষ থাকলো না। আক্রমণে ও সমর্থনে পুঁথিরচনা হ'লো বিস্তর। ছোট খাটো নানা দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হ'লো যেমন সৃষ্টি হয়েছে অন্যসব বড় দার্শনিকদের দার্শনিক তত্ত্ব থেকে। প্লেটোর আইডিয়া, কান্টের জ্ঞানের বিশ্লেষণ, সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষভেদ, শংকরের অদ্বৈতবাদ থেকে। হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌স তত্ত্ব হঠাৎ দর্শনের ক্লাস থেকে পলিটিক্সের ক্লাসে প্রমোশন পেলো। যা ছিল চিন্তার বস্তু, তা হ'লো কর্মের তুর্য্যধ্বনি। বিচিত্র ইতিহাস।

মার্কস্‌ আবিষ্কার করলেন মানুষের সমাজের ক্রমপরিণতির তত্ত্ব। আদিতে মানুষের সমাজে

শ্রেণী ভেদ ছিল না। একের পরিশ্রমে উৎপন্ন জীবনধারণ ও জীবনযাত্রার উপকরণ অপরে ভোগ করতো না। উৎপন্নের পরিমাণ ছিল এমন স্বল্প যে উৎপাদককে বাঁচিয়ে রাখতেই সমস্তটা নিঃশেষ হতো, ভোগের জন্য অবশিষ্ট কিছু থাকতো না। যখন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লো, বিশেষ কৃষির আবিষ্কারে, তখন একের পরিশ্রমের ফলের একটা অংশ অপরের ভোগে লাগানো সম্ভব হলো, এবং মানুষের সমাজে শ্রেণী ভেদের সৃষ্টি হলো। সাধারণের চেয়ে বুদ্ধিমান কি বলবান তারা উৎপাদনের উপায়গুলি, বিশেষ ভূমি, নিজেরা দখল করলো। তখন পরের দখলি এই উপায়গুলি দিয়ে যা উৎপন্ন হয়, প্রাণরাখার তাই উপায়। সুতরাং সমাজের সাধারণ লোকেরা বাধ্য হলো উপায়গুলির মালিকদের কাছে থেকে নানা সর্তে উপায়গুলিকে নিয়ে নিজেদের পরিশ্রমে ধন উৎপন্ন করতে, অর্থাৎ জীবনধারণ ও জীবনযাত্রার উপকরণ তৈরী করতে। এই উৎপন্ন ধনের যে অংশ ব্যয় হয় উৎপাদকদের বাঁচিয়ে ও মোটের উপর কর্মঠ রাখতে তা বাদে অবশিষ্ট ধন উৎপাদনের উপায়গুলি মালিকেরা আত্মসাৎ করতে থাকলো। মানুষের সমাজে দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। একশ্রেণী পরের হস্তগত উৎপাদনের উপায়গুলি দিয়ে পরিশ্রমে পেটভাতায় ধন উৎপন্ন করে সংখ্যায় এরা বেশী; অন্যশ্রেণী উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকত্বের জোরে অপরের পরিশ্রমের সৃষ্ট ধনের বড় অংশ ভোগ করে,—সংখ্যায় এরা অল্প। মেহনতী শ্রেণী ও মেহনতের ফলভোগী কৌশলীশ্রেণী। এই শ্রেণীভেদের ফলে, উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন ধনের বাঁটোয়ারার বিশেষত্বের ভিত্তিতে এক বিশেষ আকারের সমাজ গড়ে ওঠে। কিন্তু এরকম সমাজের সকলরকম গড়ন-ই অচিরস্থায়ী। কারণ যে উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্নের বণ্টনের ব্যবস্থা এর ভিত্তি, সে ভিত্তি স্থির নয়। তার মধ্যে থাকে একটা স্ববিরোধ। এর চালনায় উৎপাদনের চলতি উপায়গুলি বাতিল করে সমাজের একদল লোকের হাতে আবিষ্কার হয় বেশী উৎপাদনের নূতন উপায়। উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকত্ব চলে যায় সেই দলের হাতে; পূর্বের পরভুজ শ্রেণীর জায়গায় নূতন পরভুজ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। উৎপাদনের নূতন উপায়গুলির মালিকত্বের জোরে সেই শ্রেণীর লোকেরা অন্য সবাইকে পরিশ্রম করিয়ে তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে ও সমাজের কর্তৃত্ব করে। সমাজ এক নূতন গড়ন পায়। বণ্টনের ব্যবস্থায় কিছু অদলবদল হয়। কিন্তু সংখ্যায় বেশী মেহনতী শ্রেণী ও সংখ্যায় অল্প মেহনতের ফলভোগী কৌশলী শ্রেণী—এ শ্রেণীভেদ বহাল থাকে। এই নূতন সমাজের সেই স্ববিরোধ। তার ফলে সমাজের এ নূতনগড়নও ফিরে যায়। প্রচীন কৌশলীশ্রেণীকে ধ্বংস করে নূতন পরভুজ শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। যারা, নূতনতর উৎপাদনের উপায়গুলিকে আয়ত্বে এনে অন্য সকলের পরিশ্রমের ফলভোগ করে ও সমাজের কর্তৃত্ব করে। সমাজ আবার নূতন গড়ন পায়।

এমনি করে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষের তাড়নায় সমাজ গড়নের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সংঘর্ষে যে শ্রেণীর জয় হয় তাদের অস্ত্র পূর্বের চেয়ে অধিকতর উৎপাদনের উপায়ের প্রয়োগ, এবং সেই উপায়গুলির মালিকত্ব লাভ। সুতরাং শ্রেণী সংঘর্ষের ফলে উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমে বাড়তে থাকে। যাতে মেহনতী শ্রেণীকে পেটভাতার উপরে অল্প স্বল্প উপরি দিয়েও অনেক অবশিষ্ট থাকে। এবং শ্রেণীসংঘর্ষে জয়ী শ্রেণীর পর জয়ী শ্রেণী অধিকতর ধনী হয়। এ সমাজ ব্যবস্থায়

প্রচুরতম উৎপাদনের এক বড় কৌশল অতি অল্প লোকের হাতে উৎপাদনের উপায়গুলি কেন্দ্রীভূত হওয়া। যাতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ না হয়। সকলে সমানমনা ও সমানগতি হয়ে উৎপাদনের উপায়গুলিকে যদৃচ্ছা উন্নত থেকে উন্নততর করতে পারে। বহু ফলপ্রসূ উপায়ের স্থানে বহুতর ফলপ্রসূ উপায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পরিবর্তন চলতে চলতে এমন এক জায়গায় পৌঁছে যখন একদিকে আছে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক অতি ছোট এক শ্রেণী, যারা সে উপায়গুলিকে শক্তিশালী করে অমিত ধনউৎপাদনের উপযোগী করেছে, অন্যদিকে আছে সমাজের বাকী অগুন্তি মেহনতী জনতা, যারা সেই উপায়গুলি দিয়ে অফুরন্ত ধন উৎপন্ন করছে। তখন শ্রেণীর সংঘর্ষ চরমে পৌঁছে। অতি ছোট মালিক শ্রেণীর সঙ্গে অতি প্রকাণ্ড মেহনতী শ্রেণীর সংঘর্ষ। উপযুক্ত নেতৃত্বের চালনায় মেহনতী জনতা ছোট মালিক শ্রেণীকে ধ্বংস করে উৎপাদনের শক্তিশালী উপায়গুলিকে দখল করে নেয়। কৌশলী মালিকশ্রেণী নিজেদের কৌশলেই উৎখাত হয়। মানুষের সমাজে শ্রেণীভেদ লোপ হয়ে সাম্য ফিরে আসে। আরম্ভের দৈন্যের সাম্য নয়, পরিণতির প্রাচুর্যের সাম্য। অদ্বয় নির্গুণ সমাজব্রহ্ম, পরম ঐশ্বর্যশালী পূর্ণব্রহ্মে পরিণতিলাভ করে। এ তত্ত্বের কতক মার্কসের সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতির বিশ্লেষণ। বাকীটা তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী।

হেগেলের বিশ্বসৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনী ডায়লেক্‌টিক্‌স্ তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসের মানুষ্যসমাজের ক্রমপরিণতি ও চরমপরিণতি তত্ত্বের মিল আছে। সমাজের সকল অবস্থার মধ্যে স্ববিরোধ, তার ফলে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষের তাড়নে ক্রমে উন্নততর উৎপাদন-ধর্মী সমাজব্যবস্থার দিকে গতি, এবং সে গতির শেষ পর্য্যায়ে চরমসংঘর্ষে শ্রেণীসংঘর্ষের লোপ, এবং অসীম ঐশ্বর্য্যশালী সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠায় মনুষ্যসমাজের চরম পরিণতি। চোখ চাইলেই এসব মিল চোখে পড়ে। কিন্তু মার্কস্ হেগেলের সঙ্গে এসব মিলকে বিশেষ আমল দেন নাই। তিনি বলেছেন দার্শনিকেরা চায় সৃষ্টিকে বুঝতে, কিন্তু কাজের মত কাজ হচ্ছে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটানোতে। অবশ্য মানুষের কোন চেষ্টাতেই সব সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এই পৃথিবীতেই যায় না। পৃথিবীর বাইরে সৌর জগৎ। তার বাইরে নক্ষত্র জগৎ। তার বাইরে নীহারিকার জগৎ। তারও বাইরে অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত খণ্ড খণ্ড বিশ্ব। মানুষ তবুও এদের কথা জানতে চায়। কেবল দার্শনিক নয়, বিজ্ঞানীরাও চায়। জ্ঞানের এই ঔৎসুক্যকে মার্কস ছেলেমানুষী ভাবতেন কিনা বলা কঠিন। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে এরকম জ্ঞানের তত্ত্বের সঙ্গে তিনি মানুষের সমাজের ক্রমপরিণতির তত্ত্বকে এক পর্য্যায়ের তত্ত্ব মনে করতেন না। যে তত্ত্ব সমাজের পরিবর্তন ঘটাবার কৌশল বলে না সে তত্ত্ব দিয়ে তিনি কি করবেন। মার্কস ছিলেন কর্মবাদী ঋষি। হেগেলের সৃষ্টি রহস্যের ডায়-লেক্‌টিক্‌সের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কৃত সমাজের ক্রমপরিণতির ডায়লেক্‌টিক্‌সের মিল গরমিলের কথা তাঁর কাছে অবান্তর। ভগবান বুদ্ধ মানুষকে দুঃখনিবৃত্তির উপায়ের উপদেশ দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর আত্মা কি অবস্থায় থাকে সেই অবান্তর প্রশ্নকে আমল দেন নাই।

কিন্তু গুরুর উপদেশে চললে শিষ্যদের চলে না। তথাগত শিষ্যদের উপদেশ করেছিলেন নিজের মনের আলোতে পথ চিনতে, ধার করা আলোতে নয়; নিজের তপস্যায় নির্বাণ পেতে, পরের শরণ নিয়ে নয়। শিষ্যেরা ভরসা পেলে না। কল্পনায় করুণাময় বোধিসত্ত্বদের সৃষ্টি করে

তাদের শরণাপন্ন হলো।

মার্কসের সহগামী ও অনুগামীরা হেগেলের দর্শনের বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বের ডায়লেক্‌টিক্‌সের সঙ্গে মার্কসের আবিষ্কৃত সমাজের ক্রমপরিবর্তন ও পরিণতির ডায়লেক্‌টিক্‌সের মিল মার্কসের মত অগ্রাহ্য করতে পারেন না। বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে ডায়লেক্‌টিস্ সমাজের ক্রমপরিণতির মূলেও সেই ডায়লেক্‌টিকস্ এ কল্পনায় তারা মনে ভরসা পেলেন। তবে সমাজের চরম পরিণতির মার্কসের যে ভবিষ্যৎ বাণী তা সফল—'নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে, ওরে মন হবেই হবে'। কারণ সৃষ্টিরহস্যের কৌশলেই তা সফল হতে বাধ্য। তবুও হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌স্ থেকে মার্কসের ডায়লেক্‌টিকসের প্রভেদ কল্পনা না করলে চলে না।

"হেগেলের ডায়লেক্‌টিসের সংগে মার্কসের ডায়লেক্‌টিকসের বাহ্যিক মিল থাকলেও বাস্তবে তা পরস্পরবিরোধী। হেগেলের মতে, চিন্তার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিই হল বাস্তবের স্রষ্টা। হেগেল এই চিন্তাপদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'পরমভাব।' হেগেলের মতে বাস্তব জগৎ সেই 'পরমভাবেরই' বহিঃপ্রকাশ। মার্কসের মতে বাস্তব জগৎই মানবমনে প্রতিফলিত হয়ে চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। এই চিন্তাই ভাব, তা অন্য কিছু নয়। মার্কসের ভাষায় 'ভাব বাস্তবের স্রষ্টা নয়, বাস্তবই ভাবের স্রষ্টা।" *

কথার ঘোর প্যাঁচে মনকে প্রবোধ দেওয়া। কল্পিত বস্তুবাদকে হেগেলের 'ভাববাদের' গ্রাস থেকে রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা। হেগেলের চিন্তায় মানুষের মনের মননের যে ধারা, বিশ্বসৃষ্টি বিকাশের তা-ই পদ্ধতি। সুতরাং 'র‍্যাশানাল ইজ রিয়েল' মার্কসীয় দার্শনিকেরা জ্ঞানের ব্যাপারে মনের বেশী জারিজুরি স্বীকার করতে পারেন না। তাতে, তাদের বস্তুবাদ না কি ঘা খায়। সুতরাং মনকে তাঁরা কল্পনা করেন দর্পনের মত। বাইরে যা ঘটে মনে তা ঠিক তেমনি প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনই মনের চিন্তা বা মনন। সুতরাং 'রিয়েল ইজ র‍্যাশানাল'।

এ দুএর প্রভেদ এক ব্যাপারকে সামনে থেকে ও পেছন থেকে দেখার প্রভেদ। বাস্তবের ভেদ নয়। হেগেলের দর্শনে বিশ্বসৃষ্টির ডায়লেকটিক্‌সের যে পদ্ধতি, মার্কসীয় দর্শনেও সৃষ্টির ডায়লেক্‌টিক্‌সের সেই পদ্ধতি। দৌড় আরম্ভের ও দৌড়ের শেষের স্থানের অদলবদল, কিন্তু মধ্যেকার দৌড়ের পথটি এক। এবং এই পথেই ডায়লেক্‌টিক্‌সের লীলা অর্থাৎ ডায়লেক্‌টিক্‌সের লীলাই পথ। হেগেলীয় ও মার্কসীয় ডায়লেক্‌টিকসের বিরোধ বাহ্যিক ভাষার বিরোধ। বাস্তবের আন্তরিক মিলে তারা একবস্তু। সৃষ্টির রহস্যের মূলেই রয়েছে সমাজের পরিণতির মার্কসীয় ভবিষ্যৎ বাণীর সাফল্যের গ্যারান্টি। সেই ভরসার তাগিদেই মার্কসের আবিষ্কৃত সামাজিক ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌কে বিশ্বসৃষ্টির ডায়লেক্‌টিক্‌সের একাত্ম দেখার আকাংখা। যদি হেগেলের সৃষ্টি রহস্যের ডায়লেক্‌টিক্‌সের পদ্ধতি মার্কসীয় ডায়লেকটিকসের পদ্ধতির সঙ্গে এক না হয় তবে মার্কসীয় দার্শনিকদের চিন্তার মূল উদ্দেশ্যই বিফল হয়।

হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌সের বিখ্যাত প্রথম ত্রিকটি পরীক্ষা করলে কিছু আলো পাওয়া যাবে। প্রতিজ্ঞা—'বিয়িং, বিরোধী প্রতিজ্ঞা "নন্ বিয়িং' সমন্বয় "বিকামিং"। কোনও বস্তু কি ব্যাপারকে নামরূপের সীমায় বেঁধে নিশ্চিন্ত হতে না হতেই দেখা যায় যে সেই সীমার মধ্যে একরূপে অবস্থিত

পরমার্থের মত তা স্থির থাকছেনা। অর্থাৎ যা ছিল তা থেকে সে ভিন্নরূপ নিচ্ছে। যা ছিল তা যদি হয় 'বিয়িং' তবে তার ভিন্নরূপকে বলতে হয় "নন্ বিয়িং"। কিন্তু এই "বিয়িং" ও 'নন্ বিয়িং' রূপ ও ভিন্নরূপ, দু-এর কোনটাই নামরূপের অছিদ্র সীমানার মধ্যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন স্বপ্রতিষ্ঠ বস্তু নয়। রূপেরই পরিবর্তন হচ্ছে ভিন্নরূপে। সুতরাং রূপ ও ভিন্নরূপের সমন্বয় হচ্ছে এই পরিবর্তমানতা। থিসিস বা প্রতিজ্ঞা 'বিয়িং', এ্যান্টিথিসিস বা বিরোধী প্রতিজ্ঞা—'নন্ বিয়িং', এদের সমন্বয় বা সিন্‌থেসিস্ হচ্ছে পরিবর্তনমানতা—'বিকামিং। কিন্তু এ সমন্বয়ও অ-স্থির। এই রকমে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর সমন্বয়ের ধারা চলেছে যে পর্যন্ত না বিশ্বইতিহাসে এ্যব্‌সেলিউট্ বা ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশে "একরূপেণ অবস্থিতো যোঽর্থঃ সঃ" পরমার্থে—ডায়লেকটিক্‌সের গতির অবসান হয়।

দার্শনিক মায়ায় দৃষ্টিবিভ্রম না ঘটলে দেখা কঠিন নয় যে 'বিকামিং—"বিয়িং' ও "নন-বিয়িং' এর সমন্বয় নয়, 'বিকামিং'কে বিশ্লেষণ করেই, মানুষের বুদ্ধি "বিয়িং" ও "নন বিয়িং' পেয়েছে। বাস্তবে 'বিকামিং', "বিয়িং" ও "নন বিয়িং" এর সমন্বিত রূপ নয়। বাস্তবে আছে 'বিকামিং', পরিবর্তমান ঘটনা। সেই 'বিকামিং'-কে নিজের আয়ত্বে আনার জন্যই, মানুষ বুদ্ধির কাঠামোয় তাকে দুভাগ করে দেখে। বক্র রেখার দৈর্ঘ মাপতে তাকে বহু ছোট সরল রেখার সমষ্টি ধরে নিলে মাপার সুবিধে হয়। কিন্তু বাস্তবে বক্ররেখা বক্ররেখাই, সরল রেখার সমষ্টি নয়। নিজের প্রয়োজনে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে মানুষের বুদ্ধি প্রয়োজনের অনুকূল যে সব উপাদান তাকে ভাগবিভাগ করে দেখে বাস্তবের সেই কল্পিত মূর্তি প্রয়োজনের সীমার মধ্যে সত্য মনে করলে প্রয়োজনসিদ্ধি সুসাধ্য হয়। কিন্তু তার বাইরে তাকে বাস্তবে সত্য মনে করলে কেবল বুদ্ধির 'রিডিল্‌স্' বা ধাঁধার সৃষ্টি হয়। অতি মন্দগতি শামুক দুহাত এগিয়ে থাকলে তড়িৎগতি অ্যাকিলিস্ দৌড়ের প্রতিযোগিতায় কি করে তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, দেশ ও কালের বিভাজ্যতা যখন অনন্ত? পরমাণুর অণুবিভাজ্যতা স্বীকার করতেই হবে, নইলে পর্বত ও সরষে-কণার সমপরিমাণত্ব এড়ান যায় না। এসব কৌতুকরহস্যের সৃষ্টি হয়, যা ব্যবহারিক ও আপেক্ষিক তাকে পারমার্থিক চরম সত্য জ্ঞানে বিচারে প্রবৃত্ত হলে। এক বস্তুর উপর ভিন্ন বস্তুর অধ্যাস মায়া ও মিথ্যা জ্ঞানের মূল।

ডায়লেক্‌টিকসের পদ্ধতি সৃষ্টির পদ্ধতি নয়। সৃষ্টিকে বুদ্ধির আয়ত্তে আনার প্রয়োজনে মানুষের মনের পদ্ধতি। অখণ্ডের এককে খণ্ডত্বের বহুত্বে পরিণত না করলে মানুষের কাজ চলে না, কি বুদ্ধির কাজ কি সংসারিক কাজ। তাই বলে বাস্তবে এক-অখণ্ড বহু খণ্ডের সমষ্টি নয়। কিন্তু হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌স্ এ বিতর্কে টলে না। তার দর্শনের 'ক্রেডো' হল যা মননের পদ্ধতি তারই বহিঃপ্রকাশ সৃষ্টির পদ্ধতি। কিন্তু বস্তুবাদী মার্কসীয় দার্শনিকেরা হেগেলের এই ভাববাদ-স্বীকার করতে পারেন না। তাঁদের কি উপায়? উপায় খুব সোজা। হেগেলের দর্শনের 'ক্রেডো'কে উল্টে নিয়ে মার্কসীয় দর্শনের "ক্রেডো" করলেই হলো। বাইরের সৃষ্টি মানুষের মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত ছবিই মানুষের মনন, চিন্তা বা ভাব। সুতরাং মননের পদ্ধতি যদি হয় ডায়লেক্‌টিক্ তবে প্রকৃতির সৃষ্টির পদ্ধতিও হবে ডায়লেক্‌টিক্। নইলে মনে সে ডায়লেক্‌টিক্ আসে কেমন করে?

মার্কসিষ্ট দর্শনের স্বরূপ থেকে এই উৎপত্তির অনুমান সহজ। কিন্তু অনুমান নিষ্প্রয়োজন। মার্কসিষ্ট দর্শনের আদি দার্শনিক এঙ্গেলস্‌-এর কথা একটু তুলে দিচ্ছি।—

"ডায়লেক্‌টিক্‌সের নিয়মগুলি প্রকৃতি ও মানুষের সমাজ এ দু-এর ইতিহাস থেকে নিষ্কাশিত। কারণ এ নিয়মগুলি এই দুই ঐতিহাসিক ও চিন্তার বিবর্তনের সব চেয়ে সাধারণ নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়।···এ সব নিয়মই হেগেল তাঁর ভাববাদী কায়দায় চিন্তা বা মননের নিয়মরূপে উদ্‌ঘাটন করেছেন।···তাঁর ভুল এই যে তিনি এ নিয়মগুলি প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাস থেকে অনুমিত নিয়ম মনে না করে চিন্তার পদ্ধতিরূপে সেই ইতিহাসেরই ঘাড়ে চাপিয়েছেন। এই নিয়মগুলির আলোচনায় হেগেলের কষ্টকল্পনা ও টানা হেঁচড়ার মূল এইখানে। বিশ্বসৃষ্টিকে গায়ের জোরে একটা চিন্তা-পদ্ধতির অনুরূপ দেখাবার চেষ্টা যা মানুষী-চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাস তার একটা বিশেষ ধাপে সৃষ্টি করেছে। জিনিষটিকে যদি আমরা উল্টে নেই তবে সবই সরল ও সহজ হয়। যে ডায়লেক্‌টিক্‌সের নিয়মগুলি ভাববাদী দর্শনে গুহাহিত রহস্যের মত দেখায়, তা তৎক্ষণাৎ মধ্যাহ্ন দিনের মত সহজ ও সুস্পষ্ট দর্শন হয়।" ৭

জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের মন যে ফটোগ্রাফিক প্লেট নয়; নানা তাগিদে, বিশেষ জৈব প্রয়োজনের তাগিদে, মানুষের মন যে বহিঃপ্রকৃতিকে তার কার্যসিদ্ধির অনুকূল নানা আকার দিয়ে গড়ে তোলে, এবং সেই মনগড়া জ্ঞানকে মন-নিরপেক্ষ প্রকৃতিতে আরোপ করে—সাম্প্রতিক কালে ফরাসী দার্শনিক বের্গসোঁ তার বিশদ আলোচনা করেছেন। কিন্তু বের্গসোঁ বুর্জোয়াঁ সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক। মার্কসপন্থীদের হারাম। তাঁর কোনও চিন্তা সত্যের বিকৃতি না হয়ে পারে না, কারণ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সে চিন্তা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সমর্থক হবেই হবে।

মানুষের মনকে ইস্পাতের জালে ঘিরে একদিকে ছাডা অন্য সবদিকে তার গতি রুদ্ধ করার প্রকৃষ্ট সর্বনাশা উপায়। পদ্মকে সুদৃশ্য সুগন্ধ স্বীকার করা চলবে না, কারণ মূল তার কাদায়। ডায়লেক্‌টিক্‌সের পদ্ধতি যদি সৃষ্টির পদ্ধতি হতো, তবে সে ইলেকট্রিক টর্চের আলোতে বিজ্ঞানীরা এতদিন অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে ফেলতেন। কিন্তু কোনও বিজ্ঞানী এরকম কাজ করছেন বলে শোনা যায় নাই। এঙ্গেলস্‌ একটা উদাহরণ দিয়েছেন। রুশ রসায়নাচার্য্য মেন্ডেলিয়েফ্‌ নাকি তাঁর 'পিরিওডিক্‌ ল' আবিষ্কার করেছিলেন নিজের অজান্তে হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌সের এই সূত্রটি মেনে, যে বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন বাড়তে বাড়তে হঠাৎ তার গুণগত পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানে কাকে বলে বস্তু, কাকে বলে পরিমাণ, কাকে বলে গুণ তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'অজান্তে' করেছিলেন কথার নির্গলিতার্থ এই যে মেন্ডেলিয়েফ এ আলোতে আবিষ্কার করেন নাই। করেছিলেন অন্যরকম চিন্তায় চালিত হয়ে। এঙ্গেলস কল্পিত টর্চটি রুশ রাসায়নিকের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। সৌভাগ্যের কথা যে হালের মার্কসপন্থী রাষ্ট্রগুলির বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় ডায়লেকটিক্‌সের বাঁধা সড়কে চলছেন না। বুর্জোয়া দেশের বিজ্ঞানীদের মতই বিজ্ঞানের ঋজু, কুটিল, বাঁধা, মেঠো বিশেষ বিশেষ পথেই চলেছেন। যে সব পথ বিজ্ঞানের প্রয়োজনে নিজেদেরই তৈরী করতে হয়; পূর্বে থেকে বিশ্বসৃষ্টি রহস্যজ্ঞ ঋষিরা তৈরী করে রাখেন নাই। তার এক কারণ অবশ্য যে অনেক বিজ্ঞান-ই দৃষ্টফল। ফল যদি না পাওয়া যায় তবে পরম পবিত্র পথকেও

নমস্কার করে বিজ্ঞানীদের অন্য পথে চলতে হয়। মার্কসিষ্ট রাষ্ট্রনেতাদের বাধা দেবার উপায় নাই। কারণ ফলের লোভ তাঁদেরই সবচেয়ে বেশী।*

মার্কস মানব-সমাজের ক্রমপরিবর্তনের যে নিয়ম দেখেছিলেন, এবং যার উপর তিনি তাঁর 'বহুজনহিতায়' সমাজবিপ্লবের কর্মপদ্ধতির খসড়া করেছিলেন, তা জড় প্রকৃতির সৃষ্টি পদ্ধতির ডায়লেক্‌টিক্যাল অডায়লেক্‌টিক্যাল রূপের ওপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। তার মূল নিপীড়িত মানুষের প্রতি মার্কসের মনে মৈত্রী ও করুণা। সে মৈত্রী ও করুণার ডায়লেক্‌টিক্যাল ব্যাখ্যা কোনও মার্কসিষ্ট দার্শনিক করেছেন কিনা জানিনা। এঙ্গেলস্ সত্য কথাই বলেছিলেন যে মার্কস প্রতিভাবান। তাঁর সহগামী ও অনুগামীরা বুদ্ধিমান মানুষ মাত্র। প্রতিভার এক পরিচয় কার্যসিদ্ধির জন্য যা অবান্তর তার উপর ঝোঁক না দেওয়া। বুদ্ধিমান চেলারাই গুরুর বাক্যকে বিশ্বগ্রাসী করার লোভে তাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে অবাস্তবের সীমায় নিয়ে যায়।

* শ্রীমনোরঞ্জন রায় প্রণীত "দর্শনের ইতিবৃত্ত" দ্বিতীয় পর্ব, ১৫২ পৃঃ

† এঙ্গেলসের 'ডায়লেক্‌টিকস্ অফ নেচার'। ১৯৪০ সালে ইংরাজী অনুবাদ—১৬-২১ পৃঃ

শব্দকথায়—প্রতিভাসিক সম্বন্ধ

ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মায়াময় এই সংসারে সর্বত্রই মায়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মায়ার প্রসাদেই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, মরীচিকায় স্রোতস্বতীভ্রম হয়। শব্দরাশিও এই মায়াপাশ অতিক্রম করিতে পারে না। এই কারণে অনেক স্থলে পরস্পর অসম্বদ্ধ শব্দগুলিও সুসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন ভাষা হইতে এইরূপ কয়েকটী শব্দের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বাব ও বাবা

তৈত্তিরীয়সংহিতা-প্রভৃতি গ্রন্থে অবধারণার্থক বা বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত বাব এই নিপাত মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃত 'বা' এই নিপাতের দ্বিত্ব করিয়া বাব হইয়াছে মনে হয়। ইহার সহিত বাংলার বাবাশব্দের কোন সম্বন্ধ নাই। দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের গীতা ব্যাখ্যা ভূমিকায় ১৮/ পৃষ্ঠে দেখা যায়—কোথাও বাব অর্থাৎ বাবা বা বৎস বলিয়া শ্রোতাকে সম্বোধন করিয়া সে উপদেশ দিয়াছেন. যেমন অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ ইতি।

ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডে আছে—মঘবন্ মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্। আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্। ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতং।

হে ইন্দ্র, এই শরীরটী মরণধর্মী, সর্বদা মৃত্যুদ্বারা গৃহীত। সেই অমরণধর্মী ও অশরীরী আত্মার ইহাই অধিষ্ঠান। শরীরবিশিষ্ট আত্মাই প্রিয় ও অপ্রিয়কর্তৃক আক্রান্ত (সুখ ও দুঃখের অধিকারভুক্ত কেন না যতক্ষণ শরীর থাকে, ততক্ষণ প্রিয় বা অপ্রিয়ের বিনাশ হয় না (সুখ দুঃখের পাশ হইতে মুক্তি নাই)। শরীরশূন্য হইলেই প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না (তাহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না।)

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বাক্যের মধ্যস্থিত অপাদাদিস্থিত সম্বোধন পদ অনুদাত্ত হয়। বাবশব্দের অনুদাত্ত হওয়া ত দূরের কথা একটী স্বরের স্থলে ইহার দুইটী স্বরই উদাত্ত। সুতরাং ইহার অর্থ কিছুতেই বাবা বা বৎস হইতে পারে না।

পর ও অপর

সংস্কৃত ব্যাকরণে সর্বনামসংজ্ঞক শব্দের তালিকায় পর ও অপর এই দুইটি শব্দই পঠিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পর্যাপ্ত অপর্যাপ্ত, কুমারী অকুমারী প্রভৃতি শব্দনিচয়ের ন্যায় পর অপর এই দুইটী শব্দও একার্থবোধক। মনে হয় এস্থানে অ-টী নিষেধার্থক নহে, অবধারণার্থক (intensive)। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। পরশব্দের প্রাথমিক অর্থ দূর, ইংরাজী far ও fore শব্দের ইহা জ্ঞাতি। দূর হইতে অর্থ হইল দূরবর্ত্তী, পরবর্ত্তী, ভবিষ্যৎ, তাহা হইতে অর্থ হইল অন্য।

এক—নিকটবর্ত্তী, পর—দূরবর্ত্তী অর্থাৎ অন্য, তাহা হইতে অর্থ হইল অপরিচিত, তাহা হইতে অর্থ হইল শত্রু। অন্যদিকে আবার দূর, দূরতর হইতে অর্থ হইয়াছে শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট

ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী শব্দ—অবর। পৃ ধাতুর অর্থ পার হওয়া (ইরাজী ferry) তাহা হইতে 'পর' শব্দ আসিয়াছে। ঋগ্বেদে (২।১২।৮) আছে—

যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে
পরেইবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা
নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ।

যাঁহাকে উচ্চশব্দকারী সেনাদ্বয় দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী উভয় শত্রুই একত্র হইয়া বিবিধভাবে আহ্বান করিয়া থাকে, দুই জনে একই রথে আরোহন করিয়া যাঁহাকে পৃথগভাবে আহ্বান করিয়া থাকে, হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র।

অপ-শব্দের উত্তর রপ্রত্যয় করিয়া অপর হইয়াছে। ইহা পূর্বশব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার অর্থ—পশ্চাদ্বর্ত্তী, পরবর্ত্তী কালের, তাহা হইতে অর্থ হইল—পরবর্ত্তী অন্য। ঋগ্বেদে আছে (১।১২৪।৯)—

আশাং পূবাসামাহস্ব স্বসৃণা-
মপরা পূর্বামভ্যেতি পশ্চাৎ।
তাঃ প্রত্নবন্নব্যসীর্নূনমস্মে
রেবদুচ্ছন্তু সুদিনা উষাসঃ॥

এই প্রাচীন ভগিনীগণের মধ্যে পূর্ববর্তিনী প্রতিদিন পরবর্তিনীর পশ্চাতে আগমন করেন। এই নূতন উষারা পূর্ব্বকালের ন্যায় এক্ষণেও আমাদিগের উপর ধন ও সুদিন বর্ষণ করুন।

উপম ও উপমা

এই শব্দ দুইটী প্রথম দর্শনে সম্বন্ধ বলিয়া মনে হয়' কারণ উপমাশব্দ বহুব্রীহি সমাসের শেষে থাকিলে উপম আকার ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটির কোন জ্ঞাতিত্ব নাই। উপ-শব্দের উত্তর ম (তম) প্রত্যয় করিয়া উপমশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহার অর্থ—উচ্চতম। উপ-পূর্বক মা ধাতুর উত্তর অঙ্‌ প্রত্যয় করিয়া উপমা হইয়াছে। ইহার অর্থ সাদৃশ্য।

লক্ষ্মী ও Lucky

সংস্কৃত লক্ষ্মী-শব্দের সহিত ইংরাজী Luck বা Lucky শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে Lucky শব্দটি লক্ষ্মীর অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।

বর্তমানকালে লক্ষ্মীর বরপুত্র হইতে কাহার না বাসনা হয়? ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভের কথাও প্রায়ই শোনা যায়। লক্ষ্মী বলিলে আমরা সম্পদ্‌ ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুঝিয়া থাকি। লক্ষ্মীশব্দের প্রাথমিক অর্থ কিন্তু চিহ্ন, লক্ষণ, নিমিত্ত। 'পাপা' লক্ষ্মী বলিতে অশুভ নিমিত্ত 'পুণ্যা লক্ষ্মী' বলিতে শুভ লক্ষ্মী বোঝাইত। ক্রমশঃ লক্ষ্মী-শব্দের অর্থ হইল—সৌভাগ্য, সম্পদ, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বেদে যিনি উষা ছিলেন, পুরানে তিনি লক্ষ্মী হইলেন। ইংরাজীতে luck শব্দের প্রথমতঃ অর্থ ছিল দৈব, ভাগ্য, যেমন good luck, bad luck, hard luck, try one's luck, as luck would have it ক্রমশঃ অধিকাংশ

স্থানেই শব্দটী সৌভাগ্য অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল, যেমন to have no luck, some people have all the luck, to be in luck, to be off one's luck, for luck ইত্যাদি। Luck শব্দটি জার্মান্ ভাষায় Glueck আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। সম্ভবত প্রাচীন জার্মান lockon (আকর্ষণ করা, ভুলাইয়া আনা) হইতে Luck আসিয়াছে। লক্ষ ধাতু হইতে লক্ষ্মী আসিয়াছে। লক্ষ্য শব্দও এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াচে। লক্ষ্মী শব্দের অর্থ যাহা কিছুতে আটকাইয়া থাকে অথবা আটকাইয়া দেওয়া হয়, চিহ্ন। তাহার পর অর্থ যাহা হইতে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয়, পণ। সেকালে সম্ভবত লক্ষ টাকা পণ হইত। ক্রমশঃ লক্ষ শব্দের অর্থ হইল শত সহস্র।

Character ও চরিত্র

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি সংস্কৃত চরিত্র ও ইরাজী character একই মূল শব্দের বিভিন্ন রূপ, কেন না শব্দ দুইটীর মধ্যে অর্থগত বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্তমান আছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শব্দ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

চর্ ধাতুর অর্থ—বিচরণ করা, চলা; এই চর ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ইত্র প্রত্যয় করিয়া চরিত্র হইয়াছে। অর্থ—যাহার দ্বারা বিচরণ করা যায়, অর্থাৎ পা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চরিত্র শব্দের প্রাথমিক অর্থ—চরণ। ঠিক এই ভাবে গত্যর্থক ঋ ধাতুর উত্তর ইত্রপ্রত্যয় করিয়া অরিত্র হইয়াছে, অর্থ যাহার দ্বারা নৌকা গমন করে অর্থাৎ দাঁড়। গ্রীক্ ভাষায় ইহা আরোত্রোন্ ও লাটিন ভাষায় আরাত্রুম্ আকারে দৃষ্ট হয়। অর্থ—লাঙ্গল। বহনার্থক বহ্ ধাতুর উত্তর ইত্র প্রত্যয় করিয়া বহিত্র হয়, অর্থ—যাহা বহন করে অর্থাৎ গাড়ী। (Lat vehiculum ইংরাজী vehicle.) ছেদনার্থক লূ ধাতুর উত্তর ইত্র প্রত্যয় করিয়া লবিত্র হইয়াছে, অর্থ—যাহা দ্বারা খনন করা যায়। পাণিনি ইহাদের জন্য সূত্র করিয়াছেন অর্তিলূধূসূখনসহচর ইত্রঃ ৩।২।৪৮৪

সুতরাং দেখা গেল চরিত্রশব্দের প্রাথমিক অর্থ চরণ। বেদে আমরা এই অর্থেই চরিত্র-শব্দের প্রয়োগ পাই। যেমন, চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণম্—পাখীর ডানার মত বিশ্‌পলার পা ছিন্ন হইয়াছিল। তাহার পর চরিত্র শব্দের অর্থ হইল—কার্যক্ষেত্রে বিচরণ অর্থাৎ আচরণ, কার্য কলাপ ইংরাজীতে যাহাকে behaviour বা conduct বলে। সংস্কৃতে character বা স্বভাব অর্থে চরিত্র শব্দ সাধারণতঃ দেখা যায় না, এই অর্থে কখন কখন চারিত্র শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই জন্য বাংলায় আমরা বলি স্বভাব চরিত্র—character and conduct,

ইংরাজীতে character শব্দটী গ্রীক্ খর্ ধাতু (kharassein) হইতে আসিয়াছে। ধাতুটীর অর্থ ধারাল করা, অঙ্কিত করা ক্ষোদিত করা। এই ধাতুনিষ্পন্ন গ্রীক্ kharakter শব্দের অর্থ—প্রথমতঃ চিহ্ন, চিহ্ন অর্থে শব্দটী ব্যবহৃত হইত। বর্ণমালা বা অক্ষরকে এখনও character বলা হয়। তাহার পর অর্থ হইল বিশেষক চিহ্ন, বিশেষ গুণ। তাহার পর অর্থ হইল—বিশেষ গুণসমূহের সমষ্টি, স্বভাব, প্রকৃতি।

Butter ও Buttery

Butter (মাখন) ও Buttery (খাদ্য রাখিবার স্থান) এই দুইটি শব্দের জন্মগত কোন সম্বন্ধ নাই। যেখানে কাকজাতীয় rook-এরা থাকে তাহাকে rookery বলা হয়, যেখানে কাটিবার যন্ত্রপাতি থাকে তাহাকে cutlery বলে, যেখানে রুটি প্রভৃতি থাকে তাহাকে pantry বলে, আর যেখানে বোতল, পিপা, প্রভৃতি থাকে তাহাকে buttery বলে। যেখানে শুধু butter বা মাখন থাকে তাহাকে buttery বলে না, pantry-তেই butter থাকে। সুতরাং butter শব্দের সহিত buttery-র কোন সম্বন্ধ নাই। Bottle ও butler শব্দ Buttery-র জ্ঞাতি। ফরাসী ভাষায় bouteillerie (যে স্থানে বোতল পিপা প্রভৃতি রাখা হয়) হইতে Buttery আসিয়াছে।

Pan ও Pantry

অনেকের ধারণা যেখানে pan বা কড়া থাকে তাহাকে pantry বলে, কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ল্যাটিন panetus শব্দের অর্থ ছোট রুটি, সুতরাং যেখানে রুটি প্রভৃতি থাকে তাহাকে pantry বলে।

রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস

রথীন্দ্রনাথ রায়

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিনবত্বের সঞ্চার করেন, প্রায় অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী মোটামুটি সেই ধারাই কথা-সাহিত্যের গতি নির্দেশ করেছিল। এই পর্বের উপন্যাসের মধ্যে প্রধানত দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়—ইতিহাস-মিশ্র রোমান্স-নির্ভর আখ্যায়িকা ও সমাজ-সমস্যা-মূলক উপন্যাস। বঙ্কিম-পর্বের বাংলা কথাসাহিত্যের দু'টি ধারাই রমেশচন্দ্রের উপন্যাসকে পরিপুষ্ট করেছিল। ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য রমেশচন্দ্র ইংরেজীতেই সাহিত্যচর্চা সুরু করেন, কিন্তু তাঁকে মাতৃভাষায় সাহিত্যসেবায় অনুপ্রাণিত করেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। এই অবিস্মরণীয় ঘটনার প্রায় তেইশ বছর পরে রমেশচন্দ্র নিজেই বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উৎসাহ-বাণীর কথা স্মরণ ক'রেছেন: These words created a deep impression in me and two years after this conversation, my first Bengali Work, 'Banga Bijeta', was out in 1874.

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণার কথাই এখানে বলা হয়েছে, কিন্তু কার্যতঃ শুধু প্রেরণা নয়, বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রভাবও তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশ্য ইতিহাসের ওপর বাল্যকাল থেকেই তাঁর একটি গভীর আকর্ষণ ছিল। স্কট ছিলেন তাঁর প্রিয়তম লেখক। স্কটের উপন্যাসের মধ্যযুগীয় পটভূমিকা, বর্ণ-বিচিত্র ঐতিহাসিক রোমান্স ও বীরযুগের রোমাঞ্চকর জীবনচর্যার ছবি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস রমেশচন্দ্রের ইতিহাস-রস-রসিকতাকে পরিতৃপ্ত ক'রেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন: I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for histry, or if my taste for history made me an admirer of Scott; but no subject, not even poetry, had such a hold upon me as history.

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার আদর্শ স্কট। তবে এ কথাও যথার্থ যে, যে সময় তিনি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন, তখন বাংলাসাহিত্যে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস প্রকাশিত হয়—'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'। স্কটের উপন্যাস ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সচেতন সংস্কার যে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল, তার প্রমাণ তাঁর প্রথম উপন্যাসেই লক্ষণীয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনায় দশ বছরের মধ্যে অনেকেই বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন।

তথাপি রমেশচন্দ্রের পথ স্বতন্ত্র। সেকালের অধিকাংশ ইতিহাসমিশ্র কাহিনী রচয়িতাদের মত রমেশচন্দ্র ইতিহাসের মধ্যে সুলভ রোমান্স-রসের অনুসন্ধান করেননি। রোমান্স পিপাসা তাঁরও ছিল, কিন্তু তাকেই তিনি চূড়ান্ত ক'রে তোলেন নি। দূর অতীতের কুহেলি-মণ্ডিত রোমান্সের দিগন্ত থেকেই তাঁর যাত্রা সুরু, কিন্তু তার বৃহত্তর পরিণতি অকুণ্ঠ দেশপ্রেমিকতায়, দেশের লুপ্ত-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায়—এখানে তিনি যথার্থই চারণ-কবির ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রমেশচন্দ্র চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখছেন—'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪) 'মাধবী

কঙ্কন' (১৮৭৭) 'জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮) ও 'জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯)। উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক গতির দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে যে ঐতিহাসিক রোমান্সকে কাটিয়ে ক্রমাগত ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার দিকেই ঔপন্যাসিকের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই চারখানি উপন্যাস একত্রিত ক'রে শতবর্ষ নামে প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৭৯)। 'শতবর্ষ' নামকরণ থেকে মনে হয় একশো বছরের ভারত-ইতিহাস নিয়ে ঐতিহাসিক কাহিনীবৃত্ত রচনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য অতি ক্ষীণ সূত্রাকারে কাহিনীগুলির মধ্যে সংযোগ থাকলেও, স্বতন্ত্র উপন্যাস হিসেবেই এদের আসল মূল্য। 'বঙ্গ বিজেতা'র ঘটনাকাল ১৫৮০-৮২, টোডরমলের তৃতীয়বার বাংলায় আগমনের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। ঘটনাকালের দিক থেকে 'জীবন-সন্ধ্যা' 'বঙ্গ বিজেতার'ও পূর্ববর্তী—এখানকার কাহিনী সুরু হ'য়েছে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আহেরিয়া উৎসব থেকে। ঘটনাকালের দিক থেকে 'মাধবী-কঙ্কন'-এর স্থান তৃতীয়। তখন শাজাহানের রাজত্বকাল, সুজা বাংলাদেশের সুবাদার। রাজসিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ ও ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন প্রাপ্তিতে কাহিনীর উপসংহার। উপন্যাসটির ঘটনা-পরিধি প্রায় চার পাঁচ বছর (১৬৫৩-১৬৫৭)। শতবর্ষের শেষাংশ 'জীবন-প্রভাত'-এর কথাবস্তু। ১৬৬৩ থেকে কাহিনীর আরম্ভ—ঔরঙ্গজেব ও শিবাজির কাহিনীই 'জীবন-প্রভাত'-এর অভিষেক (১৬৭৪) কাল পর্যন্ত শতবর্ষের কাহিনী-চক্র। কিন্তু চারখানি উপন্যাস একত্রিত ক'রে 'শতবর্ষ' নাম দেওয়ার খুব বেশী যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। এর কারণ, শতবর্ষের গ্রন্থন-বিন্যাসের শিথিলতা, দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতিগত দিক থেকে উপন্যাস চারখানির মধ্যে পার্থক্য প্রচুর।

'বঙ্গ-বিজেতা' রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। আখ্যায়িকা অংশের কেন্দ্র তিনটি মুঙ্গের, ইচ্ছাপুর ও চতুর্বেষ্টিত দুর্গ। মুঙ্গেরের কাহিনীর মধ্যেই অনেকটা ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস অংশের নায়ক রাজা টোডরমল্ল। কিন্তু এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্রটিকে নিতান্তই নিষ্প্রভ মনে হয়। তাঁর গুণাবলী ও ব্যক্তি-চরিত্রের বর্ণনা লেখকের মুখ থেকেই যতটুকু শোনা যায়, তার বেশী প্রত্যাশা করাও ঠিক নয়। কারণ চরিত্রটির অন্তর্জীবন বলে কোন বস্তুই নেই। ঔপন্যাসিক যে কথা বিস্তৃতভাবে বলার চেষ্টা করেছেন, টোডরমল্লের চারিত্রিক ব্যঞ্জনা থেকে তা উদ্ভূত হয় নি। কাহিনীর প্রথমেই লেখক তাঁর আখ্যায়িকা-সম্পর্কে একটি আভাস দিয়াছেন: 'কি প্রকারে এই নিঃশঙ্ক বীরপুরুষ তৃতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করিয়া বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ শাসন করেন, তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে।" কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্রের অস্পষ্টতার জন্য লেখকের এই উদ্দেশ্যটি সফল হয়ে উঠতে পারে নি—তা ছাড়া চরিত্রটিকে যুগ-জীবনের প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে অনিবার্যভাবে সংযুক্ত করা হয় নি।

ইচ্ছাপুর ও চতুর্বেষ্টিত দুর্গের কাহিনীকে প্রধানত কাল্পনিক কাহিনী বলা যায়। তবে এই কাহিনী দু'টি নিতান্ত শূণ্যগর্ভ ও নিরালম্ব রোমান্স মাত্র নয়। এই সময় প্রায় সাড়ে তিন বছর তিনি রাজকার্য উপলক্ষে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেন। (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩—৩০শে আগস্ট, ১৮৭৬)

স্থানীয় জনশ্রুতি ও লৌকিক কাহিনীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। চতুর্বেষ্টিত দুর্গের

আধুনিক নাম চৌবেড়ে—ইতিহাস ও জনশ্রুতি-মিশ্রিত নানাকাহিনী সেখানে প্রচলিত আছে। আসল কথা 'বঙ্গ বিজেতা' উপন্যাসের উপাদান অংশ তিনটি—ইতিহাস' লৌকিক কাহিনীও কল্পনা। রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কোলাহল-মুখর রাজপথ ও এর জনবিরল গলিপথ সম্ভবত দু' ধারার মধ্যে একটি সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি আলোকরঞ্জিত রাজপথেরই যাত্রী, কিন্তু, আশে-পাশের অনভিজাত গলিপথও তাঁর কাছে এক বিস্মৃত দিনের ছায়া-দীর্ঘ কম্পমান যবনিকা ব'লে মনে হ'য়েছে। রমেশচন্দ্র কৌতূহলী হ'য়ে সেই যবনিকা-প্রান্ত উত্তোলন করেছেন মাত্র, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করেন নি। সে দায়িত্ব পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে পালন ক'রেছেন।

টোডরমল্লকে বাদ দিলেও অন্যান্য চরিত্রও তেমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারে নি। দেশ-কালের অতিরিক্ত কতকগুলি প্রাণহীন পুতুল হ'য়ে উঠেছে মাত্র। এমন কি কাহিনীর অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র ইচ্ছাপুর জমীদারপুত্র ইন্দ্রনাথ, সর্বত্র উপস্থিত আছেন বটে, কিন্তু কোথায়ও তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে নি। শকুনি 'ভিলেন' চরিত্র, কিন্তু সেখানেও জীবনবোধ-বিবর্জিত একটি টাইপ চরিত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সে মানুষের পাশববৃত্তির হাতিয়ার মাত্র—যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, তাতে রক্ত-মাংসের মানুষ বলেই মনে হয় না। মহাশ্বেতা চরিত্রের সহন-শীলতা, আভিজাত্য ও প্রতিহিংসাবৃত্তি খানিকটা মানবীয় মর্যাদা দিয়েছে। 'শকুনি ও' 'মহাশ্বেতা' এই দু'টি নামকরণের মধ্যে যথাক্রমে মহাভারত ও কাদম্বরীর প্রভাব আছে—সম্ভবত এই দু'টি চরিত্রের খানিকটা বৈশিষ্ট্যও সঞ্চারিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এই দু'টি ক্লাসিক চরিত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নয়।

কাহিনীর মধ্যে দুর্বলতম অংশ উপেন্দ্রনাথ ও কমলার আখ্যায়িকাটি। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সর্বসম্পর্ক-বর্জিত এই চরিত্র, দু'টী নিতান্ত অস্বাভাবিকভাবে কাহিনীর বৈচিত্র্যবৃদ্ধি ক'রেছে। বহিরাশ্রয়ী ঘটনার অকারণ চমকসৃষ্টি উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত গতিবেগকে পদে পদে খর্ব করেছে। অলৌকিকত্ব, আকস্মিকতা কাহিনীকে সমতালমণ্ডিত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছে। বিশ্বেশ্বর পাগলিনীর দৈবশক্তি ও তার বাস্তব পরিচয়টির মধ্যে একটি প্রবল বিরোধ আছে। 'বঙ্গ বিজেতা'র ওপরে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রভাব স্পষ্ট—মহাশ্বেতা যেন বিমলা ও বিমলা যেন আয়েসার প্রতিচ্ছবি হ'য়ে উঠেছে। 'বঙ্গ বিজেতা' অবিমিশ্র রোমান্স,—কিন্তু এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার মধ্যেও রমেশচন্দ্র যে ইতিহাস আনুগত্য দেখিয়েছেন তা বঙ্কিমের চেয়ে সত্যনিষ্ঠা ও স্পষ্টতর। কিন্তু বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসারতা ও সৃষ্টিনৈপুণ্য তাঁর ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে 'বঙ্গ-বিজেতা'র তুলনা করলে এ সত্য সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবী কঙ্কণ'-এ রমেশচন্দ্র প্রাথমিক প্রচেষ্টার জড়তাকে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন। ইতিহাস-চিত্রণ ও ঔপন্যাসিক ধর্ম—দু'দিক থেকেই 'মাধবীকঙ্কণ' রমেশচন্দ্রের উন্নত শিল্পশক্তির পরিচয় বহন করে। মূল কাহিনীর দিক থেকে ইতিহাস হয়তো মুখ্য নয়, কিন্তু নায়কের দৈব বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের বিচিত্র বর্ণের সূত্র এক অবিচ্ছেদ্য-বন্ধনে গ্রথিত। নরেন্দ্র-হেমলতা-শ্রীশচন্দ্র—কোনটিই ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। কিন্তু বৃহত্তর

ইতিহাসের স্পন্দন তাদের জীবনকে বৈচিত্র্য-মুখর করে তুলেছে। বাল্য-প্রণয়বিড়ম্বিত নরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামকে বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রেছেন। যদিও শ্রীশচন্দ্র ও হেমলতার দাম্পত্য-জীবনের ওপর ভারত ইতিহাসের আবর্ত-সঙ্কুল, অধ্যায়টি তেমন গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, তথাপি এখানকার ইতিহাস-চিত্রের একটি বিশেষ মূল্য আছে।

'বঙ্গ-বিজেতা'-য় ইতিহাসের স্পর্শ আছে, কিন্তু সে ইতিহাস ম্লান প্রাণহীন, কিন্তু 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসের ইতিহাস প্রাণ-চঞ্চল ও গতি-মুখর—রমেশচন্দ্র এখানে একটি ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টি করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখর মধ্যাহ্নে, সম্রাট শাজাহানের রাজত্বের অস্তিমলগ্নে যে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামের প্রলয়ঙ্কর শিখা জ্বলে উঠেছিল, তাকেই মধ্যযুগীয় রোমান্সের দূর-বিসর্পী রহস্যের সঙ্গে সমন্বিত করে রমেশচন্দ্র এক অসাধারণ যুগচিত্রকেই উদ্ভাসিত করে তুলছেন। পটভূমিকার বিস্তৃতিও বিস্ময়কর। ভাগীরথী তীরবর্তী একটি নিস্তরঙ্গ পল্লীগ্রাম থেকে লেখকের ইতিহাসদৃষ্টি সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে—বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে বারানসী বারাণসী থেকে বিলাস-বিভ্রমময় দিল্লী, এমন কি মোগল রাজান্তঃপুরের ভীষণ-রমণীয় সৌন্দর্যের বিষপুষ্পের সন্ধানও তিনি দিয়েছেন। উজ্জয়িনীর যুদ্ধের পরে ইতিহাস-দৃষ্টি সঞ্চারিত হ'য়েছে নূতন পথে। এবার আর বাদশাহী রোমান্সের মোহ-মদির কাহিনী নয়—এবার শৈলবন্ধুর আরাবল্লীর পাষাণ-শিলায় অঙ্কিত এক বীরত্ব মণ্ডিত দুঃসাহসিক দেশপ্রেমিকতার ইতিহাস। পরবর্তীকালের 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যার' বীজ উপন্যাসের এই অংশেই লক্ষ্য করা যায়। চিতোর, যোধপুর, উদয়পুর, একলিঙ্গ দেবের মন্দির প্রভৃতি এক সংগ্রামশীল জীবনের গৌরব-দীপ্ত ইতিহাসকেই উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। স্বার্থ-কৌটিল্য, মোগল হারেমের উচ্ছৃঙ্খল বিলাস, ষড়যন্ত্র সঙ্কুল রাজনৈতিক জটিলাবর্ত—যুগ-জীবনের প্রতিটি সত্য যেন রমেশচন্দ্র জাতিস্মরের মত বর্ণনা ক'রেছেন। নরেন্দ্রনাথের রণক্লান্ত অর্ধচেতন স্মৃতি-দর্পণে জেগে ওঠা 'বেগম সাহেবের সরাই'-এর রহস্যময় ভীষণ রমণীয় চিত্র ও জেলেখার ব্যর্থ-প্রেমের কয়েকটি আবেগ-নিবিড় মুহূর্ত বর্ণনায় রমেশচন্দ্র উচ্চাঙ্গের কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। লেখক কোনটিকেই বাস্তবের সূর্যালোকিত জগতে টেনে আনেন নি—তার ফলে একটি করুণ-সুন্দর সূক্ষ্মসার গীতি-মূর্ছনার সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত আর কোন ক্ষেত্রেই রমেশচন্দ্র তাঁর হৃদয়াবেগকে এমনভাবে মুক্তি দেন নি। জেলেখার জ্বালাময় জীবনের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি অদৃশ্যভাবে নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎকেই যেন মসী-রঞ্জিত ক'রে তুলছে। একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ওপর আরব্য উপন্যাসের গভীর প্রভাব আছে। ইরাণী রোমান্সের এমন জীবন্ত ও বর্ণাঢ্য চিত্র বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু নরেন্দ্র-হেমলতা ও শ্রীশচন্দ্রের কাহিনী। নরেন্দ্র ও শ্রীশ-চন্দ্রের চারিত্রিক বৈপরীত্যকে লেখক কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যময় মন্তব্যের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। নরেন্দ্রনাথ তার অভিমান-ক্ষুব্ধ, ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা নিয়ে বৃহত্তর জীবন-স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—এও যেন তার চরিত্রেরই স্বরূপ। শ্রীশচন্দ্রের শান্ত, সংযত চরিত্রটি হেমলতার শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছে মাত্র, কিন্তু তার হৃদয়ের গোপন-গুহায় কোন সাড়া জাগাতে

পারেনি—বিবাহিত জীবনের মধ্যেও একটি ম্লান ও ধূসর ছায়া সংক্রামিত হ'য়েছে—মিলনের সুতীব্র হৃদয়াবেগ এখানে নেই। অপরপক্ষে, হেমলতাকে ঘিরে নরেন্দ্রনাথের প্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তি—তার উচ্ছ্বসিত অভিমান, অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ, প্রীতিসমুজ্জল কল্যাণকামনা, একটি জীবন্ত হৃদয়ের লীলা-চাঞ্চল্য অপূর্ব হয়ে উঠেছে। রমেশচন্দ্রের প্রেম-চিত্রণ সাধারণত বিশেষত্ব-বর্জিত ও বর্ণবিরল। কিন্তু 'মাধবী-কঙ্কণ' উপন্যাসটি তার একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। 'মাধবী-কঙ্কণ' উপন্যাস প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কথা মনে হয়। বাল্য প্রণয়ের পরিণতি। উভয়ক্ষেত্রেই অভিশপ্ত কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে ও অন্তর্জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব শিল্প-সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তবজীবনের সঙ্গে মানব-নিয়তি ও দুর্নিরীক্ষ্য রহস্যকে একসূত্রে যুক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অশান্ত জীবন-জিজ্ঞাসা, কবিকল্পনার মহিমাদীপ্ত ঐশ্বর্য ও উচ্চতর ট্রাজেডির মহৎ সমুন্নতি রমেশচন্দ্রের পক্ষে অনায়ত্তই ছিল। তবে 'চন্দ্রশেখর' ও 'বিষবৃক্ষের' মত রমেশচন্দ্রও দাম্পত্য-বন্ধনকেই জয়যুক্ত করেছেন।—যে প্রেম বিবাহ-বন্ধনের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি, তার বৈচিত্র ও হৃদয়াবেগ যতই থাকুক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্র কেউই তাকে চরম ব'লে স্বীকার করেন নি।

'মাধবী-কঙ্কণ'-এর পরে উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্র সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি ধরেছেন। 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'—উপন্যাস দুটিতে রমেশচন্দ্রের প্রবণতা বিশুদ্ধ ইতিহাসের দিকে। পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসে ইতিহাসের স্থান অনেকখানি গৌণ, ইতিহাস বহির্ভূত ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে ইতিহাসের রঙ্গীন মশালের আলোয় রঞ্জিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যায়' ইতিহাস সর্ব গ্রাসী হয়ে উঠেছে। শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র জাতির নবীন অভ্যুত্থান, জীবনের বীরমণ্ডিত দুঃসাহসিক মুহূর্ত এত তীব্র ও বেগবহুল যে ব্যক্তি হৃদয়ের স্পন্দনগুলি সেখানে লুপ্ত হয়েছে। 'জীবন-সন্ধ্যাতে'ও তাই—রাজপুতজাতির অদম্য দেশপ্রেম, বজ্র-কঠোর সঙ্কল্প, রাজপুত বীরাঙ্গনার আত্মহুতির জ্বলন্ত ইতিহাস যে ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরব-কাহিনীর সৃষ্টি ক'রেছে, তার আড়ালে তেজসিং-পুষ্পকুমারীর প্রেম নিতান্ত নিষ্প্রভ হ'য়েছে। এই দু'খানি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র সমগ্রভাবে জাতীয়-জীবনের একটি বীর-যুগেরই (Heroic age) বর্ণনা করেছেন। এই কারণে চরিত্রগুলির কোন নিজস্ব রূপ নেই—তারা যেন বৃহত্তর ঐতিহাসিক বিক্ষোভের এক একটি তরঙ্গ। তাদের লৌহবর্ম চোখ ঝলসে দেয়, কিন্তু তার অন্তরালের রক্তমাংসের রূপটি চোখে পড়ে না। তবু 'জীবন-প্রভাতে'র মধ্যে দু' একটি ক্ষেত্রে চরিত্র-চিত্রণের সে সামান্য চেষ্টা আছে তার মূল্য কম নয়। শিবাজীর চরিত্রটি মোটামুটি নিপুণভাবেই ফুটেছে। রঘুনাথজী হাবিলদার প্রভুভক্তি ও দেশপ্রেমের একটি হাতিয়ার মাত্র।

'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যায়' ব্যক্তি-চরিত্র বিকাশের সামান্যতম প্রচেষ্টাও নেই। এখানে রমেশচন্দ্র শুধু দেশ ও কালকেই দেখেছেন যেন একটি জাতীয় জীবনের পতন-অভ্যুদয় বর্ণনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। টডের রাজস্থান-কাহিনীকে অনুসরণ করে রমেশচন্দ্র সরল, সত্যনিষ্ঠ ও বাহুল্যবর্জিত আখ্যায়িকায় ভারত-ইতিহাসের এক কীর্তি-মুখর কাহিনীকেই আরতি করেছেন।

আহেরিয়া উৎসব, রাঠোর-চন্দাবতের বংশগত বিরোধ, সূর্যমহল দুর্গের পুনরুদ্ধার,—সমস্তই একত্রিত হ'য়ে প্রতাপসিংহের দুর্জয় ও সংগ্রামশীল জীবনের গৌরব-দীপ্ত কাহিনীকে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে এক করে তুলেছেন। এখানে প্রতাপসিংহ যেন কোন ব্যক্তি নন, জাতীয় জীবনের প্রতীক। চারণ-কবির বিস্মৃত ছন্দটীকে যেন লেখক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'জীবন-সন্ধ্যা'য় ব্যক্তি পরিবার, এমন কি প্রেম-জীবনকেও অতিক্রম ক'রে বড় হ'য়ে উঠেছে জাতীয় জীবনের অভীপ্সা ও মহৎ যুগ-জীবনের প্রসারিত পটভূমি। ইতিহাসের সত্য-নিষ্ঠা আনুগত্যে, রমেশচন্দ্র এই দু'টি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রকেও অতিক্রম করেছেন। সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ এই দু'খানি উপন্যাসকে "খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসও" বলেছেন। অবশ্য ইতিহাস অংশ সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়, কিন্তু উপন্যাস অংশটি তেমনি দুর্বল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাস আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস ও মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।"—রমেশচন্দ্র তার শেষ দু'টি উপন্যাসে ইতিহাস ও মানবকে সমন্বিত করতে পারেননি, এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রভেদ।

রমেশচন্দ্র দু'খানি সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন—'সংসার' (১০৮৫) ও 'সমাজ' (১৮৯৪)। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও সামাজিক উপন্যাস রচনার মধ্যে বেশ কয়েক বছরের ব্যবধান ছিল। এই কয়েকবছরের মধ্যে রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠকীর্তির স্বাক্ষর আছে। 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'র বঙ্গানুবাদ (১৮৮৩-৮৫) ও 'হিন্দুশাস্ত্রে'র সঙ্কলন ও অনুবাদ (১৮০৩-৯৭) সম্ভবত রমেশচন্দ্রের মনোজীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস আলোচনার আগে এই তথ্যটির কথাও মনে রাখতে হবে। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে রমেশচন্দ্র আমাদের শান্ত নিরুদ্বেগ পল্লীজীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। রমেশচন্দ্রের বিশ্লেষণ খুব গভীর নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামের চিত্র ও চরিত্রগুলির মধ্যে মোটামুটি একটি নম্র-সুন্দর মাধুর্য ও স্বাভাবিকত্ব আছে। 'সংসার' উপন্যাসে বিধবা বিবাহ এবং 'সমাজ' উপন্যাসে অসবর্ণ বিবাহের কথা আছে। 'সংসার' উপন্যাস প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র কথা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। 'সংসার' উপন্যাসে 'বিষবৃক্ষে'র প্রসঙ্গ আছে। বিন্দু সুধাকে বিষবৃক্ষের পরিণাম সম্পর্কে বলেছে : "গল্প আর কি। নগেন্দ্রর সঙ্গে কুন্দের বিবাহ হইল, কিন্তু তাহাতে সুখের হইল না, কুন্দ শেষে বিষ খাইয়া মরিল।" (ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ) সম্ভবত বঙ্কিমের এই ব্যবস্থা রমেশচন্দ্রের মনঃপুত হয় নি—তাই তিনি শরৎ সুধার বিবাহ দিয়ে 'সংসার' উপন্যাস শেষ করেছেন। কিন্তু 'সমাজ' উপন্যাসটির মধ্যে রমেশচন্দ্রের প্রচারধর্মীতা শিল্পদৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন ক'রেছে। বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে তালপুকুর ও কলকাতা—পল্লী ও নগর দু'দিকের ছবিই তিনি এঁকেছিলেন, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ প্রতিপন্ন করার জন্য সনাতনবাটি জমিদার পরিবারের এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস যুক্ত করেছেন। সুশীল ও দেবীপ্রসাদের অসবর্ণ বিবাহকে সম্ভব করে তোলার জন্য ঘটনাটির মধ্যে অসঙ্গত অতি-নাটকীয় উপাদান সন্নিবেশিত করতে হয়েছে। রামপ্রসাদ সরস্বতীর আবির্ভাব যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি অসঙ্গত। আসল

কথা অসবর্ণ বিবাহ সম্ভব ক'রে তোলার উৎসাহ-আধিক্য 'সমাজ' উপন্যাসটিকে ব্যর্থ ক'রেছে। সমস্যাটির বাস্তব ও প্রয়োগগত দিকের কথা তাঁর একবারও মনে হয় নি। তথাপি রমেশচন্দ্রের চিন্তায় যে অগ্রগামী যুগের স্বপ্ন নিহিত ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি এক সময় ভগিনী নিবেদিতার কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যেই তাঁর মনোজীবনের সুন্দর ছবি ফুটেছে: Dreams! Dreams! some will exclaim. Well, let them be so,—it is better to dream of work and progress then to wake to inaction and stagnation.

উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে রমেশচন্দ্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র মনীষী রমেশচন্দ্রের একটি অংশ মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ সাহিত্য-কীর্তির মাঝখানে রমেশচন্দ্রের রস-সাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাটি আজ বিস্মৃতপ্রায়। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে বঙ্কিমযুগের সাহিত্যিক হ'য়েও ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসাকে তিনি একটি নূতন পথ দিতে চেয়েছিলেন। 'মাধবী-কঙ্কণ'-এর অচরিতার্থ প্রেমের বেদনাও উনিশ শতকের কথাসাহিত্যের এক দুর্লভ আবিষ্কার!

সমালোচনা

শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—দাম ১'০০ টাকা। **শিবনাথ** ॥ সুনীতি দেবী—দাম '৭৫ পয়সা। প্রকাশক—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পক্ষে দেবপ্রসাদ মিত্র। কলিকাতা-৬

মৃত্যুর মাত্র পঞ্চাশ বছর পরে শিবনাথ শাস্ত্রীকে নিছক ধর্মনেতা বলে ব্রাহ্মসমাজ শুধু স্মরণ করবেন এ কখনই আকাংখিত হতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্ত্তনশীল সমাজজগতে শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম অবিস্মরণীয়। সমাজ ও জীবনে জীবন্ত জিজ্ঞাসাচিহ্নের মত বহু মত, আদর্শ, প্রশ্ন, বিতর্ক ইত্যাদিতে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাও অনাবশ্যক অধ্যায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর সাহিত্যজীবনও বাংলা সাহিত্যে কম স্মরণীয় নয়। বিশেষত তাঁর দুটি অমূল্য রচনা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী শুধু গম্ভীর ধর্মনেতা প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক সম্পাদক ছিলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীর চোখের আলোয় মানুষ শিবনাথের জীবনচর্যাও কম নয়। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনী সেদিকেই আলোকপাত করেছে। শিবনাথের পরলোকগমনের পর প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। বোধহয় রচনাটি অসম্পূর্ণ। ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই বইটির অতিরিক্ত আকর্ষণ শিবনাথের দেহত্যাগের পর প্রবাসী পত্রিকায় অন্যান্য যে কয়েকজনের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোরও পুনঃপ্রকাশ। বলাবাহুল্য, এমন কয়েকটি রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিতর্পণটি প্রথমেই উল্লেখ্য। প্রসংগত বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের এরচনায় কবির দৃষ্টিতে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মধারণা সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া রয়েছে প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ স্মৃতিচারণ। সেইসঙ্গে রজনীকান্ত গুহ ও অমৃতলাল গুপ্তের রচনা। মূলত এ রচনাগুলো শিবনাথের ধর্মবিশ্বাসের ওপরেই বেশি আলোকপাত করেছে। আর এবছরটি শিবনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের শতবর্ষ পূর্তি বলে হয়ত কারো কাছে এই স্মৃতিচারণের সার্থকতাও আছে।

কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি অপেক্ষাকৃত অনালোচিত পরিচয় তিনি বাংলা শিশু পত্রিকার উদ্যোক্তা বিশেষ। অজস্র ধর্মগত বিতর্ক পরিশ্রম সংগ্রাম সত্ত্বেও শিবনাথ শিশুপ্রেমী ছিলেন। শিশু-প্রেমী শিবনাথের এই মধুর দিকটি সহজ সাবলীল ভাষায় ছোটদের পরিবেশন করেছেন সুনীতি দেবী। বলাবাহুল্য বর্তমান সংস্করণ 'শিবনাথ' পুর্ণমুদ্রণ বিশেষ। কিন্তু সুনীতি দেবীর ভাষার সারল্যে তা আজও সপ্রাণ ও সতেজ। ছোটদের উপযোগী ভাষায় সুনীতিদেবী শিবনাথের জীবনী বলতে যা বোঝায় তা সবই অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে জানিয়েছেন। বলাবাহুল্য, সুনীতি দেবী এখানে ধর্মগত প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে শিবনাথকে শিশুপ্রেমী কর্মী মানুষ হিসেবেই দেখাতে চেয়েছিলেন বোধহয়। সম্পূর্ণ সফলও হয়েছেন। তাঁর রচনায় ছোট ছোট চলতি ভাষায় গঠিত বাক্যে শিবনাথ ছোটদের কাছে—কাছের মানুষ বলেই মনে হতে পারবেন মনে হয়।

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

দ্বি-শততম সংখ্যা

সপ্তদশ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা
সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

দুইশত সংখ্যায় প্রকাশিত সামগ্রিক সূচীপত্রগুলিকে **বিষয়সূচী** অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করা হলো। এই সূচীতে উত্তর-প্রত্যুত্তরের আলোচনা, পুস্তক পরিচয়, অনুষ্ঠান বিবরণী, চিত্রপ্রদর্শনী, সাময়িক আলোচিত বিষয় ইত্যাদি পরিবর্জন করা হয়েছে।

দর্শন

ইতিহাস

আকবরীর সুবে বাংলা : নারায়ণ দত্ত—'৭১ মাঘ। এক 'পর্দানশীন' স্মৃতিকথা ও তার লেখিকা : নারায়ণ দত্ত—'৭২ বৈশাখ। প্রাচীন ভারতের মধ্যদেশ : হিতেশরঞ্জন সান্যাল—'৭২ বৈশাখ। মুঘল ফরমান : নারায়ণ দত্ত—'৭২ আশ্বিন। অজ্ঞনামের ভারতবর্ষ : শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী—'৭৩ আষাঢ়। পীঠিরাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল : সরিৎশেখর মজুমদার—'৭৪ বৈশাখ। সেলিমাবাদের বারা খাঁ ও নারায়ণ গোস্বামী : সুশীলকুমার মণ্ডল—'৭৪ অগ্রহায়ণ। ইতিহাসের নিয়ম : উত্থান-পতন ও কয়েকটি কথা : নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত—'৭৪ মাঘ। ইতিহাস চর্চার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি : বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—'৭৫ মাঘ। বিলুপ্ত জনপদ ফিঞ্জেডাঙা : তারাপদ পাল—'৭৬ আশ্বিন।

ভূগোল

মেজর রেনল : অজিত দাস—১৩৬৮ কার্তিক। প্রাচীন ভারতীয় ভূগোলে গ্রীস ও রোমের অবদান : প্রসেনজিৎ সিংহ—'৬৮ অগ্রহায়ণ। বাংলা সাহিত্যে ভূগোল-চর্যাপদ : মীরা ঘোষ—'৭৫ আশ্বিন।

অর্থনীতি

ডেভিড রিকার্ডো : মঞ্জুলা বসু—১৩৬৫ পৌষ। অ্যাডাম স্মিথ : মঞ্জুলা বসু—'৬৬ আষাঢ়। জন স্টুয়ার্ট মিল : মঞ্জুলা বসু—'৬৬ অগ্রহায়ণ। জোসেফ্ শুম্পিটার : মঞ্জুলা বসু—'৬৬ মাঘ। অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোতে মূলধন : প্রিয়তোষ মৈত্রেয়—'৬৬ ফাল্গুন। মুদ্রাস্ফীতি : প্রফুল্লকুমার সরকার—'৬৭ মাঘ। অনুন্নত অর্থনীতির উৎস সন্ধানে : প্রিয়তোষ মৈত্রেয়—'৬৯ আষাঢ়। অর্থনীতিবিদ রাণাড়ে : অরুণ সান্যাল—'৬৯ ফাল্গুন। রাণাড়ের অর্থনৈতিক চিন্তা : অরুণ সান্যাল—'৭০ জ্যৈষ্ঠ। রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি : মুরারি ঘোষ—'৭৪ জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক, '৭৫ ভাদ্র, কার্তিক, অগ্রহায়ণ। আর্থনীতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়—রায়ত প্রসঙ্গ : নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত—'৭৬ বৈশাখ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

আন্ত-রাষ্ট্রীয় বিধির রূপান্তর : অতীন্দ্রনাথ বসু—১৩৬১ আশ্বিন। ডায়লেক্টিকস্ : অতুলচন্দ্র গুপ্ত—'৬২ শ্রাবণ। বারট্রাণ্ড রাসেলের রাষ্ট্রচিন্তা : জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত—'৬৩ মাঘ। হ্যারল্ড ল্যাস্কির রাষ্ট্রদর্শন : জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত—'৬৩ ফাল্গুন। নিকোলাই ম্যাকিয়াভেলি দি প্রিন্স : শ্যামাদাস সেনগুপ্ত—'৬৬ কার্তিক।

বাণিজ্য

বাঙালীর বাণিজ্যবৃত্তি : বিনয় ঘোষ—১৩৬৫ আশ্বিন। ভারতের বহির্বাণিজ্য : প্রফুল্লকুমার সরকার—'৬৭ ফাল্গুন।

অরণ্যবিজ্ঞান

উইলিয়াম রক্সবার্গ : অজিত দাস—১৩৬৭ চৈত্র। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার : অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রস্তরে বনের স্বাক্ষর—১৩৭৩ আশ্বিন। বৈদিক যুগে বন—'৭৩ কার্তিক। সিন্ধু সভ্যতায় বন—'৭৩ অগ্রহায়ণ। পৌরাণিক ভারতে বনানী—'৭৩ পৌষ।

গণিত

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার : মুরারি ঘোষ। অব্যক্ত গণিতে গ্রীস ও ভারত—'৬৬ ভাদ্র।

রূপ রেখা দর্শন—'৬৬ অগ্রহায়ণ। গণিতের দর্পণে মিশর—১৩৬৭ কার্তিক। গণিতের দর্পণে গ্রীস—'৬৭ অগ্রহায়ণ। গণিতের দর্পণে ভারতবর্ষ—'৬৭ পৌষ।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও ধর্ম : মেঘনাদ সাহা—১৩৭১ অগ্রহায়ণ। সাহিত্যলোক বনাম বিজ্ঞানলোক : শোভন গুপ্ত—'৭২ আষাঢ়। ঊর্দ্ধাকাশ ও বিজ্ঞানী শিশিরকুমার : সুধীনকুমার মিত্র—'৭২ ভাদ্র। মহাবিশ্বের রহস্যালোকে : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭৪ আশ্বিন। আনবিক অস্ত্র ও বিশ্বসংকট : সনৎকুমার রায়চৌধুরী—'৬৪ মাঘ। বিজ্ঞান ও সাহিত্য : অমিয়কুমার মজুমদার—'৬৯ আশ্বিন। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনকার চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। বেদান্ত ও বিজ্ঞান—'৭৫ ফাল্গুন। প্রাণতত্ত্ব—'৭৬ জ্যৈষ্ঠ। জীবন ছন্দ—'৭৬ শ্রাবণ। চাঁদের দেশে—'৭৬ আশ্বিন।

শিক্ষা

শিশু ও শিক্ষক : সমর চট্টোপাধ্যায়—১৩৬০ শ্রাবণ। শিশু-শিক্ষা সমস্যা : সরিৎশেখর মজুমদার—'৬৪ ভাদ্র। শিক্ষা সংহার : রাখাল ভট্টাচার্য—'৬৮ শ্রাবণ। শিক্ষায় সাহিত্য : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'৬৮ ফাল্গুন। আধুনিক শিক্ষা ও অধ্যাত্মবোধ : বাসন্তী চক্রবর্তী—'৭২ কার্তিক। বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার সমস্যা : ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়—'৭৪ আশ্বিন।

জনতত্ত্ব

ভারতের জনসমস্যা : ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩৭০ আশ্বিন। ভারত ও ভারতের জনবল : ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়—'৭০ অগ্রহায়ণ। প্রস্তর যুগ ও জনতত্ত্ব : অলককুমার দত্ত—'৭৫ আশ্বিন।

কৃষি ও খাদ্য

প্রাচীন ভারতে কৃষিবিদ্যা : নলিনীকান্ত চক্রবর্তী—১৩৬৩ ফাল্গুন। খাদ্য অন্বেষণে সহযোগিতা : জগন্নাথ সাহু—'৬৮ কার্তিক।

নবজাগরণ

ভারতবর্ষে নবজাগরণের উৎস : সমরেণ রায়—১৩৬২ মাঘ। উনিশশতকী জাগরণ এবং একটি বিতর্ক : নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'৬৫ শ্রাবণ। নবজাগরণের পটভূমিকা : সনৎকুমার রায়চৌধুরী—'৬৮ আষাঢ়। ভারতের নবজাগরণ ও ব্রাহ্মসমাজের মতবিরোধ : নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'৭০ পৌষ।

সমাজবিজ্ঞান

প্রাচীন জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞান : নারায়ণ চৌধুরী—১৩৬০ মাঘ। সতীত্ব ও সমাজ : নগেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম—'৬১ ফাল্গুন। বাংলার সমাজ : নারায়ণ চৌধুরী—'৬২ চৈত্র। সমাজ ও সন্ন্যাস : নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম—'৬৩ আষাঢ়। সমাজ-ভিত্তি ও সমস্যা : ব্রজেন্দ্রগোপাল সেনগুপ্ত—'৬৩ কার্তিক। শ্রীগুরবে নমঃ : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৩ অগ্রহায়ণ। নারীত্বের গ্লানি : রেণু মিত্র—'৬৩ অগ্রহায়ণ। চরিত্রহীন : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬২ আষাঢ়। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী : সরিৎশেখর মজুমদার—'৬৪ ভাদ্র। বিরিঞ্চি বাবা প্রসঙ্গে : গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত—'৬৪ আশ্বিন। একান্নবর্তী পরিবার : সরিৎশেখর মজুমদার—'৬৪ কার্তিক। উন্নাসিকতা প্রসঙ্গে : সুব্রতেশ ঘোষ—'৬৫ মাঘ। স্বদেশের কুকুর ধরিব : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৪ ফাল্গুন। বিলাসিতা প্রসঙ্গে : সুব্রতেশ ঘোষ—'৬৪

ফাল্গুন। ভবিষ্যতের জন্য : সুব্রতেশ ঘোষ—'৬৪ চৈত্র। যুগমানস : সনৎকুমার রায় চৌধুরী—'৬৫ আষাঢ়। উপেক্ষিত ভিত্তি : সুব্রতেশ ঘোষ—'৬৫ আষাঢ়। অধিক উৎপাদন ও সুসম বণ্টন : সুব্রতেশ ঘোষ—'৬৫ শ্রাবণ। বিভেদ ও মৌলিকতা : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—'৬৬ আশ্বিন। সমাজউন্নয়নে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা : পবিত্র পাল—'৬৬ আশ্বিন। একবার ফিরাও মোরে : রাখাল ভট্টাচার্য—'৬৬ আশ্বিন। সাংস্কৃতিক সঙ্কীর্ণতা : পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়—'৬৬ আশ্বিন। সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা : ঋতেন্দ্রকুমার রায়—'৬৭ জ্যৈষ্ঠ। সংস্কৃতি ও স্ববারি : উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—'৬৭ জ্যৈষ্ঠ। বারোয়ারী : নির্মলেন্দু সান্যাল—'৬৭ আশ্বিন। ব্যক্তিপূজা ও সমাজ : রবি মিত্র—'৬৯ জ্যৈষ্ঠ। সমাজ শিক্ষার পরিধি : কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়—'৭০ ফাল্গুন। ভারতের সমস্যা : সম্বরণ রায়—'৭৪ বৈশাখ। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার : অচিন্ত্যেশ ঘোষ। আধুনিক সমাজ ও সামাজিক উৎসব—'৬২ চৈত্র। সমাজে তরুণের স্থান—'৬৩ শ্রাবণ। একান্নবর্তী পরিবার—'৬৩ আশ্বিন। করণিক প্রসঙ্গে—'৬৩ পৌষ। বাঙালীর পরিচ্ছদ—'৬৩ মাঘ, ফাল্গুন। প্রাদেশিকতা—'৬৩ চৈত্র। ব্যক্তি, সমাজ-সংস্কৃতি—'৬৪ বৈশাখ। সনাতনী সমাজ—'৬৪ জ্যৈষ্ঠ। ধর্ম—'৬৪ আষাঢ়। আত্মীয়তার বালাই—'৬৪ ভাদ্র। গুরুজন সমস্যা—'৬৪ কার্তিক। বিংশ শতব্দীর চেতনায় গণতন্ত্র—'৬৫ আশ্বিন।

নন্দনতত্ত্ব

নন্দনতত্ত্বে সুন্দর ও অসুন্দর : সনৎকুমার রায়চৌধুরী—১৩৬০ আষাঢ়। শিল্পে সৌন্দর্য্য বিচারের মাপকাঠি : সনৎকুমার রায়চৌধুরী—'৬০ ভাদ্র। আধুনিক চোখে সুন্দরের সীমানা : সনৎকুমার রায়চৌধুরী—'৬০ মাঘ, '৬১ শ্রাবণ, ভাদ্র। সুন্দর ও অসুন্দর : কালিদাস মজুমদার—'৬১ আষাঢ়। সৌন্দর্যতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ, ও প্লেটো : কল্যাণ সেনগুপ্ত—'৬৬ পৌষ। দ্যোতনাবাদ ও ক্রোচে : দেবব্রত চক্রবর্তী—'৬৮ ভাদ্র। কাব্যচিন্তা ও নৈর্ব্যক্তিক শিল্পচেতনা : দেবব্রত চক্রবর্তী—'৭০ ভাদ্র। সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যবোধ : শোভন গুপ্ত—'৭১ ফাল্গুন।

স্থাপত্য

বাংলার মন্দির : হিতেশরঞ্জন সান্যাল—১৩৭৩ বৈশাখ, পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র, '৭৪ বৈশাখ-শ্রাবণ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, '৭৫ অগ্রহায়ণ। ভারতের স্থাপত্য : অসিতকুমার হালদার—'৭৫ আশ্বিন।

নাট্যশাস্ত্র

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার : অমিয়নাথ সান্যাল। নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকা—১৩৬৭ বৈশাখ। নাট্যশাস্ত্রের সাধারণ পরিচয়—'৬৭ জ্যৈষ্ঠ। নাট্যশাস্ত্রের রচনা—'৬৭ আষাঢ়। নাট্যশাস্ত্রের রচনাপদ্ধতি—'৬৭ শ্রাবণ। নাট্যশাস্ত্রের ছায়াভূমি—'৬৭ ভাদ্র। নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গদেবতাপূজন—'৬৭ কার্তিক। নাট্যশাস্ত্রের পূর্বরঙ্গ বিধান—'৬৭ অগ্রহায়ণ। পূর্বরঙ্গ ও বহির্গীত—'৬৭ পৌষ। পূর্বরঙ্গের অবশিষ্ট অংশের দিগ্‌দর্শনী—'৬৭ মাঘ। পূর্বরঙ্গকর্মের শেষ-প্রয়োগ—'৬৭ ফাল্গুন। নাট্যপ্রয়োগের কাল নির্ণয়—'৬৭ চৈত্র। নাট্যশাস্ত্রে নৃত্ত ও নৃত্য—'৬৮ জ্যৈষ্ঠ। নৃত্তের বস্তুতত্ত্ব—'৬৮ আষাঢ়।

নৃত্যকলা

এখনকার নৃত্যকলা : শ্রীমতী ঠাকুর—১৩৬২ আষাঢ়। মণিপুরী নৃত্য : শ্রীমতী ঠাকুর—'৬২ আশ্বিন।

ভরত নাট্যম্ : শ্রীমতী ঠাকুর—'৬২ পৌষ। ব্যালে নৃত্য প্রসঙ্গে : দীপ্তি ত্রিপাঠি—'৬৩ পৌষ।

শিল্পকলা

নন্দলাল বসুর সঙ্গে শিল্পালোচনা : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬০ আশ্বিন। চিত্রকলার নবজাগরণ : নারায়ণ চৌধুরী—'৬১ বৈশাখ। বৈষ্ণবশিল্পের গোড়ার কথা : সুধা বসু—'৬১ জ্যৈষ্ঠ। মুঘল সংস্কৃতি এক অধ্যায়—চিত্রকলা : সুধা বসু—'৬১ আশ্বিন। শিল্পী ও শিল্পীর সমস্যা : সুধা বসু—'৬২আশ্বিন। বাংলার নব্যচিত্রকলা : নারায়ণ চৌধুরী—'৬৩ শ্রাবণ। শিল্পকলা ও তার প্রতিরূপায়ণ : মীরা দত্ত—'৬৫ কার্তিক। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার : নিখিল বিশ্বাস। সমকালীন চিত্রশিল্পের প্রকৃতি—'৬৩ মাঘ। আদিম মানুষ ও শিল্পকর্ম—'৬৩ ফাল্গুন। বাংলা দেশ ও আধুনিক শিল্প প্রসঙ্গে—'৬৮ কার্তিক। আধুনিক আফ্রিকার শিল্প—'৬৮ চৈত্র। জিনো সিভিরিনি—'৬৯ বৈশাখ। শিল্প-সমাজ-ব্যক্তি—'৬৯ শ্রাবণ। পুরাণকথা আর আধুনিক জীবনবাদ—'৬৯ কার্তিক। লোকশিল্প—'৬৯ অগ্রহায়ণ।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার : দেবব্রত চক্রবর্তী। শিল্পে রুচি—'৭০ আশ্বিন। শিল্পে নজর—'৭০ পৌষ। শিল্পে রীতি—'৭০ মাঘ। শিল্পে সুন্দর—'৭০ ফাল্গুন। শিল্পে মন—'৭০ চৈত্র। শিল্পে কল্পনা—'৭১ বৈশাখ। শিল্পে রূপ—'৭১ জ্যৈষ্ঠ। শিল্পে প্রকাশ—'৭১ আষাঢ়। শিল্পে অনুকরণ—'৭১ শ্রাবণ। শিল্পে আবেগ—'৭১ ভাদ্র। শিল্পে দুর্বোধ্যতা—'৭১ আশ্বিন। শিল্পে ভাব—'৭১ কার্তিক। শিল্পের নীতি—'৭১ চৈত্র। শিল্পে সাবেকীয়ানা—'৭২ বৈশাখ। শিল্পে শোভনতা—'৭২ জ্যৈষ্ঠ। শিল্পের প্রেরণা—'৭২ কার্তিক। শিল্পে মনোলেখ—'৭২ অগ্রহায়ণ। শিল্পের ধ্যান ও দা ভিঞ্চির ছবি : অমলেশ ভট্টাচার্য—'৬৮ পৌষ। চিত্রণ ও ভাস্কর্য : নীলরতন কর—'৬৮ মাঘ। লোকায়ত শিল্প ও লোকশ্রুতির প্রকৃতি : আনন্দ কুমারস্বামী—'৬৯ আশ্বিন। কলাকর্ষণ, কয়েকটি প্রস্তাব : আনন্দ কুমারস্বামী—'৬৯ পৌষ। মধ্যযুগের শিল্পকলার প্রকৃতি : আনন্দ কুমারস্বামী—'৬৯ ফাল্গুন। বাংলার মৃৎশিল্প : কমলকুমার মজুমদার—'৭২ অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন। শিল্পের মূল্য : অসিতকুমার হালদার—'৭৫ বৈশাখ। শিল্পীর কাজ : অসিতকুমার হালদার—'৭৫ আষাঢ়। বাংলার শিল্প : অসিতকুমার হালদার—'৭৫ ভাদ্র। চারুশিল্প ও যন্ত্রযুগ শিল্প : ইন্দ্রজিত রায়—'৭৫ কার্তিক। শিল্প ও শিল্পীর জাতিবিচার : অসিতকুমার হালদার—'৭৬ বৈশাখ। হাওড়ার প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রাদি : রামপ্রসাদ মজুমদার—'৭৬ জ্যৈষ্ঠ।

সঙ্গীত

কাব্য সঙ্গীতে বৈচিত্র্য : রাজ্যেশ্বর মিত্র—১৩৬০ ফাল্গুন। বাংলার বাদ্যযন্ত্র : মীরা মিত্র—'৬১ আষাঢ়। মার্গ ও দেশী সঙ্গীত : লক্ষীকান্ত মুখোপাধ্যায়—'৬১ ভাদ্র। ভারতীয় সঙ্গীতে 'অন্তরা' : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—'৬৩ আশ্বিন। সঙ্গীত ও সমন্বয়ের আদর্শ : নারায়ণ চৌধুরী—'৬৩ আশ্বিন। সঙ্গীত ও সমাজ চেতনা : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—'৬৩ পৌষ। আধুনিক গান : সরিৎশেখর মজুমদার—'৬৪ শ্রাবণ। ভারতীয় সঙ্গীতে রাগের ইতিহাস : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—'৬৪ আশ্বিন। ভারতীয় সংগীতে রাগ-রাগিনীর মূর্তি কল্পনা : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—'৬৫ আশ্বিন। সংগীতের বিবর্তন ও বাদ্যযন্ত্র : গোপীনাথ গোস্বামী—'৬৫ আশ্বিন। কর্ণাটকী সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—'৬৬ বৈশাখ। সুরের সন্ধানে : অমিয়নাথ সান্যাল—'৬৬ ফাল্গুন। গান শোনা প্রসঙ্গে :

নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৬৬ ফাল্গুন। গান শোনা ও তাল গোণা : নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৬৬ চৈত্র। গীতিকবিতা ও গান : আশা দাস—'৬৭ শ্রাবণ। তাল গোনা ও সুর শোনা : নরেন্দ্রকুমার মিত্র —'৬৭ শ্রাবণ। সুর শোনা : নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৬৭ আশ্বিন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান : সুধীর চক্রবর্তী—'৭০ মাঘ। আধুনিক বাংলা গান—গঠন প্রকৃতি নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৭১ জ্যৈষ্ঠ। বাংলার দেশী সঙ্গীতে হিন্দু ও মুসলমান : বীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য—'৭১ আশ্বিন। সেকালের সঙ্গীতের আসর : দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—'৭২ আষাঢ়। গান ও কবিতা দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—'৭২ চৈত্র। ভারতীয় সঙ্গীতে জিজ্ঞাসা : সুধীন মিত্র—'৭৬ আষাঢ়।

নাটক-নাট্যকার-অভিনয়-রঙ্গমঞ্চ

অভিনয়ে স্বাভাবিকতা : হীরেন বসু—১৩৬৩ জ্যৈষ্ঠ। নাটকে সমস্যা : হীরেন বসু—'৬৩ আষাঢ়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ : হীরেন বসু—'৬৩ মাঘ। বর্তমান রঙ্গমঞ্চে একাঙ্কিকার প্রভাব : নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৬৪ আশ্বিন। সাধারণ রঙ্গালয় : তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—'৬৫ ভাদ্র। জীবন রসিক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র : দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ—'৬৫ চৈত্র। নাটক পাঠকের সমস্যা : শ্রীমাধব রায়—'৬৮ বৈশাখ। উপন্যাস ও নাটক : নিতাই বসু—'৬৬ আষাঢ়। শিশিরকুমার : রাখাল ভট্টাচার্য—'৬৬ শ্রাবণ। নাট্যশালার অবিস্মরণীয় পুরুষ : গোপাল ভৌমিক—'৬৬ শ্রাবণ। জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে : রাখাল ভট্টাচার্য—'৬৬ ভাদ্র। নাটক ও সঙ্গীত : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—'৬৯ ভাদ্র। যাত্রাভিনয় : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—'৭০ জ্যৈষ্ঠ। চলচ্চিত্র ও সাহিত্য : রণজিৎকুমার সেন—'৭০ কার্তিক। ভারতীয় নাটকে সঙ্গীত : নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৭০ কার্তিক। নাটকে বাদ্যপ্রয়োগ—প্রাচীনকাল : নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৭১ বৈশাখ। আধুনিক বাংলা যাত্রা নাটক : অলোক সামন্ত—'৭১ শ্রাবণ। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র : রণজিতকুমার সেন—'৭১ কার্তিক। যুগ প্রবাহ ও নাটকের ঋতুবদল : অনিলবরণ রায়—'৭১ অগ্রহায়ণ। যাত্রার পৌরাণিক নাটক ও অভিনয় : দেবেন্দ্রনাথ মিত্র '৭২ কার্তিক। সাম্প্রতিক বাংলা নাটক প্রসঙ্গে : বিদ্যুৎ মৈত্র—'৭৩ বৈশাখ। নাট্য সাহিত্যের বিকাশ, রীতি নীতি ও নাট্য প্রসঙ্গ : দেবকুমার বসু—'৭৩ চৈত্র। অ্যাবসার্ড নাটক ও বাঙালী নাট্যকার : বার্ণিক রায়—'৭৬ শ্রাবণ। বাংলা নাটক ও নাট্য সাহিত্য : রণজিৎকুমার সেন—'৭৬ আশ্বিন। স্বর্ণশৃঙ্খল ও দুর্গাদাস কর : জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়—'৭৬ কার্তিক। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার : রবি মিত্র। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার—'৬৬ শ্রাবণ। নট নাটক ও নাট্যকার—'৬৭ জ্যৈষ্ঠ। মঞ্চমায়া ও অভিনয়—'৬৭ আশ্বিন। অভিনয়ে স্বাভাবিকতা—'৬৭ মাঘ। নাট্যচিন্তা—'৭১ শ্রাবণ। সংস্কৃত নাটক ও বাংলা মঞ্চ—'৭১ কার্তিক। দর্শক ও নাটক—'৭১ পৌষ। নাট্যতত্ত্ব ও শ্লেষাত্মক নাটক—'৭২ আষাঢ়। জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে—'৭২ কার্তিক অগ্রহায়ণ, মাঘ। নাট্যচিন্তার পালা বদল—'৭২ পৌষ। নাট্যশিক্ষা—'৭২ চৈত্র। আমাদের নাটক—বিদেশীদের চোখে—'৭৩ ভাদ্র। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও নাটক—'৭৪ আষাঢ়।

লোকসঙ্গীত

মালদহের গম্ভীরা : তারাপদ লাহিড়ী—১৩৬০ আশ্বিন। বাংলা লোকসঙ্গীত : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬১ চৈত্র। মধুসূদন কিন্নর ও ঢপগান : দীপ্তি ত্রিপাঠী—'৬৪ আষাঢ়। বাংলার সারিগান : জয়দেব রায়—'৬৫ জ্যৈষ্ঠ। উত্তরবঙ্গের লোকগীতি : ভবানীগোপাল সান্যাল—'৬৬ শ্রাবণ। ঘেঁটুঠাকুর ও

ঘেঁটুগান : নারায়ণ দত্ত—'৭১ ভাদ্র। উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া গান : শ্রীমন্তকুমার জানা—'৭২ শ্রাবণ। উত্তররাঢ়ের লোকসঙ্গীত দিলীপ মুখোপাধ্যায়—'৭৩ বৈশাখ—মাঘ।

সংস্কৃত সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প ও অন্যতম গল্পকার সোমদেব : ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী—১৩৬৪ জ্যৈষ্ঠ। সংস্কৃত গবেষণার দু'একটি দিক : যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী—'৬৪ কার্তিক। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় সংস্কৃতচর্চা : ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী—'৬৬ আশ্বিন। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য—'৬৮ জ্যৈষ্ঠ। বেদের অপৌরুষেয়বাদ : মনোনীত সেন—'৬৮ আষাঢ়। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার : দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল। অলঙ্কার সাহিত্যে হাস্যরস—'৬৮ অগ্রহায়ণ। অসঙ্গতি ও হাস্যরস—'৬৮ মাঘ। অনৌচিত্য ও হাস্যরস—'৬৮ ফাল্গুন। হাস্যরসের রূপ ও রসাভাস—'৬৮ চৈত্র। হাস্যের উপরঞ্জকরূপ—'৬৯ জ্যৈষ্ঠ। প্রাচীন ভারতের পরিবেশ ও হাস্যরস—'৬৯ মাঘ। হাস্য ও করুণরসের পারস্পরিক সম্পর্ক—'৬৯ ফাল্গুন। প্রাচীন ভারতে চৌর্যশাস্ত্র—'৭০ বৈশাখ। সংস্কৃত সাহিত্যে রজবীর কথা : বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য—'৭০ কার্তিক, পৌষ। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে সৌন্দর্যতত্ত্ব : কল্পিকা সিংহ—'৭৩ ফাল্গুন। ন্যায়মতে জ্ঞান ও তাহার বিভাগ : ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত—'৭৪ অগ্রহায়ণ। ভারতীয় সাহিত্যে পুরূরবাউর্বশী কথা : দেবনাথ দাঁ—'৭৫ পৌষ। আলংকারিক প্রস্থানে বীভৎস রস : দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল—'৭৬ ভাদ্র।

রামায়ণ। মহাভারত

মহাভারতের বিদুর : ত্রিপুরারি চক্রবর্তী—১৩৬০ শ্রাবণ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ। খোটানী ভাষায় রামায়ণ : অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—'৬১ বৈশাখ। মাধব কন্দলীর রামায়ণ : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৫ ফাল্গুন। ইতিহাসং পুরাতনম্ : কল্যাণী দত্ত—'৬৬ আশ্বিন।

চর্যাপদ। পদাবলী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যাপদের সাহিত্যপ্রসঙ্গে : জয়ন্ত গোস্বামী—১৩৬৬ কার্তিক। চর্যাপদের উত্তরসূরী : অমরনাথ পাঠক—'৬৯ কার্তিক। চর্যাপদের পটভূমি : সোমেন বসু—'৬১ ভাদ্র।

অপ্রকাশিত পদাবলী : অন্নপূর্ণা ভাদুড়ী—১৩৬৫ পৌষ। পদাবলীর চিত্রকল্প : রণেন্দ্রনাথ দেব—'৬৫ চৈত্র। পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—'৬৫ বৈশাখ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গে : রণেন্দ্রনাথ দেব—'৬৬ জ্যৈষ্ঠ।

পুঁথি

জীবন্ত-বাহন : সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—১৩৬৩ চৈত্র। উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন পুঁথি : সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—'৬৫ অগ্রহায়ণ। পুঁথি সংগ্রহের শতবার্ষিকী : জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়—'৭৫ পৌষ।

লোকসাহিত্য

বাউল সাধনা : মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন—১৩৬০ ফাল্গুন। গম্ভীরায় ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি : কালীপদ লাহিড়ী—'৬১ চৈত্র। লালন ফকির : বসন্তকুমার পাল—'৬২ জ্যৈষ্ঠ। অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সংশয়দৃষ্টি : মুনীন ঘোষ—'৬৩ ভাদ্র। শিবের গাজন ও গম্ভীরা : কালিপদ লাহিড়ী—'৬৩ কার্তিক। গাজীনামা : সোমেন বসু—'৬৭ পৌষ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বাংলার লোকসাহিত্য : অধীর দে—'৭১ বৈশাখ। লোকসাহিত্য অধ্যয়নের

পরিপ্রেক্ষিত: সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার—'৭১ আষাঢ়। আদিবাসীদের লোককথা অধ্যয়নের পটভূমি: সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার—'৭২ বৈশাখ। একটি অন্ত্যজ লোকসাহিত্য-গালাগালি: জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়—'৭৫ কার্তিক। বাংলার লোকসংস্কৃতি ও বারজন সংস্কৃতি: বিনয় ঘোষ—'৭৬ বৈশাখ।

আদি কলিকাতা। কোম্পানীর আমল

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার: চণ্ডী লাহিড়ী। কলিকাতার প্রতিরক্ষা (১৭৪২)—১৩৬৯ পৌষ। বিলেতের সাহেব-নবাব—'৬৯ ফাল্গুন। বিদেশীদের চোখে দেশীভাষা—'৭০ আষাঢ়। বিদেশীদের চোখে সতীদাহ—'৭০ ভাদ্র। বিদেশীদের রুচি বিবর্তন—'৭০ আশ্বিন। বিদেশীদের দেখা টুকিটাকি—'৭০ কার্তিক। বাংলায় বিদেশী (১৭৫৭—১৮৫৭)—'৭০ অগ্রহায়ণ। বাংলায় বিদেশী—'৭০ চৈত্র।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার: নারায়ণ দত্ত। ষ্টুয়ার্ট মিল ও ইণ্ডিয়া হাউস—'৭১ আশ্বিন। আইন-ই আকবরীর প্রথম ইংরেজী অনুবাদ—'৭২ অগ্রহায়ণ। কোম্পানীর অযোধ্যানীতি ও একটি গ্রন্থ—'৭২ চৈত্র। টেভর নিঅর ও সতীদাহ—'৭৩ কার্তিক। কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার সমাজচিত্র—'৭৩ আশ্বিন। কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার প্রথম হাসপাতাল—'৭৪ চৈত্র। কোম্পানীর নথিপত্রে আদি কলকাতার দিশিচাকুরে—'৭৫ আশ্বিন। পুরনো কলকাতা ও একটি জীবনীকাব্য—'৭৬ কার্তিক।

সাহেব নবাব ও বাবু বেনিয়ান: মুরারি ঘোষ—'৭৫ আশ্বিন।

নাম ও উপাধি

বাঙালী নামের ধারা: চণ্ডী লাহিড়ী—১৩৬১ মাঘ। ভারতীয় নাম ও তাহার সমস্যা: বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত—'৬৮ শ্রাবণ। হাওড়া জেলার উপাধি: রামপ্রসাদ মজুমদার—'৭৬ বৈশাখ।

সংবাদপত্র। সাংবাদিকতা

সংবাদপত্রে জ্যোতিষ: গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত—১৩৬২ মাঘ। সংবাদ ও সাংবাদিকতা: অবধূত—'৬৩ আশ্বিন। বাঙলা সমালোচনা ও সাময়িক পত্রিকা: অলোক রায়—'৬৪ জ্যৈষ্ঠ। সাংবাদিকতার বিপদ: অমল ঘোষ—'৬৬ আষাঢ়। বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্র: অলোক রায়—'৬৭ অগ্রহায়ণ। সংবাদপত্রের স্বাধিকার: পার্থ চট্টোপাধ্যায়—'৬৮ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। শিল্প সমালোচকের দায়িত্ব ও সংবাদপত্র: নিখিল বিশ্বাস—'৬৮ মাঘ। সম্পাদক ও সাহিত্য সাধক কালীপ্রসন্ন সিংহ: কমল চৌধুরী—'৭২ অগ্রহায়ণ। প্রথমতম সংবাদপত্র: জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়—'৭৪ ভাদ্র। সৎ সাংবাদিকতার শতবার্ষিকী: জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়—'৭৫ আশ্বিন। পৌরাণিক যুগে সাংবাদিকতা: তারাপদ পাল—'৭৫ কার্তিক, '৭৬ শ্রাবণ, ভাদ্র।

বিদেশীয় ভারত বিদ্যাপথিক

জেমস প্রিন্সেপ: সোমেন বসু—'৬৬ জ্যৈষ্ঠ। আলেকজাণ্ডার সোমা দ্য করোস: সোমেন বসু—'৬৬ আশ্বিন।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার: গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। আঁকেটিল ডুপেরোঁ—'৬৬ মাঘ। থিওডোর গোল্ডষ্টুকর—'৬৬ ফাল্গুন। ইউজেন বিউরণুফ্—'৬৭ আষাঢ়। ফ্রাঞ্জ বপ্

—'৬৭ আশ্বিন। রুডলফ্ রথ্—'৬৭ কার্তিক। উইলিয়াম ডুইট হুইটনি—'৬৭ চৈত্র। আলব্রেখট্ ভেবর—'৬৮ জ্যৈষ্ঠ। আউগস্ট্ উইলহেলেম শ্লেগেল—'৬৮ আষাঢ়। আইভ্যান পাব্লোভিচ্ মিনায়েফ—'৬৮ ভাদ্র। য়োহান গেঅর্গ বুলর—'৬৮ আশ্বিন। ফ্রেড্রিথ ম্যাক্স মুল্লার—'৬৮ কার্তিক। আর্থার এণ্টনি ম্যাক্ডোনেল—'৬৮ পৌষ। আর্থার ব্যারিডল কীথ—'৬৮ মাঘ। মরিস্ উইন্টারনিটস্—'৬৮ ফাল্গুন। জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন্—'৬৯ বৈশাখ। সিলভ্যাঁ লেভি—'৬৯ জ্যৈষ্ঠ। হোরেস হেম্যান উইলসন্—'৬৯ আষাঢ়। হেনরী টমাস কোলব্রুক—'৬৯ শ্রাবণ। সার মনিয়ার উইলিয়মস্—'৬৯ ভাদ্র। সার উইলিয়াম জোন্স—'৬৯ আশ্বিন। সার চার্লস উইলকিন্স—'৬৯ কার্তিক। সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম—'৬৯ মাঘ।

ভারত বিদ্যাপথিক

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার: গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। কাশীনাথ ত্রিম্বক্ তেলাঙ্—'৬৯ পৌষ। ডা: ভাওদাজী—'৬৯ ফাল্গুন। ভগবানলাল ইন্দ্রজী—'৭০ বৈশাখ। রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর—'৭০ জ্যৈষ্ঠ। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র—'৭০ আষাঢ়। রমাপ্রসাদ চন্দ—'৭০ শ্রাবণ। সত্যব্রত সামশ্রমী—'৭০ ভাদ্র। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার—'৭০ কার্তিক। তারানাথ তর্ক বাচস্পতি—'৭০ অগ্রহায়ণ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—'৭০ ফাল্গুন। আনন্দরাম বরুয়া—'৭০ চৈত্র। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা—'৭১ বৈশাখ। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'৭১ জ্যৈষ্ঠ। ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী—'৭১ ভাদ্র। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—'৭১ আশ্বিন। প্রবোধচন্দ্র বাগচী—'৭১ অগ্রহায়ণ। বিষ্ণু সীতারাম সুখ্ঠন্কর—'৭১ ফাল্গুন। কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল—'৭২ জ্যৈষ্ঠ। মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী—'৭২ অগ্রহায়ণ। অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া—'৭২ পৌষ। শরচ্চন্দ্র দাশ—'৭৩ বৈশাখ। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—'৭৩ জ্যৈষ্ঠ। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র—'৭৩ আষাঢ়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—'৭৩ কার্তিক। রমেশচন্দ্র দত্ত—'৭৩ অগ্রহায়ণ। মহামহোপাধ্যায় কুপুস্বামী শাস্ত্রী—'৭৩ ফাল্গুন। মহামহোপাধ্যায় রামাবতার শর্মা—'৭৪ বৈশাখ। ড: নলিনীকান্ত ভট্টশালী—'৭৪ শ্রাবণ। মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী—'৭৪ আশ্বিন। মনোমোহন চক্রবর্তী—'৭৪ ফাল্গুন। রামরাজ—'৭৫ বৈশাখ। ড: কালিদাস নাগ—'৭৫ ফাল্গুন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী—'৭৬ আষাঢ়। ড: সুশীলকুমার দে—'৭৬ কার্তিক।

অনুস্মৃতি

বির্জিতলাও: ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—১৩৬০ আষাঢ়। ৪৯ নং পার্ক স্ট্রীট: ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—'৬০ আশ্বিন। নূতনতর মানুষ দ্বিজেন্দ্রনাথ: হেমলতা ঠাকুর—'৬১ আশ্বিন। সাবেকী কথা: অসিতকুমার হালদার—'৬১ পৌষ, '৬২ জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, চৈত্র। মনের ছবি: হেমলতা ঠাকুর—'৬২ মাঘ। সান্নিধ্য: চিন্তামণি কর—'৬২ কার্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, '৬২ আশ্বিন—চৈত্র, '৬৫ বৈশাখ—ফাল্গুন, '৬৬ শ্রাবণ—চৈত্র, '৬৭ বৈশাখ, অগ্রহায়ণ। ভীষ্মদেবের প্রত্যাবর্তন: অমিয়নাথ সান্যাল—'৬৬ পৌষ। গুরুজীর বৈঠকে বদল খাঁ সাহেব: অমিয়নাথ সান্যাল—'৬৭ আশ্বিন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী: অন্নদাশঙ্কর রায়—'৬৭ আশ্বিন।

বিদেশী সাহিত্য

চীনের আদি কবি লিপো : অরবিন্দ বেদজ্ঞ—১৩৬২ ফাল্গুন। গ্যেটে ও শিলের : শ্যামাদাস সেনগুপ্ত—'৬৪ ফাল্গুন। কলমের স্বাধীনতা ও মিল্টন : মুরারি ঘোষ—'৬৫ ভাদ্র। ইবসেন : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—'৬৫ আশ্বিন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্য : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় —'৬৬ বৈশাখ। মানবজীবনে প্রেমের ভূমিকা : বারট্রাণ্ড রাসেল—'৬৬ আষাঢ়। নাস্তিবাদ ও সেক্সপীয়রের সনেট : নিরাময় বন্দ্যোপাধ্যায়—'৬৬ চৈত্র। বারট্রাণ্ড রাসেলের ছোট গল্প : শিশিরকুমার দাশ—'৬৭ জ্যৈষ্ঠ। এমিলজোলা ও সাহিত্যে বাস্তববাদ : মনোজ রায়—'৬৭ জ্যৈষ্ঠ। দেকামেরণের বোক্কাচ্চিয়ো : ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—'৬৭ জ্যৈষ্ঠ। অতিমানববাদ ও ফ্রেডারিক নীৎসে : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ—'৬৭ ভাদ্র। ক্লাসিসিজম্ : দেবব্রত চক্রবর্তী—'৬৭ ভাদ্র। মিল্টনের অ্যারিওপাগিটিকা : শশিভূষণ দাশগুপ্ত—'৬৭ আশ্বিন। চিঠিপত্রে কীট্সের শেষের দিনগুলি : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়—'৬৭ অগ্রহায়ণ। জার্মাণ গীতিকাব্যে রিল্‌কে : অমলেশ ভট্টাচার্য—'৬৮ আষাঢ়। স্তাঁদাল ও সাহিত্যে বাস্তব রীতি : মনোজ রায়—'৬৮ কার্তিক। অবক্ষয় প্রসঙ্গে : নিরাময় বন্দ্যোপাধ্যায়—'৬৮ অগ্রহায়ণ। রুশসাহিত্যের বিবর্তন : দিব্যজ্যোতি মজুমদার—'৬৮ অগ্রহায়ণ। মনীষী ভল্‌তেয়ার : হরিপদ ঘোষাল—'৬৮ ফাল্গুন, চৈত্র। সাহিত্যে বাস্তবতা : দেবব্রত চক্রবর্তী—'৬৮ চৈত্র। বারট্রাণ্ড রাসেলের দৃষ্টিতে বিশ্বশান্তি : অমিয়কুমার মজুমদার—'৬৯ আষাঢ়। মহাকবি চসার : সঞ্জীবকুমার বসু—'৬৯ ভাদ্র। উইলিয়াম ফক্‌নার : রণজিৎকুমার সেন—'৬৯ আশ্বিন। শিল্পীর অপমৃত্যু-কবি লারমনতভ্ : দিব্যজ্যোতি মজুমদার—'৬৯ অগ্রহায়ণ। সাহিত্য সংবাদ : অজিত দাস—১৩৬৮ ফাল্গুন (বরিস্ জাইৎসেক), '৬৯ বৈশাখ (জেন অষ্টেন), '৬৯ জ্যৈষ্ঠ (টমাস চ্যাটারটন), আষাঢ় (মেলাসেম রিবালো), ভাদ্র (ভিক্টর হুগো), আশ্বিন (ও, হেনরী), পৌষ (গেরহাট হাউপ্টমন), মাঘ, ফাল্গুন (টমাস উলফ্)। '৭০ বৈশাখ (জন রাসকিন), জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় (হ্যারিয়েট মনরো), '৭০ ভাদ্র (এ্যালবার্ট সোয়াইৎসার), '৭০ কার্তিক (হাইমেনেৎসের), '৭০ অগ্রহায়ণ (বেনভেনুতো চেল্লিনী)।

সাহিত্য : রেনেসাঁস-বিপ্লব-বিশ্বযুদ্ধ : দিব্যজ্যোতি মজুমদার—'৭০ আষাঢ়। জর্জ বানার্ডশ : মনোজ রায়—'৭১ জ্যৈষ্ঠ। সালভাদার দ্য মাদারিয়াগা : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত—'৭১ ফাল্গুন। ফরাসী সাহিত্য—১৯৬৪ : অসীমা মিত্র—'৭২ আষাঢ়। রুশ সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের ক্ষীণস্রোত : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭২ ভাদ্র। পারলাগেরভিস্ট জীবন ও শিল্প : শিশির মজুমদার—'৭২ ভাদ্র। বিশ্বসাহিত্যের মণিহারে পার্লবাক : বিভা সরকার—'৭২ কার্তিক। শতবছরের ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্য : গীতা পাল—'৭২ মাঘ। ডন নদীর কূলে কূলে শোলখভ : বিদ্যুৎ মৈত্র—'৭২ ফাল্গুন। এ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড : শিশিরকুমার দাশ—'৭২ ফাল্গুন। ফ্রানজ কাফ্‌কা : প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায়—'৭৩ জ্যৈষ্ঠ। দেবতা না শয়তান : প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায়—'৭৩ শ্রাবণ। ফরাসী সাহিত্য-প্রতিভা রাসীন : সত্যভূষণ সেন—'৭৩ পৌষ। গ্যেটের উপন্যাস—'ওয়ার্থারের দুঃখবেদনা' : সত্যভূষণ সেন—'৭৩ চৈত্র। স্পেনীয় নাট্যপ্রতিভা ক্যালডেরণ : সত্যভূষণ সেন—'৭৪ পৌষ। গোর্কি-জীবন ও শিল্প : সুখরঞ্জন চক্রবর্তী—'৭৫ বৈশাখ। কবি দান্তে : সত্যভূষণ সেন—'৭৫ জ্যৈষ্ঠ। গ্রীক নাট্যকার অ্যারিষ্টোফেনীস : সত্যভূষণ সেন—'৭৫

আষাঢ়। নাট্যকার আলেকজাণ্ডার ডুমাস: ফণিভূষণ বিশ্বাস—'৭৫ অগ্রহায়ণ। ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতা: সুখরঞ্জন চক্রবর্তী—'৭৫ পৌষ। উজবেক কবি নাট্যকার—উইগান: ভবেশ দাস—'৭৫ মাঘ। দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটির কবিতা: সুখরঞ্জন চক্রবর্তী—'৭৫ ফাল্গুন। হুইটম্যান ও ভারতীয় সাহিত্য: শিশিরকুমার দাশ—'৭৬ জ্যৈষ্ঠ। রবার্ট ব্রাউনিং-এর কবিতা: সুখরঞ্জন চক্রবর্তী—'৭৬ আষাঢ়। গ্রীক ট্র্যাজেডি: লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী—'৭৬ শ্রাবণ। সাফো: শিশিরকুমার দাশ—'৭৬ আশ্বিন।

সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে সমন্বয়ের আদর্শ: নারায়ণ চৌধুরী—১৩৬০ বৈশাখ। সাহিত্য বিচার: ধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তী—'৬০ জ্যৈষ্ঠ। বাংলা কথাসাহিত্যে সমস্যা: নারায়ণ চৌধুরী—'৬০ শ্রাবণ। ট্র্যাজেডী ও পেথস: সুনীলকৃষ্ণ দেবনাথ—'৬০ অগ্রহায়ণ। সাহিত্যে শিল্প সঙ্কট: নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম—'৬১ আশ্বিন। বাংলা রম্যরচনা: রথীন্দ্রনাথ রায়—'৬১ মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র,। সাহিত্যে রোমান্টিসিজম্: অলোককুমার রায়—'৬১ চৈত্র। শিল্পদৃষ্টি: নারায়ণ চৌধুরী—'৬২ ভাদ্র। সাহিত্যের আভিজাত্য: ফণিভূষণ বিশ্বাস—'৬২ ফাল্গুন। সাহিত্য সমালোচনা: সুতপা দত্ত—'৬৩ আষাঢ়। ছোট গল্প প্রসঙ্গে: শ্যামাদাস সেনগুপ্ত—'৬৩ কার্তিক। সমালোচনা প্রসঙ্গে: নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৬৩ কার্তিক। কথাসাহিত্যে নাটকীয়তা: সুতপা দেবী—'৬৩ অগ্রহায়ণ। বঙ্গসাহিত্য প্রসঙ্গে: অমল ঘোষ—'৬৩ পৌষ। সাহিত্যসৃষ্টিতে নারী: সুতপা দেবী—'৬৩ চৈত্র। বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার সাহিত্য প্রসঙ্গে: কাজী মোতাহার হোসেন—'৬৩ চৈত্র। সাহিত্য প্রসঙ্গে: শ্যামাদাস সেনগুপ্ত—'৬৪ অগ্রহায়ণ। পূর্বাঞ্চলে বাংলাসাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকা: সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৪ পৌষ। সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ: দুর্গাদাস সরকার—'৬৫ আষাঢ়। ছোটগল্পের সংকট: হরেন ঘোষ—'৬৫ ভাদ্র। বাংলাসাহিত্য ও অনুবাদ: হরেন ঘোষ—'৬৫ কার্তিক। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র: হীরেন বসু—'৬৫ অগ্রহায়ণ। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য ও রাজনীতি: গুলাব দাস ব্রোকার—'৬৬ বৈশাখ। সাহিত্যে প্রতীকের প্রয়োগ: ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য—'৬৬ বৈশাখ। সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রশ্ন: ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য—'৬৬ আষাঢ়। বাংলা ছোটগল্পের ধারা: এনাক্ষী ঘোষ—'৬৬ কার্তিক। উপন্যাস আলোচনার পদ্ধতি: নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'৬৬ পৌষ। কৌতুকরস ও সাহিত্য: অজিতকৃষ্ণ বসু—'৬৬ পৌষ। অশ্লীলতা ও বর্তমান সাহিত্য: ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—'৬৬ পৌষ। সাহিত্যে হাসির খোরাক: অজিতকৃষ্ণ বসু—'৬৬ মাঘ। সাহিত্যে আজগুবিয়ানা: অজিতকৃষ্ণ বসু—'৬৬ ফাল্গুন। জীবনী সাহিত্য ও কৌতুকবোধ: অজিতকৃষ্ণ বসু—'৬৬ চৈত্র। সাহিত্য পাঠনা: চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—'৬৭ বৈশাখ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রগতি ধারা: যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—'৬৭ মাঘ। আধুনিক সাহিত্যে 'চরিত্র': মীরা বালসুব্রামনিয়ম—'৬৮ অগ্রহায়ণ। আধুনিক বাংলা ছোটগল্প: অনিল চক্রবর্তী—'৬৯ আশ্বিন। উপন্যাসে বক্তব্য: রণেন্দ্রনাথ দেব—'৬৯ অগ্রহায়ণ। আধুনিক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি: সঞ্জীবকুমার বসু—'৬৯ পৌষ। ইংরেজী সাহিত্যে বাংলার প্রভাব: চণ্ডী লাহিড়ী—'৬৯ মাঘ। বাংলার সমর সাহিত্যের গৌরচন্দ্রিকা: বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য—'৬৯ মাঘ। প্রেমের চর্বিত চর্বণে বাংলাসাহিত্য: মীরা বালসুব্রমনিয়ম—'৭০ বৈশাখ। চেতনা প্রবাহ: মীরা বালসুব্রমনিয়ম

—'৭০ জ্যৈষ্ঠ। আধুনিক কথাশিল্পে সংকট: নিতাই বসু—'৭০ ফাল্গুন। ভান্ প্রসঙ্গে: প্রণয়কুমার দেব—'৭০ ফাল্গুন। সাহিত্য ও জনগণ: দিব্যজ্যোতি মজুমদার—'৭০ চৈত্র। বাংলা ছোটগল্প ও অতিপ্রাকৃত: ভারতী সরকার—'৭১ শ্রাবণ। ছোটগল্প অধ্যয়নের গোড়ার কথা: গীতা পাল—'৭১ ভাদ্র। ধর্ম ও প্রাগ-আধুনিক বাংলা সাহিত্য: দিলীপ চট্টোপাধ্যায়—'৭১ পৌষ। ছোটগল্পের দু-এক কথা: ভারতী সরকার—'৭১ পৌষ। সাহিত্যে বাস্তবতা: অদিতিনাথ সরকার—'৭১ ফাল্গুন। বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ: সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'৭২ আষাঢ়, শ্রাবণ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-জিজ্ঞাসা: দিলীপ চট্টোপাধ্যায়—'৭৩ ফাল্গুন। সাহিত্যের রূপ: শঙ্করকুমার বসু—'৭৩ চৈত্র। সাহিত্য ও পরিভাষা: মিহির সিংহ—'৭৪ আষাঢ়। বাংলা ছোট গল্পে প্লটের অনুসরণ: সুচেতা ভট্টাচার্য—'৭৪ শ্রাবণ। বাংলা সাহিত্যে অবাঙ্গালীর দান: মানব বন্দ্যোপাধ্যায়—'৭৪ ভাদ্র। বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ: সুখরঞ্জন চক্রবর্তী—'৭৪ ভাদ্র। সাহিত্যে আধুনিকতার তাৎপর্য: বিদ্যুৎ মৈত্র—'৭৪ ভাদ্র। মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস: গীতা পাল—'৭৪ অগ্রহায়ণ। ট্রাডিশেনাল এস ওয়াজেদ আলি: সুখরঞ্জন চক্রবর্তী—'৭৪ পৌষ। বাংলা কথাসাহিত্যে নিষিদ্ধ প্রেম: অনঙ্গমোহন রুদ্র—'৭৪ মাঘ। চিরায়ত সাহিত্য প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা: নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত—'৭৫ অগ্রহায়ণ। প্রবন্ধ আর বিশশতক: ইন্দ্রজিত রায় —'৭৫ পৌষ। উপন্যাসে উপেক্ষিতা: দীপককুমার চন্দ্র—'৭৫ ফাল্গুন। প্রবন্ধের মুখবন্ধ: জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়—'৭৫ চৈত্র। ছোটগল্পে পশুপ্রীতি: দেবনাথ দাঁ—'৭৬ আষাঢ়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডী—ফেলিকস্ কেরী: দেবজ্যোতি দাশ—'৭৬ আষাঢ়।

কাব্যসাহিত্য

কবিতা পণ্য নয়: সরিৎশেখর মজুমদার—১৩৬১ জ্যৈষ্ঠ। কাব্য সাহিত্যে নাগরিকতা: সুব্রতেশ ঘোষ—'৬৫ আশ্বিন। কবিরে খুঁজোনা তাঁর জীবন চরিতে: অমল চক্রবর্তী—'৬৫ পৌষ। বৈষ্ণবকাব্যে মিষ্টিসিজম্: ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য—'৬৫ মাঘ। বাংলা প্রেম কবিতার প্রথম পর্যায়: হরেন ঘোষ —'৬৬ ভাদ্র। আধুনিক কবিতা সমালোচনা প্রসঙ্গে: উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—'৬৬ আশ্বিন। লৌকিক প্রণয় গীতিকা: হরেন ঘোষ—'৬৬ মাঘ। কবিতার ওজন ও কৌতুকরস: অজিতকৃষ্ণ বসু—'৬৭ আষাঢ়। কাব্য সমালোচনার ধারা: গীতা ঘোষ—'৬৭ ভাদ্র। নীতি কবিতা: গুরুদাস ভট্টাচার্য—'৬৮ মাঘ। কবিতার রূপচর্চা প্রসঙ্গে: শান্তি লাহিড়ী—'৬৯ মাঘ। কবিতায় নেপথ্য প্রকৃতি: অমলেশ ভট্টচার্য—'৭১ অগ্রহায়ণ। অন্তিম অমর-পর্ণটির জন্য: বাসুদেব রায় —'৭১ মাঘ প্রাচীন বাংলাকাব্যে ত্রিধারা: সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'৭২ ভাদ্র। মঙ্গলকাব্য: সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'৭২ কার্তিক। প্রাচ্য চিন্তাধারায় কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন: মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—'৭২ চৈত্র। কবিতার পীড়ন: বিদ্যুৎ মৈত্র—'৭৩ আষাঢ়। বসুন্ধরা ও রূপসী বাংলা: রবীন্দ্রনাথ সামন্ত—'৭৩ শ্রাবণ। তেমন কবিতা চাই: ভবেশ দাস—'৭৬ বৈশাখ।

শিশু সাহিত্য

ছড়া ও ছন্দ: সমর চট্টোপাধ্যায়—১৩৬০ বৈশাখ। উনবিংশ শতাব্দীর শিশু পত্রিকা: অনিমা সেন—'৬৪ আষাঢ়, '৬৫ শ্রাবণ, ভাদ্র।

বটতলার সাহিত্য

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার: জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ঘরে বাইরে বটতলা—১৩৭৪ ফাল্গুন।

বটতলার ভোরবেলা—'৭৪ চৈত্র। বটতলার নিধুবাবু—'৭৫ বৈশাখ। বটতলার বইগুলো—'৭৫ জ্যৈষ্ঠ। বটতলার অন্তরাগ—'৭৫ আষাঢ়। বটতলানি—'৭৫ শ্রাবণ। বটতলার বসন্তক—'৭৬ বৈশাখ। বটবৃক্ষমূলে—'৭৬ ভাদ্র।

ভাষা | ভাষাতত্ত্ব

বাংলা গদ্যসাহিত্য ও রামরাম বসু : সলিলপ্রসাদ ঘোষ--১৩৬২ মাঘ। ত্রিপুরার রাষ্ট্রভাষা : সোমেন্দ্র নাথ বসু—'৬৪ ভাদ্র। ভাষাতত্ত্বে-শব্দকথা : ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'৬৪ আশ্বিন। শব্দকথার প্রতিভাসিক সম্বন্ধ : ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'৬৪ কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ। ভাষা সংকট : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৪ পৌষ। ইংরেজী কেন কোথায় কতদূর : অন্নদাশংকর রায়—'৬৪ মাঘ। রাষ্ট্রভাষা সমস্যা : সনৎকুমার রায়চৌধুরী—'৬৫ জ্যৈষ্ঠ। বিষয় বনাম ভাষা : অশোক ঘোষ—'৬৫ শ্রাবণ। বাংলা শিক্ষা সমস্যা : অশোক ঘোষ—'৬৫ আশ্বিন। বাংলা ভাষার আদিকথা : মনোজিৎ বসু —'৬৬ কার্তিক। বাংলা বানান সমস্যা : খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—'৬৬ কার্তিক। সহজ কথায় বলা : বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়—'৬৬ পৌষ। বাংলা ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তন : মনোজিৎ বসু—'৬৭ শ্রাবণ। কেরীসাহেব ও বহুভাষা কোষ : অজিত দাস—'৬৭ কার্তিক। ভারতের বাংলাভাষী : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—'৬৮ আশ্বিন। শব্দকথা : ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'৬৮ আশ্বিন। মাতৃভাষা বনাম আন্তর্জাতিকভাষা : রাখাল ভট্টাচার্য—'৬৯ বৈশাখ। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত : অন্নদাশঙ্কর রায় —'৬৯ আশ্বিন। বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দ : চণ্ডী লাহিড়ী—'৭১ বৈশাখ। ভাষার ভাষা : নবেন্দু সেন—'৭২ আষাঢ়। চতুরঙ্গের ভাষা : নবেন্দু সেন—'৭২ মাঘ। অপরিচিতের পরিচয় : নবেন্দু সেন —'৭৩ বৈশাখ। অথ ভাষা প্রসঙ্গে : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'৭৩ আশ্বিন। লেখায় লাবণ্য : নবেন্দু সেন—'৭৩ পৌষ। ষ্টাইলিস্‌টিক্‌স্ : নবেন্দু সেন—'৭৪ পৌষ। পরিভাষা ও স্বর্ণকুমারী দেবী : পশুপতি শাশমল—'৭৫ শ্রাবণ। বাংলা কবিতায় প্রাচীন অলঙ্কার : নবেন্দু সেন—'৭৫ কার্তিক। অথ বাক্য কথা : নবেন্দু সেন—'৭৬ আশ্বিন। বঙ্গভাষার উদ্ভব ও বঙ্গলিপি প্রসঙ্গে : রামপ্রসাদ মজুমদার—'৭৬ আশ্বিন।

ছন্দ

বাংলা, কলা প্রসারণ-মাত্রিক ছন্দ : নীলরতন সেন—১৩৬৪ ফাল্গুন। গদ্য কবিতায় ছন্দ প্রসঙ্গ : নীলরতন সেন—'৬৫ মাঘ। মোহিতলালের ছন্দ : প্রফুল্লকুমার দত্ত—'৬৫ ফাল্গুন। ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে : নীলরতন সেন—'৬৭ চৈত্র। গদ্যছন্দের কবিতা : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—'৬৯ বৈশাখ। বাংলা কাব্যের ছন্দ-মুক্তি—মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ : নীলরতন সেন—'৭১ কার্তিক।

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা : শিবনারায়ণ রায়—১৩৬১ জ্যৈষ্ঠ। সুধীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা : সুবিনয় ধর—'৬৭ শ্রাবণ। কুমুদরঞ্জনের কবিতা : দিলীপ চট্টোপাধ্যায়—'৬৭ পৌষ। জীবন প্রেমিক—কবি ওমর খৈয়াম : মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—'৬৮ চৈত্র। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও তাঁর কাব্যপ্রবাহ : অমিয়কুমার মজুমদার—'৬৯ ফাল্গুন। কবি চিত্তরঞ্জন দাস : কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়— '৭২ পৌষ। বগজুড়ির কবি : বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—'৭৩ মাঘ। অশ্বিনীকুমার দত্তের কবিপ্রাণ : ভবেশ দাস—'৭৪ আশ্বিন। পল্লীপ্রেমিক জসীমউদ্দীন : সুখরঞ্জন চক্রবর্তী—'৭৪ ফাল্গুন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা : সুখরঞ্জন চক্রবর্তী—'৭৫ ভাদ্র।

হিন্দী-কবি

বাংলা দেশের হিন্দী-কবি নিরালা : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য—১৩৬৮ অগ্রহায়ণ। কবি ও নাট্যকার ভারতেন্দুর বাংলা পদ : রামবহাল তেওয়ারী—'৭৫ ফাল্গুন।

সাহিত্য ও পাঠক

পাঠকের চোখে—সাম্প্রতিক পুস্তক সমালোচনা : পবিত্র পাল—১৩৬৩ ফাল্গুন। পাঠক প্রসঙ্গে : ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—'৬৪ শ্রাবণ। মূল ও কাণ্ড : রবীন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত—'৬৪ শ্রাবণ। উক্তির আতঙ্ক : রবীন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত—'৬৪ আশ্বিন। সমালোচনা : দীপক রুদ্র—'৬৫ শ্রাবণ। লঘিষ্ঠ : শঙ্কর গুপ্ত—'৬৬ ভাদ্র। ক্ষণজীবী বাক্য পতংগ ও নিসঃঙ্গ পাঠক : পবিত্র পাল—'৬৬ অগ্রহায়ণ। সমালোচনা ও সত্য : পুণ্যশ্লোক রায়—'৬৭ জ্যৈষ্ঠ। গত যুগের সাহিত্য ও বর্তমান পাঠক : মীরা বালসুব্রমণিয়ম—'৬৯ ভাদ্র। লেখকের সংস্কার : শ্রীমাধব রায়—'৭০ শ্রাবণ। সাহিত্য পাঠের প্রারম্ভিক কথা : গীতা পাল—'৭৩ ফাল্গুন। আজকের কবিতা ও পাঠক : সুচেতা ভট্টাচার্য—'৭৫ জ্যৈষ্ঠ।

কালিদাস

কালিদাসের কাব্যে ফুল : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৩৬৪ ভাদ্র, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ—চৈত্র। প্রকৃতি পর্যবেক্ষক কালিদাস : ব্রহ্মচারিণী বাসনা—'৬৬ জ্যৈষ্ঠ। কালিদাসের কাব্যে প্রেমপত্র : শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী—'৭৪ কার্তিক।

ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্র : দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—১৩৭১ মাঘ। ভারতচন্দ্র সম্পর্কে রাখালদাস হালদার : পশুপতি শাশমল—'৭৩ শ্রাবণ। সাহিত্যে আধুনিকতা—রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র : ভারতী সরকার—'৬৯ ভাদ্র।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

বাংলাগদ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩৬৯ বৈশাখ।

রামমোহন

স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বন্ধু আন্তর্জাতিক রামমোহন রায় : যোগানন্দ দাস—১৩৬৪ চৈত্র। ডিরোজিও রামমোহন ও বিপ্লব : যোগানন্দ দাস—'৬৫ আশ্বিন। রামমোহনের গদ্যরচনা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'৬৮ আশ্বিন। সম্বাদকৌমুদী ও রামমোহন : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭২ আশ্বিন। রামমোহনের ফার্সী পত্রিকা—'মীরাৎ-উল্ আখবার' : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭৩ আশ্বিন।

দ্বারকানাথ

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার : অমৃতময় মুখোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়ীর ইতিকথা—১৩৬৫ পৌষ। জমিদার দ্বারকানাথ—'৬৭ কার্তিক। জাল প্রতাপচাঁদের মামলায় দ্বারকানাথ—'৬৭ ফাল্গুন। দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলা—'৬৮ আশ্বিন। দ্বারকানাথ ও সতীদাহ—'৬৯ শ্রাবণ। দ্বারকানাথ ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসমাজ—'৬৯ ভাদ্র। দ্বারকানাথের তীর্থযাত্রা—'৬৯ আশ্বিন। দ্বারকানাথ ও শিক্ষা আন্দোলন—'৬৯ কার্তিক। দ্বারকানাথ ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক—'৬৯ অগ্রহায়ণ। ডাক্তারি

শিক্ষা ও দ্বারকানাথ—'৭০ বৈশাখ। কার-ঠাকুর কোম্পানী—'৭০ শ্রাবণ। দেওয়ান দ্বারকানাথ—'৭০ আশ্বিন। দ্বারকানাথের জমিদারী—'৭০ অগ্রহায়ণ। দ্বারকানাথ ও তদানীন্তন শাসন ব্যবস্থা—'৭০ মাঘ। সেকেলের সংবাদপত্র ও দ্বারকানাথ—'৭১ বৈশাখ। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও জাহাজী কারবার—'৭১ শ্রাবণ। ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ—'৭১ আশ্বিন। দ্বারকানাথের বিলাতযাত্রা—'৭১ অগ্রহায়ণ। বিলাতের পথে দ্বারকানাথ—'৭১ পৌষ। দ্বারকানাথের ইওরোপে পদার্পণ—'৭১ মাঘ। দ্বারকানাথের পরিবার—'৭৩ জ্যৈষ্ঠ। দ্বারকানাথের ব্যবসায়ের পটভূমি—'৭৩ শ্রাবণ। ডিষ্ট্রিক চ্যারিটেবল সোসাইটি ও দ্বারকানাথ—'৭৩ মাঘ। দ্বারকানাথ ও তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা—'৭৪ আশ্বিন।

ঈশ্বর গুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রসঙ্গে : সুবোধ বসু—১৩৬৩ চৈত্র। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ : রতন সান্যাল—'৬৫ আশ্বিন। ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎকালীন সমাজ-মন : অলোক রায়—'৬৫ কার্তিক। মেকির শত্রু—ঈশ্বর গুপ্ত : রজতকুমার পাণ্ডা—'৭২ চৈত্র।

দেবেন্দ্রনাথ

ধর্ম-সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ : নবেন্দু সেন—১৩৭৬ আষাঢ়।

বিদ্যাসাগর

হিউমানিষ্ট পণ্ডিত বিদ্যাসাগর : বিনয় ঘোষ—১৩৬৪ ভাদ্র। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ : বিনয় ঘোষ—'৬৪ আশ্বিন।

মধুসূদন

বিশ্বপথিক বাঙালী কবি : শিশিরকুমার দাশ—১৩৬৫ কার্তিক। মেঘনাদ বধ-কাব্যে জীবন স্মৃতি : বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়—'৬৬ ভাদ্র। মেঘনাদ বধ কাব্য প্রসঙ্গে : দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—'৬৯ কার্তিক। মধুসূদন ও মৈথিলীশরণ সম্পর্ক নির্ণয় : সুমন রায়চৌধুরী—'৬৯ অগ্রহায়ণ। মধুসূদন ও 'দেবকী' : সুখময় মুখোপাধ্যায়—'৭৩ অগ্রহায়ণ। মধুসূদনের স্বাদেশিকতা : শ্রীমন্তকুমার জানা—'৭৫ শ্রাবণ।

বিহারীলাল

বিহারীলালের কাব্যের পুনর্বিচার : নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—১৩৭১ আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র। বিহারীলাল ও বাংলাকাব্যের ঐতিহ্য : নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'৭১ কার্তিক।

হেমচন্দ্র

হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতা : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৫ আষাঢ়, শ্রাবণ। পিণ্ডারীর ওড্ ও হেমচন্দ্র : জীবেন্দ্র সিংহরায়—'৬৯ আশ্বিন।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম-মনীষা : ভবতোষ দত্ত—১৩৬৬ আশ্বিন। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর : ভবতোষ দত্ত—'৬৮ আশ্বিন। বাংলা উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র—নব বিশ্লেষণ : দিলীপ চট্টোপাধ্যায়—'৬৯ মাঘ। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙালী সমাজ মন : অলোক রায়—'৭০ শ্রাবণ। দুর্গেশনন্দিনী : বাসুদেব দেব—'৭০ কার্তিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চিন্তা ও বাঙালী সমাজমন : আলোক রায়—'৭০ মাঘ। বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনচিন্তা ও বাঙালী সমাজমন : অলোক রায়—'৭১ ভাদ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস

চিন্তা ও বাঙালী সমাজমন : অলোক রায়—'৭২ ভাদ্র। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রসঙ্গে : অধীর দে—'৭২ ফাল্গুন। বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা : অশোক কুণ্ডু—'৭৩ পৌষ-চৈত্র, '৭৪ বৈশাখ-ভাদ্র, কার্তিক-চৈত্র, '৭৫ আষাঢ়-ভাদ্র, কার্তিক-চৈত্র, '৭৬ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা : অশোক কুণ্ডু—'৭৬ ভাদ্র, কার্তিক।

ত্রৈলোক্যনাথ

ত্রৈলোক্য সাহিত্যের ভূমিকা : গীতা ঘোষ—১৩৬৭ চৈত্র।

জগদীশচন্দ্র

দ্রষ্টা জগদীশচন্দ্র : সনৎকুমার রায়চৌধুরী—১৩৬৫ মাঘ। জগদীশচন্দ্রের কবিতা : মুরারি ঘোষ—'৬৫ অগ্রহায়ণ।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা : সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—১৩৬০ ভাদ্র। বাস্তব জীবনযাত্রার পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী—'৬১ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ ও আন্দামান রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬১ বৈশাখ। কবির জন্মদিন : দেবীপ্রসাদ সেন—'৬১ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ কি ন্যাশানালিস্ট : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬১ আষাঢ়। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি—'৬২ বৈশাখ। স্থর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৩ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনা : রথীন্দ্রনাথ রায়—'৬৩ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের চিঠি—'৬৪ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-বাসর : হেমলতা ঠাকুর—'৬৪ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ ও জনগণ : সনৎ রায়চৌধুরী—'৬৪ বৈশাখ। ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৪ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা—'৬৬ বৈশাখ। ব্যাকরণ ও রবীন্দ্রনাথ : মনোজিৎ বসু—'৬৬ বৈশাখ। আমরা ও রবীন্দ্রনাথ : নিরঞ্জন হালদার—'৬৬ বৈশাখ। কৌতুক-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ : অজিতকৃষ্ণ বসু—'৬৭বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ ও নবজাগরণ : সোমেন বসু—'৬৮ বৈশাখ। রবীন্দ্র-চিন্তা : সোমেন বসু—'৬৮ আশ্বিন। সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ : হরিপদ ঘোষাল—'৬৯ কার্তিক। রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭০ পৌষ। রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মন : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭১ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭১ ভাদ্র। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে যন্ত্রবাহন সভ্যতা : অমিয়কুমার মজুমদার --'৭১ ফাল্গুন। প্রাচীন সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ : ভূপেন্দ্রনাথ হালদার—'৭১ ফাল্গুন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদের নিজস্বধারা : সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়—'৭২ বৈশাখ। রবীন্দ্রমানসে যন্ত্রের মূল্যায়ন : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭২ বৈশাখ। চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ : রবিশেখর সেনগুপ্ত—'৭২ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস : অশ্রুকুমার সিকদার—'৭৪ বৈশাখ—চৈত্র, '৭৫ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। প্রাচীন চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথ সামন্ত—'৬৪ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য—'৭৫ বৈশাখ। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭৬ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ ও জনশিক্ষায় মিউজিয়াম : তাঁরা সাঁতরা—'৭৬ কার্তিক।

রবীন্দ্রসাহিত্য

রবীন্দ্রসাহিত্যে কালিদাসের প্রভাব : ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী—১৩৬১ শ্রাবণ। বলাকাপর্বে রবীন্দ্রনাথ : রথীন্দ্রনাথ রায়—'৬১ বৈশাখ : অপ্রয়োজনের আনন্দ : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬১ বৈশাখ।

রবীন্দ্রকাব্যের শেষ অধ্যায় : অনিলকুমার আচার্য্য—'৬১ বৈশাখ। রবীন্দ্র চেতনা : সুরজিৎ দাশগুপ্ত—'৬৩ বৈশাখ। ল্যাবরেটারি : জীবেন্দ্রকুমার গুহ—'৬৩ ভাদ্র। বিসর্জনের নায়ক গোবিন্দমাণিক্য : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৩ আশ্বিন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ : ভবানীগোপাল সান্যাল—'৬৪ বৈশাখ। রবীন্দ্রসাহিত্য জিজ্ঞাসা : রাখাল ভট্টাচার্য—'৬৪ বৈশাখ। পরিশেষের ছন্দোলিপি ও তার ভূমিকা : রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—'৬৪ শ্রাবণ। 'সাধনা' পর্বের রবীন্দ্রনাথ : হরপ্রসাদ মিত্র—'৬৫ বৈশাখ। মুক্তধারা : গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত—'৬৫ বৈশাখ। আজি মম জন্মদিন : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৫ বৈশাখ। শেষের কবিতায় প্রেম : মীরা দত্ত—'৬৫ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের কবিমানস : নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম—'৬৫ শ্রাবণ। সানাই : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৫ ভাদ্র। রবীন্দ্রনাথ ও পত্রপুট : সাধনা সরকার—'৬৬ ভাদ্র। প্রাচীন ভারতের সাধনা ও 'তপতী' : তপতী সেনগুপ্ত—'৬৬ ভাদ্র। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুজিজ্ঞাসা : অরুণ সেনগুপ্ত—'৬৬ মাঘ। ছিন্নপত্র : সোমেন বসু—'৬৭ বৈশাখ। কোন আদিকাল হতে : সোমেন বসু—'৬৭ ভাদ্র। কড়ি ও কোমল ও মিঠেকড়া : সোমেন বসু—'৬৭ আশ্বিন। রবীন্দ্রকাব্যে গৃহধর্মিতা : গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত—'৬৮ বৈশাখ। গদ্যকবিতা ও লিপিকা : উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—'৬৮ মাঘ। রবীন্দ্রসাহিত্যে আধুনিকতা : বাসুদেব মুখোপাধ্যায়—'৬৮ চৈত্র। যে পক্ষের পরাজয় : সোমেন বসু—'৬৯ বৈশাখ। রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞানের প্রভাব : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭০ বৈশাখ। রবীন্দ্রসাহিত্যে নদী : অজয়কুমার ঘোষ—'৭০ কার্তিক। রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়—জীবনবাদ : শুভব্রত রায়চৌধুরী—'৭১ চৈত্র। রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বমূলক গল্প : অজয়কুমার ঘোষ—'৭১ চৈত্র। রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় : শুভব্রত রায়চৌধুরী—'৭১, চৈত্র '৭২ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন। পঞ্চভূত ও রবীন্দ্রনাথ : অলোক রায়—'৭২ পৌষ। রবীন্দ্রকাব্য সাধনায় বাস্তব জীবনবোধ ও সৌন্দর্যবোধ : বাসন্তী চক্রবর্তী—'৭২ মাঘ। রবীন্দ্ররচনায় লৌকিক ছন্দ : শ্রীমন্তকুমার জানা—'৭২ ফাল্গুন। রক্তকরবী নাটকে গান : সুখরঞ্জন চক্রবর্তী—'৭২ চৈত্র। মালিনী : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৭৩ বৈশাখ। মুক্তধারা নাটকে গান : সুখরঞ্জন চক্রবর্তী—'৭৩ জ্যৈষ্ঠ। রাজা নাটকের গান : সুখরঞ্জন চক্রবর্তী '৭৩ কার্তিক। অচলায়তন নাটকের গান : সুখরঞ্জন চক্রবর্তী—'৭৩ মাঘ। পত্রসাহিত্য—দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ : নবেন্দু সেন—'৭৪ আষাঢ়। রবীন্দ্রকাব্যের আদিপর্ব ও ভারতী পত্রিকা : গীতা পাল—'৭৫ ভাদ্র। বর্ণপরিচয়ের নবতম গুরু রবীন্দ্রনাথ : প্রবোধরাম চক্রবর্তী—'৭৬ শ্রাবণ।

রবীন্দ্রতথ্য

রবীন্দ্ররচনা সূচী : পুলিনবিহারী সেন ও পার্থ বসু—'৬৭ বৈশাখ, '৬৭ আষাঢ়—চৈত্র, '৬৮ বৈশাখ, '৬৯ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। রবীন্দ্র গ্রন্থালোচনা : সোমেন বসু—'৬৮ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্র অভিধান : সোমেন বসু—'৬৮ শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ। রবীন্দ্ররচনায় 'চরিত্র সূচী' : তপতী মৈত্র—'৬৯ শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক—মাঘ।

রবীন্দ্রসংগীত

রবীন্দ্রনাথের গান : ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—১৩৬০ পৌষ। রবীন্দ্রসংগীতের সমস্যা : নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৬০ চৈত্র। প্রাচীন বাংলা গানের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসংগীত : রাজ্যেশ্বর মিত্র—'৬২ আষাঢ়। রবীন্দ্রসংগীতের সুর-দলন : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬২ ভাদ্র। রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতার

মনস্তত্ত্ব : প্রফুল্লকুমার দাস—'৬৩ আষাঢ়। রবীন্দ্রসংগীতে 'লয়' বৈশিষ্ট্য : নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৬৪ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্রসংগীতে রাগ ও রাগিনীর বিচার : নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৬৭ বৈশাখ। রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতার ভূমিকা : নরেন্দ্রকুমার মিত্র—'৬৮ বৈশাখ।

রবীন্দ্রচিত্রকলা

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী : অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—১৩৬০ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা : নিখিল বিশ্বাস—'৬৪ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের ছবি : সনৎকুমার রায়চৌধুরী—'৬৬ বৈশাখ।

ভিন্নপ্রদেশে রবীন্দ্রচর্চা

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির রচনাকার : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। মলয়ালম্ গীতাঞ্জলি—১৩৭০ বৈশাখ। তামিল গীতাঞ্জলি—'৭০ আষাঢ়। কন্নড গীতাঞ্জলি—'৭০ ভাদ্র। তেলেগু গীতাঞ্জলি—'৭০ আশ্বিন। ওড়িআ গীতাঞ্জলি—'৭০ কার্তিক। উর্দু গীতাঞ্জলি—'৭০ পৌষ। পাঞ্জাবী গীতাঞ্জলি—'৭০ মাঘ। মারাঠী গীতাঞ্জলি—'৭০ চৈত্র। গুজরাটী গীতাঞ্জলি—'৭১ বৈশাখ। হিন্দি গীতাঞ্জলি—'৭১ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।

বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের একটি বক্তৃতা : শঙ্করীপ্রসাদ বসু—১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠ। বাংলা গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—'৬৯ পৌষ। পত্রসাহিত্যে বিবেকানন্দ : রতন সান্ন্যাল—'৭০ আষাঢ়।

রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য রচনা : রথীন্দ্রনাথ রায়—১৩৬৭ বৈশাখ।

রজনীকান্ত

গীতিকবি রজনীকান্ত : কমল চৌধুরী—১৩৭২ আশ্বিন। কান্তকবির গান : দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—'৭২ অগ্রহায়ণ।

নিবেদিতা

ভারতে জাতীয়তা উন্মেষনায় ভগিনী নিবেদিতা : চিত্তরঞ্জন পাল—১৩৬৪ ভাদ্র। নিবেদিতার ভারতবর্ষ : শিশিরকুমার দাশ—'৭৫ চৈত্র।

গগনেন্দ্রনাথ

গগনেন্দ্রনাথ : নিখিল বিশ্বাস—১৩৬৮ পৌষ।

প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর অপ্রকাশিত চিঠি—১৩৬২ বৈশাখ। প্রমথ চৌধুরী—সবুজপত্র ও দেশকাল : রথীন্দ্রনাথ রায়—'৬৩ শ্রাবণ। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির একদিক : রথীন্দ্রনাথ রায়—'৬৩ আশ্বিন। প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারী কথা' : রথীন্দ্রনাথ রায়—'৬৪ বৈশাখ। বীরবলী সনেট : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—'৬৫ মাঘ।

বলেন্দ্রনাথ

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা : রথীন্দ্রনাথ রায়—১৩৬২ শ্রাবণ, ভাদ্র। বলেন্দ্রকাব্যে প্রেমচেতনা : শিবানী সিংহ—'৭৬ জ্যৈষ্ঠ। শিল্প সমালোচনায় বলেন্দ্রনাথ : শিবানী সিংহ—'৭৬ কার্তিক।

অতুলপ্রসাদ

অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ : কল্যাণকুমার বসু—১৩৭৪ কার্তিক। সংগীতরসিক সংগীতশিল্পী

অতুলপ্রসাদ : কল্যাণকুমার বসু—'৭৫ পৌষ।

অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সাধনা : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৩৬০ বৈশাখ। ঘরের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ : স্বরূপা মুখোপাধ্যায়—'৬০ আশ্বিন। শিল্পের সুন্দর ও অবনীন্দ্রনাথ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬১ ভাদ্র। অবনীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা—'৬১ আশ্বিন, '৬২ বৈশাখ, '৬২ আশ্বিন '৬৩ বৈশাখ। অবনীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬২ পৌষ। রূপকথা ও অবনীন্দ্রনাথ : অনিমা সেন—'৬৫ কার্তিক। কলা সমালোচনায় অবনীন্দ্রনাথ : মীরা দত্ত—'৬৬ জ্যৈষ্ঠ। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর জগত : নিখিল বিশ্বাস—'৬৯ ফাল্গুন।

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের শিল্পদৃষ্টিতে দেশ ও সমাজ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ—ভাদ্র, কার্তিক। শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠি—'৬১ অগ্রহায়ণ। শরৎচন্দ্র ও সাহিত্যতত্ত্ব : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬১ অগ্রহায়ণ। শরৎসাহিত্যের ভূমিকা : রথীন্দ্রনাথ রায়—'৬২ আশ্বিন। 'শেষের পরিচয়ের' পরিচয় : জীবেন্দ্রকুমার গুহ—'৬৩ আষাঢ়।

যতীন্দ্রনাথ

যতীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবনজিজ্ঞাসা : ভবানীগোপাল সান্যাল—১৩৬৫ ফাল্গুন।

বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' : রথীন্দ্রনাথ রায়—১৩৬২ পৌষ, মাঘ। বিভূতিভূষণের ছোটগল্প : রতন সান্যাল—'৬৬ কার্তিক। শিল্পী বিভূতিভূষণ : অরুণকুমার সেন—'৬৮ ফাল্গুন। গল্পকার বিভূতিভূষণ : তারাপদ পাল—'৭৩ চৈত্র।

নজরুল

নজরুলের কাব্যে প্রেম ও সৌন্দর্যপ্রীতি : ভবানীগোপাল সান্যাল—'৬৪ শ্রাবণ। বাংলা গানের একটি পর্যায় নজরুলের গান : বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—'৭১ ফাল্গুন।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : হীরেন বসু—১৩৬৩ মাঘ। গল্পকার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : নিতাই বসু—'৬৬ অগ্রহায়ণ।

বিবিধ

গান্ধীজীর মতবাদ : নির্মলকুমার বসু—১৩৬০ আশ্বিন। অথ মল্লিনাথ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬০-৬১ শ্রাবণ। বলিদ্বীপে হিন্দুধর্ম সাধনার জীবন্ত রূপ : অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—'৬০ শ্রাবণ। বিজয়া : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—'৬০ আশ্বিন। এমনি করেই ঘটেছিলো : নাটালিয়া সেদোভা ট্রটস্কী—'৬০ অগ্রহায়ণ। বাঙালীর রসনা সংস্কৃতি : চণ্ডী লাহিড়ী—'৬০ চৈত্র। চোয়াংত্সের উপদেশাবলী : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬১ বৈশাখ, আশ্বিন, পৌষ। জনগণ ও আমরা : পুণ্যশ্লোক রায়—'৬১ আষাঢ়। জনগণ ও আমরা : অন্নদাশঙ্কর রায়—'৬১ ভাদ্র। জনগণ ও আমরা : গৌরী দত্ত—'৬১ শ্রাবণ। প্রাচীনকালে প্রণয়ীগণের সংকট : অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—'৬১ আশ্বিন। আফ্রিকার কথা : অন্নদাশঙ্কর রায়—'৬২ আশ্বিন। সমাজধর্মী সত্যেন্দ্র

নাথ : কমলা দাশগুপ্ত—'৬২ কার্তিক। সমকালীন লেখকের দায়িত্ব : নারায়ণ চৌধুরী—'৬২ কার্তিক। দেহ ও দেহাতীত : রাখাল ভট্টাচার্য্য—'৬২ কার্তিক। সবুজ শিল্পী কথা : নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম—'৬২ অগ্রহায়ণ। বাংলার শিল্প-বিজ্ঞাপন : অন্নদা মুন্সী—'৬৩ বৈশাখ। সাহিত্যিকের রাজনীতি : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য—'৬৩ শ্রাবণ। ঠাকুর পূজা : অন্নদাশঙ্কর রায়—'৬৩ আশ্বিন। ছাড়পত্র : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—'৬৩ আশ্বিন। গুণগ্রাহী ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোর : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৩ মাঘ। যুক্তিবাদ : পুণ্যশ্লোক রায়—'৬৪ আশ্বিন। আত্মজীবনী : সোমেন্দ্রনাথ বসু—'৬৪ আশ্বিন। বৌদ্ধ সাধনা : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬৪ আশ্বিন। প্রবাস-পুরাণ : অমল ঘোষ—'৬৪ কার্তিক। রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস : রথীন্দ্রনাথ রায়—'৬৪ চৈত্র। বৌদ্ধতন্ত্র ও চন্ডক : রণজিৎকুমার সেন—'৬৪ চৈত্র। ব্রহ্মসভা না ব্রাহ্মসমাজ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬৫ বৈশাখ। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে : রাখাল ভট্টাচার্য—'৬৫ বৈশাখ। মুক্তিসাধক সত্যেন বসু : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'৬৫ জ্যৈষ্ঠ। সময় নেই : শঙ্কর গুপ্ত—'৬৫ জ্যৈষ্ঠ। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে : সন্তোষকুমার অধিকারী—'৬৫ জ্যৈষ্ঠ। গ্রামের দিকে : পবিত্র পাল—'৬৫ শ্রাবণ। বাঙালীর প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব : সলিলপ্রসাদ ঘোষ—'৬৫ কার্তিক। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : হরেন ঘোষ—'৬৫ চৈত্র। নবযুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবী : বিনয় ঘোষ—'৬৬ বৈশাখ। প্রথম বাঙালী খৃষ্টান : অজিত দাস—'৬৬ চৈত্র। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস : রাখাল ভট্টাচার্য—'৬৭ আশ্বিন। অজিত চক্রবর্তী সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য : লাবণ্যলেখা চক্রবর্তী—'৬৮ ভাদ্র। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঙালী সমাজ-মন : অলোক রায়—'৬৮ ভাদ্র। একটি অমূলক আশঙ্কা প্রসঙ্গে : অমিয়কুমার মজুমদার—'৬৯ জ্যৈষ্ঠ। রাজা রাধাকান্ত দেব ও বাঙালী সমাজ-মন : অলোক রায়—'৬৯ শ্রাবণ। ইসলাম সংস্কৃতি ও আমরা : গুরুদাস ভট্টাচার্য—'৬৯ আশ্বিন। জাতীয় চরিত্র : মানসী দাশগুপ্ত—'৭০ শ্রাবণ। জওহরলাল নেহেরুর সাহিত্যিক দৃষ্টি ও কবি হৃদয় : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭১ আষাঢ়। স্মৃতি উচ্চারিত : শক্তিব্রত ঘোষ—'৭১ অগ্রহায়ণ। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য রচনা : অমিয়কুমার মজুমদার—'৭১ পৌষ। হাসি : দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—'৭১ পৌষ। শ্রাদ্ধ : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—'৭১ মাঘ। ঈশপ ও বিষ্ণুশর্মা : দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—'৭১ চৈত্র। রামানন্দ জয়ন্তী : কমল চৌধুরী—'৭২ বৈশাখ। এ শতাব্দী কার ? : সুনীলকুমার নাগ—'৭২ আশ্বিন। প্রেমের নিদানতত্ত্ব : দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—'৭২ অগ্রহায়ণ। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি : ফণিভূষণ বিশ্বাস—'৭৩ ফাল্গুন। অসতো মা : সম্বরণ রায়—'৭৪ মাঘ। বস্তুমানুষ : সম্বরণ রায়—'৭৫ বৈশাখ। বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা : নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত—'৭৫ আষাঢ়। চৈতন্য লাইব্রেরীর গৌরহরি সেন : জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়—'৭৫ অগ্রহায়ণ। চিন্তনীয় : নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত—'৭৫ পৌষ। বিস্মৃত জননায়ক রামগোপাল ঘোষ : নারায়ণ দত্ত—'৭৫ মাঘ। ইয়ং বেঙ্গল যুগ ও বঙ্গসংস্কৃতি : শিবপ্রসাদ হালদার—'৭৫ চৈত্র। বিংশ শতাব্দীর ভাবিক সমস্যার কয়েকটি দিক : সুনীলকুমার নাগ—'৭৬ জ্যৈষ্ঠ। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়মানসে রক্ষণশীল চেতনা : শিবপ্রসাদ হালদার—'৭৬ ভাদ্র। নবরসের একটি রস : প্রকাশ পাল—'৭৬ ভাদ্র। লাল গির্জার দ্বিশত-বার্ষিকী : জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়—'৭৬ আশ্বিন। বিস্মৃত সাহিত্যসেবী ব্যোমকেশ মুস্তাফী : দেবজ্যোতি দাশ—'৭৬ আশ্বিন।

বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, সুপণ্ডিত, পরমভাগবত শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের লোকান্তর গমনে জি জ্ঞা সা গভীর শোকাহত, লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্যগ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

by the sweat
of the brow...
A hard way to earn a living !
Yet, it is comforting to know
that today's hard work
will lead to a happy, relaxed
tomorrow.
For that you have to make
careful plans. You have to
save regularly for your future
and your family's future.
Save your hard-earned money
with UCOBANK where
it earns interest and
steadily to ensure a
secure future.
UNITED
COMMERCIAL
BANK
HEAD
You can save—
UCOBANK can help you

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 December '69 (0'50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

সপ্তদশ বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৭৬

শুধুই কেশ তৈল নয় একটি কেশ রসায়ন

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকীই ইহার প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্কতা রোধ ক'রে ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-৫

SA-2/69

SALES & SERVICE THROUGHOUT THE COUNTRY

30 লক্ষ মহিলা ভুল করতে পারেন না
গত চার বছরে 30 লক্ষের চেয়েও বেশী স্ত্রীলোক লুপ্ নিয়েছেন। তাঁরা জানেন যে লুপ্ :
ফলপ্রদ—জন্ম নিরোধের সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য যে সমস্ত উপায় রয়েছে, তার মধ্যে একটি।
সরল—কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাক্তারবাবু লুপ্ লাগিয়ে দিতে পারেন।
পরিবর্তনসাধ্য—আপনার যখনই আর একটি সন্তানের প্রয়োজন হবে, আপনি সহজেই এটিকে বের করে আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন।
সুবিধাজনক—লুপ্ নেওয়ার পরে সেটি যদি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, তবে অন্য কোনও উপায় আপনাকে খুঁজতে হবে না। দাম্পত্য সুখের ক্ষেত্রে লুপ্ বাধা সৃষ্টি করে না।
ক্ষতিকারক নয়—লুপ্ নিলে কোনও রোগ হয় না। যদি কোনও উপসর্গ দেখা দেয়, সে সবের সহজেই চিকিৎসা হতে পারে।
অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ডাক্তারেরা মত দিয়েছেন যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের জন্যে লুপ্ একান্ত উপযুক্ত। লুপ যাঁদের সহ্য হয় না, তাঁরা সময়ের ব্যবধানে সন্তান জন্ম ও সন্তান সংখ্যা সীমিত করবার জন্যে অন্যান্য উপায়ের আশ্রয় নিতে পারেন। বাড়ীর সবচেয়ে কাছের পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শ করুন। পরিবার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্তীয় নির্দেশ ও যাবতীয় সেবা-সহযোগ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
গুজবে কাণ দেবেন না
আপনার ডাক্তারবাবুর কথা বিশ্বাস করুন

সপ্তদশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মর্ডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বাংলা শিশু সাহিত্য ও 'ছড়া'

অশোককুমার দে

প্রকাশের ব্যাকুলতার মধ্যে আছে সৃষ্টির প্রয়াস, চেতনার আলোকের বিকিরণ। এই প্রকাশ ব্যাকুলতার মধ্যেই আদিম মানুষের নিজেকে ভাষা দেবার অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। মানুষের উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশের মধ্যেই সাহিত্য সৃষ্টির প্রাথমিক প্রস্তুতি ঘটে। প্রকৃতির বিভিন্ন সৃষ্টির মত সাহিত্যও একটি সৃষ্টি কিন্তু তা স্রষ্টার মনোভূমিজ। সময়ের সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির প্রকরণও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। আজকের দিনে সাহিত্য বলতে ছাপানো কোন রচনা বুঝে থাকি। কিন্তু যে যুগে ছাপাখানা ছিল না, স্মৃতিই ছিল সাহিত্যের বাহন, সে যুগেও সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন গাথাকাব্যে বিশেষত মহাকাব্যসমূহ অনুরূপ যুগ পরিবেশেই রচিত হয়। কলাকৈবল্যবাদীদের মত (Art for art's sake) মেনে নিয়েও বলা চলে যে সাহিত্য প্রধানত মানুষের জীবনসম্ভূত, অলৌকিক কোন সৃষ্টি নয়। অর্থাৎ মানুষকে বাদ দিয়ে সাহিত্য নয়। পূর্বকালে কমবেশী সাহিত্যের এই ধর্মটি বজায় ছিল, এখনও আছে। অধিকন্তু আজকের সাহিত্য ব্যক্তি পরিচয়ে চিহ্নিত। কিন্তু যেখানে লেখকের পরিচয়ে কোন রচনা চিহ্নিত নয়, বা যেখানে লেখকের পরিচয় সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত, সেইসকল ক্ষেত্রে রচনাদি কি সাহিত্য পদবাচ্য বলে গ্রাহ্য হবে না? কিম্বা সেই সাহিত্য যা কোন একজন বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি নয়? এই উভয় ক্ষেত্রেই আমরা লোকসাহিত্যের কথা স্মরণে রেখেছি। কেননা এই সাহিত্য একদিন মানুষের জীবন-সত্যকে স্বীকার করেছিল বলেই মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কে বা কারা এর রচয়িতা আমরা তা জানি না।

সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন ধারার একটি অনুরূপ প্রকরণের সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয়বহ এবং তা 'লোক-সাহিত্য' (Folk Literature) রূপে খ্যাত। লোকজীবনসম্ভূত এবং লোক-সৃষ্ট

এই সাহিত্যে কোন লেখকের পরিচয়েই বড় নয়, বরং এই সাহিত্যের বিশেষত্ব নির্বিশেষ লোকগোষ্ঠীর রসবোধের পরিতৃপ্তিতে। জীবনের সত্যের কাছাকাছি যেতে পেরেছিল বলেই 'লোক-সাহিত্য' আজকের যুগের মানুষকেও বিস্মরণের তীরে দাঁড়িয়ে হাতছানি দেয়। লোক-সাহিত্যের প্রধান উৎসস্থান পল্লী বা গ্রাম। 'অনাধুনিক' কালের জীবন মূলতঃ গ্রামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, গ্রামীণ সংস্কৃতিই দশের এবং দেশের সংস্কৃতি ছিল, জীবন ছিল নিস্তরঙ্গ, অনুরূপ যুগ পরিবেশেও মানুষ নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলতে চেয়েছে এবং সাহিত্যও রচিত হয়েছে। সেই সাহিত্য অবশ্যই মৌখিক এবং তৎকালীন মানুষের স্মৃতিই ছিল এই সকলের ধারক ও বাহক। পূর্বপুরুষগণের ঐতিহ্যবাহী এই সাহিত্যে অনেক কিছুই আছে: উপাখ্যান, কাহিনী, লৌকিকপুরাণ, কবিতা প্রবাদবাক্য, বাগ্‌রীতি, ছড়া, রূপকথা প্রভৃতি। এই ছড়া এবং রূপকথার জগতই শিশু-সাহিত্যের 'পূর্বাচল'। লোকসাহিত্যের সঙ্গে শিশু-সাহিত্যের যোগ এই ছড়া ও রূপকথার মাধ্যমে।

প্রধানত শিশু-সাহিত্য তাকেই বলি—স্রষ্টা যখন সাহিত্যের সৃষ্টিযজ্ঞে যেতে শিশুদের জন্যই যে সাহিত্য-কীর্তি রচনা করেন। সবদেশে সবকালেই 'ছড়া' হল শিশুসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। অনাধুনিক লোক-সাহিত্যের অন্যান্য রচনার মত ছড়ারও কোন লেখক পরিচয় নেই। শিশু-সাহিত্যের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের সম্পর্ক এই সৃষ্টি উৎসের বিচারে। যদিও 'ছড়া' লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং নির্বিশেষ লোকই এই ছড়ার রচয়িতা এবং পাঠক হতে পারে, কিন্তু শিশুদের জন্য রচিত ছড়ার প্রাথমিক রসসিদ্ধি ঘটে শিশুমনেই।

কিন্তু প্রথম মানবশিশুর জন্য কি শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নি? আজ তার কোন খবর জানা নেই। শুধু অনুমেয় যে সেই মানবশিশুর কালেও শিশু-সাহিত্য ছিল। নিশ্চয় তা ছড়া। শিশু আনন্দময় জগতের প্রতীক এবং সে আনন্দ লাভে ইচ্ছুক। ছড়া এবং রূপকথা শিশুমনের নিকট সেই আনন্দের বাণী পৌঁছে দেয়। সেই ছড়ার 'ভাষা' নিশ্চয় আজকার দিনের ভাষা নয়। অতঃ কিম্?

মানব ইতিহাসের উষালগ্নই ছড়ার সৃষ্টি লগ্ন। হিংস্র জীবজগতেও বাঘশিশু তার রক্তপিপাসু মায়ের স্নেহলাভে বঞ্চিত থাকে না। বনজঙ্গলের আদিম মানুষের জীবনবৃত্তেও সন্তানের প্রতি মাতা পিতার স্নেহমমতার পরিচয় মেলে। সন্তানের সেবা যত্ন ও লালন-পালনের মধ্যে মাতৃস্নেহের বাস্তবদিকটি প্রকাশিত এবং সেই স্নেহভাব যখন ভাষা লাভ করে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, তখন তা হয় ছড়া—

"খোকা আমাদের সোনা
চারপুকুরের কোনা।
সেকরা ডেকে মোহর কেটে
গড়িয়ে দেব দানা;
তোমরা কেউ কোরো না মানা।"

—মূলত ছড়াসমূহ "মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীত"। আরও অধিক সত্য যখন ভাবনার জগতে দাগ কেটে যায় যে শিশু মায়েরই সৃষ্টি—মায়ের "ইচ্ছা হয়ে" যে ছিল তার "মনের মাঝারে" —সৃষ্টি যন্ত্রণার সে আনন্দপুঞ্জ। রবীন্দ্রনাথ মায়ের মনের সেই চিরন্তন সত্যকেই প্রতিধ্বনিত করেছেন:

"যৌবনেতে যখন হিয়া উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে।
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।"

যুগে যুগে ভাষার রূপভেদের জন্য ছড়ারও ভাষাগত দিকটির পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু ছেলে ভুলানো ছড়ার মূলধর্মের কোন পরিবর্তন হয় নি। অধিকন্তু ঠাকুরমা ঠাকুরদা দিদির স্নেহের পাত্র, আদরের ধন মানবশিশু। পক্ষান্তরে স্নেহের এই পারিবারিক বৃত্তে শিশুর দাদা ও বাবার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রথম মানুষ দেবতার সৃষ্টি, কিন্তু প্রথম মানবশিশু মায়ের গর্ভজাত। সুতরাং শিশুসাহিত্য বিশেষত ছড়ার সৃষ্টি প্রথম মানবশিশুর কালেই।

শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্যই সাধারণত শিশুসাহিত্যের পরিচয়বহ। কিন্তু সেই শিশুদের বয়সের সীমারেখা কোন পর্যন্ত? বুড়ো বাবা মা'র কাছে ছেলে মেয়ে খোকা খুকু, তা সম্পূর্ণত স্নেহজাত। মানুষের জীবনবৃত্তে শিশুর বয়সের সীমারেখা বেশী হলে আট। ছড়া এবং রূপকথা পাঠ করলে স্পষ্টতই লক্ষ্যে আসে যে ছড়াগুলো কোলের এবং কিঞ্চিৎ ভাষাবোধ সম্পন্ন শিশুর জন্যই রচিত এবং রূপকথা মূলতঃ কিঞ্চিৎ গল্পরস ও ভাষাবোধসম্পন্ন শিশুর জন্যই রচিত। রূপকথার কথক ঠাকুরদা এবং ঠাকুরমারা। তাঁরাই নাতি নাতনীকে ঘুমপাড়ানোর সময় কোন এক রূপময় জগতের কথা বলে এক কল্পময় জগৎও সাবালকের সৃষ্টি করেন এবং শিশুও সেই কল্পময় জগতে ঘুরতে ঘুরতে কোনো এক সময় ঘুমের জগতে ডুব দেয়। সুতরাং শৈশবকালকে ঘিরে এবং শিশুমনের বিকাশোন্মুখ দিকটির বিকাশের সহায়তায় রচিত সাহিত্যই যথার্থ শিশু সাহিত্য। কিশোর সাহিত্যকে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করে শিশুসাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধিতে কেউ কেউ আশান্বিত। কিন্তু শিশুমন আর কিশোরমন এক নয়, দুয়েরই বয়সের ধর্ম ভিন্ন। সুতরাং দুই ভিন্ন বয়সের নিকট সাহিত্যের আবেদনও ভিন্ন। অর্থাৎ শিশু সাহিত্যের গুণাগুণ বিচারে সেই 'শিশুমন' বিশেষ তাৎপর্যবহ।

আজকের দিনে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানাশ্রয়ী। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে। শিশুমনের সার্বিক বিকাশসাধনই আজকের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য এবং এই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গরূপেই নতুন করে আজকে শিশুসাহিত্যের পুনরালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। শিশুর নিকট এই পৃথিবী একটা রহস্যময় খেলাঘর; আবার শিশুর মনও সকলের নিকট এক অজ্ঞাতপুরী। শিশু যে কি চায় তা শিশুও পরিষ্কারভাবে অপরকে জানাতে পারে না। কেননা তার প্রকাশের ভাষা তখনো সুচারু ভাবে প্রকাশক্ষম নয়। কিন্তু উভয়দিকের সর্বপ্রকার বাধাসত্ত্বেও শিশুমনকে অজানা থেকে জানার জগতে পৌঁছতে হচ্ছে এবং এর জন্য শিশুর দিক থেকেই তাগিদ বেশী। সেও পরিণত মানুষের মতো জানতে চায় এই জীবনের পথ কোথায় চলেছে, এর শেষ কোথায়—ক্যুভেডিস্। কথা বলতে শিখবার পর থেকেই শিশুর মনে একটা অহং (ego) ভাবের সৃষ্টি হয়, তখন সে আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ। সে দার্শনিক, তার অফুরন্ত 'কি' এবং 'কেন'-এর উত্তর অনেক সময় অসম্ভব। শিশুমনের এই জিজ্ঞাসা রহস্যময় পৃথিবীতে প্রবেশের আলোকসরণী। শিশুর এই

অহংবোধের পরিণতিতে তিনটি স্তর আছে—(ক) ইঙ্গিতময়তা বা অভিভাবন (suggestivity), (খ) তদাত্মীকরণ (Identifiability) এবং (গ) অহংভাবাদর্শী (ego-ideal)। শিশুমনের এবম্প্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শিশুসাহিত্যের ভাববিশ্লেষণেরই একপ্রকার রূপভেদ মাত্র। সাংসারিক পরিবেশ থেকেই অভিভাবনের সাহায্যে সে ভবিষ্যৎ জীবনবৃত্ত বুঝতে পারে। মায়ের কোলে বা অন্যান্যদের আশেপাশে শিশু ছড়া শুনেছে :

"পাঁকাল মাছের কাঁকল সরু
মেয়েটি যেন কল্পতরু !
মেয়ে হব ঘর নিকব,
পরব পাটের শাড়ী
খড়-খড়েতে চড়ে যাব
জমিদারের বাড়ি।"

—ছড়া শুনে শিশুমনে নিশ্চয় রাধার মতো ভাবোদয় হয় না :

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল...
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

কিন্তু ছড়ার গল্পরস ধ্বনি বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে শিশুদের ভাববোধকে উদ্দীপিত করে, ভাব নতুন চেতনালোকে দাগ কেটে যায়, তার মনের ভাবকে কর্মে ও চিন্তায় ভাষা দিতে সাহায্য করে। কেউ বর-বর খেলে, কেউ বা বধূ এবং এই আচরণের মধ্যে একটা সলজ্জ ভাব আছে—অন্য চক্ষুর অন্তরাল থেকে নিজেকে গোপন করার এক প্রয়াস। বা ছোটমেয়ে সে পুতুল খেলে নিজের কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেয়। অনুরূপভাবে রূপকথার রাজপুত্রের বীরত্বের কাহিনী শুনে, "নিজেকে সেই বীর চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়" এবং মনে মনে অনুকরণের (imitation) চেষ্টা করে। মনোবিজ্ঞানী পিঁআজের মতে সাত আট বছরের শিশুর যুক্তি বিচার দুর্বল। সে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জগৎটাকে বুঝতে চেষ্টা করে। সুস্থান আইজ্যাকশও বলেছেন, 'শিশু সব জিনিসকে জীবন্ত মনে করে, তাদের অদ্ভুত ক্ষমতায় (magic) বিশ্বাস করে আর অসম্ভব স্বতঃবিরোধী (syncretistic) ভাব একসঙ্গে মনের মধ্যে পোষণ করে। ফলে রূপকথার আজগুবি গল্প তাদের নিকট কষ্টকল্পনা মনে হয় না বরং তা সহজ সুন্দর। শিশু-সাহিত্য রচনায় তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে শিশুমনকে জানার। ফলে আজকের দিনের শিশু-সাহিত্য রচনায় বিজ্ঞানপ্রসূত শিশু মনোবিজ্ঞানের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে আগেকার দিনের মা-ঠাকুরমারা শিশুমনকে কল্পনাদ্বারা নিরীক্ষণ করেই শিশুসাহিত্য রচনায় ব্রতী ছিলেন।

শিশুসাহিত্যেরও রূপভেদ আছে—ছড়া-রূপকথা-ভূতুড়েগল্প-কবিতা-নাটক-হাস্যকৌতুক-রোমাঞ্চকাহিনী-অভিযান বা এ্যাডভেঞ্চারমূলক রচনা। এককথায় রস পরিণতিতে শিশুমনকে লক্ষ্য রেখে মানবমনে যা কিছু রচিত তাই শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

ছড়া বিশেষত ছেলেভুলান ছড়া একটি ছন্দায়িত ভাব, এই ভাবটি প্রধানতঃ মাতৃহৃদয়ের স্নেহোৎসারিত সৃষ্টি। শিশুমনের সহজাত প্রবৃত্তি সহজভাবে হাল্কাসুরে এবং ধ্বনি জটিলতায় না গিয়ে রস চমৎকারিত্ব ভোগ করা। শিশুর ক্ষেত্রে এই রস নিষ্পত্তি সাহিত্যের ব্রহ্মা স্বাদসহোদর নয়, ধ্বন্যালোকের আলোক এখানে ম্লান হয়েছে "শিশু ভোলানোর" বিভূতির কাছে। অধিকন্তু আধুনিক কালে প্রবেশের পূর্বে শিশুর মায়েরাই ছিলেন মূলতঃ এই শিশু-সাহিত্যের রচয়িতা, বিশেষ করে ছেলেভুলানো ছড়ায়, আর ছিলেন ঠাকুরমা এবং ঠাকুরদা।

উপাখ্যানধর্মী রচনার দুটো ভাগ: (ক) রূপকথা, ও (খ) ভূতুড়ে গল্প। এই দুয়ের মধ্যে 'রূপকথা' মার্জিত মনের পরিচয়বহ। একসময় ছিল যখন রূপকথা শিশুসাহিত্যের বিষয়ীভূত অন্যতম কলাকৃতি। রূপকথার সৃষ্টিকাল আজো অজ্ঞাত। অনুমান সাপেক্ষ যে সব সাহিত্যেই কবিতার সৃষ্টি আগে, পরে গল্পের সৃষ্টি। এর অর্থ এই নয় যে গল্প শুনবার ইচ্ছেটা পরবর্তী। কবিতার মধ্য দিয়েও গল্পের ছবি সৃষ্টি হতে পারে। রূপকথার বড়ো বৈশিষ্ট্য এর চমকপ্রদতা, জমজমাট গল্পরস এবং মোহিনী ভাব—তারপর…তারপর…তারপর শ্রোতা ছুটে যাবে শেষকে জানতে। কিন্তু ভূতুড়ে গল্পের মধ্যে একপ্রকার অবিমিশ্র ভীতি জড়িয়ে আছে; মারাত্মক ধরনের কোন ভয় নয়, কিন্তু শিশুমনের পক্ষে সামান্য ভয়ের ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট। রাত্রির অন্ধকারে ঠাকুরমার কোলে আঁকা-বুড়ী, বাঁকা-বুড়ীর গল্প শুনতে শুনতে নিজের মধ্যেই ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং নিজের কল্পনাকেও আর প্রসারিত না করে জোর করে চোখের পাতা মিট মিট করতে করতে যতশীঘ্র সম্ভব ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করে।

ছড়া এবং উপাখ্যানধর্মী রচনা সমূহই শিশুসাহিত্যের মৌলিক সৃষ্টি এবং তা আধুনিক জীবনবোধের পূর্বের সৃষ্টি। কবিতা-নাটিকা-হাস্যকৌতুক ও রোমাঞ্চকর রচনাসমূহ আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তির সৃষ্টি এবং পরিণত বয়স্কপাঠকদের জন্য সৃষ্ট সাহিত্যে অনুকরণ (imitation) জাত। আজকে দিনের কবিরা বুদ্ধিগ্রাহ্যমন নিয়ে শিশুর জন্য ও শিশুকে কেন্দ্র করে কাব্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু শিশুরপক্ষে সেই কাব্যজগতে প্রবেশ সহজ নয়। বা নাটিকা সমূহ, এইগুলো সাধারণত অন্যান্য মহৎ নাটকের অনুকরণে শিশুদের উপযোগী করে রচিত হয়। এই ধরণের সৃষ্টিকে সাধারণত শিশুমনের উপর আরোপিত সাহিত্য চেতনা বলা চলে। বিশেষত এই সিদ্ধান্ত বাঙলা শিশুসাহিত্যের সর্বাংশে প্রযোজ্য।

শিশুসাহিত্য বলতে প্রথম ছেলে ভুলানো ছড়াই বুঝে থাকি। অনাধুনিক কালের মত আজও ছড়ার রচনা ও চর্চা চলছে। অবশ্য আজকের দিনে এই ধরণের ছড়ার মধ্যে কিছু কিছু ভাবগত পরিবর্তন ঘটেছে। প্রধান কথা হল ছড়া ভাবসর্বস্ব বা কোন abstract idea বিশেষ নয়, এর ভিতরেও একটা রূপময় জগৎ আছে, তা পরিণতিতে আজকের "ছোটগল্প"-কেও হার মানায়, এই রূপকেই যথার্থ ছবি বলা চলে, এর প্রয়োজন শিশুমনের কল্পনার প্রসারণশীলতায়:

"নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে
ও পারেতে ছেলেমেয়ে নাইতে নেমেছে।

দুইধারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে—উঃ বড্ড লেগেছে।'

—গ্রাম বাঙলার নদীর ধারের এক সামগ্রিক চিত্র শিশুমনকে পৃথিবী ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি রূপময় ধারণা দিচ্ছে।

রূপকল্পনার প্রসারণশীলতাই বোধহয় মুখ্য নয়, শিশু মনে একটা আবেশ সৃষ্টিও বোধ হয় বড় কথা। এই আবেশ সৃষ্টি হয় সুর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে—

"খেনা নাচন খেনা
বট পাকুরের ফেনা।......' ইত্যাদি।

মায়ের কোলের স্নেহচ্ছায়ায় এবং বোলের তালে তালে শিশু কোন এক অজানা মুহূর্তে ঘুমে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থকে কেন্দ্র করেই রচনা করেছেন "ছেলে ভুলানো ছড়া"। শিশু ভোলানাথের সঙ্গোপন রহস্য এখানেই নিহিত।

ছড়ার নিজস্ব একটি রূপগত দিক আছে। এই সম্পর্কে সুনির্মল বসুর মন্তব্য অনুধাবনীয়: "ছড়া লিখবার রীতি-নীতি ও পদ্ধতি সাধারণ রচনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।" ছড়ার নিজস্ব একটি ছন্দরীতি আছে, এর নাম "ছড়ার ছন্দ"। অন্যান্য সাহিত্যেও ছড়ার ছন্দ-রীতি আলাদা। বাঙলা ছন্দ প্রকৃতি ভেদে তিন প্রকার: স্বরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত-অক্ষরবৃত্ত। 'স্বরবৃত্ত' ছড়ার ছন্দেরই নামভেদ। এটি দলমাত্রিক বা দলবৃত্ত রীতির ছন্দ। বাঙলার লোকজীবন সম্ভূত সাহিত্যই এই ছড়ার উৎসস্থল, রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় "বাঙলা লৌকিক ছন্দ"। ভাষার বিচারে ছড়ায় ব্যবহৃত তিন চতুর্থাংশ শব্দই তদ্ভবজ ও দেশী, দেশীশব্দের অনেক কথাই সুরসৃষ্টির সহায়কধ্বনি মাত্র, কোন বিশেষ অর্থবহ নয়। যেমন—

ক. ইচিং বিচিং জামাই বিচিং
খ. ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
গ. আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল

ভাবের ক্ষেত্রে অসংলগ্নতা ছড়ার অন্যতম ধর্ম। অনেক ক্ষেত্রেই ছড়ার ভাবটি একমুখী নয়। যেমন—

"খেনা নাচন খেনা
বটপাকুরের ফেনা
বলদে খেলো চিনা
ছাগলে খেলো ধান
সোনার যাদুর জন্য যেয়ে
নাচনা কিনে আন।"

—এই ছড়ার প্রথমছত্র ধ্বনিসর্বস্ব, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ছত্রে কোন ভাবগত ঐক্য নেই, শুধু এই ক্ষেত্রে শিশুর কল্পনাপ্রবণ মনের প্রসারণের সহায়ক তিনটি বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আর ছড়ার শেষপর্যায়ে মাতৃস্নেহের উৎসারণ ঘটেছে।

ভাবের অসংলগ্নতা স্বীকার করেও বলা যায় যে ছড়ার মধ্যে একটা গল্পরস আছে, কাহিনীর অসম্পূর্ণতা অবশ্যই লক্ষণীয়। গল্পশোনা শিশুমনের এক চিরন্তন ধর্ম। কিন্তু কিসের গল্প? সেই গল্প যেখানে শিশু তার সমবয়সীকে খুঁজে পায়। একদিন মায়ের বুকে ঠাকুরমার কোলে ছড়ার মারফত শুনতে শুনতেই বড় হয়ে উঠে এবং শিশুবোধের জগতে প্রবেশ করে :

"এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে,
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।
এ মাসটা থাকো দিদি কেঁদে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে।
হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হল দড়ি
আয়রে আয় নদী জল, ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"

—কৌলীন্যপ্রথার দয়ায় বহু সতীনের ঘরে নববধূর অবস্থাটা শোচনীয়। এরপর যদি শাশুড়ী জ্বালা, ননদিনী কাঁটা থাকে, তবে অবস্থা আরো করুণ হয়ে ওঠে। একদিন শ্রাবণ বেলায় ভাই এসেছে দেখা করতে দিদির সঙ্গে। নব বিবাহিত জীবনের সুখ তার কপালে নেই, বাপের বাড়ি ভাইয়ের সঙ্গে ফিরে যাবার জন্য সে ব্যগ্র, পতিগৃহ আর তার কাম্য নয়। তৎকালিক বাংলাদেশের নারী জীবনের এই অন্তর্বেদনাই রূপক হয়ে আগমনী গানে ধ্বনিত হয়েছে॥

বাংলার শিশুসাহিত্য আছে। কিন্তু কোথায় তার উৎসমুখ? মানবসভ্যতার প্রবহমানতার মধ্যেই ফল্গুর মত শিশুসাহিত্য প্রবহমান। এইসূত্রে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের শিশু সাহিত্যের মত বাঙলা শিশু সাহিত্যও প্রাচীনত্বের স্বাক্ষরবহ। আজকের যুগে না আসার পূর্বপর্যন্ত আলোচ্য সাহিত্যের বিশেষ কোন তথ্যবহুল ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের নিকট নেই। ইতিহাস বিমুখ জাতি বলে নয়, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বের বাঙলা শিশু সাহিত্যের কোন লেখ্যরূপ নেই। বাঙলা লোক-সাহিত্যের অন্যান্য রচনার মতো এটিও একটি মৌখিক সাহিত্য। আবহমান কাল ধরে বাঙালী মায়ের মুখে মুখে ফেরা এই ছড়া বা রূপকথার প্রাচীনত্বের প্রতি আজ আর কোন সন্দেহ নাই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও ছড়া প্রভৃতিকে বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে স্বীকার করেছেন। ন্যূনপক্ষে এই প্রাচীনত্ব প্রায় একহাজার বছরের। সময়ের পরিবর্তনের পথে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। আজকের ছড়ার মধ্যে হাজার বছর আগের ধ্বনিগত রূপটি নেই, যেমনটি 'চর্যাপদে' বা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' ধৃত আছে। আজকে যা আছে তা হল ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত পরিবর্তিত রূপটি।

বাঙলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত বাঙলা ছড়ারও কালভেদ নির্দেশ করা চলে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বপক্ষ অনাধুনিক এবং উত্তরপক্ষ আধুনিক। আধুনিক কালের ছড়া রচয়িতাদের ব্যক্তি পরিচয় জানা নেই। বিস্মরণের তীরে আজ তাদের পরিচয় হারিয়ে গেছে। শুধু তাদের স্মৃতিটুকু আমাদের চেতনালোকে দেদীপ্যমান। কিন্তু আধুনিককালে প্রবেশ করেই রচয়িতার রূপভেদ ঘটেছে। এই রূপান্তরকে বলা চলে মৌলিক। কারণ রচয়িতারা মূলত

পেশাদার কবি এবং মায়েরা গেলেন হারিয়ে। অধিকন্তু রচয়িতার ভাবনাগত পরিবর্তনের ফলে আধুনিককালের অনেক ছড়াই আধুনিক বস্তু ভাবনার প্রকাশস্থল হয়েছে। পুনশ্চ মা যেমনটি করে শিশুমনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে, অনুরূপ অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির আরোপণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যেমনটি করে আজকের ছড়া রচয়িতা ভাবছেন—

"একশ চুয়াল্লিশ—
আজ পথে বেরুতে মানা।
পথের উপর ইয়া ইয়া
লাল জুজুদের থানা।
ওরা দিন মানেনা খন মানে না
হাওয়ার গাড়ী চড়ে
দুম ফটাস্ দুম্ ফটাস
দিচ্ছে মানুষ মেরে।"

আধুনিক ছড়া স্রষ্টার পরিচয়বহ। উনবিংশ ও বিংশ শতকের অনেক ছোটবড় কবিই শিশুদের জন্য ছড়া লিখেছেন, আজ পর্যন্ত সেই ধারা অক্ষুণ্ণ আছে। বিশেষত জীবনের প্রবহমানতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই এই ধারাটির বিকাশ ঘটছে। লেখ্যরূপ থেকে যাওয়ায় আজকে আর আধুনিক রচয়িতারা বিস্মৃত হন না। মুদ্রাযন্ত্র এক্ষেত্রে প্রধান আশীর্বাদক। বিশেষ করে এই ব্যাপারে শহুরে জীবনবোধ ও সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। শহুরে জীবন অনেক বেশী জঙ্গম (dynamic), সেখানে স্থিতির চেয়ে প্রকাশ অনেক বেশী কাম্য। সুকুমার রায় এই পর্যায়ের স্মরণীয় ছড়ালেখক। কিন্তু আধুনিক কালেও ছড়া রচনায় মধ্যে অজ্ঞাত লেখকজনের স্বাক্ষর রয়েছে। কেননা আধুনিক বিষয় সম্পর্কিত এমন অনেক ছড়াই আছে যা রচয়িতার নামকে বুকে এঁটে বসে নেই। যেমন—

"আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি।
যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ী।
রেলকাম ঝমাঝম্
পা পিছলে আলুরদম।"

—এইধরণের আধুনিক বিষয়গত রচনা কোন. আত্মভোলা মানুষেরই সৃষ্টি, যাঁরা পথে ঘাটে চলাফেরায় ছড়া কাটেন। সহজ সরল নির্লিপ্ততাই এই ছড়া সমূহের বিশেষত্ব। আনন্দদানেই এই ছড়ার মুখ্য রসসিদ্ধি। এমনি ধরণের একটি ছড়ার অংশবিশেষ উদাহৃত হল—

"পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে
অলরাইট ভেরী গুড্
পাউরুটি বিস্কুট।"

আধুনিক কালে বাংলা শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন দিকে অভিনব উন্নতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু ছড়া এখনও কিছু অংশে ঐতিহ্যবাহী সৃষ্টি। আধুনিক কালের হয়েও ছড়ার চিরন্তন ধর্ম রক্ষিত, বিশেষ করে অগভীরতা এবং অর্থের সারল্য। যেমন—

"খুকুর হবে বিয়ে,
শাখ বাজাবে টিয়ে
দাঁড়কাকেরা জুটবে হেথায়
বরণ ডালা নিয়ে।

ভাজতে লুচি আরসোলারা
আসবে মায়ে ঝিয়ে
দুধু খেয়ে বসবে খুকু
ছাঁদনা তলায় গিয়ে॥"

—সুনির্মল বসু

এক্ষেত্রে সুনির্মল বসুর একটি উক্তি স্মরণ করি: "আগে বিশেষ কিছু ছড়া লিখিনাই, কিন্তু আমার এই কাব্যজীবনের মূল উৎস হচ্ছে আমার সেই বাল্যজীবনের মা ঠাকুরমার মুখে শোনা মধু ঝরানো সুরেলা ছড়াগুলি।" আধুনিক যুগে ছড়া লিখিয়ে রূপে অনেকেরই বিশেষ খ্যাতি লাভ ঘটেছে। মাত্র শিশু সাহিত্যিক রূপেই সেই পরিচয় সীমিতি নয়, স্রষ্টারা অনেকেই স্ব স্ব যুগের বুদ্ধিজীবী মহলের ঋত্বিকও ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা যখন নতুন জাগার চেতনায় উত্তাল, বাঙালীর জীবনবোধ যখন সচল ও চেতন, সমকালীন মানুষ তখন অনাগত ভবিষ্যতের জনকের জন্য চিন্তা করছে। Alice in wonderlands-এর মতো বই তাদের মনে হয়তো নতুন জিজ্ঞাসার ঢেউ তুলেছে। সেই নতুন চেতনালোকের কাণ্ডারী হলেন বিদ্যাসাগর—লালবিহারী দে—শিবনাথ শাস্ত্রী—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—রবীন্দ্রনাথ (বিশেষত ঠাকুরবাড়ীর প্রচেষ্টা) যোগীন্দ্রনাথ সরকার। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগ ও রচনার দ্বারাই বাঙলা শিশু সাহিত্যের ভূমি কর্ষিত হয়, দেখা দিল শিশু সাহিত্যের সোনালী যুগ, চেষ্টা চলল শিশুমনকে নতুন মাটির নতুন সোনালী ফসলে ভরপুর করে দিতে।

মূলত উপাখ্যানধর্মী অনুবাদনির্ভর গদ্যরচনার দ্বারাই উনবিংশ শতাব্দীর শিশুসাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়। এই যুগ বাংলা গদ্যেরও উন্মেষের যুগ। ফলে কবিতা বা ছড়া রচনার চেয়ে গদ্যের প্রতিই তাঁদের একটা সহজ আকর্ষণ ছিল। ঐতিহ্যক্রমেও শিশুদের উপযোগী রূপকথা উপকথা এদেশের লোকমুখে প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক কাহিনী-রূপকথা ভূতুড়ে গল্প-পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ এবং বৌদ্ধজাতকের কিছু কিছু গল্প লোকসাধারণের জানা ছিল। বিদ্যাসাগরও এক্ষেত্রে বস্তু আহরণে বাংলা গদ্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে পারেননি। "ছোটদের বেতাল পঞ্চবিংশতি" বিদ্যাসাগরের উক্তপ্রবণতার পরিচয়জ্ঞাপক। লেখ্য সাহিত্যে রূপকথা যুগের সূচনাও এই রচনায়। ত্রৈলোক্যনাথের "কঙ্কাবতী" ফ্যানটাসী ধরণের রচনা—অবাস্তব স্বপ্ন নিয়ে এমন অপূর্ব রচনা বাঙলা শিশু সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। "কল্পনার নীল সমুদ্র থেকে রূপকমল" তোলা হয়েছে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের ঠাকুরমা ঠাকুরদার ঝুলিতে। আধুনিক পর্বে অনুরূপ কাজ যিনি মৌলিক ভাবে করলেন তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর "ক্ষীরের পুতুল," "আলোর ফুলকি" বাংলা শিশু সাহিত্যে এক অদৃষ্টপূর্ব অভিনবত্ব আনয়ন করে।

"শকুন্তলা" তাঁর এক অনন্য রচনা।

বাঙলা শিশু সাহিত্যে কৌতুক সৃষ্টি এক নতুন সংযোজনা। এই ধরণের রচনা শিশুমনে হাসি ও আনন্দের খোরাক যোগায়। হাস্যকৌতুকে দিলীপ রায়ের "বিরাগীর বিড়ম্বনা", "বেড়াতে যাবার বিখ্যাত স্থান", প্রফুল্ল বসুর "হেঁাদল কুৎকুৎ" ও "মানিক জোড়", মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের "এপ্রিল ফুল", "চায়ের ধোঁয়া"; ব্যঙ্গকৌতুক রচনায় শিবরামের "কথা বলার বিপদ", "মন্টুর মাস্টার", রঙ্গকৌতুকে অবনীন্দ্রনাথের "ভূতপত্নীর দেশ" প্রভৃতি সার্থক সৃষ্টি। দিলীপ রায়ের নির্মল কৌতুক ভাবনার ক্ষেত্রে পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব মনে হয় কাজ করেছে। এই পর্যায়ে হাস্য-রোমাঞ্চ সৃষ্টিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের "ঘনাদার গল্প" এক সফল রসসৃষ্টি।

শিশু উপযোগী কিছু নাটিকা যেমন সুনির্মল বসুর "ফলসা গাছের জলসা" নরেন দেবের "সোনার কাঠি" ও লীলা মজুমদারের কিছু কিছু সৃষ্টি বাঙলা শিশুসাহিত্যের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লেখনীয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি "অবন মহলের" কথা। এই মহল সৃষ্টির উদ্দেশ্যও শিশুমনে নাট্যরসস্ফুরণ। আলোচ্য পর্যায়ের বেশ কিছু রচনা নামে শিশুপাঠ্য হলেও কার্যত শিশুদের বড়দের জন্য।

শিশু যখন শৈশবের সীমা অতিক্রম করে স্বাধীন মনোভাব ও সাহসিকতার পরিচয় দিতে উন্মুখ হয়, তখন সেই মনোভাবের সুষ্ঠু বিকাশ সাধনে অভিযান এ্যাডভেঞ্চার জাতীয় কাহিনী পাঠের প্রয়োজন আছে।

বাঙলা শিশু-সাহিত্যের গদ্যভাগে ইউরোপীয় প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়, বিশেষত বিশশতকের সৃষ্টি পর্যায়ে। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলন এর অন্যতম কারণ। শিশু সাহিত্যের মূলকথা শিশুমনের যথার্থ বিকাশ সাধন—শিশুর চিত্তবৃত্তির পরিধির বিস্তার। শিশুর একটি বয়স আছে যখন সে ছড়া ও রূপকথার গল্পের দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির ফলে যখন সে কৈশোরের সমীপবর্তী, তখন ছড়া বা রূপকথা পাঠে অভিনিবিষ্ট সেইমন কোথায় যে সময়ের গর্ভে হারিয়ে যায় তা শিশুও জানে না, তখন নতুন মন নতুন আস্বাদ লাভের জন্য কল্পনার জগৎ থেকে ক্রমেই মাটির কাছাকাছি নেমে আসে এবং মাটির রূপরসগন্ধ স্পর্শ পেতে সে উৎসুক হয়ে ওঠে। ফলে দুয়ের সন্ধিক্ষণে সে সে-জগতের অধিবাসী হয়, সে জগতের নাম রোমাঞ্চকর জগৎ—সাগর-পর্বত-বনজঙ্গল-নভোচর প্রভৃতি অভিযানের কাহিনী পাঠ করতে করতে সে নিজেকেও সেই অভিযানকারীদের অন্যতম মনে করে।

আধুনিক পর্যায়ে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিককে পেয়েছি। সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শিবরাম চক্রবর্তীর ছড়া অভিনব বিষয় রসের জন্য আস্বাদিত, কিন্তু বর্তমান মানুষের জীবনবোধ নাগরিকতায় উত্তরণের ফলে গ্রামের স্নেহমাখা শ্যামলরূপ গেল জীবন থেকে দূর সরে, ফলে তাঁদের রচনা অনাধুনিককালের মত স্নেহরস দ্বারা জারিত নয়। এই ছাড়া পূর্বকালের ছড়ার ন্যায় শিশুর মনে আবেশ সৃষ্টি করে না, কিঞ্চিৎ উদ্দীপ্ত করে মাত্র, অবশ্য শিশুমনের নিকট নতুন আবেদন পৌঁছে দেয়। আধুনিক ছড়ার এই বিশেষত্বের কারণ এই যে মায়েরা আজকের দিনে আর ছড়া রচয়িতা নন এবং তা মাতৃহৃদয়ের স্পর্শকাতরতাশূন্য। অধিকন্তু

হাস্য কিংবা কৌতুকরসই এই সকল ছড়ার উপজীব্য রস। এই পর্যায়ে সুকুমার রায় অগ্রণী ছিলেন। তাঁর 'আবোল-তাবোল' 'খাই-খাই' বাঙলা শিশু-সাহিত্যের ক্লাসিক এবং এই সকল রচনার বৈশিষ্ট্য একমাত্র হাস্যরস সৃষ্টিতে। সুকুমার রায় উত্তরাধিকার সূত্রে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রসবোধ ও কবিত্ব লাভ করেন। সুনির্মল বসুর "আলপনা" ও "হারা" রঙীন প্রজাপতির মতই শিশু চিত্তাকর্ষক রচনা—এই দিক থেকে ছড়াকার সুকুমার রায়ের সার্থক উত্তরাধিকারী। যোগীন্দ্রনাথের 'হাসিখুসী' শিশুকে সাহিত্য শিক্ষাদানের এক সুন্দর প্রকল্প। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' কিংবা সীতানাথ বসাকের "আদর্শলিপি" দিয়ে যাঁদের বর্ণশিক্ষা ঘটেনি, তাঁরাও বোধহয় 'হাসিখুসী' পড়ে বর্ণশিক্ষা লাভ করেছেন। যোগীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মধ্যে "হিজিবিজি, রাঙাছবি, নূতনছবি, হাসিরাশি" প্রভৃতি শিশুর সারল্যের প্রতীক। এই ছাড়া আছে স্বপনবুড়োর কিছু কিছু রচনা।

বাঙলাদেশের বেশ কিছু সংখ্যক কবি শিশুদের জন্য চিন্তা, ভাবনা এবং সৃষ্টি করলেও তা 'ছড়া' না হয়ে 'কবিতাই' হয়েছে। প্রকৃতই এই সকল সৃষ্টি পরিণত শিশুর জন্য, বিশেষ করে কিশোরবয়স্কদের জন্য। কেন না পরিণত মন না হলে কবিতার রসোদ্ধার সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানবশিশু যখন আর শিশু নয়, পরিণত মনের অধিকারী, সেই পর্যায়ের রচনা কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'অজয়', কালিদাস রায়ের 'পর্ণপুট'। অধিকন্তু "এই ধারার স্নিগ্ধ কোমল রচনা"য় বন্দে আলী মিঞা, জসীউদ্দীন প্রভৃতি স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। মনে হয় এই ক্ষেত্রে শেষোক্ত দুই কবির মধ্যে গ্রামীণ জীবনের প্রভাব কাজ করেছে, বিশেষ করে নদী-নালা বিধৌত গ্রাম-বাঙলার সরল শ্যামল রূপ ॥

বাংলাদেশের প্রাচীন ছড়াসমূহের অন্তর্নিহিত ভাব ও বিষয়ের ভেদ লক্ষণীয় বিষয়। অনেকদিন পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে বাংলা ছড়ার এই বিস্ময়কর বিষয়গৌরবের ও বিষয়বৈচিত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ করে অনাধুনিক কালের ছড়াসমূহ সমকালীনযুগের বাঙ্গালী জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্মৃতি বহন করছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক-লৌকিকপুরাণ চেতনা (Myth)—জীবনবোধ ও জীবনাদর্শ—এককথায় জীবনের সামগ্রিক পরিচয় এই ছড়াসমূহে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামকেন্দ্রিক জীবনবোধই ছিল অনাধুনিক বাংলার বিশেষত্ব, গ্রামীণসমাজ ও সংস্কৃতিই ছিল বাংলাদেশের পরিচয়স্থল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এমন প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।" কোন কোন ক্ষেত্রে "একটা তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখে সমস্ত বংগগৃহ বংগসমাজ জীবন্ত" হয়ে ওঠে পাঠক মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

(ক) সমাজকে নিয়েই আমাদের ওঠা-বসা, সমাজই আমাদের পরিচয়স্থল। গৌরীদান-কৌলীন্য-সতীদাহপ্রথা—এইসবের আবর্তে বাংলার নারীজীবন বিপর্যস্ত। অনাধুনিক কালের সেই বিস্মৃতপ্রায়রূপ কিছু কিছু 'ছেলে ভুলানো ছড়া'য় ফুটে উঠেছে। সমাজ যেখানে স্থাণু, অন্ত বেদনায় নারীমন সেখানে সচল ও বাঙ্‌ময়—

"চোখ খাওগো মা-বাপ, চোখ খাওগো খুড়ো,
এমন বরে বিয়ে দিলে তামাক খেগো বুড়ো।"

এই কৌলীন্যপ্রথার বিষময় পরিণতি সম্বন্ধে যুগসন্ধিক্ষণের গুপ্তকবিও জ্ঞাত ছিলেন—

"শতেক বিধবা হয় একের মরণে।"

কিন্তু আধুনিককালের পূর্বেই সমকালীন সমাজের প্রতি নারীসত্তার অবমাননায় নারীমনের চিরন্তন অভিযোগ প্রাগুক্ত ছড়ার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

(খ) অনাধুনিক কালের কোন কোন ছড়ায় গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। গ্রামীণজীবনের সাধারণ আর্থিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে রচিত একটি ছড়ায় বলা হয়েছে যে প্রকৃতি আনন্দময়, নর-নারীর মনেও সেই আনন্দের প্রকাশ ঘটে। কোন পরিবেশগত কারণে তা সকল-সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। যে-স্বামী প্রকৃতির আনন্দময় রূপে রোমাঞ্চিত হয়ে স্ত্রীর মধ্যে সেই ব্যঞ্জনা খোঁজে, তখনই স্ত্রীর বিরুদ্ধমনের প্রকাশ ঘটেছে—

"কথা কইব কি ছলে,
কথা কইতে গা জ্বলে।"

কারণ যে-স্বামীর মোটাভাত মোটাকাপড় দেবারও যোগ্যতা নেই, তারপক্ষে আনন্দময় জগতের চিন্তা অর্থহীন। আজকের দিনের কোন ভোগমত্ত নারীর মত বিলাসব্যসনের দীর্ঘ কোন তালিকা সেই অনাধুনিক বাঙ্গালী ঘরের বধূ দেয়নি। সাধারণভাবে জীবনধারণের জন্য যেটুকু সম্ভব স্ত্রী-স্বামীর নিকট ততটুকু প্রত্যাশা করেছে।

(গ) অর্থনৈতিক অবস্থার অস্পষ্টতা 'ছেলে ভুলানো ছড়া' সমূহে থাকলেও অনুধাবন করা যায় যে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে সেই অবস্থা কখনো কখনো সংগীন হয়ে উঠতে পারে। এই যুগে জীবনযাপন সহজ সরল ছিল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার উত্থান-পতন ঘটলেও তা সাধারণভাবে গ্রামবাংলার শান্তিকে ক্ষুন্ন করেনি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলাদেশের পশ্চিমভাগে মারাঠাদের চৌথ-আদায়ের উদ্দেশ্যে আগমন ঘটলে তৎকালীন জীবনধারা কোন কোন ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হয়। সেই বিপর্যস্ত রাঢ়বাংলার নর-নারীর ভীত-শঙ্কিত মনের ভাবনাই সেকালের মায়েদের স্নেহভাবনার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।—

"খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ল
বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরুল পান ফুরুল
খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।"

এই ছড়া থেকে একটি জিনিষ সহজেই প্রকাশ পায় যে ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূলত কৃষিনির্ভর ছিল এবং সরকারকে দেয় খাজনা শস্য দিয়েই পরিশোধ করা যেত, তা ধান, পান, রসুনও হতে পারে। এই বর্গীর কথা বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'বাংলার বর্গী' গ্রামবাংলার জীবনকে ভীষণভাবে নাড়া দিতে পেরেছিল বলেই তা মঙ্গলকাব্যেরও বিষয় হয়ে উঠতে পেরেছে। "মহারাষ্ট্রপুরাণ" সেই মঙ্গলকাব্য। স্নেহপ্রবণ

মাতৃহৃদয় বিশৃংখল অর্থনৈতিক অবস্থায় সন্তানের ভবিষ্যৎ মংগলাকাংক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন। আলোচ্য ছড়ায় তৎকালীন জীবনভাবনা ও দেশের অবস্থার একটি সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে।

(ঘ) বিভিন্ন ছড়ায় বিভিন্নভাবে সাময়িক উৎসবাদির কথা প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামবাংলার লৌকিক বিশ্বাসের মংগলদেবতারূপে 'শিবায়ণের' শিব কৃষককুলে কৃষির দেবতারূপে পূজিত। চড়ক উৎসব-নীলপূজা-শিবের গাজন প্রভৃতি একই উৎসবের অংগ বিশেষরূপে চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।—　　"আমরা দুটিভাই শিবের গাজন গাই।

ঠাকমা গেছেন গয়া-কাশী ডুগডুগি বাজাই।"

শিবায়ণের কাহিনী ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের লোকজীবনে প্রচলিত ছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকায়ত শিবচেতনা বিশেষভাবে কাজ করেছিল। পৌরাণিক শিবচেতনাও কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করেছে। কাশী ত্রিকালজ্ঞ শিবের পীঠস্থান। বৃদ্ধবয়সে ঠাকুরমাদের বিশ্বনাথের নিকট আশ্রয়লাভ পরমকাম্য। এবং এই শিব দেবাদিদেব মহাদেব এবং পৌরাণিক। লক্ষ্যণীয় এই ছড়ায় লৌকিক শিবদেবতার সংগে পৌরাণিক শিবের মিলন ঘটেছে।

সাধারণভাবে সামাজিক উৎসবাদির মধ্যে বিবাহ-উৎসবের কথা 'ছেলে ভুলানো ছড়ার' মধ্যে বিশেষভাবে শোনা যায়। বাঙালী জীবনে কৌলীন্য প্রথা, বহু-বিবাহ প্রভৃতির প্রচলন থাকার জন্য ছড়ার মধ্যে উক্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্মটি বিভিন্ন প্রসংগে উল্লেখিত হয়েছে।

(ঙ) লৌকিক পুরাণ (Myth) চেতনা : Myth মানুষেরই জীবন ও চেতনা সম্ভূত। বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহ কম-বেশী বাংলা দেশেরই পুরাণকাহিনী এবং তা বাংলার লোকজীবন উদ্ভূত। মঙ্গল-কাব্যের মনসা-চণ্ডী-শিব প্রভৃতি লোক দেবতা বাংলার লোকজীবনের সংগে সম্পর্কিত থাকায় ছড়ার মধ্যে বিভিন্ন মঙ্গলদেবতার বিক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে গিয়েছে। Myth চেতনার বিচারে শিবদেবতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে এবং এই পর্যায়েও উক্ত হচ্ছে; মঙ্গলকাব্যের একমাত্র রৌদ্রচরিত্র চাঁদসদাগর, দৈবানুগৃহীত বাঙ্গালীসমাজে চাঁদ একমাত্র এবং সর্বশেষ পুরুষাকারের পূজারী, বিভিন্ন ছড়ায় মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন দেবদেবীর কথা উক্ত হলেও বাংলার মানস-বিদ্রোহের প্রতীক চাঁদ বিভিন্নপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। কেননা বাংলার নিগৃহীত সাধারণ মানুষেরা সুখে-দুঃখে চাঁদকে ভুলে যেতে পারেনি। যেমন—　১. "বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এল বান।

শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥"

২. "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যখানে চর।

তারিমধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর॥"

৩. "ডিম্-ডিমা-ডিম　　ডিম্-ডিমা-ডিম্

কিসের বাদ্যি বাজে?

চাঁদের বেটা লখিন্দর　বিয়ে করতে সাজে।"

(চ) বাঙালী ঘরের কথা : কিছু সংখ্যক ছড়ায় স্পষ্টভাবেই বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, জীবনের সীমাবদ্ধরূপের অবস্থা, আশা-আকাংক্ষা ভাষা লাভ করেছে। প্রকাশ পেয়েছে ভাই-বোনের স্নেহ প্রীতির কথা, নববধূর দুঃসহ জীবন-যাপনের কথা। এই

প্রসংগে "এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক টুক করে"—ছড়াটির উল্লেখ করা চলে। রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াটির সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর ভিতরকার সমস্ত মর্মান্তিক কাহিনী, সমস্ত দুর্বিষহ বেদনাপরম্পরার তাৎপর্য রসজ্ঞ পাঠকের অনুভূতির অগম্য থাকে না। বিবাহের দীর্ঘদিন বাদে একদিন শ্রাবণ বর্ষায় "পিতৃগৃহের চিরপরিচিত ব্যথার ব্যথী ভাই আপন ভগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে—(দিদির) হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সেদিন আর কি বাধা মানিতে পারে।"

শাশুড়ী-ননদিনী-ঝি কণ্টকিত একান্নবর্তী বাঙালী পরিবারে নববধূর চলাফেরা সহজ সরল ছিল না। জীবন এক এক সময় বিষময় হয়ে ওঠে। ফলে এমনি এক বাঙালী ঘরের বধূ ঘর ছেড়ে বনে চলে যায়, কিন্তু বাঘ-কুমীরের জন্য জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। ফলে আবার 'পতিগৃহে যাত্রা' :

"কুমীরের ভয়ে গেলাম বাড়ী দাসীর মুখ ফুটে।
দাসীর ভয়ে গেলাম ঘরে ননদে মন্দ বলে;
ননদের ভয়ে রাঁধতে গেলাম শাশুড়ী ওঠে জ্বলে।
রাগ কোরো না শাশুড়ী গো, আমি তোমার মেয়ে,
তুমি যদি তাড়াও বল দাঁড়াই কোথায় যেয়ে?"

সত্যই অনুরূপ গৃহপরিবেশে বাঙালীবধূর ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, কেননা এই সংসারতরী বড়ই ছোট।

ঘর-সংসার-বিবাহের মধ্যেই বাঙালী জীবনের সীমাবদ্ধতা। সেই অনাধুনিক কালের কষ্টিপাথরে জীবনবোধের সোনালীরূপটুকু শেষবারেরমত বিবাহের মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অনাধুনিক কালের বেশ কিছু সংখ্যক ছড়ায় ওই বিবাহের কথা, উৎসবরূপে নয় জীবনের প্রয়োজন-বোধেই, ঘুরেফিরে এসেছে। মনে হবে জীবনবোধের পরিসমাপ্তিও বিবাহের সাতপাকের মধ্যে :

"দোল দোল দুলুনি। মা কেন কেঁদে মর
রাঙা মাথায় চিরুনি॥ আপনি বুঝিয়া দেখ
বর আসবে এখনি। কার ঘর কর॥"
নিয়ে যাবে তখনি॥

জীবনের চাওয়া-পাওয়ার সব কিছুর যেন শেষ ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ দুই ছত্রে উচ্চারিত হয়েছে শাশ্বত বাণী : "আদ্যকাল হইতে অদ্যকাল পর্যন্ত বংগীয় জননীর কতদিনের শোকের ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে।"

সুতরাং এখন আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে অনাধুনিক কালের সমগ্র বাঙালী জীবন মথিত হয়ে এই ছড়ার মধ্যে মূর্ত হয়েছে এবং মর্মরিত হচ্ছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ আগমনকে কেন্দ্র করে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার রূপান্তর ঘটে। ইংরেজ বণিকদের স্বার্থের অনুকূলে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পাশাপাশি বাণিজ্যিক অর্থনীতির (Mercantile Economy) সূচনা বিকাশ ঘটে এবং এই অভিনব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অনুকূলে বাংলার জীবনব্যবস্থায় নগরজীবন-বোধ

দেখা দিল, সৃষ্টি হল নতুন জীবনচেতনা, নাগরিক সংস্কৃতি-এর পূর্ণায়ত রূপ। জব চার্নকের কলিকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে বাঙলা-দেশের এই পরিবর্তন ঘটছে। আধুনিক অর্থে এই প্রথম বাঙালীর জীবন হল নগরমুখী—গ্রাম বাংলা থেকে নগর বাংলায় উত্তরণ, ভাঙন ধরল গ্রামীণ সংস্কৃতি ও জীবনবোধে। তৎকালিক যুগের মানুষের নিকট কলিকাতা হল সেই শহর যেখানে দুটো পয়সা আয় করা যাবে। একটি ছড়ায় এই পয়সার কথা বলা হয়েছে, এক আদুরে বোন সোহাগ ছলে তার দাদার নিকট আব্দার করছে— "দাদাগো দাদা শহরে যাও,
তিন টাকা করে মাইনে পাও।"

এর পরের কথা বাঙালীর চিরাচরিত জীবনবোধ সঞ্জাত—এবার উপার্জনক্ষম দাদাকে বিয়ে করে বোনের জন্য একটি খেলার সাথী আনতে হবে। লক্ষণীয় যে পরিবর্তিত অবস্থায় যুগের ক্রান্তিমূল্য এখানে স্পষ্ট। অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হতে চলেছে। এই পরিবর্তনের পথেই ছড়াও সেই যুগচেতনার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। যুগের ক্রান্তিমূল্যকে স্বীকার করেই ছড়া আজ আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত।

ছড়ার এই রূপান্তর বিধৃত হয়েছে বিভিন্নভাবে—শহরের কথায় পোশাক-পরিচ্ছদের উল্লেখে, জীবনবোধের পরিবর্তনে, বিভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণনায়, বিভিন্ন দেশের উল্লেখে, যানবাহনের বর্ণনায়, বিভিন্ন ইংরেজী শব্দের ব্যবহারে। কিন্তু এই রূপান্তরে ছড়ার কোন বিকৃতি ঘটেনি, পরিবর্তিত জীবনস্রোতে এক সহজাত সৃষ্টিরূপেই ছড়ার সৃষ্টি চলছে। বিভিন্ন ছড়াকারের রচনায় এই সৃষ্টির স্বাক্ষর অব্যাহত আছে।

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে বাংলা শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। এই পর্যায়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী অগ্রণী ছিল, এবং ছিল রায়চৌধুরী পরিবার। রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণে রেখেও অবনীন্দ্রনাথকেই স্মরণীয় বলতে হয়। আধুনিক যুগে নগরজীবনের চমককে অস্বীকার করে গ্রামীণ জীবনের স্বাদ এবং শ্যামলিমাকে বহন করে এনেছে জসীমউদ্দীন এবং বন্দে আলী মিঞার রচনা। সুনির্মল বসুর কৃতিত্ব কিন্তু সর্বাধিক। কেননা ছড়ার মূল রূপ রস গন্ধ এই যুগেও তার রচনায় আস্বাদিত হয়। এই শতাব্দীতে ছড়া রচনা বাদে শিশুসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও বিশেষ করে কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সূচিত হয়। এই কাহিনী দু'ভাবে রচিত হয়েছে—(ক) গদ্যে, (খ) পদ্যে। পুরাণ চেতনা বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারতের মহাকাব্যিক রস ও চেতনা এই ধরণের কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দান করে। ইদানীংকালে 'শিশু সাহিত্য সংসদের' প্রযোজনায় শিশুদের জন্য সহজ সরল গদ্যে রামায়ণ-মহাভারত-কথাসরিৎসাগর অবলম্বনে কাহিনী সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে শিশু মনকে একই সংগে গল্পরসের আনন্দদানের সংগে ভারতীয় ঐতিহ্যের জগতেও ঘুরিয়ে আনা হচ্ছে। শিশুমনও বৃহৎ জীবনবোধের সংগে পরিচিত হবার পথ খুঁজে পায়। স্বাধীনতা উত্তর যুগে এই নতুন জীবনদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতার লক্ষ্য মানুষের সার্বিক বিকাশ, জাতিরূপে বিশিষ্ট পরিচয় দান; আর বৃহত্তর লক্ষ্য অনাগতকালের নব জাতকের চলার পথ সুগম করা। পুনশ্চ জাতির যারা ভবিষ্যৎ, সাহিত্য নিশ্চয় তাদের অবহেলা করতে পারে না। নতুন জীবনের প্রয়োজনবোধেই তাই স্বাধীনতা-উত্তর কালের

শিশুসাহিত্যে বিভিন্নপ্রকার সংযোজন দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যের মূলে তিনটি কারণ কাজ করেছে—(ক) শিশুমনের পরিধির বিস্তার, (খ) শিশুর জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ প্রস্তুতি, (গ) আধুনিক যুগ চেতনা ও আদর্শের সংগে পরিচিতি। এই প্রসংগে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক H. G. Wells-এর নিকট Maxim Gorky-র লিখিত একটি পত্রের অংশ বিশেষ উদাহৃত হল :—

Today, perhaps more than ever before, children are the best and most necessary things on earth. The Children of Russia need more than all other to get acquinted with the world, it's great men and their labours for mankind's happiness. We must cleanse children's hearts from the blood-staned rust of this horrible and senseless war, we must restore in those hearts a faith in humanity and respect for it."

গর্কীর চেয়ে স্পষ্টভাবে আজকের দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনার প্রয়োজনীয়তা নতুনভাবে বলবার আর অপেক্ষা রাখে না। আজকের যুগে শিশুর গুরুত্ব উপলব্ধির মূলে কাজ করছে মানবিকতার মূল্যবোধ—মানুষের পূর্ণত্বই এই উপলব্ধির কাম্য।

ঐতিহ্যগত বা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারসূত্রে (Cultural Heritage) বাঙালী যা লাভ করেছে তন্মধ্যে লোক-সংস্কৃতি (Folk Culture) এবং লোক-সাহিত্য (Folk literature) অন্যতম। বাংলার গ্রামেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব। কোন নাগরিক মন বা চেতনা এই সংস্কৃতির পশ্চাতে বিশেষভাবে কাজ করেনি। অধিকন্তু এই সংস্কৃতি চেতনা অনেকাংশে লোকায়ত এবং আঞ্চলিক। বৃহত্তর কোন বঙ্গ সংস্কৃতি আধুনিক যুগের পূর্বকালে রূপলাভে করেনি। ফলে গ্রাম-জীবনও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, ব্যাপক জীবনবোধও গড়ে ওঠেনি। কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনও বাংলার গ্রামসমূহকে একই সূত্রে বন্ধন করে কোন বৃহত্তর সমাজবোধ গড়ে তুলতে পারে নি। লোকায়ত পুরাণ মঙ্গলকাব্যসমূহের দেব-দেবীদের etymological ইতিহাসই বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট। প্রাচীন বা অনাধুনিক কালের ছড়াসমূহ গ্রামবাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির রসপুষ্ট বাঙ্ময় প্রকাশ। সম্ভবত কালধর্মের ছড়ার এই অন্তর্নিহিত রূপটি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। অধিকন্তু লোক-সাহিত্য সম্পর্কে যে গর্ববোধ আছে, সেই গর্বের অন্যতম স্থল এই ছড়া সমূহ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালী যখন আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে এবং প্রয়োজন হয়েছে বিদেশী মোহ থেকে মুক্তি লাভের; তখনই বাঙালীপ্রাণ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাঙালী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হন। গুরুসদয় দত্ত সর্বপ্রথম বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির পুনর্গঠন ও পুনর্মূল্যায়নে মনোনিবেশ করেন। ফলে লোকায়ত সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পুনরুদ্ধারকার্য চলতে থাকে। এই সময়ের এক ভাষণে রবীন্দ্রনাথও বাঙালীর দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করেন : 'আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে, স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলেভুলাইবার ছড়া, প্রচলিতগান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অংগ।"

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে আধুনিক যুগে 'ছড়া' বাংলা লৌকিক ছন্দে রচিত হলেও আর কি তা লোক-সাহিত্যের পরিচয়বহ ? স্পষ্টতই নয়। কেননা আজকের সাহিত্য আর লোক-সাহিত্য নয়, আধুনিক যুগে রচিত ছড়া ব্যক্তি পরিচয়ে চিহ্নিত এবং আধুনিক যুগ ভাবনায় পরিশীলিত। উপরন্তু এই ছড়া নগর জীবনরসে সঞ্জীবিত। এবং তার আবেদনও আজকের শহর-নগরের মানুষের নিকটেই। শিক্ষার প্রসারে অবশ্যই আজকের গ্রামের মানবশিশু নগরের মানবশিশুর কাছাকাছি এসে যাচ্ছে ; প্রকারান্তরে গ্রামের মানুষও আজ নগরমুখীন, কি শিক্ষা, কি জীবিকা, সর্বপ্রকারে। আজকের দিনে যাঁরা ছড়ার রচয়িতা তাঁরা এই শিশুমনের নিকটই তাঁদের রসাবেদন নিবেদন করছেন। কিন্তু এই শেষমুহূর্তেও একটা কিন্তু থেকে যায়। প্রশ্নটা দু'দিক থেকে আসে—(ক) ছড়ার ছন্দে লেখা সব কিছুই কি ছড়া ? (খ) 'ছড়া' মাত্রই কি শিশুসাহিত্য ?

ছড়ার ছন্দে লেখা যে-কোন রচনাই 'ছড়া' নয়। এই পর্যায়ে লক্ষণীয় যে ছড়ার ছন্দে রচিত হলেও তা শেষ পর্যন্ত কবিতা। রবীন্দ্রনাথ শিশুকে ভালবেসেছেন, কারণ নিজের মাতৃহীন শিশুদের করুণ অবস্থা অনুভব করেছেন এবং স্মরণের তীর্থপথে আপন শিশুকে রেখে ছড়ার ছন্দে কাব্য রচনা করেছেন। 'শিশু' এবং "শিশু ভোলানাথের" কবিতাসমূহ এই পর্যায়ের সৃষ্টি। কিন্তু এই কাব্যসমূহ শিশুদের মনোগ্রাহ্য নয়, নয় পাঠ্য, বরং তা শিশুর মাতা-পিতাদের রস-চর্বনার জন্যই রচিত। কেননা রবীন্দ্রনাথের এই সৃষ্টি পর্যায়ে শিশুরা একটা idea বিশেষ, কবির কল্পজগতের কেন্দ্র বিন্দু। যেমন—

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?" [জন্মকথা]

রসজ্ঞ পাঠককে এই কবিতা পাঠের পর বলে দিতে হয় না যে উক্ত উদ্ধৃতিটি কবিতা কিংবা ছড়া। শিশুদের কেন্দ্র করে রচনা করলেও শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি শিশু-সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি, তা কাব্যরূপেই সমধিক খ্যাত। প্রকৃত শিশুসাহিত্য অর্থে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি পর্যায়ে কিছু নেই বললেই হল।

কিংবা ছড়ার ছন্দে শিশুদের জন্য রচিত ইদানীংকালের সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনার একটি অংশ বিশেষ আলোচ্য প্রসংগে উল্লেখ করা চলে—

"বলতে পারো বড়ো মানুষ মোটর কেন চড়বে ?
গরিব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ?"

মার্কসীয় দর্শনপ্রসূত এই শ্রেণী সংঘাতের বিষয় অনেক শিশুর বাবারই অনধিগম্য। সাত-আট বছরের শিশু ছড়ার মধ্যে সরল নির্মল আনন্দকেই চায়, কোন গভীর তত্ত্বকে সে চায় না।

বা প্রসূন বসু যেমনটি করে দেশের খাদ্যাভাব এবং রেশনিং ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গচ্ছলে দেখেছেন :

"তাই তাই তাই / মামার বাড়ী যাই ;
মামার বাড়ী গিয়ে দেখি / দুধভাত তো নাই।"

তবে কি আছে ? ছড়াকার বলছেন—

"রেশন থেকে চাল-এসেছে
ধান কাঁকড়ে ভরা
কাঁকড় মেশা ভাত খেয়ে
প্রাণটি হলো সারা।"

উদ্ধৃতিসমূহ ছড়ার ছন্দে রচিত। শিশু এই ছড়ার মধ্যে বন্দী। তবুও ছড়ার ভাবজগতে প্রবেশ সরলমনা শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভবনয় এর রহস্যভেদ।

ছড়া মাত্রই শিশু সাহিত্য নয়। কি পূর্বকালে কি একালে ছড়ার ছন্দে অনেক কিছুই রচিত হয়েছে, বিশেষ করে বাংলা লোকসাহিত্যের অনেক অংশবিশেষই উক্ত ছন্দ রীতিতে রচিত। ফলে প্রাচীন সাহিত্যের যা কিছু ছড়ার ছন্দে রচিত তা অবলীলাক্রমে ও নির্বিচারে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভূত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে শিশুসাহিত্যের মূল্যমান ঠিক রেখে সংগৃহীত ছড়ার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাই বাঞ্ছনীয় হবে। বাংলা ভাষার প্রাচীন ছড়া সংগ্রহর মধ্যে "ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে," সেই ছড়া সমূহই যথার্থ শিশু সাহিত্যের অঙ্গীভূত। অনেক গুরুগম্ভীর বিষয়কে হাল্কাভাবে বলার উপায় হল 'ছড়ার' নিজস্ব ঢঙটি, কিম্বা গাম্ভীর্যের সরলী করণে। আধুনিক কালেও ছড়ার ছন্দে এই ধরণের রচনার কাজ চলেছে, প্রচার মাধ্যম রূপেও এই ছন্দরীতির ব্যবহার হচ্ছে। পশ্চিমবাঙলার বিগত মধ্যবর্তী নির্বাচনের পটভূমিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রচারযন্ত্র গড়ে তোলে। এই প্রচার সহায়ক রূপে 'ছড়া' ও রচিত হয়। যেমন—

"মিথ্যে দাদা নাচন কোদন মিথ্যে পাতা ফাঁদ
মিষ্টি কথায় আরকি ভুলি ওগো সোনার চাঁদ॥"

অথবা—"ভেলকি বাহির নটি মাসেই ঘটি গেলার শেষ
আর কিছুদিন থাকলে পরে শ্মশান হত দেশ॥"

এরপর কি বলতে হবে যে উক্ত ছড়া দুটি শিশুদের জন্য রচিত? আজকের শিশুর যাঁরা স্রষ্টা সেই জনক-জননীরাই হয়তো এই সকল রচনার রসোদ্ধারে কার্যক্ষম হবেন। ছড়ার অন্তর্নিহিত ভাব এবং প্রচার যন্ত্রের বাতাসই বা কোন দিকে তা বয়স্কদেরই বোধগম্য।

শিশুদের জন্য রচিত ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায় তা অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য রসমাধুর্যকে 'বাল্যরস' বলেছেন। "এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নুপুর নিক্কণ ঝংকৃত।" সুতরাং শিশুকে শৈশবকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখে আলোচনার শেষ টানা যেতে পারে। যখন সাহিত্যের আলোচনায় "শিশুসাহিত্য" শীর্ষক শ্রেণী বিন্যাস, তখন "কিশোর সাহিত্য" "যুব সাহিত্য" প্রভৃতি শীর্ষক আলোচনার জের কেন যে অনেকে করেন তা আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারিনে। "শিশু সাহিত্যের" আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ শীর্ষক আলোচনা যুক্তি-যুক্ত নয়। ফলে শৈশবের প্রান্তে বাল্যকালের মধ্য দিয়ে যে-কৈশোর দেখা দেয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও যে এর প্রকৃতি ভেদ ঘটে, বক্ষ্যমান আলোচনায় সেইদিকে দৃষ্টি রেখে চিরাপুরাতন অথচ চিরনতুন মানবশিশুকে রাজাধিকার দেয়া হল॥

বৈদান্তিক মনোবিদ্যা

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

আমাদের মন। মনের সাহায্যে আমরা ভালবাসতে শিখি, ঘৃণা করি, বিশ্বের সাথে পরিচিত হই, জটিলতম প্রশ্নের সমাধানে তৎপর হই, অপরকে ঈর্ষা করি, উত্তেজিত হই, আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে হেসে গড়িয়ে পড়ি এবং এই মনের দ্বারাই আমাদের হাসি ও কান্নার ভাব প্রকাশে সক্ষম হই। মনই আমাদের একমাত্র সম্পদ যার প্রক্রিয়ার জন্যই আমরা আজ অন্যান্য প্রাণী হ'তে স্বতন্ত্র-সত্তা অর্জন করেছি। অতি শৈশবকাল থেকে একটু একটু জ্ঞানোন্মেষের সাথে সাথে মনকে আমাদের দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী যা শেখান হয় আমরা কতক পরিমাণে তাই শিখি ও বিশ্বাস করি। বর্ণপরিচয়ের বারটি স্বরবর্ণ যেমন শেখান হলো তেমনিই শিখলাম, অঙ্কগণিতে দুই-এ দুই-এ চার বলা হ'লো চারই বুঝলাম—পাঁচকে চার আর চারকে পাঁচ বললে কি ক্ষতি হ'য়ে যায় কিম্বা স্বরবর্ণের দ্বিতীয় অক্ষর কেন প্রথম অক্ষরের আগে হ'বে না চিন্তাও করতে পারি না —গুরুমশাইরা ব'লেও দেন না, অথচ আমরা মাকেই প্রথমে ডাকতে শিখি পরে বাবাকে অর্থাৎ আকারান্ত শব্দ প্রথম থেকেই আমরা উচ্চারণ করতে শিখি। তাছাড়া মাকে বাস্তবিকতা হিসাবেই প্রথমে আমাদের মন গ্রহণ করে আর বাবাকে আমাদের আমরণ বিশ্বাস ক'রেই চলতে হয়, অর্থাৎ আমাকে বারে বারে বলা হ'য়েছে ইনি তোমার বাবা আমিও বিশ্বাস ক'রেছি ইনি আমার বাবা। এইভাবে শিশুকাল থেকে আমাদের মনকে একপ্রকার প্রতিবর্তিত (কন্‌ডিশনিং) করা হয়। এক হিসেবে বলা যেতে পারে আমাদের জ্ঞানোদয়ের সাথে সাথে অনেক জোরজুলুম চলতে থাকে। তারও আগে থাকতে যা কিছু হয় সেটা উপস্থিত আলোচ্য বিষয় নয়। মোট কথা আমাদের মন সম্বন্ধীয় আলোচনা নিতান্ত জটিল ব্যাপার। তাই যখন দেখি অর্দ্ধ-জ্ঞান প্রাপ্ত কিম্বা "ভুঁইফোড়" মনোবৈজ্ঞানিক, মনোবিদ্যার কোন বিষয় আলোচনার প্রথমেই "যৌন-প্রবৃত্তির" (লিবিডো) মাহাত্ম্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয় তখন সে নিজের মনের কতটা দৈন্য প্রকাশ ক'রে বসে নিজেই তা জানে না। আধুনিক মনোবিদ্যা প্রগতিশীল বিজ্ঞানের অন্তর্গত হ'লেও এখনও ঠিক সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান বলা চলে না তবে এই বিদ্যার লক্ষ্য হ'লো সুসংবদ্ধ, সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান দান করা।

মন সম্বন্ধে আলোচনা এবং মনের ক্রিয়ার বিশ্লেষণ আরম্ভ হয় সাধারণ বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে। বিজ্ঞানের অবদান মানুষের বিশ্লেষণকারী শক্তি। এই শক্তির প্রয়োগ যে দিন থেকে আমরা মনঃসম্বন্ধীয় আলোচনায় আরম্ভ করি সেদিন থেকে আধুনিক পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার জন্ম হয়। তার পূর্ব পর্য্যন্ত মনোবিদ্যা ছিলো দর্শনের একটি বিশেষ শাখা। সে সময় মনোবিদ্যা যাথার্থ্য ও বস্তুনিষ্ঠতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। এ সত্ত্বেও আজও যে মনোবিদ্যা ঠিক ঠিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একথা বলা চলে না তার কারণ "মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু মন এবং মন বাহ্য—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দ্রব্য বিশেষ নহে। মনের প্রকাশ দেহের মাধ্যমে ঘটে। একমাত্র নিজের মনকেই প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভব এবং অপরের মনকে অনুমানের মাধ্যমে জানিতে হয়," একথা

ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ম্যাক্‌ডুগল প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিকেরা বলে থাকেন। যে কোন প্রাকৃতিক ঘটনাকে আমরা বাইরে থেকে বিশ্লেষণ প্রণালীর দ্বারা জানতে পারি এবং তার মাপজোপ অঙ্ক ক'রে বার করতে পারি কিন্তু মনের ক্রিয়ার যতই হিসাব নিকাশ নিতে বসি না কেন তার ঠিক ঠিক সন্ধান পাওয়া বাইরে থেকে সম্ভব হয় না। সোজা কথায় আমার মনের মধ্যে যা কিছু ঘটে যাচ্ছে আমি যদি কিছুতেই প্রকাশ না করি মনোবিদ্যার বিরেচণ (ক্যাথার্সিস) প্রণালীর দ্বারাও আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করা সহজসাধ্য হবে না।

মনোবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিকেরা দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করেন এবং স্নায়ুতন্ত্র, গুরুমস্তিষ্ক, মধ্যম মস্তিষ্ক লঘুমস্তিষ্ক ও সুষুম্না শীর্ষক প্রভৃতি শারীরিক অংশগুলির কর্ম্মতন্ত্রের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। এই স্নায়ুতন্ত্রকে বিশ্লেষণ ক'রে শরীর-বৃত্তীয় মনোবৈজ্ঞানিকেরা স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম অংশ বা একক "নিউরোণের" গঠন ও কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। "নিউরোণের" তিনটি অংশ যেমন একটি হ'লো কোষদেহ,—কোষদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট "এ্যাক্‌সন" এবং "ডেনড্রাইট্" সমূহ। স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র হলো মস্তিষ্ক এবং এই মস্তিষ্কের দ্বারাই আমরা চিন্তন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এখানে স্নায়ুতন্ত্রের বিশদ বিবরণ ও মস্তিষ্ক বিদ্যার আলোচনা ছেড়ে দেহাভ্যন্তরীণ কোষগুলির বিষয় সাধারণ ভাবে কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রাণীদেহের প্রত্যেকটি-কোষ একটি-স্বতন্ত্র-জীবনের প্রতিচ্ছবি। প্রত্যেকটির একটি সারাংশ-কেন্দ্র (নিউক্লিয়স্) আছে। এই কোষগুলির মধ্যে আছে "প্রোটিন"। একটি মানবদেহে প্রায় একলক্ষ প্রকারের "প্রোটিন" বর্ত্তমান থাকে তাছাড়া প্রতিটি কোষের মধ্যে প্রায় একলক্ষ প্রকারের "এনজাইম্" যৌগিক অণু আছে এবং এই "এনজাইম"গুলিকে সাহায্য করে খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন), "হরমোন" এবং তাড়িৎ আহিত (ইলেকট্রিকেলী চার্জড্) "ম্যাগ্‌নেসিয়ম" "ক্লোরিণ" প্রভৃতি কতকগুলি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ।

প্রথমতঃ কোষগুলির কথা চিন্তা করলে দেখা যায় প্রাণীর খাদ্যের সাথে এগুলির বিশেষ সম্বন্ধ কারণ খাদ্যের মধ্যে "প্রোটিন" অংশই কোষগুলির পুষ্টিসাধন করে। দ্বিতীয়তঃ মানবদেহে কোষগুলি শরীরের অবয়বানুসারে বিশেষ প্রকারের কার্য্য-সাধন করে। হৃদ্‌যন্ত্রের কোষগুলির কার্য্য মস্তিষ্কের কোষগুলির কার্য্য এক নয়। তবে কি মস্তিষ্কের কোষগুলির চিন্তন শক্তিও আছে? কিম্বা প্রশ্ন হ'তে পারে এই বিশেষ কোষগুলি কি চিন্তা করতে সক্ষম? চিন্তনের ঠিক আবয়বিক প্রক্রিয়া কোষের স্তরে কি ভাবে সাধিত হয় এসম্বন্ধে মনোবৈজ্ঞানিকগণ একপ্রকার নীরব। তাঁরা চিন্তনকে একপ্রকার ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ চিন্তন শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, বিশ্বাস, অনুমান প্রভৃতি সকল প্রক্রিয়াকেই বুঝিয়াছেন। চিন্তন শব্দ-কে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলি ব্যষ্টিভাবে চিন্তন প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃত হ'তে পারে না বলেই মনে হয়। কিন্তু যদি চিন্তন প্রক্রিয়াকে একটু সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি-দিয়ে বিচার করা যায় বা চিন্তনের মূলে উদ্দীপক ও প্রতি ক্রিয়ার প্রণালীকে প্রয়োগ করা যায় তাহ'লে দেখতে পাওয়া যাবে কোষগুলি প্রতিক্রিয়াশীল এবং বলা যেতে পারে প্রত্যেকটি কোষ যখন সমষ্টিগতভাবে কোন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার কার্য্যে রত হয় তখন চিন্তন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ইংরাজীতে বলা যেতে পারে "কনসার্টেড্ এ্যাক্‌সন" বা "হারমণি।"

চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে স্মৃতির কথা বলা হয়েছে। এই স্মৃতিকণাগুলি কোন কোন জীব-বৈজ্ঞানিকের মতে কোষ মধ্যস্থ "রিবোনিউক্লিক অ্যাসিডে"র (আর এন এ) মধ্যে সংরক্ষিত হয়। তাছাড়া বংশ প্রভাব আলোচনায় দেখা গেছে উৎপাদন-অণু বা "জিন্"গুলিও সঞ্চারিত হয় এই কোষগুলির দ্বারা বা কোষাভ্যন্তরস্থ "ক্রোমোসোমের" সাহায্যে। "ক্রোমোসোম" হ'লো পুং-জনন কোষের কেন্দ্রাংশে বংশজ প্রক্ষলণের কতকগুলি বাহক। পুরুষ ও স্ত্রীদেহে জননকোষের "ক্রোমো-সোমের" মোট সংখ্যা আটচল্লিশ। এই সকল প্রক্রিয়াগুলো ঠিক ঠিক চিন্তন প্রক্রিয়া না হ'লেও এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটলেও চিন্তনের অতি সামান্য অংশ হয়তো বর্তমান থাকতে পারে। তারপর হলো প্রত্যক্ষ—এটিও চিন্তন প্রণালীর অঙ্গ। প্রত্যক্ষ করার প্রণালীর মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ সাহায্য আছে এবং কোষদেহ হ'তে বর্ধিত "ডেনড্রাইট্" ও "নিউরোন" প্রভৃতির সাথে এর সম্বন্ধ। দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার সম্বন্ধ বা চিন্তন-শক্তির মূলে দেহের কোষগুলির কার্য্য ইত্যাদি যতই বিচার করা যাক্ না কেন ঠিক ঠিক প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না। হয়তো মনোবিজ্ঞানে আরও উন্নতিলাভ করলে সম্ভব হবে। বর্তমানক্ষেত্রে বিচারশীল বৈজ্ঞানিকেরা মস্তিষ্কের কোষগুলির চিন্তনশক্তির ক্ষমতার কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করলেও, তাদের "কন্সার্টেড্ এ্যাকসন"ই চিন্তনশক্তি একথা বললে ভুল হয় না।

আমাদের দেশে বেদান্ত-শাস্ত্রে মনের শারীর-বৃত্তীয় উৎপত্তির কথা (সোমাটিসিজম্) বলা হ'য়েছে। মন-জড় পদার্থেরই পরিণতি এবং খাদ্যের সূক্ষ্ম অংশ হতেই মনের সৃষ্টি এই রকম বলা হ'য়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হ'য়েছে ভুক্তদ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ হ'তেই মনের সৃষ্টি হয় (অন্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা তন্মনো ভবতি—৬-৬-১, ২)। শঙ্করভাষ্যে অন্নের ব্যাখ্যা "ওদনাদি" অর্থাৎ চাল, ডাল, ঘৃত অর্থাৎ সাধারণ খাদ্যদ্রব্যকেই বোঝান হ'য়েছে এবং অন্নের মন্থনপ্রণালী বোঝানর ব্যাপারে পাকস্থলীর ক্রিয়াকেই নির্দ্দেশ করা হ'য়েছে। শঙ্করভাষ্যে আরও ব্যাখ্যা দেওয়া হ'য়েছে যে এই অন্নের সূক্ষ্মাংশ মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির সাথে যুক্ত হয় (মনঃ অবয়বৈঃ সহ সম্ভূয়) এবং মনের পুষ্টি-সাধন করতে থাকে (উপচিনোতি)। শ্রুতি এই তথ্যটিকে একটি ছোট গল্পের দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছেন।

ঋষি উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বোঝাতে চেয়েছিলেন মনের অন্ন হতে উৎপত্তির কথা এবং পুত্রকে বলেন—"তুমি এক পক্ষ যাবৎ কোন অন্ন গ্রহণ করবে না, কেবল একটু একটু জল পান করবে কারণ প্রাণ—আপোময়ঃ। শ্বেতকেতু তাই করলেন। পনের দিন পর উদ্দালক পুত্রকে বললেন—"এবার তুমি ঋগ্, যজু, ও সাম মন্ত্রগুলির পুনরাবৃত্তি কর"। শ্বেতকেতু উত্তর দিলেন—"এসব আমার কিছুই মনে পড়ছে না (ন বৈ মা প্রতিভান্তি) (ছাঃ উঃ ৬-৭-২)। তখন পিতা শ্বেতকেতুকে পুনরায় অন্নগ্রহণ করতে বললেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলেন—"ব্যবৃত্তি ও অনুবৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ অন্ন বর্জ্জন ও অন্নগ্রহণ করা হতে প্রমাণ করা হয়েছে—মনের উৎপত্তি অন্ন থেকে। অবশ্য উপনিষদের ঋষিরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে বসেন নি কিভাবে খাদ্যের মধ্যে "প্রোটিনের অংশ দেহের মধ্যে কোষগুলির পুষ্টিসাধন করছে কিন্তু খাদ্য হতেই মনের সৃষ্টি বা খাদ্য ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ একথা সাধারণভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন—উদ্দেশ্য ছিলো মনের

জড়ত্ব প্রমাণ করলে সূক্ষ্মআত্মা সম্বন্ধে জানবার বৃত্তি বা এষণা জাগৃত হবে। তা ব'লে মনকেও উপেক্ষা করা চলে না, কারণ মনের সাহায্যেই সাধন পথে অগ্রসর হতে হয়, তাই মনের মূল তথ্য কি সীমিত পরিবেশে, জানতে চেষ্টা করা হয়েছিলো।" (এই সূত্রে ডাঃ আর, এন ডাণ্ডেকরের—সোমাটিসিজম্ অব বেদিক সাইকলজী—হিষ্টরিকেল কোয়াটার্লী ভলিউম ওয়ান মার্চ ১৯৩১—দ্রষ্টব্য))।

মনকে ব্যাপক অর্থে শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে এটি কতকগুলি প্রক্রিয়া সমষ্টি যার মধ্যে কাম (বাসনা) সঙ্কল্প, সন্দেহ (বিচিকিৎসা), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি (ধৈর্য্য) অধৃতি (অধৈর্য্য), হ্রী (নম্রতা), ধী (বুদ্ধি) ও ভী (ভয়) প্রভৃতি সব কিছুই নিহিত আছে। মনের ক্রিয়া নানাভাবে ছান্দ্যোগ্য, বৃহদারণ্যক, কঠ, কেন, প্রশ্ন, তৈত্তরেয় ও শ্বেতাশ্বতরেয় উপনিষদে বর্ণিত আছে। মনের ক্রিয়ার মধ্যে প্রথম হলো কাম অর্থাৎ বাসনা তারপর আসে সঙ্কল্প। সঙ্কল্পকে শঙ্করাচার্য্য ব'লেছেন অন্তঃকরণবৃত্তি (ছাঃ উঃ ৭-৪-১)।

মনবিদ্যার স্নায়ুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় দেখা যায় যে মানবদেহে সূক্ষ্মস্নায়ুগুলির কর্ম্মতন্ত্র অতুলনীয়। বাহ্যজগতের জ্ঞান আমরা আহরণ করি দেহের সাহায্যে এবং আমাদের মনকে দেহের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। দেহের মাধ্যমেই মনের বাহ্যজগতের সাথে সম্বন্ধ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাহাত্তর হাজার স্নায়ুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে (২-১-১৯) এই বিচিত্র স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে একশত স্নায়ু আমাদের হৃদযন্ত্র হতে উদ্ভূত হয়—"শতঞ্চৈকা হৃদয়স্য নাড্যাঃ"—(ছাঃ উঃ ৮-৬-৬) এবং এই শতস্নায়ুর মধ্যে একটী যাকে "সূর্য্যনাড়ী" আখ্যা দেওয়া হয়েছে—মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে (মূর্দ্ধাণং)। দেহে মধ্যে স্নায়ুগুলির গণনার সত্যাসত্য এখানে বিচারের বিষয়বস্তু নয় তবে এতোগুলি ছোট, বড়, মোটা, সরু, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্নায়ু পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হয় কিনা জানা নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা বলেন এমন বহু সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে যেগুলি মরণ পর্য্যন্ত সুপ্তই রয়ে যায়। যদি কোন ক্রিয়ার দ্বারা সুপ্ত সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রগুলি জাগ্রত করা যায় আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই এমন বহুজিনিষ দেখতে সক্ষম হই—যাকে লোকে বলে অতীন্দ্রিয় বস্তুর দর্শন।

বস্তুতঃ আমাদের দেশে খাদ্যকেই মনের প্রধান উপাদান ব'লে ধরা হয়েছিলো। আজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দেহের কোষগুলির মধ্যে "প্রোটিনের" কর্ম্মতন্ত্র। খাদ্য হতে "প্রোটিন" সংগ্রহ ক'রে দেহের কোষগুলি পুষ্ট হলে প্রাণ ও মনের ক্রিয়া চলতে থাকে।

গান্ধী দর্শন—নবীন আদর্শের মূল্যায়ণ

কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য

বর্তমানে চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন একটা সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, তেমনি সংঘাতের প্রবল রূপ প্রখর হয়ে উঠেছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে। একদিকে যেমন তত্ত্ব বা থিওরীর সংঘর্ষ অন্যদিকে ব্যবহারিক আন্দোলন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বিভিন্ন আদর্শবাদের সংঘর্ষ যখন তীব্র হয়ে উঠেছিল তখন ভারতবর্ষে মার্ক্সবাদ ও গান্ধীবাদের আন্দোলন ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। সেই সময়ে অনেকে গান্ধীবাদকে মার্ক্সবাদের মুখোস হিসাবে আখ্যা দেন। মার্ক্সবাদও এক মুক্তির আন্দোলন, গান্ধীবাদও একটা মুক্তির আন্দোলন ছাড়া আর কিছু নয়। মার্ক্সবাদ, আধ্যাত্মিকতা বর্জিত এক জড়বাদী জীবন ব্যাখ্যা; গান্ধীবাদ, ঐহিকতা বর্জিত আধ্যাত্মিক জীবন ব্যাখ্যা।

যে গান্ধীবাদের সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে তার সার্থকতা স্বাধীনতা উত্তর ভারতে বর্তমান তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে নতুনভাবে মূল্যায়ণ করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

কোনও তত্ত্বর আলোচনা করবার পূর্বে তার অন্তর্নিহিত ভাবটি হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া দরকার। জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও সংস্কারকে তুচ্ছ করে কোনও তত্ত্ব যেমন টিকতে পারেনা তেমনি জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা জীবনদর্শনকে বাদ দিয়ে তত্ত্বকে বোঝান যায় না। একরকম তত্ত্ব যা জোর করে চাপান যায়, যার সঙ্গে হৃদয়ের কোনও সংযোগ থাকে না, আর এক প্রকার তত্ত্ব যা আপনিই হয়ে যায় অন্তরের একটা অঙ্গ, তার সায় থাকে অন্তরের, জাতির জীবনদর্শনে। তাই গান্ধীবাদ আলোচনা করবার পূর্বে ভারতের জীবনদর্শনে আলোকপাত করা একান্ত আবশ্যক। কারণ কোনও তত্ত্ব কোনও রাষ্ট্রের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আরোপ করবার পূর্বে বিবেচনা করা প্রয়োজন যে সেই রাষ্ট্রের জীবনদর্শনের সঙ্গে সেই তত্ত্বের কোনও মিল আছে কিনা।

ভারতের জীবনদর্শনের মূল সুরটি হল "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" ভারত সত্যের পূজারী, সুন্দরের পূজারী, ত্যাগের পূজারী। ভারতের জীনদর্শন অন্তর্মুখী এক ধ্যান গম্ভীর আত্মস্থতা। পাশ্চাত্যের জীবনদর্শন বহির্মুখী; তাতে আছে কর্মচাঞ্চল্য, উদ্দামতা ও উচ্ছলতা। ভারত আপনিতেই আপনি বিভোর। ভারতের এক শাশ্বত ধর্ম রয়েছে, সেই ধর্মের লক্ষ্য হল আত্মপ্রকাশ। ভারতের ধর্ম বলে—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মোঽস্মি।" তাই হিন্দু জাতির মধ্যে দেখা যায় একটা গাম্ভীর্য, শান্তি ও অল্পে সন্তুষ্টি। ভারতের ধর্ম বাদ দিয়ে ভারতবাসীকে বোঝা যায় না। কোনও রাষ্ট্র যতই সভ্যতা ও শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হক বংশগত ও জাতিগত সংস্কারকে এড়াতে পারে না। ভারতবর্ষে এখনও অনেকে তেত্রিশকোটি দেবতাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, ভয়ও পায়, তা সে আড়ালেই হোক বা লোকচক্ষুর সামনে হোক। সর্বোপরি ভারতে অনেকে মূর্তিপূজায় আস্থাবান। ভারতীয়ের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল এগুলি। জাতির এই চরিত্রগত বৈশিষ্টই সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্র সংস্কারের ভিত্তিভূমি। কারণ জাতীয় সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ কোনও জাতিই সহ্য

করতে পারবে না অম্লানবদনে।

রাষ্ট্রীয় চেতনা বলতে যা বোঝায় তা ভারতবর্ষ পেয়েছে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের সভ্যতা মিশেছে জলের ওপর তেল ভাসবার মত। এই রাষ্ট্র চেতনার প্রথম পর্ব হল ইংলণ্ডমুখী। যেহেতু politics শব্দটি ইংরাজদের মারফৎ পাওয়া। দেশবন্ধু দাশের ভাষায় 'ইংরাজের ইতিহাসে রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি।' (নারায়ণ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাপক বিদ্রোহের সূচনা, এই যুগকে militant nationalism বলা যেতে পারে। এরপরই যে যুগ তাহল একদিকে militant nationalism অন্যদিকে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অহিংসনীতি। মার্ক্সবাদ তখন ভারতে প্রবেশ করেছে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের দিকে ইঙ্গিত করে দেখিয়েছে তার ভারত শোষণের বীভৎস রূপ, সামাজিক বৈষম্য ও ভারতের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা। কৃষক ও মেহনতী মজদূরের বিদ্রোহই নিয়ে আসবে স্বাধীনতা, সাম্য, ঘোচাবে অর্থনৈতিক দুর্দশা। ভারতের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হল রাশিয়াতে। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক জগৎ ছিল তত্ত্ব ও ব্যবহারের সংঘর্ষ অসংখ্য জোড়া তালি আর মিলন। পূর্বে প্রোগ্রাম তারপর স্বাধীনতা, না পূর্বে স্বাধীনতা পরে প্রোগ্রাম এই বাদানুবাদই মুখর হয়ে উঠেছিল।

গান্ধীজীর মত ছিল—"স্বরাজ হবে ভারতবর্ষের প্রথম ও প্রাথমিক ধ্যান, পরে হবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে বিচার।

একথা ঠিকই স্বরাজ না আসলে গান্ধীজীর মতে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটান সম্ভবপর নয়। কারণ গান্ধীজীর যে দার্শনিক তত্ত্ব তা বহিঃশক্তির চাপে পূর্ণরূপে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না।

গান্ধীজীর যে দার্শনিক মতবাদ তা কিন্তু সোস্যালিজিমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে ভিন্ন নয়। তিনিও মন্তব্য করেছেন তাঁর মতবাদের সম্বন্ধে "the greatest welfare of the whole soceity and the abolition of the hideous inequalities resulting in the existence of millions of have nots and a handful of haves." সোসালিজিমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে একসুর—"শ্রেণীহীন সমাজ"। তিনি আরও বলেছেন—"I desire to end Capitalism almost, if not quite as much as the most advanced socialist or even Communists. But our methods differ. সোস্যালিষ্টবাদীদের ভ্রূকুঞ্চিত হল, এ কেমনধারা কথা। আবার একদল বললেন গান্ধীবাদ মার্ক্সবাদেরই একটি বিকল্প জীবনদর্শন। আসলে গান্ধীবাদ কিন্তু সোস্যালিজিম ও কমুনিজিমের কোনর আদর্শেই পুষ্ট নয়। গান্ধীবাদের উৎস হল আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা এবং তার স্তম্ভ "অহিংসা ও সত্য"। আচার্য কৃপালনী যার ব্যাখ্যা করেছেন "I belive the revolution for which Gandhiji is responsible is of the former type, that is primarily a revolution of ideas and ideals and is not merely political but an all round revoluion changing the values of life as did the French and Russian revolutions. তিনি আরও বলেছেন—"What

Gandhiji contemplates is casteless and classless socity based upon co-operative service…"এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কার্যক্রমকে গান্ধীজী বলেছেন "Tripple Programe" অর্থাৎ "চরকা, মৈত্রী এবং অস্পৃশ্যতা পরিহার" এবং এর মূল নীতি হল 'অহিংসা ও সত্য। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত সাম্য ও মৈত্রী আসতে পারে অহিংসার মধ্য দিয়ে। "Only when non-violence is accepted by the best minds of the world as a basis on which a just social order is to be constructed. তাঁর মতবাদে দেখা যায় সকল কার্যক্রমের মধ্যে মূল নীতিই হচ্ছে অহিংসা, তা সে স্বাধীনতা সংগ্রামেই হোক, বা অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই হোক।

স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যেকটি কর্মীর অস্ত্র হবে চরকা, প্রেম ন্যায় ও সত্য। সংগ্রাম করতে হবে ভালবাসার দ্বারা যেমন করেছিলেন মহারাজ অশোক। অকৃত্রিম প্রেম জন্মদেবে সহনশীলতার। এই অকৃত্রিম প্রেম ও সহনশীলতাই পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত করবে। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, ইংরাজ যত অত্যাচারই করুক সহ্য করবার ক্ষমতা যদি বাড়ান যায়, হৃদয়ে যদি ক্ষমা ও প্রেম থাকে এবং সেই সঙ্গে থাকে আত্মিক বল, তাহলে দুর্দান্ত ইংরাজ একদিন তার ভুল বুঝতে পারবে এবং ভারতবাসীর প্রেম, অহিংসা ও সহ্যশক্তি তার পাষাণ হৃদয়ে করুণা জাগিয়ে তুলবে এবং ভারতের সত্যাগ্রহের সঙ্গে সন্ধি করে মুক্ত করে দেবে ভারতবর্ষকে। তিনি বলেছেন—"So long as I have a share in the attainment of Independence it will be through non voilent means and therefore, a result of an honourable treaty or settlement with Britain.

ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলেছেন—

"মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বানি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্য চক্ষুসা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে॥"

সকল জীব যেন মিত্রের চক্ষুতে আমাকে দেখে এবং আমিও যেন সকল জীবকে মিত্রের চক্ষুতে দেখতে পারি। এই নীতির মূল তপস্যাই হল অহিংসা। এই অহিংসাই "গান্ধীবাদের কেন্দ্রবিন্দু, একে মধ্যস্থ করেই এর অর্থনৈতিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক দর্শন পল্লবিত হয়ে উঠেছে।"

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজী বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণী ততক্ষণই থাকতে পারে যতক্ষণ তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বা বিরোধ না থাকছে। জমিদারও থাকবে, প্রজাও থাকবে, তবে শোষক ও শোষিত হিসাবে নয়। প্রজার অর্থই জমা থাকবে, জমিদার খরচ করবে তা প্রজার হিতার্থে, জমিদারের আত্মসুখের জন্য নয়।

তিনি রাষ্ট্রস্বামীত্ব স্বীকার করেননি। কেন্দ্রের স্বামীত্বে গ্রামের দুর্দশা হবে এবং সেই সঙ্গে অবলুপ্ত হবে গ্রাম্যশিল্পের। গান্ধীদর্শনে কলকারখানাই কুটিরশিল্পের ও স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের প্রতিবন্ধক, এ ছাড়া কলকারখানাই ধনী ও শ্রমিক শ্রেণী সৃষ্টি করবে যার অনিবার্য ফল বিরোধ, সংঘর্ষ ও অর্থনৈতিক অসাম্য। অভাবকে (want) যতই বাড়ান যাবে অভাব ততই বাড়বে, আবার যতই কমান যাবে ততই কমবে। গান্ধীদর্শনে অভাবকে কমিয়ে জীবনকে মুক্তি

রাখার কথা বলা হয়েছে যাতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক চর্চার পথ প্রশস্ত হয়। গান্ধীবাদে ঐশ্বর্যের স্থান নেই, গান্ধীদর্শন স্বীকার করে "উপকরণ হীন রিক্ত পল্লীসমাজ"। এরূপ সমাজে থাকবে না কোন কলহ, ভেদভাব ও অসাম্য। যখন যার যা প্রয়োজন তা সেই তৈরী করে নেবে দেশীয় উপকরণ দিয়ে নিজের ঘরে। মানুষের জীবন হবে সুন্দর, অনাড়ম্বরহীন, সহজও নীতিমূলক। এই নীতি যদি পৃথিবীর সমস্ত দেশ মেনে নেয় এবং গান্ধী দর্শনের ওপর রাষ্ট্র গঠন হয় তাহলে পৃথিবীতে আর কোন বিরোধ দেখা দেবেনা। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলি বাঁধা থাকবে একসূত্রে।

মহাত্মা গান্ধী শুধু তাঁর দর্শন উপস্থাপিত করেই ক্ষান্ত হননি। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়, এই নীতিই তাঁর মধ্যে কাজ করেছে। গান্ধীদর্শনের সঙ্গে মহাত্মাগান্ধীর কোথাও কোন অমিল নেই, এইটিই একটি বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখবার বিষয়। গান্ধীজীই তাঁর দর্শনের প্রতীক। তাঁর অমিত মনোবল, আত্মবিশ্বাস, প্রেম, ক্ষমা তাঁকে মহান করেছে। আমরা এও লক্ষ্য করি যে ভারতীয় জীবনদর্শন ও জাতিগত বৈশিষ্টের সঙ্গে গান্ধীবাদ এক সূত্রে বাঁধা। তিনি তাঁর তত্ত্ব নিজের জীবনে প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন যে গান্ধীবাদই পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারে স্থায়ী শান্তি আনন্দ সাম্য ও মৈত্রী।

কিন্তু আমাদের এই যুগ বড় জটিল কোনও কিছুই বিনা বিচারে নির্বিবাদে গ্রহণ করে না। তাই গান্ধীবাদকেও যুক্তি তর্কের সম্মুখীন হতে হয়। গান্ধীবাদকে অবশ্য যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়নি। একে পাওয়া গেছে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার মধ্যে দিয়ে, তাই গান্ধীবাদ একটা তত্ত্ব হিসাবে যে অন্যতম একটা তত্ত্ব, এবিষয়ে কারুরই কোন সন্দেহ নেই। তত্ত্ব দুই প্রকার—একটা ব্যবহারিক অন্যটা পুঁথিগত। পৃথিবীতে যতপ্রকারই তত্ত্ব দেখা যায় সেগুলি কোনওটা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রূপায়িত হতে দেখা যায় না। কিছু থেকে যায় আবদ্ধ পুঁথির মধ্যে এবং কিছু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এসে নানা সংঘাত এবং অবস্থার চাপে জোড়াতালির সাহায্য নেয়। এতে অনেক সময়ে মূল নীতির পরিবর্ত্তন হয়না। কিন্তু গান্ধীবাদে মুশকিল এই যে এর মূল সুরটি এমনভাবে বাঁধা যে কিছুই রদবদল করবার জো নেই, আবার হুবহু একে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রূপায়িত করাও এক বিড়ম্বনা। কারণ গান্ধীবাদ মনুষ্যচরিত্রের বৈচিত্রকে অস্বীকার করেছে, সেই সঙ্গে উপেক্ষাও করেছে বিবর্ত্তনের মূলনীতি।

গান্ধীবাদের অহিংস নীতি ব্যক্তিগতভাবে একটা নীতি হলেও হতে পারে। কিন্তু জাতিগত ভাবে একটা নীতি হতে পারে না। "হিংসা অহিংসা, ভালো-মন্দ আত্মপর বিশ্বভরে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, একটিকে বাদদিয়ে অপরকে অবলম্বন মানুষ করতে পারে না। বিশ্বসংসার যদি একটা বিরাট তপোবন হয় তাহলেই অহিংস নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে। আলোর সঙ্গে যেমন আঁধার মিশে আছে, ভালোর সঙ্গে মন্দ, তেমনি মিশে আছে হিংসার সঙ্গে অহিংসা। কতগুলি বৃত্তি নিয়ে মানুষের একটা ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছাবৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি, উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত বৃত্তি, সংস্কারগত বৃত্তি, বহির্জগত থেকে আহরিত করা বৃত্তি, এই সব মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ মানুষ। একের সঙ্গে অন্যের ভিন্নতা নানা প্রকারের। মানুষের সহজ বৃত্তি হল যে "মানুষ চালিত হয় আত্মরক্ষা ও আত্মসমৃদ্ধির প্রবৃত্তির দ্বারা"। আত্মরক্ষা ও আত্মসমৃদ্ধির সঙ্গে পশুশক্তিও মিশে রয়েছে।

তাই হিংসাকে জীবন থেকে মুছে ফেলা কোনও কালেও সম্ভব নয়।

হিংসাবৃত্তি দুই প্রকার একপ্রকার immoral অর্থাৎ গর্হিত অন্যপ্রকার হল ন্যায় সঙ্গত। প্রথমটা নীচতা ভীরুতা এহং দ্বিতীয়টি কল্যাণকর।

লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত মানবকে উদ্ধার করতে যে পশুশক্তির ব্যবহার হয় তা কল্যাণকর। আত্মরক্ষা, সমাজ রক্ষা ও জাতিরক্ষার্থে যে পশুশক্তির ব্যবহার তাও কলাণকর। আবার যে পশুশক্তির দ্বারা সমাজের অকল্যাণ, রাষ্ট্রের অকল্যাণ তা গর্হিত immoral। হিংসার বৃত্তিটুকু না থাকলে আত্মোন্নতি সমাজ তথা জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। যেহেতু আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সর্বকালের এবং প্রকৃতিগত, তাই হিংসাবৃত্তিও সর্বকালের এবং প্রকৃতিগত। ধরে বেঁধে কিছু লোককে অহিংস করে তুললেও তার বৃত্তিটুকু মুছে যাবে না বরঞ্চ থাকবে চাপা; সুযোগ সুবিধে পেলে ঐ চাপা বৃত্তি আবার দ্বিগুণ ভাবে জেগে উঠবে। তখন ওই হিংসাবৃত্তি চরিতার্থতার মধ্যে কোনও হিতাহিত জ্ঞান থাকবে না। মনোবিজ্ঞানের মতে অবদমিত বৃত্তি কখনও সুফল দেয় না, তাই বলে। আবার এও সম্ভব নয় যে একই কালে প্রত্যেকটি মানুষ হয়ে উঠবে অহিংস। কিছু সংখ্যক থাকবেই যাদের মধ্যে হিংসাবৃত্তি আছে। সুতরাং এমত অবস্থায় অহিংসনীতি টিকতে পারবে না। আমাদের শাস্ত্র সার্বজনীন অহিংসনীতি স্বীকার করেননি। শাস্ত্রকারেরা আধারভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটতেই দিতেন না, অহিংস নীতির ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রেম, ক্ষমা ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে তপোবনে যাবার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু তা হয়নি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হত না। শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা এবং রাজা হিসেবেই নিজেকে প্রকট করেছেন। দেবী পুরাণ, কালিকা পুরাণ ও চণ্ডীতে অসংখ্য যুদ্ধ দেখা যায়। সুতরাং অহিংস নীতি নির্ভর করছে স্থান, কাল, পাত্রের ওপর। বর্ত্তমান যুগে স্থান কাল পাত্রের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। স্থান কাল পাত্রের প্রশ্ন না উঠলে অহিংস নীতিরও কোন প্রশ্ন ওঠে না। পণ্ডিত নেহেরুও বলেছেন—"Gandhiji tried to make this individual ideal in to a social group ideal."

দ্বিতীয়ত মনুষ্য সভ্যতার বিবর্ত্তনের মূল নীতি হল অগ্রসর হওয়া, পেছু হটা নয়। শিশু যখন দাঁড়াতে পারে তাকে কোন প্রকারে বসিয়ে বা শুইয়ে রাখা যায় না। সে তখন চেষ্টা করে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুতে, আছাড় খায় আবার হাঁটবার চেষ্টা করে। জীবজগতের এই নীতি, প্রকৃতির এই স্বভাব।

আজকের বিজ্ঞানপুষ্ট জগতে একথা কেউ ভাবতে পারে না যে জীবনের অনায়াসলব্ধ উপায় ও উপকরণগুলি ত্যাগ করে মানুষ ফিরে যাবে তার প্রাচীন যুগের সমাজে, যেখানে কোনও কলকারখানা উদ্যোগ থাকবে না। জাগতিক প্রাপ্তির ইচ্ছা ও সংগ্রাম থাকবেনা, এমনকি, থাকবেনা পুলিশ, সৈন্য ইত্যাদি। মানুষ গ্রামে থাকবে, চরকায় কাপড় বুনবে ও খেতে চাষ করবে। একথা সত্য যে ভারতবর্ষে গ্রামের উন্নতি না হলে সারা দেশের উন্নতি

হবে না, তাই বলে প্রাচীন গ্রাম্য জীবনে ফিরে যাওয়া নয়। এগুতে হবে গ্রামকে সঙ্গে নিয়ে।

· গান্ধীজীর আদর্শ মহৎ, তবে আমরা দেখেছি যে আদর্শগুলি মহৎ, নীতিগুলি মহৎ তা আবার ব্যবহারিক জগতে অচল। সব আদর্শই ব্যবহারিক জগতে রূপায়িত করা সম্ভবপর নয়। তবে এ কথা স্বীকার্য যে গান্ধীজীর মত মহানপুরুষের আরও প্রয়োজন আছে আমাদের দেশে, প্রয়োজন আছে মহৎ আদর্শের ও নীতির যার চিন্তা বিশ্লেষণ মানুষকে ঠিক পথে চালিত করতে অনুপ্রাণিত করবে। একদিন সত্যই গান্ধীজীর স্বপ্ন সফল হবে যেদিন সারা বিশ্ব বুঝতে শিখবে আমরা অমৃতের সন্তান, এই জাগতিক সুখ আনন্দের ওপরেও রয়েছে এক অসীম আনন্দ, সেই মহানন্দময় সাগরে অবগাহনই হবে একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ জাগতিক চাওয়া ও পাবার একটা সীমা রয়েছে। বিজ্ঞানের সাহায্য দ্বারা যতটুকু জানা যায় তারও সীমা রয়েছে একটা। যখন বিজ্ঞান হয়ে যাবে স্তব্ধ, জীবনের একঘেয়েমি মানুষকে করবে উদ্বুদ্ধ আরও নতুন কিছু পাবার জানবার, তখনই প্রয়োজন হবে বিশ্বজ্ঞানের, মানুষের জীবন নিয়মিত আবার নতুন আদর্শে। তবে সে সময় এখনও আসেনি। শ্রীঅরবিন্দও যেন তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে "reign of universal peace দেখতে পেয়েছিলেন। "A day may come, must surely come, we will say, when humanity will be ready spiritually, moraly, socially for the reign of universal peace, meanwhile the aspect of battle and the nature of function of man as a fighter have to be accepted and accounted for by any practical philosophy and religion."

এই স্বর্গীয় শান্তিরাজ্যের প্রস্তুতির জন্য গান্ধীবাদ প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রেরই চিন্তার বিষয় উচিত।

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

আত্মপ্রীতি (ধর্মতত্ত্ব) ॥

আত্মরক্ষা মানুষের স্বভাব এবং ধর্ম। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য অনেকসময় অন্যের ক্ষতি করতে হয়। সে ক্ষেত্রে অধর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করলে অধর্ম হয় না, এই অধ্যায়ে গুরু শিষ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য হিতবাদীদের মতেরও আলোচনা করেছেন। বৃহত্তর সমাজের বৃহত্তর হিতের জন্য ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র সুখের আশা বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য। আবার হিতের পরিমাণ হিসাবেও, একজন মানুষের অধিক পরিমাণ হিতের জন্য অনেক মানুষের তদপেক্ষা অল্পপরিমাণ হিত করার জন্য উদ্যোগী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এরূপ পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সর্বপ্রধান কথা এই যে—সকলের সকল কর্মই 'ঈশ্বরমুখী' করা উচিত। "অতএব যাহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, তাহাই অনুষ্ঠেয়। ইদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুবর্ত্তনে কখন অবস্থাবিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থাবিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়।"

আদর (গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক) ॥

প্রথম প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৮০, পৃঃ…৪৬। প্রেমিকাকে আদরসম্ভাষণ করে প্রেমিক যেন জগতের যা কিছু প্রিয় তার মধ্যেই তার সন্ধান করছে। এটিই কবিতার বিষয়বস্তু।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায় (মুদ্রকাকারে অপ্রকাশিত) ॥

প্রথম প্রকাশ—'প্রচার', অগ্রহায়ণ ১২৯১, পৃঃ ১৬৯-১৮৪। আলোচ্য প্রবন্ধটি থেকে বঙ্কিম-বিরোধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমের বিভিন্ন প্রবন্ধকে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেন। তাতেও বঙ্কিম বিচলিত হননি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর স্নেহধন্য রবীন্দ্রনাথ যখন 'ভারতী'তে—'একটি পুরাতন কথা' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করলেন, তখন আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত 'প্রচারে' এই প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা এবং ধৈর্যের সংগে বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করেছেন। বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর স্নেহ এতই প্রবল ছিল যে তিনি বিশ্বাস করেননি রবীন্দ্রনাথ নিজের থেকে বঙ্কিম-বিরোধিতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পিছনে ব্রাহ্মসমাজের ছায়া তাঁকে প্ররোচিত করছে বলে মনে করেন। শেষপর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেছেন। বলাবাহুল্য পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্ষমাগুণের কথা স্বীকার করেন। প্রধানতঃ বঙ্কিমের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই এই বিরোধের অবসান ঘটে।

আমার দুর্গোৎসব (কমলাকান্তের দপ্তর ১১ সংখ্যা) ॥

'আমার দুর্গোৎসব' রচনাটি কার্ত্তিক, ১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

কমলাকান্ত সপ্তমী পূজার দিন আফিম চড়িয়ে দুর্গার ঐশ্বর্যময়ী মূর্তি দেখতে পেলেন।

বুঝতে পারলেন ইনি জননী বঙ্গভূমিরই মূর্তি। কিন্তু বঙ্গভূমির এই ঐশ্বর্য আজ কালগর্ভে নিমজ্জিত। তাই তিনি ডাক দিয়েছেন সমগ্র দেশবাসীকে—জীবনপণ করে উদ্ধার করতে হবে বঙ্গভূমির লুপ্তগৌরবকে।

রচনাটি গুরুগম্ভীর। বঙ্কিমের দেশপ্রেমিক মনোবৃত্তির পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে 'আমার দুর্গোৎসবে'। যে বঙ্কিম 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে দেশপ্রেমের মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন, বিভিন্ন প্রবন্ধে বাংলার দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়েছেন, তৎপরে লঘুচপল আয়তনেও আর একবার উদ্দীপিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত দেশকে নিয়ে রসিকতা করা যায় না। তাই এই রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র আবেগে উদ্দীপ্ত এবং কবিত্বময় বর্ণনাভঙ্গীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশকে কেবলমাত্র idea নয়, মৃন্ময়রূপ দান করেছেন। এই রচনার বাংলা-সংস্কৃত মিশ্রিত স্তোত্রটি 'বন্দেমাতরম্' গানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমার মন (কমলাকান্তের দপ্তর, ৫ম সংখ্যা) ॥

'আমার মন' ১২৮০ সালের মাঘ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হয়। রচনাটিকে 'একা' প্রবন্ধেরই অনুসরণে বলা যেতে পারে। 'একা' প্রবন্ধে যে প্রীতির কথা বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, 'আমার মনে' সেই প্রীতিরই প্রকাশ দেখি। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র কিঞ্চিৎ রসিকতার সংগে আরম্ভ করেছেন। তিনি তাঁর মনকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে কি সেই মন কোনও রন্ধনশালায় রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যসন্ধানে ব্যস্ত? অথবা কোন যুবতীর পশ্চাদানুসরণে ব্যস্ত? কিন্তু কোথাও তিনি মনের সন্ধান পেলেন না। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র পৃথিবীতে স্থায়ীসুখের মূল আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। এখানে তিনি পরিহাস ছেড়ে গভীরতর স্তরে এসে উপনীত হয়েছেন, এবং আবিষ্কার করেছেন—"পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ীসুখের অন্য কোন মূল নাই।" কিন্তু বর্তমান ইংরাজী সভ্যতার প্রভাবে জনগণ বাহ্যসম্পদ আর্থিক উন্নতির দিকেই বেশি ঝুঁকেছেন। এটি বঙ্কিমের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হয়েছে। উদরপূর্তির প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত নয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সবশেষে মানুষের কাছে—পরোপকারে প্রবৃত্ত হবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

এমনিভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধটিতে সরস কৌতুক থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত এক গভীর সত্যে গিয়ে উপনীত হয়েছেন।

আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প (বিবিধপ্রবন্ধ—১ম) ॥ প্রথমপ্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৮১ সাল। প্রবন্ধটির প্রেরণা "সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি প্রণীত। কলিকাতা।" উক্ত গ্রন্থের লেখক ইংরাজী Fine Arts—শব্দের অনুকরণে 'সূক্ষ্মশিল্প' নাম দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, প্রবন্ধটিতে শিল্পসৃষ্টির মূল প্রেরণা যে সৌন্দর্যতৃষ্ণা সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক মানুষের সুখবোধের পার্থক্য আছে। কারও হয়ত ধনে সুখ, কারও ধর্মে সুখ, কারও জ্ঞানে সুখ। কিন্তু প্রত্যেক মানুষই সুন্দর জিনিষ দেখলে সুখী হয়। মানুষের এই সৌন্দর্যবোধের পরিতৃপ্তির জন্যই সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি। সূক্ষ্মশিল্পের কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ করা

হয়েছে—চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, নৃত্য, সঙ্গীত, কাব্য।

তারপর বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন বাঙ্গালীজাতির সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার অভাবের জন্য ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন—"সূক্ষ্ম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘৃণা।" এর কারণ হিসাবে অবশ্য বাঙ্গালীর আর্থিক দুরবস্থাকে তিনি কিছুটা দায়ী করেছেন। সেখানে একটি ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে বহু সন্তান-সন্ততি নিয়ে বাস করতে হয়, সেখানে তাদের গৃহসজ্জার স্থান কোথায়? তবে আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক বড়লোক বাঙালীও সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাবে গৃহসজ্জা করতে পারে না। সাহেবদের অনুকরণে তারা বহুমূল্য আসবাবপত্র স্তূপাকার করে রাখে, কিন্তু উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারে না। তাই লেখকের দুঃখ—"সৌন্দর্য্য বিচারশক্তি, সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনসুখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই।"

আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত (বিজ্ঞানরহস্য) ॥

প্রথম প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন' জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯। পূর্ণসূর্য গ্রহণকালে সূর্যের চারদিকে একপ্রকার রশ্মির বিচ্ছুরণ দেখা যায়। পৃথিবীর তুলনায় এই সৌররশ্মির আয়তন অনেকগুণ বেশি। সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় সূর্যে পতিত হবার সময় এই রশ্মিগুলিকে পর্বতের ন্যায় দেখায়। একেই বলে সৌরোৎপাত। বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সৌরোৎপাত সম্বন্ধীয় গবেষণার বিস্ময়কর ফলাফল অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে আলোচনা করেছেন।

ইউটিলিটি বা উদর দর্শন (কমলাকান্তের দপ্তর) তৃতীয় সংখ্যা) ॥

১২৮০ সালের, কার্ত্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'এ প্রবন্ধটি 'ইউটিলিটি বা দর্শনদ্বয়' নামে প্রকাশিত হয়। প্রথমে ছিল—১। হিতবাদ দর্শন এবং তারপর ২। উদরদর্শনের আলোচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে এক বিখ্যাত দার্শনিক মতবাদের অপব্যাখ্যা দ্বারা হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। জেরমি বেন্থামের Utilitarianism এর মূল বক্তব্য হল যা সর্বমানবের পক্ষে হিতকর, তাই করা উচিত। এই রচনাটির প্রথম সংস্করণে বঙ্কিম কিছুটা সিরিয়াসভাবে এই দর্শন সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু আলোচনা করেছিলেন—"বলিতে কি, এখনকার ইউরোপের চিন্তাপ্রণালী, অর্দ্ধেক বেন্থাম অর্দ্ধেক কোম্‌তের মতানুসারিণী। চিত্তমধ্যে এই দুই মতের সমুচিত সামঞ্জস্যই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা।

বেন্থামের পর, ডুমন, মিল, অষ্টিন প্রভৃতি তাঁহার মতের সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ঐ মতই এক্ষণে মান্য এবং গ্রাহ্য। যাঁহারা ইহা মানেন না, হিতবাদীরা বলেন, তাঁহারা হিতবাদ দর্শন সম্যক্ বুঝিতে পারেন না।

এই মতের সার কথা এই যে যাহা হিতকর, তাহাই অনুষ্ঠেয় ও কর্ত্তব্য। যাহা অহিতকর, তাহা বর্জ্জনীয় এবং অকর্ত্তব্য। হিতাহিত ফলোৎপাদকতা ভিন্ন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের—অর্থাৎ পুণ্যপাপের অন্য লক্ষণ নাই।

এই সকল দার্শনিকেরা কখন বঙ্গদেশে আইসেন নাই—আসিলে তাঁহাদের প্রণীত হিতবাদ শাস্ত্র এরূপ অসম্পূর্ণ থাকিত না। বাঙ্গালীর মত হিতবাদী পৃথিবীতে আর কোন জাতি নাই। এ শাস্ত্র বাঙ্গালীর নিকট কার্য্যে পরিণত। যাহাতে হিত বা উপকার নাই, এমত কার্য্য

আমরা করি না, বা করিতে সম্মত হই না।

ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের সঙ্গে বাঙ্গালী হিতবাদীদিগের বিলক্ষণ ঐক্য আছে—কিন্তু কয়েকটি প্রধান বিষয়ে বিশেষ অনৈক্য আছে। সেই অনৈক্য স্থান সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম, ইউরোপীয়েরা বাঙ্গালীর ন্যায় বলিয়া থাকেন, যাহা হিতকর তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা আরও বলেন, যে এই হিত অর্থে জগতের হিত বুঝিতে হইবে। আমরা বলি হিত অর্থে আপনার হিত বুঝিতে হইবে। যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই পুণ্য, যাহাতে নিজের অহিত তাহাই পাপ।

দ্বিতীয় ইউরোপীয়েরা বলেন, এই "হিত" অর্থে যাহা আশু হিতকর তাহা বুঝায় না, যাহা চরমে হিতকর তাহাই বুঝিতে হইবে। শুভাশুভ ফলানুসন্ধানে, অনন্তকাল পর্যবেক্ষণ করিয়া পুণ্য পাপনির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। আমরা কহি তাহা নহে; আমি যতদিন বাঁচিব, কেবল ততদিনের মধ্যে যাহা ঘটিতে পারে তাহাই আমার আলোচ্য। আমি মরিয়া গেলে হিতাহিতের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

আমাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহার বলেন, যে আমি যতদিন বাঁচব ততদিনের কথাই বা কেন ভাবিব? দেখিতেছি একটি কর্ম্ম করিলে, অদ্য সুখী হইব, এক বৎসর তন্নিবন্ধন অসুখী হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক বৎসর আমি বাঁচিব কি না, তাহা কে বলিতে পারে? অদ্যকার সুখ নিশ্চিত, ভাবী দুঃখ অনিশ্চিত। অতএব যাহাতে সুখ তাহাই হিতকর এবং কর্ত্তব্য।

তৃতীয় ইউরোপীয়েরা বলেন, যে কোন কার্য্যের জগদ্ব্যাপী এবং অনন্তকাল স্থায়ী ফলাফল সচরাচর লোকে আপন বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারে না; অতএব কার্য্যের ফলাফল বিজ্ঞেরা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য। বাঙ্গালী বলেন, বিজ্ঞ, আমি এবং আমার পূর্ব্বপুরুষেরা। আমাদের তুল্য বিজ্ঞ কে? অতএব আমরা নিজের মত এবং স্বর্গীয় মহাশয়দিগের মত ভিন্ন আর কোন মত গ্রাহ্য করিব না। কেবল দুইটি বিষয়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের মত অগ্রাহ্য—আহার এবং পরিচ্ছদে। বুট পেণ্টলুন পরিব, মদ্য মাংস খাইব। আর যদি ইংরাজিঅনা শিখিয়া একটু ইংরাজি ছড়াতে পারি তাহা ছড়াইব। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের মতেই চলিব।"

কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে রচনাটির লঘুত্ব হ্রাস পাওয়ার ফলে ভয়ে বোধ হয় এটি পরিত্যাগ করেন। কমলাকান্ত বলেছে—"আমি এই হিতবাদিতে অমত করি না।" অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনার আক্রমণ হিতবাদ দর্শনের প্রতি নয়। হিতবাদ দর্শনকে উপলক্ষ্য করে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর বাঙালী জাতিকে তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা বল এবং প্রতারণা—এই ষড়বিধ পুরুষার্থের উপায়ে তিনি যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা বাঙালী জাতির স্বরূপটিকেই উদ্ঘাটিত করেছে।

রচনাটির বক্তব্য—সূত্র এবং ভাষ্যের দ্বারা নতুন রীতিতে উপাস্থাপনা করা হয়েছে।

ইতিহাসাদির পৌর্ব্বাপর্য্য (কৃঃ চঃ ১ম খণ্ড ১৭ পরিঃ)॥

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র আলোচনার প্রথমে তাঁর আলোচনার প্রণালী নির্দ্ধারণ করেছেন। এখানে তিনি ঐতিহাসিক সত্য কালক্রমে উপাখ্যানে পরিণত হয় তা দেখিয়েছেন। বেদের পুরূরবা ও

উর্ব্বশী ছিল আগুন জ্বালাবার দুটি কাষ্ঠ, কিন্তু কালক্রমে তা কেমন বিভিন্ন উপাখ্যানে পরিণত হল বঙ্কিমচন্দ্র তা দেখিয়েছেন। মহাভারতেও এরূপ পুতনা রাক্ষসীর কাহিনীটি পরিবর্তিত হয়েছে। পুতনা প্রথমে শিশুরোগ বা শকুনএর নাম ছিল, কিন্তু কালক্রমে তা রাক্ষসীতে পরিণত হয়। এমনিভাবে ত্রিকালরূপ কাল, সহস্র ফণাযুক্ত কালীয়নাগে পরিণত হয়। এ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে—কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় তিনি এই ক'টি গ্রন্থকে গুরুত্ব অনুযায়ী গ্রহণ করবেন, প্রথম "মহাভারতের প্রথম স্তর। দ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ। তৃতীয়। হরিবংশ। চতুর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত।"

ইন্দ্র (দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম) ॥

প্রথমপ্রকাশ—প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃঃ১৪৫-৫৬।

এখানে ইন্দ্র-দেবতার প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। বেদের মন্ত্র থেকে জানা যায়, ইন্দ্র হলেন বৃষ্টিকারী আকাশ। তাই তাঁর হাতের আয়ুধকে বজ্ররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৃত্র প্রভৃতি বিভিন্ন অসুরকে তিনি যে নিধন করেছেন, তারা বৃষ্টির শত্রু ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং ইন্দ্র বিশ্বেরই একটি শক্তিমাত্র।

ইন্দ্রপ্রস্থ। এই খণ্ডে ১৲টি পরিচ্ছেদ আছে।

ইন্দ্রপ্রস্থ সম্বন্ধে তথ্য এই—"খাণ্ডবারণ্যের মধ্যে একটি নগর। যুধিষ্ঠিরের রাজধানী। কথিত আছে দেবতারা ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপন করেন। এই স্থানে পূর্ব্বকালে ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করতেন, সেই থেকে এর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। এই স্থানে মৃত্যু হলে বিষ্ণুতুল্য হয়। বর্ত্তমান দিল্লীর মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ এখন সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখা যায়।"

ইংরাজস্তোত্র—মহাভারত হইতে অনুবাদিত (লোকরহস্য)॥ প্রথম প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃঃ ৩৭৯—৩৭১।

দেবতাদের যেরূপ বন্দনা করা হয় সেইভাবে ইংরেজদের বন্দনা করা হয়েছে। প্রথমে ইংরাজদের সংগে বিভিন্ন দেবতাদের গুণাগুণের সাদৃশ্য দেখান হয়েছে। এখানে বঙ্কিম সরস উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা যথাযথ সামঞ্জস্যবিধান করতে পেরেছেন। পরবর্তী অংশটিতে ইংরাজদের কৃপাকামনায় দেশবাসীর আবেদন বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজদের তোষামোদ করবার জন্য সেযুগে এই জাতীয় স্বার্থপর লোকের অভাব ছিল না। বঙ্কিম একস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যাসাগরকেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি—"আমি বিধবার বিবাহ দিব, কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না, তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।'

বঙ্কিম তাঁর সত্যবাদীতা ইংরাজদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর জন্য দীর্ঘকাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ যোগ্যভাবে সম্পন্ন করলেও উন্নতিলাভ করতে পারেননি। সেই ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে একস্থানে—"আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশ দাও,—আমার সর্ব্ব-বাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরী দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বার কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

যদি না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্হোমে নিমন্ত্রণ কর, বড় বড় কমিটির মেম্বার কর, সেনেটের মেম্বার কর, জুষ্টিস, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনরচিত ও কবিত্ব॥ (ঈশ্বর: গ্রন্থ: ভূমিকা) প্রথম প্রকাশ ১২৯২ সাল। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকারূপে বঙ্কিমচন্দ্র এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি রচনা করেন।

প্রবন্ধের 'উপক্রমণিকা' অংশে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দায়িত্ব ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি করেছেন।—এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার দিতেছি, তাহার জন্যও ধন্যবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গোপাল বাবু আমাকে কতকগুলি নোট দিয়েছিলেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। গোপালবাবু নিজে সুলেখক, এবং বাংলা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তাঁহার নোটগুলি এরূপ পরিপাটী যে, আমি তহোতে কাটাকুটি বড কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুর নোটগুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি—আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এই কথাগুলি বলিবার তাৎপর্য এই যে, গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জন্য আমারও সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।"

প্রথম পরিচ্ছেদে ঈশ্বরচন্দ্রের 'বাল্য ও শিক্ষা' জীবন আলোকিত হয়েছে। এতে গোপাল-বাবুর নোট কতটুকু এবং বঙ্কিমের লেখা কতটুকু তা সুনিশ্চিতভাবে আলাদা করবার উপায় নেই। তবে বঙ্কিমসাহিত্যপাঠে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করা গেছে, তাতে করে মনে হয়,—ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক নবাগতা বিমাতারে সম্ভাষণের উপর মন্তব্য, দুর্গামণি ও ঈশ্বরের বিবাহপ্রসঙ্গে উক্ত মন্তব্যগুলি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের। প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচনায় ঈশ্বরগুপ্তের জীবনী থেকে বঙ্কিমচন্দ্র দু'টি তথ্য আবিষ্কার করেছেন, একটি হল—ঈশ্বরগুপ্ত মেকির শত্রু এবং দ্বিতীয়টি হল স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর বিরূপ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঈশ্বরগুপ্তের "কর্ম" জীবন বর্ণিত হয়েছে। এ পরিচ্ছেদটি বঙ্কিমচন্দ্র গোপালবাবুর জন্যই রেখেছেন। সুতরাং সংবাদ প্রভাকরের পূর্বে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের তালিকায় ভুল বিবরণ যেখানে সাহিত্যপরিষৎ সম্পাদক মন্তব্য করেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্যে কিছু ভুল আছে।" তা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা অব্যাহতি দিতে পারি। যাই হোক এই পরিচ্ছদটি যেমন 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকার উত্থান-পতন ও বিরোধিতার ইতিহাসের জন্য মূল্যবান তেমনি ঈশ্বগুপ্তের চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঈশ্বরগুপ্তের 'কবিত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ পরিচ্ছেদের দায়িত্বভার বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই আলোচনায় গুরুদক্ষিণা স্বরূপ কেবলমাত্র স্তুতিবাক্য ব্যবহার করেননি, যথার্থ সমালোচকের মতই দোষে গুণে মিশ্রিত ঈশ্বরগুপ্তের কবিস্বরূপের পরিচয় নির্ধারণ করেছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের যে বৈশিষ্ট্যটি সর্বাগ্রে চোখে পড়ে, তা হল ঈশ্বরগুপ্ত Realist এবং Satirist' তবে 'ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই'। 'অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় একটি প্রধান দোষ।' তবে এই অশ্লীলতার জন্য সেকালের রুচিকেই অনেকপরিমাণে দায়ী করা যেতে পারে। সর্বোপরি ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালী কবি, গ্রামকেন্দ্রিক বাঙালীর ভাব-ভাষা সবকিছুই তাঁর মধ্যে প্রকাশিত।

ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব ? (কৃষ্ণচরিত্র ১ম ১৩ পরিঃ)।

এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র সোজাসুজি প্রশ্নাকারে বিষয়বস্তুটিকে স্থাপন করেছেন। অলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তি অপেক্ষা আক্রমণাত্মক ভাবটিই গ্রহণ করেছেন। অনেকে বলেন যে ঈশ্বর নিগুর্ণ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরের নিগুর্ণত্বে বিশ্বাস করেন না। প্রশ্ন উঠতে পারে ঈশ্বর তো সবই করতে পারেন। তবে তাঁর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে দুষ্টের দমনে এত সময় ব্যয় করার দরকার কি ? দরকার এই ঈশ্বর তাঁর অবতারত্বের দ্বারা মানুষকে কর্মানুষ্ঠানে প্রেরণা যোগায়। আবার 'কর্মই ধর্মের প্রধান উপায়'। এই কারণেই ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে কৃষ্ণের মানবস্বরূপের ব্যাখ্যাকেই প্রবৃত্ত হয়েছেন, তবুও ঈশ্বরের অবতারত্বেও তিনি বিশ্বাসী।

ঈশ্বরে ভক্তি (ধর্মতত্ত্ব ১ অধ্যায়)॥

এই অধ্যায়ে ঈশ্বরভক্তির স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র—"*যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।*" এই অধ্যায়ের গুরুদেবের উক্তি—"*এ জীবন লইয়া কি করিব ?*" কথাটির সংগে কমলাকান্তের দপ্তরের কয়েকটি প্রবন্ধের মূল সুরটির সংগে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর ভক্তির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র 'জ্ঞানবাদ'-এর প্রাধান্য অস্বীকার করেছেন। কারণ জ্ঞানের দ্বারা অনেক জিনিষ জানতে পারা যায় বটে, কিন্তু পাওয়া যায় না। ভক্তিবাদই ঈশ্বরলাভের প্রকৃত উপায়।

ইউরিপিডিস | সুখরঞ্জন চক্রবর্তী।

শ্রেষ্ঠ গ্রীকনাট্যকারদের মধ্যে তৃতীয় এবং সর্বকনিষ্ঠ নাম হলেন ইউরিপিডিস। তাঁর রচনাতেই তথাকথিত নাট্যচিন্তা এবং প্রাচীন ঐতিহ্যানুসরণ সর্বপ্রথম প্রখর ও প্রচণ্ড প্রতিবাদের ভাষা পেল। এথেনীয় দর্শক মনকে তিনিই প্রথম এক দুঃসহ প্রত্যয়ের মুখোমুখি এনে দাঁড় করালেন। গ্রাম্যজীবনের নিস্তরঙ্গ শান্ততার পরপারে ইউরিপিডিস দর্শকদের এনে উপস্থিত করলেন নাগরিক জীবনের অশান্ততার মাঝখানে। উপস্থিত করলেন সংশয় ও সংঘাতের দুর্গম পরিমণ্ডলে।

মানুষের জন্য মানুষের লেখা নাটক তৎকালীন নাট্যমোদীরা বলতে গেলে সর্বপ্রথম ইউরিপিডিসের হাত থেকেই লাভ করলো। এতদিন যে নাটক লেখা হচ্ছিল তাতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য এমনই সুদীর্ঘ সাম্রাজ্য অধিকার করে রেখেছিল যে, তার মধ্যে ঠিক যেন মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু যেসব মানুষেরা নাট্যকারদের অনুপ্রেরণা সঞ্চার করছিল তাদের সঙ্গে দর্শকদের ঠিক যেন কোন আত্মিক সংযোগ ছিল না। ইউরিপিডিসের রচনার সংগে সংগেই নাটকের মধ্যে সত্যকার মানব প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হলো। ইউরিপিডিস তার নাটকে কুশীলব দাঁড় করালেন মানব ও মানবীকে—বাস্তব জগতে যাদের সচরাচর দেখা মেলে।

প্রাক্তনদের মতন এই তরুণ নাট্যকার কোন ঐতিহ্য ও পুরাণে আস্থা পোষণ করেন নি। তিনি মনে করতেন যে পুরাণগুলি অত্যন্ত নীতিবিগর্হিত এবং সুস্থচিন্তার পরিপন্থী। এখানে বর্ণিত দেবদেবীর কথা যদি সত্য হয় তাহলে কোনমতে তাদের পূজার্চনা তো দূরের কথা, ভক্তি শ্রদ্ধাও করা যায় না। আর যদি তা না হয়, তবে প্রাচীন গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাস কত শিথিল, কত অবনত, তা ভেবে বারবার শিউরে উঠেছেন এই তরুণ নাট্যকারটি। এরিস্টোফিনিস ইউরিপিডিসকে একজন “নাস্তিক” বলে ঘোষণা করেছেন। একদিক দিয়ে ঘোষণাটি সত্য। ইউরিপিডিস গ্রীক দেবদেবীর কোপনস্বভাব অন্যায়, দুষ্কর্ম প্রভৃতি অত্যন্ত ক্ষমাহীন দুর্বাশার মতনই দেখেছেন তাঁর কাছে, তাঁর বিচারের মানদণ্ডে ঈশ্বরেরও রেহাই ছিল। তাই তাঁর রচনাতে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের চাবুক বারবার নির্মমভাবে আস্ফালিত হয়েছে। অধ্যাপক নিকল বলেন, “If Sophocles shows himself akin to Shakespeare, Euripides, with his prevailing itellectualism and disillusionment, freequently reminds us of shaw.”

পরবর্তীকালে শ’ এর নাটকের মধ্যে যে অঙ্কুরোদ্গমন দেখতে পাই—বুদ্ধির তীব্রচ্ছটা, প্রতীকদ্যোতনা, সূক্ষ্ম সাংকেতিকতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি তা যেন সর্বপ্রথম ইউরিপিডিসের নাটকেই দেখা গিয়েছিল। পঞ্চমশতকের গ্রীকচিন্তায় যে সংশয় দেখা দিচ্ছিল, তার প্রথম উন্মেষ হয় ইউরিপিডিসের রচনাতে। ইস্কাইলাসের মতন ভাববাদী বা কল্পনাপ্রবণ তিনি ছিলেন না।

অপিচ প্রখর জীবনবাদী ও বাস্তবানুগ নাট্যকার ছিলেন তিনি। তাঁর রচনাতে বাস্তবানুগত্য অত্যন্ত গভীরমাত্রার বিদ্যমান ছিল। অধ্যাপক নিকল বলেছেন, "There is an ugly modern word that saw much service in the twenties of the present century—'debunking'; it might well be applied to much of Euripides work."

প্রাচীন ঐতিহ্য ও পুরাণে অবিশ্বাস ইউরিপিডিসের কাছে নিত্য নতুন সব নাটকীয় সমস্যার উদ্রেক করেছে। এইসব সমস্যার সমাধানের দিগন্ত আবিষ্কারের প্রচেষ্টার মধ্য থেকেই ক্রমশ তিনি রঙ্গমঞ্চকে আমাদের কালের কাছাকাছি এনে পৌঁছে দিয়েছেন। একদিক দিয়ে বলতে গেলে ইউরিপিডিসই হচ্ছেন বর্তমানকালের তথা আধুনিককালের মঞ্চপোযোগী নাট্যরচয়িতাদের দিকদিশারী। জন ড্রিংক ওয়াটার বলেছেন, "Euripides was compelled to use the elaborate method of the Greek stage, but he chose men and women, not Gods, for his dramatic personal, and, for this reason, he regarded as the father of romantic drama."

কিন্তু ইউরিপিডিস তথাপিও পাপের চেয়ে পুণ্যকেই অধিকতর মর্যাদা দান করেছেন। কেননা পুণ্যের মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সুন্দরের অবস্থান।

কমকরে সত্তরটি নাটকের রচয়িতা হলেন ইউরিপিডিস। তারমধ্যে আটটি নাটক অবিস্মরণীয় মর্যাদার অধিকারী। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মিডিয়া। অধ্যাপক গিলবার্ট মারে মিডিয়াকে চরিত্র সৃষ্টি এবং পরিবেশ রচনার দিক থেকে একটি অসামান্য রচনা বলে স্বীকার করেছেন। এটি নাট্যকার ইউরিপিডিসের একটি প্রাথমিক রচনা। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর প্রতিভার স্বর্ণচম্পকদীপ্তি অনুভব করা যায়। এখানে লেখকের যৌবনকালের অনুভূতিকেই বাকবদ্ধ করা হয়েছে। এই লেখক দ্বিধাগ্রস্ত এবং সৌন্দর্যের পূজারী। জেসন ও মিডিয়ার কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে এই নাটকের পটভূমি। জেসন তাঁর যাদুকরী পত্নীর সান্নিধ্যে যখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন এবং করিন্সের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেছেন তখন থেকেই এই নাটকের সূত্রপাত।

জেসন এখন মধ্যবয়স্ক; তাঁর বিলাসিনী স্ত্রীর ভালবাসাতে এখন তিনি বড় ক্লান্ত অনুভব করেন। মিডিয়া এখন বিষণ্ণনয়না নারী, চোখে তার বার্ধক্যের প্রতি তীব্র ঘৃণা। (sullen-eyed and hot with hate) নিজ কন্যার কল্যার্থে করিন্থের রাজা তাঁকে নগর থেকে নির্বাসিত করেন। প্রাতে মিডিয়া তাকে অকৃতজ্ঞতার জন্য তীব্র ভৎর্সনা করে। মিডিয়ারই সাহচর্যে তিনি স্বর্ণময় ফ্লিস পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন; ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর বিপন্নজীবন, তাঁর প্রতারক কনিষ্ঠতাত পিলিয়াসকে মিডিয়াই হত্যা করেছিল।

কিন্তু আজ জেসন সেই স্বীকৃতিদানে অনিচ্ছুক। তাই মিডিয়া গ্রহণ করবে চরম প্রতিশোধ। তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মিডিয়া দান করবে মৃত্যুর মতন ভয়াবহ দান। তাতেও সন্তুষ্ট হবে না মিডিয়া। জেসনকে শুধু বিপত্নীক করেই ক্ষান্তি মানবে না সে; জেসনকে অপুত্রকও হতে হবে। তার অবিশ্বাসী প্রেমিককে আঘাত হানবার জন্য মিডিয়া তার নিজের সন্তান সন্ততিকেও হত্যা করবে।

জেসনের সঙ্গে দ্বিতীয়সাক্ষাতে মিডিয়া এমন ভান করে যে তার ভাগ্যের কাছেই নতি

স্বীকার করবে এবং তার সন্তানসন্ততিদের দেখে সে ক্ষণকালের জন্য অশ্রুপাতও করে।

কিন্তু মিডিয়ার এই বিগলিতভাব ক্ষণকাল পরেই কেটে যায় এবং মিডিয়ার প্রতিহিংসা পরায়ণা ক্ষণকাল পরেই আবার আত্মপ্রকাশ করে।

মিডিয়া ইউরিপিডিসের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এরই মধ্য দিয়ে তিনি সুন্দর জীবনের এষণা করেছেন। মিডিয়াতে নৈতিক প্রশ্নটিকে ইউরিপিডিস অত্যন্ত বড় করে দেখেছেন এবং ভ্রষ্ট পাপাচারে লিপ্ত জীবনযাত্রাকে এই তরুণনাট্যকার কখনোই বৃহৎরূপে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

এরিষ্টোটল ইউরিপিডিসের প্রতিভাকে অকপটে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সফোক্লিস সহ সমস্ত গ্রীক জনতা এই নাট্যকারের দেহবসানে শোক প্রকাশ করেছে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে গ্রীকনাটকের একটা মহানকালের অবসান হয়।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

লৌকিক শব্দকোষ ॥ কামিনীকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্। ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১। মূল্য : ১২'৫০।

সাহিত্যের নামে আজ যখন কিছু চিত্রিত কামকণ্ডুয়ন, কিছু অর্থহীন, ছন্দহীন প্রলাপ ভাষণা, স্থান-কাল-পাত্রের সম্পর্কহীন অন্ধ নির্বোধ অনুকরণ অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং সবচেয়ে কুশিক্ষিত নরনারীর উদ্দাম হাততালি কুড়োচ্ছে; আজ পাণ্ডিত্য যখন পল্লবগ্রাহিতা, সমাজের জ্যেষ্ঠেরা যখন নিবীর্য ক্লীব বৃহন্নলার ভূমিকা নিয়েছেন, সাধারণ সুস্থ মানুষ যখন মূঢ় বিস্ময়ে ও হতাশায় স্তব্ধ, তখন এ ধরণের একটি শ্রমনিষ্ঠ গ্রন্থের আবির্ভাব পরম বিস্ময়ের এবং আনন্দের সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরাধিকার যে আমাদের বিপন্ন রক্ত থেকে এখনো নিঃশেষে নির্বাসিত হয়নি—এ তারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র যে এদেশে জন্মলাভ করেছিলেন, গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় শ্রীকামিনীকুমার রায় সেই মহাসত্যটি আজ এই ধ্বংসের দায়ভাগে জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর এই অব্যর্থ অমোঘ সারস্বত কর্মের সম্পাদনায়। আবির্ভাব কথাটি স্বেচ্ছায়ই ব্যবহার করেছি; কারণ এ মাটিতে এ ধরণের ফসল বহুকাল ফলেনি। তাঁর এই মহৎ গ্রন্থে আমি স্পষ্ট যেন আবার প্রত্যক্ষ করেছি সেই হারিয়ে যাওয়া, সেই মিলিয়ে যাওয়া উনবিংশ শতকের বৃহৎ বড় বাঙ্গালীর সমর্পিত নিদিধ্যাসনের শেষ অম্লান দীপ্তি।

গ্রন্থকার যদিও এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে 'কোষ' শব্দটি ব্যবহার করতে গিয়ে প্রাজ্ঞজনোচিত বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, কিন্তু আসলে এটি মামুলী অভিধান মাত্র নয়, পরন্তু, যথার্থ কোষগ্রন্থের সামগ্রিক লক্ষণে এবং অভিজ্ঞানে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বস্তুতঃ বাংলা দেশের সার্থক কোষগ্রন্থের যথার্থ উত্তরসূরী লৌকিক শব্দকোষ; আমার তো মনে হয়, কোনো কোনো বিষয়ে একমাত্র প্রাচ্য বিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষের সঙ্গেই এই গ্রন্থ তুলনীয় হতে পারে। যদিও লৌকিক শব্দকোষ এবং বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। বিশ্বকোষ হল ইংরেজী এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রতিশব্দ। যদিও মূলতঃ এটি শব্দকোষ, কিন্তু প্রায় প্রতিটি শব্দের পরে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাতে একে নিশ্চিতভাবেই special encyclopaediaর মর্যাদা দিতে হয়। আন্তরিকতার ঐশ্বর্যে এবং তথ্য ও তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণে এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রসঙ্গের পরিধি বিস্তারে এ গ্রন্থ যে তুঙ্গ স্পর্শ করেছে তা একক প্রচেষ্টায় প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হবে; বিশেষ করে আজকের এই সস্তা হাততালির যুগে, এই অবক্ষয়ী সময়ের অন্তহীন অন্ধকারের আবর্তে তলিয়ে যেতে যেতে এ ধরণের শ্রমনিষ্ঠ তপস্যামণ্ডিত গ্রন্থের আবির্ভাব আমাদের কাছে পরম বিস্ময়।

নানা মৌখিক ও আঞ্চলিক শব্দের বিপুল সংগ্রহ এবং তাদের বিভিন্ন শব্দার্থের গবেষণা

এ গ্রন্থের একটি অংশ মাত্র। পরন্তু একটি শব্দকে আশ্রয় করে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যে বিচিত্ররূপা সংস্কৃতিতে মুক্তধারা প্রবাহিত হয়ে আছে—তার সামগ্রিক উন্মোচনও এ গ্রন্থের অভিষ্ট। এই কারণেই আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'একই শব্দের বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপ ইনি ধরিয়া দিয়াছেন, ইহাতে এই পুস্তকের উপযোগিতা আরো বাড়িয়াছে। সারা বাঙ্গালায় জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে, চিন্তাপ্রণালীতে, রহন-সহনে যে সাম্য আছে, তাহা একই শব্দের বিভিন্ন বিচিত্র রূপের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানি সহৃদয় পাঠকের নিকট উপাদেয় এবং উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য। ইহার বৈজ্ঞানিক মূল্য তো আছেই, সাংস্কৃতিক দিকও ইহার আর একটি গুণ।'

'এই সমস্ত গ্রাম্য ও প্রাদেশিক শব্দ লইয়া বৃহৎ সংগ্রহ পুস্তকাকারে এখনো বাহির হয় নাই—অন্তত: পশ্চিমবঙ্গে।' বলেছেন আচার্য সুনীতিকুমার। বস্তুত:পক্ষে সামগ্রিকভাবে বাংলা দেশের আঞ্চলিক ও গ্রাম্য শব্দের অভিধান রচনায় প্রথম পথিকৃতের সম্মান প্রাপ্য বর্তমান গ্রন্থকারের—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলার নবজাগৃতির ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকেই শুরু হয়েছে আমাদের আত্মানুসন্ধান। তখন থেকেই ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু প্রয়াস প্রযত্ন এ প্রসঙ্গে দেখা গেছে সত্য, ছোট বড় কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ এবং গবেষণার কাজ, এমন কি বিশেষ কোনো একটি অঞ্চলের বা সমাজের কথ্যভাষার অভিধানও বিরচিত হয়েছে, কিন্তু এরকম আনুপূর্বিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংহত প্রয়াসের ফলশ্রুতি এর আগে ঘটেনি। পূর্ববঙ্গে ডা: শহীদুল্লার তত্ত্বাবধানে এ ধরণের বাংলা উপভাষা বা বিভিন্ন কথ্যভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচনার কাজ এই দশকেই শুরু হয়েছে। প্রথম ছ'টি খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিতও হয়ে গেছে। কিন্তু এ প্রয়াসের পিছনে রয়েছে পূর্বপাকিস্তান সরকার এবং পূর্ববাংলার অজস্র পণ্ডিত, গবেষক ও ছাত্র-সম্প্রদায়। তা ছাড়া তাঁদের শব্দ সংগ্রহের প্রয়াস পূর্ববঙ্গের মাত্র তেরটি জেলাকে কেন্দ্র করে। সামগ্রিকভাবে বাংলা কথ্যভাষার পূর্ণায়ত চিত্রটি যে আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে কখনোই উন্মোচিত হতে পারবে না। একক প্রচেষ্টায় শ্রীযুক্ত রায় যে দু:সাধ্য কর্মে ব্রতী হয়েছেন তাতে তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদের পাত্র।

তিনি তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে ভূমিকায় বলেছেন, 'ইহা বাংলার (বিভাগোত্তর পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান) বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের (masses) মৌখিক ভাষার শব্দসমূহের শেষ গ্রন্থ। সমগ্র বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মৌখিক লোকায়ত শব্দাবলী সংগ্রহ করা কী যে দুরূহ কর্ম—এ সম্পর্কে যাঁদের সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই জানেন। ২৪৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে যে সব শব্দাবলী সংগৃহীত হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি, তা শ্রীযুক্ত রায়ের সমগ্র সংগ্রহের সামান্য অংশ মাত্র। বিগত ৩৫ বৎসর যাবত তিনি এই দু:সাধ্য কর্মে সমর্পিত হয়ে আছেন। কোনো সরকারী বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পান নি বলেই আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে, তিনি নিজেই এই গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রণী হয়েছেন এবং সেই কারণেই এ গ্রন্থের অপূর্ণতা—সংগৃহীত সমগ্র শব্দাবলীর সামান্য অংশকে প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন গ্রন্থকার।

শুধু শব্দ সংগ্রহের বিশালত্বই নয়, প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে তিনি যে সব তথ্যাবলী এবং তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন—তা তাঁর প্রভূত প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার-লিখিত ভূমিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি

নানা বিষয়ের জ্ঞানের সমাবেশ এবং বিচিত্র নিপুণ অজস্র তথ্যের উপস্থাপনায় সমগ্র ভূমিকাটি এই গ্রন্থের পরম সম্পদ।

আরো একদিক থেকে এই ভূমিকাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। আজকের যুগে—আত্মশ্লাঘা এবং আত্মপ্রচারের দুর্মর অন্ধ নেশায় পূর্বসূরীদের ঋণস্বীকার করা দূরের কথা, অগ্রগামীদের এবং সহযাত্রীদের উদ্দেশ্যে কর্দম নিক্ষেপ করাই যখন একালের মেকি পাণ্ডিত্যের প্রচলিত পথ, সেখানে কামিনীবাবুর এই ভূমিকাটি একটি বিরল উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। আঞ্চলিক উক্তভাষা বা মৌখিক ভাষার সংগ্রহে এবং এ সম্পর্কে তথ্য বা তত্ত্বের উদ্ঘাটনে পূর্বসূরীদের সামান্যতম অবদানকে শ্রীযুক্ত রায় তাঁর এই ভূমিকায় সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়ে জনচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশে এবং বাংলার বাইরেও যিনি যতটুকু কাজ করে গেছেন তার সমগ্র ইতিহাসটি আনুপূর্বিক পরিবেশন করে কেবল যে পূর্বসূরীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে মানবিক কৃত্য সম্পাদন করেছেন তাই নয়, পরন্তু ভাবীকালের গবেষকদের জন্যও পথনির্দেশ করে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্বও পালন করে গেলেন। এই ধরণের অভিধান বা কোষগ্রন্থ রচনা করতে হলে যে সব পথপরিক্রমা অবশ্যম্ভাবী, তারও একটি সুন্দর রূপরেখা শ্রীযুক্ত রায় তাঁর ভূমিকায় তুলে ধরেছেন।

জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণলেখ্য নির্মাণে মৌখিক বা আঞ্চলিক ভাষায় আলোচনা এবং গবেষণার মূল্য যে কতটা এ সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর সুলিখিত 'পরিচয়ে' উল্লেখ করেছেন। মিশ্র এবং যৌগিক আমাদের বাঙালী সংস্কৃতিতে লৌকিক উপাদান প্রচুর। বিভিন্ন যুগে নানা দিগ দেশ থেকে আগত কৌম সমাজের এবং এই দেশেরও আদিম অধিবাসীদের জীবনের থেকে তো বটেই, বিচিত্র সব উপাদান ও অবদান মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে আমাদের আজকের বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের নানা চর্যায়, উপকরণে এবং রূপাবয়বে। সবাই মেনে নিয়েছেন ইতিহাসের এই অমোঘ সত্যকে। তাই সমগ্র বঙ্গসংস্কৃতির সত্য রূপ জানতে হলে আমাদের লোকজীবনের ও লোক সংস্কৃতির সঙ্গে যথার্থ পরিচয় একান্ত অপরিহার্য। এবং এই মৌখিক লোকভাষার মধ্যেই ছড়িয়ে এবং জড়িয়ে আছে লোকসংস্কৃতির জানা রূপরেখার প্রসঙ্গ। বিভিন্ন শব্দাবলীর অর্থপরিবেষণা প্রসঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের নানা ইতিহাস ও পরিচয় প্রভৃত পাণ্ডিত্য এবং রসবোধের সঙ্গে লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাই কেবল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র শব্দ ভাণ্ডারে উন্মুক্ত করেই নয়, পরন্তু সমগ্র বাংলা সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় দানে গ্রন্থটিকে লেখক বঙ্গ সংস্কৃতির সম্পর্কিত চিরায়ত গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত করে দিয়েছেন। বহুকালের বহুজনের আকাঙ্খিত সমগ্র বাংলা মানুষের জন্য শ্রীযুক্ত রায় যে এরকম একখানি লৌকিক শব্দকোষ রচনা করে জাতিকে উপহার দিয়েছেন। এজন্য বাঙালীর সারস্বত সাধনার ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে রইল।

নচিকেতা ভরদ্বাজ

Early Bengali Prose : Carey to Vidyasagar By Dr, Sisirkumar Das : Book Land (P) Ltd. Calcutta, Price : Rs. 25·00 Only.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ডি. লিট., ডি. ফিল., বা পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণা-গ্রন্থের অভাব, অন্তত সংখ্যার দিক থেকে, এখন আর নেই। বরং বাজারে ভীড়টা একটু বেশীই। ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাও যেমন তেমনি ঠকার সুযোগও বেশী। ফলও হচ্ছেও তাই। পাঠক—লেখক—প্রকাশক ত্রিপক্ষই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রকাশক গবেষণা গ্রন্থের নাম শুনলেই আঁৎকে উঠছেন, পাঠক বস্তু বিষয়ে তৃপ্তি পাচ্ছেন না, লেখকও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছেন। সব মিলিয়ে বাজারে এখন এক ভয়াবহ নৈরাশ্য আর নিষ্ফলতা বিরাজমান। এ সত্বেও কদাচিৎ দু'একখানি গ্রন্থে যখন প্রকৃত সারস্বত সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় তখন ভগ্ন-মনে আশা, আনন্দ ও বলের সঞ্চার হয়।

ডঃ শিশিরকুমার দাশের Early Bengali Prose : Carey to Vidyasagar এমনি এক বিরল মনীষার সফল প্রয়াস। লণ্ডনে বসে ধান চাষ সম্পর্কে গবেষণা নিয়ে যাঁরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন তাঁদের কথা স্মরণে রেখেও বলছি যে এখনো সুখতা ও সুষ্টুতার দিক থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণা করার সম্ভাবনা ওদেশেই বেশী। প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থটি। এটি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ থিসিস। এখানে আমাদের জ্ঞানচর্চার এখন চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। মূল্যবান বই আমাদের দেশে পাওয়া কত কষ্টকর তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। গ্রন্থ একটু প্রাচীন হলেই তা আর জাতীয় গ্রন্থাগারেও পাওয়া যায় না। তাছাড়া দুষ্প্রাপ্য বই সংরক্ষিত করার সদিচ্ছাও আমাদের নেই। বইর এত অযত্ন বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আর নেই। এর মধ্যে শিক্ষিতের পুস্তক চুরির অভ্যাস ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অথচ, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের কত অমূল্য গ্রন্থাদি বিদেশের গ্রন্থাগারে কত যত্নে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা লাভের ২২ বৎসর পরেও সে সমস্ত পুস্তকাদি দেশে আনানোরও কোন ব্যবস্থা হলনা! কাজেই আমাদের গবেষণার মান নিম্নমুখীন হওয়ার এ একটি বড কারণ।

গবেষণার মূল্য যেমন নূতন আবিষ্কারে তেমনি বিশিষ্ট পদ্ধতিতেও। উভয় দিক থেকেই যখন অভিনবত্ব এবং নবমূল্যবিচার করা হয় তখনি গবেষণার মান উচ্চমুখীন হয়। ডঃ দাশের গ্রন্থখানি এই কারণে স্বতন্ত্র মূল্যের। বস্তু বিষয়ের নূতনত্বে এবং পদ্ধতির বিশিষ্টতায় বইটি আমাদের অন্যতম সম্পদ। দশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত বইখানির বস্তুবিন্যাস নিম্ন মত।

প্রথম অধ্যায় : অষ্টাদশ শতকের পলাশীর যুদ্ধ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-বিস্তার ও রাজশক্তিরূপে ইংরেজের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, সেকালীন কলকাতার ভাষার ইতিহাস এবং বাংলা গদ্যের প্রকীর্ণ উদাহরণ এবং সে সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব মতামত।

দ্বিতীয় অধ্যায় : উইলিয়ম কেরী, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু। কেরীর বাংলা ভাষা ও সাধারণভাবে বাংলাগদ্যের নির্মাণপর্বের অমসৃণতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও ভাষা-তাত্বিক মূল্য বিচারের পদ্ধতিটি এই অধ্যায়েই প্রথম ব্যবহৃত হল।

তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম অধ্যায় : কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা বিশ্লেষণ এবং বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এদের স্থান বিচার। কেরীর ভাষায় ইংরেজী বাক্যের গঠন ভঙ্গী, শব্দ নির্বাচনের অসুবিধা, বাক্য সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার প্রভৃতির বিশ্লেষণ, রামরাম বসু সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ভ্রান্তি প্রদর্শন, মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা, চলিত বাংলা ও সাহিত্যিক বাংলার তিনটি স্টাইল দেখানো হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : রামমোহন রায়ের গদ্যের বিশদ বিশ্লেষণ এবং বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্দেশিত হয়েছে। রামমোহনের ভাষা বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন, ভাষা ও ব্যাকরণের দিক থেকে সংস্কৃত ও বাংলার স্বভাব কখনোই এক নয়—এ ধারণা রামমোহনেরই প্রথম এসেছিল। তিনিই প্রথম গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। রামমোহনের রচনাতেই প্রথম শিথিল যতি বিন্যাস লক্ষিত হয়। যুক্তিগ্রাহ্য গদ্যের সূচনাও তার হাতে।

৭ম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে সাময়িক পত্রের ইতিহাস ও বাংলা গদ্যের ক্রম বিকাশ প্রসঙ্গে ভাষার উপাদানগুলির সূক্ষ্ম আলোচনা। দিগদর্শন পত্রিকা, যতিচিহ্নের ব্যবহার, সংযোজক অব্যয়ের সফল ব্যবহার, Direet, Indirect Speech ও ইংরেজী বাক্যবিন্যাসের সঙ্গে বাংলা বাক্যের সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রভৃতির আলোচনা।

৮ম অধ্যায় : সংবাদ প্রভাকর (১৮৩০) এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গদ্য। সংবাদ প্রভাকরের অভিভাবকত্বে দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির আত্মপ্রকাশ। ঈশ্বর গুপ্ত নিজেও কবি হয়ে গদ্যরচনায় প্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁর গদ্যে কবিতার ভাষা থাকলেও সরল বাক্যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। কবিদের জীবনী সংরচনে তাঁর মূল্য অপরিসীম। লেখক উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে সাময়িক পত্রের ভাষা কেবল সংবাদমুখীন হয় না, সাহিত্যমুখীনও হয় এবং ভাষার এই বৈশিষ্ট্য সংবাদ প্রভাকরেই লক্ষিত হয়েছিল।

৯ম অধ্যায় : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ। বাংলা গদ্যের দুটি বড় ধারার সূত্রপাত। ভাষা বিচার করে লেখক দেখিয়েছেন অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কেমন ভাবে বৈজ্ঞানিক রচনা দৃপ্তরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভাষার প্রারম্ভিক অসুবিধার মধ্যেও তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরী করেছেন। তৎসম শব্দের ব্যবহার এই কারণে তাঁর রচনায় দোষ নয়, অবশ্য অঙ্গ। দেবেন্দ্রনাথের হাতে Religious Prose বা ধর্ম সাহিত্যের ভাষা সৃষ্ট হল। লেখক উভয়ের রচনায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বাংলা গদ্য এঁদের হাতে ক্রমশ কত দার্ঢ্য হতে আরম্ভ করেছে। নুতন নুতন শব্দ নির্বাচনে সফলতা, সফলতা বাক্য গঠনে এবং যতি স্থাপনে। বস্তুত যতিচিহ্নের সফল ব্যবহার অক্ষয়কুমারেরই হাতে, ভুগোল (১৮৪১) গ্রন্থে।

১০ম অধ্যায় : গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা ভাষা সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল বলে লেখক প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। এই সঙ্গে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রচলিত একটি মারাত্মক ভ্রান্তিরও নিরসন করেছেন। গ্রন্থকারের ভাষায় Vidyasagar is popularly held to be the first Bengali writer to employ successfully the English Punctuation System in the composition of Bengali prose, This notion is false. কারণ পূর্ব অধ্যায়েই

বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থটির আলোচনায় আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা কর্তব্য। গ্রন্থকার কখনো তাঁর সিদ্ধান্ত আগে করে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেননি। আগে প্রমাণ, তথ্য, ভাষার উপাদান বিশ্লেষণ পরে সিদ্ধান্ত, ভাব, স্টাইলের পরিচয়। বস্তুত গ্রন্থটি Stylistics বা রীতিবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। এই পদ্ধতি আমাদের দেশে এখনো নূতন। স্টাইলিস্টিক্স অত্যন্ত জটিল বিজ্ঞান। একজন স্টাইল বিশেষজ্ঞের মতে Stylistics is not a branch of linguistics, it is a Parallel science which examines the same problems from a different point of view-—.—Ullmann,Stephen, **Style in the French novel**, England—1957, 10.

এই মত নিয়েও বিতর্ক আছে। বস্তুত নূতন বিষয় নিয়ে ভাবনার অবকাশ থাকে দেখেই এই বিতর্ক। তবে একথা মানতেই হবে যে যতদিন পর্যন্ত সাহিত্য আলোচনায় আর নূতন কোন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত না হচ্ছে ততদিন এই পদ্ধতিটিকে স্বাগত জানাতে কোন বাধা নেই। বরং আরো চর্চার দ্বারা পদ্ধতিটিকে আরো বিজ্ঞান সম্মত করে তোলাই প্রয়োজন।

পরিশেষে গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী এবং পাদটীকা বা রেফারেন্স ব্যবহারের ছাঁদটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। A Good bibliography is a must for a thesis ; যেটা আমাদের দেশে গবেষণার ক্ষেত্রে নাই বললেই চলে। লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম, (গ্রন্থের ভাগ বা খণ্ড থাকলে তার উল্লেখ), প্রকাশ স্থান, প্রকাশ কাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা এই ক্রম সজ্জায় পাদটীকা বা bibliography তৈরী করা দরকার। নতুবা Reference বা Bibliography দেওয়ারই অর্থ হয় না। কেবল গ্রন্থের নাম বা গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এমনকি প্রকাশকাল থাকলেও Refarence পূর্ণ হয় না। কোন সংস্করণের কোন সংখ্যা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ডঃ দাশ এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এই যত্ন ও সতর্কতা না থাকলে একটি ভাল গবেষণাগ্রন্থের পূর্ণতা কিছুতেই সম্ভব নয়। Early Bengali Prose : Carey to Vidyasagar এদিক থেকে একখানি মূল্যবান পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ। ছিদ্রান্বেষীর চোখে ভ্রান্তি হয়ত দু'চারটি চোখে পড়বে তবে মনে রাখা দরকার বাঁশির সুরই প্রধান, ছিদ্র নয়।

Dialectical marks, Graph, Table ইত্যাদির ব্যবহার হয়েছে ঠিকই তবু গ্রন্থের মূল্য ২৫·০০ টাকা আমাদের মত গরীবের দেশের পাঠকদের নিকট গ্রন্থটি পাঠের একটি বড় বাধা বলে মনে হয়। ভবিষ্যতে এদিকে তাকিয়ে যদি পেপারব্যাকের একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহলে প্রকাশক ও লেখক উভয়েই ধন্যবাদার্হ হবেন সন্দেহ নেই।

নবেন্দু সেন

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 January '70 (0'50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি —
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

চালায় যে নাম নাহি কয়।
কেউ বলে যন্ত্র সে, অর্থ-কিছু নয়।
মানেহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়,
অগোচরে যারা সব রয়েছে সেথায়
তারি যেন বাহু নিশ্বাস —
সন্দেহ-আড়ালেও মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।

সপ্তদশ বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৭৬
সমকালীন

তিনটাকা হয়
বেশী ফসল পেতে হলে মাটী পরীক্ষা করানোর পরে তাতে এন্‌পিকে(নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস্‌ ও পটাসিয়াম্‌) প্রয়োগ করুন।
সার প্রয়োগ থেকে সবচেয়ে বেশী লাভ করতে হলে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করুন।
কখন, কেন ও কিভাবে সার প্রয়োগ করতে হয়, সে বিষয়ে গ্রামসেবক বা সম্প্রসারণ অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।
একটাকা থেকে কেমন করে?
খুবই সোজা
সার
ব্যবহার করুন

সপ্তদশ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মর্ডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

কাব্যবিচারক চিত্তরঞ্জন

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিজীবনের বহু বিচিত্র গুণাবলীর মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল অথবা জনপ্রিয়তায় মুখরিত তন্মধ্যে পরাধীন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতারূপে, মাণিকতলার বোমার মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবী বীর অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে সওয়ালকারী কৌঁসুলীরূপে, স্বরাজ্য আন্দোলনের স্রষ্টারূপে অসাধারণ বাগ্মীতার অধিকারীরূপে জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালকরূপে চিন্তাশীল লেখকগোষ্ঠী সম্মিলিত মাসিক পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদকরূপে এবং সর্বোপরি উৎপীড়িত ও দুঃস্থ জনমানবের সেবা ও কল্যাণসাধনায় আত্মোৎসর্গকারী বদান্যপুরুষরূপে পরিচয়ই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁহার এই মহান ও মহনীয় জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দিকের কথা যাহা আমরা সাধারণতঃ বিস্মৃত হই তাহা তাঁহার রসজ্ঞ চিত্ত ও সৃজনধর্মী রুচিবান মন ও মনন। অর্থাৎ রাজনীতি অথবা আইন ব্যবসায়ের নানা কুটিলতা ও জটিলতার উর্দ্ধে তাঁহার যে একটি অতিশয় সরস ও অনুশীলনধর্মী চিৎপ্রকর্ষ ছিল তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিলে চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যের সমাদরের মাধ্যমে চিত্তরঞ্জনের জীবনের এই দিকটি বিকশিত ও সমৃদ্ধ।

শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যখন যৌবনে মাত্র পদার্পণ করেন সেই সময় হইতেই কাব্যসৃষ্টির দুর্নিবার প্রচেষ্টা তাঁহাকে পাইয়া বসে। মাত্র পনের বৎসর বয়সে তিনি সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন (১৮৮৫ সাল)। ১৮৯২ সাল হইতে ১৮৯৬ সাল লণ্ডনে ছাত্রজীবন যাপন কালেও কাব্যসৃষ্টিতে তাঁহার বিরতি ঘটে নাই। তিনি যতগুলি কাব্য রচনা করেন তাহার অধিকাংশ ১৮৯৬ সাল হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে পাঁচটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলির নাম যথাক্রমে :

মালঞ্চ (১৮৯৬), মালা (১৯০২), সাগরসঙ্গীত (১৯১৩), অন্তর্যামী (১৯১৫) এবং কিশোর কিশোরী (১৯১৫)।

এই কাব্যগুলিতে চিত্তরঞ্জনের কবিমানসের গভীর অনুভূতি, প্রগাঢ় আস্তিক্যবুদ্ধি, অতিশয় সংস্কারমুক্ত চিত্ত এবং একই সঙ্গে সূক্ষ্মরসবুদ্ধি ও অতিশয় সংযত ভাষাবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা কিন্তু চিত্তরঞ্জনের কাব্যরসের বিশ্লেষণ না করিয়া তাঁহার জীবনের অপর যে দিক অর্থাৎ রস বিচার শক্তির সহিত পরিচিত হইব। কারণ কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে কাব্যের সমাদর বা কাব্যরসের মূল্যায়ন চিত্তরঞ্জনের অনুশীলনী দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটি বিশিষ্ট দিক।

আমাদের দেশে অতিশয় প্রাচীনকাল হইতে বহু জ্ঞানী পণ্ডিত রসজ্ঞ ও আলঙ্কারিক ব্যক্তিগণ কাব্যের যথার্থ বিচারের মাপকাঠি প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়াছেন। তথাপি কাব্য বিচার সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হইয়াছে এমন উক্তি করিতে কেহই সাহসী হইবে না।

কাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্ত বলিয়াছিলেন—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। আবার ইংরাজ সমালোচক Mathew Arnold বলিয়াছেন—Life's criticism in Verse অর্থাৎ ছন্দের মাধ্যম জীবনের সমালোচনা নয়—জীবনের টীকা রচনা (Life's commentary in Verse)। অর্থাৎ কাব্যের সংজ্ঞা কোনও সীমিত পরিধিতে আবদ্ধ নয়। তাহা বিচারকের দৃষ্টিতে আপেক্ষিক।

চিত্তরঞ্জন কবি হইলেও কাব্যরসের বিচারে যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাব্য একটি নিরালম্ব বস্তু নয়। কবি মাত্রেই কল্পনার পক্ষে ভর দিয়া শূন্যে বিচরণ করিলেও সত্যকে অপরিহার্য বলিয়া জ্ঞান করেন। চিত্তরঞ্জনও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন: "জীবনের অনন্তমুহূর্তে প্রাণের সাক্ষাৎ লাভ হয়।......যাহা আত্মা তাহাই দেহ, যাহা অনন্ত তাহাই সান্ত। যাহা পরমার্থ তাহাই সংসার। এ জীবন লইয়াই কবিতা। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃ প্রকৃতির সন্ধান না পায় সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।......শূন্য আকাশে যেমন গৃহ নির্মাণকরা যায় না সেইরূপ কল্পিতলোকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।......সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।"

চিত্তরঞ্জন মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালী ছিলেন। তাই বাঙ্গলাদেশের সম্বন্ধে যেমন তাঁহার উচ্চাশা ও আত্মাভিমান ছিল তেমনি বাঙলার কাব্যকবিতার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। একদা প্রাণের উজ্জলতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙালী কবিগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন। সই কবিতায় তাহাদের প্রাণের উল্লাসের সহিত অনন্ত আনন্দ ও অমৃতের রসধারা উৎসারিত হইয়াছে। প্রাণের আবেগে ছন্দ রচনা গীতিমুখর হইয়া উঠিয়াছে এবং জীবনের বহুধাবিস্তৃত রূপ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নিত্যই নব নব মূর্তিতে প্রকাশমান হইয়াছে। চিত্তরঞ্জনের কথায় বলিতে গেলে বলা যায়—"বাঙ্গালার ঢেউ খেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধুগন্ধবহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপধুনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটির প্রাঙ্গণ, বাঙ্গালার নদনদী, খালবিল, বাঙ্গলার মাঠ, বাঙ্গলার ঘাট, তালগাছ ঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসীপত্র,

বাঙ্গলার গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগরতরঙ্গে চরণ বিধৌত-জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগরসঙ্গম, ত্রিবেণীসঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরাবৃন্দাবন, বাঙ্গলার জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ।"

বাঙ্গলার কাব্য-যাহা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে এ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে তাহার মর্মবাণী উপরিউক্ত চিত্র বা বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার মধ্যে যে একটি সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা প্রেমের, মিলনের ও আনন্দের সুর সমন্বয়ে রচিত মধুর বংশীধ্বনি।

চণ্ডীদাসের কাব্য প্রেম কল্পনার রসে ও রঙে অভিষিক্ত ও অনুরঞ্জিত হইলেও তাহা সত্য হইতে দূরে নহে। এই কথা স্মরণে রাখিয়াই চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন : শুধু নায়ক নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌছিতে পারে তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনা মাত্র।......চণ্ডীদাসের গীতিকাব্য বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য। ইহাতে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তাহাই বাঙ্গলার গীতিকবিতার প্রাণ। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত অতীন্দ্রিয় মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম। কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌছায়, এই প্রাণচিন্তামণির মণিকোঠরে মণি না মিলাইতে পারে তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়।...... শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুডৌল ও নিখুঁত, সুন্দর সহজ।"

বাঙ্গলার গীতিকাব্য যাহা বৌদ্ধদের দোহা বা সহজিয়া ধর্মের মধ্যে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল তাহা রূপান্তরিত হইয়া চণ্ডীদাসের যুগে এক নবকলেবর প্রাপ্ত হয়। চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি বাঙ্গলার আদি রাগাত্মিকাপদ রচয়িতা। উভয়ের মধ্যে জীবনবোধের আপাতদৃষ্ট সামীপ্য থাকিলেও ব্যবধান অনেকাংশে বর্তমান।

চিত্তরঞ্জনের মতে : "দুজনেই কবিতার মিলনমন্দিরের দ্বারে পৌছিয়েছেন। একজন মন্দিরদ্বারে আসিয়া থমকিয়া থামিয়া গেলেন আর একজন সেই মণিকোঠার প্রাণচিন্তামণিকে বুকের ভিতর ধারণ করিলেন, গাইলেন—

"বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব
প্রেমচিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।"

কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি। তাঁহারা বোধহয় জীবনের সুখদুঃখকে ভালো করিয়া বুঝেন নাই। সুখ যখন রূপান্তর হইয়া ভাগবতসত্যে ফুটিয়া ওঠে, তখন তাহা সুখ নহে দুঃখ এবং দুঃখ যখন ভাগবত সত্যে গিয়া পৌছায় তাহা দুঃখ নয় সুখ, তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন :

"...সুখ দুঃখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুঃখ যায় তারি ঠাঞি।"

একদিকে জীবনের অনুভূতি, অন্যদিকে রসের ভিতর দিয়া রূপান্তর, চণ্ডীদাসের প্রায় প্রত্যেক কবিতায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু বিদ্যাপতির তাহা নয়, তিনি গানে যে রসের মধ্যে যে অবস্থার কথা কহিয়াছেন, তাহাতে শুধু ইন্দ্রিয়ের ভোগ, রূপ রস গন্ধের অনুপম সামঞ্জস্য ও মিলন, তিনি সেখানে স্বয়ং সেই রূপরসের মধ্যে ডুবিয়া আছেন চণ্ডীদাস সেই রূপ রস গন্ধের মধ্যে ডুবুরির মত ডুব দিয়া মণি তুলিয়া উঠাইয়াছেন।"

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন ইহাও বলিয়াছেন "বিদ্যাপতি শুধু রাধার অন্তরে প্রবেশ করিয়া রাধার কথার সঙ্গে নিজের প্রাণের ভাব মিলাইয়া জড়াইয়া দিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস রাধাকে রাধাই রাখিলেন, তাহার মনের শুধু রাধার মনের নয় কুলবতীর মনের কথাটি এমন সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহার তুলনা হয় না।

পরিশেষে বিদ্যাপতির সর্বজনবিদিত পদ—

"জনম অবধি হম্ রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।" অথবা,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখল
তেওঁ হিয় জুড়ন ন গেল—উদ্ধৃত করিয়া চণ্ডীদাস কৃত পদ
"পুত্র পরিজন, সংসার আপন
সকল ত্যাজিয়া দেখ
পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ।"—ইত্যাদির সহিত মিলাইয়া

চিত্তরঞ্জন এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন—"বিদ্যাপতি প্রেম'র মধ্যেই ডুবিয়াছিলেন, প্রেমর মধ্যেই প্রেমকে দেখিতে পান নাই। চণ্ডীদাস জন্মমৃত্যুর অতীত, সুখ-দুঃখের অতীত, ভয় ভাবনার অতীত ইন্দ্রিয় গ্রাম সব ডুবাইয়া এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতের রসসিন্ধুর মাঝে ঢেউয়ের মত দুলিতেছেন।"

চিত্তরঞ্জনের উপরিউক্ত অভিমত হইতে এই ধারণা করিলে অবশ্যই ভুল হইবে যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির উভয় কবির রচনা তুলনামূলক সমালোচনাকালে তিনি বিদ্যাপতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন অথবা চণ্ডীদাসের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রদ্ধার সঙ্গে অধিগত করার পর চিত্তরঞ্জনের মনে চণ্ডীদাসের কাব্য যে বিশেষ রেখাপাত করিয়াছিল তাহাকেই তিনি আলোচনাসূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তাই প্রসঙ্গতঃ তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে "চণ্ডীদাসের গানে যে অভাব ছিল মহাপ্রভুর জীবনে তাহার পূরণ হইল।" মহাপ্রভুর জীবনে একমাত্র প্রার্থনা ছিল—"অহৈতুকী ভক্তি দাও, জগদীশ আর কিছুই কামনা করি না!" চণ্ডীদাসের গান আর মহাপ্রভুর জীবনকে চিত্তরঞ্জন বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। চিত্তরঞ্জনের ভাষায় বলা যায় "যুগল প্রেমের বিলাসবিবর্ত চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে তাহার অপরূপ স্ফূর্তি হইয়াছিল। চণ্ডীদাস যেন মহাপ্রভুর সৃষ্টিকে আনিতেছিলেন।" মহাপ্রভুর আবির্ভাবে দেশের সমাজ; সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। তিনি চিরাগত ভাবগত ধর্মকে নবরূপে রূপায়িত করেন। অর্থাৎ রামানুজ

ও মাধবাচার্যের প্রচারিত ভাবধারাকে প্রাচীন ভাগবতধর্মের সহিত সমন্বিত করিয়া মহাপ্রভু যে ধর্মের প্রবর্তন করেন তাহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব পদকর্তাগণ কাব্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই চণ্ডীদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। এই বিষয়ে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন—"মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের পর আমরা যে কবির পদাবলী পাই তাহার ভিতরে আগেকার রাগিনীই ফুটিয়াছে। কবি লোচনদাসের "চৈতন্যমঙ্গলে" বাঙ্গলা দেশের ঘরের কোণের কথা সত্যরূপ ফুটিয়াছে। গৌরাঙ্গের জন্মের পর বাঙ্গলায় আর এতবড় কবি জন্মাননি।"

কোনও কোন সমালোচক বৈষ্ণব কাব্যকে জীবনবিমুখী রূপকমাত্র বলিয়াছেন। কেহ কেহ আবার তাহার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের গন্ধ অধিকতর পাইয়াছেন। চিত্তরঞ্জন দৃঢ়তারসঙ্গে এই সকল অভিমতকে খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন: "বৈষ্ণব কবিদের প্রত্যেক অনুভূতি তাঁহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপুর্ণ অভিজ্ঞতার উপরেই স্বাধিষ্ঠিত।...বৈষ্ণব কবিদের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের রাধা তাঁহাদের জীবনের প্রাণের মর্মে শতদলের উপরই প্রতিষ্ঠিত।...বৈষ্ণব জানে যে তাহার মনে প্রাণে দেহে এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত লীলা করিতেছেন—সে যন্ত্র, যন্ত্রী তাহার প্রাণের প্রাণারাম হইয়া আনন্দরস লীলাচ্ছলে ভোগ করিতেছেন। এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই শুদ্ধি ভোগ ও ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত। এই ইন্দ্রিয় ভাগবৎ ভোগের ইন্দ্রিয়।" বৈষ্ণবকাব্য আসলে বাসনামুক্ত প্রেমেরই নিদর্শন। ইহাতে দেহ উপজীব্য হইলেও সম্পূর্ণ নয়—দেহাতীত কল্পনাই ইহার মুখ্যবস্তু। বাংলা কাব্যের প্রবাহকে যাঁহারা সুচনাকাল হইতে অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহারা যদি পাশাপাশি ইংরাজী কাব্যের তুলনা করেন তাহা হইলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে ইংরাজী গীতিকবিতায় কবির আত্মগত সুর বিশ্বের সকল পদার্থকে আপনার অন্তরে টানিয়া লইয়াছে এবং ইহার ফলে প্রত্যেক কবিতা কবির বিশেষ মনোভাবের ছাঁচে গড়া হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের কবিগণ কিন্তু যে কবিতা রচনা করিয়াছেন উহাতে কথা অপেক্ষা গানই প্রধান বস্তু, কবি জগৎ ও জীবনকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়া আপনার মনের মাধুরী মিশাইয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরগুলিও কথার উপর মৃদঙ্গ ঝঙ্কার তুলিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ইহা প্রমাণ করিতে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন: "আমাদের দেশে চণ্ডীদাস হইতে রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালারা কেহই গীতিকবিতা লেখেন নাই। তাঁহারা রচিয়াছেন গান। সেই গান যখন আসে তখন সুর আসে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কথা শুধু সেই রূপকের সুরের রূপকে ফুটাইতে সহায়তা করে। যে গান রসের সৃষ্টমূর্তিকে সুরেররূপে ঢালাই করিয়া দেয় সেই গানই বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি।"

চৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। বন্যার দুকূলপ্লাবী স্রোতধারার ন্যায় এ যুগের কবিগণ নবনব সৃষ্টির প্রাচুর্যে সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলেন। বৃন্দাবন দাস, নরোত্তম দাস, লোচন দাস, বলরাম দাস সকলের সার্থকসৃষ্টিতে বাঙ্গলার কাব্যসাহিত্য অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া ওঠে।

চৈতন্যের দেহান্তর প্রাপ্তির পর শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে। ইহার সঙ্গে মুসলমান শাসকদের অত্যাচার মিশ্রিত হইয়া দেশে সাংস্কৃতিক

নিষ্প্রদীপ (Cultural blackout) বিরাজ করিতে থাকে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আলোকের বর্ত্তিকাহস্তে আর্বিভূত হইলেন রামপ্রসাদ এবং আরও কবিকুল যাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, ও রামেশ্বরের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই বাংলা কাব্যের ধারাকে স্ব স্ব কৃতিতে পরিপুষ্ট করিলেও রামপ্রসাদের ন্যায় সাফল্য দাবী করিতে পারেন না। এমনকি ভারতচন্দ্রের ন্যায় শক্তিমান কবিও মুসলমানী সংস্কৃতির আওতায় পড়িয়া বিজাতীয় ভাবধারার অনুগমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পক্ষান্তরে রামপ্রসাদ হিন্দুর পৌরাণিক ঐতিহ্য সংস্কারকে স্মরণ করিয়া প্রাণের এক নবতম মহিমার কীর্তন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন: "একদিকে মুসলমানী বাঙালী কবি আলোয়ালের পদ্মাবতী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মাঝে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্তন সেই যুগের দুই ধারাকে স্রোতের মত লইয়া গেছে: কিন্তু দুই স্রোত গঙ্গাযমুনার মতো মিলিতে পারে নাই, পারিবেও না।"

রামপ্রসাদের গান প্রধানত: চারভাগে বিভক্ত: কালীকীর্তন, শিবসঙ্গীত কৃষ্ণসঙ্গীত ও তত্ত্বসঙ্গীত অথবা দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে সঙ্গীত বর্তমান। রামপ্রসাদের সঙ্গীতের প্রচার সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াই আজু গোঁসাই, রামদুলাল, কমলাকান্ত কাব্য রচনা করেন। রামপ্রসাদের লোকান্তর গমন ও রামমোহনের জন্ম এই দুই ঘটনা বাংলাকাব্যের সুপ্রাচীন ও বহুকালগত ধারাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিয়াছে। রামমোহনের শিক্ষাদীক্ষা ভিন্নরূপ থাকায় তিনি রামপ্রসাদকে আদৌ অনুসরণ করেন নাই। কেন করেন নাই তাহার উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন: "রামমোহন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। কেননা বাঙ্গলার নিজস্ব যে বৈষ্ণবভাব যাহা বাঙ্গলার প্রাণকে ধর্মকে জাতিকে সমাজকে সকলরকমে বাঙ্গলার সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন মায়াবাদী বেদান্ত ও কোরানের সঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্রকে বেশ করিয়া শুনাইয়া দিলেন।" রামপ্রসাদের কাব্য বিচারকালে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন: "রামপ্রসাদ এই জগতকে যেমন সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বের প্রাণকে যেমন মাতৃরূপে, জননীর মাতৃত্বের ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলেন, নিজের প্রাণকে যেমন মাতৃত্বের রূপান্তরে লইয়া গিয়া আপনি আত্মস্থ হইয়া তাহাতে নিজেকে ও নিজের প্রাণকে বিশ্বমাতাকে এক করিতে পারিয়াছিলেন তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁহার রচিত আগমনী ও বিজয়া।......রামপ্রসাদের গানের ভিতর প্রেমের মানুষের যে রূপান্তর হইয়াছিল তাঁহার কাছে বিশ্বের দর্শনাদি প্রতিপাদ্য গ্রন্থের বোঝা ও জ্ঞান গোষ্পদের তুল্য।"

প্রসঙ্গত: চিত্তরঞ্জন ইহাও বলিয়াছেন: "বাঙ্গলার অঙ্গনে এই একটা সুন্দর অদ্ভুত ধারা দেখিলাম। সে মুসলমানি ধারার পাশে যেমন রামপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাঙ্গলার প্রাণের স্রোতকে অনাবিলভাবে বহাইয়া লইয়া গেছেন ঠিক তেমনি রামমোহনের সময়ে কবিওয়ালার দল, রামবসু, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, যজ্ঞেশ্বরী প্রভৃতি বাঙ্গলার খাঁটি কবির দল সেই সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল।"

বাঙ্গলা কাব্যের ধারা অনুসরণকালে চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধকগণের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হইয়াছেন। যেখানে তাহার ব্যত্যয় লক্ষ্য করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার অভিমত কঠোররূপ

পরিগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বৈষ্ণবভাব বর্জিত কবিতাকে তিনি কখনও সাদরে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বোধহয় চিত্তরঞ্জনের আজন্মলব্ধ সংস্কার কবিতা অর্থে খাঁটি বাঙালী জীবনের অনুসারী ভক্তি রসাশ্রিত প্রেমসুন্দরের কল্পনাভিন্ন অন্য কিছুকে চিন্তার বিষয় করিতে পারে নাই। তাই রামমোহনকে তিনি ফেরঙ্গ কবিতার গুরু অথবা জবরদস্ত মৌলবী বলিয়া ব্যঙ্গ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বাঙ্গলার গীতি কবিতা ইউরোপের গীতি কবিতা হইতে যে ভিন্ন প্রাণধর্মের ও ঐতিহ্যসংস্কারের প্রতীক তাহা তিনি অন্তরের সহিত গভীরভাবে বিশ্বাস করিতেন। তাই তিনি রামপ্রসাদের কালীকীর্তন হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া বাঙালী বাৎসল্যরসের চিত্র ও বাঙালী গৃহসংস্কারের দৈনন্দিন পিতামাতার মধুর স্নেহ সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়া দেখাইয়াছেন—

গিরিবর। আর পারিনি হে
প্রবোধ দিতে উমারে
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে……

এই বাৎসল্যরসের চিত্র ও গানটিকে এই ফেরঙ্গযুগে ঘোরো কবিতা বলিয়া ব্যঙ্গ করা সহজ, কিন্তু যাঁহারা সত্য মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও বাৎসল্যরস জীবনে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া প্রাণের ভিতর অনুভূতিতে সে রস আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন ইহার তুলনা কেহ দিতে পারে না।”

পক্ষান্তরে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবির কবিতার একটি নমুনা উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

“খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?
মা শুনে কন হেসে কেঁদে—
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।……

ইহাতে বাৎসল্যরসের গভীরতা দূরে থাকুক, রসিকজন ইহাতে বুদ্ধির খেলাই দেখিতে পান, রসের কোন আভাষই পান না।…আমি যাহাকে ইংরাজী গীতিকবিতার কথা বলিয়াছি ইহা সেই বিলাতী ছাঁচে তৈরী।” ইরাজী গীতিকবিতা যেমন Realism ও Idialism উভয়কে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছিল বাংলা গীতিকবিতা সেইরূপ প্রেম ও ভক্তি রসের সমন্বয়ে সৃষ্ট হইয়াছিল। এই প্রেম ও ভক্তি অর্থে কিন্তু অনন্ত ও শাশ্বত মাধুরীর আকাঙ্খা যাহা বিশেষ দেশ কালের গণ্ডীকে ছড়াইয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং যাহা দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়া দেহাতীত বস্তুতে বিলীন হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের কাব্য বিচারের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটি ভালভাবে বুঝিবার পক্ষে উপযোগী অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল। এই সকল অংশ হইতে কাহারও মনে হয়তো এমন ধারণা হইবে যে কাব্য সমাদর কালে চিত্তরঞ্জন সর্বত্র অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে সক্ষম হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাসকে শীর্ষস্থানে উপস্থাপন এবং রামমোহন, ভারতচন্দ্র এমনকি

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা হইতে কিছুটা বিরূপ বা প্রতিকূল অভিমত অনেকের মনে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করিবে যে তিনি প্রাচীন রক্ষণশীল মতবাদের অনুগামী এবং আধুনিক চিন্তাধারার আদৌ সমর্থক ছিলেন না যেমন রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত কবিতা—

"ভালবেসে সখি! নিভৃত যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো তোমার
মনের মন্দিরে।"......

অথবা, "শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার
শুনেছি শুনেছি তাহা
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা!

—সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"চণ্ডীদাসের কবিতা যে রাজ্যের এ'দুটি কবিতা সে রাজ্যেরই নয়—সে মহামিলন মন্দিরের অনেক দূরে।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই চিত্তরঞ্জনই কৃষকের জীবন অবলম্বনে রচিত কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—যে কবি জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পাইয়া সেই জীবনের ভিতর ও বাহির দুই দিককেই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারেন তিনিই যথার্থ কৃষকের কবিতা লিখিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বার্নস-এর Ploughman-এর কথা বলা যায়। আধুনিক বাঙ্গলা কবিতায় কালিদাসবাবুর "পর্ণপুটে" কৃষকের ব্যাথা" নামক একটি কবিতা যথার্থ কৃষকের কবিতা—

"ক্ষেতের কাজ করতে গিয়ে উদাস হয়ে যাই
কাজেতে আর নাইকো মন আরাম সুখ নাই;
তোমার সেই কাজলচোখ মনে যে উঠে জ্বলি
ধানের চারা উপড়ে ফেলি আগাছা কাটা বলি।
* * *
শান্তিপুরে তোমার ডুরে এ বুকে চাপি ধরি
চোখের জলে কথা ভাসে মেঝেতে রহি পড়ি।"

উপসংহারে চিত্তরঞ্জনের এই মন্তব্যটুকু স্মরণ করিতে হইবে—"শুধু নায়ক-নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌঁছাতে পারে তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনা মাত্র।" অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনের কাব্য বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে এ কালে বিতর্কের অবকাশ থাকিলেও তাহা যে তাঁহার আত্যন্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, খাঁটি বাঙালী সংস্কৃতির ধারক ও বাহকের পরিচয় ও আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তার সাক্ষ্য দিতেছে সে বিষয়ে কোন সুধীজনের দ্বিমত থাকিতে পারে না।

গুপ্তআমলের ভূমি-ব্যবস্থা

দীপকমোহন সেন

সৃষ্টির আদিমকাল থেকেই জমি এবং জমির মালিকানা নিয়ে নানারূপ জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। ক্রমশঃ আমরা দেখতে পাই যে, জমির উপর ব্যক্তির অধিকার সমষ্টিগত অধিকার এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের মালিকানা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়।

ইতিহাসের অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতে গুপ্ত আমলে জমির উপর ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত এবং রাষ্ট্রগত অধিকার ছিল এবং অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে জমির শ্রেণীবিভাগও এই তিন প্রকারে করা হত। সাধারণভাবে আইনসম্মত অধিকার, আইন বহির্ভূত অধিকার এবং নিরঙ্কুশ অধিকার—এই তিনটি প্রকারভেদ ছিল।

প্রাচীনযুগে জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ বহুগুণ থাকায় ভূসম্পত্তির অধিকার নিয়ে বিশেষ একটা সংঘর্ষের কারণ ঘটে নাই। এবং জমির চাহিদাও বর্ত্তমানকালের মত এতটা ছিল না। ফলে আইনসঙ্গতভাবে ভূমির অধিকার ও ভোগ করা নিয়ে একজন অন্য লোককে বাধা প্রদান করত না। কালের অগ্রগতিতে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির ভোগদখলকারীদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ল। শুধুমাত্র জমিতে প্রথম বাসকরার জন্য কারও আর জমিতে অধিকার জন্মাল না। আইনসম্মত উপায়ে জমির মালিকানা সত্ব স্বীকৃত হ'ল। গুপ্ত আমলে চাষের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় চাষের জমি এবং অন্যান্য জমির চাহিদা বেড়েই চলল। এখন পূর্বের ন্যায় যে আগে জমির দখল নিল তার জমির উপর অধিকার চিরতরে কায়েম রইল না। এইভাবে জমির অধিকার এবং দখলকে কেন্দ্র করে ধর্মশাস্ত্রকারেরা নানা প্রকারের আইন প্রণয়ন করতে লাগলেন।

বিভিন্ন উপায়ে জমির মালিকানা স্থির হত। আইন প্রণেতা গৌতমের মতে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকার ক্রয়, বিভাগ এবং গ্রহণের মাধ্যমে জমির মালিকানা অধিকার পেত। মনুর মতে সাতটি প্রধান উপায়ে জমির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হত। এই সাতটির চারটির কথা গৌতমই উল্লেখ করেছেন—বাকি তিনটি হ'ল যুদ্ধজয়, সুদে টাকা ধারের বিনিময়ে এবং কোন উল্লেখযোগ্য কাজের পুরস্কার স্বরূপ। নারদ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রকারগণের মতামত গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে ভূমিবন্টন কিভাবে করা দরকার সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন।

গুপ্তযুগের বহুসংখ্যক শিলালিপি থেকে আমরা রাজার খাস অধিকারের জমি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি। এই যুগের বহু রাজাকে গ্রাম কিংবা গ্রামের কোন অংশ দান করতে দেখা যায়। রাজার ধর্ম কার্য্যে ভূমিদানের কথা সমুদ্রগুপ্তের গয়া তাম্রলিপি এবং নালন্দা অনুশাসন, স্কন্দগুপ্তের ভিটারী শিলালিপি, সর্বনাথের খো-তাম্রলিপি এবং রাজা দ্বিতীয় প্রবরসেনের সিওয়ানী তাম্রলিপিতে বর্ণিত আছে। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রাজার অধিকার নিশ্চয়ই দেশের জমির একটা বিরাট অংশ ছিল—নতুবা তাঁর পক্ষে ভূমিদান করা সম্ভব হত না। কৃষককে কোন

কারণে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত কিনা বলা শক্ত। ভূমি রাজস্ব না দেওয়ার দরুণ যে কোন লোককেই উচ্ছেদ করা যেত। তবে, রাজা ধর্মীয় কাজে জমি দান করলেও সেজন্য কৃষকের ভূমির অধিকার নষ্ট হত না। এমতবস্থায় কৃষককে জমির নূতন মালিককে রাজস্ব দিলেই চলত। আমরা বহুস্থানে দেখতে পাই যে রাজা গ্রামদান করেছেন—এই দানের অধিকার একমাত্র রাজারই ছিল। ফলে, রাজ্যে রাজাই যে সকল প্রকারের ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যারা করমুক্ত গ্রাম কিংবা জমি ভোগ করত তাদের নির্দেশ দেওয়া হত যে তাঁরা যেন এইভাবে করমুক্ত গ্রামসৃষ্টির সহায়তা না করেন, কারণ এরফলে সরকারী রাজস্বহ্রাসের সম্ভাবনা ছিল। সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে ধর্মের কাজ নির্বাহের জন্য যে ভূদান করা হত তাকে "ব্রহ্মদেয়" এবং "অকরদ" বলে গণ্য করা হত। এই প্রকারের জমি কেউ বিক্রয় করতে কিংবা বন্ধক রাখতে পারত না।

বর্তমান কলের ভূ-আইনের ন্যায় গুপ্ত-আমলে ধর্ম বিষয়ক জমি ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্বে রাজার অনুমতির প্রয়োজন ছিল। তবে সাধারণ কেনা-বেচার ক্ষেত্রে সরকারী অনুমোদনের দরকার ছিল বলে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। একবার ধর্মবিষয়ক কাজে প্রদত্ত জমি বাজেয়াপ্ত করা হত না।

দেশের খনিজ সম্পত্তি রাজার অধিকারে ছিল। মনু ও বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারদের মতে খনিজসম্পত্তির উৎপন্নের অর্ধেকেরও বেশী রাজার প্রাপ্য, কারণ রাজাই এই সম্পত্তির রক্ষাকর্ত্তা।

প্রজাদের সামগ্রিক অধিকার এবং সমবায় অধিকারের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে কোন কোন পণ্ডিত এই প্রথাকে খুবই সমর্থন করেছেন। তাঁরা এই পদ্ধতির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। গ্রাম্য প্রধানদের পরামর্শ না নিয়ে রাজা গ্রামের জমি বাজেয়াপ্ত করতেন না এবং গ্রাম্য প্রধানগণও ভূমিবণ্টন এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেকসময় রাজার মতামত গ্রহণ ক'রতেন। ডঃ মজুমদার, বসাক এবং আল্‌তেকারের মতে গ্রাম্য সমবায় প্রতিষ্ঠান রাজনীতির ক্ষেত্রেও এক বিরাট দায়িত্ব পালন করত। যদি কোন ব্যক্তি ভূমি রাজস্ব না দিতে পারতেন তবে সেই ভূমি গ্রাম্য সমবায় সমিতির অধিকারে আসত। ভূমি বাজেয়াপ্ত করা কিংবা নতুন কাউকে জমি দেওয়া ব্যাপারে গ্রাম্য প্রধানদের মতামতের দরকার ছিল কারণ তাঁরাই গ্রামের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং জমির সীমারেখা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রাখতেন। ভূমি হতে উৎপন্ন শস্যাদির এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে রাজা পেতেন, অবশিষ্ট গ্রামের তহবিলে যেত। সুতরাং সামগ্রিকভাবে গ্রামবাসীদের যে অবাধ অধিকার এবং আঞ্চলিক স্বাধীনতা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

কৃষি এবং ভূমিবণ্টনের কথা বিচার করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে অধিকাংশ কৃষকের খুব অল্প পরিমাণ চাষের জমি ছিল। কৃষকেরা নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করত। বিশেষ দু'একটি স্থানে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে মজুর নিয়োগ করার উল্লেখ আছে। নারদ এবং বৃহস্পতির মতে মজুরী নির্দিষ্ট হলে চাষী উৎপন্নের এক-দশমাংশ পারিশ্রমিক হিসাবে পাবে। বৃহস্পতি চাষিদের উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। নারদের মতে কৃষককে

অপরের জমি চাষ করার পারিশ্রমিক হিসাবে এক-তৃতীয়াংশ এবং এক পঞ্চমাংশ প্রদান করতে হত। চাষী ও মজুর কাজে অবহেলা এবং উৎপাদনে গাফিলতির পরিচয় দিলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হত। ভূমির পরিমাপের জন্য বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, যথা—ভূমি, পাতক, পত্তিকা, দ্রোণবাপ, কুল্যবাপ, খাণ্ডুকাবাপ, নিবর্ত্তন এবং বেলী। কিন্তু পরিমাপের পরিধি কতদূর ছিল বলা শক্ত। অনুমান করা যায় যে কুল্যবাপ এক-একরের কিছু বেশী এবং নিবর্ত্তন আড়াই একক পরিমাপককে সূচিত করে। ছ'একরের পরিমাপকে বেলী আখ্যা দেওয়া হত।

জমির প্রকৃতি অনুযায়ী মূল্য নিরূপণ করা হত। বাংলাদেশে এক কুল্যবাপ অকর্ষিত জমির মূল্য ছিল দুই অথবা তিন দীনার (অর্থাৎ ৫০ কিংবা ৭৫ টাকা) ভূমির হস্তান্তর সাধারণত গ্রামের অধিবাসীদিগের মতামত অনুযায়ী হত এবং গ্রাম্য প্রধানের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধানের স্থান নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রে ছিল। বিভিন্ন প্রকারের ধানের বিবরণ আমরা পাই।

রেশম ও পশমজাতদ্রব্যের বিশেষ উল্লেখ আছে। ভারতীয় উৎপন্ন রেশম ও পশমশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে "চীনপট্ট", "চীনাংশুক", "চীনভূমিজ" প্রভৃতি চীনের পশম ও রেশম শিল্পের ভারতে আমদানীর বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। এই সময় ভাগকর এবং উদ্রঙ্গ নামে দুই প্রকারের ভূমিরাজস্বের উল্লেখ আছে। সাধারণভাবে এই প্রকারের করের হার ছিল শতকরা ১৬ ভাগ থেকে ২৫ ভাগ। উৎপন্নের হারের অনুপাতে ভূমিকর ধার্য্য করা হত। উৎপন্ন কম হলে ধার্য্য করের পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেওয়া হত।

ভারতে সবসময়ই কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য ছিল না। বহুসময় দুর্ভিক্ষ, বন্যা, প্লাবন, খরা প্রভৃতি দেখা যায়। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় অনেক সময় দেশের অধিবাসীগণকে বিভিন্নভাবে পর্যুদস্ত করেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। রাজা, জনসাধারণ এবং বিত্তশালীলোকেরা সমবেত প্রচেষ্টায় দেশকে দুর্যোগ এবং আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

বটতলার কর্তাভজা

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চর্য্যাপদের যুগ থেকেই দেহতত্ত্ব ও মিষ্টিক ধর্মাচ্ছাদনে গানের অভাব নেই। ঠিক সহজ সরল ভাষায় নয় কোড ল্যাংগুয়েজ বা 'সন্ধ্যা' ভাষায়। এ ধরণের গানের কদর ধর্মাশ্রয়ী মানুষের কাছে। সাহিত্যের সঙ্গে তাদের সরাসরি সংযোগ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি এই মিষ্টিক গান 'নব্য বাউল সঙ্গীত' নামে কলকাতায় চাহিদা সৃষ্টি করেছিল। 'বটতলার প্রকাশকেরা এধরণের "নব্য বাউল সঙ্গীত" পুস্তিকা অনেক ছাপাইয়াছিলেন।' যোগী—বাউল—দরবেশ—সাঁই কর্তাভজা-গুরুসত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় থেকেই এই মিষ্টিক গান পেয়েছি।

কাঁচরাপাড়ার কাছাকাছি ঘোষপাড়া অঞ্চলে কর্তাভজার দলের সৃষ্টি। ১৬১৬ শকের বীরনগরের মহাদেব বারুই আখের ক্ষেতে আটবছরের ছেলে কুড়িয়ে পান। এরই নাম আউলচাঁদ। কর্তাভজা দলের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় তেইশজন শিষ্য সংগ্রহ করেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে। হিন্দুশিষ্যদের মধ্যে প্রথম রামশরণ পাল। রামশরণ পাল চাষ করতেন। আউলচাঁদ তাঁর 'বিভূতি' দেখান প্রথম রামশরণের স্ত্রীর জীবন রক্ষায়। আউলচাঁদের কথামত রামশরণের স্ত্রীর মৃত্যুর পর শবদেহ দাড়িম্ব গাছের নীচে সমাধি দেওয়া হয়। আউলচাঁদ বলেন রামশরণের স্ত্রী শচীমাতার গর্ভে রামদুলাল নামে জন্ম নেবেন। এই দাড়িম গাছতলায় কর্তাভজাদের সমাজ বাটী সতীমার সমাধি। ভক্তরা এসে প্রণাম করেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় পূজার অনুষ্ঠান।

কর্তাভজার ধর্মটি আমাদের আলোচ্য নয়, তবু এককথায় বলা যায় কথকতার মত প্রথমদিকে কর্তাভজা ধর্মও সম্ভবত ভালই ছিল। কিন্তু রামদুলালের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র পালের আমলে কর্তাভজার মধ্যে কিছু অশ্লীলতা প্রবেশ করেছিল। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ঘোষপাড়ার মেলার প্রত্যক্ষদর্শীয় সাক্ষ্যে জানা যায় 'এ বৎসর দোলে প্রায় ৬৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা স্ত্রীলোক। কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই অধিক, পুরুষদিগের সকল প্রায় মূর্খ। যে সমাজের স্ত্রীলোকেরা লজ্জা ও কুলভয়ে গৃহের বাহির হইতে সাহসী হয় না, সেই সমাজের স্ত্রীলোকেরা এক কর্তার অনুরোধে বহুসংখ্য অপরিচিত পুরুষের সহিত একত্রে বসিয়া আমোদ করিতে লজ্জিত হইতেছে না! এক একটি পুরুষের নিকটে গড়ে ৪।৫ টি করিয়া যুবতী বসিয়া আছে !!"

বস্তুত কর্তাভজা ধর্মটি কিছুটা অসংগতি জনক। এখানে "কর্তা" পদটি বিশেষ সমালোচনার খোরাক হতে পারে। কর্তাভজা শব্দের প্রকৃত অর্থ কর্তার উপাসক দল। কর্তা পদ পৈতৃক এবং শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যে চালু। 'কর্তা নিষ্পাপ এবং যে কার্য্য অন্যের চক্ষে দুষ্কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়, যদিও তিনি কখন কখন তাদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু সে সকলও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের লীলা খেলার ন্যায়, পার্থিব লীলা বলিয়া সাধারণের অবধারণ করা কর্তব্য'। শিষ্য ও শিষ্যারা একত্রে নানান আমোদ প্রমোদে রাত কাটান। 'শুনা গিয়াছে, বস্ত্রহরণ পর্য্যন্ত বাকি থাকে না।'

সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ঘোষ পাড়ার মেলার সাক্ষ্যে জানা যায় 'বর্তমান কর্তা ঈশ্বরবাবু একটি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া কেহ পদসেবা করিতেছে কেহ গা টিপিয়া দিতেছে, কেহ মুখে আহার প্রদান করিতেছে, কেহ বা অঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছে এবং কেহ কেহ গলদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিতেছেন। আমরাও অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি এই ধর্মাবলম্বী কুলবালাদিগের বস্ত্র হরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করেন, রমণীরা করজোড় করিয়া বৃক্ষতল হইতে উহা প্রার্থনা লয়।'

কর্তাভজাদের মধ্যে কিছু মিষ্টিক গান চালু আছে। নরনারী শিষ্যশিষ্যা নামে যে অবাধ আলাপ তার মূল তাঁহারা বলেন 'মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা।' কর্তাভজাদের সকলকেই প্রথমেই পুরো শিষ্য করা হয় না। প্রথমে একআনা বা গুরুসত্য শিষ্য করা হয়। ষোল আনা মন্ত্র পড়ে। সেটা হল 'কর্তা আউলে মহাপ্রভু, | আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, | তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নাহি, | আমি তোমার সঙ্গে আছি | দোহাই মহাপ্রভু।'

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, কর্তভজাদের গানগুলো মিষ্টিক। আমরা আগেই বলেছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি শহর কলকাতায় 'নব্যবাউল সঙ্গীতে'র চাহিদা হয়েছিল। ব্যাপারটা একটু আলোচনা করা দরকার। ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'বাউল-গানের প্রচলন আমাদের দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত সমাজে তাহার কোন মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। বাউল গান রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার বলিলে বেশি বলা হয় না।' সত্যিই লালন ফকির ও তাঁর বাউল গান কবির খুবই প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় বাউল গান যখনি শহরে শিক্ষিত মহলে জনপ্রিয় হল তখন শিক্ষিত বাঙালীর নজর পড়ল অনান্য ধর্মাশ্রয়ী মিষ্টিক গানেও। কর্তাভজাদের গানও এই পথে এল। ব্যবসায়ী বটতলা সঙ্গে সঙ্গে কর্তাভজাদের গান সংগ্রহ করে প্রকাশ শুরু করল।

কর্তাভজাদের একটি মিষ্টিক প্রাচীন গান উদ্ধার করা যেতে পারে দুর্গাচরণ রক্ষিতের সংগ্রহ থেকে। "এ ভবের মানুষ কোথা হতে এল ; | এনার নাইক রোষ, সদাই তোষ | মুখে বলে সত্য বল' | এনার সাথে বাইশ জন, | সবার একটি মন,— | জয় কর্তা বলি, বাহু তুলি | করে প্রেমের চলাচল | এ যে হীরা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, | এর হুকুমে গঙ্গা শুকুল।"

এইভাবে কর্তাভজাদের গান এল বটতলায়। আমরা আগেই আলোচনা করেছি ঘোষ পাড়ার মেলায় যাঁরা যেতেন তাঁরা অধিকাংশই চরিত্রহীন নরনারী। এরা বটতলারই ফসল। মাহেশের স্নানযাত্রার মত বিভিন্ন উৎসবের সময় ধনীবাবু নৌকায় আমোদ মজা করতে যেতেন সেখানে। সঙ্গে থাকত রক্ষিতা। কর্তাভজার মেলায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ যে মেয়েদের কথা বলেছেন তাদের অধিকাংশই বটতলার। হুতোম স্নানযাত্রায় বিভিন্ন বাবু রক্ষিতার যে ব্যভিচার বর্ণনা করেছেন এখানেও তাই পুনরুভিনীত হয়েছে ধর্মের মোড়কে। তাই কর্তাভজাদের শিষ্য শিষ্যাদের মধ্যে বটতলার 'বাবু' ও 'রক্ষিতা' দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বস্তুত এই ধর্মের রক্ষা ও বৃদ্ধির কাজে বটতলার বাবু ও বিবিদের দান কম নয়। এরই ফলে বটতলার প্রকাশকরাও কর্তা-ভজার গানগুলো ছাপাতে লাগলেন টপ্পা সংগ্রহের মত। বটতলার ব্যবসা ধর্মে কর্তাভজা শহর বাসীর কাছে উঠে এল। চোখের আড়ালে ঘোষপাড়ার অশ্লীল মেলা ভুলে গেলেন শহরের শিক্ষিত

মানুষ, তাঁরা তখন মিষ্টিক বাউল গানের নেশায় মাতাল।

কর্তাভজাদের গীতাবলী লালশনী কর্তৃক সংকলিত হয়ে বটতলায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৭ সালে। প্রথম খণ্ড। এছাড়া অবশ্য বটতলায় বিভিন্ন গানের সংকলনে কর্তাভজার গান সঙ্কলিত হয়েছে। কর্তাভজাদের একটি মিষ্টিক কবিতা ডঃ সুকুমার সেন সংগ্রহ করেছেন—

চৈতন্য সঙ্গ পাইয়া কহে নিত্যানন্দ
মাকে ভজ বাপকে পাবে ঘুচবে মনের ধন্দ
প্রাণের ওপর জলের মরাই কাছিম সাপে ধরে
সাপের মাথায় হংস ডিম্ব তাহে হরিণ চরে।
ডিমের ভিতর চৌদ্দ ভুবন বাজার তায়
সাপের মুখে ফুল ফুটেছে কর্তা বসে তায়।
সাধ করিয়া ঘর করেছে দ্বার করেছে নটা
ঘরের ভিতর ভূতের বাসায় গালিম আছে ছটা।
ভূতের মুখে ফুল বাগিচে পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে
জলের ভিতর আগুন দিয়ে বাউল দেখে চেয়ে।
খেপার কথায় হাতী পড়ে মাকড়সার ফান্দে
তা দেখে চৈতন্য হাসে নিতানন্দ কান্দে।
বোবা হয় কালা হাসে কানা দেখে রঙ্গ
দাস নিত্যানন্দ বলে পেয়ে সাধুসঙ্গ;

গানটি ১৮৬১ সালে শীল এণ্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে মুদ্রিত শিশুবোধকে কবিচন্দ্রের কলঙ্কভঞ্জন পালার মধ্যে গোপীদের কৃষ্ণ ভোলানো গান।

কাব্যনাটক

বীতশোক ভট্টাচার্য্য

এলিয়ট বললেন, খালি গদ্যময় নাটক আর চলবে না; এবার কবিতা চাই: চাই কাব্যনাটক। কিন্তু কথাটা কাব্যনাট্য হবে, না নাট্যকাব্য হবে তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ রইল। বিশেষ করে যাঁরা এক একটা ছাঁচ, ছাপ, শীলমোহর তৈরী করে দেন, তাঁদের কাছে। কেন না নাটক হলো গিয়ে যৌথ শিল্প, বিশ্বের হেন জিনিষ নেই যা সেখানে ভরে দেওয়া যায় না। সেদিক থেকে একে উপন্যাসের চাইতেও ভারসহ, চলনসই বলতে হয়। তাই যাকে আমরা বলে থাকি বাস্তব, যা চারপাশে অহরহ ঘটছে, সেই শাদামাটা দৈনন্দিন ব্যাপার, তাও সেখানে নাটকীয়, চমক লাগানোর মতো, অন্ততঃ তেমন করেই সাজিয়ে গুছিয়ে তাদের পরিবেষণ করা হয়। কিন্তু কবিতা এখন অভিজাত না হোক, অভিমানী তো বটে। তাই সব কিছুর পংক্তিভোজে সে সহসা ব'সে পড়তে পারে না, রয়ে সয়ে কথা বলে, বাদসাদ দিয়ে কাটছাঁট করে নিজের মাপের জামা ক'রে নেয়। ফলে, তাকে নাটকের মঞ্চে ওঠাতে গেলে এবং নাম ভূমিকা দিতে গেলে নাম এবং বেশবাস পাল্টানোর প্রশ্ন এসে প'ড়ে। কেননা যাঁরা নাটক দেখেন, সেই বৃহত্তর, অপরিশীলিত সমাজ, তাঁদের ধারণায় নাটক ব্যাপারটাই নিরেট গদ্যময়, প্রোজেয়িক। তাঁদের মত—এরই মধ্যে যাত্রার দলের বিবেকের মতো ভরাট গলা কেউ আসুক, উইংসের আড়াল থেকে দুএকখানা সুরেলা সংগীত হোক, গ্রীক কোরাসও যদি পোশাক পালটে সেখানে নামে, তাহলে সে কী ব'লে তাও না হ'য় শোনা যাবে: কিন্তু তাই বলে সমস্তটাই কবিতা, সে কেমন ক'রে হয়! অথচ সেক্সপীয়রের নাটক যারা জড়ো হয়ে শুনেছে, সেই এলিজাবেথান জনতার সঙ্গে এখনকার দর্শকের মৌল বিরোধ কোথায়। এখানে এলিয়টের কথা মেনে নিতে হয়: নাটকে কবিতার ব্যবহার হবে এমন যে তাকে কবিতা ব'লে আর চেনাই যাবে না। অর্থাৎ মঞ্চসাফল্যের জন্য কবিতাকেও এক ধরণের প্রতারক সরলতার আশ্রয় নিতে হবে। দর্শক যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে (কিন্তু একেবারেই পারে না কী!) যে সংলাপ কাব্যময় হয়েছে।

কাব্যময় সংলাপের ব্যবহার অবশ্য অনেক দিনের। সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলাই হয়েছে। কিন্তু এখানে সে শ্রব্যকাব্য এবং দৃশ্যকাব্যের মাঝামাঝি এক ক্ষুরধার পথে চলে যেখানে দুদিকেরই সীমার অতিশায়ন একে অন্যের সঙ্গে মেলে, আবার যেন মেলেও না। ব্যাপারটা আদপে ভীতিজনক ছিল না, হাজার হাজার বছর আগে আথেন্সের মানুষ আম্ফিথিয়েটারে বসে সেরা গ্রীক লিখিয়েদের কাব্যনাটক বেমালুম স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু ছোটো ছোটো, কাটা কাটা উক্তি প্রত্যুক্তির লক্ষ্য সেখানে শব্দভেদী বাণের মতো ঋজুভাবে সমর্পিত, চরণগুলি চলে যেন শুদ্ধ নৈয়ায়িকের নিষ্ঠায়। তারই মধ্যে থেকে, বাইরের সংঘাত আর ভিতরের দ্বন্দ্বে সঞ্চারিত আনন্দ বেদনা নিংড়ে নিতে গিয়ে উৎকণ্ঠ যে দর্শক মানুষ নাটক থেকে কবিতাকে আলাদা করে সনাক্ত করার অবকাশ তাদের কোথায়, আর প্রয়োজনই বা কী! বেদের আখ্যানসূক্ত জাতীয়

কবিতাতেও নাটকের বীজ আবিষ্কার করা গেছে। পুরূরবা ও উর্বশী সংবাদ কিংবা সরমা ও পণির কথোপকথন আক্ষরিক অর্থেই নাটকীয়। কিন্তু তারও পরে অভিজাত এবং সংস্কৃত হয়ে নাটকের নায়কনায়িকারা বিপজ্জনক ভাবে স্বভাবকবি হয়ে উঠলেন। একে সংস্কৃতের গদাইলশকরি চাল নাটকের পক্ষে মারাত্মক, তার উপর যে কেউ হয়তো এক অনুচ্ছেদ গদ্যসংলাপ বলে মন্দাক্রান্তা বা মালিনী ছন্দে দুখানি শ্লোক শুনিয়ে দিলেন। গদ্যসংলাপের নীরন্ধ্র আয়তনে যে আবেগের অতিরেক ধরতো না, তাই কবিতার লঘুগুরু অক্ষরমাত্রায় বেশ মিলেমিশে গেল। বাংলা নাটকেও এ রোগ অনেককাল ছিল, আর একমাত্র ব্যক্তিগত এবং অভিজাত পৃষ্ঠপোষণেই এ সমস্ত ব্যাপার প্রশ্রয় পায়।

অন্যদিকে শুদ্ধ কবিতাতেও নাটকের অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে। মহাকাব্যের মধ্যে নাটক রচনার যোগ্য বিষয়বস্তু এবং নাট্যগুণ, দুইই প্রভূতপরিমাণে মেলে। কিন্তু গীতিকবিতা আরো পরের অনেক ভিন্ন ব্যাপার, অথচ সেখানেও সংক্রাম দেখা গেলো নাটকীয়তার। লিরিকে সব মিলিয়ে আত্মকথনটাই বড়ো, এবং নাটকে স্বগতোক্তি যদিচ পুরনো হয়ে গেছে, তবু ব্যক্তিস্বরূপের উন্মোচন আছে যে গীতিকবিতায়, সেখানেই প্রচ্ছন্নভাবে নাট্যরসের একটা প্রসাদ লাভ করা যায়। পুরুষকবি যদি কোনো নারীর গলায় অবিকল কথা বলেন, এবং বলবার ভঙ্গিটি যদি আলাপ চারিতার দিকে যায়, তবে তা কিছু না কিছু পরিমাণে নাটকীয় হয়ে ওঠেই : এই একটা সাধারণ এবং সামান্য উদাহরণ দেওয়া গেল, না হ'লে এ ধরণের অভিঘাত আমরা ব্রাউনিঙে পেয়েছি, পেয়েছি এলিয়টে রবীন্দ্রনাথে, বলতে গেলে অনেক ভালো কবির রচনাতেই তা অবিরলভাবে লভ্য। কিন্তু যাঁরা মর্মান্তিকভাবে রোমান্টিক, তাঁদের হাতে নাটক, কাব্যনাটক কিছুতেই যেন মঞ্চের জন্য সফলভাবে উৎরোয় না। মাননীয় ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন, কিন্তু উনিশ শতকী ইংরেজী রোমান্টিক নাটকের দিকে মাত্র তাকালে এর সত্যতা যেন প্রামাণিক মনে হয়।

এমনকী রবীন্দ্রনাথও গীতিনাট্যে বা নৃত্যনাট্যে যে মঞ্চসাফল্য বা সোৎসাহ সমর্থন পেয়েছেন কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে তেমন নয়। পাওয়াও সম্ভব ছিল না। একখানা রক্তকরবী বা একটি ডাকঘর নাটক হয়েও কাব্যপ্রাণ, কিন্তু তার নিশ্বাস এতমৃদু এবং এমন সুরভিত আর অঙ্গাঙ্গি যে পাঠক এবং দর্শকমনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে পারে, সে কাব্যধর্মিতাকে তখন নাটকে সহজ এবং সহজাত বলে বোধ হয়। অন্যদিকে, আরো পরে বাঁশরীর মতো নাটকে কথাগুলো এমন করে বসানো যে অভিনয় তো দূরের কথা পাঠকের আস্বাদনেও সাময়িক ক্লান্তি আসে। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজানো যায় না, শেষ বয়সের নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ বা শ' তাঁদের উপমারূপকের মনোহারিত্ব চমৎকারিত্ব নিয়েও তাই পুরনো হয়ে যান। কিন্তু 'বিসর্জন' নাট্যকাব্য যখন সব চাইতে বেশি বার মঞ্চস্থ এবং সবচেয়ে বেশি বার ব্যর্থ হয়, তখন তার কারণটা সহজেই অনুমান ক'রে নেওয়া যায়। কর্ণ এবং কুন্তী, কচ এবং দেবযানীকে পরীক্ষামূলকভাবে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে যে আনা যায় না এমন নয়, কিন্তু সেখানেও মনে রাখতে হয় আবেদন মূলতঃ আসছে কবিহৃদয়ের কাছ থেকে, যেখানে সংলাপ ছাপিয়ে উপচে ওঠে রসাত্মক অনুভূতি, প্রায় ঘটনার ঘট ভেঙে যায় অভিব্যক্তির স্বতঃ-উৎসারে। অথচ আজকে রবীন্দ্রনাথকে যদি বাংলার অঙ্গুলিমেয় নাট্যকারদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য

বলতে হয়, তাহলে তাঁর কাছ থেকে সফল কাব্যনাটকের শর্তপূরণ অন্ততঃ প্রত্যাশিত ছিল।

গৈরিশ ছন্দে এককালে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রণোদনা সেখানে কবিচিত্তের নয়, বরং কাজচলা গোছের একটা মোটামুটি ফর্ম তৈরী ক'রে নেওয়ার ব্যাপার। কেন না গিরিশচন্দ্রকে একরকম পাখি পড়িয়ে নিতে হয়েছে সেই সমস্ত অভিনেত্রীকে দিয়ে, যাঁরা হয়তো নিরক্ষর, ক অক্ষর গোমাংস এবং গিরিশচন্দ্র জাতে না তুললে হয়তো ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে গিয়ে যাত্রার দলের সখী সাজতেন। তাছাড়া, গিরিশচন্দ্রের ভক্তিভাব ও আবেগের পক্ষে এই ভাঙ্গাভাঙ্গা, মাঝেমাঝে ব'সে যাওয়া ছন্দ বেশ উপযোগী ছিল। অন্যদিকে ডি, এল, রায় বাঙালির সামনে আদর্শ সেক্সপিয়রিয় নাটক তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর, তাই তাঁর ভাষা অকূলে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো নাটকের ক্রিয়াকে, সময়ে সময়ে সংলাপের বাক্যে কাব্যগুণ ছাড়া আর কিছু রইল না। দেখা গেল, মধুসূদনের মতো দ্বিজেন্দ্রলালেও সবকিছু হাইসাউণ্ডিং; সেখানে সব কাঠিন্য নিয়তির মতো, সব অন্ধতা হিংসার মতো, সব সমুদ্রই সেখানে গর্জন করে, সব নীলিমাতেই সেখানে প্রশান্তি। এই মাত্রাতিরেক উচ্ছ্বাসের এই অতিপ্লাবন নাটকীয় সংযম, যাকে ঔপন্যাসিক নিরাশক্তির সমতুল কী তার চাইতেও বেশি বলতে হয়, তার অতিমাত্রায় ক্ষতি করে, তাই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বাদুকাব্যময় সংলাপ নিয়েও সীতা বা পাষাণীর চাইতে বেশি কিছু কাব্যনাটকে দিয়ে যেতে পারলেন না।

সাধারণ এবং সামান্য সংলাপও ক্ষেত্রবিশেষে কবিতার ভূমিকায় কার্যকর, অথবা কবিতার অধিক সাংগীতিক, চণ্ডালিকায় 'কখন ছাগল তুই চরাবি'র মতো আটপৌরে ব্যাপারে ঘরোয়া আর ঘনিষ্ঠ সুর লাগানোর কথা, এবং হয়তো তাই অধুনা চলচ্চিত্রের দৃষ্টিও সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র মতো অভিনয়ের কথা মনে রেখেও বলা যায় যে পারিবারিক পুনর্মিলন উৎসবকে কেন্দ্র করেও যে কাব্যনাটক রচনার অবকাশ আছে সে আবিষ্কারের মূল্যও কেনোমতে অগ্রাহ্য করার মতো নয়। ধর্মঘরে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হ'লে তা নিয়েও কাব্য-নাটক লেখা যায়, কিন্তু সেখানেও মানবিক প্রদর্শনীর পাশাপাশি, সমান্তর ভাবে এক রাষ্ট্রযন্ত্র এবং ধর্মতন্ত্রের অসম এবং উৎসাহী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে বলে ঐতিহাসিক রস দর্শকের মনকে আরও গভীরভাবে জারিত এবং অভিভূত করে ফেলার সুযোগ পায়।

ঐতিহাসিক রসের এই বিশেষ প্রকরণগত সুবিধা কাব্যনাটক রচয়িতার কখনো একতম উপজীব্য নয়। তাই লেখক যখন অতীতাভিসারের পক্ষপাতী, তখন তিনি কেবল প্রাচীনতায় কোনো বাঞ্ছিত প্রতিবেশ খুঁজে নেন বললে সব বলা হয় না। কীট্‌স্ ভগ্নপাত্রের গায়ে এক নব রসের স্বাক্ষর খুঁজেছিলেন, কবির ক্ষেত্রে এই প্রক্ষেপণ বড়ো কথা। তাই যে নস্টালজিয়া কবির মধ্যে সদাসক্রিয়, তাকেই অতীতের নায়কনায়িকার চরিত্রে প্রয়োজ্য আধুনিকতা সঞ্চালিত ক'রে দিতে দেখা যায়, তারই প্রতিভায় পুরাণ নতুন ভাষ্য পায়, সমকালীন ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে আখ্যান-গুলি। তাই সেখানে তারা পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক হলেও তাদের ভিন্ন মর্যাদা, তাদের ঘিরে নতুন নতুন মিথ তৈরির দরজা খুলে যাচ্ছে। গীতিময়তা ইয়েটসের নাটকবিশেষে যদিচ ক্ষতিকর তবু পুরাণ ব্যবহারের স্বাতন্ত্রে এবং সৌন্দর্যে তারা মূল্যবান্ হয়ে থাকবে। একজন ইলেকট্রা,

একজন ডঃ ফস্টাস যদি ফিরে আসেন নতুন পরিচয় নিয়ে, যে পরিচয়ের মধ্যে আমরা এইমাত্র আমাদের পাত্র এবং প্রতিবেশের সালোক্য এবং সাযুজ্য খুঁজে পেলাম, সেই নবতর এবং প্রায় পূর্ণাঙ্গ হতে চলেছে এমন ব্যাক্তিস্বরূপকে তখন আর ফেরানো যায় না, তারও স্থান করে দিতে হয় কাব্যনাটকে।

হেঁয়ালি নাটককেও স্থান দিতে হয়েছে সেখানে, কেননা অ্যাবসার্ড ড্রামা আর যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর যোগ এমন কিছু আকস্মিক নয়, বরং রোমাণ্টিক বিস্ময়ের যে বিশ্বদর্শন তার থেকে এই প্রহেলিকা এবং প্রপঞ্চ দেখার চোখ ঈষৎ তির্যক্‌ এবং আলাদা। তাই অডেনের নাটকে মৃত্যু নৃত্যপর, তখন ফাল্গুনীর অন্ধ বাউলের কথা মনে আসে না, সুচিত্রা মিত্রের ধাতব গলায় 'নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু' শোনার আশ্চর্য অনুভূতির কথাও নয়। কাব্যনাটকের জগৎ এখন সংকীর্ণ, পৃথক হয়ে গেছে, আর লোকেরা বা ইয়েটসের মতো মঞ্চের সঙ্গে যোগসম্পন্ন কবিই বা কোথায়। ফর্মের বাঁধাবাঁধি যতটুকু আছে তা তাই একান্তভাবে কবিতায়। কাব্যনাটকে তাই হয়তো দ্বিতীয় অঙ্কেই চূড়ান্ত ঘটনা ঘটে যায়, নাট্যিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানসিক গতির চাইতে দ্রুত বা ঘাতজর্জর হয় না। এই পরিণতি অবশ্য বিশেষ করে কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তবু কবিদের স্বাধীনতা সেখানে প্রকরণ এবং বস্তুবন্ধনকে অস্বীকার করার মতো সোচ্চার হতে পারে ব'লে আধুনিকতার তথাকথিত চীৎকার থেকে চিরকালের উচ্চারণকে চিনে নেবার অসুবিধা ও তার সম্ভাবনা থেকে যায়।

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

উত্তরচরিত (বিবিধ প্রবন্ধ ১ম) ॥

১২৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত এই ৫ম সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধ ভবভূতি-কৃত 'উত্তররামচরিত' নাটকের রসগ্রাহী সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে একদিকে যেমন উত্তরচরিতের বিষয়বস্তুর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি এই কাব্যের দোষ-গুণাদি নির্ণয়ও করেছেন। প্রবন্ধটি লেখার বাস্তব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"এই প্রবন্ধ নৃসিংহবাবুর অনুবাদের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল।"

প্রবন্ধটিতে উত্তরচরিতের বিষয়বস্তু বর্ণনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কের বিস্তারিত পরিচয় আছে। কিন্তু সেই পরিচয়ের ফাঁকে ফাঁকে লেখক সমালোচনা করতে ছাড়েননি। ফলে প্রবন্ধটি কেবল নীরস সমালোচনায় পরিণত না হয়ে রসগ্রাহী হয়েছে।

তুলনামূলক আলোচনাকেও বঙ্কিম প্রশ্রয় দিয়েছেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের তুলনামূলক আলোচনা অনেকাংশে প্রাধান্যলাভ করেছে। তাছাড়া কালিদাস ও ভবভূতির কবিকৃতির পার্থক্য অত্যন্ত সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন,—কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তিও উত্তম। কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমা প্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন; সুন্দর সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল সূচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্যপরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্যে সফল হয়েন না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢলিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।"

শুধু তাই নয়, সাহিত্যসৃষ্টিতে যুগপ্রভাবের আলোচনাও বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন। তাই তিনি লিখলেন—"বাস্তবিক সর্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমলপ্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন যে উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি প্রণীত নহে। তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আর্য রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন।

রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা, অলসাদির দ্বারা, তাঁহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃতি হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল।"

'উত্তরচরিত' নাটক। সুতরাং নাটক হিসাবে তার মূল্য স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বিচার করা কর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র সে কাজটিই করেছেন। প্রথমাঙ্কের প্রেমমহিমা তৃতীয় অঙ্কের বিরহের গভীরতা নির্ণয়ে সহায়তা করেছে বলে তিনি মনে করেন। আবার নাটকের যে গুণ ঘটনাগত দৃঢ়তা, ভবভূতির নাটকে তার অভাবের কথা স্বীকার করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। তৃতীয় অঙ্কের দোষের তিনি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আবার কাব্যগুণে যে এই গ্রন্থ ভূষিত তাও তিনি স্বীকার করেছেন—"আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনামধ্যে সেইরূপ কবিত্বরত্ন ছড়ান আছে।" ভবভূতির দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদব্যবহারের যে প্রয়োগগত ত্রুটি ও কোথাও কোথাও তার উৎকর্ষ—তা'ও তিনি উল্লেখ করেছেন।

এমনিভাবে উত্তরচরিতের একটি নিরপেক্ষ সমালোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রবন্ধটিতে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অপেক্ষা আলোচনার গাম্ভীর্য রক্ষিত হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও কবিত্ব প্রকাশিত হয়নি এমন নয়। ভবভূতির বর্ণনাকে আত্মসাৎ করে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকস্থলে নূতন সৃষ্টি করেছেন। সীতার নির্বাসনে বঙ্কিমের প্রথমা স্ত্রী বিয়োগের বেদনাই যে উচ্ছ্বসিত রূপলাভ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।—"স্ত্রী বিসর্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জন করে, তাহারই হৃদয়োচ্ছেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্মে যে গুরু;—ভালবাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা,—স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ—অর্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশ;—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভালবাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে পত্নী বিসর্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা!"

এই সমালোচনায় দোষ যে আয়তন বৃদ্ধি ও উদ্ধৃতিবাহুল্য এ সম্বন্ধে সচেতন থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রবন্ধেরই যেন সমালোচনা করে দিয়েছেন—"দৈর্ঘ দোষে এই সমালোচন বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এ জন্য আমরা কুণ্ঠিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচন দীর্ঘ হইলেও দোষটি মার্জনাতীত হইবে না। যদি ইহার দ্বারা একজন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয় বা তাঁহার কাব্যরস গ্রাহিণী শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব।"

কাব্য ও নীতি, সৌন্দর্যসৃষ্টি ও কবিত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন তা' স্বতন্ত্রভাবে প্রবন্ধসৃষ্টির বিষয়।

উপপ্লব্য (কৃ: চ: ৫ম খণ্ড) ॥

'কৃষ্ণচরিত্রে'র পঞ্চম খণ্ডের নাম। এই খণ্ডে মোট ৯টি পরিচ্ছেদ আছে। উপপ্লব অর্থ বিদ্রোহ বা বিপ্লব। মহাভারত যুদ্ধের উদ্যোগ এখানে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মহাভারতে উপপ্লব্য একটি নগরের নাম। এই নগরটি মৎসরাজ্যের অন্তর্গত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোগের সময় পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের শেষে এখানে কিছুকাল ছিলেন।

উপসংহার (কৃ: চ: ৫ম খণ্ড—৯ম পরি:) ॥

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের যে যে স্থানে কৃষ্ণকথা অত্যন্ত অল্প আছে সেগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন।

উপসংহার (কৃ: চ: ৭ম খণ্ড | ২য় পরি:) ॥

'কৃষ্ণচরিত্রের' এই উপসংহার পরিচ্ছেদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমগ্র গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের মূল রূপটি এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাই এই পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিযোগ্য বলে মনে করি।

"সমালোচকের কার্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ;—এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস; অপর সত্যের সংগঠন। কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্যই প্রধান; এজন্য আমাদিগের সময় ও চেষ্টা সেই দিকেই বেশী গিয়াছে। কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা অতি দুরূহ ব্যাপার, কেন না মিথ্যা ও অতিপ্রাকৃত উপন্যাসের ভস্মে অগ্নি এখানে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়া প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র পুন: সংস্থাপিত করিব, তাহা মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। আমার যত দূর সাধ্য, ততদূর আমি গড়িলাম।

উপসংহারে দেখা কর্তব্য যে, যতটুকু সত্য পুরানেতিহাসে পাওয়া যায়, ততটুকুতে কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ প্রতিপন্ন হইল।

দেখিয়াছি, বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ বলবান্। তাঁহার অশিক্ষিত বালপ্রভাবে বৃন্দাবন হিংস্রজন্তু প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাঁহার অশিক্ষিত বলেও কংসের মল্ল প্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। গোচারণকালে গোপালগণের সঙ্গে সর্বদা ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের স্ফূর্তি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, দ্রুতগমনে কালযবনও তাঁহাকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার রথসঞ্চালন বিদ্যার বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়।

এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্বপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে সময়ের সর্বপ্রধান যোদ্ধগণের সঙ্গে, অন্যান্য বহুতর রাজগণের সঙ্গে—কাশী, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্রক, গান্ধার প্রভৃতি রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন, কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারেন নাই। তাঁহার যুদ্ধশিষ্যেরা, যথা—সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় হইয়াছিলেন। স্বয়ং অর্জ্জুনও তাঁহার নিকট কোন কোন

বিষয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাণেতিহাসে তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুতা একজন সামান্য সৈনিকের থাকিতে পারে। সৈন্যপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সেনাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধগণ পটু ছিলেন না। মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না, ভীষ্মের বা অর্জ্জুনেরও নহে। কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, জরাসন্ধযুদ্ধে। তাঁহার সৈনাপত্যগুণে ক্ষুদ্রা যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখ্যাতীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করিয়াছিল। সেই অগণনীয়া সেনার ক্ষয়, যাদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানিয়া মথুরা পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নির্মাণার্থ সাগরদ্বীপ দ্বারকার নির্বাচন, এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক পর্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণীনির্মাণ যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার ঋষিদিগের ইহা অবোধগম্য—অতএব ইহাও এক অন্যতর প্রমাণ যে, কৃষ্ণেতিহাস তাঁহাদের কল্পনামাত্রপ্রসূত নহে।

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলও চরমস্ফূর্তিপ্রাপ্ত, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ, ইহাই ভীষ্ম তাঁহার অর্ঘপ্রাপ্তির অন্যতর কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শিশুপাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই বলিয়াছিলেন যে তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পূজা কেন?

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মই ইহার তীব্রোজ্জল প্রমাণ। এই ধর্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এ মত নহে, মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়াছি। কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্বলোক হিতকর, সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই ইহা গ্রন্থান্তরে বলিয়াছি। এই ধর্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা সকল কার্য সিদ্ধ করেন, ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও প্রমাণীকৃত করিতেছি। কেবল এই গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্তজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন।

সর্বজনীন ধর্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধর্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিত পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সভ্রান্ত রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াই যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজসূয় যজ্ঞে হস্তার্পণ করিলেন না। অবাধ্য যাদবেরা এবং বাধ্য পাণ্ডবেরা তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করা, উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সাম্রাজ্য স্থাপনের অল্পায়াসসাধ্য অথচ পরম ধর্ম্য উপায়। ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পর, ধর্মরাজ্য শাসনের জন্য রাজধর্মনিয়োগ ভীষ্মের দ্বারা রাজ্যবস্থা সংস্থাপন করান, রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় অতিপ্রশংসনীয় উদাহরণ। আরও অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন।

কৃষ্ণের বুদ্ধি, চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা সর্বব্যাপিনী, সর্বদর্শিনী, সকলপ্রকার উপায়ে উদ্ভাবিনী, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি। মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যতদূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ ততদূর সর্বজ্ঞ। অপূর্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব, যাহার উপরে আজিও

মনুষ্যবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহা হইতে চিকিৎসাবিদ্যাও সঙ্গীতবিদ্যা, এমনকি, অশ্বপরিচর্যা পর্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনর্জীবন একের উদাহরণ; বিখ্যাত বংশীবিদ্যা দ্বিতীয়ের, এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অশ্বের শল্যোদ্ধার তৃতীয়ের উদাহরণ।

কৃষ্ণের কার্যকারিণী বৃত্তি সকলও চরমস্ফূর্তিপ্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, এবং সর্বকর্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধর্ম এবং সত্য যে অবিচলিত, এই গ্রন্থে তার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্বজনে দয়া ও প্রীতিই এই ইতিহাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। বাহুবলদৃপ্তগণের অপেক্ষা বলবান্ হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি শান্তির জন্য দৃঢ়যত্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সর্বলোকহিতৈষী, কেবল মনুষ্যের নহে—গোবৎসাদি তির্যক যোনির প্রতিও তাঁহার দয়া। গিরিযজ্ঞে তাহা পরিস্ফুট। তা বতকার কথিত বাল্যকালে বানরদিগের জন্য নবনীত চুরির এবং ফলবিক্রেত্রীর কথা কতদূর কিম্বদন্তীমূলক, বলা যায় না—কিন্তু যিনি গোবৎসের উত্তম ভোজন জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাঁহার চরিত্রানুমোদিত। তিনি আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কিরূপ হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি, আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি তাহার শত্রু। তাঁহার অপরিসীম ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত দেখিলে তিনি অয়োনির্মিত হৃদয়ে অকুণ্ঠিতভাবে দণ্ডবিধান করেন। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থে স্বজনের বিনাশেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কংস মাতুল, পাণ্ডবেরা যাহা, শিশুপালও তাহা;—পিতৃস্বসার পুত্র; উভয়কেই দণ্ডিত করিলেন; তারপর, পরিশেষে স্বয়ং যাদবেরা সুরাপায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইলে, তাহাদিগকেও রক্ষা করিলেন না।

এইসকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনে তিনি অপরাঙ্মুখ ছিলেন না, কেননা, তিনি আদর্শ মনুষ্য। যে জন্য বৃন্দাবনে ব্রজলীলা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহার, যমুনাবিহার, রৈবতক-বিহার। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।

কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে। ধর্মতত্ত্বে বলিয়াছি, ভক্তিই মনুষ্যের প্রধানা বৃত্তি। কৃষ্ণআদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ—তাঁহার ভক্তির স্ফূর্তি দেখিলাম কই? কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাঁহার এই ভক্তির পাত্র কে? তিনি নিজে। নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উহা কথিত হইয়াছে—"য এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতীতি।"

"যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট্।"

ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগন্ময়; তিনি সেই জগতে প্রীতিবিশিষ্ট। পরমাত্মার আত্মরতি আর কোন প্রকার বুঝিতে পারি না। অন্ততঃ আমি বুঝাইতে পারি না।

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়,

অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঙ্মুখ—ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্ত, নির্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কিনা, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন, তিনি অন্ততঃ Rhys Davids শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন ; "The Wisest and Greatest of the Hindus." আর যিনি বুঝিবেন যে এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে, বিনীতভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারনাদ্ব কারণাকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রানায় তে পরম্॥"

উপসংহার (ধর্মতত্ত্ব/২৮ অধ্যায়)॥

"ধর্মতত্ত্ব" গ্রন্থের স্থূল বক্তব্যগুলি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়েছে। মূল কথাগুলি এই—

"১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

৫। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

৬। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন ; এইজন্য সর্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে—"সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি।"

"পূর্ণাহুতি"র কবি কালিদাস রায়

ভারতীয় জীবন-চর্চার সার্থক প্রতিফলন "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্"-কে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় হৃদয় যখন উন্মুখ হয়, তখন প্রীতির প্রাবল্য নির্মাল্য হয়ে অবিকল সাফল্য লাভ করে। "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্" এই আপ্তবাক্যটিতে হৃদয়মাধুর্য অবিমিশ্র আশ্রয়ে পরিপূরিত। শ্রদ্ধার নিরিখে আপন আত্মউপলব্ধিটি যে গাঢ় থেকে গাঢ়তম হয়ে ওঠে সেই কথাটিই কবিশেখরের রবীন্দ্র-প্রশস্তিতে আকীর্ণ 'রবীন্দ্রনাথ' নামক কবিতাটিতে দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষকতাবৃত্তির পরিশ্রুত নির্মল সলিল আর সারস্বত সাধনার বিমলিন হৃদয়মুকুর—এই দু'য়ে মিলে কবিশেখর কবিগুরুকে ভাবনার এক অকৃত্রিম আলোকে মঞ্চস্থ করিয়েছেন। রবীন্দ্র-সমুদ্র-মন্থন অনেকে বিচিত্রভাবে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় করেছেন। কিন্তু কবিশেখর যেন একেবারে আলাদা,—স্বতন্ত্র। জৌলুষহীন অথচ সুদূরপ্রসারী চিন্তার অনুসরণাত্মক নিম্নোক্ত কথা কয়টি রবীন্দ্রনাথের প্রতি বোধকরি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে—

"...বইছে তোমার সুরের সুরধুনী
বাইছে তাতে 'সোনারতরী' দেশের যত গুণী।
ঘাটের নেয়ে বাটের বাউল গোঠের রাখাল যারা
তোমার গানেই গুরুবরণ করছে আজি তারা।" (রবীন্দ্রনাথ)

এই প্রসংগে আরেকটু উদ্ধৃত করি—

"তোমার পানে চেয়ে চেয়ে বিস্ময়ে যে পাই না থাই
তোমার বিশ্বরূপটি দেখে চোখবুজে রই, না তাকাই॥" (ঐ)

শ্রদ্ধার অকৃত্রিমতায় কথাগুলি যে কতখানি প্রাণবন্ত তা প্রাণবানদের কাছে প্রাণময় হয়ে উঠতে নিশ্চয়ই বেগবান হবে।

গ্রামবাংলার শান্তকবি কালিদাস রায়। গ্রামীণ শান্তি কবির কাব্যসংসারের অলংকার। বলা বাহুল্য, গ্রামের সেই অকৃত্রিম রূপটিকেই কাব্যগ্রন্থের প্রারম্ভে অত্যন্ত আদরের সংগে সংযোজিত করা হয়েছে। শহুরে কৃত্রিম সান্ত্বনায় তিনি আরাম পান না। প্রাণের আরাম পেতে মনের কোণে আসন পাতেন গ্রামীণ বাস্তুভিটের আশেপাশে। চোখ পড়ে থাকে টেবিলের লেখার কাগজের উপর, কিন্তু মন উড়ে যায় গ্রামের সেই "সাতপুরুষের ভিটেমাটিতে"। লেখনীর মুখে কথা বেরোয়—

"চক্ষে এল জল,
গ্রামটা কখন শহর হ'ল কেঁদে কি আর ফল।" (রূপান্তর)

কিন্তু তবুও কবি তাঁর মনের আরাম আর প্রাণের বিরাম খুঁজে পেতে পুকুর পাড়ের বুড়ো অশথ, খামারবাড়ী, জামতরু, নিমতরু, শিউলি ফুলের গন্ধ আর বেগুনী নিমফুলের রংটিকে আজও একান্ত

আপনার করে মেনে নিয়েছেন। "পল্লীকিশোরী"কে আঁকতে গিয়ে পল্লীবালার মনের সংযোগীভাষায় সাযুজ্যে বাংলার প্রকৃতিটিকেও সুন্দরভাবে তিনি এঁকে রাখলেন। পল্লীকিশোরীর মন-কিশলয় যৌবনের শ্যামল গৌরবের জন্য যেভাবে আপ্লুত হয়, তারই অবিকৃত সত্যকে আঁকতে শহুরে কোন উপঢৌকন আশ্রয় পায়নি। পেয়েছে গ্রামময় বাংলার প্রাণময় আলাপের সেই অতি সাধারণ অথচ অনেক-বলার কাহিনীর উপকরণ—বকুলতলায় বসে সন্ধ্যঝরা বকুলফুলের মালা গাঁথা, ছোটভাইটিকে কোলে তুলে চুমু খাওয়া, "পোষা হাঁসটির পালখে বুলায় গাল" আর—

> "মাধবীলতারে জড়াইয়া দেয় গন্ধরাজের ডালে,
> সকাল-বিকাল চারগাছে জল ঢালে,
> গাভীর অঙ্গে হাত বুলাইয়া শিহরণ দেখে তার,
> খসে-খসে পড়া বসনাঞ্চলে বুক ঢাকে বারে বার।" (পল্লীকিশোরী)

রবীন্দ্র-কবি-জীবনের প্রত্যাশা ছিল "যে আছে মাটির কাছাকাছি, তারি লাগি কান পেতে আছি…"। কবিশেখর সেই মাটির অত্যন্ত কাছ থেকেই ডাক দিলেন—

> "হে তরুণ কবি, কবিতা হইতে ইহারে দিয়াছ বাদ,
> সন্ধান রাখ—পেয়েছে মেয়েটি কিসের নতুন স্বাদ ?" (পল্লীকিশোরী)

এই তো কবিগুরুর উত্তর সাধক কবিশেখরের জিজ্ঞাসা। এই জন্যেই তিনি "গাঁয়ের কবি"। গাঁয়ের কবির মতোই তিনি বলতে পারেন—

> "যাদের বার্তা লিখেছি তারা যে বাংলামায়ের আসল ছেলে,
> মুচি-ডোম হাড়ি চাষী মাঝি তাঁতি বাঁকী ঝাঁকী রাখাল জেলে।" (গাঁয়ের কবি)

গ্রাম্য বধূরা শহুরে কায়দা আদায়ে অনভ্যস্ত। তারা একান্তই গ্রাম্য, সত্যই সরল, প্রকৃতই "বঙ্গের বধূ"। তাদের সেই অনাড়ম্বর জীবনের সারল্য কবির কাছে ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। সাধারণের নিকট যা উপেক্ষিত, কবির কাছে তা-ই অপেক্ষার বস্তু। নিম্নোক্ত কয়েকটি লাইনের মাধুর্যে সেটি তাৎপর্যময়তায় আভাসিত হয়েছে—

> "যাদের অধরে শাঁখবাজে যারা সাঁঝদীপ জ্বালে তুলসীতলে,
> পশ্চিমে ভানু ঢলিয়া পড়িলে দীঘি-নদী-ঘাটে জলকে চলে,
> ষষ্ঠীতলায় পাড়ার সকল ছেলেমেয়েদের কুশল মাগে
> সকলের শেষে শুতে যায় যারা, প্রভাতে সবার আগেই জাগে।" (গাঁয়ের কবি)

গ্রামবাংলার মাটির টানে কবি বারবার শহর থেকে আপন মনটিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন "গান গেয়ে ধান কাটে যারা" তাদের পাশে, "রাঙা সোনা থেকে কাস্তে গড়ে" যারা তাদের কাছে। কেননা তারাই তো বাংলাদেশটিকে আজও যাতে চিনতে ভুল না হয় সেজন্য একান্ত আপনার করে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু এতে তাদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই—আছে মিলিত স্বার্থের অনাবিল প্রীতি। সেইজন্যেই কবি লেখেন—

> "তাদের কথাই লিখি যারা হেথা রচেনি ঘাঁটি বা উপনিবেশ,
> এই বাঙলার আসল মালিক, এ মাটি যাদের খাঁটি স্বদেশ॥" (ঐ)

বলা বাহুল্য, এই সাধারণীকৃতির অসাধারণ স্বীকৃতি কবিশেখরের প্রতি কবিগুরুর সস্নেহ আশীর্বাদ—"তোমার কবিতা বাংলাদেশের মাটির মতন স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা……।"

বৈষ্ণবীয় ভাবের ঐতিহ্যে কবির মানস-পরিচর্যা পরিমার্জিত। ভগবদ্‌ভক্তির ঐশীশক্তির লীলায় তিনি সম্পূর্ণ পরিপ্লুত। বাস্তবের কুটিল ও জটিল সংঘাত থেকে "আনন্দরূপম্"-এর অনিন্দ্যরাজ্যে পৌঁছুতে তিনি বারবার প্রয়াসী হয়েছেন। বস্তুত আধ্যাত্মিক অনুভূতির অসীমতায় পরম সান্ত্বনালাভের সন্ধানে কবি আপনাকে বৈরাগ্যের গৈরিক সায়রে পূর্ণ অবগাহন করিয়েছেন। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে পৃথিবীর বাস্তব সৌন্দর্যে স্বাভাবিকভাবে কবি যেমন আকৃষ্ট হয়ে অবলীলাক্রমে প্রকৃতিকে আঁকার প্রয়াস পেয়েছেন, তেমনি প্রৌঢ়ত্বের স্তিমিত প্রদীপের আলোয় জীবনদর্শনকে গভীরভাবে বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছেন ভগবদ্‌গূঢ়ৈষার আত্মিক সম্মিলনে। এখানে তিনি রাখালরাজার সেবক, 'দ্বিভুজ মুরলীধরে'র সান্নিধ্যলাভে তৎপর "তুমি মোর প্রিয়তম এইশুধু পারিয়াছি বুঝিতে…" (দ্বিভুজ মুরলীধর)। বলা বাহুল্য শ্যামল প্রান্তরের কবি শ্যামনামে বিভোর। তাঁর প্রাণ-মন ঐ চরণে সম্পূর্ণ সমর্পিত। ঐ রাঙা চরণেই তিনি স্মরণ নিলেন—

"আপাদলম্বি সেই কদম্বমালা আজো মঞ্জুল,
আমি যেন সেই মালার একটি চরণচুম্বি ফুল ॥" (শ্যামনাম)

গার্হস্থ্যজীবনের সংগে কবি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। এই ঘনিষ্ঠতায় কল্পনার বিন্দুমাত্র আশ্রয় নাই। জৌলুষপূর্ণ ভাষারও কোন প্রশ্রয় তিনি দেননি। কেবল আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারে যা ঘটে তাকেই তিনি সাধারণভঙ্গিমায় অনাবিল রসমাধুর্যে পরিবেশন করেছেন। স্মর্তব্য, মধ্যবিত্ত পরিবারে লালিত-পালিত কবিজীবনের এ এক প্রত্যক্ষ অনুভূতি। বাংলার গৃহস্থবধূরা যতদিন না পর্যন্ত মাতৃত্বের পরীক্ষায় পাশ করতে পারছে ততদিন যে সে সংসারের একজন খেটে-খাওয়া-বৌ-এর পর্যায়ে পরিচায়িত হয়ে থাকে তা আমরা জানি। তখন তাকে শাশুড়ির অনেক মুখ-ঝাম্‌টা সহ্য করতে হয়, নিরুপায়ে হজম করতে হয় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সী ননদীর অত্যাচারও। কিন্তু যেদিন মা হয়ে ফুটফুটে ছেলেটিকে শাশুড়ির কোলে দিয়ে সংসারের কাজ করতে ব্যস্ত হয় তখন শাশুড়ী-ননদীরা হাঁ-হাঁ করে উঠে;—শরীর খারাপ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, এতদিন তার শরীরের প্রতি তাদের লক্ষ্য ছিল না। সহসা এই পরিবর্তন যে নবজাতকের প্রতিই ভালবাসার ফলশ্রুতি তা কবির চোখকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। তখন—

"ননদী আর আগের মতো করে না টিসটিস্,
শাশুড়ীমার মুখে মধু, আর ঝরে না বিষ।" (নবপ্রসূতি)

বধূটি এতে আনন্দিত। একদিকে তার মাতৃত্বের অবদান, অপরদিকে সাংসারিক স্নেহে এখন অনেকখানি মানুষের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাই সন্তানটিকে কোলে নিয়ে সে বলে—

"খোকন বাছাধন,
তুই এলি তাই হ'ল আমার দাসীত্ব মোচন ॥" (ঐ)

বাংলার গৃহস্থের মায়েরা চিরদিনই স্নেহপ্রবণ আর অনুভূতিময়তায় আশ্চর্য স্নিগ্ধ। কোন

প্রার্থী এসে—সে ছলচাতুরী করেই হোক, কিংবা স্বাভাবিক দারিদ্র্যের বশেই হোক,—যদি কিছু খাবার চায় কিংবা কোন জিনিষ বিক্রী করতে আসে এবং তার মুখে যদি "মা" ডাকটির স্নিগ্ধতা থাকে, তাহলে কোন মা কি সেই প্রার্থীর কথায় বা ব্যবহারে কোনরূপ জটিলতার প্রশ্ন মনে আনতে পারে? কিন্তু মায়ের সন্তান মা'কে এ-ব্যাপারে বার বার সাবধান করলেও মা ছেলের কথায় "আহা গরিব, মা ব'লে সে ডাকে" কিংবা "লোকটা ভালো, মা ব'লে সে ডাকে" অথবা, "মেসে থাকে, মা ব'লে সে ডাকে" প্রভৃতি স্নেহময় ভাষায় জবাব দেয়। কিন্তু ছেলে যখন 'ঐ সবল লোকটা কেন খেটে খায় না' বলে অভিযোগ করে, তখন মায়ের হৃদয় থেকে জবাবটুকু বেরিয়ে আসে—

"বড়ই কাঙাল, মা ব'লে সে ডাকে,
না হয় দুমুঠ কমই খাব, তাড়িয়ে দেব তাকে?" (মায়ের কৈফিয়ত)

এই হ'ল বাংলার গৃহস্থের মায়ের মনের অতি নিকটের ছবি, যা কবির হাতে হয়েছে বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ।

রোজকারী গৃহস্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে সংসার অনভিজ্ঞ ছেলেদেরকে যে কিরূপ হতাশ আর সংগ্রামী করে তোলে তা 'মৃত্যুশোক' কবিতায় চিরন্তন হয়ে দেখা দিয়েছে। তারা এতদিন যে সুখের পরিসরে ছিল তা থেকে সহসা বিচ্যুত হয়ে বাস্তবের কাঠিন্যে নেমে এসেছে। তারা এখন ভাবতে শিখেছে সংসার চালানোর জন্যে বিভিন্নরকম আয়ের পন্থা আর ব্যয় সংকোচের রূঢ়তা। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে চাকর-বাকর রাখতে তারা রাজী নয়। বৌয়েরা রান্নাঘরে গিয়ে কাজে সক্রিয় হচ্ছে; তারা এখন আর ফি-সপ্তাহে সিনেমা যেতে পারছে না। মায়ের নামে বাড়ীখানায় মিলেমিশে সকলকে বাস করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, "নীচেতলা ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সের উপায় করতে হবে" বলে তারা মত প্রকাশ করেছে। বস্তুত, এখন তাদের পরিচয় হল—

"ছিলাম অভিজাতের দলে
মধ্যবিত্তের নীচে নেমে গেলাম সাধারণের তলে।" (মৃত্যুশোক)

গার্হস্থ্য জীবনকে এত নিবিড়ভাবে উপলব্ধি না করলে বোধকরি এমন সত্যটি ধরা পড়ত না।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে দেশপ্রীতিমূলক কয়েকটি কবিতায় তিনি তাঁর প্রাণের অঞ্জলি জানিয়েছেন অত্যন্ত সংযতচিত্তে। বলা বাহুল্য, এইরূপ ব্যাপারে কোথাও কোন চিত্তদৌর্বল্য বা অযাচিত কষ্টকল্পনার প্রশ্রয় নাই। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে জীবনসংগ্রাম তা তিনি সচক্ষে দেখেছেন, হৃদয় দিয়ে সেই আন্দোলনকে উপলব্ধি করেছেন। স্বাধীনতা যে জীবনমুক্তির শ্রেষ্ঠ পদসঞ্চার সে-কথাকে তিনি বারবার স্মরণ করেছেন। আমরা আমাদের বহু আকাংক্ষিত স্বাধীনতা পেয়েছি অজস্র অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে। কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে আমরা যেন হেলায় না হারাই—

"অনেক তপের অনেক ত্যাগের বহু সাধনার ধন
তুমি স্বাধীনতা, যেন এই কথা হয় না বিস্মরণ।" (স্বাধীনতা)

ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে ভারতীয় দেব-দেবী তথা ভারতীয় সংস্কৃতি যে বিভিন্নভাবে ও বিচিত্রসংস্পর্শে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেই কথাটি কবিশেখর সার্থকভাবে উপলব্ধি করেছেন। ভারতীয়েরা "ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়"-এ কালাতিপাত করতে বেশী ভালবাসে। সেখানে নেই

কোনরূপ চাঞ্চল্য ; আছে ঐশ্বরিক মাধুর্যের লীলায়িত প্রয়াস। তীর্থময় ভারতের সেই রূপটিকে কবি অত্যন্ত সহজ করে বললেন—

"শত শত পুণ্যতীর্থ সারা দেশে করিল রচনা,
অশ্বত্থে দেবত্ব দিল তাহারি কল্পনা।" (কবির ভারত)

যা অতি সাধারণ তারই মধ্যে ভগবানের বিভূতি ভারতীয় ষড়দর্শন লক্ষ্য করেছে। তাই তো এই অধ্যাত্মময় ভারতের নগণ্য ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে বৃক্ষ, প্রস্তর—এমনকি অস্পৃশ্য জন্তুর মধ্যেও জীবনায়নের অকৃত্রিম প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ, বিশ্বময়ের আবাসস্থল যে তাঁরই সৃষ্ট পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে। তাঁকে যেমন উপেক্ষা করা যায় না, তাঁর সৃষ্টিকেও অনাদর করব কি করে! এই হ'ল ভারতীয় কবি-আত্মার মর্মবাণী।

মন্দিরময় ভারতের ভগবদানুভূতি যেমন ভারতীয় অধ্যাত্মজীবনের প্রাণের দিক, অনুরূপভাবে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ শিল্পসম্ভারগুলিও রসিকজনের প্রলোভনের বস্তু। সন্ধ্যারতির বাদ্যবৃন্দসহ ঘণ্টার কলরোলে ভক্তপ্রাণ দেবচরণে আশ্রিত হয়ে পড়ে ; পাষাণমন্দির দেখে করজোড় কপালে উঠে। এ সবই যে ভক্তির প্রকারান্তর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ হেন ভারতে জন্মগ্রহণ করে কবি সার্থক হয়েছেন। সার্থক হয়েছে তাঁর কবি-মন। এখানে পেয়েছেন তিনি আপন সৃষ্টির উপকরণ। মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি দিয়েছে তাঁকে নিরন্তন প্রেরণার উপঢৌকন। অজস্র স্মৃতিস্তম্ভে তিনি দেখেছেন স্রষ্টার কৃতিত্ব, অনুভব করেছেন তাঁদের একনিষ্ঠতা। বিশাল ভারতের মহান্ পুরুষদের খোদিত মূর্তিতে তিনি দেখেছেন শৌর্য-বীর্য আর ত্যাগের মহিমা। তাই তো তিনি ভারতীয় জীবনকে, ভারতীয় কৃষ্টিকে আপনজীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেননি। "ভারতের কবি" বলে নিজেকে পরিচয় দিতে তিনি গর্ববোধ করেন।—

"...ভারতের কবি বলি তারে
পাষাণ মন্দির করে ভক্তি নত যারে।" (ভারতের কবি)

ভারত সম্বন্ধে কিছু লিখলেই ভারতের কবি হওয়া যায় না। ভারতের আকাশ-বাতাস, তার ধূলিকণা, তার জনজীবনের মর্মোদঘাটন না করলে ভারতেকে জানা যায় না তা কবিশেখর পরিস্কার করাতে চাইছেন। ভারতের মতো দ্বিতীয় একটি দেশ যে পৃথিবীর আর কোথাও নেই সে সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চয়। এখানে যে মুক্ত প্রাণের আলো আর সকলের বাঁচার সমান অধিকার রয়েছে। এ যে মহামানবের তীর্থভূমি। এখানে তো বাছবিচারের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। কেবল "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে"—এই চিরায়ত আচরণধারাটি এখানে প্রধান। হাজার অত্যাচারেও এ দেশ যে সর্বংসহা, অজস্র লুণ্ঠনেও এ যে ষড়ৈশ্বর্যময়ী, বিপুল হানাহানিতেও দেশমাতা যে মঞ্জুলহাসিনী। এমন দেশ কে কবে কোথায় পেয়েছে! অতএব এদেশে জন্মে যেমন আনন্দ, মরেও তেমনি তৃপ্তি। কেননা—

"সকল ধর্মে সমান শ্রদ্ধাবান
বাক্যে কর্মে নেই তব ব্যবধান।
শত্রু মিত্রে দিয়ে সম অধিকার
অতিথিসেবায় অবারিত তব দ্বার।" (ভারতভাবনা)

আর যে কবি বলেন, আমি ভারতে জন্মে সার্থক হয়েছি "তাহারেই বলি আমি ভারতের কবি"। দেশপ্রীতির এমনধারা অতি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ বাংলার সাদামাঠা কবি কালিদাসের কাছে পেতে আমরা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশী।

সমসাময়িক ঘটনাবলী কবিদের জীবনকে কোন না কোনদিক থেকে আকৃষ্ট করে। তাঁরা এগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন না ; বা সম্ভবও নয়। কবিশেখর কালিদাস রায়ও এই পরিস্থিতিতে মূক হয়ে থাকতে পারেননি। যুগসমস্যার বাস্তবচিত্রকে তিনি আপন কাব্যে স্থায়ী চিত্ররূপ দিয়েছেন।

পাশাপাশি ঘরের বাসিন্দা আমরা। একঘরে চলেছে বিলাসের অতি-প্রয়োজনীয় উপঢৌকন, আর তারই পাশের ঘরে ধুঁকছে বুভুক্ষার নীরব আবেদন। অথচ কেউ কাউকে আমল দেয় না। এই সহমর্মিতাহীন শহুরেজীবন আজকের দিনে যেন বিস্ময় ও বেদনায় মূক ও পঙ্গু হয়ে গেছে। কবি লক্ষ্য করেছেন, একদিকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত পুত্রগণের অসুস্থ পিতার জন্য শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত সৌধে বিশ্রামের রকমারী রাজকীয় ব্যবস্থা। আর তারই পাশে অপর এক বৃদ্ধের জীবন-সংগ্রামের সে কি বিস্ময়কর প্রচেষ্টা। এরা "চলে নিত্য ট্রামে বাসে হইয়া বিব্রত। জীবন বিপন্ন করি উদরান্ন করিতে অর্জন…"। এই দারুণ থাঁকের বাজারে আট-দশটি পোষ্যের সংগে দৈনিক আপোষ-রক্ষা করতে একমাত্র উপার্জনক্ষম বৃদ্ধের "হা ভগবান" বলে একদণ্ড বসারও সময় থাকে না। নিরন্তর পরিশ্রমেও সংসার অচল হয়ে পড়েছে ; আবার ঋণেও হাবুডুবু খাচ্ছে। এইরূপ নানান চিন্তায় হয়ত একদিন একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় গোটা সংসারটাই ভেসে যাবে। এদের জীবনে বিশ্রাম বা আরাম বলে কোন জিনিস নেই— "সুদীর্ঘ জীবনে এরা কোনদিন পায়নি বিরাম,

ইহাদের মরণই বিশ্রাম।" (—বিস্ময় ও বেদনা)

কবিশেখরের মর্মের এই কথাটি আশ্চর্য সত্যের আশ্রয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কোষ্ঠীতে এদের যথেষ্ট আয়ু থাকলেও কবি বলতে পারেন—

"ট্রামে-বাসে ধাক্কা খেয়ে পড়ে

কোনদিন যাবে এরা মরে।" (ঐ)

স্বাধীন ভারতের এই পাশাপাশি বৈষম্যকে তিনি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে অন্তরে বেদনাবোধ করছেন।— "স্বাধীন ভারতে আজ ইহাদের তত্ত্ব কেবা লয় ?

করুণায় কে দেয় আশ্রয়।"

বর্তমানের কঠোর সত্যকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখেছেন "কলেজের মেয়ে"র মধ্যে। শিক্ষিতা মেয়ে সেজেগুজে কলেজে যায়, সভায় আবৃত্তি করে গীটার বাজায়। কিন্তু এই ভরা যৌবনে এ সমস্ত বাহ্যিকরূপের কোন প্রয়োজনই মিটছে না,—সে তার জীবনসঙ্গী খুঁজে পাচ্ছে না। বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। একটা সুখের নীড় বাঁধতে তার কতো না আগ্রহ, ভগবানের কাছে কতো না নীরব আবেদন। তার মনের কথাটি এমনিভাবে প্রকাশমান "কতদিন আর রাখব বেঁধে লাঞ্ছিত যৌবন"। সে চায় না "বাড়ী-গাড়ী গয়না শাড়ী"। সে বলে, কেবল "একটি নিজের কুলায় পেলে ধন্য হয়ে যাই।" কিন্তু সবই বিফল হয়। সেজেগুজে পাত্রপক্ষের কাছে পরীক্ষায়

বসে। তারা বিমুখ হয়ে বলে "ফর্সা আরো চাই"। মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে "বিয়ে না হোক চাকরি করে খাবি"। কিন্তু পেটটাই কি সব, হৃদয়টা কি মরে গেছে ? তাকে কোথায় সে সরিয়ে রাখবে ! তার মনটা খাঁ খাঁ করে উঠে—

কোথায় আমার বঁধু,
এই জীবনের শ্রীসৌরভে কে যোগাবে মধু ?" (কলেজের মেয়ে)

এমনিভাবে আজকের নানা ঘটনাকে তিনি অদৃষ্টের পরিহাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। "'৬৬ সাল" কবিতাটিতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির নানান্ সমস্যার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের এই সন্ধিক্ষণে চারিদিকে যেরূপ হানাহানি, অন্তর্ঘাতমূলক কাজ হচ্ছে তাতে তিনি দুঃখিত। প্রকৃতির রুদ্ররোষও যে দেশের সমূহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে, তাসখন্দের সাধের সৌধ যে ভূমিকম্পনে কাঁপে, শিক্ষাক্ষেত্রেও সে উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমবর্ধমান এতে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। আশ্চর্য হয়েছেন সংবাদ পড়ে—চড়াপড়া গাঙেও "চালের জাহাজ ডোবে"। এমনি ধারা প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে তিনি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন—

"অদৃষ্ট হলে মন্দ,
করুণাময়ের খয়রাতখানা একদম হয় বন্ধ।" ('৬৬ সাল)

পৃথিবীর তাবৎ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মানব সম্বন্ধেও তিনি কতকগুলি কবিতায় তাঁদের প্রশস্তি-গাথা গেয়েছেন। তাঁদের কেউই ঈশ্বরের প্রেরিত সাক্ষাৎদূত কেউ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ, কেউ বিদ্যাবত্তায় মান্য, কেউ ভাগ্যহত দেশসেবক রাজা, আবার কেউ দুস্তর সমুদ্র-বিজয়ী সাঁতারু। এঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বকীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত। দেশের সেই সম্মানীয়দের সম্মাননা করা যে এক রকম শিষ্টাচার তা তিনি তাঁর প্রাসংগিক কবিতাগুলিতে আপন অন্তরের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও প্রীতি দিয়ে জানাতে বিস্মৃত হননি। বলা বাহুল্য, মহান্‌দের প্রতি এই প্রীতি আগামী দিনের জনজীবনকে যে শ্রদ্ধার আসনে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বস্তুত, পূর্বসূরীদের প্রতি উত্তরকালের কবি-সাহিত্যিকদের এটাই শাশ্বত শ্রদ্ধার স্বাভাবিক অনুস্মৃতি। এই প্রসংগের কবিতাগুলি হ'ল—মিহির সেন, সিরাজ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শকুন্তলার কবি, মহারথ নেহেরু, অগ্নিগর্ভ ভস্ম, বলেন্দ্রনাথ, খৃষ্টদেব, দয়ালপ্রভু ইত্যাদি।

ব্যঙ্গ-রসাত্মক কবিতাগুলি কবিশেখরের তীক্ষ্ণ রসবোধের পরিচায়করূপে স্বীকৃত হতে বাধা নেই। বাঙালী হাসতে জানে না, বাঙালী জানে শুধু কাঁদতে—এই প্রচলিত মতটিকে পুরোপুরি না মানলেও কিছুটা মানতে বাধ্য হই। কেননা হাসির মধ্যে যে একটা উদার ও সুদূরপ্রসারী প্রাণচাঞ্চল্যের পরিচয় নিহিত রয়েছে তা অনেকের কাছে অজানা। হাসি যে মানসিক স্বাস্থ্যের একটি অন্যতম অনুসংগ তা আমাদের দেশের তথাকথিত গুটিকয়েক কবি সাহিত্যিকদের লেখনীতে লক্ষ্য করেছি। হাসি কেবল যে হাসিই নয়, তারও মধ্যে যে একটি মানসিক সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনাময় অন্তর্নিহিত সংকেত বিধৃত থাকে সেটি জানতে ব্যঙ্গ-রসাত্মক কবিতা বা গদ্যপাঠে লাভ করা যায়। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের স্বীকরণের পরিসরে এই বিভাগটি অত্যন্ত উপাদেয় ও মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে। হাসির সংগে ভাবনা, ভাবনার সংগে সুদূরপ্রসারী মানসিক চেতনাটিই মানুষকে তার

বিভিন্ন কর্মে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে। এইখানেই ব্যঙ্গ-রসাত্মক হাসির মহিমা, চেতনালোকের সৌন্দর্যবিধানের সার্থকতা।

"জোড়হাতের গান"-এ যেমন নিছক হাসির রেশটি স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়েছে, তেমনি ভাবিয়ে তুলেছে পাঠকদের, তাদের নামিয়ে এনেছে বাস্তবের সার্থক পরিসরে। এ জগতে মন পেতে হলে কি স্ত্রী, কি ঝি ("পাড়ার পাঁচী"), কি পড়সী, কি ভাবী বেহাই, কি জমাদার, দর্জি, ধোপা এমনকি ট্রামে-বাসে সহযাত্রীর কাছেও বিনয়াবনত হয়ে জোড় হাত করতে হয়। কিন্তু এক জায়গায় জোড়হাত না করেই কবি খালাস পান। সেখানে তাঁকে কারও মন পেতে হয় না, মনমরা হতেও হয় না, কেবল মারতেই প্রয়াসী হন।—"…এক হাত চলে কেবল গায়ে বসলে মশামাছি॥" বলা বাহুল্য, কবির মত সকলেই এ হেন কাজে অবিকৃতভাবে প্রয়াসী হন।

আবার "মশক" কবিতায় তিনি বলছেন—

"এ অঙ্গে চপেটাঘাত করি বারবার,
তুমি উড়ে যাও, খাই স্বহস্তে প্রহার॥"

নিছক হাসি তার মানসিক ঐশ্বর্য—এই দু'য়ে মিলে কবিতাগুলি আমাদের হাসায় আর গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। কেননা, মশক লুকিয়ে লুকিয়ে রক্তচোষণ করে। সে চোর তার দংশন তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু ভয়াবহ। তাকে আঘাত করতে গেলে সে আঘাতকারীকে বেমালুম তার সরু ঠ্যাংগুলি দেখিয়ে অবলীলাক্রমে নাগালের বাইরে চলে যায়। আবার বেহায়ার মত শোষণ করতে এগিয়ে আসে। অথচ মানুষ পারে না সেই ক্ষুদ্রদের প্রতি সাংঘাতিক রোষাঘাত হানতে। অবশেষে নিজেই হার মেনে শান্তভাবে অতটুকু জীবের ভয়েও মানুষ পুংগবকে সাবধানতা অবলম্বনে প্রয়াসী হতে হয়—

"তব দংশন হতে শেষে পাইতে রেহাই
ঘরের ভিতরে ঘর করি যে রচনা
জাল পটবাস,—তোমা করিতে বঞ্চনা" (মশক)

ব্যঙ্গ-রসের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে 'দ্বিপদী', 'যক্ষধন', 'ধর্মের নামে' কবিতাগুলি সার্থক। বাস্তব সত্যকে অবলম্বন করে তীক্ষ্ণ বাণ হানতে কবিশেখর সোচ্চার হয়েছেন। এ মহানগরের পরিবেশ যে ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে এবং তাতে যে শান্তিময় জীবনের চেয়ে প্রচ্ছন্ন অশান্তির উন্মাদনা প্রকট হয়ে পড়েছে সেই চিত্রটি তিনি এইভাবে উপস্থাপিত করে মিঠাচাবুক বুলিয়েছেন—

"এ মহানগর
সারাদিন রেডিও-র সঙ্গীতে মুখর
দু-ধারে প্রাচীর গাত্রে রূপসীর চিত্র অগণন
পথে পথে সিনেমার আকর্ষণ নয়ন-লোভন॥"
আমোদ-উৎসবময়ী এ মহানগরী,
ট্রামে-বাসে ঘুরিতেছে কতশত নাগর-নাগরী॥" (যক্ষধন)

'ধর্মের নামে'ও যে অসম্ভব গর্হিত কাজগুলো অবলীলায় মীমাংসিত হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ তা নির্বিবাদে স্বীকার করে নিচ্ছে সেইখানেই তাঁর দুঃখ—

"ধর্মের নামে কেবলি প্রবঞ্চনা,
মানুষের ঘরে জন্মিছে আবর্জনা।" (ধর্মের নামে)

'দ্বিপদী' কবিতাটি যেন ব্যঙ্গের চাবুকে লক্লক্ করছে। লাইনগুলো পড়ার সময় হাসি পায়, পড়া থামিয়ে চিন্তা করলে পাঠক চাবুক খায়। অস্ফুট কেবল মুখ থেকে কথাটুকু বেরিয়ে আসে—'সত্যি'। শত গরু পুষলেও গৃহস্বামী যেমন "হয়নাকো কভু গোস্বামী", তেমনি হাজার মোরগ খাওয়ার পর কেউ "যোগী" হতে পারে না। অনুরূপভাবে কবি বলছেন—

"মোটরে দুইটি ভাগ্য রাজপথে আছে ভাগ করা,
একটি মোটরে চড়া, অন্যটি মোটর তলে পড়া॥ (দ্বিপদী)

ইংগিতগুলো যে প্রতীকধর্মিতার আশ্রয়ে শাশ্বত হয়ে উঠেছে তা বলতে এতটুকু বাধা নেই।

জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ (সম্ভবত) প্রকাশ করলেন। সুদীর্ঘ জীবনের নানান অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে ভরপুর এই কাব্যগ্রন্থ। নামটিও হয়েছে অভিনব—"পূর্ণাহুতি"। জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে কবি আপন সৃষ্টিকে পরিপূর্ণভাবে দেশের কাছে আহুতি দিলেন। এ যেন তাঁর জীবনের পালাশেষের গান। আকৈশোর বাণীর পূজা করে এসেছেন একনিষ্ঠতার আশ্রয়ে। প্রশ্রয় পেয়েছেন সমঝদারদের কাছ থেকে—অনুপ্রাণিত হয়েছেন সারস্বত সাধনায়। দীর্ঘজীবন প্রদক্ষিণের পর তিনি আজ বড়ই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত—বার্দ্ধক্যের জীর্ণতায় শ্লথ। তাঁর রূপময় সৃষ্টি আজ থেমে এসেছে। ক্লান্ত মনে, জীর্ণ হৃদয়ে অনুভব করেছেন "ফসলহারা ক্ষেত"-এর করুণ চিত্রটি—

"এই মাঠপানে চাই—
আমার জীবনে মাঠের জীবনে প্রভেদ খুঁজে না পাই।"

তাঁর কবি-প্রাণ হাহাকার করে উঠেছে—"...আমার জীবনমরুর আকাশে মেঘ জাগিবে না আর"। কিন্তু তাঁর এই ঘোষণায় তিনি তেমন দুঃখিত নন। দীর্ঘজীবনের কৃতিত্বময় সারস্বত সাধনায় তিনি বহু সম্মান পেয়েছেন। আজ আর সে বিষয়ে তার আগ্রহ নেই। এবার জীবনটা মহাকালের সংগে মিলতে পারলেই তিনি সমধিক খুশী হন।—

"খ্যাতি-যশে মোর আর নাই কোন লোভ,
অপযশে আর হয় না আমার ক্ষোভ।
যশ পিপাসায় হয়ে তাই উদাসীন।
এসেছে আমার তৃষ্ণা-জয়ের মন্ত্রজপার দিন॥" (যশোতৃষা)

জীবনের দীর্ঘ আটটি দশক ধরে তিনি বহুসঙ্গী পেয়েছেন। অত্যন্ত নিকটতমসঙ্গী পেয়েছিলেন স্ত্রীরূপে সুকৃতিদেবীকে কিন্তু কয়েকবছর গত হ'ল তিনি পৃথিবী ছেড়েছেন। কবি তাই একান্ত আপনজনকে হারিয়ে এই বৃদ্ধবয়সে নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গের পথে তাঁর সান্ত্বনা নেই। তবুও আত্মোপলব্ধির নিরিখে তিনি ভাবেন, একা এসেছি—একাই যেতে হবে, সঙ্গী কেউ-ই হবে না—

"সাথীহারা হয়ে চলিতেছি পথ ব'লে
ক্ষোভ নেই তাই গোধূলি বেলায় একলাই পথ চলি॥"

কিন্তু এই পথ চলা তাঁর আর সহ্য হচ্ছে না। নিঃসঙ্গ হয়ে চোখবুঁজে বসে থাকেন কবি। মনে

পড়ে কত কথা, চোখের সামনে ভেসে উঠে বিগতদিনের বিচিত্র স্মৃতি। সবচেয়ে তিনি পীড়িত হন মায়ের স্মৃতিতে—চোখ জলে ভরে আসে। অনেক কষ্টকরে রোগজর্জর কবিকে তিনি মানুষ করেছিলেন। আজ তিনি নাই। কিন্তু তাঁর দেওয়া স্নেহময় পরশটুকু কবির মনে প্রত্যক্ষীভূত হচ্ছে। কবি কাঁদছেন নীরবে—মা'কে তিনি স্বোপার্জিত পয়সায় ভরণ-পোষণ করতে পারলেন না। তার অনেক পূর্বেই—কবির ছাত্রাবস্থায়—তিনি বিদায় নিয়েছেন। জীবিতাবস্থায় মায়ের সামান্যতম সেবাও তাঁর দ্বারা হ'ল না। এই দুঃখ তার মনকে ভীষণভাবে ভারাক্রান্ত করে তুলছে—

"জনি জানি কোনদিন
পরিশোধ করা যায় না মায়ের ঋণ।" (আমার মা)

তাই তো তাঁর মাতৃহারা কবিআত্মা নীরবে অশ্রু ঝরায়—

"আজ শুধু কাঁদি চির অপরাধী আমি যে কুসন্তান।" (ঐ)

এমনিধারা বিগতদিনের হৃদয়বিদারী দুঃখকে কবি নিরস্ত করতে পারছেন না মন থেকে। সেই জন্যেই পুরুষোত্তমের চরণপ্রান্তে ঠাঁইটুকু নিতে যেন তিনি শশব্যস্ত—

"দিন ত ফুরায় আঁধার ঘনায় পশ্চিমে ডুবে চাকী.
গোধূলি-ধূলায় বুঝিতে পারি না পথ কতটুকু বাকী।" (নিঃসঙ্গ পথে)

জীবনকে এইভাবে তিনি সুখে-দুঃখে পূর্ণ করেছেন। বোধকরি কিছু বাকি ছিল। তাই সার্থকতার সংগে পূরণ করলেন "পূর্ণাহুতি"'র পুঁথিতে। অতি সাধারণ, অত্যন্ত নিকটের, একেবারে আপনজনের সহজগ্রাহ্য কথার ঠাস্‌বুনুনিতে কাব্যগ্রন্থটি আদ্যন্ত সুলিখিত হওয়ায় বাংলাদেশের খাঁটি কবিশেখরকেই আমরা নিবিড় করে পেয়েছি। জীবনানুভূতির এমন শান্ত তরঙ্গে কারও হতাহত হওয়ার আশংকা নেই।

জীবন-সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে কবি সাহিত্য সাধনার পুরস্কার গেলেন—রবীন্দ্র-পুরস্কার। এই পুরস্কার পাওয়ার জবানীতে তাঁর শ্রদ্ধান্বিত সৌম্য ও শান্ত রূপটিকেই লক্ষ্য করেছি। কোন গর্ব নয়, কোন উচ্ছ্বাস বা চাপল্য নয় —নেহাৎ সাদামাঠা বিনয়ামৃত ভাষা—

"মাথায় থুলাম দেশমাতার স্নেহের নিদর্শন
ভাতায় না তা, মাতায় না, তিতায় দু'নয়ন।" (সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত)

স্মর্তব্য, তিনি কারো নন, তিনি সকলের—"আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নয়" এই-ই তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি।

·

রজতকুমার পাঞ্জা

দীনবন্ধু মিত্রঃ কবি ও নাট্যকার—মিহিরকুমার দাশ॥ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা দশটাকা॥

একদা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের দৈন্য নিয়ে হাহুতাশ করার রেওয়াজ ছিল। অধুনা বাংলা সমালোচনা গ্রন্থের প্রাচুর্যই অনেকের কাছে আপত্তিকর মনে হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, এই সমালোচনা গ্রন্থগুলি নিতান্তই 'অ্যাকাডেমিক' ধাঁচে রচিত হওয়ার ফলে এগুলির মধ্যে মৌলিকতাতো কিছু নেইই, উপরন্তু সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের সঙ্গে কোনো যোগ না থাকায় এর মূল্য সাময়িক ও যৎসামান্য। বিশেষত, যাঁরা নিজেরা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যকর্মে নিযুক্ত। তাঁরাই 'অ্যাকাডেমিক' গ্রন্থাদির প্রতি তিক্ত আক্রমণ করে থাকেন, এবং প্রায়শই তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল অধ্যাপকসমাজ এবং বিশেষভাবে 'থিসিস' গ্রন্থ। বলাবাহুল্য, এই আক্রমণের মধ্যে যুক্তির সন্ধান ততখানি পাওয়া যায় না, যতখানি দেখি বিদ্বেষ বুদ্ধির প্রকাশ। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য-কর্ম কাম্য, সে কথা কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবিচার ও সমালোচনার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। প্রতিদিন বাংলা ভাষায় যেসব কবিতা-গল্প-বই উপন্যাস-নাটক লেখা হচ্ছে, সেগুলি সবই উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্মের নিদর্শন নয়,—তার মধ্যে অনেক আবর্জনাও সঞ্চিত হয়ে চলেছে। ক্ষমতা যাঁর সীমাবদ্ধ, তিনি সাহিত্যের যে ধারাতেই হাত দিন না কেন তাঁর নিন্দা করা সহজ। এক্ষেত্রে সৃষ্টীধর্মী সাহিত্য ও সমালোচনা সাহিত্যের মধ্যে কোন পদার্থ নেই। বাংলা সমালোচনা গ্রন্থ সব সময়ে উৎকৃষ্ট সমালোচনার নিদর্শন নয়, লেখকের সামর্থ্য অনুসারে গ্রন্থের উৎকর্ষ-অপকর্ষ ঘটে। অন্যদিকে 'অ্যাকাডেমিক' সমালোচনার প্রতি নাসিকাকুঞ্চন করা সহজ: কিন্তু সাহিত্যের মান নির্ধারণ, উচ্চমান রক্ষা, বিস্মৃত প্রায় সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্মের পুনরুদ্ধার অধ্যাপকেরাই করে থাকেন। অধ্যাপকদের মান-বিভ্রাট হতে পারে এমন নয়, তবু তাঁদের প্রয়াস-প্রযত্ন মূল্যবান। গ্রীক সাহিত্য বা সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার কোনো প্রয়োজন নেই আশাকরি একথা কেউ বলবে না। শেক্সপিয়র বা শেলি-কীটসকেও হয়তো লোকে এতদিন ভুলে যেত, যদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের চর্চা অব্যাহত থাকতো। সমালোচনা কখনো সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের শত্রু নয়, বরং এজরা পাউণ্ডের কবিতা বা টমাসমানের 'ডক্টর ফস্টাস' উপন্যাস পড়তে হলে সমালোচকের সাহায্য গ্রহণ অনেক সময়ে অনিবার্য। বাংলা সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পাশাপাশি অগ্রসর হয়েছে; আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা প্রাধান্য পাওয়ার ফলে সমালোচনা গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য তাই আদৌ ভীতিকর কোনো ব্যাপার নয়, বরং অধ্যাপকদের গবেষণা গ্রন্থের সাহায্যেই আমরা মধ্যযুগ ও উনবিংশ শতাব্দী সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য জানতে পারছি, অতীতের সাহিত্যকর্ম আমাদের কাছে আরও অনেক বেশি জীবন্ত ও

তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে অধ্যাপক ডক্টর মিহিরকুমার দাশের 'দীনবন্ধু মিত্র : কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থটি উল্লেখ করা যেতে পারে। দীনবন্ধু মিত্রের নাম বা তাঁর দু-একটি নাটকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমরা কত কম জানি, তা আলোচ্য গ্রন্থটি পড়বার পর বুঝতে পারা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নিঃসন্দেহে দীনবন্ধু, কিন্তু এযাবৎ তাঁর পূর্ণাঙ্গ কোনো জীবনী লেখা হয়নি, তাঁর জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে নাট্যকর্মের কোনো যোগ দেখানো হয়নি। দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়েছে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রায় একশো বছর হতে চললো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। শ্রীমিহিরকুমার দাশ সেদিক থেকে বাঙালী সমাজের দীর্ঘদিনের এক আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করলেন, দীনবন্ধুর পূর্ণাঙ্গ জীবনীসহ তাঁর কাব্য ও নাটকের বিস্তারিত আলোচনা করে গত শতাব্দীর কাছে আমাদের ঋণের কিছুটা অন্তত পরিশোধ করতে সক্ষম হলেন।

'দীনবন্ধু মিত্র : কবি ও নাট্যকার' এ যুগে 'অ্যাকাডেমিক' সমালোচনার একটি অত্যুৎকৃষ্ট সার্থক নিদর্শন। দীনবন্ধুর জীবন ও ব্যক্তিত্ব অনেক নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। নীলদর্পণ নাটকের পটভূমি নির্দেশেও লেখকের তথ্য সংগ্রহে নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শুধু তথ্য আবিষ্কার বা উদ্‌ঘাটনেই লেখকের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়নি, তথ্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দীনবন্ধুর জীবন ও সাহিত্যকর্মের যোগসূত্রটিও আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন।

দীনবন্ধুর নাটক সম্বন্ধে শ্রীমিহিরকুমার দাশের মূল বক্তব্যগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নীলদর্পণ নাটকের নিষ্ঠুর পটভূমিকা ও বিষাদান্ত পরিণাম সত্ত্বেও দীনবন্ধুর নাটকগুলির প্রবণ হাস্যরস। দীনবন্ধুর হাস্যরসসৃষ্টির কৌশল লেখক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, এবং রেস্টোরেশন যুগের নাটকের সঙ্গে তুলনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দীনবন্ধুর হাস্যরস কখনো চরিত্রনির্ভর হলেও (যেমন নিমচাঁদ), অধিকাংশ সময়েই তা বাক্‌ভঙ্গি ও বাচনভঙ্গি সর্বস্ব। লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'দীনবন্ধুর নাটকের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক কোনো আলোচনা ইতিপূর্বে যেমন হয়নি তেমনি হয়নি তাঁর নাটকে ছড়া ব্যবহারের। অথচ এই আলোচনায় দীনবন্ধুর নাটকের এক নূতন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।' এদিক থেকে 'দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের ভাষা' পরিচ্ছেদটি অত্যন্ত মূল্যবান অংশ। তবে লেখকের একটি অন্যতম সিদ্ধান্ত বিতর্কমূলক; লেখকের মতে—দীনবন্ধু যে পরিপূর্ণ দেশজ সংস্কৃতির মানুষ, এই ধারণা 'ভ্রমাত্মক'। দীনবন্ধু বিদেশী সাহিত্যভাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই, কিন্তু দীনবন্ধুর হাস্যরসকে লেখক নিজেই 'Bengali Humour' নামে অভিহিত করেছেন এবং দীনবন্ধুর নাটকে ব্যবহৃত ছড়া প্রবাদ প্রবচন বিশ্লেষণ করলে নাট্যকারের লোকায়ত সংস্কারের দিকে ঝোঁক স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

দীনবন্ধু নাট্যকার হিসাবেই বেশি পরিচিত বটে, কিন্তু তাঁর কাব্যগ্রন্থাদি এবং গদ্যরচনাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রীমিহিরকুমার দাশের গ্রন্থে দীনবন্ধুর কাব্য ও গদ্য

রচনার দীর্ঘ পরিচয় ও বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। লেখক ভূমিকায় লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যের নবীন ঐতিহাসিকেরা দীনবন্ধু মিত্রের ছাত্রাবস্থার কবিতা, দ্বাদশ কবিতা ও সুরধুনী কাব্য সম্পর্কে প্রায় সকলেই নীরব।...এর প্রকৃত কারণ দীনবন্ধুর নাট্যকার পরিচয়। কিন্তু দ্বাদশ কবিতা ও সুরধুনী কাব্যে এমন এক কবি ও কথাবস্তুর সন্ধান আছে, যার ঐশ্বর্য কম নয়। দীনবন্ধুর এই অবহেলিত ও প্রায়বিস্মৃত কাব্যকথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস তাই স্বাভাবিকভাবে বর্তমান নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে।' লেখক দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, দীনবন্ধুর ছাত্রাবস্থায় রচিত কবিতাগুলির কাব্যমূল্য সামান্য হলেও এগুলির মধ্যে তাঁর নাটকের ইঙ্গিত আছে। অন্যদিকে 'দীনবন্ধুর দ্বাদশ কবিতার মূলসূত্রে এমন একটি মহৎ বেদনার প্রকাশ আছে যে তাঁর কাব্য রসিক চিত্তকে আনন্দিত করে।' এবং 'সুরধুনী কাব্যে' দীনবন্ধু 'পুরাণে এসে সন্ধান করেছেন তার উৎসমুখ—ইতিহাসে ব্যাপ্ত হয়েছেন দেশকালে এবং বর্তমানে অনুভব করেছেন গঙ্গার সেই কুলপ্লাবী স্রোত ধারার আশ্চর্য ফসলকে।'

দীনবন্ধুর গদ্যরচনার মধ্যে 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' ও 'পোড়া মহেশ্বর' আধুনিক পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও, বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে রচনা দুটি উল্লেখযোগ্য। 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' উদ্ভট গল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন।

'দীনবন্ধু মিত্র : কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থটি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। একালের পাঠক দীনবন্ধুকে নূতনভাবে চিনবেন, তাঁর কাব্য ও নাটকে নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার করবেন—এখানেই শ্রীমিহিরকুমার দাশের প্রকৃত কৃতিত্ব। গ্রন্থের ভূমিকা অংশে দীনবন্ধু-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সমালোচনাগুলির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু দীনবন্ধুর গ্রন্থগুলি প্রকাশকালে সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তারও নিদর্শন গ্রন্থটিতে থাকলে ভালো হতো; আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে সে জাতীয় কিছু সংযোজন সম্ভব হবে।

অলোক রায়

আমি যাঁদের দেখেছি : পরিমল গোস্বামী। প্রকাশক : রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী কলিকাতা দাম বারো টাকা

শ্রদ্ধেয় এবং প্রবীণ সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী রচিত 'আমি যাঁদের দেখেছি' বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান সংযোজন। মোট তিনশ পাতার বই। জেমস্ বণ্ড মার্কা কোন খুনে বা আত্মকথনে বিকৃত নায়কের কোন গোপন কেচ্ছার স্বীকারোক্তি মার্কা আধুনিক বই নয়। বরং সে বিচারে "আমি যাঁদের দেখেছি" রীতিমত অনাধুনিক। ভাষায় এবং বক্তব্যে কিন্তু অনাধুনিক হ'লেও (এ যুগের বিচারে) "আমি যাদের দেখেছি" নির্দ্বিধায় সাহিত্য। উৎকৃষ্ট সাহিত্য। যা কদাচিৎ দু'একখানা হাতে পড়ে।

"আমি যাঁদের দেখেছি" রহস্যকাহিনী নয়। আঙ্গিক প্রধান উপন্যাস নয়। হাল আমলের যে সাহিত্য, যার উপজীব্য ক্রোধ, কাম এবং যার পরিণতি হত্যাকাণ্ড বা গর্ভপাতে (এরও আবার বৈধকরণ হতে চলেছে), যে জাতীয় সাহিত্য "আমি যাঁদের দেখেছি" নয়। উত্তেজিত, ক্রোধান্ধ বা রিরংসু হবার মত কোন উপকরণই এর নেই। অত্যন্ত ঘরোয়া মেজাজে এবং অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ ভাষায় লেখা কয়েকটি জীবন চিত্র। এমন কয়েকজনের স্কেচ যাঁরা নিঃসন্দেহে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বাংলার সাহিত্যকাশে দীপ্যমান ছিলেন। মোট যে একুশজনের জীবনচিত্র এই সংকলনে লিপিবদ্ধ তাঁদের নেতৃত্ব করছেন রবীন্দ্রনাথ। এ সংকলনের শেষ আলোচিত ব্যক্তি সজনীকান্ত দাস। আলোচনার সংগে আছে লেখক কর্তৃক তোলা একুশটি অতি মনোরম আলোকচিত্র। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি কৌতুককর ছবি বইটির সমগ্রন্থের স্বাদ বাড়িয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষ মজার ছবিটি বোধহয় ট্রেনের কামরায় উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠরত বনফুল, এবং তাকে ঘিরে অনেকের মধ্যে গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত একটি স্কেচও বইটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

রীতি অনুযায়ী এ ধরণের বই রচনার একটা উদ্দেশ্য বা প্রেরণা থাকে। এবং পাঠককে যে সম্বন্ধে অবহিত করতে হয় ভূমিকা পাঠে যাঁরা অভ্যস্ত, (সবাই নন) তাঁদের চমকে দেবার জন্য লেখকের মুখবন্ধটুকু স্বভাবতই বাগাড়ম্বর মণ্ডিত হয়ে থাকে। রীতির ব্যতিক্রম এখানেও হয় নি। অর্থাৎ একটি ভূমিকা আছে। এবং "প্রেরণা" সম্পর্কে লেখকের একটি ছোট্ট নিবেদনও আছে। নিবেদনটি পাঠ করে প্রত্যেক পাঠকই সচকিত হবেন। বাগাড়ম্বর নয়, চমৎকারিত্বের জন্য। মন্তব্যটি তুলে দিচ্ছি। "এই পুস্তকে যাদের কথা লিখেছি, তাঁরা আমার চোখে কেমন, সেই কথাই বলতে চেষ্টা করেছি। এতে মোট একুশজনের কথা আছে,...। এঁদের সবাইকে ভালবেসেছি বলেই লেখার প্রেরণা।... (এবং সম্ভবত পল্লীর মানুষ হওয়াতে পল্লীবাসীর বিস্ময়ও ফুটে উঠেছে আমার লেখায়)''। লেখকের চোখে তাঁরা কেমন, তারও একটা ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। "আমি যে কয়েকজন ব্যক্তিকে একটু বেশি নিবিড়ভাবে দেখেছি, তাঁরা সবাই আমার চোখে কোন না কোন দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। তাঁরা সাধারণের চেয়ে ভাল কি মন্দ, সে প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগে নি। স্বতন্ত্র এইমাত্র।'' এরপরই উল্লেখ করতে হয় দেখা সম্পর্কে লেখকের অভিমত। এখানেও তাঁরই মন্তব্য তুলে দিচ্ছি। "১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে...প্রথম দেখি রবীন্দ্রনাথকে। এই দেখা আমার প্রথম চাক্ষুস দেখা"। কিন্তু এই "বাস্তব দেখা" লেখকের মতে "আংশিক দেখা"। কারণ চোখের দেখা ও মনের দেখায় মিল হয় নি তখনো। আমি মনের চোখে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি বাল্যকালে। সেই প্রথম দেখাকে আমি পরবর্তী দেখার ভূমিকারূপে আমার জীবনে একটা বড় স্থান দিয়েছি।"

"আমি যাদের দেখেছি", এইরকম একুশজন বিশিষ্ট খ্যাতনামাদের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী সম্বলিত একটি অসাধারণ সংকলন গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, লেখক এঁদের ভালবেসেছেন এবং বিস্ময়ের চোখে দেখেছেন। অথবা হয়ত গ্রন্থও নয়। আবেগ উচ্ছ্বাসহীন, সংযত এবং ন্যূনতম কথার ফ্রেমে মোড়া একুশজন মানুষের পূর্ণাবয়ব রেখাচিত্র। যেন এক বিচিত্র ও অভিনব চিত্রশালায়

দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে এবং একটার পর একটা ছবি দেখতে দেখতে আমরা প্রায় অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে চলেছি বিস্মিত ও পুলকিত মনে। এ বিস্ময় ও পুলকবোধ অযাচিত নয়। লেখকই এদের গড়ে তুলেছেন তাঁর অননুকরণীয়, সংযত এবং চাতুর্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে। ভাষা ও বর্ণনায় প্রত্যেকটি থেকে প্রত্যেকটি আলাদা। যেন একুশজন সম্পর্কে একুশটি স্বতন্ত্রলিপি। এ কুশলতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই মনে বিস্ময় ও পুলকবোধ জাগায়। ভাষা কোথাও চিত্রধর্মি, কোথাও তরঙ্গায়িত স্রোতস্বিনীর মত বেগবতী আবার কোথাও রীতিমত গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণী।

বইখানির সব সম্পদ কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে নিহিত নেই। শোনা যায় সব মহৎ সৃষ্টিতেই শিল্পীর মাত্রাবোধের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এ ক্ষেত্রেও সেটি অনুপস্থিত নয়। এত মানুষের মিছিল যাঁদের অনেকের সংগেই লেখকের সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা কোন আলোচনার অবকাশ রাখে না! তবুও লেখক নিরপেক্ষ। বইখানির সর্বাধিক মাধুর্য বোধহয় এই মাত্রাবোধেই। লেখাগুলির মধ্যে লেখক কোথাও সোচ্চার বা প্রকট নন, উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে। তাঁর উপস্থিতি যেখানে অনিবার্য এবং শিল্পানুগ, মাত্র সেখানেই তাঁকে আমরা পাই।

যাঁদের কথা লেখক বলেছেন তাঁদের অনেককেই আমরা জানতাম অসম্পূর্ণভাবে। কোথাও কোথাও বা শুধু তাঁর নামটির সংগেই মাত্র পরিচয় ছিল আমাদের। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে এঁদেরই সবারই একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট দিক আছে। তাঁদের জীবনের ছোট ছোট নানা ঘটনা, তাঁদের রচনা থেকে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি, ইত্যাদির সাহায্যে সেই স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট দিকটি ছোট্ট একটি টীকা বা মন্তব্যের সাহায্যে তিনি প্রতিভাত করেছেন। একে হয়ত আবিষ্কার বলা যাবে না (লেখকও আবিষ্কার বলতে নারাজ), তবে নিঃসন্দেহে দৃষ্টিপাতের নূতনত্ব সবচেয়ে আস্বাদনীয় হ'ল পরিণতিতে লেখকের একটি কৌতুককর মন্তব্য। দুএকটার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। চন্দননগরে বোটের ওপর সুধাকান্তকে কবির (রবীন্দ্রনাথ) মৃদু ভর্ৎসনা—অতঃপর তাঁর মনের মেঘ কাটাবার জন্যে কর্তৃপক্ষ পরিবেশিত সন্দেশ ও চমচমের উল্লেখ। যা শুনেই কবি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এরপরই লেখকের মন্তব্য। "আর ঠিক এই চাঞ্চল্যের মুহূর্তে প্রকাণ্ড একখানা পরাতে থরে থরে সাজানো সন্দেশ এসে হাজির হল। কবি-মগজের স্বাদ-কেন্দ্রে এতক্ষণ যে আনবিক বা মোলিকিউনার চাঞ্চল্য ঘটেছিল তা থেমে গেল, সেই স্বাদ থেকে গ্যাসটেটরি ও অলফ্যাকটরি স্নায়ু বেয়ে একটা আনন্দ স্রোত একবার বাইরে একবার ভিতরে ছুটতে লাগল। পুলক দৃষ্টি-স্নায়ু বেয়ে চোখের তারায় নাচতে লাগল"। পরিশেষে তাঁর তখন মন্তব্য, "সন্দেশের প্রতি লোভ কবি ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে আমি বিশ্বাস করি," যেমন অদ্ভুত ও সরস তেমনি নির্মম সত্য।

অথবা মনে করুন প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত উক্তিটি! প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত লেখা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের ভুল বোঝা এবং তারপর তেড়ে আসা ব্যাপারটা বীরবল খুব সাধারণ ভাবে দেখতেন না। এ তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক। এ ব্যাপারে তাঁর মত ছিল, ভুল বুঝে তেড়ে আসার চেয়ে, না বুঝে চুপ করে যাওয়া ভাল। এই সময়ই লেখকের সংগে প্রমথ চৌধুরীর জি. কে. চেস্টারটন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। লেখকের তখন চেস্টারটন ভাল করে পড়া ছিল

না তাঁর কথাটাই তুলে দিচ্ছি। "যাই হ'ক, প্রমথ চৌধুরীর কথায় আমাকে চুপ করে যেতে হয়েছিল, কারণ ঠিক কোন বই পড়ে বিরক্ত হয়েছেন তা আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল।……তবে বুদ্ধি করে সেদিন নিজেকে তাঁর কাছে এক্সপোজ করি নি।" এই সরল উক্তিটির জন্যেই প্রমথ চৌধুরী আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কিংবা মনে করুন রাজশেখর বসু সম্পর্কে লেখকের প্রথম পরিচিত প্যারাগ্রাফটি! "রাজশেখর বসু সম্পর্কে কিছু লিখতে বসলেই কোন্ প্রসঙ্গ থেকে আরম্ভ করব, এ হয় একটা সমস্যা। একদিকে সাহিত্যকর্মে রঙ্গ, ব্যঙ্গ, পরিহাস, অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব শান্ত প্রকৃতি, অনাড়ম্বর জীবন, অপূর্ব নিয়মনিষ্ঠা। আরও একদিকে স্নেহ প্রবণতা এবং বারো-তেরোটি পোষা বিড়াল। আরও একটা দিকে রামায়ণ, মহাভারত ও অভিধান।" আবার অন্যত্র তাঁর আর একটি উক্তি। "তা হলে এ পর্যন্ত রাজশেখরের জীবনের দুটি ঘটনা পাচ্ছি,—অহিংসা+আড্ডা। এর পরে আরও প্লাস চিহ্ন বাড়বে।" মনে ত' হয় এর বাইরে রাজশেখরের উল্লেখযোগ্য দিক আর কিছু নেই। আপনারাই বলুন! দৃষ্টিপাতের নতুনত্বের সঙ্গে মন্তব্যের এই সরলতা বইটির একটি আশ্চর্য অলংকরণ।

এ-যেন কোন বিশাল পটভূমিকার ওপর লেখা এক মহাগ্রন্থ। যে মহাগ্রন্থের নায়ক স্বয়ং লেখক। তার এক একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ এক একটি চরিত্রকে ঘিরে ক্রমবিকশিত। পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে কোন পারম্পর্য নেই। যেমন নেই চরিত্রগুলির মধ্যে। লেখক কোথাও দৃশ্যত উপস্থিত নন। তবুও বইটি শেষ করার পর লেখকের অনুভূত ভাবরূপটিই প্রধান হয়ে ফুটে ওঠে পাঠকের মনশ্চক্ষে। মনে হয় তিনিই নায়ক। অন্য সবাই পার্শ্বনায়ক। শিল্প বিচারে এই নির্লিপ্ততা গ্রেট আর্ট বলে সর্বত্র প্রশংসিত।

গ্রন্থটিতে অনেকগুলি কৌতুককর ঘটনা ও মজাদার কাহিনী আছে। ধরতাই হিসেবে তার কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন, চন্দননগরে বোটের মধ্যে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে কবির (রবীন্দ্রনাথের) মৃদু ভর্ৎসনা, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর আত্মকথার খানিকটা উদ্ধৃতি, বিহারীলাল গোস্বামী কৃত Complementary colour এর উপর ফর্মুলা, [আমাদের ছেলেবেলায় appropriate prepositionএর ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা এইরকম ফর্মুলা শিখেছিলাম। যে ফর্মুলা এখনও ভুলি নি], সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের একটি আশ্চর্য কৌশলপূর্ণ কবিতা রচনা, 'খাইয়ে' চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের গল্প (তখন তাঁর বয়স ৭৭), বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পাঁজি পাঠানো অথবা তাঁর সঙ্গে সার্জনস্টীন সাহেবের সাক্ষাৎ, হেমেন্দ্রকুমার রায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, নলিনীকান্ত সরকারের বাংলা ক্রমওয়ার্ড, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নৈশ তর্ক সভা, গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগে গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগলের সাময়িক দ্বন্দ্ব, নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রকাশের চমকপ্রদ ইতিহাস, সজনীকান্ত দাসের 'মাইকেল বধ কাব্য' ইত্যাদি এ ছাড়াও আরও অনেক আছে। এবং আশাকরি মনোযোগী পাঠক তা খুঁজে পাবেন।

রবিশেখর সেনগুপ্ত

SPECIALITIES

Sanforized :

Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH

Printed :

Voils
Lawns Etc.

in Exquisite Patterns

A
R
U
N
A

Regd. No. C 315 Phone : 23-5155 February '70 (0'50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
পরিণামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকনা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—সমকালীন 'প্রবন্ধের পত্রিকা'।

'সমকালীন'-এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্যগ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

Statement in Form IV of the Registration of News Papers (Central) Rules, 1956.

SAMAKALIN

1.	Place of Publication	Calcutta.
2.	Periodicity of its Publication	Monthly.
3.	Printer's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
4.	Publisher's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
5.	Editor's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
6.	Name and address of individuals who own the newspapers and partner or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Anandagopal Sengupta. *Proprietor.* 24, Chowringhee Road. Calcutta-13.

I, Anandagopal Sengupta, hereby declare that the particulares given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Sd.) A. G. SENGUPTA.

Dated, 1st March, 1970. *Signature of Publisher,*

সপ্তদশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মর্ডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

হলদে-সবুজ-সাদা-কালো

মানসী দাশগুপ্ত

ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে 'ট্র্যাডিশন' এবং 'মডার্নিটি'। এ নিয়ে বিদ্বজ্জন সমাজে কিছুকাল যাবতই আলাপ আলোচনার রেওয়াজ হয়েছে। এ কথা ত প্রায় প্রবাদ বাক্যে দাঁড়িয়েছে যে আমরা এ দেশে এক পর্বান্তরিক বিহ্বলতার মাঝখানে কাল কাটাচ্ছি, আমাদের ঐতিহ্যের নোঙর গেছে ছিঁড়ে, আর আধুনিকতার কোনোপ্রকার ফলবান তীর আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। কতদিন এ ভাবে ভাসব কেউ জানে না, কোনমতে কোথাও কেউ একরকম করে টেনেটুনে এ হালছেঁড়া নৌকোকে সামাজিকতার কোনো সবল কিনারে ভিড়িয়ে দিতে পারলেই আমাদের উৎকণ্ঠার রাত্রি প্রভাত হবে এবং যেহেতু আধুনিকতা অনিবার্য, ঐতিহাসিক কালক্রমকে কেউ পিছু ফিরে যেতে বলতে পারে না। সেহেতু ঐতিহ্য আধুনিকতার মিলনে যে এক জন্মাবে তা হবে আধুনিক ঐতিহ্য। যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তন তো এভাবেই হয়েছে?

হয়েছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু যুগপরিবর্তনের এই নিত্যসহ্য উত্তাপ-উৎকণ্ঠার চরিত্র বিংশশতকের প্রায় শেষ পাদে এসে নানাকারণে কিছু চরিত্র বদলেছে। এর ফলে, পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে আধুনিকতা বহুদিন যাবত সম্পূর্ণ চরিত্রে প্রকাশিত সেখানেও উৎকণ্ঠা আন্দোলনে সমাজমন নিত্য অস্থির।

বেশ কিছুকাল পূর্বে এক মার্কিনী মহিলাপত্রিকায় কেউ লিখেছিলেন, মার্কিনী মায়েরা ছেলেদের "না" বলতে ভুলেই গেছে। দোকানে দাঁড়িয়ে ছেলে একটার পর একটা জিনিষের জন্ম বায়না তুলছে, মা দেবে না, সে অবস্থায় যেখানে বলা দরকার "না ওসব তুমি পাবে না"। সেখানে মা ও সব জিনিষ না-কেনার পক্ষে একশ তেত্রিশ রকম যুক্তি দিয়ে ক্রমাগত কথা বাড়িয়ে যাচ্ছে।

সোজা ভাষায় "না" কথাটি কিছুতে বলছে না, এমন দৃশ্য প্রত্যহ দেখা যায়। কর্তৃত্ব প্রয়োগের এই অনিচ্ছার সংগে কর্তৃত্বে অনাস্থা এবং আপ্তবাক্যে অবিশ্বাসের দৃশ্যত: কোনো যোগ আধুনিক মায়ের তথা আধুনিক মানুষের মনে আছে কিনা তা বলা শক্ত। কিন্তু এগুলি একে অপরকে যুক্তির জালে জড়িয়ে রাখে বলে মনে হয়। সত্যাসত্য, ভালমন্দ, উচিত অনুচিত সবই যুক্তির নিরিখে বিচার করে নেব—এ বোধ মনের ভিতরে যথেষ্ট জেগে থাকলে নিজের বক্তব্যকে কেবলই যুক্তিগ্রাহ্য করবার দায় এসে যাবে এটা স্বাভাবিক। তাতে স্বতঃস্ফূর্ত শাসন-স্নেহের প্রকাশ ও প্রত্যয়ে বাধা পড়ে।

এ দেশে একদা চারযুগের কথা চিন্তাশীলদের মনে আবেদন করেছিল। কোন যুগের পরে কোন যুগ আসবে, ভালমন্দের কী অলজ্ঘ্য বিধানে কালের গতি নির্ণীত হবে—এ সমস্তই মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ভাবে তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কেবল এ দেশে বলেই নয়। সমুদ্রের এপারে ওপারে সর্বত্রই ভালমন্দকে নিয়ে শাদা এবং কালোর সহজ ভাগের ছকে হিসেব মিলানোর প্রবণতা মানুষের ভাবনায় একদা দেখা যেত। সেই সমস্ত চিহ্নিত চিন্তার সুখের কাল তার পরে একদিন ফুরিয়ে গেল। ভাবতে বসলেই ভাবনার প্রাথমিক প্রত্যয়গুলিতে টান পড়তে লাগল, এই টানের জটিলতার যন্ত্রণা হলো আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার অন্যতম প্রকাশ নেতিবোধ। ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ এর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে এক পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক লাল বড়ো সুন্দর করে লিখেছিলেন কথা কটি, যার বাংলা রূপান্তর :

পরিবারের নোঙর নেই, দেশ নেই, ভগবান নেই,—এত নির্ভার শূন্যতা এত না থাকা মানুষের অন্তর বইতে পারে কি ?"

এ কোনো প্রশ্ন নয়, এ কেবল একটি চিন্তা। এ চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, ঝেড়ে ফেলে দেওয়া ঠিক নয় কেননা এই নিঃসঙ্গ নেতিতে পরিপূর্ণ জগত কোনো একজন দেশ-ঘর ভগবানভ্রষ্ট মোরায়েস কিংবা ষষ্ঠিব্রতের সৃষ্টি নয়। অসংখ্য মানুষ আজকের দিনে এদেশে-ওদেশে প্রতিভা এবং অপ্রতিভতা নিয়ে এমনি জগতে এসে দাঁড়াতে চাইছে কিংবা দাঁড়িয়েছে যার বেগে তার নাম আধুনিকতা। এবং এ আধুনিকতার প্রবাহ কোনো একটি ভগীরথ মাথায় করে নামিয়ে নিয়ে আসেননি। আধুনিকতার সৃষ্টি প্রতিভাশালী সাহিত্যিকদের হাতে হয়নি। প্রতিভাশালী একজন, দুজন কি তিনজন যা করে থাকেন, এক্ষেত্রেও করছেন তা হল সাধারণ কিন্তু সমদরদী মনের যে ভাব, যা-মেজাজ তা তাঁরা ফুটিয়ে তুলছেন সূক্ষ্ম আঙ্গিকে, পরিচ্ছন্ন রেখার ব্যবহারে। কাব্যে, চিন্তাশীলতায়, অস্তিত্বে। এ মেজাজের মূলে কাজ করেছে যুগের বেগ এবং বিজ্ঞানমুখিনতা।

আধুনিকের মন আজ ঘরে থেকেও পরবাসী, দেশে থেকেও দেশান্তরী, বিশ্বজগতে বাস করে বিশ্বস্রষ্টার চিন্তায় বিমুখ। ঐতিহ্যগত কোনো মূল্যমান বিনাসন্দেহে গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক, অথচ নূতন কোনো দিশার সন্ধান মেলেনি তাদের। এ অবস্থায় যারা স্বভাবতঃ শান্ত সমাহিত প্রকৃতির তারা অস্থির হয়ে উঠলেও কটু হয়ে ওঠে না। যাদের ব্যক্তিত্বে শান্ত রসের চেয়ে অধিকতর উত্তেজক কোনো রসের ধারা বইছে তাদের তীক্ষ্ণতা তিক্ততা অন্যের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে।

স্পষ্টতঃই এ সব সমস্যার উদ্ভব হয় তাদের নিয়ে যারা নিজেদের বিষয়ে, অন্যের বিষয়ে,

অন্যান্য নানা বিষয়ে চিন্তা করে ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয় বা হতে চায়। আধুনিকতার প্রশ্ন এদেরই ঘিরে, দ্বন্দ্বও এদের নিয়ে কেননা এরাই যাথার্থ আধুনিক। ভাবনাচিন্তার অভ্যাসকে আধুনিতার একটি সামান্য লক্ষণ হিসেবে ধরতেই হবে যেহেতু বিনাচিন্তায় যদিও ঐতিহ্যে গা এলিয়ে থাকা যায় বুঝে এবং না বুঝে, বিনাচিন্তায় ঐতিহ্যের বিপরীতে গিয়ে দাঁড়ানো যায় না। আধুনিক হবার দায় হিসেবে মতামত তৈরী করতে হয় প্রত্যেকটি মানুষকে। এ খুব সহজ দায় নয়, আর, সকলে এ দায় বইতে ইচ্ছুক থাকেন ও না। তাই বহিলক্ষণে যা তখনকার দিনে চলছে, সেই যুগোপযোগী ব্যবহারকে মেনে, সময়কালের পোষাকে, ভাষায় নিজেকে সাজিয়ে তাঁরা আধুনিক বলে নিজেদের চালিয়ে দিয়ে যান। এরকম উপরতলার আলগা আধুনিকদের নিয়ে চিন্তা অল্প। এঁরা হচ্ছেন চিরদিনের "তদানীন্তন"। এই তদানীন্তনতা সমাজ জীবনে ফ্যাশনের মতো আসে যায়, হাল ফেরায়। তা নিয়ে দু'দশদিন কথাও হয়। কিন্তু তার ভিতরে কোনো গভীর প্রত্যয়ের দ্বন্দ্ব নেই। এঁরা অক্লেশে বলে থাকেন, বলতে পারেন, 'আমরা লক্ষ্মী পুজোও করি, টুইস্টও নাচি'—কেননা এ দুই-ই তাদের অঙ্গাবরণ, এর অভ্যন্তরে শূন্যতা আছে কি নেই এ নিয়ে তাঁদের ভাবনার ইচ্ছে, অবকাশ, প্রয়োজন কিছুই দেখা যায় না। এঁরা যেন তদানীন্তনতার একটি ধ্বজা বহন করেন। এই রকম ধ্বজাধারীদের ঐতিহ্য বিমুখ বলা যায় না তাই এঁরা যথার্থ আধুনিকও নন। তবু এঁরা যা করেন, হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে চমকে চমকে ফেরেন অনেক যন্ত্রণা বয়ে যথার্থ আধুনিককেও আজ তেমনি ভেসে যেতেই হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ তাই হবে। কেন, সে প্রশ্নে পৌঁছবার পূর্বে এ মিল সত্বেও তদানীন্তন, এবং আধুনিকের প্রভেদ নিয়ে কটি কথা এখানেই সেরে রাখা হলো। তদানীন্তনেরা সর্বকালে সর্বদেশে 'তৎকালে' উপস্থিত থাকায় আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যের পরিচ্ছন্ন আলোচনা কঠিন হয়ে ওঠে। ইদানীং আধুনিকতার সঙ্গে মনঃকষ্টের কোনো সঙ্গত, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখতে না পেয়ে তদানীন্তনেরা বিচলিত, কখনো বা বিরক্ত হয়ে আধুনিক কবিতা কথা সুর কাহিনীকে ত্যাজ্য বিবেচনা করেন। যে প্রত্যয় দ্বন্দ্বে আধুনিক মন আন্দোলিত সে প্রত্যয়ে দ্বন্দ্বের যথার্থ ভাগীদার নন বলে যে তদানীন্তনেরা আন্তরিক ঐতিহ্যসাধকের গভীর প্রত্যয় প্রবণতার অংশীদার এমনও নয়। প্রত্যয়ের প্রয়োজন নেই এমন এক প্রত্যয় দিয়ে নিজেদের চালাতে পারলে এঁরা অধিকতর শান্তি পেতেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু এ প্রয়োজনের তাগিদ এঁদের ভিতরে খুব জোরালো বলে মনে হয় না। "কোনো এক প্রত্যয়ে উপনীত হতে চাই। হতে পারছিনা'—এ বোধের যে যন্ত্রণা তা সেই কারণে এঁদের স্পর্শ করে না। কিন্তু যথার্থ আধুনিকের সংবেদনশীল মন বলতে চায় যে গভীরতর প্রত্যয়ে পৌঁছাব বলেই তো ঐতিহ্যের নোঙর ছিঁড়েছি, প্রত্যয়কে খুঁজে না পেলে আমার চলবে কেন? প্রাচীন গৃহীত অভ্যস্ত প্রথা আর নিয়মনীতিকে অনাস্থা দিয়ে যাচাই করা কেন যদি না দৃঢ়তর কোনো আস্থার সম্ভাবনা থাকবে? এই প্রত্যয়-প্রত্যাশা নিয়ে আধুনিকেরা বারবার এসেছেন, ভেবেছেন, কষ্ট পেয়েছেন। অনুমান করা সম্ভব যে সর্বকালে সর্বদেশে যেমন ঐতিহ্যবাহীরা ছিলেন। তেমনি একটি-দুটি-তিনটি আধুনিকও ছিলেন নূতন প্রত্যয় খুঁজে ফেরার কষ্ট নিয়ে, নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা এ কষ্ট এবং এ বিষণ্ণতাকে যে আজকের সাহিত্যে তীব্র, কিংবা আরও কঠিন করে বললে, কটু এবং কষায় ঠেকছে তার

কর্মগত কারণগুলি নিয়ে অনেক বলাবলি হয়েছে। সে কথা নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করে একটু বললেই চলবে যে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে যান্ত্রিকতার দ্রুত প্রসার এবং অসহ্য রোগবৃদ্ধি মানুষকে কক্ষভ্রষ্ট করেছে—সে আজ বহুদিন হলো। এ অবস্থার কোন প্রতিকার ঘটা দূরের কথা এরই মাঝখানে দুই মহাযুদ্ধ বিস্তারিত ধ্বংসব্যবস্থা এবং ধ্বংসাবশেষ নিয়ে দেখা দিয়ে গেল। শিল্প বিপ্লবের চাকায় আনা সুখসমৃদ্ধির অনেক স্থূল পাওয়ার মাঝে মাঝে একটুখানি সূক্ষ্ম পাওয়ার বদলে বড়ো বড়ো হারানোর এবং হারের অভিজ্ঞতায় মানুষের কর্মে মানুষের আস্থা কমে কমে এল। মানুষ রইল কাজের চাকায় বাঁধা ঘণ্টা শুনে, যন্ত্রের দৌড়ে তাল দিয়ে। অথচ কর্মে তার মন স্ফূর্তি পেলনা, মুক্তি পেলনা, এর ভিতরে যে অবসন্নতা তা এই আধুনিক যুগের উপহার। এ অবসন্নতায় শুধু ক্লান্ত করেনা, ক্রুদ্ধ করে, কর্মে অনাস্থা আনে, সেই ক্রোধ এবং অনাস্থার প্রকাশ মার্ক্সপন্থী চিন্তায়।

কর্ম কথায় যেমন মার্ক্স, ধর্ম কথায় তেমনি ফ্রয়েড মানুষের নিজের বলের, দক্ষতার, প্রেমের সব গৌরব ভেঙে দিয়ে গেলেন। মানুষকে শুনতে হলো, জানতে হলো, তার সমস্ত সমাজসত্তার জন্ম অভিশপ্ত, কর্ম অভিশপ্ত, প্রেম অভিশপ্ত। এসব কথা জানতে হলো কেননা,—বিজ্ঞানকে ধন্যবাদ,—মানুষের জ্ঞানের পিপাসা, বিশ্লেষণের প্রবণতা বড় বেড়ে বেড়ে গেল। সবই তার খুলে ছিঁড়ে জেনে নেওয়া চাই। এত জানা, এত বিশ্লেষণ তাকে যেখানে এনে পৌঁছে দিল সেখানে বিচার আছে, বিবেচনা আছে শ্রীও নেই, বিশ্রামও নেই। জ্ঞান পিপাসা, কামের মতোই, জ্ঞানকেই আনে, পিপাসাকে তীব্রতর করে, তৃপ্তি আনে না। সেই অতৃপ্তির দাহ, যত শ্রদ্ধেয় যত মূল্যবান হোক, দাহই, এবং অতনুদাহকারী শিবের মতো আধুনিক মননশীল চিন্তাবীরেরা এ দাহকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে খেদে আধুনিক মনকে ভরে তুলেছেন।

বিজ্ঞানকে যদি এমন করে মূলমন্ত্রের মতো আধুনিক মন গ্রহণ না করত তাহলে বুড়ী পৃথিবীর জরাজীর্ণ বার্ধক্য পেরিয়ে কিছু রহস্যময়তা আজো জগত সংসারকে হয়তো ঘিরে রইতো। তা রইলনা। আধুনিক মন কেবল পৃথিবীর নয়,পার্থিব জগতের নয়, নিয়মনীতি ইচ্ছে অনিচ্ছে ভাললাগা মন্দলাগার মানে খুঁজতে এবং বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা দিতে বেরুলো। সব কাজেরই কারণ আছে। সব অস্তিত্বেরই মানে আছে এবং কারণ খুঁজে পাওয়ার মানে খুঁজে পাওয়ার দায়দাবী হলো মানবিক অস্তিত্বের দায়দাবী—এ সমস্ত প্রত্যয়গুলিকে সিদ্ধান্ত বলে প্রমাণ করার চেষ্টায় তারা যুক্তিতর্কে রত রইলো। এই যুক্তিতর্কের এক চেহারা ফ্রয়েডে অন্য চেহারা মার্ক্সে। বিশ্লেষণে মানুষের জৈব দাসত্ব, খণ্ডতা, বদ্ধতা ধরা পড়লো, মানবচেতনায় যে মুক্তির বোধ, সহজ অস্তিত্বের যে আনন্দ তার কোনো রূপরেখা ধরা গেল না এঁদের চিন্তায়। আজকের দিনের আধুনিকতা যন্ত্রের দাসত্বের গ্লানির সংগে এই সমস্ত নিরাশ্বাস বিশ্লেষণের বিষণ্ণতাকে মিলিয়ে মানুষের মনকে ভার করে তুলেছে। জীবন সুরু হতে না হতেই তার জীবন অসহ হবার জো। এর অর্থ এই নয় যে ফ্রয়েড অথবা কার্ল মার্ক্সের তত্ত্ব সামগ্রিক ভাবে সমস্ত আধুনিক মানুষ জেনেছে বা মেনেছে। কিন্তু আবছাভাবে এই তত্ত্ব সমূহের তাপ আমাদের স্নেহ, শ্রদ্ধা, আশ্বাস-আস্থা, আনুগত্য, উদ্দীপনার মূলগুলিকে শুকিয়ে জীর্ণ করে দিয়েছে। এ কথা আগের চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন হয়ে

দেখা গেছে যে বিশ্লেষণে যা ধরা যায় তা আমাদের কোনো নতুন শ্রদ্ধা, নতুন প্রত্যাশায় ঘেরা নতুন বন্দরের আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে না। একদা নোঙর ফেলার মতো যা কিছু স্থির নিশ্চিত ছিলো তা বিজ্ঞানী আলো ফেলে শিথিল, দ্রব, অবাস্তব করে তুলে চিন্তাশীল অনুভূতি প্রবণ মানুষের মনকে ভাসিয়ে দেওয়া হলো সীমাহীন শূন্যে খুঁজে বেড়াতে। এই শূন্য হাতড়ে ফেরার নামই আধুনিকতা। আধুনিকতা কোনো স্থির প্রত্যয়ী আলো জলা বন্দর নয়। ভেসে থাকতে যে জানে, সেই আধুনিক।

যুক্তিখোঁজা পাগলামিতে এনে আমাদের এই শূন্যে উপস্থিত করেছে বলে কিছু মানুষ থেকে থেকেই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তারাও আধুনিক। তারা কখনো মানবিকতাবাদের নাম নিয়ে আসে, কখনো অস্তিত্ববাদের। তারা প্রতিবাদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করতে চায়, এমনি তাদের ঘোরতর প্রতিবাদী মন। তারা কেন্দ্রচ্যুত হয়েও ভাসতে নারাজ, তারা ডুবে যেতে চায়। অস্তিত্বের বিষণ্ণতার গভীরে। সে গভীরতায় তারা নেতিবাদের বিরুদ্ধে আশা পায়. সে আশার কথা তারা বলে, বলতে চায়। নেশায় মেতে খুশি থেকে আশার ভাষা রপ্ত করার প্রয়াসে তাদের তাই এদেশে ওদেশে নানাভাবে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়, আগেও যেমন দেখা গেছে। আগে দেখা যেত ঐতিহ্যের নিষ্ঠুর চাপে, নিয়মতন্ত্রে। এখন দেখা গেল সম্পূর্ণ অবস্থার সর্বময় বেনিয়মে। কিছু না বুঝে কেবল নিয়মমতে চলো এতেও যেমন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ চলে যায়, তেমনি সম্পূর্ণ করে সমস্তটা বুঝে বিচার করে তবে নিজের নিয়ম নিজে গড়ে চলো এতেও মনে স্ফূর্তি চলে যায়। আনন্দ মেলে না। প্রথম অবস্থার উত্তরে একদা বাঙলা অঞ্চলে আউল বাউল দরবেশ আনন্দের কথা বলতো। আজকের দিনে পশ্চিমী মুল্লুকে ফুলখোকা-খুকুরাও আনন্দের কথা, খুশির কথা বলে সভ্যতার দ্বিতীয় দশায়। মুখে তাদের হাসি লেগে থাকে, ভুলে থাকার হাসি। সব বুঝে ফেলার দুঃখে, সব বুঝতে চাওয়ার দুঃখে, বুঝবার শেষ পর্যন্ত কিছু নেই—একথা বোঝবার দুঃখের হাসি হলো এদের পথ চলার সম্বল।

মানে যে খোঁজার কিছু নেই এ চিন্তার পিছনে কেবল যুক্তিসর্বস্বতা ছাড়াও জাগতিক কিছু পার্শ্বগত কারণও উপস্থিত। বিশেষতঃ উত্তর উনবিংশ শতাব্দীতে এ কারণগুলি বড় কম জোরালো হয়ে উঠেনি। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক মানুষেরই নতুন হয়ে নতুন করে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে বাঁচবার ইচ্ছে দেখা যায়। আধুনিকতা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে স্পষ্টতর করে তুলে এ ইচ্ছাকে বাড়িয়েছে বই কমিয়ে দেয়নি। যারা বুদ্ধিমান, যাদের কিছু দেবার আছে, যাদের যথার্থই বিশেষ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা উপস্থিত, তাদের ভিতরে এ ইচ্ছার প্রকাশ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে এই স্বাভাবিক। আগের দিনে স্বাতন্ত্র্যসন্ধীদের সংখ্যা ছিল কম, এক যুগের স্বাতন্ত্র্যসন্ধীদের বক্তব্য, চিন্তা, প্রকাশ রক্ষা করে পরবর্তীদের মৌলিক প্রকাশ পথকে কণ্টকিত করার ভয় ছিলো অল্প। এক কথায় স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র এমন কঠিন প্রতিযোগিতা সংকুল হয়ে ওঠেনি। কবি যশ প্রার্থীর পক্ষে প্রশ্রয়লাভ সহজতর ছিল। ছাপাখানা, ফিল্ম, টেপ, রেকর্ড ইত্যাদির কল্যাণে পূর্বসূরীর নিত্য প্রসাদও যেমন তার এবং অন্যান্য সৃষ্টিশীল তরুণের মিলত না, তাদের ছায়াও তেমনি এদের আচ্ছন্ন করে দিত না। এতদিনের এত বক্তব্য প্রকাশের পরে, এত অনুভূতি প্রকাশের পরে, বক্তব্য বা

অনুভূতিতে আগে ধরা যায় নি এমন বিষয় তো কমে গিয়েছেই (কত আর বিচিত্র হবে মানুষের মন আর অন্তরঙ্গ জীবন ? কত বা মৌলিকতা দেখানো যাবে বহিরঙ্গের বৈচিত্র্য নিয়ে ?) মৌলিকতার সম্ভাবনা—অন্ততঃ মৌলিকতা নিয়ে গৌরবের সম্ভাবনা কমেছে সেই সঙ্গে। এখন মৌলিকতা আছে কেবল আঙ্গিকে আর ভঙ্গীতে, খেলা প্রধানতঃ তাই নিয়েই। তবু যে তরুণ শিল্পী সাহিত্যিক একেবারে ব্যর্থ যায় না তার কারণ নতুন কেবল নূতন বলেই মুখ ফেরাতে লোকে সেদিকে ফেরে। মূল তার যেখানেই হোক, সে যে অন্য কেউ এতে তার স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান শান্তি পায়। কিন্তু এই সচেতন প্রচেষ্টায়, এই ভঙ্গীর প্রতিযোগিতায় নেমে সময়ে সময়ে নিজেকে ফাঁকা মনে হবে এত স্বাভাবিক। সৃষ্টিশীল কর্মের ক্ষেত্রে এই অর্থহীন নৈর্ব্যক্তিক শূন্যতার চেয়েও গভীরতর শূন্যতাবোধ আনে প্রেমের শুষ্কতায়। সৃজনশীলতায় নিজেকে স্বাতন্ত্র্য খুঁজবে এমন মানুষ ক'জন ? অধিকাংশ মানুষ সে প্রকাশ খোঁজে ব্যক্তিগত প্রেমে। বিচার বিশ্লেষণহীন যে প্রেম মানুষকে আপনবৃত্তে সম্রাট করে, সে প্রেমেরই ভিন্ন রূপে শৈশবে সে থাকে মায়ের কোলের রাজাধিরাজ। এই রাজত্বকে আধুনিক মেজাজ সংকীর্ণ করে এনেছে নানাভাবে। স্নেহ প্রেমের চরিত্র নিয়ে, পাত্রান্তরণ নিয়ে সহস্র কথা উঠেছে পড়েছে, ফ্রয়েড প্রেমের সর্বময় শক্তি এবং আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির মৌলিক বিরোধিতা দেখিয়ে মানুষের জীবনে প্রেমের কামনার ভীষণ করুণ এবং নিষ্ঠুর বৈপরীত্যের কথা বলে ফুরিয়ে উঠতে পারেননি। সেই অসমাপ্ত কঠিন কথনের ঘা এখনো শুকোয়নি, কোনদিন শুকোবে কিনা কে জানে।

অন্যদিকে, সাধারণ সমাজ ঐতিহ্যে এ কথা বরাবরই স্বীকৃত ছিল যে শৈশবে বাল্যে সঞ্চিত যে পাথেয়, তা যৌক্তিক অযৌক্তিক যেমন যা হোক প্রতি মানুষ তার সম্পূর্ণ দায়ভাগী। আত্মীয়জন আত্মীয়জন বলেই গ্রহণীয়। এ তত্ত্ব মেনে নেওয়া আধুনিক মেজাজের পক্ষে শক্ত, কেন না, রুচি এবং বুদ্ধির সম্মতি নেই এমন কোনো কৃতজ্ঞ হৃদয়াবেগ দ্বারা চালিত মানুষের পক্ষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রকম বাঁচিয়ে রাখা শক্ত। এ দ্বন্দ্বে কষ্ট জমে, সে কষ্ট আমাদের দেশে প্রত্যহ অনেকের ব্যবহারে দেখতেও পাই। আমরা একে পর্বান্তরের কষ্ট বলে অভিহিত করে থাকি এবং আশা করি আধুনিকতা তার সর্বপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিয়ে গুছিয়ে গেলে, অনেক বৃদ্ধ নিবাস, শিশু পালন, হাসপাতাল, আশ্রয়াগার তৈরী হলে, যন্ত্রের ব্যবহারে দৈনন্দিন পারস্পরিক নির্ভরতা কমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে এলে তখন আমরা মুক্ত হবো প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্নেহ নির্ভর, আত্মীয়তার ঘেরা টোপ পরানো কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশী যূথবন্ধন থেকে, যুক্তিহীন মুখচাওয়ার হাত থেকে। তখন এ মুক্তি নিতে মনে বাজবে না কেননা সবাই তো সেবাযত্ন সবই পাচ্ছে, কারো কোনো স্বাতন্ত্র্যহানি না ঘটিয়েই পাচ্ছে এর চেয়ে বাঞ্ছনীয় কী হতে পারে ? এর পরে মানুষ বিনাদ্বন্দ্বে, বিনাকষ্টে ব্যক্তিগত রুচি দিয়েই নিজের জীবন কাটাতে পারবে, যাচাই করে বুঝে নিতে জানবে কী হবার জন্য সে এসেছিল, কী তার জগতে দেয় এবং লভ্য ! ধরা যাক এমন হলে। ধরা যাক, একটি সম্পূর্ণ সমর্থ আধুনিক মানুষকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিন্তায় যার জন্মসূত্রের কোনো কৃতজ্ঞতা ছায়া ফেলেনা, যে নিজের রুচি ও বুদ্ধিমত দিন কাটাতে সম্যকরূপে সমর্থ। এমন লোকের পক্ষে আধুনিকতা কোনো বিষণ্ণতা কোনো খেদ আনবে কেন ? যদি না আনে তবে আধুনিকের একক আত্মস্বাতন্ত্র্য নিয়ে চিন্তার

প্রয়োজন ঘটে কেন? ঘটে কেন না ঐ আদর্শ আধুনিকও তো চিরতরুণ হয়ে থাকবার জন্ম জন্মায়নি, চিরতরুণ হয়ে মরবেও না। যৌবনকালেও নানাপ্রকার আধিব্যাধি তাকে ক্লান্ত করবে, দুর্বল মুহূর্তে আশ্রয় খোঁজাবে। নিজের রুচিবুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী যে সঙ্গ, সে সঙ্গ সুখে ওরকম আশ্রয় মেলা শক্ত। সেখানে পরস্পরকে যাচাই করা চলে, ব্যক্তিকে রোজই তার গ্রহণযোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হয়। ব্যক্তি তো সেখানে কারো সন্তান বলে, ভাই কিংবা বোন বলে, আপনজন বলে মান পায়না, "খোকা বলেই ভালবাসি, ভাল বলে নয়" বলে আহ্লাদ করার কোনো সুযোগ কোনো ক্লাব, পার্টি কিংবা গুণীজন সংসদ দেয় না। নিজের দক্ষতা, ভালত্ব ইত্যাদির প্রমাণ দিয়েই যেখানে পরস্পর একত্রে মিলেছে সেখানে "কিছু নেই কেবল আমি আছি" বলেই নিজেকে গ্রহণ করা কিংবা করানো যাবে এমন কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য। কিন্তু দুর্বল মুহূর্তে, ক্লান্তির মুহূর্তে যখন সঙ্গের প্রয়োজন বড় বেশি, কাউকে যখন পরোখ করতে দিতে ভরসা হয়না তখন তবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে মানুষ? আর তেমন দুর্বল ক্লান্ত মুহূর্ত একেবারে আসে না এমন সর্ব শ্রান্তি দ্বিধা মুক্ত সন্ন্যাসী কোথায়? আধুনিক মন হয়ত সে বৈরাগ্য পেত যদি আজকের দিনে মানুষের ভিড এড়িয়ে সঙ্গ পেরিয়ে নির্জনে বসে নতুন তত্ত্বচিন্তার অবসর মিলত। বহুকাল যাবত নির্জনতার সে অবকাশ দুর্লভ হয়ে এসেছে। চারিপাশে অজস্র মানুষ কাজের তাডনায়, অকাজের জনতায় সর্বদাই ঘিরে থাকে, তাদের সংগে একধরণের বোঝা পডা মনের ভিতরে সর্বদাই করতে হয়। সেখানে এই অপ্রতিহতনীয় জনতার ভিতরে নির্জনতা অতি আধুনিক মনকেও কখনো হঠাৎ ক্লান্ত করে, বিষণ্ণ করে! সকলের চোখের দর্পণে নিজেকে অনবরত যাচাই করতে থাকলে নিজেকে দামী বলে মনে হবে এত মূল্যবান ব্যক্তিত্ব অল্প লোকেরই থাকে। অন্যের প্রশ্রয়েই, প্রেমের বা স্নেহের মূল্যেই ব্যক্তিত্বের মূল্য থাকে ধরা। তাকে যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে ছোঁয়া যায় না। তবু যদি বিচার করতে যাচাই করতে সাধ যায়—তাহলে ঘটে মুস্কিল। আধুনিকতার এই মুস্কিলের একটি হাতের কাছের সাহিত্যিক নমুনা হলো 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ। নিখিলেশ স্ত্রীর দেহমন স্বামী হিসেবে অনায়াস দাবীতে সম্পূর্ণ দখল রাখতে অনিচ্ছুক, সে একটি বিশিষ্ট মানুষ বলেই বিমলা তাকে প্রেমের মূল্য দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে এমনটি ভাবতে পারলেই তার আনন্দ। এই ইচ্ছের পরোখ করতে গিয়ে নিখিলেশ নিজেকেও দুঃখে ফেলেছে, বিমলাকেও। অভ্যাসবসে, ধর্মের নামে স্বামীকে প্রণম্যাস্পদ বলে মেনে নেওয়ায় ব্যক্তিসত্তার মহিমা প্রকাশ না পেলেও আরাম থাকে, সেটা সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে বেআব্রু করে দিলে সাধারণ মানুষের যে বিপন্নতা আধুনিক মানুষ নিখিলেশ সেই বিপন্নতাকে নিজের জীবনে ডেকে এনেছে। এ বিপন্নতাকে ভদ্রস্থানা দেবার জন্ম অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিতে ত্রুটি করেননি যে প্রকৃত পক্ষে নিখিলেশ খুব উচুদরের মানুষ, সন্দীপই খেলো এবং বিমলার খেয়ালী রুচিতে অকস্মাৎ সন্দীপ অমন করে সাড়া জাগালেও এ আকর্ষণ তুচ্ছ, মূল্যহীন ইত্যাদি। এটা নেহাতই নিখিলেশকে বাঁচিয়ে দেওয়া, নিজের চোখে—অন্যের চোখে। নিখিলেশ পরীক্ষা দিতে গিয়ে অনুত্তীর্ণ হয়নি—এ কথা বলার চেষ্টা। যদিও এরকম হিসেবে ভালবাসার হিসেব মেলেনা তথাপি সন্দীপ যদি খেলো না হতো, যথার্থ মূল্যবান আকর্ষণীয় মানুষ হতো, তাহলে বিমলাকে অপরাধিনী ভাববার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকত না, কেন না সেক্ষেত্রে বিমলার মন

যোগ্যতরকে বেছেছে। এতে যুক্তির কোনও বাধা তো থাকত না। এতে অবশ্য তার জীবনে মঙ্গল হতো কিনা, নিখিলেশের আনন্দ হতো কিনা সে প্রশ্নের অবকাশ রয়ে যেত। কিন্তু নিখিলেশ যা চেয়েছিল সেই যথার্থ, নিরাবরণ সত্যের মুখ দেখতে পাওয়ার ভাগ্য তার হতো এতে সন্দেহ নেই। এ ভাগ্যকে মেনে সমাজ জীবনে শ্রীবৃদ্ধির মুস্কিল হয়, ব্যক্তি জীবনে আনন্দেরও বাধা ঘটে। সব পরীক্ষায় সব সময়ে বসে যাবার এই আধুনিক সত্যসন্ধী ইচ্ছায় সেই জন্যে সকলের অন্তরগত সায় না থাকতে পারে, নিখিলেশ বেশি উঁচুদরের মানুষ বলেই বিমলার মন চাওয়ার দাবী তার বেশি এমন নয়, স্বামী বলেই, বিমলার জীবনে তার পদক্ষেপ প্রথমে বলেই তার দাবী এই মোটা কথা দিয়েই সামাজিক নীতিবিধান চিরদিন সমস্ত বিমলা এবং নিখিলেশকে একত্রে রেখেছে, রক্ষা করেছে। এতে গৃহের শান্তি এবং ব্যক্তির মঙ্গল বজায় থেকেছে। এতে ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ বা পরীক্ষা হয়নি। ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশের আধুনিক সাধনায় যে কঠিন কষ্টের সম্মুখে মানুষকে বারবার পড়তে হয়, হয়েছে এবং হচ্ছে এতে প্রতিভার স্বাক্ষর বিহীন সাধারণ স্নেহ-প্রেম সন্ধী মানুষের মন শঙ্কিত, ব্যথিত, অস্থির হয়ে উঠেছে। তবু এই আত্মঘাতী আত্মপরীক্ষায় আধুনিক মন লিপ্ত থেকেছে শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক নির্ভেজাল যুক্তি ও সত্যের পিপাসায় তা হয়তো নয়। এরকম ধারণা অনেকের আছে যে সত্যশিবসুন্দরের ভিতরে সত্যকে আঁকড়ে ধরলেই শিবসুন্দর ক্রমে দেখা দেবেন, কিন্তু অসত্যে শিব নেই। আর, যে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা সত্যে নয়, সে সুন্দর অযথার্থ, ক্ষণস্থায়ী, মূল্যহীন।

এ ধরণের কথা থেকে আলোচনা বহুদূরে চলে যেতে পারে যেখানে আধুনিকতার প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক নয়। কেন না এ আলোচনা চিরকালের, দীর্ঘকালের। অপ্রাসঙ্গিকতা পরিহার করে কয়েকটি কথার আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে যৌক্তিকতা এবং মনের সহজ আনন্দে বাঁচার সমন্বয় সাধন সহজ নয়, সম্ভবতঃ সম্ভবপরও নয়। "ভালমন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে" বলে যে হাসি মুখে ফোটানো সম্ভব তা মূলতঃ বৈরাগ্যের হাসি। আধুনিক মনের এ বৈরাগ্য এবং আধুনিক যুগের সম্ভোগের অজস্র উপকরণ এবং সম্ভোগতৃষ্ণা বাড়াবার প্রযত্ন এ দুয়ের কঠিন অসামঞ্জস্য মানুষকে এত ক্লান্ত করবে, কষ্ট দেবে যা ইতিপূর্বে মানুষ সহ্য করেনি, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিশেষতঃ ক্রমাগত যদি সে আশা করে এ অসামঞ্জস্য ঘুচবে, তার সত্যসন্ধিৎসা তাকে মনের মতো করে আনন্দে বাঁচবার পথে পৌঁছে দেবে, আশাভঙ্গের বেদনা তাকে বাজবে এই স্বাভাবিক।

প্রথমতঃ, সত্যকে রক্ষা করলেই শিবসুন্দর—যাকে শিব ও সুন্দর বলে চেনা যায়—দেখা দেবে এ ধারণার কোনো যাথার্থ্য নিরূপণ হয়নি। অনেকে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এ তিনকে একার্থক, সত্যার্থক করে দেন। তাতে এ সব তত্ত্ববিদদের মূল্যবোধের তৃষ্ণা ধরা পড়ে, কিন্তু এ সমীকরণের যাথার্থ্য প্রমাণ হয় না। নিরাবরণ সত্য যখন আমাকে বলে সংসারে তোমার অস্তিত্ব অসংখ্য সহস্রকোটির মধ্যে একটি সংখ্যামাত্র, এটা থাকা এবং না থাকায় কোথাও কোনো অর্থপূর্ণ পরিবর্তন হবে না, তখন সত্যের এই নিস্পৃহ কঠিন প্রকাশে আমার জীবনে সুন্দর এবং মঙ্গল দেখা দিচ্ছে এরকম মনে করা শক্ত। এ কথা তো সত্য যে যতো কাজ আমরা জমিয়ে তুলি, যতো ঘটনা

আমাদের ঘিরে ঘটে, এ সবই আমরা রয়ে গেছি, বেঁচে আছি এই অস্তিত্বের একটা সমর্থন জুগিয়ে যাবার জন্ম। মানবিক অর্থে কোনো সমর্থনযোগ্য কারণ আছে বলে আমরা সংসারে এসেছি এরকম ভাবনাকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করা শক্ত। আমরা আছি বলেই আছি এবং নেহাত যখন রয়েই গেছি তখন বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করা যাক, এর চেয়ে বেশি কিছু বলা, বেশি গভীরে যাওয়া যখন উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠেছে তখন থেকে একই সংগে সময়ের সদ্ব্যবহার করা, সৎভাবে বাঁচার চেষ্টার পিছনে মানবিক সমর্থন খোঁজার প্রয়াসও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেন না ঐ বেআব্রু তুচ্ছতা মানতে আমাদের বড কষ্ট হয়।

সত্য কোনদিন কোনমতে শুভ এবং সুন্দরকেই আমাদের জীবনে এনে পৌছে দেবে এরকম একটা বিশ্বাস না রাখতে পারলে, কেন যেন, অতি আধুনিকের মনও মনে মনে বলতে চায় "আমরা ঠকে গেছি।" আধুনিক লেখায় বক্তব্যে অ্যান্টিরোমান্টিক হওয়ার যে প্রায়-রোমান্টিক ঝোঁক তাতে এ খেদ স্পষ্ট। যা কিছু দেখি সবই গ্লানি, যা কিছু পাওয়া সবই ফাঁকি—এ সবই অভিমানে এই নিত্যপ্রার্থনা ও প্রশ্ন যে—কোন সংবেদনশীল মন অনুভব করতে পারে যে, যা কিছু দেখি দোষ সব পবিত্র হোক, যা কিছু পাওয়া সবই সার্থক হোক—কিন্তু হায়, হলো না কেন ?

রবীন্দ্রনাথ যে অবলীলায় বলেছিলেন,

"যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশ পানে নয়ন তুলে শ্যামল বসুমিতা"

এমনতরো সহজ প্রশ্ন আধুনিক মনে জাগা বড়ো শক্ত। অনেক ঘেঁটে, দেখে, খুঁজে জানা গেছে শ্যামল বসুমতী নয়ন তুলে কখনো কাউকে ডাকেনি। ডাকেও না। পৃথিবীর পথে যেতে অতি অপরূপ নেত্রপাতের অন্তরালে মর্মকথাকে বিশ্লেষণ করলে চিরপ্রেমের কোনও প্রত্যাশাও কোথাও বাঁচিয়ে রাখা যায় না। অথচ এ কী নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা যে এখানে কিশোর-বেলায় ভিজে মাটির স্পর্শ মানুষের মনে রোমাঞ্চ জাগায়, বৃক্ষলতা অন্য কোনোখানের আভাস আনে, সীমাহীন আকাশ বিস্ময় নিয়ে জেগে থাকে, আদিম যুগের প্রথম প্রবল ব্যাকুল ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে অনেক দিনের অনেক কথায়, চেতনার রং রস মিশিয়ে মানুষ যে জগত গড়েছিল তা এখনো রোমাঞ্চিত রহস্য জাগাতে চায়, সমস্ত ছোট খণ্ডিত ইচ্ছে এবং পাওয়া একটি সম্পূর্ণতায় মিলে শান্তি দেবে এ প্রত্যাশায় শৈশব থেকে বার্ধক্যে মানুষ ক্লান্তিহীন পথ চলে।

এ খেদ সহসা যাবার নয়। কর্মের সার্থকতা, প্রেমের নিকষিত হেম উজ্জ্বলতা সব কল্পনার আলোজ্জ্বল দ্বীপ হয়ে গেলে যে নোঙরহীন সাগরে মন ভাসে তাতে খেদ মেটাবার পথের নিশানা নেই। খেদই আধুনিকতার চরিত্র। কোথাও পৌছবার প্রত্যাশা নেই, ভেসে থাকার আনন্দেই ভেসে থাকতে পারাই আধুনিককে সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব দিতে পারে। কেননা আগেই বলেছি, এমনি ভেসে থাকার নামই আধুনিকতা। নোঙর বেঁধে ফেললেই আমরা পৌছে যাব ঐতিহ্যের বাঁধা ঘাটে।

উইলফ্রিড ওয়েনের কবিতা

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা যে সব কবিদের কণ্ঠ খুলে দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে ইংরেজ কবি উইলফ্রিড ওয়েনের নাম কিছুটা লবণ সহযোগেই স্মরণীয়। একদিকে রাজনীতিবিদ্‌দের অপপ্রচার—পিতৃভূমির জন্য প্রাণ দেওয়া অত্যন্ত পবিত্র এবং সম্মানীয় কাজ; আর একদিকে দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সৈনিকের কাজ নিয়ে সীমান্তে রওনা হওয়ার উন্মাদনা—এ দৃশ্য কবি ওয়েনকে এত বেশী চিন্তিত করে তুলেছিল যে তিনি অন্যান্য যুদ্ধের কবি বা উদ্গাতাদের মতন কখনোই যুদ্ধের স্বপক্ষে সওয়াল করতে পারেননি। তাঁরই সমকালীন কবি রূপার্টব্রুকের মতন তাঁর রচনাতে তাই উন্মাদনা, আদর্শবাদ বা আত্মত্যাগের মহিমা কিংবা আর্দ্র ঘনীভূত দেশপ্রেম সামান্যতম স্থানও অধিকার করেনি।

ওয়েনের কবিতাতে লেগেছে এক ম্লান গোধূলির মালিন্য। এক মহতী ব্যথা, বিষণ্ণতা।

ওয়েন উদ্‌ঘাটিত করেছেন যুদ্ধের ক্ষয়িষ্ণু দিক—অহেতুক যুব হত্যার বিভীষিকা। তাঁর কাছে সৈনিকেরা হলো দুর্ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত যুব সম্প্রদায়—ডুমড্ ইউথ, তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

> What passing bells for these who die as cattle ?
> Only the monstrous anger of the guns,
> Only the stuttering rifle's rapid rattle
> Can patter out their hasty visions.
> No mockeries for them from prayers or bells.
> Nor any voice of mourning save the choirs.—
> The shrill, demented choirs of wailing shells ;
> And bugles calling for them from sad shires,
> What candles may be held to speed them all ?
> Not in the hands of boys, but in their eyes
> Shall sheive the holy glimmers of good-byes.
> Tha pallor of girls brows shall be their pall ;
> Their flowers the tenderness of silent minds,
> And each slow dusk a drawing-room of blinds.

এ কবিতার মধ্যেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ওয়েনের মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে কী নির্মম ব্যঙ্গ আস্ফালিত হয়েছে—No mockeries for them from prayers or bells ছত্রটির মধ্যে। তারপর কবিতাটির মধ্যে যত্রতত্র যুদ্ধের বিভীষিকার কথা।…যুদ্ধ মানে অহেতুক ধ্বংসলীলা। তার কোন প্রয়োজনীয় দিক থাকতে পারে না। এ ধরণেরই বিশ্বাস ছিল মানবদরদী ওয়েনের। তাই তাঁর যাবতীয় কবিতার মর্মবাণী হলো করুণা ও সমবেদনা। যুদ্ধের

রণদামামাতে যখন মানব চৈতন্য একাবারেই দেউলিয়া হয়ে গেছে, জীবন শুকিয়ে গেছে ভালবাসা, মমত্ব বোধ আর বন্ধুত্বের অভাবে, তখন ওয়েনের কবিতা পড়ে আমরা যেন বারবার করুণাধারাতেই ফিরে আসি।

ওয়েন যুদ্ধ ফেরতা কবি হয়েও যুদ্ধের কোন আলোকিত সম্ভাবনার দিকের কথা তিনি বলতে পারেননি। যুদ্ধকে আদর্শান্বিত করতে পারেননি তিনি রূপার্টব্রুকের মতন। যাঁরা যুদ্ধের বাস্তবতার দিক সম্বন্ধে উৎসাহী ওয়েনের আবেদন তাঁদেরই কাছে। ওয়েন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যা' দেখেছেন—যে মহতী বিনষ্টির দিক তাই-ই তিনি তাঁর একাধিক কবিতার মধ্য দিয়ে অকপটে বর্ণনা করেছেন।

অতি শৈশবকাল থেকেই তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর মার বক্তব্য এইরূপ:—

"সর্বদাই সে ছিল চিন্তাশীল কল্পনাপ্রবণ শিশু।" তাঁর শৈশবের কবি কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন কীটস। প্রথম পর্বের কবিতায় কীটসের প্রভাব তাই পর্যাপ্ত পরিমাণেই লক্ষণীয়। ১৯১৫ সালে যুদ্ধে যোগদানের পূর্বপর্যন্ত তাঁর কবিতাতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের অবক্ষয় বিশেষ কার্যকরী হতে দেখা যায়।

১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে "সোমসীমান্ত" থেকে তিনি লেখেন—"আমি আর তোমাকে অধিক ঘটনা বলতে পারি না। আমার কোন আশা নেই, কোন অনুভূতি নেই…'। এর কয়েকদিন পর আবার লেখেন তিনি—"ঐ সব সোমের চিত্রাবলী সৈন্যদের কাছে হাসির উপাদান স্বরূপ—কেনসিংটনের ট্রেঞ্চের প্রদর্শনার মতন…ইংলণ্ডের মানুষের আশা করবার কিছু নেই। তারা অবশ্যই উত্তেজনা প্রকাশ করবে। কিন্তু এখন পর্যন্তও তারা উত্তেজিত নয়।"

অতঃপর ১৯১৭ সালে তাঁকে একটি সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কেননা তিনি তখন প্রচণ্ডভাবে স্নায়বিক রোগে ভুগছিলেন। কিছুদিন পরই তাঁকে চালান করা হয় এডিনবার্গের এক হাসপাতালে সেখান থেকে টেনিসনের ব্যক্তিগত দুঃখ সম্বন্ধে তিনি লেখেন—

"বিষাদের জন্য, তিনি কি কখনো মৃত মানুষের মতন কখনো জমে গিয়ে বেঁচেছেন স্বস্তিপেতে? তিনি কি শুনেছেন পানশালার বিলাপ। গোধূলি বা সন্ধ্যার ঘন্টাধ্বনিতে নয়। সকাল, দুপুর এবং রাত্রিতেও খেতে খেতে, ঘুমোবার সময়, বেড়াবার সময় এবং কাজ করতে করতে কখনো কি শুনেছেন পানশালার গভীর বিলাপ, শুনেছেন তার বজ্রনির্ঘোষ, ফিসফিসানি ইত্যাদি? —তাই মনে হয় টেনিসন সর্বদা ছিলেন এক মহান শিশু। আমিও তেমনি থাকতে চেয়েছিলাম। অবশ্য রিমস্ট হ্যামেলকে ছেড়ে।"

যখন স্নায়বিক দৌর্বল্য থেকে তিনি মুক্তি লাভ করছিলেন তখন তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে স্যাসুনের সংগে। স্যাসুন আর তিনি অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হন। স্যাসুন তাঁর দৃষ্টি খুলে দেন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় কঠোর ও অকপট মন্তব্য রাখতে বদ্ধপরিকর হন ওয়েন। সহসা ওয়েন এই চিন্তার মধ্য দিয়েই মনোভঙ্গিমার জগতে সাবলকত্ব অর্জন করে ফেলেন।

এই সন্ধিক্ষণেই জন্মলাভ করে তাঁর প্রখ্যাত ডিস্এবল্ড্ কবিতার এই আশ্চর্য সুন্দর

পংক্তিগুলি :—

One time he liked a blood-smear down his leg,
After the matches, carried shoulder-high.
It was after football, when he'd drunk a peg,
He thought he'd better join—He wonders why...

* * *

Some cheered him how, but not as crowds cheer goal.
Only a solemn man who brought him fruits
Thanked him ; and then inquired about his soul.
Now, he will spend a few sick years in Institutes,
And do whatever things the rules consider wise,
And take whatever pity they may dole,
Tonight he noticed how the women's eyes
Passed from him to the strong men that where whole.
How cold and late it is ! Why don't they come
And part him into bed ? Why don't they come ?

অবশ্যই এ কবিতার উৎস হলো ক্রোধ ; কিন্তু এ কবিতার মধ্যে ক্রোধটাই মূল আশ্রয় নয়। ক্রোধের অন্তে এখানে ফুটে উঠেছে কাঁটার পরিখা ডিঙিয়ে রক্তকমলের মতনই ওয়েনের করুণা। ওয়েন ছিলেন সমকালীন সকল যুদ্ধের কবিদের মধ্যেই সবচেয়ে করুণাঘন। যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর কাব্যমদিরাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। ওয়েনের কবিতার ঐশ্বর্য ছিল অসামান্য—সামান্যকে তিনি অসামান্য করে তুলতে পারতেন। তুচ্ছকে দান করতে পারতেন তুচ্ছাতীতের মহিমা। তাঁর কবিতার মধ্যে তাই দেখি রয়েছে এক সক্রিয় আবেগ—এই আবেগ ছায়াসঞ্চার করেছে তাঁর ভালবাসা, সহানুভূতি, প্রশংসা ও আনন্দের কেন্দ্রমূলে—তা থেকেই তাঁর কবিতা হয়েছে সমৃদ্ধিশালিনী।

ওয়েন যুদ্ধক্ষেত্রে সকলকেই ভালবেসেছেন। শত্রুকেও সমবেদনার বন্ধনে একান্ত করে দিয়েছেন। প্রতিপক্ষের সৈনিককে তাই ভাবতে চাননি শত্রু বলে—পরন্তু যুদ্ধ এবং যুদ্ধবাজদেরই তিনি চিহ্নিত করেছেন শত্রুরূপে ; তাই জর্মান সৈন্যকেও গভীর মমতায় তিনি যুদ্ধের শিকার বলে ভেবেছেন, দেখেছেন তাদেরও দুর্ভাগ্য পীড়িতরূপেই।

শত্রু তাঁর মনে সহানুভূতি জাগিয়েছে। অসীম মমত্বে ছাওয়া তাঁর "স্ট্রেঞ্জ মিটিং" কবিতাটি। এই কবিতার বিষয় একটি দুঃস্বপ্ন বা রূঢ় বাস্তবেরই অবিকৃত রূপ। একটি গভীর সুড়ঙ্গে অর্থাৎ প্রেতভূমিতে তিনি একজন শত্রুসৈন্যের সাক্ষাৎ পান—

It seemed that out of battle I escaped
Down some profound dull tunnel, long since scooped
Through granites which titanic wars had groined.

Yet also there encumbered sleepers groaned.

Then, as I probed them, one sprang up and stared

With piteous recogrition is fixed eyes,

Lifting distressfull hands as if to bless.

এই সৈন্যটি তারই হাতে নিহত হয়েছে—

I am the enemy you killed my friend.

I knew in this dark ; for so you frouned

Yesterday through me as you jobbed and killed.

সৈন্যটি নিজেই তার অকালমৃত্যুর ভয়াবহতা এবং ব্যর্থতা বিবৃত করেছে—

"Strange friend," I said, "here is no cause to mourn"

"None", said the other, "save the undone years,

The hopelessnese......

বেঁচে থাকলে সে অকথিত সত্য প্রকাশ করতে পারতো, 'the pity of war, the pity war disfilled" তাছাড়া—

I would have poured my spirit without stint

But not through wounds ; not on the cess of war.

কিন্তু তার শোকাবহ মৃত্যুতে সেই সত্যবাণী অনুচ্চারিত রয়ে গেল।

"চান্সেস" কবিতাটি অনবদ্য। সর্বহারাদের ব্যথা বেদনাকে কী এক অসামান্য মমতার সংগে ফুটিয়ে তুলেছেন ওয়েন—

One of us got the knock-out, blown to chops,

T'other was hurt like, losim' both 'is props.

An' one, to use the word of 'ypocrites,

'Ad the misfortoo to be took be Fritz.

Now me, I was n't scratched, praise God Almighty.

(Though next time please I'll thank, in for a blighty,)

But poor young Jim, 'e's livin' an' 'e's not ;

'E recokoned 'e'd five chances, an 'e', ad ;

'E' wounded, killed, and pris'ner, all the lot,

The bloody lot all rolled in one. Jim's mad.

প্রতিটি কবিতার মধ্যেই দেখা যায় যে সর্বহারাদের জন্য, রিক্ত ব্যথিতদের জন্য কবির মমতা কী অসামান্যরূপে স্বরিত হয়েছে? দি শো কিউটিলিটি, ইনসেনসিবিলিটি ইত্যাদি কবিতাগুলিতেও ওয়েনের ভাবকল্পনার ঐশ্বর্য এবং যুদ্ধের কবলে কবলিত মানুষের জন্য অসীম মমতা লক্ষ্য করবার মতন। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। অনুরাগীরা সেসব কবিতা অবশ্যই পাঠ করবেন।

ওয়েন যখন ৪ঠা নভেম্বর ১৯১৮ সালে শ্যামবার খাল পার হতে গিয়ে নিহত হন তখন তাঁর কাগজপত্রের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের কবিতাবলীর ভূমিকা লেখা একটি খসড়া পাওয়া যায়। তাঁর যাবতীয় কবিতার মূলভাষ্য এটাকেই বিবেচনা করা যেতে পারে।

This book is not about heroes. English Poetry is not yet fit.
to speak of them.
Nor is it about deeds, or lands, nor anything about glory,
Honour, might, majesty, dominion or power except war.
Above all I am not Concerned with poetry.
My Subject is War, and Pity of War.
The Poetry is in the Pity.
Yet this elegies are to this generation in so sense consola—
tory. They may be to the next. All a poet can do today is.
Warn. That is why the true Poets must be truthful.

যদিও আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে ওয়েনের দান তেমন কিছু অসামান্য নয়, তথাপি ওয়েনকে বাদদিয়ে আধুনিক কবিতার ইতিহাসও রচনা করা যাবে না। অবশ্যই টি. এস. এলিয়টের মতন প্রজ্ঞাদৃষ্টি তাঁর নেই। কিংবা হপকিনস্-এর মতন ঐতিহ্যবোধ। তথাপি একথা মানতেই হবে যে আধুনিক জটিল মনোভাবের তিনিই প্রবক্তা। এবং এই মনোভাবের উপযুক্ত ভাষা ও রীতি তিনিই উদ্ভাবন করেছেন। বক্তব্য অব্যর্থলক্ষ্য করার জন্য তিনি শ্রুতমধুর শব্দের পরিবর্তে কর্কশ শব্দ প্রয়োগ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ছন্দের ক্ষেত্রেও তিনি ঐ একই উদ্দেশ্যে প্রচলিত রীতিকে ভেঙেছেন। বারবার ভেঙেছেন।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত যত কবি সাহিত্যিক জেহাদ ঘোষণা করেছেন, বলাই বাহুল্য, তাদের সকলেরই অগ্রগণ্য হলেন উইলফ্রিড ওয়েন। তাঁরই কণ্ঠ থেকে আমরা সর্বপ্রথম শুনতে পেয়েছি—হে যুদ্ধ! বিদায়।.........

পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের হৃদয়ে শান্তিপ্রিয় কবি ওয়েনের কোনদিন মৃত্যু নেই। চির অমর, চির মৃত্যুঞ্জয় তিনি॥

দক্ষিণের ভরতনাট্য

সুভদ্রা প্রামাণিক

কথাটা ভরতনাট্য না ভারতনাট্যম ? অনুমান করা যায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থশতকে ভরতমুনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'নাট্যশাস্ত্র' রচনা করেন। ভারতীয় নৃত্য ও অভিনয়কলা বিষয়ে এইটি আদি ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। দক্ষিণ ভারতের যে বিশেষ নৃত্যরীতিকে আমরা সাধারণতঃ 'ভারতনাট্যম' নামে অভিহিত করে থাকি তার উৎপত্তি মূলতঃ নাট্যশাস্ত্র থেকেই। সেদিক থেকে 'ভরতনাট্য' বলাই বোধহয় সমীচীন, ভরত কথাটির ইংরাজী প্রতিশব্দের হুবহু বাঙলা তর্জমা থেকে 'ভারত' আর দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যের ফলে নাট্য কথাটির বদলে 'নাট্যমে'র উদ্ভব হয়ে থাকবে।

বলা বাহুল্য যে একটিমাত্র নৃত্যের রীতিনীতি স্থির করবার জন্যই নাট্যশাস্ত্র লিখিত হয় নাই। ভারতীয় অভিনয়কলার সামগ্রিক আলোচনাই ছিল এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। এই প্রশস্ত পরিধির মধ্যে ভারতীয় প্রধান নৃত্যপদ্ধতিগুলি অন্তর্ভুক্ত এইজন্য যে ভরতনাট্য, কথাকলি বা মণিপুরনৃত্যশৈলীর ক্ষেত্রে অভিনয়ের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভিনয়ের রসে ভরতনাট্যের মত লাস্যনৃত্য যতখানি সিক্তিত, বীরত্বপূর্ণ কথাকলি বা ভক্তিমূলক মণিপুরী হয়তো ততটা নয়। তবু পরবর্তীকালের কথাকলি বা মণিপুরী নাট্যশাস্ত্রের বিধিনিষেধের একেবারে বাইরে যেতে পারেনি এইজন্য যে এগুলি কথকের মত অভিনয়-অপ্রধান নৃত্য নয়। স্থান-কাল ভেদে, এ দুটির ক্ষেত্রে, ভরতনাট্য থেকে অল্পবিস্তর পার্থক্য ঘটেছে মাত্র, কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি।

কথকের কথা স্বতন্ত্র। কথক বিশুদ্ধ নৃত্য। তালের নীরস গণিতে কথকের সর্বাঙ্গ আবৃত। অভিনয়ের অবকাশ সেখানে নেই বললেই চলে।

একথা হয়ত সকলেই জানেন যে মুঘল রাজদরবারে কথকের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ফলে তার প্রসার ও জনপ্রিয়তা। তৎপূর্বে অপরিবর্তিত স্বাভাবিক রূপই তার ছিল কিন্তু পরে দরবার-সংস্পর্শে এসে নবাব-বাদশাহের মনোরঞ্জনের মাধ্যম হয়ে ওঠায় এই নৃত্যশৈলীতে রূপান্তর ঘটে এবং ক্রমে নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব বিমুক্ত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। বর্তমান কথক নৃত্যরীতিকে 'ক্লাসিক্যাল' নৃত্য বলা যায় কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

ভরতনাট্য এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল নিয়ে বহু মত পার্থক্য থাকলেও, তাঁর গ্রন্থরচনার পর মোটামুটিভাবে ধরা যায় যে প্রায় আড়াই হাজার বৎসরকাল যাবৎ এ নৃত্যের প্রচলন ও চর্চা হয়ে আসছে। উত্তর ভারতে এ নৃত্যের অল্পবিস্তর প্রসার ঘটেছিল নিশ্চয়, কিন্তু তার প্রভাব কাটিয়ে অচিরকালের মধ্যেই স্বকীয় নৃত্যরীতিপদ্ধতিতে, অর্থাৎ কথকে, অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলতঃ সুদীর্ঘকালব্যাপী এই নৃত্যপদ্ধতি সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারতেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এখনও ভরতনাট্যের সর্বাধিক প্রচলন দক্ষিণ ভারতেই এবং এ নৃত্যের প্রখ্যাত শিল্পীগণের অধিকাংশই দক্ষিণ ভারতীয়।

এই দীর্ঘকালের চর্চা ও চিন্তার ফলে অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ভরতনাট্যে বিবর্তন ঘটেছে প্রচুর। ভরতনাট্য প্রধানতঃ লাস্যনৃত্য হলেও, এই নৃত্যে একদা পুরুষেরাও অংশগ্রহণ করতেন। পুরুষ শিল্পীরা, দেবদাসীদের মতই মন্দিরে মন্দিরে ভগবত-মেলা নাটকে অভিনয় করে দেবতার সন্তোষবিধানে ব্রতী হতেন, যদিচ তাঁদের সংখ্যা ইদানিং কম, নেই বললেই চলে। ভগবত-মেলা এক সময় লুপ্ত হতে বসেছিল। এই বিশেষ পদ্ধতিটির পুনরুদ্ধারের জন্য দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী-সম্প্রদায় ও উদারদৃষ্টি সংস্কৃতিসেবীরা বিশেষ সচেষ্ট হয়েছেন। ভগবত-মেলা নাটক ছাড়া ভরতনাট্যের অপর তিনটি প্রচলিত অংশের নাম: সদীর নাট্য কুরাভঞ্জী ও কুচিপুদি। এগুলির মধ্যে সদীর নাট্য অংশটুকুই দেবদাসীদের অক্লান্ত প্রযত্নে ও নিষ্ঠায় আজকের ভরতনাট্যের রূপ নিয়েছে।

দেবদাসীরা যে মন্দিরলগ্ন গণিকামাত্র এই অপ-ধারণাই এককালে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। অথচ এই দেবদাসীরা যে তৎকালীন কুলললনা অপেক্ষা অধিকতর কলাবিধো ছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান। সম্ভবতঃ, এই-সব গুণপনার জন্যই দেবদাসীরা সেকালে হেয় প্রতিপন্ন হতেন না। উৎসবে পার্বণে আচার-অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতের জন্যে তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ করে আনা হত, পুণ্যকর্মের শুচিতা নষ্ট হবার প্রশ্ন কখনও ওঠেনি তাঁদের উপস্থিতিতে। বংশানুক্রমিকভাবে দেবতার সামনে নৃত্যানুশীলন করে ভরতনাট্যের ধারাটি তাঁরা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

ইংরেজি সভ্যতা প্রসারের ফলস্বরূপ আমরা দেবদাসী-প্রথার শুধু খারাপ দিকগুলিই দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। অবশ্য এই প্রথার অন্তর্গত কতকগুলি অস্বাভাবিক ও অমানবিক দিক আছে যেগুলি যথার্থ নিপীড়নমূলক—তার উচ্ছেদ কাম্য কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই প্রথাকে হীনভাবে গণিকা-পর্যায়ে নামিয়ে আনা সংকীর্ণ অনুদারতা ও একদেশদর্শিতা।

উনবিংশ শতকের শেষদিকে ও বর্তমান শতকের প্রথম দিকে ভারতনাট্যের চর্চা প্রায় বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। দেশীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহকগণ বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এই নৃত্যের ঐতিহ্য ও গৌরব অনুধাবন করে প্রবল আন্দোলনের দ্বারা দেশবাসীকে সচেতন করে তোলেন এবং আইনের মাধ্যমে একে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন। অধিকন্তু অর্ধশতাধিক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যেমন মণিপুরী নৃত্যের প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি দেখিয়ে ভারতীয় নৃত্যকলার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেন তেমনি গণিকাবৃত্তির অঙ্গ বলে খ্যাত যে নৃত্যগীত এতদিন অবহেলিত ও অপাংক্তেয় ছিল, তাকে তিনি সংস্কৃতি ও সমাজ-ক্ষেত্রে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেন যোগ্যসম্মাননার সঙ্গে। কবিগুরু নির্দেশিত বঙ্গ ললনাদের শোভন ও সুন্দর নৃত্যানুশীল অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভদ্র ললনারাও মার্জিত শিল্প হিসাবে নৃত্যকলার চর্চা শুরু করল। দেবদাসীসম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্তিলাভ করে ভরতনাট্য মন্দির-সীমা অতিক্রম করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সহজেই প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করল আপন প্রাণশক্তিতে।

ভারতের রূপাদর্শে 'তন্বীশ্যামা'

ইন্দু রক্ষিত

প্রাচীন ভারতে সাহিত্যে বা কাব্যে দেহশ্রীর অনেক বর্ণনা আছে। আর রয়েছে দৃষ্টিগ্রাহ্য নমুনাও তার ভাস্কর্যে আর চিত্রশিল্পে। বর্ণের পরিচয় ভাস্কর্যে বড় একটা পাবার নয়, তাকে পেতে হয় চিত্রশিল্পে আর অগণ্য যার নমুনা রয়েওছে সঞ্জীবীত অনন্তরূপে অজন্তা গুহামন্দিরে, তার চৈত্য আর বিহারান্দরে। কাব্যে অবশ্য গড়ণ, বরণ, ভূষণ কি আভরণ সবটুকু পেতেও কোন বাধা নেই; তবে চাক্ষুষ নয়, শব্দ, ভাষা আর ছন্দে গড়া সে রূপটি উঠবে ভেসে কল্পনায়। আর বর্ণনার গুণে বেশ বর্ণালী হয়ে সে উঠবে ফুটে রসিকজনের মানস পটে। ঠিক তেমনই এক রূপচ্ছবি এঁকেছিলেন কবি মন্দাক্রান্তা ছন্দে যক্ষকান্তার উত্তর মেঘের পরিচিত এই শ্লোকটিতে—

তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠঃ।
মধ্যেক্ষামা চকিত হরিণাপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ॥
শ্রোণীভাবাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্।
যা তত্রস্যাৎ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥

অতিপরিচিত এ শ্লোক। তবু মনে হয়, এই 'তন্বীশ্যামা' রূপাদর্শ নিয়ে কাব্যামোদী রসিকজনের কিছু সংশয় আছে। বিশেষ করে 'শ্যামা' শব্দটি নিয়ে। কেন না, 'শ্যামা' বলতে আজ সাধারণতই বুঝি আমরা শ্যামবর্ণা, অর্থাৎ শুক্লেতর বর্ণ যে রমণীর, অথচ আধুনিক রুচিতে গৌরাঙ্গীরই সমাদর, হতাদরা শ্যামাঙ্গী। তাই মানতে চায় না আধুনিক মন, যে যক্ষের কান্তা যিনি সে রমণীরতন। অঙ্গবরণটি তাঁর সুগৌর নয় শ্যামলাভাই সে দেহকান্তি! আবার একেবারে আধুনিকই তো নয়, রয়ে গেছে নজীর কিছু পূর্বকালেরও। ভট্টিকাব্যের পঞ্চমসর্গের একটি শ্লোকেও হয়েছিল যে 'শ্যামা' শব্দটির ব্যবহার তারও টীকায় লিখিত হয়েছে বেশ ছন্দিত ভাষায় পরিষ্কার যে শ্যামা সেই স্ত্রী, তপ্তকাঞ্চনাভা যার তনুশ্রী। সংশয় কিছু এখানেও। 'তপ্ত কাঞ্চন' কোন সে বর্ণ? তপ্ত অবস্থায় সোনার সে রূপই বা কি? এ বিষয়টিও বিচারের দাবী করে। তবে সে বিচারে আসা যাবে পরে। টীকাকার মল্লিনাথ কিন্তু বর্ণনিয়ে বলেননি কোন কথা। শুধু বল্লেন শ্যামা তিনিই যিনি 'কৃশাঙ্গী এবং যিনি যৌবনমধ্যস্থা।' বাংলা অনুবাদকদের কেউ মল্লিনাথকে অনুসরণ করলেন, কেউ বা ভট্টিটীকাটির অনুসরণে, আর হয়তো নিজমনেরও অনুমোদনে গৌরাঙ্গীকেই বরণ করলেন। কেউ বা আবার এড়িয়েও যেতে চাইলেন প্রশ্নটিকে। স্বর্গতঃ হৃষীকেশ শাস্ত্রীর অনুবাদ—

"কৃশাঙ্গে যৌবন শোভা দন্তপাতি মনোলোভা
পক্কবিম্ব ফলসব সুচারু অধর॥"

এ অনুবাদ ঝরে ঝরে সুন্দর আর মল্লিরই অনুপন্থী। কবি প্যারীমোহনও লিখেছেন তেমনটিই—

"বিরাজে যেথা সেই তরুণীকৃশতনু দশনগুলি যেন মুকুতা সার"

মল্লিনাথের ভাবে ভাবুক আছেন আরো কিছুজ শ্যামার্থে শ্যামল দূর্বাদলের তারুণ্য কল্পনা করে তৃপ্ত

হ'তে চেয়েছে যাঁদের কবিমন। কবিজনোচিতই এ কল্পনা। বলা চলে রবীন্দ্রনাথের "ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা" এরই সমার্থক বা সমার্থক ব্যঞ্জনা। তবে কথা, শ্যামার্থে শ্যামবর্ণা অস্বীকার কি করে এ ব্যাখ্যা?

পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর গদ্যানুবাদে আবার এই বিশেষ শ্লোকটির বেলায় রাখলেন বাদ নিজ ব্যাখা বা অনুবাদ। আর স্বর্গীয় শাস্ত্রীমশায়ের পদ্যানুবাদটুকু তুলে দিয়েই এড়ালেন প্রশ্নটি, এড়ালেন বাদ বিসম্বাদ। এড়ালেন কিছুটা কবি বুদ্ধদেবও। "তন্বীশ্যামাকে" তিনি তন্বীশ্যামাই অটুট রেখে গেলেন লিখে—

"তন্বীশ্যামা আর সূক্ষ্মদন্তিনী নিম্ননাভি ক্ষীণমধ্যা"

অতএব এক বর্ণও পরিষ্কার বর্ণ কি শ্যামার হ'লো না। কবি নরেন্দ্রদেব তাঁর অনুবাদের প্রথম সংস্করণে লিখেছিলেন—

"বর্ণ যিনি স্বর্ণচাঁপা তন্বীতনু কোমল কায়"

কিন্তু মন তাতে দেখি শেষ অবধি সায় দেয়নিকো; কী মনে করে লিখলেন তিনি নূতন করে পরের সংস্করণে—

"তন্বী তনু বর্ণশ্যামা দন্ত তুষার শিখর হেন।" ১

আর এক অনুবাদকার, ছদ্মনাম যাঁর স্পর্শমণি, লিখেছেন তিনি—

"তন্বী তরুণী সে গৌরী কটিকৃশে করেছে অবনত স্তনের ভার"

অর্থাৎ তরুণী আর গৌরী দুইই বলা হ'লো তাঁর। স্বর্গীয় রাজশেখর বসুও দেখি গৌরবর্ণকেই গ্রহণ করেছেন। এবং আছেন অনেকজনই এমন গৌরাঙ্গীকেই সমর্থন যাঁদের।

যে নজীরে তন্বীশ্যামার গৌরীরূপ নিরূপণ আধুনিক নজরে হ'য়েছে ভট্টিটীকার সে শ্লোকটিতে ছন্দ মধুরতা ও কিছু আকর্ষণ রয়েছে—

শীতে সুখোষ্ণা সর্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখ শীতলা।
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে॥

কল্পনা মধুরও প্রথম পংক্তি। কিন্তু কোন যুক্তি এ দু'টি লাইনে পাইনে 'শ্যাম' শব্দ যদি কৃষ্ণবর্ণবোধক হয় তবে শ্যামাই কেন বা হবে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, কী সে কারণে, ব্যাকরণেরই বা কোন আইনে? ভরত মল্লিকের সুবোধা নামক টীকাটি'র প্রতিষ্ঠায় সুবিস্তারও তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন সুপণ্ডিত যতীন্দ্রবিমল। তিনি উদ্ধৃত করছেন—'শীতে সুখোষ্ণা' নয়,—

শীতে যা চোষ্ণাগাত্রী স্যাদুষ্ণে স্পর্শ শীতলা।
প্রকৃত্যা সুকুমারাঙ্গী সা শ্যামা কথিতা বুধৈঃ॥

এখানে তবে তপ্তকাঞ্চনাভা নয়, সুকুমারাঙ্গী! তবে তো আর কেউই নয়? না মল্লি, না ভরতমল্লিক শুনিনি এ কথা বলেছেন বল্লভদেবও যে শ্যামা সেই নারী গৌরবর্ণা যাঁর দেহবল্লরী।

বাংলা অভিধানে অবশ্য 'শ্যামার' এক অর্থে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা স্থান পেয়েছে। অভিধান সেই ব্যাখ্যাকেই আসনদান করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বা সাহিত্যে। বঙ্গানুবাদে ভট্টিটীকাটির প্রভাবই বুঝি এই অভিধানভুক্তির কারণ। নয়তো প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানের কোথাও শ্যামার্থে গৌরীর কোথাও

উল্লেখ নেই। অমরকোষ, উৎপলমালা, কি মেদিনী কোথাও তো দেখিনি গৌরী বোঝাবার কোনই প্রয়াস! আধুনিক ব্যোটলিঙ্ক ও রোথ (Olto Boethlingk and Roth) বা মনিয়র উইলিয়ামস (Monier Williams) অথবা আপ্তে শিবরাম (Apte Vaman Sivara) কারুরই তো না! এমনকি শব্দকল্পদ্রুমও সে অর্থফল দেয় না! তাঁদের কথায়—শ্যামা যৌবন মধ্যস্থা। কৃশাঙ্গী, অপ্রসূতা ইত্যাদি, এবং শ্যামা তিনি শ্যামাই। আরো ব্যাখ্যা ধরেছেন তুলে এম্ আর কালে (M. R. Kale)। লিখেছেন তিনি টীকায় তার—'অপ্রসূতা ভবেৎ শ্যামা তন্বী চ নবযৌবনা'। এখানে বলা চলে হয়তো গৌরীরও এক অর্থ বাল্য হ'তে কৈশোর দুয়ারে উপনীতা যে বালিকা। কালে দিচ্ছেন আরো এক উদ্ধৃতি বর্ণেরও উল্লেখে যেটি ছন্দিত ভাষায় শ্যামারূপেরই যেন বন্দনা—

"অপ্রসূতা ভবেচ্ছ্যামা শ্যামা চ ষোড়শ বার্ষিকী।
শ্যামা চ শ্যামবর্ণা চ শ্যামা মধুরভাষিণী ॥"

তবে দেখা যাচ্ছে প্রকৃত শ্যামা যে নারী তিনি স্থূলাঙ্গী নন, তন্বী সুকুমারাঙ্গী; বিগত যৌবনা তিনি নন, নন তিনি সন্তানের জননী; উদ্ভিন্ন যৌবনা ষোড়শী তিনি, মধুর ভাষিনী, অথচ সকল নারীত্ব গুণেরই তিনি অধিকারিণী এবং তিনি লাবণ্যময়ী শ্যামবর্ণাও। কিন্তু কে? গৌরীর বা গৌরবর্ণের কোথায়ও উল্লেখ তো দেখি না? তবে? তবে সে কথা বলার ভার বৈয়াকরণের, বলার ভার রসিকজনের। শব্দগত অর্থে শ্যামা গৌরী কি না সে আলোচনা হয়তো অনধিকার প্রবেশই আমার মত ভাষানভিজ্ঞের। তবে যেটুকু ছায়াপাত করেছে মনে তা হ'লো—সে কালের সে শ্যামা অর্থে একালের শ্যামবর্ণা বুঝতে হ'লেও কোন ক্ষতি ছিল না, খেদও কিছু ছিল নাকো। তাতে করে মতভেদ হ'তোও না ঐতিহাসিকের। শিল্পী হিসাবে এখানে উল্লেখ করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে অজন্তার মধ্যপর্বের চিত্রকলা এবং গুপ্তরাজকবির কাব্যকলা একই যুগ সংস্কৃতির সন্ততি (সহোদরা, নয়তো সগোত্রা অন্ততঃ) রূপের আদর্শ, রসের আবেদন একই হওয়ার কথা এই দুই কলাবিদ্যার। কাব্যকলায় ছন্দে শব্দমাধুর্যে সৃজিত ভাবের যে নিরাবয়ব বাঙ্ময়ীরূপ, দৃষ্টিনির্ভর শিল্পে, ভাস্কর্যে বা চিত্রকলায় আরোপিত হয় সেই ভাবেরই যেন সাকার প্রতিরূপ। অঙ্কনে বা তক্ষণে। দেখা যাবে অজন্তায় চিত্রিত সে মানবজীবন প্রবাহে গৌরাঙ্গী বিরল, বরং চোখে পড়ে অবিরল শ্যামাঙ্গী বা কৃষ্ণাঙ্গী রূপেরই সমারোহ। গৌরবর্ণের বর্ণগৌরবে নন সেখানে গরবিনী রাজকুলকামিনীরাও; শ্যামাঙ্গী বা কৃষ্ণাঙ্গীই প্রায় সব তাঁরা। রাজমহিষীরও কৃষ্ণাঙ্গী হ'তে হয়নিকো কোন বাধা। এমনকি তথাগতের তপোভঙ্গে নিয়োজিতা যে মারকন্যা তারও দেহবর্ণ মোটেই তপ্তস্বর্ণ নয়, যৌবনোচ্ছল সে রূপ লাবণ্য উজ্জল হ'য়েই উঠেছে ফুটে শ্যামশ্রী বর্ণাভায়। তবু অসুন্দর তো এরা কেউই নয়! অতএব স্বচ্ছন্দেই বলা চলবে যে প্রাচীন ভারতের রূপাদর্শে শ্যামলকৃষ্ণ দেহবর্ণের কিছুই কম সমাদর ছিল। মহাভারতের যদুপতি কৃষ্ণই ছিলেন না শুধু কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ অর্জুনও কৃষ্ণা দ্রুপদ কন্যা, কৃষ্ণাজ মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও—

"কালো ব্যাসের কৃপায় আজও বেঁচে আছে বেদের বাণী,
দ্বৈপায়ন সে কৃষ্ণকবি শ্রেষ্ঠকবি তাঁরেই মানি।"

আরো লিখেছেন কবি সত্যেন দত্ত—

"বৃন্দাবনের সেই যে কালো
রূপে তাহার জগৎ আলো…"

তবে এ কয়টি ছত্রে আধুনিক মনের অনুকম্পারই সুর 'কালো'র অনাদরে দরদী কবিমনের সহানুভূতি। অথবা বলা চলে 'কালো'র পক্ষ নিয়ে কিছু ওকালতিই। তাই রূপের কথা বলতে গিয়ে আসতে হ'য়েছে গুণের কথায়। যেমন—

"বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা"। অথবা—
"আকাশ ভরা তারা বিফল কালো চোখের তারা বিনা।" ইত্যাদি

কিন্তু সেকালের সে 'কালোর' প্রেম অনুকম্পা নয়, সহজ আকর্ষণ, সহানুভূতি নয়, স্বাভাবিক প্রীতি। রামায়ণেও যদি বা সীতা অসিতবর্ণা নন, কিন্তু দূর্বাদল-শ্যাম, তিনি সীতাপতি রাম, অনুজ ভরতেরও দেহবর্ণ শ্যাম। আর গৌরবর্ণা যদি বা হিমাদ্রি কন্যা গৌরী, মহিষমর্দিনী দুর্গাও কি তাই? মতভেদ সেখানেও। অতসীপুষ্প বর্ণাভা বলতে কাঞ্চনাভা মানতে ছিল আপত্তি স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির। অতসী নীলাভ তাঁর মতে দুর্গা প্রতিমারও তাই হওয়া উচিত। হয়ও তা কোথাও কোথাও।

যক্ষপ্রিয়ার গৌরাঙ্গী হবার পক্ষে কখনো বা যোগানো হ'য়ে থাকে দু'টি যুক্তি, যা বেশ জোরালোও শোনাবে হয়তো, তবে আপাততঃই। প্রথমটি, কুবের পুরী অলকা ছিল উত্তর পাহাড়ে বা মানস ক্ষেত্রে; অতএব সেখানকার অধিবাসীরা গৌরাঙ্গ যখন, যক্ষপ্রিয়াকেও উচিত তেমনই মনে করা। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ্ (Vincient Smith) এমনই যুক্তিতে চেয়েছিলেন বোঝাতে যে বিচিত্রবীর্য তনয়ের পাণ্ডুনাম পণ্ডুবর্ণহেতুই, যেহেতু পাণ্ডবেরা ছিলেন তরাই প্রদেশের লোক। সে কথা নয় থাক। এখন দেখা যাক এখনকার মানসক্ষেত্র তিব্বতের এক জনবিরল অনুর্বর অঞ্চল, আর পাহাড়ী, গাড়োয়ালী গোর্খাদি আধা বাঙ্গলীয় পীতগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই উত্তর হিমাচল। এখানকার মানুষজন ঠিক গৌরাঙ্গ না হ'লেও পীতাভ তারা, শ্যামাঙ্গ বলা ভুলই। কথা শুধু তখনো তরাই-এ যদি বাস তারা করেও থাকে আর দেহবর্ণ তাদের যদি কৃষ্ণেতর হয়েও থাকে, দেহসৌষ্ঠবও তবে ছিল তাদের নিশ্চয়ই আর্যেতর। বর্ণের কথা নয় বাদই রইলো, সেই ক্ষুদ্রচক্ষু কুঞ্চিত দৃষ্টি পাহাড়ী যুবতীকে কি কোনও রকমে কল্পনা করা যাবে—'চকিত হরিণী প্রেক্ষণা? বরং সম্পূর্ণ এ শ্লোকটির পরিপূর্ণ রূপ হিমগিরির শিলাপীঠে না খুঁজে খুঁজলে পাওয়া যাবে অজন্তা গুহার শিলাপটে; সেখানেই মিলবে তার অবিকল প্রতিকৃতি।

দ্বিতীয় যুক্তি, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠ নাকি গৌরাঙ্গীরই মানায় ভালো। তা হয়তো মানায়; তবু বলতে হয় সেও কি আমাদের আধুনিক অভ্যস্ত রুচির ব্যাপার নয়? নয়তো, যদি কোন তরুণীরূপকে কল্পনা হ'তে সরিয়ে রাখি তবে দেখবো হয়তো শ্যামলিমার পাশে অরুণিমাও কিছু বেমানান নয়। লোহিত, পীত এরা উষ্ণবর্ণ—Warm colour; আর নীল বা নিকটবর্তী স্নিগ্ধবর্ণ বা Cold colour। এখন উষ্ণবর্ণের পাশে স্নিগ্ধের প্রয়োগে বৈপরীত্য সাধন বর্ণযোজনার বিশিষ্ট নীতি। রাজপুত চিত্রের প্রধান উপজীব্যই এই বর্ণবৈপরীতের রীতি। 'শীতে সুখোষ্ণা' বা 'গ্রীষ্মে সুখশীতলা' কথা দু'টি স্পর্শানুভূতির। যদি আসি দর্শনানুভূতির কথায়? অর্থাৎ কর বোলানোর

নয়, দৃষ্টি বোলানোর স্পর্শ সুখটি যদি অনুভব করি কল্পনায় ? তবে বলা যাবে 'সুখোষ্ণা অরুণিমার' পাশে পরম উপভোগ্যই 'সুখশীতলা শ্যামলিমা'। শ্লোকেরই ভঙ্গীতে বলা যায়—

সুখ শীতলা শ্যামাভা পার্শ্বে সুখোষ্ণা চারুণাভা চ।
সুখ দায়িকা সুস্নিগ্ধা এতৎ সুদৃশ্যা চাবলোক্যতে ॥

তন্বীশ্যামার অনুরূপ আরো এক দেহরূপ-বর্ণনা পাবো অতীতের ছায়াপথ বেয়ে দাঁড়াই যদি আরো একটু পিছন পানে যেয়ে মহাকবি হ'তে মহাকাব্যের যুগে, কলিদাস হ'তে বেদব্যাসে। সেখানে দ্রুপদকন্যার বিবরণে 'শ্যামা' শব্দ যেমন যেমন লিখিত হ'য়েছে, শ্যামলাননে বিম্বোষ্ঠও প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। দ্রুপদকন্যার শৈশব ছিল না, যজ্ঞবেদি মূলে উত্থিতা যাজ্ঞসেনী পূর্ণ যৌবনা। তিনি 'দর্শনীয়াঙ্গী, সুভগা, শ্যামা আয়তপদ্মপলাশ লোচনা'—

'কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদি মধ্যাৎ সমুত্থিতা।
সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী স্ব সিতায়ত লোচনা ॥
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী…'ইত্যাদি। (মহা, আদি, ১৬০/৪৪-৪৫)

পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ—'যজ্ঞবেদির মধ্য হ'তে একটি কন্যা উত্থিত হইল যাহার নাম পাঞ্চালী, দেহের কান্তি মনোহর, অঙ্গসকল সুদৃশ্য, নয়ন যুগল সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ ও সুদীর্ঘ, শরীরের বর্ণ 'শ্যাম', এই শ্যামাঙ্গী কৃষ্ণারূপের মহিমা কীর্তন করেছেন মহাভারতকার মনোহর বর্ণনায় আর একবার, বিরাট পর্বে, বিরাট মহিষী সুদেষ্ণার জবানীতে—

গূঢ়গুল্‌ফা সংহতোরু স্ত্রিগম্ভীরা যড়ুন্নতা।
রক্তপঞ্চাসু রক্তেষু হংসগদ্‌গদ ভাষিণী ॥ ২
সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণী পয়োধরা।
তেন তেনৈব রূপেন কাশ্মীরীব তুরঙ্গিনী।
অবালপক্ষ নয়না বিম্বোষ্ঠী তনুমধ্যমা।
কম্বুগ্রীবা গূঢ়শিরা পূর্ণচন্দ্র নিভাননা ॥
কা ত্বং ব্রাহি ভদ্রে নাসি দাসী কথঞ্চণ। (মহাঃ, বিরাট ৮ | ১০-১৩)

বাংলা অনুবাদে বলা চলে—

(তোমার) পেলব শরীরে গ্রন্থি লক্ষণীয় নয়।
সুশোভন সন্নিহিত তব উরুদ্বয়।
গভীরতা তিন আর উচ্চতার সুলক্ষণ ষট্
দেহে বিদ্যমান ;
রক্তিমেরও শুভাঙ্কর পঞ্চগুণ ঘেরি দেহ তট
হেরি শোভমানা
মরালের মত
বাচন ভঙ্গিমা তব
মনোহারী কত !

সুকেশী ও সুবক্ষোজা,
সুশ্যামলীরমা।
সুগঠন বক্ষ শ্রোণী
তুমি অনুপমা।
এ সকল গুণে,
কাশ্মীর তুরঙ্গী যেন
জাগে তাই মনে।
নয়নপল্লব তব সুদৃশ সুচারু বঙ্কিম
বিম্বের সদৃশ;
আননের ওষ্ঠাধর শোভিত উজ্জল রক্তিম,
কটিদেশ কৃশ।
লুপ্তশিরা তনুশ্রী ত্রিরেখাঙ্কিত গ্রাবা
অনুপ আনন তব পূর্ণচন্দ্র নিভা।
দাসী তুমি নহ;
হে ভদ্রে, কেবা সে তুমি
পরিচয় কহ।

যাজ্ঞসেনীর জন্মসময়ে হয়েছিল দৈববাণী। তাই তাঁর নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হ'লো—

'কৃষ্ণেত্যে বাব্রুবন কৃষ্ণং কৃষ্ণাভূত সা হি বর্ণতঃ।' (মহা | আদি ১৬০ | ৫৪)

সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদে—"আর দৈববাণী এই শ্যামাঙ্গীকে কৃষ্ণা বলিয়াছে, এবং ইহার বর্ণশ্যামই হইয়াছে সুতরাং ইহার নাম হইল কৃষ্ণা। অতএব বলতে হয়, প্রথমত ভট্টটীকার আলোচিত শ্লোকটির ওই 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা' বাক্যাংশটুকু বাদে কালিদাসের শ্যামার গৌরী হবার কোন সুযুক্তিই খুঁজে পাওয়া গেল না। অপর পক্ষে, প্রাচীনতর ভারতের সমাজরুচিতে শ্যামবর্ণা 'শ্যামা' রমণী কতটা আদরের অধিকারিণী ছিল সবহ কিছুই তার পরিচয় খুঁজে পাওয়া গেল! আর তৃতীয়তঃ যাকে চাক্ষুষও দেখে নেওয়া, যে সেই সব শ্যামল শুভ্রেতর রূপ লাবণ্য কতটা নয়ন তৃপ্তিকর হতে পারে তার নিদর্শনও অগণ্য, শুধু একটু দরদী মন নিয়ে যদি দাঁড়াই দু'নয়ন মেলে সেই অজন্তা চিত্রমালার সামনে। দাঁড়ালে দেখবো সেখানে সারে সার রয়েছে সেই সব সুকুমারাঙ্গীরা কত উজ্জল হ'য়ে ফুটে কত না ভঙ্গিমায় সেই শ্যামশ্রী বর্ণাভায়!

এখন রইলো তবে দু'টি কথা। 'তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা' বাক্যাংশটিতে টীকাকার সত্যই কি চেয়েছিলেন বোঝাতে সোনার অতিউজ্জল গৌরবর্ণ? আর যদি চেয়েও থাকেন, তবে চাইলেনই বা তা কেন?

'শ্যামার' কাছাকাছি আছে আর একটি শব্দ সংস্কৃতের শব্দ ভাণ্ডারে যার সঙ্গে রয়েছে কাঞ্চনেরও কিছু সম্পর্ক,—সে হ'লো 'শ্যামিকা'। অর্থ সোনার খাদ বা খাদ মিশ্রিত সোনা। সোনা বিশুদ্ধ হ'লে বরাবরই তা উজ্জল কিন্তু খাদ মিশ্রিত সোনা, শ্যামিকা তপ্ত হ'লে তার বর্ণে

দেখা দেবে মালিন্য। তাই রঘুবংশের প্রথমাংশেই কবি বলছেন—

"তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তি হেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধি শ্যামিকাপিবা॥ (রঘু, ১ | ১০)

(পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণের ব্যাখ্যা—দোষ-গুণের বিচারকর্তা পণ্ডিতমণ্ডলীই সংকৃত এই রঘুবংশ কৃপাপূর্বক শ্রবণ করুণ। কেন না সোনা খাঁটি কি তাহাতে খাদ আছে ইহা অগ্নিতেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।)

সেই খাদমিশ্রিত সোনা 'শ্যামিকা' তপ্ত হ'লে তাম্রাভ বা 'শ্যামা'। এখনো স্বর্ণকারের কারখানায় তা প্রত্যক্ষ হবে। অতএব 'শ্যামা'কে 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা' উল্লেখ করতে সেই শ্যামিকার শ্যামবর্ণ বোঝানো কিছু বিচিত্র নয়। কারণ খাঁটি সোনা যথেষ্ট শক্ত নয়, গয়না কি কারুকর্ম করতে তাতে খাদ কিছু মেশানো চিরকালেরই রীতি। কথা শুধু কম আর বেশি। অন্ততঃ একজন যিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণকে এই শ্যামিকার 'শ্যাম' অর্থে গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং সেই বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত একটু উদ্ধৃতি এখানে উপস্থিত করি। 'কপালকুণ্ডলায়' তিনি মতিবিবির রূপ বর্ণনা করছেন স্বভাবসিদ্ধ তাঁর সরস ভংগীতে—

"প্রকৃতপক্ষে ইনি গৌরাঙ্গী নহেন···যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি তাহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্র কৌমুদীর ন্যায়, কাহারও ঈশদারক্তবদনা উষার ন্যায়। ইহার বর্ণ এতদুভয় বর্জিত, সুতরাং ইহাকে প্রকৃত গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকারী শক্তিতে ইহার বর্ণও ন্যূন নহে। ইনি শ্যামবর্ণা। শ্যামা মা বা শ্যামসুন্দর যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ এ সে শ্যামবর্ণ নহে। তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ এ সেই শ্যাম।"

এ সত্ত্বেও সে অর্থ যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চন বলতে যদি খাঁটি সোনাই বুঝতে হয় তবে স্বতন্ত্র কথা, আর তাই বুঝেই যখন গৌরাঙ্গী অর্থ নিয়েছেন অনুবাদকরা তখন তার কারণ অন্যত্র খুঁজতেও হবে। আর এই যুক্তি বা এই অর্থগ্রহণ বুঝি একেবারে নিরাপদও নয়। কারণ এর সংগে অন্য প্রশ্নও জড়িত। প্রথম কথা—'তপ্তকাঞ্চন' বর্ণের কথা মেঘদূতের তন্বীশ্যামা প্রসঙ্গের নয়, সেটি ভট্টির টীকায়। দ্বিতীয়, সেই মূল শ্লোকে ভট্টি শুধু শ্যামা শব্দটিই ব্যবহার করেননি, বলেছেন "দূর্বাকাণ্ডমিব শ্যামা" বাক্যটি পরিষ্কার।

যোষিদ্ বৃন্দারিকা তস্য দয়িতা হংসনাদিনী।
দূর্বাকাণ্ডমিব শ্যামা ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা॥ (ভট্টি, ৫ | ১৮)

অতএব এর টীকায় কেন লিখলেন তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা টীকাকার তারও কারণানুসন্ধানে আসতে হয় আরো এক প্রশ্নে আগে তার। যে কেনই বা ভট্টি ব্যবহার করলেন 'দূর্বাকাণ্ডমিব শ্যামা শব্দ দু'টিকে? বিশেষ করে যখন রামদয়িতা সীতা বরাবরই রামায়ণে 'পূর্ণচন্দ্র নিভাননা', হিরণ্যবরণা ইত্যাদি বহু গৌরবর্ণাত্মক বিশেষণে বর্ণিতা? সীতার সে রূপমহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত হ'য়েছে রাবণেরই মুখ নিঃসৃত স্তুতিবাক্যে, রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের অনেকখানি জুড়ে ছে'চল্লিশ অধ্যায়ে। জনকদুহিতার সে রৌপ্যকাঞ্চন দেহকান্তি ও চন্দ্রনিভ আনন মাত্র তখনই হ'য়েছিল মেঘাবৃত চন্দ্রের মত নিষ্প্রভ, নীলাভ ও ম্লান যখন ছিন্ননাল মৃণালের মত রামবিহীনা রুদিতা সে রামদয়িতা

হরণকালে কুক্ষিগতা হ'য়েছিলেন ঘোর-দর্শন দশাননের—

তস্যাস্তদ্বিমলং বক্ত্রমাকাশে রাবণাঙ্কগম্।
নররাজ বিনা রামং বিনালমিব শঙ্কজম্॥
বভূব জলদং নীলং ভিত্ত্বা চন্দ্র ইবোদিতঃ।
সুললাটং সুকেশান্তং পদ্মগর্ভাভম ব্রণম্॥ ইত্যাদি—(অরণ্য ৫২। ১৮-১৯)

ভট্টির পূর্বোক্ত শ্লোকটির টীকায় জয়মঙ্গল তাই দূর্বাকান্তমিব শ্যামাকেও কৃশাঙ্গী অর্থেই গ্রহণ করতে সুপারিশ করেছেন; না হ'লে দূর্বাকান্তবৎ শ্যামবর্ণ এখানে পুরাণের—অর্থাৎ রামায়ণের গৌরত্ব-বর্ণনার বিরুদ্ধ হয়ে পড়ে। (দূর্বাকান্তমিব তত্তুল্যা কৃশাঙ্গীত্যর্থঃ। দূর্বাকান্তব্য বর্ণেত্তি ব্যাখ্যানং পুরাণবিরুদ্ধং তত্র গৌরত্ব কথনাৎ)

ভট্টি কেন দিয়েছেন এই 'দূর্বাকান্তমিব' উপমা তার নির্ণয় সহজ অবশ্য নয়। হয়তো বা দিয়েছেন তা কালিদাসের প্রভাবেই 'তন্বীশ্যামার' ভাবাদর্শে অনুভাবিত হ'য়ে উত্তমা রূপসৃষ্টির আগ্রহেই। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই এখন সহজ সুবোধ্য যে এই শ্লোকের টীকা প্রণয়নে টীকাকারকে বলতেই হয়েছিল শ্যামার্থে 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা' সীতাদেবীর সিতবরণ যখন স্বতঃসিদ্ধ। এবং তারও উপর বিশেষ করে যখন গৌরবর্ণের গৌরব ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে লোক-রুচির পরিবর্তনে।

ঐতিহাসিক পরিবর্তনে, পরিবেশের প্রভাবে যুগধর্মের কাঠামো বদলায়। বদল হয় লোকরুচির। এ যুগেও পরিবেশের কারণে রুচির প্রভেদ বা বৈপরীত্যই বলব রয়ে গেছে কত এই ভারতভূমেই। রুচির সে বৈপরীত্য হ'য়েছে চিত্রিত প্রতিষ্ঠাবান কথাশিল্পীর এক সার্থক রচনায়। সেখানে দণ্ডকশবরীর অঘটনে অর্জিত গৌরকান্তিই তার স্বীয় অরণ্যসমাজে অনাদরের কারণ। অথচ শহরে ভ্রষ্টাচারীর লোভাতুর দৃষ্টি ধাবিত হ'য়েছিল এই ধবলারই দিকে।

গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালই কালিদাসের কাল মোটামুটি এই ধারণা ঐতিহাসিকের। সে কাল খৃষ্টীয় পঞ্চমশতক। আর ভট্টির কবি আরো অন্ততঃ দু'শতাব্দি পরের লোক। টীকাকার তো আরোই পরে। আবার আরো পরে মল্লিনাথ, চতুর্দশ শতক। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বা কালিদাসের কালে হুনেরা ছিল সীমায়িত প্রায় সিন্ধুসীমান্ত পারে। এর পরেই ঘটেছে বারে বারে হুন অভিযান; ক্রমে শ্বেত-হুনদের ঘটলো বিস্তৃতি প্রায় সারা আর্যস্থান জুড়ে। রাজা যশোধর্মনের অথবা বালাদিত্যের হাতে হুনদের পরাজয়ের অনেক আগেই তবে ঘটে গিয়েছিল সংস্কৃতির অনেক দেওয়া-নেওয়া বোঝাপড়ার পালা। রূপাদর্শেরও বেশ কিছু রূপান্তর। একটু খোঁজ-খবর করলে হয়তো চিনেও নেওয়া যাবে সেই ক্রমরূপান্তরের রূপটিকেও।

বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণে রয়েছে চিত্রবিষয়ক তার তৃতীয় খণ্ড। সেখানে লিখিত নির্দেশও রয়েছে কোন কোন জাতের লোককে, কোন কোন শ্রেণীর মানুষকে আঁকতে হবে কেমনতর দেহবর্ণে। আছে সেখানে পাঁচ শ্রেণীর গৌরবর্ণের ও বারোটি শ্যামবর্ণের কথা। কিন্তু নেই তপ্তস্বর্ণ।৩ তবে নির্দেশ সেখানে স্পষ্ট যেমন বক্তব্য বা যুক্তি তাতো পরিষ্কার নয়। সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্য দুই সেখানে পাশাপাশি পরস্পর। তবে আছে যা আরও সে এই যুগসন্ধিকালের লোকরুচি বদলের বা তার এলোমেলো কল্পনায় চিন্তাভাবনার বেশ কিছু ইঙ্গিত। বিষ্ণুধর্মোত্তর বলছেন প্রথমতঃ শ্যামবর্ণে

আঁকতে হবে পুলিন্দ ও দাক্ষিণাত্যবাসীদের, পঞ্চাল, শূরসেন মাগধীদের এবং অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গবাসীদের (পুলিন্দা দক্ষিণাত্যাশ্চ প্রায়শো বর্ণতেঽসিতাঃ। পাঞ্চালাঃ শূরসেনাশ্চ তথা যে চাত্র মাগধাঃ); অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাশ্চ প্রায়শো বর্ণেতেঽসিতা।) আর বিশিষ্ট রকমের গৌর হবে শকজাতি, যবন পল্লব, পাহ্লিকেরা এবং উত্তর পথের লোকেরাও। (শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পহ্লবাঃ বাহ্লিকাশ্চ যে ; এবং প্রায়েন গৌরাঃ কর্তব্যা উত্তরা পথ সম্ভবাঃ) এ অবধি তো বেশ কথা, হয়তো বাস্তব সম্মতও। কিন্তু এই ভৌগোলিক, আঞ্চলিক বা জাতিগত racial কারণেই নয় শুধু, গৌরবর্ণের দাবীদার বিষ্ণুধর্মোত্তর মতে তারাও সামাজিক মর্যাদায় যাদের অধিকার এসেছে, যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজারা (চন্দ্রবর্ণার দ্বিজাকার্যা রাজন্য পদ্ম সন্নিভাঃ।) এবং বিত্তশালী লোকেরাও। অপরপক্ষে শ্যামবর্ণের পর্যায়ে ফেলা হ'লো আরো তাদেরও সামাজিক ব্যবস্থায় যারা ক্ষুদ্র, যারা হীন, যারা শূদ্র অথবা শ্রমিক শ্রেণী। এবং তপোক্লিষ্ট রোগা যে যোগী, এবং যে রোগী, অথবা ভাগ্যপীড়িত যারা পড়েছে গ্রহের ফেরে আর যারা ফেরে যত দুষ্কার্য করে।—

"রাজানঃ পদ্মবর্ণাভা যে চাপি সুখিনো জনাঃ।
কুকর্মানো গ্রহস্তা ব্যাধিস্তপ আশ্রিতাঃ॥"

অতএব বুঝতে দেরি হয় না গৌরবর্ণটি ইতিমধ্যেই সমাজে বেশ কায়েম করে নিয়েছে আভিজাত্য-গৌরবের আসনটি।

বিষ্ণুধর্মোত্তরের প্রাচীনতম অংশে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মত যদিও, চিত্রবিষয়ক এই তৃতীয় খণ্ডটির গ্রন্থনাকাল সপ্তম শতক। কিথ (Kith) ক্রামরিশের (Kramrisch) মত বিশেষজ্ঞের তাই অভিমত। অর্থাৎ ভট্টির কবি আর অজন্তার শেষপর্বের ছবি এরাও তার সমকালীন। সীতার দূর্বাকান্ত বা দূর্বাঙ্কুরবৎ বর্ণ বলার অসঙ্গতি মেনে নেওয়া ছাড়াও বিষ্ণুধর্মোত্তরে বর্ণিত শ্যামাঙ্গ ও গৌরাঙ্গের এহেন তারতম্যের পরে শ্যামার্থে শ্যামবর্ণা বলায় খুবই কুণ্ঠার কারণ ছিল। তখনকার পরিবেশেও, শুধু বর্তমান যুগেই নয়। তাই শ্যামার মর্যাদাদানে অর্থ তার 'তপ্তকাঞ্চনাভা' বলার বুঝি প্রয়োজনও হ'য়েছিল। এখানে উল্লেখ্য ; মধ্যপর্বের অজন্তায় গোপা ও রাহুলের সামনে বুদ্ধের যে বিরাট মহিমাময় উপস্থিতি সে মহিমরূপ সেখানে রক্তিমাভ শ্যামেই উজ্জল ও প্রাণোচ্ছল। গোপা বা রাহুলও গৌর নয়। আবার এক সংখ্যক গুহার শেষপর্বের কিছু নিম্নমানের চিত্রশ্রেণী মধ্যেও দেদীপ্যমান যে একটি উপাদেয় রচনা, সেই পদ্মপানি বোধিসত্ত্বের দেহবর্ণে ফুটেছে গৌরত্বের আভাস।

অতএব আমার অনুমান কালিদাসের 'শ্যামা'কে কাঞ্চনবর্ণা বা গৌরবর্ণা কল্পনা করার কোন হেতুই নেই। 'শ্যামা চ শ্যামবর্ণা চ'—'শ্যামা' সে শ্যামবর্ণাই তিনি সেই 'তন্বীশ্যামা যক্ষকান্তা' তাঁকে গৌরী মনে করা ভ্রান্তিই। টীকাকার মল্লিনাথ ভট্টির যুগের অর্থাৎ এই সাংস্কৃতিক আলোড়নের অনেক পরের লোক ; সময় কাল চতুর্দশ শতক। রুচিবিপ্লবের সে তরঙ্গে দোল খাননি তিনি। যে টুক ভাসাবার তা ভাসিয়ে দিয়ে সংস্কৃতির সে জলোচ্ছাস তখন স্থির, শান্ত, নিস্তরঙ্গ। এমন কি ইতিপূর্বে তুর্ক অভিযানেরও যে সংঘাত আর কম্পন তারও আলোড়ন তখন স্থৈর্যে ফিরে এসেছে। যদিও মল্লিনাথ পরিষ্কার বলেননি শ্যামা শ্যামাঙ্গীই, কারণ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছে তখন গৌরবরণ,

তবু সুস্থির চিন্তার ও বিচার বিবেচনার যথেষ্ট অবকাশ পেয়ে সুন্দরতর অর্থেরই আশ্রয় নিয়ে নিজব্যাখ্যা প্রণয়ন করেছিলেন—"শ্যামা তিনিই যাঁর মধ্য যৌবন"। আর সাহস ভরে বলতেও চেয়েছিলেন তাই বুক ফুলিয়ে কালিদাসের কাব্য ভারতী দুর্ব্যাখ্যাবিষে ছিলেন মূর্চ্ছিতা, এবার তাঁর সঞ্জীবনী ব্যাখ্যায় হবেন তিনি পুনরুজ্জীবীতা—

ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্যাখ্যাবিষ মূর্চ্ছিতা।
এষা সঞ্জীবনী টীকা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি॥

১। তবে শিখরি দশনকে সুদর্শ করতে কেন যে এই তুষারের আবরণ সেটি প্রশ্ন থেকে গেলেও এখানে আলোচ্য নয় এখন।

২। গভীরতার তিন সুলক্ষণ—নাভি, স্বভাব ও কণ্ঠস্বর; উচ্চতার ছয়—বক্ষোজদ্বয়, শ্রোণীদ্বয়, নাসিকা ও মন বা অন্তঃকরণ ও রক্তিমের পাঁচ—দুই চরণতল, দুই করতল এবং অধরদেশ।

৩। গৌরবর্ণের পাঁচটি—(১) রুক্ম গৌরী, (২) বসন্তগৌরী, (৩) স্ফুটচন্দন গৌরী, (৪) শরদ্ঘন গৌরী এবং (৫) চন্দ্রকবদ্ গৌরী।

শ্যামবর্ণের বারোটি—(১) রক্তশ্যামা. (২) মৃদগশ্যামা, (৩) দুর্বাঙ্কুরশ্যামা, (৪) পাণ্ডুশ্যামা, (৫) হরিত্ শ্যামা, (৬) পীতশ্যামা, (৭) প্রিয়ঙ্গুক শ্যামা, (৮) কপিশ্যামা, (৯) নীলোৎপলশ্যামা, (১০) ঘনশ্যামা, (১১) চাষ শ্যামা ও (১২) রক্তোৎপলশ্যামা।

বটতলার দলিল

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঠিক দুশো বছর আগে শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী মুর্শিদাবাদের নোয়াপাড়া গ্রামটার লীজ দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এর কিছুদিন আগে পলাশীর নবাব যুদ্ধে পরাজিত—বাংলার স্বাধীনতা সূর্য্য অস্ত গেছে এবং আয়ুর টিকিটে ভাগ্যের লটারী খেলতে আসা কিছু লালমুখো ইংরেজ নবাব নবকৃষ্ণদের সাহায্যে বাংলার গদি দখল করেছেন। নোয়াপাড়া গ্রামের লীজ বোধকরি সেই কীর্তির কৃতজ্ঞ পুরস্কার। লীজটির দলিলের নাম ছিল দেব শওয়াল (Deb shewul)। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রাক্তন তালুকদার নোয়াপাড়া গ্রামের জমিদারি ত্যাগ করতে গররাজি হলেন। সেই হট্টগোলের বেলাতেও প্রাক্তন তালুকদার বিচার প্রার্থনা করে সেদিনের নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেন। কিছুটা অপ্রস্তুত ইংরেজ নবকৃষ্ণকে আরও কোলের কাছে টেনে নিলেন। সৌভাগ্যের স্নেহভাজন নিরভিমানী নবকৃষ্ণ সেকালের অজ কলকাতাই বরণ করলেন। বরং এই বদলি ব্যবস্থাতেই তাঁর ভাগ্য ফিরল।

সেকালের ছোট কলকাতা বা সুতানুটি হল উনবিংশ শতাব্দীর বটতলার বৃত্ত বটতলার নিখুঁত মানচিত্র পাওয়া অসম্ভব কিন্তু সেদিনের সুতানুটি ছিল ব্যবসায় ডালহৌসি—'বাবু'দের বাসস্থান চিৎপুর রোডও। চিৎপুরের আটটি বাজারই এখানে। সুতানুটি, হাটসুতানুটি (এটাই কি মোহনটুর্নি ঘাটের পাশে হাটখোলা বাজার! ১৬৯০ এর বৃষ্টি টুপটুপ দুপুরে এখানেই হাজির হয়েছিলেন কলকাতার ভগীরথ জব চারনক। আরও লক্ষ্যণীয় এখানেই আজও লেখা ষ্টেশন : সাহেব বাজার) বাজার সুতানুটি, সভাবাজার (এটাই হল শোভাবাজার—ডঃ সুকুমার সেন বলছেন শোভাবাজারের প্রকৃত নাম সভা বাজার—নবকৃষ্ণের নবরত্ন সভা থেকে—ক্রমশ এটাই লোকের মুখে শোভাবাজার হয়ে দাঁড়ায়!) চার্লস বাজার (বর্তমানে চিৎপুর রোডের বুকে সোনাগাছির কেন্দ্রবিন্দু), বাগবাজার ও হোগলকুঁড়ি (সেকালের সবচেয়ে অভিজাত পাড়া—একদা সংবাদ প্রভাকর মুদ্রিত হত এখানেই) ভিতর-সিমলাও বোধহয় এখানেই।

এই হল বটতলা। বটতলার এমন ছবি সমকালীন দলিলেই পাওয়া গেছে। সুতানুটির যে দলিল আমরা পরে উদ্ধার করছি সেখানে বারবার বলা হয়েছে রামবাজার ও রাজেবাজারএ এলাকার বার। রামবাজার বোধহয় রামবাগান বিডনস্ট্রিটে। রামবাগান সেকালে সোনাগাছির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় রূপাগাছি নামে পরিচিত। রাজেবাজার কি রাজাবাজার? রামবাজার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পার করা যেতে পারে। বটতলার যে দলিলটি আমরা এখানে উদ্ধার করছি তা মূলতঃ ইংরেজীতে লেখা। এখানে তার সহজ ভাবানুবাদ করা হল, আইনত বা কোনমতেই স্বীকৃত হতে পারে না। তাই কয়েকটি প্রাথমিক তথ্য আগেই বলে নিই।

এখানে যখনই নবকৃষ্ণ বলা হয়েছে তার প্রকৃত অর্থ "Maharaja Nobkissen his heirs executors administrators or assigns:

অপরদিকে United Company বলতেও তাদের successers or assign বোঝাবে।

নবকৃষ্ণ যে বারবার lease চেয়েছেন English language এ তার কারণ হিসেবে জানা যায়, Many difficulties and objections were raised by the inhabitants and land holders, and in order to avoid objections, at the suggestions of the Raja an English lease was granted him in perpetuity.

Husbandry বলতে বোধহয় বোঝান হয়েছে সাহেবদের খাবার মত কিছু জীবজন্তু (গরুও।) নগেন্দ্রনাথ শেঠের কাছে জানা যায়, শোভাবাজারের নীচু জলজ ফাঁকা অঞ্চল তখন বাস করবার যোগ্য ছিল না। সেখানেই বোধহয় হাঁস মুরগীর বন্দোবস্ত ছিল।

গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, আয়ারল্যাণ্ডের আমাদের স্বাধীন রাজা তৃতীয় জর্জের রাজত্বের আঠারতম বছরের আঠাশে এপ্রিল এবং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের একপক্ষে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের ইউনাইটেড কোম্পানী যাঁরা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা করেছেন এবং অপরপক্ষে বাংলা প্রদেশের কলকাতার মহারাজা নবকিষেণ বাহাদুরের মধ্যে এই দলিল তৈরি হচ্ছে।

যখন ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর গভর্ণর জেনারেল মাননীয় ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং সদস্য কাউন্সিলর রিচার্ড বারওয়েল ফিলিপ ফ্রান্সিস ও এডওয়ার্ড হুইলার বাংলা প্রদেশের ইউনাইটেড কোম্পানীর তরফে ১৬ই জানুয়ারী বা কাছাকাছি কোন দিনে পার্সীভাষায় কোম্পানীর দেওয়ানী সনদ বলে ও শীলে উপরিউক্ত ওয়ারেন হেষ্টিংস (এ ধরণের দলিল করার প্রথানুযায়ী) মহারাজ নবকিষেণকে 'মহামান্য শক্তিশালী মহারাজা নবকিষেণ বাহাদুর নামে' কলকাতার সুতানুটি বাগবাজার এবং হোগলকুঁড়ি (সুতানুটি, সুতানুটি হাট, সুতানুটি বাজার, সভাবাজার, চার্লসবাজার, বাগবাজার ও হোগলকুঁড়ি এই কটি বাজার কিন্তু রাম বাজার ও রাজেবাজার বাদে), নোয়াপাড়া সহ আরো কটি গ্রামের বদলে ১১৮৪ বঙ্গাব্দে (১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস) তালুকদারি দান করলেন। পূর্বোক্ত মহারাজা নবকিষেণ তালুকদারির পক্ষে লাভজনক এমন সব কাজ করছেন যা প্রথা সঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত বিচার সম্মত এবং এই এলাকার রায়ত ও অন্যান্য বাসিন্দাদের কাছেও সুবিধাজনক যথা, তাঁর সুব্যবস্থায় এই অঞ্চলে বাজারে husbandryর দৈনিক বৃদ্ধি হয়েছে এবং বর্তমান সনদে লিখিত ঠিক বারোশ সাইত্রিশ সিক্কা টাকা তের আনা দশ পাই (চৌকিদারি ট্যাক্স বাদে) নির্দিষ্ট সময়ে আদায় হচ্ছে।

যখন পূর্বোক্ত মহারাজা নবকিষেণ বাহাদুর পূর্বোক্ত কাউন্সিল সহ গভর্ণর জেনারেলকে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন কিছু কারণে উপরিউক্ত তালুকদারি যেন তাঁকে ইংরেজী ভাষায় Perpetual lease অথবা grant দেওয়া হয় যার ফলে তিনি কোম্পানির মতই ট্যাক্স ইত্যাদি আদায় করতে পারবেন এবং কোম্পানির মালগুজারি টাকা জমা দিতে পারেন।

যখন পূর্বোক্ত কাউন্সিল সহ গভর্ণর জেনারেল পূর্বোক্ত তালুকদারির ইংরেজীভাষায় grant দেওয়া সম্পর্কে মহারাজা নবকিষেণের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে রাজি হয়েছেন।

এখন এই দলিল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসারত ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের পূর্বোক্ত ইউনাইটেড কোম্পানি পূর্বোক্ত শর্ত এবং পাঁচ আরকট টাকা বা এই দলিল

শীল বা ডেলিভারি করার সময় তাদের হাতে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে (এই টাকার প্রাপ্তি এখানেই স্বীকার করা হচ্ছে) এবং মহারাজা নবকিষেণ পালন করতে সম্মত ভাড়া চুক্তি ইত্যাদি অন্যান্য শর্তের বিনিময়ে মহারাজা নবকিষেণ বাহাদুরকে এই দলিল বলে কলকাতার পূর্বোক্ত সুতানুটি বাগবাজার হোগলকুঁড়ির গ্রামগুলো দিচ্ছেন। এই তালুকদারি ফল, মুনাফা, ভাড়া, খাজনা ট্যাক্স, কমিশন, পতিত জমি, পাট্টা সেলামি, বখশিশ, লাভ, সুবিধা, যা আগে কোম্পানি ভোগআদায় করতেন, এখন পাওয়া যায় বা পরে পাওয়া যেতে পারে তা এখন থেকে মহারাজা নবকিষেণ ভোগআদায় করবেন।

এই ভোগআদায়ের জন্য তিনি আইন সঙ্গত সকল উপায়ই ব্যবহার করতে পারবেন যা ইউনাইটেড কোম্পানি অনুরূপ অবস্থায় ব্যবহার করতেন বা করতে পারবেন। তিনি কোম্পানির মতই এখন থেকে কোন ভাড়া খাজনা ইত্যাদি প্রয়োজনে মকুব করতে পারবেন। পূর্বোক্ত ১৭৭৭ সালের ১১ই এপ্রিল থেকে মহারাজা নবকিষেণ কিন্তু বছরে বারোশ সাঁইত্রিশ সিক্কাটাকা তের আনা দশপাই কোম্পানিকে দিতে বাধ্য থাকবেন চৌকিদার ট্যাক্স বাদে। কিন্তু তিনি এমন কিছু করতে পারবেন না বা করাবেন না যা রায়ত বা বাসিন্দাদের ওপর অত্যাচার হবে বা এমন কিছু আদায় করতে পারবেন না যা এই দলিল কার্যকরী না হলে কোম্পানিও আদায় করতেন না। **কিন্তু সর্বদা** ঘোষণা করা থাকছে যে এই দলিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং অর্থ হল কোনমতেই পূর্বোক্ত ডুইবাজার রামবাজার ও রাজেবাজার সম্পূর্ণ বা অংশতঃ এই দলিলের বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। **তাছাড়া** যদি মাসিক বা আরো তাড়াতাড়ি কোন কিস্তিতে দেয় পূর্বোক্ত খাজনা বারোশ সাঁইত্রিশ সিক্কাটাকা তের আনা দশ পাই পুরো একবছর পর্যন্ত বাকি থেকে যায় (অন্তত একবার আইনসঙ্গত ভাবে বকেয়া খাজনা চেয়ে নোটিশ দেবার পরেও) তাহলে পূর্বোক্ত এলাকায় পুনঃপ্রবেশ করতে পারবেন এবং তা এমন ভাবে ভোগ দখল করবেন যেন এই দলিল কখনই সম্পাদিত হয়নি।

তাছাড়াও দুই পক্ষই এ ব্যাপারে একমত যে যদি মহারাজা নবকিষেণ এই দলিল কার্যকরী থাকাকালীন কোন সময়ে তালুকদারির রায়ত বা বাসিন্দার কাছ থেকে আইনসম্মত প্রাপ্য যা এতদিন প্রথাগত ভাবে নেওয়া হচ্ছিল এবং কোম্পানী নিত তার চেয়ে বেশী জোর করে বা বিনা জোরেও আদায় করে তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে মহারাজা নবকিষেণ যতটুকু প্রাপ্য তার বেশী যতটা আদায় করেছেন তার তিনগুণ কোম্পানীকে জরিমানা হিসেবে জমা দিতে বাধ্য থাকবেন।

এরই সাক্ষ্য হিসেবে একপক্ষে নবকিষেণের কাছে যে দলিল থাকবে সেটা ইউনাইটেড কোম্পানীর তরফে গভর্ণর জেনারেল হিসেবে ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং পূর্বোক্ত প্রেসিডেন্সীর কাউন্সিলর হিসেবে রিচার্ড বারওয়েল, ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং এডওয়ার্ড হুইলার নাম সই ও কোম্পানির শীল দিচ্ছেন এবং অন্যটি যেটা সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেলের কাছে থাকবে সেখানে মহারাজা নবকিষেণ এই দলিলের প্রথমেই উল্লিখিত তারিখ সালে সই করেছেন ও শীল দিচ্ছেন।

(১) ওয়ারেন হেষ্টিংস (২) রিচার্ড বারওয়েল (৩) ফিলিপ ফ্রান্সিস (৪) এডওয়ার্ড হুইলার.

বাংলা প্রদেশের ফোর্টউইলিয়মে (যেখানে কোন ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয় না পাওয়াও যায় না), এই দলিল শীল করা হল এবং দুই পক্ষের মধ্যে পরস্পর বিনিময় করা হল নিম্নোক্তদের উপস্থিতি (১৭৭৭ সালে) (১) জর্জ হজসন (২) আইজাক বাগ.

বঙ্কিম-সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

উপাসনা (দেবদত্ত ও হিন্দুধর্ম) ॥

ঋতুবর্ণন (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা)।

প্রথম প্রকাশ—"বঙ্গদর্শন", বৈশাখ ১২৮২ সাল, পৃ, ২১-২২

"ঋতুবর্ণন। শ্রী গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত। চুচুড়া সাধারণী যন্ত্র।—গ্রন্থের সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই বলেছেন—"কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য, বর্ণন ও শোধন।" বর্ণন বলতে হুবহু বর্ণনা, এবং শোধন বলতে কবির মানসলোকে নূতন সৃষ্টিকে বোঝান হয়েছে। বর্ত্তমান গ্রন্থটিকে তিনি প্রথম পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন।

একটি গীত (কমলাকান্তের দপ্তর—দ্বাদশ সংখ্যা) ॥

১২৮১ সালের ফাল্গুনমাসের 'বঙ্গদর্শনে' রচনাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

"এসো এসো, বঁধু এসো, আধ আচড়ে বসো, নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।"—এই সুবিখ্যাত বৈষ্ণবপদাবলীকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমের কল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। প্রথমে লেখক এই কবিতাটির মধ্যে চিরন্তন বিরহের আকুলতা শুনতে পেয়েছেন। মানুষের মধ্যে যে এক চিরন্তন অতৃপ্তি আছে, সেই অতৃপ্তিই কখনো তাকে সম্পূর্ণ হতে দেয় না। এই প্রসঙ্গে 'প্রাচীনসাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি স্মরণীয়। সেখানে তিনি প্রত্যেকটি মানবহৃদয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের অনতিক্রম্য জলরাশির কল্পনা করেছেন।

তারপর বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ মানুষের আলোচনা থেকে দেশপ্রেমের আলোচনার মধ্যে উপনীত হয়েছেন। লেখক বঙ্গভূমিকে হৃদয়ের আসনে বসাতে চান। কিন্তু পরাধীন বঙ্গভূমির জন্য তাঁর দুঃখের অন্ত নেই। দেশলক্ষ্মীর গৌরব ম্লান হয়ে গেছে।

রচনাটিতে একদিকে যেমন বঙ্কিমের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনি দেশপ্রেমের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

একা, "কে গায় ওই ?" (কমলা কান্তের দপ্তর ১ম সংখ্যা) ॥

দপ্তরের প্রথম রচনা, কিন্তু এটিকে সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনার মর্যাদা দেওয়া যায়। ১২৮০ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে পথিকের কণ্ঠনিঃসৃত গান শুনে বঙ্কিমের মনে যে নিঃসঙ্গতার বেদনা জেগে ওঠে তারই প্রকাশ এই রচনাটিতে। এখানে বিষয়বস্তু নিতান্তই গৌণ। সমস্ত রচনাটিই সংগীতের অনুকরণের মত প্রবাহিত হয়েছে। বঙ্কিমের অপূর্ব কবিত্বশক্তি এই রচনার উৎকর্ষে সহায়তা করেছে।

কিন্তু এটি কেবল শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাস নয়। বঙ্কিমের জীবনদর্শন, আদর্শবাদ এবং সংগ্রামী মনোবৃত্তির একাকীত্ব এর মধ্যে প্রকাশিত। দীর্ঘজীবন ধরে বঙ্কিম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করে এসেছেন। তাই সমাজে তিনি একক। শিল্পীর নিঃসঙ্গতাও তাঁকে মাঝে মাঝে বেদনা দেয়। বিশেষতঃ যৌবনের আনন্দময় আশার দিনগুলি অতীত হয়ে যাওয়ায়, বার্দ্ধক্যের একাকীত্ব কবিকে বেদনাবিদ্ধ করেছে। তাই তিনি সকলকে উপদেশ দিয়েছেন—"কেহ একা থাকিও না।"

কিন্তু বঙ্কিম একা হলেও, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। এইখানেই তাঁর সংগে বৃহত্তর মানবসমাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন—"প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সংগীত।"

আবার এক অর্থে 'একা' প্রবন্ধটিকে 'কমলাকান্তে'র ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই গ্রন্থের রচনাবলীর মধ্যে হয়তো বঙ্কিম অনেক অন্যায়কে আক্রমণ করেছেন। তার ফলে হয়তো কারো কারো ক্ষোভ হতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর মানবের কল্যাণের জন্যেই তিনি এই কার্যে ব্রতী হয়েছেন। কেবলমাত্র লোকের পিছনে লাগা তাঁর স্বভাব নয়, বৃহত্তর মানবের প্রতি ভালবাসাই তাঁকে এই জাতীয় রচনায় বিদ্ধ করেছে।

রচনাটির মধ্যে হাস্যরসের স্থান নাই। শান্তরসই এখানকার প্রতিপাদ্য।

কর্ণবধ (কৃষ্ণচরিত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম পরিঃ) ॥

কর্ণবধ-বৃত্তান্ত মহাভারতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ঘটনায় কৃষ্ণের কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের পূর্বে বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ করিয়ে ও কর্ণের হাত থেকে উপযুক্ত সারথ্যের দ্বারা অর্জ্জুনকে বাঁচিয়ে কৃষ্ণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে আরো একটি বড় কথা যে কৃষ্ণ এখনো নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে স্বীকার করেননি।

কতকাল মনুষ্য ? (বিজ্ঞানরহস্য) ॥

প্রথমপ্রকাশ "বঙ্গদর্শন" ফাল্গুন ১২৮০। মানুষের সৃষ্টি কতকাল পূর্বে হয়েছে, তা বঙ্কিম এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর থেকে যেমন বিভিন্ন প্রাণীর চিহ্ন পাওয়া যায় এবং তা থেকে অনুমান করা হয় বিভিন্ন প্রাণীর প্রাচীনত্ব, তেমনি—"মনুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্বোর্দ্ধ স্তরে, অর্থাৎ আধুনিক মৃত্তিকায়। তন্নিম্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরেও কদাচিৎ মনুষ্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্যের সৃষ্টি সর্বশেষে ; মনুষ্য সর্বাপেক্ষা আধুনিক জীব।"

*** কবিতা পুস্তক/গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক ॥**

বাল্যকালে কেবলমাত্র 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকাতেই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের পরও কবিতা লিখতেন এই গ্রন্থটিতে তার পরিচয় আছে। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার' এবং 'ভ্রমর' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতা তিনি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। এই গ্রন্থে মোট ১৬টি গদ্যপদ্য মুদ্রিত হয়। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ অনুসারে কবিতাগুলির প্রথম প্রকাশ কাল দেওয়া হল।—

বঙ্গদর্শন

সংযুক্তা	চৈত্র ১২৮৪, পৃ, ৫২৯—৫৩৩।
আকাঙ্খা	জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, পৃ, ৭০—৮০।

অধঃপতন সঙ্গীত	অগ্রহায়ণ ১২৮১, পৃ, ৩৮২—৩৮৪।
সাবিত্রী	" ১২৭৯, পৃ, ৩৭১—৩৭৩।
আদর	বৈশাখ ১২৮০, পৃ, ৪৬।
বায়ু	কার্ত্তিক ১২৭৯, পৃঃ ৩২৮—৩৩০।
আকবরশাহের খোষরোজ	বৈশাখ ১২৮৫, পৃঃ ১২—১৬।
মন এবং সুখ	কার্ত্তিক ১২৮০ পৃঃ ৩১৯—৩৩০।
ভাই ভাই	চৈত্র ১২৮১, পৃঃ ৫৬২—৫৬৩।
দুর্গোৎসব	ভাদ্র ১২৮৫, পৃঃ ২০২—২০৯।
মেঘ	ভাদ্র ১২৮০, পৃঃ ২৩৩—২৩৫।
খদ্যোৎ	জ্যৈষ্ঠ ১১৮৪, পৃঃ ৯২—৯৪।
প্রচার	
পুষ্পনাটক	শ্রাবণ, পৃঃ ৩৫—৪০।
রাজার উপর রাজা	বৈশাখ ১২৯২, পৃঃ ৩৫৯—৩৬০।
ভ্রমর	
জলে ফুল	বৈশাখ ১২৮১, পৃঃ ২৮—২৯।
বৃষ্টি	আষাঢ় ১১৮১, পৃঃ ৬১—৬৩।

এছাড়া ‘বঙ্গদর্শন’ (ফাল্গুন ১২৭৯, পৃঃ ৬১২)-এ প্রকাশিত ‘বিরহিনীর দশ দশা’ কবিতাটি গ্রন্থে স্থান পায়নি।

এই গ্রন্থটি ‘কবিতাপুস্তক’ নামে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—১৮৭৮ খ্রীঃ। এটি “কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত” হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ—১৮৯১ খ্রীঃ কোলকাতার হেয়ার প্রেস থেকে “গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক” নামে প্রকাশিত হয়।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের “বিজ্ঞাপন” বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—“যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা, এই কবিতাপুস্তকে সন্নিবেশিত হইল, প্রায় সকলগুলিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি “জলে ফুল” ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। বাল্যরচনা দুটি কবিতা, বাল্যকালেই পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে কিছু অভাব থাকুক, গীতিকাব্যের অভাব নাই। বিদ্যাপতির সময় হইতে আজি পর্যন্ত, বাঙ্গালী কবিরা গীতিকাব্যের বৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। এমন সময়ে এই কয়খানি সামান্য গীতিকাব্য পুনর্মুদ্রিত করিয়া বোধ হয় জনসাধারণের কেবল বিরক্তই জন্মাইতেছে। এ মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দুনিষেকের প্রয়োজন ছিল না। আমারও ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই এতদিন এ সকল পুনর্মুদ্রিত করি নাই।

তবে কেন এখন এ দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম? একদা বঙ্গদর্শন আপিশে এক পত্র আসিল—তাহাতে কোন মহাত্মা লিখিতেছেন যে, বঙ্গদর্শনে যে সকল কবিতা প্রকাশ হইয়াছিল,

তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তিনি সেইসকল পুনর্মুদ্রিত করিতে চাহেন। অন্যে মনে করিবেন যে, রহস্য মন্দ নহে। আমি ভাবিলাম, এই বেলা আপনার পথ দেখা ভাল, নহিলে কোনদিন কাহার হাতে মারা পড়িব। সেই জন্য পাঠককে এ যন্ত্রণা দিলাম। বিশেষ, যাহা প্রচারিত হইয়াছে, ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহা পুনঃ প্রচারের নূতন পাপ কিছুই নাই। অনেক প্রকার রচনা সাধারণ সমীপস্থ করিয়া আমি অনেক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি; শত অপরাধের যদি মার্জনা হইয়া থাকে, তবে আর একটি অপরাধেরও মার্জনা হইতে পারে।

কবিতাপুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে তাহা সংগত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা-আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্যে ছন্দ মিলাইতে বসা এক প্রকার সংসাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ তিনটি গদ্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। অনেকে বলিবেন, এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর যে, এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য, আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।

অন্য কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে দুইটি বাল্যরচনা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, তাহার কোন মার্জনা নাই। ঐ কবিতাদ্বয়ের কোন গুণ নাই। ইহা নীরস, দুরূহ, এবং বালকসুলভ অসার কথায় পরিপূর্ণ। যখন আমি কলেজের ছাত্র, তখন উহা প্রথম প্রচারিত হয়। পড়িয়া উহার দুরূহতা দেখিয়া, আমার একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, "ও গুলি হিয়ালি।" অধ্যাপক মহাশয় অন্যায় কথা বলেন নাই। ঐ প্রথম সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না—অনেক অনেক কপি আমি স্বয়ং নষ্ট করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার অনেকগুলি বন্ধু, আমার প্রতি স্নেহবশতঃ ঐ বাল্যরচনা দেখিতে কৌতূহলী। তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থই এই দুইটি কবিতা পুর্নমুদ্রিত হইল।

"দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন"-এ আছে—"বাংলা কবিতা পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাহিতে হয়। তবে সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক অপরাধ করিতেছেন, সে সকল পাঠক যদি ক্ষমা করেন, আমার এ অপরাধও ক্ষমা করিবেন।

ক্ষমার একটু কারণ এই আছে যে, এবার একটি পদ্য প্রবন্ধ নতুন দেওয়া গেল। "পুষ্পনাটক" প্রথম "প্রচারে" প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।

"দুর্গোৎসব" "বঙ্গদর্শন" হইতে এবং "রাজার উপর রাজা" "প্রচার" হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

"কবিতাপুস্তক" অপেক্ষা "গদ্য পদ্য" নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এইজন্যে এইরূপ নামের কিছু পরিবর্তন করা গেল।"

কবিতাপুস্তকের কবিতাগুলি ঈশ্বরগুপ্তেরই ধারার অনুসরণ নায়ক-নায়িকার সংলাপের মাধ্যম অনেক কবিতার বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। উপমাপ্রয়োগ ও বর্ণনপ্রণালীও প্রাচীনপন্থী। এই কবিতাগুলির একমাত্র মূল্য এর কোন কোনটির মধ্যে পরবর্তীকালের বঙ্কিমের স্বদেশপ্রেমের অঙ্কুর দেখা যায়।

বঙ্কিমের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত)—পরে এই গ্রন্থের সংগে সন্নিবেশিত হয়। এই গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল এরূপ—

'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস'-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা—৪১।

'কবিতাপুস্তকে'র পৃষ্ঠা সংখ্যা—১১২।

সম্মিলিতভাবে 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৪৪।

'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' বঙ্কিমচন্দ্রের ১৫ বছর বয়সের রচনা এবং প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লেখেন—"স্বকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয়কাব্য রচনা রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানসমাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবার তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনাজনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন। গ্রন্থকার।"

'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তকে' এই কাব্যগ্রন্থখানি সন্নিবেশিত করবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন—

বাল্যরচনা

"এই কবিতাগুলি লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়। লিখিত হওয়ার তিন বৎসর পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারীতে পচে—বিক্রয় হয় নাই। তাহার পর আর এ সকল পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্য বিবেচনা করি নাই, এখনও আমার এমন বিবেচনা হয় না যে, ইহা পুনর্মুদ্রিত করা বিধেয়। বাল্যকালে কিরূপ লিখিয়াছিলাম, তাহা দেখাইয়া বাহাদুরী করিবার ভরসা কিছুমাত্র নাই; কেননা, অনেকেই অল্প বয়সে এরূপ কবিতা লিখিতে পারে। যাহা অপাঠ্য তাহা বালকপ্রণীত হউক বা বৃদ্ধপ্রণীত হউক, তুল্যরূপে পরিহার্য। অতএব কিছু পরিবর্তন না করিয়া "ললিতা" নামক কাব্যখানি পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। "মানস" নামক কাব্যখানিতে পরিবর্তন বড় সহজ নহে, এ জন্য সে চেষ্টা করিলাম না। তথাপি সামান্য পরিবর্তন করা গিয়াছে।"

লক্ষ্য করবার বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র 'ললিতা তথা মানস' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থখানির প্রতি যথেষ্ট দুর্বলচিত্ত ছিলেন। তাই এটিকে নূতনরীতির কাব্য বলে অভিহিত করেছেন। এই

নূতনরীতি আর কিছুই নয়—বিহারীলাল প্রবর্তিত আখ্যায়িকা কাব্যের ধারা। এই আখ্যায়িকা কাব্য গীতিরসধারায় অভিসিঞ্চিত। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থটিকে 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তকে' সন্নিবেশিত করবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন, তা রূঢ় হলেও সত্য।

'ললিতা' কাব্যের আখ্যান বস্তু নিতান্তই সামান্য। ললিতা নামে রাজার নন্দিনী মন্মথ নামে এক যুবককে বিবাহ করায় রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়। ললিতা ও মন্মথ যখন রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন ললিতা দস্যুকর্তৃক অপহৃতা হয়। অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে ডাকাতরা তাকে ছেড়ে দিল। সেই বনমধ্যে মন্মথর গান শুনে দু'জনের আবার দেখা হল। তারপর মন্মথ ও ললিতার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রেমের ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। বনমধ্যে এক মধুর সংগীত শ্রবণ ক'রে তার রহস্য-উন্মোচনের জন্য তারা অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ভয়ানক ঝটিকাঘাতে উভয়েরই মৃত্যু হল। এটিকে 'ভৌতিক গল্প' বলে বঙ্কিমচন্দ্র অভিহিত করেছেন। নায়ক-নায়িকার মৃত্যুর পর বর্ণনায় কিছুটা কবিত্বের আমেজ আছে—

"নাথভুজে মাথা দিয়ে পড়েছে মোহিনী।
মুখে মুখে কাঁদে যেন দুটি সরোজিনী॥
ললিতার মুখশশী ভিজে বরিষায়।
সরোজ শিশির মাথা মাটিতে লোটায়॥
শীতল ললাটে জলে শশধর।
জলে ভিজে পড়ে আছে অলকানিকর॥
ফুটায় কবরী চারু, দীর্ঘ তৃণোপরে।
মন্মথ রয়েছে তবু নাহি তুলে ধরে॥

'মানস' কাব্যটিতে কবি প্রকৃতির মধ্যে মানসিক শান্তির অনুসন্ধান করেছেন। কাব্যটিতে গীতিকবিতার যথার্থ স্পর্শ লেগেছে। গ্রন্থটির প্রথমে Childe Harold এবং বাল্মীকি থেকে বনের প্রশস্তিবাচক দু'টি উদ্ধৃতির মধ্যে মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

স মা লো চ না

কেটে যাবে মেঘ ॥ ডঃ অসীম বর্ধন। অ্যালফা বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌, কলকাতা। আড়াই টাকা ॥

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের নানা জটিল বিষয়কে খুব সহজ, রম্য করে পরিবেশনার মুন্সিয়ানা লেখক অসীম বর্ধন ইতোপূর্বে তাঁর অন্যান্য রচনাতে দেখিয়েছেন। 'কেটে যাবে মেঘ' গ্রন্থেও সে কথার ব্যতিক্রম ঘটেনি, বলা যেতে পারে। বর্তমান গ্রন্থটিতে মানসিক নানা বিষয় নিয়ে খুব ঘরোয়া পরিবেশে লেখক আলোচনা করেছেন। কোথাও তথ্য বা তত্ত্বের বাক্-আড়ম্বরতা নেই—মানুষ নিজের অগোচরে কখনো কখনো যে সব দুর্বলতার জালে জড়িয়ে নিজেরই মনের চারপাশে অন্ধকারের দেয়াল গড়ে তোলে—সরস আলোচনার মাধ্যমে সেই সব অকারণ ভীতির কারণসমূহ বিবৃত করতে লেখক বর্তমান গ্রন্থে প্রয়াসী হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঞ্চভূত গ্রন্থের একটি নিবন্ধের একস্থানে বলেছেন, 'সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন-নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।' এবং অতঃপর…'আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। খাইবার, পরিবার, জীবনধারণ করিবার, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক, মনটা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বড়ো হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দিকে অনেকখানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বসিয়া বসিয়া ডায়েরী লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তোলে, যাহাকে একভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর একভাবে দাঁড় করায়, যাহা কোনকালে কিছুতেই বোঝা যায় না, অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে, এমনকি এ-সকল অপেক্ষাও অনেক গুরুতর গর্হিত কাজ করে।' (মন)

সুতরাং বলা যেতে পারে যে আমাদের যা কিছু তা মন নিয়ে এবং যা-কিছু নয় তা-ও মনকে ঘিরেই নানা অবস্থায় এবং অ-ব্যবস্থায় মন স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে—এবং তা থেকেই জন্ম নেয় হতাশা, নৈরাশ্য ইত্যাদি। অথচ নিজেদের এক্তিয়ারের মধ্যেই সকলেরই সুখী হবার উপায় আছে—শুধুমাত্র সেইটুকু বুঝতে পারলেই সমস্ত বিরোধের অবসান। 'আজকের দিনের জটিল জীবনের নানা সংগ্রাম ব্যর্থতা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে কখনো যদি আপনার মনে হতাশার অবসাদ জাগে, যদি সে অবসাদ সর্বক্ষণ আপনাকে ম্রিয়মাণ করে রাখে, তাহলে হাল ছেড়ে দেবেন না। হতাশার অবসাদ-মেঘ কাটিয়ে ওপরের মুক্ত আকাশে উঠে যাওয়ার উপায় আছে'।

শুধু মনের আবহাওয়াটাকে বদলাতে হবে। যে কারণে আমাদের মন নিজেদের অগোচরে নিজেদেরই বিরুদ্ধে এভাবে ষড়যন্ত্র করে ওঠে—সেই দুর্বলতার শিকার হবার কারণগুলিকে লেখক

বর্তমান গ্রন্থের কয়েকটি নিবন্ধে সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন এবং সেইসঙ্গে জটিল আবহাওয়া বদলের সহজ সমাধান করবার চাবিকাঠিটিরও ইংগিত দিয়েছেন। কেটে যাবে মেঘ, উদ্বেগ ও রাতজাগা ইত্যাদি ভুলতে শেখা যায়, সমালোচনা সইতে পারেন, পারি বাবু আর পারি না বাবু, যা চান সত্যি চান, সৃজন ক্ষমতা ও বুদ্ধি, বিপদ—অহঙ্কার জাগছে কিংবা বেদনা কমানোর মনোকৌশল ইত্যাদি নিবন্ধাবলী উপর্যুক্ত প্রসংগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু মনোবিজ্ঞানের তথ্যকে সরসভাবে উত্থাপন নয়, এমন একটি বিশেষ ভংগীকে তিনি বেছে নিয়েছেন যা রসাস্বাদন ব্যতিরেকেও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার সহায়ক বলে সাধারণ পাঠককে আরো আকর্ষণ করবে।

'কেটে যাবে মেঘ' গ্রন্থের মুদ্রণ ও গ্রন্থনা সাধারণ, এবং বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ চোখকে পীড়িত করে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ॥ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: নয়নরঞ্জন ভট্টাচার্য, খিদিরপুর। মূল্য: প্রীতি ও আগ্রহ ॥

ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সব্যসাচী। এমন কোন ভাব বা চিন্তা নেই, যা রবীন্দ্রনাথের পাওয়া যায় না। আর ভাষার বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বেও রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা ভার। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং তাঁর সাহিত্যিক মন ও চিন্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেক মনস্বী লেখক আলোচনাও করেছেন। সেদিন থেকে ক্ষোভ করার কিছু নেই। তবু আজও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আলোচনা হচ্ছে—এটা আশার কথা।

সম্প্রতি জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার প্রবীণ। এক সময়ে তরুণ বয়সে রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলেন। পরে কেমন করে রবীন্দ্র-অনুরাগী হয়ে পড়লেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'ভূমিকা'য়। 'ভূমিকা' সমেত সাতটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি শেষ হয়েছে। অধ্যায়গুলি খুবই সংক্ষিপ্ত। মোট ১১৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থ।

লেখক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্মমত ও বিশ্বাসের মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ প্রয়াস আপাতদৃষ্টিতে সার্থক হলেও কখনও সম্পূর্ণ ও সত্য হতে পারে না। কেননা, রবীন্দ্রনাথকে কোন প্রচলিত ধর্মমতের মোড়কে আচ্ছন্ন করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মনন ও অনুধ্যান লেখকের নিকট সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়নি বলেই তিনি এক সীমায়ত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে সীমিত করতে চেয়েছেন এবং বিভ্রান্ত হয়েছেন। বৈষ্ণব প্রেম বা লীলাতত্ত্বের নিরিখে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন লেখক। বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভাবজগতের সংগে সাদৃশ্য নির্ণয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু গান বা কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা গভীরভাবে অনুশীলন করে জেনেছেন তাঁরা সকলেই

একমত যে, মূর্তিসাপেক্ষ যে প্রেম বৈষ্ণব কাব্যে অভিসার, মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি বিচিত্র রসকে প্রকাশ করেছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঠিক সেই প্রেম মূল উপজীব্য হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রেম, রহস্যের আঁধারে ঘেরা, নব নব বিচিত্ররূপে তার প্রকাশ। তাঁর প্রেমের দেবতাও রহস্যময় এবং তাঁর অধিষ্ঠান যে কখন কোথায়, কবি স্বয়ং তাও ঠিকমত জানেন না। বৈষ্ণব কাব্যে এই রহস্যের আবরণ বা ইঙ্গিত নেই। বৈষ্ণব প্রেমলীলা অতীব সহজ ও সরল। এ লীলা প্রায় সবারই জানা। কোথায় এর সূচনা ও শেষ তার জন্য বুদ্ধি বা কল্পনারও আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বৈষ্ণবের সহজ ভক্তির সুরও রবীন্দ্রনাথের গানে তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। নিশ্চয়ই এর কারণও আছে। বৈষ্ণব কবিরা প্রচলিত ধর্মমত ও বিশ্বাসকে জীবনে আশ্রয় করেছিলেন, ফলে সহজ ভক্তি সাধনাও তার অন্যতম অঙ্গ বলেই তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং অতি সহজেই সে ভক্তিতে তাঁদের হৃদয় অভিসিঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এই বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তিনি কোন প্রচলিত ধর্মমতের নিগড়ে নিজের মনকে বেঁধে ফেলেন নি এবং তাই রবীন্দ্র-কাব্যে বিরহের যে দুঃখ বেদনা, মিলনের যে আনন্দ-দ্যোতনা, ভক্তের সংগে ভগবানের যে নিভৃত গোপন অভিসার তার সংগে বৈষ্ণব কবিতার মিলন-বিরহ প্রভৃতি বিচিত্র-রসের সাদৃশ্য অনুভূত হলেও তা সম্পূর্ণ এক নয়। রবীন্দ্র-অধ্যাত্ম সাধনা বা অধ্যাত্ম-রস বৈষ্ণব সাধনা বা অধ্যাত্ম-রস থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ একক। তাঁর সংগে কারো তুলনা করে একাকার করা বিভ্রান্ত মনের পরিচয়। লেখক জিতেন্দ্রনাথ তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই মৌলিক ভ্রমের বশবর্তী হয়েছেন। সেইদিক থেকে গ্রন্থটি কতখানি পাঠকের নিকট সমাদৃত হবে, সে-বিষয়ে আমার সংশয় আছে।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর প্রতিকৃতির জন্য আকর্ষণীয়।

অধীর দে

শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য। তারা সাঁতরা। পরিবেশক : কারেন্ট বুক সপ, ৫৭এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : এক টাকা ॥

'দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্রের শৈশবের শিশুশয্যা, ভাগলপুর যৌবনের উপবন এবং সামতাবেড় বার্ধক্যের বারাণসী।' রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়া জেলার রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতাবেড় (পাণিত্রাস) গ্রামে তিনি একটা বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে তিনি তাঁর সেই নবনির্মিত বাসভবনে বসবাস শুরু করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই গ্রামের বাড়ীতেই তিনি কাটান। নানা দিক থেকে তাঁর জীবনের এই সময়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শেষ জীবনের কয়েকখানি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস সেই সময়েই রচিত হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর সেই পল্লীভবনটিকে বড়ই ভালবাসতেন। তাঁর প্রমাণ আছে তাঁরই লেখা একটা চিঠিতে : 'পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ী আর রূপনারায়ণ নদ—এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশি দিন কোথাও থাকতে পারি নে।' শুধু তাই

নয়, এই গ্রাম ও গ্রামবাসীদেরও ভালবেসেছিলেন প্রাণ দিয়ে—তাদের সংগে একাত্মও হয়ে গিয়েছিলেন। ‘কেবলমাত্র হতভাগ্য পল্লীবাসীদের দুঃখ, দৈন্যকেই তিনি সাহিত্যের মধ্যে তুলে ধরেননি, এই সব বঞ্চিত ও হতভাগ্যদের প্রাত্যহিক জীবনের মাঝেও তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন।’

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের এই জীবন-কাহিনী এবং সেই সঙ্গে তাঁর সেই সময়কার সাহিত্যিক-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনকে, আলোচ্য গ্রন্থের সাতটি প্রবন্ধে স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্য গ্রন্থটি শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়-পর্বের জীবনীগ্রন্থ নয়। ফলে ধারাবাহিকভাবে এখানে তাঁর জীবন-কাহিনীকে পাওয়া যাবে না। তবে, গবেষণামূলক অনুসন্ধান ও অনুশীলন চালিয়ে শ্রীসাঁতরা প্রবন্ধ সপ্তকে শরৎচন্দ্রের পল্লীভবন, পল্লীজীবন, পারিবারিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, গ্রন্থাগার এবং পল্লীদরদী শরৎচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায় প্রবন্ধগুলির ওপর আলোকপাত করেছেন। এবং বলা যায় যে, শরৎচন্দ্র-সম্পর্কে উৎসাহী ও আগ্রহশীল-পাঠকরা এই গ্রন্থটির মধ্যে তাঁদের কৌতূহল মেটাবার অনেক তথ্যই পাবেন। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রবন্ধটি এবং পরিশিষ্টে প্রদত্ত সেই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তকের তালিকাটি বর্তমান গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ।

সামতাবেড়েতে বসবাস করতে চাওয়ার শুরু থেকেই শরৎচন্দ্রকে ঐ অঞ্চলের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সমাজপতিদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় বিরোধের মুখোমুখি হয়ে যথেষ্ট নাজেহাল হতে হয়েছিল। কেননা, ‘পল্লীসমাজ’, ‘পণ্ডিতমশাই’ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা শরৎচন্দ্রকে তাঁদের গ্রামে বাস করতে দেবার মতো উদারতা তাঁদের ছিল না। সেই প্রাথমিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হবার পর তাঁরা সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে অপমান করার ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু সেখানেও তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সময়ে ঐ সব সমাজপতিরা শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিরণ্ময়ীদেবী সম্পর্কে কুৎসা রটনাতেও পিছপা হননি। সে-সব কিছুকে উপেক্ষা করেই তিনি গ্রামে বাস করেছিলেন এবং সমস্ত গ্রামবাসীকে ভালবেসে তাদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ তাঁকে একবার ফৌজদারী মামলাতেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। তবুও পল্লীর প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। বন্যার হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্যে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। রোগাক্রান্তদের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করতেন এবং ঔষধাদি দিতেন—বিনামূল্যে। গ্রামবাসীদের কাছে তাঁর পরিচয় ‘দাদাঠাকুর’ এবং তাঁর চিকিৎসা ধন্বন্তরির সমান। এখানে বসবাসকালেও দরিদ্র্য স্ত্রীলোকদের প্রতি তাঁর অসীম দয়ার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। নারী-শিক্ষা ও নারী প্রগতির জন্য তিনি স্কুলও তৈরী করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন সম্পর্কে যে সব তথ্য লেখক দিয়েছেন তাতে দেখা যায়: তিনি ‘বাড়ীর নিচের তলায় কাঁচের জানলা দিয়ে তৈরী একটা ছোট্ট ঘরে লেখাপড়া করতেন। লেখার সময়ে নির্জনতা পছন্দ করতেন।’ লেখার সময় যাতে মনের স্বাচ্ছন্দ্যমত লিখতে পারেন তার ব্যবস্থা ছিল। গড়গড়ায় তামাক খেতেন—লেখার সময়। দাবা ও পাশা খেলায় উৎসাহী ছিলেন। রেডিওর গান পছন্দ করতেন। মাছ ধরতে ভালবাসতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুব হিসেবি লোক ছিলেন। গ্রামবাসীদের টাকা-পয়সা দেওয়া ছাড়া আইনগত পরামর্শ এবং দরখাস্ত লিখে দেওয়াও তাঁর দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ ছিল।

হিরণ্ময়ীদেবী সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি লাজুক, নিষ্ঠাবতী ও ধর্মশীলা ছিলেন। শরৎচন্দ্রের জীবনে হিরণ্ময়দেবীর প্রভাব ছিলো। হিরণ্ময়ীদেবী সামতাবেড়ের বাড়ীতে মারা যান। এ-সম্পর্কে পূর্ব প্রকাশিত (ভিন্ন লেখকের) এক গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যের ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছে।

সামতাবেড়ে থাকা কালেই তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ নেন। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা এবং মতামত সম্পর্কিত প্রবন্ধটিও সুপাঠ্য।

সব মিলিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি তথ্যপূর্ণ ও মূল্যবান এবং সুখপাঠ্যও। এই জাতীয় গ্রন্থ উপহার দেবার জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ। তা সত্ত্বেও দুটি বিষয়ে উল্লেখ করতে হচ্ছে : (১) কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে কিছু কিছু পুনরুক্তি দোষ রয়েছে। এ-সম্পর্কে ভূমিকায় ত্রুটি স্বীকার করে লেখক দায় সেরেছেন। গ্রন্থকারের দিক থেকে এটি অভিপ্রেত হওয়া উচিত নয়। গ্রন্থিবদ্ধ করার সময় প্রবন্ধগুলিকে এই ত্রুটি-মুক্তি করা উচিত ছিল। তা না করায় শরৎচন্দ্রের প্রতি অবহেলা, গ্রন্থের প্রতি অমর্যাদা এবং পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। (২) প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় লিখিত হলেও, গ্রন্থ রচনার সময় ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে শুরু ক'রে শরৎচন্দ্রের জীবনের ধারাবাহিকতার দিকে নজর রেখে ধারাবাহিকভাবেই শরৎচন্দ্রর ব্যক্তি ও সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করলে গ্রন্থটি আরও সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হতো।

তারাপদ পাল

Regd. No. C-815 Phone : 23-5155 March '70 (0·50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সপ্তদশ বর্ষ ॥ চৈত্র, ১৩৭৬

সমকালীন

সবেমাত্র বেরিয়েছে

ক্রীমটি সত্যিই ভাল!
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

মোটা লাভ

সহজেই ভাঙানো যেতে পারে

করের ক্ষেত্রে ভালো রকমের রেয়াৎ পাওয়া যায়

সুরক্ষিত বিনিয়োগ

● আপোনার ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, অনুমোদিত এজেন্ট কিংবা দালালের কাছ থেকে ইউনিট্ কিনুন।

ইউনিট্ এমন এক অর্থ বিনিয়োগ ব্যবস্থা যাতে আপনি সদাসর্বদা আস্থা রাখতে পারেন।

ইউনিট্ ট্রাস্ট অফ্ ইণ্ডিয়া, বম্বে ● কলিকাতা ● দিল্লী ● মাদ্রাজ

davp 69/507

সপ্তদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

চৈত্র তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মর্ডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ছড়া-প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ

তারাপদ সাঁতরা

সবুজ প্রান্তরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা ছোট-বড় কত না নদ-নদী আর কত যে তার নাম; গাছপালা আর জঙ্গল, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ—এরই ধারে ধারে গড়ে উঠেছে বাংলার গ্রাম জনপদ। বহুদিন আর বহু শতাব্দী ধরেই এই পরিবেশে গড়ে উঠেছে বাংলার পল্লীজীবন; গতানুগতিক জীবনযাত্রার তালে তালে পা ফেলে তার যাত্রা নয়—তার দীর্ঘদিনের জীবনের মধ্যে গ্রাম বাংলার এই সমাজ পরিবেশন করেছে অনেক নতুনত্বের—অনেক সৌন্দর্য ও ভাবের কল্পনায়। এই ভাবকল্পনার ঐশ্বর্য যে কত বিস্তৃত ছিল, তার কিছুটা সন্ধান পাওয়া যেতে পারে গ্রাম বাংলার পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে থাকা প্রচলিত ছড়া-প্রবাদ, গান আর নাচের মধ্যে। নিছক সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা নিয়ে কেউ রচনা করেনি এই সব ছড়া গান আর প্রবাদ প্রবচন। নিজেদের অগোচরে পল্লীর মানুষেরা তাদের মুখে মুখে তৈরী রচনার মধ্যে পল্লীর জীবনকথা, লোক-সংস্কার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ভাবাদর্শের পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

বলা যেতে পারে পল্লীরমণীরা সেকালে কথায় কথায় ছড়া কাটতেন। ছড়া কাটতেন কারুর বিষয়ে শ্লেষ করে, ব্যঙ্গ করে, আবার কখনও বা প্রশংসা করে। পল্লীরমণীদের নিত্যদিনের রচিত ও ব্যবহৃত এই সব গ্রাম্যছড়া ছাড়াও সাধারণ মানুষেরাও যে-সব ছড়া প্রবাদ রচনা করেছেন, তার মধ্যে অনেক সরস কাহিনীও প্রচ্ছন্ন থাকতো। এর মধ্যে সেকালের গ্রামীন সমাজচিত্র যেটুকু ছড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা আজ ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হয়ে উঠেছে। তাই দেখি, জেলার বা অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস লেখকেরা ছড়া-প্রবাদের এই সব উপাদানকে অস্বীকার করতে পারেন নি; প্রচলিত ছড়াগুলিকে সামাজিক

ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তাঁদের রচনাতেও ঠাঁই দিয়েছেন। চলতি কথায় প্রচলিত 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' বা 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' এই সব ছড়া-প্রবাদগুলির মধ্যেই তা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ঐতিহাসিক বা সামাজিক উপাদান। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, এই সব ছড়াগুলি হলো তাই সামাজিক ইতিহাসের ফসিল মাত্র। 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থের যশস্বী লেখক সুশীলকুমার দে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'সামাজিক ইতিহাস স্থানীয় গালগল্প বা রসিকতা যাহাকে ফরাসী ভাষায় বলে blason's populaires—অথবা প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের কৌতুককর বর্ণনা বা বিদ্রূপ অনেক প্রবাদে স্পষ্ট পাওয়া যায়।'

অবশ্য একথা ঠিক যে, বাঙালীর জাতীয় মানসের পরিচয় পেতে গেলে এইসব ছড়া-প্রবাদের মধ্যে যে উপকরণ মিলতে পারে সে উপকরণ কিন্তু একদিক থেকে ইতিহাসের সামগ্রী হিসেবে দাবী করতে পারে না। কেননা, বস্তুনিষ্ঠাই তো ঐতিহাসিকের ধর্ম—সেই স্বধর্মে থেকে ক্ষীর সংগ্রহ করাই তার কর্তব্য।

অন্যদিকে সমাজ জীবনের পরিচয় অন্বেষণে যদি ছড়া-প্রবাদের উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে শ্লীল-অশ্লীল প্রশ্নটি বাদ দিতে হয়। সেকালের সমাজ জীবন ও রুচিবোধ আজকের থেকে অনেক পৃথক। তাই সমাজবিজ্ঞানীরা নির্বিবাদে এই সব ছড়া-প্রবাদ সংগ্রহকেই প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য করেছেন—শ্লীল কিংবা অশ্লীল প্রশ্ন হিসেবে না রেখে সবগুলিরই মূল্য সমান দিয়েছেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে ছড়ার মধ্যে অশ্লীলতার গন্ধ থাকলেও তা জাতিতত্ব ও নৃতত্ব আলোচনার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। সবশেষে ছড়ার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যেতে পারে, 'এমন প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।'

এক্ষেত্রে বাঙালীর জীবনচর্যার ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপকরণ এই সব ছাড়া-প্রবাদের মধ্যে কতটা অন্তর্নিহিত আর কতটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা আলোচনা করা যাক্। দেখা যাচ্ছে, মঙ্গলকাব্যের একটানা আধিপত্যের যুগেও মঙ্গলকাব্যের কবিরা গ্রাম বাংলার এই উপকরণকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও এর স্পর্শ যে মাঝে মাঝে প'ড়েছে, এর রচনার কাঠামো যে মঙ্গলকাব্য-রচয়িতারাও ব্যবহার করেছেন তাও সংগৃহীত ছড়া প্রবাদের আলোচনায় সম্যক উপলব্ধি হবে।

উদাহরণ স্বরূপ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ নিয়ে রচিত একটি ছড়ায় বলা হয়েছে—

ন' বসান বারো দা, যে বলেতে পারে জানবে সে তমলুকের ছা।

অর্থাৎ এর অন্তর্নিহিত অর্থ করলে দাঁড়ায়—মেদিনীপুর জেলার তমলুক অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলের নামকরণ হয়েছে 'বসান' এবং 'দহ' বা অপভ্রংশে 'দা যুক্ত নামের সংযোগে। যেমন ভগবান বসান, নয়াবসান, সারদা বসান, শ্রীধর বসান আর দা'য়ের ক্ষেত্রে খুকুরদা, নারানদা, মেছেদা তিলদা প্রভৃতি। সুতরাং এই সব গ্রামগুলির হদিশ দিতে পারে তমলুক অঞ্চলের অধিবাসীরা। আর এই জন্যেই তমলুক অঞ্চলের সন্তান হিসেবে সে এই গৌরবের অধিকারী হতে পারে একান্তই।

উল্লিখিত ছড়াটির আবেদন প্রসঙ্গে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলার গ্রামীন

জীবনে লৌকিক ধাঁধার যে সুপ্রচলন ছিল—এটিও তার প্রভাব থেকে যে মুক্ত হতে পারে নি তা মুর্শিদাবাদ থেকে সংগৃহীত অনুরূপ এক ছড়ায় ধাঁধার মত প্রশ্ন করে বলা হয়েছে—

রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা
এক কথায় যে বলতে পারে　　সে মজুমদারের বেটা। (১)

অন্যদিকে কাশীরাম দাসের রচনায় ঠিক এরই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। কাশীরাম দাসের জন্মস্থান 'ইন্দ্রাণী' অঞ্চলের জনপ্রিয়তা যেখানে ছড়ার মধ্যে স্থান পেয়েছিল তারই প্রভাব কাশীরাম দাসের লেখায় প্রবাহিত। ধাঁধার মত প্রশ্ন করেই লেখা হয়েছে—

বার ঘাট তের হাট, তিন চণ্ডী, তিনেশ্বর
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।

লৌকিক প্রচলিত ছড়ার প্রভাব কাশীরাম দাসের লেখায় যে সুস্পষ্ট তা আগের ছড়াগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তাই মনে হবে। তবে প্রসঙ্গত কাশীরাম দাসের 'ইন্দ্রাণী'র ঐতিহ্য নিয়ে রচিত ধাঁধাটির উত্তর না দিলে এ আলোচনার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে তার আলোচনায় আসছি।

'ইন্দ্রাণীর' বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক গবেষক ও আগ্রহীরা আলোচনা করতে বসে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কালের প্রবাহে সবই এখন বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে গেছে বলেই এই সব ক্ষুদ্র সামাজিক উপাদান সংগ্রহ করতে অসুবিধে দেখা দিয়েছে। তবু অনুসন্ধানের আলোকে যা সংগ্রহ করা গেছে তা হলো, একদা ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ইন্দ্রাণী অঞ্চলের পশ্চিম ও দক্ষিণ তটে অবস্থিত ছিল এই বারঘাট। সেই ঘাটগুলি হলো—(১) শাঁখারীর ঘাট (২) ইন্দ্রঘাট (৩) কদমতলার ঘাট (৪) বারদুয়ারী ঘাট (৫) কলুর ঘাট (৬) স্বরূপ পালের ঘাট (৭) বক্সীর ঘাট (৮) গণেশ মহাতার ঘাট (৯) ভাউ সিংহের ঘাট (১০) দেওয়ান ঘাট (১১) কান্তমুদী বা রাজার ঘাট (১২) পীরের ঘাট।

তের হাট হলো পর পর কাটোয়া থেকে দাঁইহাট পর্যন্ত হিসেব করলে যা দাঁড়ায়—(১) গুড়ে হাট (২) হাড়ী হাট (৩) আতু হাট (৪) ঘোষ হাট (৫) বাজু পাহু হাট (৬) পাহু হাট (৭) মণ্ডল হাট (৮) পাতাই হাট (৯) চরপাতাই হাট (১০) আকাই হাট (১১) বিকে হাট (১২) বীর হাট (১৩) দণ্ডী হাট অপভ্রংশে দাঁই হাট। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য মধ্যযুগে মুসলমান রাজত্বকালে আরও দুটি হাটের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, যা নসরাপুর এবং গঞ্জই মুর্শিদপুর নামে পরিচিত।

তিন চণ্ডী হলো, একাই চণ্ডী, পাতাই চণ্ডী ও কুলাই চণ্ডী এবং তিনেশ্বর হলো ইন্দ্রেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর ও ঘোষেশ্বর। (২)

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে এই বিষয়ে আরও এক সুস্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, লৌকিক ছড়ার উপর ভিত্তি করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরামও তাঁর কাব্যে বহুল প্রচলিত ছড়ার এই লৌকিক রূপটিকে গ্রহণ করেছেন। শিশু শ্রীমন্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুকুন্দরাম লিখেছেন—

আয় আয় রে বাছা আয়　　তুলিয়া আনিব গগন ফুল।
কি লাগিয়া কান্দ, বাছা, কি ধন চায়॥　　একেক ফুলের লক্ষেক মূল॥　ইত্যাদি

বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় থেকে সংগৃহীত ছড়াটি হলো—

আয় রে আয়। কি লেগে কান্দিস রে বাছা কি ধন তোর চাই।

* * *

তুলে এনে দিব গগন-ফুল। একটি ফুলের লক্ষ টাকা মূল॥ ইত্যাদি।

সন্দেহ নেই বহুল প্রচলিত লৌকিক এই ছড়াটিই মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছিলেন, যা কাশীরাম দাসের লেখাতেও প্রকাশ পেয়েছে এবং যার প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও একটা ধারণা করা চলতে পারে।

ছড়া-প্রবাদগুলি যে শুধু মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদেরই প্রভাবিত করেছে এমন নয়, পরবর্তীকালে তরজা ও কবিগায়কদেরও যে একান্তই প্রভাবিত করেছে তাও প্রসঙ্গান্তরে আলোচনায় দেখা যাবে। এছাড়া ছড়ার লৌকিক অবদান পরবর্তীকালে ইংরেজী শিক্ষার কাজেও ব্যবহার করা হয়েছে যার উদাহরণ হলো—

ফিলজফার-বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান—চাষা পামকিন-লাউ-কুমড়ো, কুকুম্বার-শশা।

গ্রামীন সমাজ জীবনের বৈচিত্র্যে তার পরিবেশে নানান কারণে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছিলেন, 'পূর্বে গ্রাম্য ছড়াগুলি গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদেরও সাহিত্য রসতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য ভিখারিণী ও পিতামহীদের মুখে মুখে ঘরে ঘরে প্রচারিত হইত। এখন তাঁহারা অনেকেই পড়িতে শিখিয়াছেন; বাংলার ছাপাখানার সাহিত্য তাঁহাদের হাতে পড়িয়াছে। এখন গ্রাম্য ছড়াগুলি বোধ করি সমাজের অনেক নীচের স্তরে নামিয়া গেছে।' কিন্তু এই লৌকিক সৃষ্ট ছড়া আজও যা বিস্মৃতির পূর্বে সংগ্রহ করা গেছে তার অবদানও কম নয়। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় তার পুরোনো দিনের চেহারাটার একটা চিত্ররূপ রয়ে গেছে এই সব ছড়া-প্রবাদগুলির মধ্যে। অথবা গ্রাম বসতিতে যে সম্প্রদায়ের একদিন ছিলো প্রাধান্য, তাদের পরিচয়ও দিতে পারে এইসব ছড়া-প্রবাদগুলি। প্রয়োজনবোধে এলাকার বৈশিষ্ট্যগত সাধারণ মানুষের শ্রেণীচরিত্রও স্থান-মাহাত্ম্যের কথাও স্থান পেয়েছে। কত জনপদ, কত লোকালয়, কত হাট-বাজার-গঞ্জ, কত জাতিগোষ্ঠী আর তার সংস্কৃতি আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের এই লৌকিক অবদান আজও এই পরিবর্তনের মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয় অতীত দিনের ফেলে আসা সেই জীবনের কাহিনী—সেই পুরোনো ইতিহাস। একান্তভাবে তাই বলা যেতে পারে, গ্রাম বাংলার এই ছড়া-প্রবাদগুলি হলো আঞ্চলিক লোকচেতনার গিরি নির্ঝর বিশেষ।

এই বিষয়ে পূর্বসূরীদের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বলতে পারা যায় সমগ্র ছড়া-প্রবাদের জগতে সব ছড়া-প্রবাদগুলির আলোচনায় না বসে শুধুমাত্র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত ছড়াগুলির উপরেই আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখতে চাই। প্রসঙ্গক্রমে গ্রামের বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত ছড়াগুলির আলাদা ভাবে নামকরণ সম্পর্কে হদিশ দিয়েছেন মেদিনীপুরের ঘাটাল-দাশপুরের সুপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয়। তাঁর মতে, এগুলি স্থানীয়ভাবে 'তিন এর প্রবাদ' হিসেবে প্রচলিত। পঞ্চাননবাবুর বক্তব্যকে সমর্থন করেই প্রচলিত ছড়া-প্রবাদের এই শ্রেণীবিভাগকে

ও অন্যান্য আঞ্চলিক ছড়াগুলিকে নিয়েই অতঃপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছি।

'তিন এর প্রবাদ'এর প্রথম উদাহরণ হলো, যে জাতি বা পদবীগত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গ্রামের পত্তন হয়েছে এমন একটি ছড়া—

পাল, ভটচায, খাঁ　　　তিন নিয়ে মানকর গাঁ।

আজকের এই মানকর এক সময় ছিল বর্ধমান জেলার গৌরব। তার রেশমশিল্প ও সারস্বত সাধনার কেন্দ্র হিসাবে মানকরের যে প্রসিদ্ধি তার মূলে ছিল ছড়ায় বর্ণিত ঐ সব পরিবারের অবদান। আজও মানকরের এই সব পরিবারের প্রতিষ্ঠিত সুদৃশ্য দেবালয় ও জীর্ণ অট্টালিকাগুলি মানকরের পূর্ব গৌরবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

হাওড়া জেলায় প্রচলিত এমন একটি ছড়ায় গ্রামের প্রধান প্রধান পরিবারে উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে—

রায় বাড়ুজ্জে মোল্লা　　　তিন নিয়ে খালনা।

বর্ধিষ্ণু এই খালনা গ্রামের পরিচয় উপরিউক্ত পরিবারের অবদানকে যে কেন্দ্র করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খালনা সম্পর্কে অন্য একটি ছড়া প্রচলিত আছে। খালনা গ্রামের অবস্থিতি নীচু জায়গায় হওয়ায় প্রায় বন্যায় ডুবে যেতো। তাই বলা হয়েছে—

খাল, নালা, বন্যা　　　তিন নিয়ে খালনা।

অনুরূপ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীর কাছাকাছি পাতেণ্ডা গ্রামের প্রধান বসতকারীরা চিত্রিত হয়েছেন—　রায়, লস্কর, খাঁ।　　　তিনে পাতেণ্ডা গাঁ।

এই ভাবেই　　　সিং শিমলা কর　　　তিনে জাজীনগর।

উল্লিখিত জাজীনগর গ্রামটি হলো বীরভূমের উত্তর-পূর্বের শেষ সীমান্তে অবস্থিত। ছড়ায় বর্ণিত সিং হলো সিংহ উপাধিধারী কায়স্থ, শিমলা হলো শিমলাল গাঞী ব্রাহ্মণ এবং কর বৈদ্যজাতিভুর্ক্ত পরিবাররাই জাজীনগর গ্রামের আদি বাসিন্দা। এখনও এই গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের বাস আছে।

পেশাগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে সব গ্রাম-জনপদ 'তিন এর সংবাদ' এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা হলো—　　ঘেঁটেল. চেটেল, ফ'ড়ে,　　　তিন নিয়ে উলুবেড়ে।

হাওড়া জেলায় এই উলুবেড়ে এলাকার পুরানো দিনের চিত্রটিকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এই ছড়াটির মধ্যে। এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হুগলী ভাগীরথী নদী আর ওপারে আছিপুর। ঘাট পারাপারের জন্যে যারা নিযুক্ত তারা তো ঘেঁটেল হবেনই। (মতান্তরে, কেউ কেউ বলেন, তখনকার দিনের কোন সামন্ত রাজার ঘাঁটি আগলাবার জন্যে নিযুক্ত লোককেই বলা হতো ঘাঁটিয়াল আর তা থেকে ঘেঁটেল)। চেটেলরা হলেন পথিকদের বিশ্রামস্থল চটির তদারককারী। এক সময় যখন রেললাইন বসেনি, তখন পুরীর জগন্নাথদেবের দর্শনাভিলাষী তীর্থযাত্রীদের জন্যে উলুবেড়েতে ছিল এমন ধরণের একটি চটি। আর এই নানা কারণে উলুবেড়ের

জমজমাট চেহারা রূপ নিয়েছিল তার বিখ্যাত হাটকে কেন্দ্র ক'রেই—তার জন্যেই ক'ড়েদের আনাগোনা।

এমনি ধরণের— তাঁতি, রাজপুত, ভাট তিন নিয়ে কালীঘাট।

কালীঘাটের জমজমাট অবস্থায় যে সম্প্রদায় ছিলেন প্রধান ভূমিকায় তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বস্ত্রশিল্পের দৌলতে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে ছড়াটির মধ্যে। রাজপুত জাতিগোষ্ঠির আনাগোনা ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে আর ভাটদের বোধ হয় বলা হয়েছে, কালীঘাটের বিশেষ পূজানুষ্ঠানে নিয়োজিত ভাট ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে কেন্দ্র ক'রে।

হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। বহুল প্রচলিত প্রথাটির মধ্যে—

বাঁদর, শোভাকর, মদের ঘড়া তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া॥

হয়ত গুপ্তিপাড়ায় গাছের ডালে বাঁদরের উৎপাতের জন্যে তা ছড়ার বিষয়বস্তু হয়েছে। এ সম্পর্কে কথিত আছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তিপাড়া থেকে বানর বানরী এনে অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় করে তাদের বিবাহ দেন এবং সেই উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আনিয়ে তাদের যথাযোগ্য সম্মানও দেন। আর 'শোভাকর' অর্থে বলা যেতে পারে গুপ্তিপাড়ার 'চট্ট শোভাকর' বংশের পাণ্ডিত্যের কথা এবং বীরাচারী তান্ত্রিক সাধনার অনুষ্ঠানের জন্যে খ্যাত গুপ্তিপাড়ায় আসতো পঞ্চমকারের বিশেষ একটি উপাদান মদ্য। এইভাবেই প্রাচীন ছড়াটির মধ্যে নিহিত সেকালের গুপ্তিপাড়ার বৈশিষ্ট্য জানা যাচ্ছে। জেলা গেজেটিয়ারেতেও গুপ্তিপাড়া সম্পর্কে বলা হয়েছে—'Guptipara was a very important seat of Sanskrit learning. Many eminent Sanskrit scholars lived here among whom the most notable was family of the Shovakars (শোভাকর বংশ). Baneswar Vidyalankar and Ramgopal Vidyalbagis belonged to this family,...The name was probably derived form the fact that once it was a leading centre of Tantric practices.'

গুপ্তিপাড়ার সংস্কৃত শিক্ষার ঐতিহ্য সম্পর্কে আরও যে দুটি ছড়া প্রচলিত আছে তাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ছড়া দুটি হলো—

গুপ্তিপাড়ার মাটির গুণে দেবের ভাষা মানুষ জানে।

এবং বিসর্গ ও অনুস্বার মুখে অবিরত, আর্ক ফলার লম্বা বোঁটা নেড়া মাথা যত।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জন্যে গুপ্তিপাড়া একসময় খুবই বিখ্যাত ছিল তা ছড়ায় বর্ণিত হয়েছে। একসময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সংস্কৃত শিক্ষার্থীরা গুপ্তিপাড়ার চতুষ্পাঠিতে অধ্যয়ন করতে আসতো এবং দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় জন্যে এখানকার খুবই সুনাম ছিল।

হুগলীর রাজবল হাট এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানকার সুবিন্যস্ত পথ-ঘাট, সুরম্য ভবন, মনোরম মঠ-মন্দির, সুন্দর পুকুর ও পুকুরের ঘাট ইত্যাদির মধ্যে এই গ্রামের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই এই গ্রাম সম্পর্কে প্রবাদ রচিত হয়েছে—

চার চক্, চৌদ্দ পাড়া, তিন ঘাট এই নিয়ে হয় রাজবলহাট।

আর একটি ছড়ায়—

ছুলে, কপালী, মুচুরমান　　　তিন নিয়ে বাগনান ॥

হাওড়া জেলার বাগনান শহরের আজকের জমজমাট অবস্থাটির মধ্যে তার পুরোনো অধিবাসীদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ বাগনান মৌজার মধ্যে যারা ছিলেন প্রধান সেই মুসলমান সম্প্রদায়ের বিখ্যাত সফরদান পীরঠাকুরের প্রাচীন আস্তানা বর্তমান এবং ছুলিয়া ও কপালী সম্প্রদায়ের বসবাস এখনও রয়েছে এই অঞ্চলে। কপালী সম্প্রদায় সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। চটকল তৈরীর আগে এই কপালী সম্প্রদায়ের তখন উপজীবিকা ছিল চটের ও শনের বস্তা তৈরী করা যা স্থানীয়ভাবে প্রয়োজন মেটাতো; অথবা বলদের পিঠে ছালা দেবার জন্যে বস্তা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানের বাগনান শহরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব কোনমতে অবহেলাভরে টিকে আছে।

২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের আর একটি ছড়া—

বাঁশ, বাজানে, ঘটকেরা　　　তিন নিয়ে মাট কোমরা।

মাটকোমরা গ্রামে বাঁশের বন এবং বাদ্যকর পরিবারের অবস্থান এই ছড়াটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। গ্রামের প্রধান বসবাসকারী পরিবার হলেন ঘটক পদবীধারী ব্যক্তিগণ; তাই মাটকোমরার গৌরব এদের নিয়েই।

গ্রাম্য ছড়ায় বর্ণিত শ্রুতিমধুর অনুপ্রাসের নিদর্শন দেখা যায় যে-সব ছড়ায় তা হোল—

কথা, কড়া, কারসাজি　　　তিন ক-তে কবিরাজী।

অথবা,

বাকি, বাক্য, বাটপাড়ি　　　এই তিন নিয়ে দোকানদারি

অন্যদিকে স্থানীয় এলাকার বর্ণনায় এরই মত রচিত হয়েছে মানুষের পেশাগত, জাতিগত বা পদবীগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্ণিত ছড়া ও প্রবাদ। এই সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'ইংরেজিতে এক শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত রচনা আছে, তাহাকে Epigram বলে। ইহা যেমন সরল, তেমনই প্রত্যক্ষ। ইহার কোন কোন বিষয়ের সঙ্গে প্রবাদের সামঞ্জস্য থাকিলেও, সমগ্রভাবে বিবেচনা করিতে গেলে, ইহা এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর রচনা—ইহা প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহার একটি অংশকে মধ্যযুগের ইংরেজীতে priamel বলিত; ইহাতে কতকগুলি বিপরীতধর্মী বিষয় ও চিত্র একই বাক্যের ভিতর আনিয়া সুচতুরভাবে বিন্যাস করা হইত। বাংলাতেও অনুরূপ রচনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়।' উদাহরণ হলো—

রাঁড়, ষাঁড়, সন্ন্যেসী　　　তিন নিয়ে বারাণসী ॥

*　　*　　*

তাঁতী, গোঁসাই, পচাভুর　　　তিন নিয়ে শান্তিপুর।

এ ছড়াটি বিখ্যাত শান্তিপুরের ধুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং 'গোঁসাই' সম্পর্কে বলা যেতে পারে চৈতন্যের শিষ্য অদ্বৈত গোঁসাইয়ের বাসস্থান হওয়ায় এই ইঙ্গিত করা হয়েছে। পচা ভুর অর্থে পচা গন্ধাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। অন্যান্য ছড়াগুলি হলো—

চোর চোট্টা, হারামজাদ, এই তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ।

*

গু, গোবর, ময়লা, তিন নিয়ে নহলা (হাওড়া)

*

কাঙ্গাল, বাঙ্গাল খস্তে, তিন নিয়ে নস্তে।

*

রাস, তাস জোরের লাঠি, তিন নিয়ে পানিহাটী।

*

গাড়ী, জুড়ী, ফুলের তোড়া, তিন নিয়ে উত্তরপাড়া।

*

কুঁজড়ো, কাওয়ারী, সুর, তিন নিয়ে মেদিনীপুর।

অথবা,

রে, বে, বদসুর, তিন নিয়ে মেদিনীপুর।

*

বেহায়া, বেরসিক, বাঁকা, তিন নিয়ে ঢাকা।

অথবা,

মশা, মোল্লা, শাঁখা, এই তিনে ঢাকা।

*

পোল, পাগল, পুলো, তিন নিয়ে উলো।

*

হাড়ি, বাগ্দী, নেড়ে, এই তিনে তুলসীবেড়ে। (হাওড়া)

*

দাঙ্গা, হাঙ্গামা, মহামারি, তিন নিয়ে মেমারি। (হাওড়া)

*

ঝগড়া, বিবাদ, কলহ, তিন নিয়ে খড়দহ। (হাওড়া)

*

লুটে, কুটে, মুতের কাদা, তিন নিয়ে এড়গোদা।

মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রামের অন্তর্গত এড়গোদা গ্রামটির লুটে অর্থাৎ লুটপাটকারীদের এবং কুটে অর্থে কুষ্ঠ রোগীদের কথা বলা হয়েছে।

হাতে শিকরে, সঙ্গে কুকুর, জানবে সাতজোড়ার ঠাকুর।

*

কাঁথা, বালিশ, মশারী, তিন নিয়ে ঘুশুড়ী।

*

বামুন, বস্তি, বাঁশের গোড়া, এই তিন নিয়ে ভাঙামোড়া।

*

তাল, মান, সুর, তিন নিয়ে ভবানীপুর।

গাঁজা, গুলি ইত্যাদি নিয়ে রচিত ছড়া-প্রবাদগুলি অনেক গ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। যেমন—বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম জয়কৃষ্ণপুর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

গাঁজা, গুলি, ক্ষেপা কুকুর, তিন নিয়ে জয়কৃষ্ণপুর।

অন্যদিকে, ফরাসডাঙ্গা সম্পর্কেও তাই—

গাঁজা, গুলি, অম্বভাঙ্গা, তিন নিয়ে ফরাসডাঙ্গা।

বেহালা—শরশুনার অতীতের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা, তিন নিয়ে শরশুনা।

মেদিনীপুরের ঘাটালের অন্তর্গত দুর্বাচটির মাঠ বিখ্যাত ছিল 'পঞ্চমকার' সাধনার ক্ষেত্র হিসেবে। তাই সেই অঞ্চল ছড়ায় বর্ণিত হইয়াছে :

মদ, মাগী, চাট, তিন নিয়ে দুর্বাচটির মাঠ।

আর একটি ছড়া। ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রাম মদ চোলাইয়ের বিখ্যাত স্থান হওয়ায় বলা হয়েছে—

সুয়াপুর নাম্না,			মদে ভাতে পান্না।

বিভিন্ন স্থানে সেকালের বাংলায় গাঁজা, গুলি, চণ্ডু খাওয়া যে খুব প্রবল ছিল তা নিম্নের ছড়াটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা, গুলির কোন্নগরে,
বটতলায় মদের আড্ডা, চণ্ডুর বৌবাজারে।
এই সব মহাতীর্থ যেনা চোখে হেরে,
তার মত মহাপাপী নাই ত্রিসংসারে।

বরিশাল সম্পর্কে ছড়া—ধান খুন লাল, তিন নিয়ে বরিশাল। অন্য একটি ছড়ায়—আইতে শাল, যাইতে শাল, তিন নিয়ে বরিশাল। এখানে শাল অর্থে শালতিকেই মনে হয় বলা হয়েছে।

এক একটা অঞ্চলের গ্রামবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে—সব ছড়া রচিত হয়েছে, তার মধ্যে—

ময়নার কাঁই কুই			মণ্ডলঘাটের ধারা
চেতুয়ার বন্দোবস্ত			কাশীযোড়ার গেরা।

উল্লিখিত ছড়াটি তখনকার দিনের পরগণা ভিত্তিক এলাকার অধিবাসীদের নিয়ে রচিত। মেদিনীপুর জেলার তমলুকের কাছাকাছি ময়না পরগণার অধিবাসীদের চরিত্রটা ছিল কোন কিছু কাজ করার বিষয়ে দোমনা ভাব। তাই তারা ছড়াতে বিখ্যাত হলেন 'কাই কুই' হিসেবে গৌরব অর্জন করে। তমলুকের অপর পারে রূপনারায়ণের তীরে হাওড়া জেলার মণ্ডলঘাট পরগণা আর

তার অধিবাসীরা হলেন মামলা-মোকদ্দমায় ওস্তাদ। দণ্ডবিধি ও কার্যবিধি আইনের ধারায় সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় থাকার জন্যে হয়ত তারা 'ধারা' আখ্যায় ভূষিত হলেন। মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া বরদা পরগণার অধিবাসীদের চরিত্র আবার একটু ভিন্ন ধরণের। অহেতুক বিবাদ-বিসম্বাদ এড়িয়ে চলার জন্যে তারা হয়ত জায়গা জমির ক্ষেত্রে প্রজা বন্দোবস্ত করে দিতেন, বা কোন কাজ হাসিলের জন্যে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত করে নিতেন; তাই তারা 'বন্দোবস্তে'র আখ্যা পেলেন এবং সব শেষে মেদিনীপুরের কাশীযোড়া পরগণার অধিবাসীরা অতি সামান্য কারণেই ঝগড়া-বিবাদ করার পর সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চাইতেন 'গ্রহের ফের' বলে। তাই ছড়ায় বর্ণিত (হ'য়েছেন 'কাশীযোড়ার গেরা' হিসেবে। বলা যেতে পারে, বৃটিশ শাসনের জেলা তৈরী হবার আগে পরগণা ভিত্তিক সাধারণ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এই ছড়াটি।

২৪ পরগণার পোয়ালী গ্রামটি ছিল শান্ত নিরুপদ্রব; আর তার নিরক্ষর অধিবাসীরাও একান্তই নিরীহ। তাই অপর গ্রামের লোকেরা এই গ্রামের উদ্দেশ্যে ছড়া কেটে আখ্যা দিয়েছিলো—

যে যাবে পোয়ালী, সব বুদ্ধিটা খেয়ালী।

বেলেঘাটাকে নিয়ে এই ধরণের আর একটি ছড়া—

যার নেই পুঁজিপাটা সে যাবে বেলেঘাটা।

অপর একটি ছড়ায়—

উলোর মেয়ে কুলুজী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা, শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

পক্ষান্তরে—

উলোর মেয়ে কুনকুচুটি, নদের মেয়ের খোঁপা শান্তিপুরে হাত নাড়া দেয়, গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

আলোচ্য এই ছড়াটিতেও বর্ণিত হয়েছে মেয়েদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের গুণাগুণ। নদীয়া জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম উলা-বীরনগরের মেয়েরা তাদের কুলগর্বে গর্বিতা, অগ্রদ্বীপের পক্ষান্তরে, নদীয়ার মেয়েরা বেণী রচনায় পারদর্শিনী; শান্তিপুরে মেয়েদের দম্ভের ও উন্নাসিকতার জন্যে 'হাতনাড়া' এবং গুপ্তিপাড়ার মেয়েদের কলহপ্রিয়তা বা মুখরার জন্যে 'চোপা' আখ্যায় রচিত ছড়াটি সেকালের বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র-চিত্র।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যেতে পারে এই ধরণের ছড়া প্রবাদগুলি থেকে পরবর্তীকালে কবিয়াল ও তর্জা গায়করা যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তাদের রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। কোন্ জায়গার কি ভাল তা নিয়ে যে ছড়ায় বলা হয়েছে—

পাবনার ঘি ভাল বাঁকুড়ার দই ধনিয়াখালির খৈ, ইত্যাদি।

ঠিক এইরকমই গান রচনা করেছেন কবিয়ালরা। তার নমুনা হলো—

রাঢ়ের রাধুনী বামুন, বস্তিদের পেতে
নদীয়ার নবীন নাগর, কে পারে গো সইতে ?
কৃষ্ণনগরের ময়দা ভাল মালদহের ভাল আম,
উলোর ভাল বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম।
শান্তিপুরের শাড়ী ভাল, ভাল তার খোঁপা,
গুপ্তিপাড়ার গিন্নি ভাল, ভাল তার চোপা।

বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রাকে একবার বলা হ'য়েছিল কোন জায়গার কি ভাল তার জবাব দিতে। তার দেওয়া এই জবাবের কবিগান প্রসঙ্গত উপরে উল্লিখিত গানের সঙ্গে তুলনা-

মূলক উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর গানটী হলো—

ময়মনসিংহের মুগ ভাল, খুলনার দই
ঢাকার ভাল পাত-ক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই
কৃষ্ণনগরের ক্ষীর-পুলী ভাল, মালদহের ভাল আম
উলোর ভাল বাঁদর-বাবু, মুর্শিদাবাদের জাম।
রংপুরের শ্বশুর ভাল, রাজসাহীর জামাই,
নোয়াখালির নৌকা ভাল, চট্টগ্রামের ধাই।

শান্তিপুরের শালী ভাল, গুপ্তিপাড়ার মেয়ে,
মানিককুণ্ডের মুলো ভাল, চন্দ্রকোনা ঘিয়ে।
দিনাজপুরের কায়েৎ ভাল, হাবড়ার ভাল শুঁড়ি
পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভাল, ফরিদপুরের মুড়ি।
বর্ধমানের ঢাকী ভাল, চব্বিশ পরগণার গোপ
পদ্মানদীর ইলিশ ভাল, কিন্তু বংশ লোপ।

হুগলীর ভাল কোটাল-লেঠেল, বীরভুমের ভাল ঘোল,
ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভাল হরি হরি বোল।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক আরও অন্যান্য ছড়ার নমুনা হলো—

দাঁতে মিশি, কাপড় বাসি, বাড়ী কোথা না কুড়মুন পলাশী।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, বর্ধমান জেলার কুড়মুন পলাশী হলো, রেভারেণ্ড লালবিহারী দের জন্মস্থান।

*

আঁকুড়া, বাঁকুড়াবাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি।

*

বেটি মাটি মিথ্যেকথা, তিন নিয়ে কোলকাতা।

*

লম্বা কোঁচা কাছাটান, তবে জানবে বর্ধমান।

*

খোল, বোল, মালার তোড়, তবে জানবে কাঁটা গোড়।

*

তরকারীতে দেয় না নুন, বাড়ী কোথা না আমারুণ।

বৈষ্ণব প্রধান শান্তিপুর সম্পর্কে ছড়া কেটে তুলে ধরা হয়েছে সেকালের চিত্রটি—

শান্তিপুর রসের সাগর এক এক ঘরে তিন তিন নাগর।

অপরদিকে ঘাঁটালের আলমগঞ্জের কাছাকাছি কৃষ্ণনগর গ্রাম সম্পর্কেও বলা হয়েছে—

কেষ্টনগর রসের সাগর এক এক মাগী তিন তিন নাগর।

রাজসাহীতেও (অধুনা পূর্বপাকিস্তান) প্রচলিত এই ধরণের ছড়াটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। সেটি হলো—

দোম দোম দোম—মাদার,
এ ফক'নরীর সাত ভাতার,
তাও ফক'ননির মন ব্যাজার।

এখানে 'মাদার' অর্থে করা হয়েছে পীরঠাকুর, ফক'ননির বলতে বলা হ'য়েছে ভিখারিণীর

এবং ব্যাজার অর্থে হলো অসন্তুষ্ট।

অন্যদিকে হুগলী জেলার যে গ্রামগুলি সম্পর্কে বদনাম আছে সেই গ্রামগুলিকে সাধারণ লোকে ছড়ায় অন্তর্ভূক্ত করেছে—

বাঘাটি খানকিপাড়া, কোন্নগাঁ লক্ষ্মীছাড়া, জয়পুরেতে মদের হাড়া।

হাওড়া জেলাতেও অনুরূপ আর একটি ছড়া—

দেউল গ্রাম ঠাকুর মানকুর যেমন তেমন, খাক্সীর সব শালা ঢেমন।

আবার আঞ্চলিকভাবে গ্রামবাসীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেসব ছড়া রচনা করা হয়েছে তা হলো— গোঁফ ছাঁটা লম্বা দাড়ি তার হচ্ছে রাণায় বাড়ি।

'রাণা' গ্রামটি হোল হাওড়া জেলার একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। তাই ছড়াতে এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অপর একটি ছড়া হলো—

পা গোদা গোদা মাথা হেঁড়ে তার বাড়ী ভুলগেড়ে।

হাওড়া জেলার ভুলগেড়ে গ্রামটির অধিকাংশ অধিবাসীরা ফুল ও ফল গাছের চারা মেলায়, হাটে ও বাজারে বিক্রয় করেন। মাথায় তাদের চারাগাছের বোঝা নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে যেতে হয়। বর্ষায় মেঠো পথ কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে আর তার উপর দিয়ে চলাফেরায় কাদা লেগে পা ভারী হয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় কাদামাখা পা'কে গোদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এরই উপর যখন মাথায় চারাগাছের বোঝা থাকে তখন গ্রামবাসীদের চেহারা যা দাঁড়ায় তাতেই ঐ ছড়ায় সৃষ্টি।

আর একটি ছড়া—

গলা সরু পেট ভারি, ঠিক জানবে আড্ডায় বাড়ী।

মেদিনীপুর জেলায় এক সময়ে খুব ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। কেশপুর থানার আড্ডা-মালঘাটি গ্রামটির ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের উদ্দেশ করে এই এই ছড়াটি তাই বলা হয়েছে।

শারীরিক বা আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই ধরণের আরও যে-সব ছড়া রচিত হ'য়েছিল তা হলো—

তেল থাকতে রুক্ষ গা খরসান যাবি তো সামন্তভূম যা।

*

বাঁকা সিঁথে লম্বা ছোট, তবে জানবে পঞ্চ কোট।

*

মুখে পান হাতে চুন তবে জানবে মানভূম

*

কালো কাপড়, মাথায় চুল বাড়ী কোথা না ভাঁটাকুল।

*

ময়নার গোদ, পিংলার গোদ।

মেদিনীপুর জেলার ময়না থানায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের বসবাস খুব বেশী থাকায় এবং পিঙ্গলা থানায় ফাইলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব—এই ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে।

গ্রাম বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত ছড়াগুলির মধ্য থেকে আমরা সেই গ্রামগুলির অতীত দিনের চেহারাটিকে উপলব্ধি করতে পারি যা বর্তমানের গ্রামগুলির পরিবর্তিত রূপ দেখে কোনক্রমেই ধারণা করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ—

বাঁশ, বাদুড়, ভূত তিন নিয়ে ক্ষেপুত

মেদিনীপুর জেলার ক্ষেপুত গ্রামটি হলো বেশ প্রাচীন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দিগ্‌বন্দনা প্রসঙ্গে এই গ্রামটির উল্লেখ আছে এবং ছড়ার অন্তর্ভুক্ত বাঁশগাছের প্রাধান্য ও সেই সঙ্গে বাদুড়ের আধিক্য এ সবই এখনও বর্তমান। তবে ভূতটা যে কী উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, তা জানা যায় নি। আর একটি ছড়া—

বাছরীর মাটি, যাবে গুটি গুটি যদি যাবে ছুটে, খোলাম যাবে ফুটে।

সম্প্রতি হাওড়া জেলার এই বাছরী গ্রাম থেকে পাল ও সেন যুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। পোড়ামাটির মৃৎপাত্র ও তার ভগ্নাংশ এই গ্রামটির চতুর্দিকে এমনভাবে বিস্তৃত রয়েছে যে, তার প্রকৃতিগত চেহারা ধরা পড়েছে সঠিকভাবে এই ছড়ায়। অন্য একটি ছড়ায়—

যে খেয়েছে কেওড়ার ঝোল, সে ছেড়েছে মায়ের কোল।

সুন্দরবনের জঙ্গলে হরিণ ও বানরের কাছে কেওড়া গাছের ফল ও পাতা খুবই উপাদেয় খাদ্য। এই গাছের ফলগুলি ছোট আকারের গাব গাছের ফলের মত। স্বাদ হলো জলপাই-এর মত টক এবং বীজ খুব বড়। জানা গেছে, সুন্দরবন এলাকার অধিবাসীরা এই ফলের খোসা বাদ দিয়ে নুন সহযোগে এক ধরণের চাটনি তৈরী করে যা সত্যিই উপাদেয়। তাই সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা 'কেওড়ার ঝোল' সম্পর্কে ছড়ায় তাদের প্রশস্তিকে অমর করে রেখেছে।

গ্রামের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং উৎপন্ন শস্যাদি নিয়ে যে সব গ্রাম-জনপদ ছড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা হলো

তাল, বাবলা, ছুঁচো বেচা, এই চার নিয়ে মুড়োগাছা।

*

তাল তাড়ি বুড়ো এঁড়ে এই তিন নিয়ে মাগুড়ে।

*

আম, আমড়া কুঁজড়ো ধান, তিন নিয়ে বর্ধমান

*

খানা ডোবা পুকুর, তিন নিয়ে খানপুর। (হাওড়া জেলা)

*

অলি, গলি, সুড়ঙ্গ, তিন নিয়ে উদঙ্গ। („)

ধান, চাল কুঁড়ো, তিন নিয়ে পাঁশকুড়ো (মেদিনীপুর)

*

কলাপাতা, কাঠের আঁটি এই নিয়ে বৈদ্যবাটি।

*

বাঁশ বাক্স ডোবা তিন নদের শোভা

*

পোস্ত টক কলাইয়ের ডাল, এই তিন নিয়ে বীরভূমের চাল।

*

ডাঁস, মশা, মাছি তিন নিয়ে সাঁতরাগাছি। (হাওড়া জেলা)

কলকাতা সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত যে বিখ্যাত ছড়া বেঁধেছিলেন, তাও এর সঙ্গে তুলনীয়—

রেতে মশা দিনে মাছি এই তাড়য়ে কলকেতায় আছি।

এছাড়া কুটিরশিল্প ও অন্যান্য সমৃদ্ধিসূচক গ্রাম-নগরকে কেন্দ্র করে যে সব ছড়া রচিত হ'য়েছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল—

গুলি খিলি মতিচুর তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।

মতান্তরে,

গান বাজনা মতিচুর এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।

বাঁকুড়া জেলায় মল্লরাজদের রাজধানী বিষ্ণুপুর অঞ্চল একদা যে তার অম্বরী তামাক, পান এবং 'মতিচুর' নামক মিষ্টান্নে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তা উল্লিখিত ছড়াটিতেই প্রমাণ হয়। বিষ্ণুপুর সম্পর্কে দ্বিতীয় ছড়াটিতে বর্ণিত গান বাজনার কথাও যদি ধরা যায়, তাহলেও বিষ্ণুপুরের সমৃদ্ধি যে তার সঙ্গীতকেও কেন্দ্র করে সূচিত হয়েছিল তা বোঝা যায় এই সঙ্গীতের পরবর্তী কালে 'বিষ্ণুপুর-ঘরানা' নামকরণ থেকে। ছড়ায় বর্ণিত 'মতিচুর' মিষ্টান্নটির বিশেষত্ব সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'মতিচুর' মিষ্টান্ন বিষ্ণুপুরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে খ্যাত। স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পিয়াল ফলের বীজ গুঁড়ো করে ময়দার মত করা হতো। তারপর তা দিয়ে তৈরী মিষ্টান্নটিকে ঘিয়ে ভাজা হোত। এই মতিচুর এতই হাল্কা ছিল যে জলের উপরও তা ভেসে বেড়াতো।

সেকালের স্থানীয় সমৃদ্ধিসূচক আর একটি বিখ্যাত ছড়া—

বাহান্ন বাজার তিপান্ন গলি তবে বুঝবি রাধানগরে এলি।

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা ছিল একদা অতি সমৃদ্ধশালী শহর আর সেই সহরের বাহান্নটি জায়গায় বসতো বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভারের বাজার। অপরদিকে এই বিরাট বাজারটিকে কেন্দ্র করে যে তিপান্নটি অলি-গলির সৃষ্টি হয়েছিল, তাই পার হয়ে চন্দ্রকোণার শেষ সীমানা রাধানগরে পৌছানো যেত। আজও লোকমুখে প্রচলিত এই ছড়ারটি মধ্যে চন্দ্রকোণার সেই অতীত সুখ-সমৃদ্ধি আর তার বিগত গৌরবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

চন্দ্রকোণার সমৃদ্ধি নিয়ে রচিত আরও একটি ছড়া এই, প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে এবং

তা হলো—

চন্দ্রকোণার মট্‌কী ঘি　　　খেলি না তো খেলি কি ?

ছড়ায় 'মটকী' অর্থে বুঝিয়েছে হাঁড়ি। চন্দ্রকোণার বাহান্ন বাজারের একটি হোল গয়লাসাঁই আর সেখান থেকে তৈরী ঘি ঐ মটকীতে বোঝাই হয়ে ভারে ভারে ঘাটাল পর্যন্ত বাহিত হয়ে কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে চালান যেতো। দেশ বিদেশ থেকে আমদানীকৃত অজস্র ঘিয়ের মধ্যে এই 'মটকী' ঘি যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলো তা ছড়ার মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে।

চন্দ্রকোণার সমৃদ্ধির সংগে দেখা যাচ্ছে বহু ছড়া প্রবাদের সংযোগ। তাই মামাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে, একটি ছড়ায়, যা প্রসংগত উল্লেখ করলে অপ্রাসংগিক হবে না। ছড়াটি হলো—

মামা মুড়ির ধামা খেতে খেতে যায় চন্দ্রকোণা
চন্দ্রকোণায় খেজুর মেথি মামা খায় মাগের লাথি।

চন্দ্রকোণার সমৃদ্ধির মত আরও একটা ছড়া—

কাগজ কলম কালি　　　তিন নিয়ে বালী

একসময়ে 'বালীর কাগজ' নামে এক ধরণের হলদে কাগজ খুব বিখ্যাত ছিল। হাওড়ার বালীতে একদা স্থাপিত এই কাগজ কলটিরও একটা পুরাণো ইতিহাস আছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মিশনারীরা শ্রীরামপুরে একটা কাগজ কল স্থাপন করেন এবং তখনকার দিনে ঐ কাগজ শ্রীরাম পুরের কাগজ নামে খ্যাত ছিল। পরে বালী পেপার মিল শ্রীরাম পুরের ঐ কাগজ কলটিও কিনে নেয় এবং বালীর নাম পরবর্তীকালে কাগজের জন্যে খ্যাত হয়। অনুরূপ আর একটি ছড়া—

চিঁড়ে, চেটাই, ঝোঁতলা　　　তিন নিয়ে চেতলা।

কলকাতার চেতলা হাট এখনও খেজুর পাতার চাটাই এবং চিঁড়ে বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। ঝোঁতলা মাদুরের সমগোত্রীয় এবং এর কাঠিগুলি খুবই মোটা। জলা জায়গায় উৎপন্ন একধরণের মোটা পাতিঘাস থেকে পাওয়া কাঠি থেকে ঝোঁতলা তৈরী করা হোত। বর্তমানে এর ব্যবহার অনেক কমে গেছে।

দিনাজপুরের বৈশিষ্ট্য তার উৎপন্ন ফসলের মধ্যে। তাই ছড়াতে প্রকাশ পেয়েছে—

চাল চিঁড়ে গুড়, তিন নিয়ে দিনাজপুর।

রাজশাহী (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) জেলার কোথায় কি প্রসিদ্ধ তাও ছড়ার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে—

শিবগঞ্জের বিত্তি সুপারী নবাবগঞ্জের খড়,
বিহার রাতে ভাঙলো গাড়ী নেংড়া হোল বর।

এই রকমই এলাকার বিখ্যাত জিনিষ নিয়ে রচিত একটি তুলনামূলক ছড়া—

কলার মধ্যে মর্ত্তমান　　জেলার মধ্যে বর্ধমান　　আর জাতির মধ্যে মুসলমান।

আমাদের সাধারণ চলতি ছড়ার সংগে উপরিউক্ত ছড়াটি তুলনীয়—

কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা।
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা॥

অথবা, তুলনীয়— মাছের মধ্যে দাড়া জাতের মধ্যে ধাড়া।

দাড়া অর্থে বোধহয় এখানে গাংদাড়া মাছকে বুঝিয়েছে।

বীরভূম জেলার উপলয় গ্রামের সমৃদ্ধি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

ঘোষ গ্রামে মা লক্ষ্মী উপলয়ে বর।

'বীরভূম বিবরণ' গ্রন্থে এই ছড়াটির ভাবার্থ দেওয়া হয়েছে এই বলে, '…ঘোষ গ্রামের নিকটবর্তী উপলয় গ্রামে এখনো সময় সময় কোনো কোনো কৃষক আশার অতীত ফসল প্রাপ্ত হয়। কৃষকরা এই ঘটনাকে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর বর বলিয়া নির্দেশ করে।'

স্থান মাহাত্ম্য সম্পর্কে হাওড়া জেলায় প্রচলিত আর একটি ছড়া—

গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল।

ছড়ায় বর্ণিত গঙ্গা নদী বলতে হুগলী-ভাগিরথী নদীকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর পশ্চিম কূলকে বারাণসী তুল্য জ্ঞান করার কারণ হলো, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির পর কলকাতার অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার কলকাতাকে অধর্মস্থান মনে করে পশ্চিম তীরবর্তী শিবপুর, শালিখা ও রামকৃষ্ণপুরে এসে নতুন করে বসবাস সুরু করেন।

বাংলার পূজা পার্বণে এবং বিশিষ্ট দেব-দেবীর পূজানুষ্ঠানে যে সব বিখ্যাত মেলা পার্বণ অনুষ্ঠিত হোতো, তাও ছড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এইসব মেলায় ভীষণ লোক সমাগম হওয়ার জন্যে বলা হয়েছে—মানাদের জাত, কে দেয় কার পোঁদে হাত। মানাদের জাত হোল, হুগলীর মহানাদের জটেশ্বর শিবের মেলা।

বহু জনসমাগম পূর্ণ বিখ্যাত মেলাগুলি সম্পর্কে ছড়া যেন একই সুরে বাঁধা। মেদিনীপুর জেলার কুলেমেনোর স্বরূপনারায়ণের মেলা সম্পর্কে ছড়ায় বর্ণিত হয়েছে—

যে যায় কুলেমেনোর জাত কে কার পোঁদে দেয় হাত।

অন্যদিকে এইসব মেলা পার্বণের তখন একটা বড়ো আকর্ষণ ছিল মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত যাত্রা কথকতার সংগে সঙ্‌ দেখানো। চুঁচুড়ার বিখ্যাত সঙ্‌ নিয়ে কালীপ্রসন্ন লিখেছিলেন, "পূর্বে চুঁচুড়ার মত বারোইয়ারি পুজো আর কোথাও হত না। 'আচাভো' 'বোম্বা চক' প্রভৃতি সঙ প্রস্তুত হত; শহরের নানা স্থানের বাবুরা বোট, বজরা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সঙ দেখতে যেতেন; লোকের এত জনতা হত যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিল, চোরেরা আণ্ডিল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু গরীব দুঃখী গেরোস্তর হাঁড়ি চড়েনি'। চুঁচুড়ার সঙ নিয়ে তাই প্রবাদ রচনা করা হয়েছে—

গুলিখোরের কিবা ঢঙ্‌, দেখতে যেন চুঁচুড়োর সঙ্‌।

হুগলীর সঙও বিখ্যাত ছিলো—তাই বলা হয়েছে—

মোগল মিশি মাথাঘসা, তিন দেখতে হুগলী আসা।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে রচিত ছড়া প্রবাদগুলি অমর হয়ে আছে তার ধ্বংসলীলায় অবদান নিয়ে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—

আমনান ডুবু ডুবু　　পাউনান ভাসে　　সোনার মালপাড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে।

এই ছড়াটি প্রসঙ্গক্রমে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই বিখ্যাত প্রবাদ—

শান্তিপুর ডুবু ডুবু　　নদে' ভেসে যায়।

সেখানে ছিল অবশ্য ভক্তি প্রবাহের বন্যা কিন্তু আলোচ্য ছড়াটি হোল দামোদরের বন্যা প্রসঙ্গ। বলা হয়েছে হুগলী জেলার পোলবা থানার পাউনান গ্রাম বন্যায় আগে ডুবেছে আমনান গ্রাম ডুববো ডুববো অবস্থায়; কিন্তু সোনার মালপাড়া হয়ত উঁচু জায়গায় হওয়ার জন্যে এখনও বন্যার জল তার ক্ষতি করতে পারেনি। ছড়া রচয়িতারাও তাই মালপাড়াকে সোনার মালপাড়া বলে চিত্রিত করেছেন।

একদা দামোদরের বন্যায় গ্রাম গ্রামান্তর জুড়ে যে ধ্বংসলীলা সুরু হ'য়েছিল তা পল্লীবাসী কোনদিন বিস্মৃত হতে পারেনি। ছড়া কেটেছে—

ওরে নদ দামোদর　　তোরে দিয়ে আতান্তর।

শুধু ছড়া নয় প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে এই নিয়ে গানও বেঁধেছে। ১২৩০ সালের বন্যা নিয়ে রচিত একটি গান—

নদী সে দামোদর বরাকরে করেছে আনাগেনো
দুধার মিশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা॥
এল বান পঞ্চকোটে নিলেক লুটে ভাঙ্গলো রাজার গড়
ছুড়্ ছুড়্ শব্দে ভাঙ্গে পর্বত পাথর॥
মিশায়ে নালাখোলা, বানের খেলা নদীর হ'লো বল
দামোদরে জড় হলো চৌদ্দ তাল জল॥

দুরন্ত নদ দামোদরের উৎপত্তি নিয়ে রচিত ছড়াটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ছোট তিনটি নদের একত্রতাই দামোদর নদের বিশালত্ব। তাই ছড়ায় বলা হয়েছে—

ক্ষুদে, মুনে, বরাকর,　　এই তিন নিয়ে দামোদর।

অন্যদিকে অতিবৃষ্টির ফলে প্লাবন নিয়ে রচিত অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলায় প্রচলিত ছড়াটি হলো—

কার কথা কাঁয় শুনে চৈত্রমাসে বান,
কারো গেল চিনা কাউন, কারো গেল ধান।

ছড়াটির বক্তব্য হোল, বাংলা ১১৯৩ সালে চৈত্রমাসে রংপুর জেলার কাকীনিয়া অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে যে ভীষণ জলপ্লাবন হয়—তাতে বহু লোক সর্বস্বান্ত হন এবং অনেকে প্রাণ ত্যাগ করেন।

নদীর বন্যা, অতিবৃষ্টির ফলে জলপ্লাবন ছাড়াও ঝড় ঝঞ্ঝা নিয়ে রচিত যশোর খুলনায় নিম্নোক্ত ছড়াটি উল্লেখযোগ্য।

তালগাছে বিড়ালের ছাও শালিক নেয়ট পাড়ে
কত মানুষের গরু মারা গেল জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে।

বিগত ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যশোর খুলনার সুন্দরবন অঞ্চলে যে প্রবল ঝড় হয়—তাকে সাধারণ লোকে 'জ্যেষ্ঠের ঝড়' আখ্যা দিয়েছে। ঐ ঝড়ে অসংখ্য মানুষ ও গবাদি পশু মারা যাওয়ায় ছড়া রচিত হয়ে সেই ধ্বংশলীলার কাহিনী আজও অমর হয়ে আছে।

প্রাকৃতির বিপর্যয় ছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের বাঘের উপদ্রব নিয়ে কতকগুলি ছড়া রচিত হয়েছে। এর মধ্যে—

নীলমণিরে খাইল বাঘে অন্য লোকে কি বা লাগে।

আউশাহী গ্রামে (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) একদা বাঘের উপদ্রবে নীলমণি নামক এক বলশালী যুবককেও যে বাঘের পেটে যেতে হয়েছিল—এ ছড়াটি তারই স্মৃতি।

যশোর খুলনা অঞ্চলের প্রচলিত ছড়াটিও ঠিক আগের মতই। শুধু নামটার যা পরিবর্তন।

শঙ্কর চক্রবর্তীকে খেলো বাঘে অন্য লোক আর কোথায় লাগে।

'যশোর খুলনার ইতিহাস' রচয়িতা সতীশচন্দ্র মিত্র ছড়ায় বর্ণিত শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রতাপাদিত্যের দূত হিসেবে পরিচয় দিতে চেয়েছেন। তিনি মামুলীভাবে বাঘে খাওয়ার বদলে অন্য অর্থ করেছেন। তিনি লিখেছেন, রাজমহলে মোগল সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য প্রতাপাদিত্যের দূত শঙ্কর চক্রবর্তী যখন গোপনে সেখানে যান তখন শের খাঁ নামে মোগলদের কোন এক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শঙ্কর চক্রবর্তীকে বন্দী করেন। শের অর্থে বাঘ—তাই এই প্রবাদের সৃষ্টি হ'য়েছিল। শঙ্কর চক্রবর্তী সম্পর্কে 'যশোর খুলনার ইতিহাসে' লেখা হ'য়েছে, 'শঙ্কর কিন্তু বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি অচিরে কারারক্ষীগণকে বশীভূত করিয়া রাজমহল হইতে পলায়ন করেন।'

'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?
ধান ফুরুলো পান ফুরুলো খাজনার উপায় কি?
আর কিছুকাল সবুর কর রসুন বুনেছি।'

এ হোল, বাংলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা নিয়ে র'চিত সেই স্মরণীয় ঘুমপাড়ানী ছড়া যা আজও স্মরণ করিয়ে দেয় সেই বর্গী আগমনের ভয়াবহ কাহিনী।

বীরভূমে বর্গীর হাঙ্গামার ফলাফল নিয়ে একটি ছড়া প্রচলিত আছে। ছড়াটি হলো—

যাদবিন্দ সর্বানন্দ, মল্ল শরণ রামভদ্র আর কচ্চিকা চরণ পাঁচে রুদ্র চরণ
বর্গীরে হলেন সদয়া রুদ্র হলেন বৈমুখী ভাস্কর করলে ব্রহ্মহত্যা কাঁদল গাছের পালা পশুপক্ষী।

উপরিউক্ত ছড়াটি বীরভূম জেলার সিউড়ির অন্তর্গত কচুজোড়ার রাজা রুদ্রচরণকে কেন্দ্র করে রচিত। রুদ্রচরণের কুলগুরু ছিলেন কবি যাদবিন্দ ভট্টাচার্য। বর্গীর সর্দার ভাস্কর পণ্ডিত যখন বীরভূম আক্রমণ করেন তখন রুদ্রচরণ প্রবল পরাক্রমে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও, তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

এছাড়াও নিম্নবঙ্গে একদা মগ ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে গ্রাম-গ্রামান্তরে যে বিভীষিকার সৃষ্টি হ'য়েছিল তা নিয়ে রচিত দু একটি ছড়া সেই পুরোনো দিনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সংগৃহীত ছড়াটি হলো—

তালগাছের আড়ে, আছে আকনড়ে মুখে বলতে দেব না বাবা
ছেলে ধরার ভয় হয়েছে, পথে যেওনারে বাবা বানিয়ে দেবে হাবা গোবা
চিনি দেবে থাবা থাবা একা পথে যেওনারে বাবা।

বর্গীর ভয়ের মতই এখানে যে 'আকনড়ে'র ভয় দেখানো হয়েছে তা সেই 'মগের মুল্লুকের' কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে। পর্তুগীজদের দোসর মগ-আরাকানীদের কথাই ছড়ায় ব্যক্ত হ'য়েছে 'আকনড়ে' হিসেবে। আরাকানবাসী মগেরা সে সময় গ্রাম গ্রামান্তরে শিশুনারী প্রভৃতি বলপূর্বক ধ'রে চালান দিতো বলেই গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে এক ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল।

এই সময়েই প্রচলিত আর একটি ছড়া সে সময়ের সামাজিক ইতিহাসের এক সাক্ষ্য হয়ে আছে। ছড়াটি হলো,

যদুর কাঁধে বাঁশ, মধুর সুতোর আঁশ, হরির সর্ব্বোনাশ।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে মগ দৌরাত্মের ফলে সামাজিক জীবনের এক চিত্র এই ছড়াটি। সে সময়ে মগ দস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত নারীগণ 'ভারার মেয়ে' নামে বিভিন্ন স্থানের হাটে বিক্রীর জন্যে চালান যেতো। এখানে 'ভারা' কথাটির অর্থ হোল নৌকো। সুতরাং ভারার মেয়ের অর্থ দাঁড়াচ্ছে নৌকোর মেয়ে—অর্থাৎ কিনা মগ দস্যুদের হাতে বন্দিনী নৌকো বোঝাই মেয়ে। তদানীন্তন মেদিনীপুর জেলায় তমলুক এবং উড়িষ্যার বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী পিপলী অঞ্চলে বসতো এই মেয়ে কেনা-বেচার হাট। আড়কাটিদাররা হাট থেকে ঐ মেয়েগুলি কিনে এনে ব্রাহ্মণকন্যা বলে বিক্রী করে দিতেন ব্রাহ্মণসন্তানদের কাছে বিয়ের কনে হিসেবে। কিন্তু পরে জানা যেতো—ঐসব মেয়েরা মোটেই ব্রাহ্মণকন্যা নন। ছড়ার বর্ণনায় দেখা যাবে, যদু যে মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি হলেন ডোমকন্যা অথবা ডুলি বাহকের কন্যা। ঠিক তেমনি মধুর ভাগ্যে জুটেছিল তন্তবায় কন্যা এবং সবশেষে হরির ভাগ্যে যে সর্বনাশ ঘটলো তা হচ্ছে যে, কোন এক অসতীর কন্যাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে। এই হল মোটামুটি সেই সামাজিক কলঙ্কময় ইতিহাস—যা ছড়ার মাধ্যমে অমর হয়ে আছে।

প্রসঙ্গক্রমে সামাজিক ইতিহাসের এই অধ্যায় সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এই ঘৃণ্য ব্যবসা বহুদিন পর্যন্ত সমাজে টিকে ছিলো। আজ থেকে ষাটবছর আগে হাওড়া জেলার জনৈক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এ সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। আগ্রহশীলদের অবগতির জন্যে তা এখানে উল্লেখ করা গেল।

তিনি লিখেছেন, 'Slavery was in vogue in Howrah. Public advertisement appeared in those days giving a minute description of the boy or girl to be sold or bought and I remember an old lady still living speaking of the slave girls she had bought on different times when she lived in Howrah to wait on her..., The

difficulty arose from the simple fact of its being an institution of old standing introduced into the country by the Mahomedans, encouraged by the Dutch and prized by the Portuguese who were actively engaged with the Mugs in carring off people of both sexes forcibly. Their depreciations were at their height during 1760—1770. During 1770 they came close to Howrah and the alarm was so great that an iron chain had to be thrown accross the river to stop them.'

বাংলার বুকে বর্গী ও মগদের অত্যাচারের চিত্র ছড়ায় যেভাবে অমরত্ব লাভ করেছে, তেমনি বর্ধমান জেলায় ঠ্যাঙাড়েদের চিত্রও প্রচলিত ছড়ায় স্থান পেয়েছে। এমনি একটি ছড়া হলো—

যদি পেরুলি করজোনা, নেয়ে ধুয়ে ঘরখানা,
যদি না পেরুলি করজোনা, দল চাপা দে ঘুম যানা।

করজোনা হোল বর্ধমান জেলার সদর থানার অন্তর্গত একদা সমৃদ্ধ :একটি প্রাচীন গ্রাম। কালের প্রভাবে কোম্পানীর আমলের প্রথমদিকে ঠ্যাঙাড়েদের উৎপাতের জন্যে করজোনা কুখ্যাত হয়ে পড়ে। করজোনার কাছে দুর্ধর্ষ ঠ্যাঙাড়েরা পথচারীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে হত্যা করতো। সেই পুরোণো দিনের করজোনার স্মৃতি টিকে রয়েছে আজও এই ছড়ার মধ্যে।

ঠিক বর্ধমান জেলার মতো বীরভূমের সামাজিক ইতিহাসের চিত্রও তাই। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বীরভূম জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং তার ফলে দস্যু তস্করের উপদ্রব চরম সীমায় পৌঁছে। পথ-ঘাটের সামান্যতম নিরাপত্তাও যে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল—তা জানা যায় প্রচলিত ছড়ার মাধ্যমে। বলা হয়েছে—

যদি পেরোবি কুলে ঘরে আয়গা বলে।

বীরভূমের মহম্মদবাজারের উত্তরে এই কুলে নদী। অতীতে স্থানটি অরণ্যবেষ্টিত থাকার জন্যে ডাকাতের আড্ডা গড়ে ওঠে এবং কুলে নদী পেরিয়ে যে যেতে পারতো সে যে ঘরে পৌঁছে যেতো নির্বিবাদে তা ঐ ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে।

মেদিনীপুর জেলাতেও প্রচলিত অনুরূপ ছড়া—

যদি পেরুলি তারাজুলী তবে জানবি ঘরকে এলি।

তারাজুলী মেদিনীপুর জেলার জাড়া-রামজীবন পুরের কাছ দিয়ে প্রবাহিত একটি ছোট্ট নদী। হুগলীর গোঘাট আর আরামবাগ থানা এলাকাও এর কাছাকাছি। সুতরাং এ অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাতদের কাহিনী সুবিদিত।

বীরভূম জেলায় বিভিন্নস্থানে ডাকাতির জন্যে যে সব স্থান পরিচিত ছিল সেগুলিকে ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে—

এত বলেও না ঢোকে প্যাটে, মরগা গিয়ে মেলের মাঠে।

'পারুই হতে বেরগাঁ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মাঠকে মেলের মাঠ বলতো। এখানে ডাকাতের উপদ্রব ছিলো। মেলের মাঠে গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

অন্য একটি ছড়ায় এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

লাগাইও না বেশী ল্যাঠা কেনার ডাঙ্গায় কে কার ব্যাটা।

এই ছড়াটির মর্মার্থ হলো, 'এখানে ভীষণ ডাকাতের উপদ্রব ছিলো তাই এই প্রবাদের সৃষ্টি। গল্প আছে নাকি কোন ডাকাত পথিককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে; তখন পথিক দেখে—ডাকাত হল তার বাবা। তাই প্রাণভয়ে চীৎকার করে ওঠে। আপন পরিচয় দিয়ে তবুও নিস্তার পায় না। পাঁচড়া থেকে খয়রাশোল পর্যন্ত বিস্তৃত ডাঙ্গায় কেনারাম ডাকাতের আস্তানা ছিল। এখনও ঐ ডাঙ্গাকে কেনার ডাঙ্গা বলে।' মাসিক চন্দ্রভাগা চৈত্র '৭৫

বীরত্বব্যঞ্জক ও বিদ্রোহাত্মক ঘটনা সম্বলিত যে সব ছড়া প্রচলিত ছিলো, তার মধ্যে গ্রামবাংলার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য লুকিয়ে আছে। ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত লাউসেন ও ইছাই ঘোষের যুদ্ধে ইছাইয়ের পরাজয় নিয়ে বীরভূম অঞ্চলে যে ছড়া প্রচলিত আছে, তা হলো—

শনিবার সপ্তমী সম্মুখে বার বেলা, আজি রণে যেও নারে ইচ্ছাই গোয়ালা।

আলোচ্য ছড়াটি বীরভূমের কেন্দুবিল্ব অঞ্চলের লোকমুখে আজও শোনা যায়। কেন্দুবিল্বের কাছাকাছি অজয়নদের তীরে ইছাই ঘোষের দেউল আজও বর্তমান। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে বর্ণিত ইছাই ঘোষের মৃত্যুতে ইছাইয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা শ্যামারূপা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে কেঁদেছিলেন। তিনি ইছাইকে যুদ্ধে যেতে বারণ করে দৈববাণীও করেছিলেন—এ ছড়াটি তারই স্মৃতি।

আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত ছড়া—

আগে যায় বাঁকা দীপচাঁদ পিছে গেরো রায়।

এই ছড়াটির মর্মার্থ সম্পর্কে 'বীরভূম বিবরণে' উল্লিখিত হয়েছে যে, 'বীরভূম রাজের হেতমপুর দুর্গের হিন্দু সেনাপতি দিলীপচাঁদ—ম্যাকলিয়ন ও তকী খাঁর গুপ্ত আক্রমণের সংবাদ জানিতে পারিয়া রাজনগর ও দুর্লভপুর হইতে বহু সৈন্য আসিয়াছিল তাহাই পূর্বোক্ত কন্দর খাঁ পরিচালিত বাহিনী এবং গোরাচাঁদ রায় ঘাট দুর্লভপুর হইতে আগত সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। এই হিন্দু সেনাপতিদ্বয় ও কন্দর খাঁ অদম্য বীরত্ব ও অসীম সমর নৈপুণ্যের সহিত ম্যাকলিয়ন ও তকীর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাই উপরিউক্ত ছড়া প্রচলিত আছে।'

বাঙ্গালীর মুক্তি যুদ্ধের বহু কাহিনী আজও সংগৃহীত হয়নি। কিন্তু ছড়া প্রবাদের মধ্যে যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে নীল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে নিম্নোক্ত ছড়াটি উল্লেখযোগ্য—

মোল্লাহাটির লম্বা লাঠি, রইল সব হুদোর আঁটি,
কোলকাতার বাবু ভেয়ে, এল সব বজরা চেপে লড়াই দেখবে ব'লে।

এ সম্পর্কে 'যশোর খুলনার ইতিহাস' লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, 'লড়াই হইয়াছিল কত লোক কত স্থানে হত বা আহত হইয়াছিল তাহার খবর নাই। খবর এইটুকু আছে, তাহাদের যন্ত্রণা ও মৃত্যু সফল হইয়াছিল, জেদ বজায় ছিল। মোল্লাহাটির যে লম্বা লাঠির বলে নীলকরেরা বাঘের মত দেশ শাসন করিতেন, প্রজারা চাষ বন্ধ করিলে সে লাঠির আঁটি পড়িয়া রহিল, উহা ধরিবার লোক জুটিল না। নীলকরের উৎপাত বন্ধ হইয়া আসিল।

প্রসঙ্গত সাঁওতাল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত বীরভূম অঞ্চলের এই দীর্ঘ ছড়াটি স্মরণ করা যেতে পারে।

শুন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে।
শুভবাবুর হুকুম পেয়ে সাঁওতাল যুঝেছে ॥
বেটারা কোক ছাড়িল জড়ো হইল হাজারে হাজার।
কখন এসে কখন লুটে, থাকা হইল ভার ॥

ছড়া প্রবাদ স্মরণীয় করে রেখেছে বদান্যপুরুষদের দানশীলতা ও মহানুভবতা, ধনী ও জমিদার পরিবারের বিলাসিতা, আড়ম্বর ও তাদের যাবতীয় ভাল-মন্দ কার্যকলাপ। প্রচলিত ছড়ায় তাই প্রকাশিত হয়েছে—

দানে চন্নু, অন্নে মান্নু, রঙ্গে রাজনারায়ণ
বিত্তে ছকু, কীর্তে নরু, রাজা যাদব রাম।

এই বহুল প্রচলিত ছড়াটিতে মেদিনীপুর জেলার ছ'জন স্বনামধন্য ব্যক্তির উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে চন্নু হচ্ছেন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রাজবল্লভ গ্রামের দানশীল চন্দ্রশেখর ঘোষ। মেদিনীপুর জেলার কালেকটরের দেওয়ান হ'য়ে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু এই উপার্জিত অর্থ নিজের ভোগ বিলাসে ব্যয় না ক'রে পিতৃদায়, মাতৃদায় ও কন্যাদায়গ্রস্ত বহু বিপন্ন ব্যক্তিকে দান করতেন মুক্ত হস্তে।

মান্নু হলেন মান গোবিন্দ ভঞ্জ। লোয়াদার নিকটবর্তী পুঁয়াপাট গ্রামের ভঞ্জ পরিবারের একজন যশস্বী ব্যক্তি। এদের প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব কারুকার্য সম্পৃক্ত ও পোড়ামাটির মন্দিরটি এখনও এই গ্রামে রয়েছে।

রঙ্গে রাজনারায়ণ হলেন জকপুরের মহাশয় বংশের শেষ কানুনগো রাজনারায়ণ রায় মহাশয়। বিত্তে ছকু হলেন মলিঘাটির চৌধুরী পরিবারের ছকুরাম চৌধুরী। ইনি মহারাষ্ট্রীয়দের দমনের জন্যে কোম্পানীকে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রথম জীবনে সদর কানুনগোর দপ্তরে নায়েব কানুনগোর কার্যও করেছিলেন। জমিদারদের বৈভবের যত প্রকার সামগ্রী থাকা সম্ভব তা তার ছিল বলেই ছড়ায় বিত্তে ছকু হিসেবে খ্যাত হয়েছিল। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

মেদিনীপুরের মত হাওড়া জেলার বিখ্যাত চারজন সম্পর্কে ছড়ায় প্রকাশ না ক'রে যেভাবে বলা হয়েছে তাও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। 'রাম' দিয়ে যুক্ত হাওড়ার এই চারজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন—

ধনে রামজয় মণ্ডল (জয়পুর)
মানে রামজয় কেরানী (রাউতাড়া)
দানে রামকিশোর রায় (তাজপুর)
গানে রাম বসু (শালকিয়া)

আর হাওড়ার তিনজন রাজা হলেন, মদন রাজা, নরেন্দ্রনারায়ণ আর আন্দুল রাজা।

পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাও অমর হয়ে আছেন ছড়ার মাধ্যমে। বীরভূমের লাভপুর অঞ্চলের যাদববাবু তাঁর বহু সৎকীর্তির জন্যে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন প্রচলিত এই ছড়ায়—

সকল লোকে বলছে, যাদবাবু ভারি পুণ্যবান
বাড়ীতে গো শিব বসিয়ে বাড়ী কল্লে কাশীধাম।

এই রকমই আরও একজন দানবীর সম্পর্কে ছড়ায় বর্ণনা করা হয়েছে—

রেতের ঠাকুর কেদার রায়, রেতে আসে রেতে যায়।

ছড়ায় বর্ণিত কেদার রায় ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাবের একজন কর্মচারী এবং বীরভূম জেলার মহম্মদাবাদ পরগণার অধীন অঙ্গারগড়ের অধিবাসী কলেড়া গ্রামে এই রায় মহাশয়ের খনিত দীঘিকে লোকে কেদার রায়ের দীঘি বলে থাকে। কোন এক সময়ে মাতৃদেবীর গঙ্গাস্নানের প্রয়োজনে তিনি অঙ্গারগড় থেকে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীর পর্যন্ত একটা রাস্তা নির্মাণ করে দেন। নবাব দরবারে কাজ ব্যাহত না করে তিনি রাত্রিতে অশ্বারোহণে এসে রাস্তার কাজ পরিদর্শন করতেন এবং রাস্তার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের পারিশ্রমিক দিয়ে আবার রাত্রেই মুর্শিদাবাদ ফিরে যেতেন বলেই সাধারণ লোকে তাঁকে নিয়ে এই ছড়া রচনা করেছিলেন।

যশোর-খুলনা অঞ্চলে প্রচারিত বারভূঁইঞা সীতারাম সম্পর্কে প্রচলিত ছড়া—

ধন্যরাজা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর, যার বলেতে চুরি-ডাকাতি হয়ে গেল দূর।

সীতারামের চেষ্টায় যশোর খুলনার অনেকস্থান দস্যু দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সীতারামের আমলে ভূষণা অঞ্চলে প্রজাবর্গ সুখে বসবাস করার সুযোগ লাভ করে। তাই ছড়ায় সীতারামের এক প্রশস্তি।

দিনাজপুর ও বর্ধমানের রাজা, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং রাণী ভবানীও ছড়ার মাধ্যমে অমর হয়েছেন তাদের স্ব স্ব কার্যকলাপে। তাই লোকমুখে ছড়া প্রচারিত হয়েছে—

দিনাজপুরে নগদ দান বর্ধমানের বৃত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর, রাণী ভবানীর কীর্তি।

মেদিনীপুর জেলাতেও ধনী ভূস্বামীদের সম্পর্কেও এই ধরণের ছড়া প্রচলিত আছে। যেমন—

কাশীঘোড়ার মান, ময়নারাজার ধান, দে নন্দীর টাকা।
কুঁচিল ঘোড়ই-এর পাকা। মতান্তরে, চিল্কীর পাকা

কাশীঘোড়া পরগণার অধিশ্বর ছিলেন স্থানীয় ভূস্বামী রাজা রাজনারয়ণ রায়। তার মান, সম্মান ও প্রতিপত্তি একসময়ে খুবই সুবিখ্যাত ছিল। ময়নাগড়ের রাজাদের বহুজমি জায়গার মালিকানার ফলে উৎপন্ন ফসল ধানের অধিকারী হওয়ায় বিখ্যাত হয়েছেন এই প্রাচুর্যের জন্যে। পলাশী গ্রামের দে, নন্দীরা লবণ ব্যবসায়ে একসময় বিত্তমান হয়েছিলেন এবং চিল্কীর নিকটবর্তী ঘোড়ই পরিবার তাঁদের বৃহৎ অট্টালিকা এবং সুউচ্চ মন্দির নির্মাণের জন্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ঠিক এই ধরণের আর একটি ছড়া—

গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি বনমালী সরকারের বাড়ী
উমিচাঁদের দাড়ি জগৎ শেঠের কড়ি।

মতান্তরে,

গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি বনমালী সরকারের বাড়ী
আমির চাঁদের দাড়ি, হুজুরিমলের কড়ি।

ছড়ায় বর্ণিত গোবিন্দরাম মিত্র গোবিন্দপুর গ্রামে বসবাস করে জব চার্ণকের প্রধান সহকারী হন এবং পরে বহু বিত্তের অধিকারী হয়ে তিনি কলকাতার কুমোরটুলী অঞ্চলে বৃহৎ প্রাসাদ ও একটি নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করেন। পলাশীর যুদ্ধের কিছু পরেই ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'নায়েব ফৌজদার' নিযুক্ত হন। হলওয়েল সাহেব তাঁর গ্রন্থে এই গোবিন্দরামকে 'Black Deputy', 'Naib Zaminder' বা 'Mayor of Calcutta' এই নামে আখ্যা দিয়েছেন। সামাজিক ইতিহাস লেখকদের কেউ কেউ বলেছেন, গোবিন্দরামই গোবিন্দপুরের জঙ্গলাদি কাটাইয়া তথায় বসবাস করেন সেই নিমিত্ত উক্ত স্থানটি তদীয় নামানুসারে গোবিন্দপুর নামে অভিহিত হয়।' যাইহোক কৌশলে গোবিন্দরাম যে তৎকালীন একজন বড়ো শাসনকর্তা হয়ে ছড়ির জোর দেখিয়েছিলেন তা বেশ বোঝা যায়।

বনমালী সরকার ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের একজন দেওয়ান এবং কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটি ট্রেডার ছিলেন।

সেকালে কলকাতার অট্টালিকাসমূহের মধ্যে ১৭৫৬ সালের কলকাতার আবির্ভাবেরও বহু আগে তৈরী তাঁর কুমারটুলীর বাড়ীই সর্বাপেক্ষা বড়ো ছিল।

আমীরচাঁদ ও হুজুরিমল কে জানা যায়নি, তবে উমিচাঁদ ও জগৎশেঠ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সেকালের পুরাণো কলকাতাকে কেন্দ্র করে এই ধরণের আরও একটি ছড়া তৈরী হয়েছিল—

ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার।

রামদুলাল সরকার কোন এক সময়ে মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় তদানীন্তন ইংরেজ সরকারকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। সে যুগের বাঙ্গালী ধনকুবের কৃষ্ণপান্তি এবং মতিলাল শীল একই রামদুলালের সমসাময়িক ছিলেন।

ছড়ায় বর্ণিত প্রাণকৃষ্ণ হালদারের মত ধনী ও বিলাসী ব্যক্তি উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে খুব অল্পই ছিল। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় তাঁর বাড়ীতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তকীরা এসে অতিথিদের মনোরঞ্জন করত এবং এই উপলক্ষে দশ-পনের দিন ধরে সমাগত বহু ব্যক্তিকে তিনি ভূরিভোজে আপ্যায়িত করতেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সর্বসাধারণকে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁর পুজোর ব্যয় হতো লক্ষাধিক টাকা। পরে এই বিখ্যাত বাবু মাটির নীচে নোট জাল করার অপরাধে ধারা পড়েন এবং বিচারে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

জমিদারী ব্যবস্থায় খাজনা আদায় সম্পর্কে চিরাচরিত পদ্ধতি মত আমরা দেখি যে, জমিদারের পক্ষ থেকে প্রজাপীড়ন না করলে খাজনা আদায় হয় না। কিন্তু হুগলীর বালী দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের গোহালখাঁড়া গ্রামের জমিদার মদন চৌধুরী নামে জনৈক দয়ালু জমিদার ঢোল সহরত করলেই প্রজারা খাজনা পৌছে দিতো। তাই ছড়ায় বর্ণনা করা হয়েছে—

ঝা গুড় গুড় বাজনা। মদন চৌধুরীর খাজনা॥

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চলে প্রচলিত একটি ছড়া সরকারী আমলাদের মহৎকীর্তি ঘোষণা করছে। তা হলো—

হরি মোহন পুল, রায় অক্ষয়ের স্কুল
তাহার উপর আহামরি, বজলল করিমের বোর্ডিং লাইব্রেরী।

ঘাটাল মহকুমায় সর্বপ্রথম মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন হরিমোহন সেন, ১৮৭৬ সালে। শীলাবতী নদী ঘাটাল শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় শহরের দুই তীরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় বড় অসুবিধে দেখা দেয়। কিন্তু মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট হরিমোহনবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় লীলাবতী নদীর উপর যে ভাসমান সেতু তৈরী হয়, তা এখনও বর্তমান আছে।

পরবর্তী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আসেন রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই মহতী চেষ্টায় ঘাটালের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়—উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হিসেবে উন্নীত হয়। পর বৎসর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী বজলল করিমের চেষ্টায় ঘাটালে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়। সুতরাং যাঁদের সাহায্যে ও উদ্যোগে ঘাটালের এই উন্নতির সোপান রচিত হয় তাদের কীর্তি ছডার মধ্যে অক্ষয় করে রাখা হয়েছে।

অনুরূপ আর একটি ছড়ায় হাওড়া জেলার বালীগ্রামের উন্নতিতে যাঁদের অবদান ছিল তাঁদের নামও ছড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে—

'ছিরে, বীরে, শান্তিরাম এই তিন নিয়ে বালীগ্রাম।

উপরিউক্ত ছড়া থেকেই বোঝা যায়, বালীগ্রামের সবরকমের উন্নতির জন্যে ছড়ায় বর্ণিত ঐ তিনজন ব্যক্তিই ছিলেন অগ্রণী। বালীতে সর্বপ্রথম শিক্ষালয় পৌরসদন ও বহু প্রাচীন স্থানের সংস্কার ইত্যাদির মূলে শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায় বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান তাই ছডার মধ্যে বর্ণিত হয়ে তাঁদের গৌরব ঘোষণা করছে।

মহারাজ নন্দকুমার সম্পর্কে প্রচলিত যে সব ছড়া তা হলো—

বায়ান্ন লাখী দয়ারাম সে হবে ভাণ্ডারকাম।

মহারাজ নন্দকুমারের আদি বাসস্থান বীরভূমের ভদ্রপুর গ্রাম। মহারাজ একবার লক্ষজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করেন এবং ঐ অনুষ্ঠানে কৃষ্ণনগরের মহারাজা ও নাটোরের অধিপতি উপস্থিত থেকে এই বৃহৎ ক্রিয়া সম্পন্ন করান। গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক উৎসব ও অনুষ্ঠানের জন্যে একজন উপযুক্ত লোককে ভাঁডার ঘরের দায়িত্ব দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানে সে সময় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম—যিনি ছিলেন সে সময়েই বাহান্ন লক্ষ টাকার মালিক। সেকালের দেওয়ানদের বিত্ত সম্পর্কে আমরা এই ছড়াটি থেকে একটা পরিচয় লাভ করতে পারি।

নন্দকুমারের আয়োজিত এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রচলিত আর ছড়ায় বলা হয়েছে—

ভাদুরের নন্দকুমার লক্ষবামুন কল্লে সুমার,
কেউ খেলে মাছের মুড়ো কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো

দেখা যাচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করতে সে সময়েও বন্দুকের যে কুঁদো ব্যবহার হয়েছিল। তাও বেশ কৌতুককর ব্যাপার।

নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রচিত একটি ছড়া—

দরবার অসাধ্য পুত্র অবাধ্য কেবল ভরসা গঙ্গা গোবিন্দ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজে এই ছড়াটি রচনা করেছিলেন নানা কারণে। বাংলার রাজস্ব কাউন্সিলের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গা গোবিন্দের সংগে সদ্ভাব রেখে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি রুগ্নাবস্থায় পুত্র শিবচন্দ্রকে প্রায়ই কলকাতা হয়ে গঙ্গাগোবিন্দের কাছে দরবার করতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু পুত্র পিতার কথায় কান দিতেন না বলেই কৃষ্ণচন্দ্র উপরিউক্ত ছড়া রচনা করে গঙ্গাগোবিন্দকে পত্র দিতেন।

রাজা-মহারাজা আর জমিদার গোমস্তাদের নিয়ে যে সব ছড়া তৈরী হয়েছে তার মধ্যে অত্যাচারীদের কথাও বিদ্রূপ করে ছড়ার মধ্যে বলা হয়েছে। এমনই একটা ছড়া হলো,

ইকির মিকির চাম চিকির চামেকাটা মজুমদার। ধেয়ে এল দামুদার

ছড়ায় বর্ণিত মজুমদার হল বাংলার তিন মজুমদার। নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার সাবর্ণ চৌধুরী বা সাবর্ণ মজুমদারের পূর্বপুরুষ লক্ষীকান্ত মজুমদার এবং বাঁশবেড়ের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়ানন্দ মজুমদার এদের দৌরাত্মের জন্যে সাধারণ মানুষের কাছে এরা এমন ভীতির কারণ হয়েছিলেন যে, আজও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দু'হাতের দশ আঙুল মেলে ধ'রে ছড়া আবৃত্তি করে থাকে।

শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নিয়েও অনেক ছড়া রচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বীরভূম বিবরণে উল্লিখিত হয়েছে, '...শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নিবৃত্তির জন্যে যাঁহাদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা বীরভূমে স্মরণীয় হইয়া আছে, মুলুকের রামকানাই ঠাকুরকে সেই দলের অগ্রবর্তী বললেও অত্যুক্তি হয় না। মুলুকে অপরাজিতা পুজা লইয়াও রামকানাইকে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হইয়াছিল, বীরভূমে একটি ছড়া প্রচলিত আছে—

মুলুকে অপরাজিতা মঙ্গল ডিহে রাস, ভুরকুণ্ডায় ডেঙ্গোঠাকুর শুনতে উপহাস।'

মঙ্গল ডিহির ঠাকুরেরা সখ্যভাবের উপাসক কিন্তু রাসযাত্রাই সেখানে সর্বপ্রধান উৎসব। ভুরকুণ্ডায় ঠাকুরের বামে শ্রীমতী নাই, অথচ তাহারা মধুর রসের উপাসক ছিলেন, আর বৈষ্ণবের পাট মুলুকে অপরাজিতা দেবী আছেন, তাঁহার আবার দুর্গোৎসবের কয়দিন বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে, তাই ছড়ায় এই উপহাস।'

সামাজিক কারণে ছড়া কেটে যে সব ব্যাঙ্গোক্তি করা হয়েছিল তারমধ্যে রাজা রামমোহনকে কেন্দ্র করে রচিত ছড়াটিই সেকালে ছিল বহুল প্রচারিত। ছড়াটি হলো—

সুরাই মেলের কুল বাড়ী খানাকুল
ওঁ তৎসৎ বলে এক বানিয়েছে ইস্কুল।

উদ্ধৃত ছড়াটি থেকে জানতে পারা যায় যে রামমোহন ছিলেন সুরাই মেলের কুলীন ব্রাহ্মণ এবং ওঁতৎসৎ কথাটি ব্রাহ্মধর্মকে উদ্দেশ্য করে কথিত।

পরবর্তীকালে এই ধরণের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ ছড়া রচিত হয়েছে গ্রাম গ্রামান্তরে। মেদিনীপুর জেলার 'নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত' পুস্তকে এই ধরণের এক ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। ছড়াটি অস্পৃশ্যতা

বর্জনকে কেন্দ্র করে বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে শ্লেষ করে রচিত। সে সময়ের সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব এই ছড়ার মধ্যে সুপরিস্ফুট। ছড়াটি হলো—

আনন্দ এঁড়ে অভয় গাই,　　জীবন বাছুর, ভিখারী ধাই,

মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার আমদাবাদ গ্রামের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের হরেকৃষ্ণ দাস একজন নিষ্ঠাবান গৃহস্থ ছিলেন এবং এক সময়ে তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্যে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। ঐ প্রীতিভোজে প্রায় হাজার পনের লোক যোগদান করেন। কিন্তু প্রতিবেশী অভয় কাথিলা, আনন্দ দীণ্ডা, ভিখারী আচার্য প্রভৃতি বাধাদান করেছিল বলেই তাদের বিরুদ্ধে এই ছড়াটি রচিত হয়েছিল।

বাঙলা দেশের সমুদয় জাতিগোষ্ঠি ও সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কত যে উপদেশাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক ছড়া প্রবাদ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই ধরণের জাতিমূলক ছড়াগুলিও নৃতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণার সহায়ক হ'তে পারে মনে ক'রে এগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বল্লাল সেনের আমলে ব্রাহ্মণদের মতে কায়স্থদের ঘোষ, বসু ও মিত্র সম্প্রদায়ও কৌলিন্য লাভ করেছিল। গুহ রাঢ়ে কৌলিন্য লাভ করতে পারেনি বটে, কিন্তু বঙ্গে কৌলিন্য পেয়েছিলেন। অপরদিকে দত্ত বিনয়হীন হওয়ায় অকুলীন হ'য়ে পড়েছিল। তাই ছড়ায় বলা হয়েছে,

ঘোষ, বসু, মিত্র কুলের অধিকারী　　অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি।

এইসব কুলীন কায়স্থ সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে যাঁরা বসতি স্থাপন করেছিলেন তাদের নাম ছড়ায় বিখ্যাত হয়ে আছে।

আকনায় প্রভাকর, নিশাপতি বালী,
শক্তিবসু বাগাণ্ডা গেলা, মুক্তি বসু মাইনগরী।
হুই মিত্র বড়িশা গেলা, গুঁই মিত্র ঢাকা,
একে একে করে লও তিন কুল ছয় সমাজের লেখা।

এই ধরণেরই অন্য একটি ছড়ায় বর্ণিত হয়েছে—

আকনাতে গেল ঘোষ মাইনাতে বসু　　বড়িশা রহিলা মিত্র দুঃখ রহে কিছু।

উল্লিখিত প্রথম ছড়াটিতে দেখা যাচ্ছে, প্রভাকর ও নিশাপতি যথাক্রমে আকনায় ও বালীতে ঘোষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। শক্তি ও মুক্তি যথাক্রমে বাগাণ্ডা ও মাইনগরীতে বসু বংশের এবং হুই ও গুঁই যথাক্রমে বড়িশা ও ঢাকার মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

অপর ছড়াটিতে এই কায়স্থ সমাজের মধ্যে যাঁরা বিশেষ মর্যাদাশীল হ'য়ে উঠেছিলেন, সেই আকনার ঘোষ মাহানগরের বসু এবং বড়িশার মিত্রদের কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, হুগলীর সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ বন্দর পতনের পর, কায়স্থদের এই প্রসিদ্ধ সমাজস্থানও সেই সঙ্গে লুপ্ত হয় এবং বাঙলার নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

কায়স্থদের মত রাঢীয় ব্রাহ্মণ সমাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

মুখুটি কুটিল বড় বন্দ্যঘটি সাদা এদের মাঝে বসে আছেন চট্ট হারামজাদা।

অনুরূপ, বারেন্দ্র শ্রেণী সম্পর্কে—

মৈত্রকুল শিবতুল, বাগচী কুল সাদা সান্ন্যাল বংশ ঘোর পাগলা, লাহিড়ী হারামজাদা।

কায়স্থ সমাজেও ঠিক এই ধরণের প্রচলিত ছড়া প্রসঙ্গত তুলনীয়।

ঘোষ বংশ বড় বংশ, বোস বংশ দাতা, মিত্তির কুলীন বংশ দত্ত হারামজাদা।

প্রচলিত গ্রামীন ছড়া প্রবাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজের অনেক প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তান সন্ততি এই সময়ে ছাপান্নখানি পৃথক পৃথক গ্রামী বা গাঁই পদবী হয়। কিন্তু এছাড়াও সাতশতী নামে আর এক শ্রেণীর আদিম পতিত ব্রাহ্মণ যে ছিলেন এবং উক্ত আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণ অথবা তাঁদের সন্তানরা অনেকেই এই সাতশতীর কন্যা যে গ্রহণ করেছিলেন, তা প্রচলিত ছড়ায় জানা যায়।

পঞ্চ গোত্র ছাপান্ন গাঁই এ ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।
যদি থাকে দু এক ঘর সে সাতশতী আর পরাশর।

কথিত শতশতী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ কার কাছ থেকে কোন্ গ্রাম পেয়েছিলেন তার কোন লিখিত ইতিহাস নেই বটে, কিন্তু একটি প্রচলিত দীর্ঘ ছড়ায় এই সাতশতীদের বিচিত্র উপাধিগুলির নাম থাকায় এই উপাধিগুলি যে গাঁই পদবী অনুসারে প্রচলিত হ'য়েছিল তা বোঝা যায়। ছড়াটি হলো—

'সাগাই, সুরাই, নালশী, বগাই, হাঁসাই কালাই ধাঁই।
বালসী, বাণ্টুরী, ধানুসী কাটালী কুশলোজ্জল গাঁই।
কাশ্যপ, কাঞ্জরী, বাতারি, পিতারি নাতারি আর বেরু,
বাগরাই উল্লুক ঝরঝর মুল্লক ফর ফর কেরল চের চেরু।
বালখুরী পুংসিক দীঘল গাঁই ভাদাড়ী ভট্টশালী করঞ্জ তাই
নগড়ি দহড়ী হাম সেচাই কৌণ্ডিল্য বাপারি বাগুরাই।'

অন্যত্র বৈদিক ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরা ছড়া কেটেছেন—

যারা এদিক, না ওদিক তারাই হয় বৈদিক।

এর মর্মার্থ হলো যে যাঁরা রাঢ়ীয় নন আর বারেন্দ্রও নন। সুতরাং তাঁরা উপরিউক্ত পঞ্চগোত্র ও ছাপান্ন গাঁই এর অন্তর্ভূক্ত যখন হতে পারেন না তখন তারা বৈদিক শ্রেণীভুক্ত।

ব্রাহ্মণ সমাজকে উদ্দেশ্য করে শ্লেষ ভরে অন্যান্য সম্প্রদায় ছড়া রচনা করেছেন—

হাড়ী, যুগী, বামুন তিন জাতি আপন আপন।

এ ছড়ায় বলা হয়েছে হাড়ী জাতির পুরোহিত যখন হাড়ী, যুগীর পুরোহিত যুগী এবং ব্রাহ্মণের পুরোহিত ব্রাহ্মণ, তখন এই তিন জাতি আপন আপন হ'তে বাধা কোথায়?

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছাড়াও, বল্লালসেন যে জাতিগঠন নীতি প্রচলিত করেছিলেন তাতে কোন্

কোন জাতিগোষ্ঠি নবশাখ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত তা বিভিন্ন স্থানে যে সব প্রচলিত ছড়া প্রবাদ আছে তা উদ্ধৃত হোল।

রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত ছড়া হলো—

তেলি মালি বাঁশালি, তাঁতি নাপিত মধুলি, কংস শংখ গোছালি
কামার কুমর পুঁটলি, এই নবশাখাবলি।

ছড়ায় বর্ণিত বাঁশালি অর্থে বাঁশের বাঁক ব্যবহারকারী দধি দুগ্ধের ব্যবসায়ী গোয়ালা। মধুলি মোদক বা ময়রা। গোছালি অর্থে পানের গোছ বিক্রয়কারী বারুই বা বারুজীবি এবং পুঁটলি অর্থে মসলার পুঁটুলি বিক্রয়কারী গন্ধ বণিক।

নবশাখ সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ছড়া—

তৈ তাঁতি মালাকার গোপ নাপিত পত্রধর কামার কুমোর মনোহর।

তৈ অর্থে তেলি, পত্রধর অর্থে বলা যেতে পারে পত্রের ব্যবসায়ের জন্য বারুই অথবা পাটি প্রস্তুতকারী এবং মনোহর অর্থে মোদক বা ময়রা।

এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নবশাখ সম্পর্কে বিভিন্ন ছড়া।

মনে হয় যে জাতি গোষ্ঠী যে অঞ্চলে প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলো তাদের কথাও ছড়ার অন্তর্ভূক্ত করে দেওয়া হয়েছিল বলেই, নবশাখ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের প্রচলিত ছড়া পাওয়া যাচ্ছে। যথা—

তৈ, নাই, তামূলি তিলি মালি গোছালি কামার কুমোর পাটালি।

*

তিলি মালি গোছালি কামার কুমার পাটালি নরসুন্দর তাঁতি তামলি।

*

তিলি মালি ব্যাসালি তাঁতি নাপিত মধুলি কামার কুমোর গোছালি।

*

তেলি মালি গোছালি কামার কুমার পুঁটলি ময়রা নাপিত সুতুলি।

*

তেলি মালি গোছালি কামার কুমোর পাটালি তাঁতি নাপিত ব্যাসালি।

*

তেলি মালি তামালি গোপ নাপিত গোছালি (বা পোছালি) কামার কুমোর পুঁটুলি।

ব্যাসালি শব্দে বলা হয়েছে, বড়বড় হাঁড়ি বা হাঁড়া যাতে গোয়ালারা দুধ জ্বাল দেন বা দধি নবনীত প্রস্তুত করে। দধি দুগ্ধের ব্যবসায়ী আহীর গোপ অর্থাৎ আহীর শ্রেণীর গোয়ালা জাতি পূর্ব্বাঙ্গে সর্বত্রই নবশাখ শ্রেণীভুক্ত।

যশোর খুলনা জেলায় নবশাখ সম্বন্ধে আর এক প্রচলিত শ্লোক আছে যথা—

তৈ তাঁতি তথা বার, গোপ মালি কর্মকার,
কুরি ময়রা দিয়া আষ্ট, নাপিত সর্ব কনিষ্ঠ।

এখানে বার অর্থে বারুজীবী, কুরি অর্থে যাহারা মুড়কী-বাতাসা ইত্যাদি বিক্রয় করে তাদের

বুঝিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

মেদিনীপুর জেলার একটি উপজাতি সম্পর্কেও ছড়া প্রচলিত আছে। ছড়াটী হলো—

চোরকে চোর চিনে কাণ্ড্রাদের পুরাতন চোর চিনে।

এই ছড়াটির বুৎপত্তি সম্পর্কে যোগেশ বসুর 'মেদিনীপুর জেলার ইতিহাসে যা' বলা হয়েছে, 'কাণ্ড্রা ও কদমা দুইটি একই জাতি। উড়িষ্যায় উহারা কাণ্ডা এবং মেদিনীপুরে কদমা ও কাণ্ড্রা উভয় নামেই পরিচিত। হিন্দু রাজত্বে উহারা দেশীয় সৈন্যের কার্য করিতেন এবং পাইক নামে অবিহিত হইতেন। উপরিউক্ত ছড়ার দ্বারা অনুমিত হয় যে, পূর্বে কাণ্ড্রাদের অধিকাংশ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই দুর্নাম দূর করিবার জন্যই কাণ্ড্রাগণ 'কদমা' নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন।

তন্তুবায়দের সম্পর্কে শ্লেষ করে আর একটি ছড়া—

যত মোগল পাঠান হদ্দ হল ফার্সি পড়ায় তাঁতি।

বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত কতকগুলি বিভিন্ন ধরণের বিষয় নিয়ে তৈরী ছড়া পরিবেশিত হলো।

বৈষ্ণব ধর্ম প্রবাহের ফলে ভক্তদের মধ্যে কীর্তন গানের যে সমধিক প্রসার লাভ ঘটেছিল তা নিম্নোক্ত ছড়াটিতে বোঝা যায়। বলা হয়েছে,

নিমাই চাঁদের বাজলো খোল তাঁতি ভাতি চরকা তোল।

প্রবাদ যে, বীরভূমের ইলামবাজারের নিমাইচরণ চক্রবর্তী একজন বিখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতের সুরে আকৃষ্ট হ'য়ে সকলে তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে দিতেন। তাই ছড়া কেটে নিমাই চাঁদ সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছে।

গ্রামীন সমাজে প্রকৃত মানুষের অধিকার অর্জন করার জন্যে ছড়ায় বলা হয়েছে—

দিনে চাষা রাতে তাঁতি যে হয় তার স্বর্গে বাতি

অর্থাৎ মানুষকে স্বাবলম্বী হতে হলে একদিকে যেমন তন্তুবায় জাতির আদর্শ গ্রহণ করতে হবে অন্যদিকে তেমনি কৃষক হওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

যাত্রা দলের লোকজনদের প্রাত্যহিক জীবনধারা সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে ছড়া রচনা করা হয়েছে—

তেল মাখরে আভাখাবা চিত হয়ে শোবে বাবা,
খাবে যদি যাত্রাদলের ভাত গর্ত দেখে পাতবে বাবা পাত।

খুলনা জেলার একটি ছড়া—

যমুনা নদী মরবেনা নকীপুরের জমিদার পড়বে না।

খুলনা জেলার কালিগঞ্জ অঞ্চলে লোকমুখে প্রচারিত উপরিউক্ত ছড়াটি থেকে বোঝা যায় যে যমুনা নদী একদা প্রবল বহমানা থাকায়-সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, যমুনানদীর মত নকীপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারী শাসন অব্যাহত গতিতে বজায় থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পরবর্তীকালে এই সম্পর্কে বিপরীত ফলই ফলেছে; যমুনা নদী যেমন তার গতি হারিয়ে ফেলেছে তেমনি নকীপুরের জমিদারীও লাটে উঠেছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত এইসব ছড়া প্রবাদগুলি সম্পর্কে 'অধিক কহিব কত, পুঁথি বেড়ে যায়।' ছড়া প্রবাদের মাধ্যমে এই আমাদের গ্রাম বাংলার সমাজ চিত্র—যার মধ্যে নিহিত আছে বাঙ্গালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন চর্যার ঘনিষ্ট পরিচয়। পল্লীর স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সংসারভীরু ধর্মপ্রাণ নরনারী যাঁরা গান গেয়েছে, ছড়া বেঁধেছে, গাথা রচনা করছে আর এর মধ্যেই তারা নিজেদের অগোচরে তাঁদের রচনায় রেখে গেছেন পল্লীর জীবনকথা, লোকসংস্কার আর ভাবাদর্শের পরিচয়। বাংলাদেশের জেলায় জেলায় প্রতি গ্রামেই স্থানীয় ঘটনা নিয়ে এমন বহু গান ছড়া ও প্রবাদ রচনা করা হ'য়েছে যা অতীত দিনের স্মৃতি হিসেবে আজ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকসাহিত্যের বহু উপকরণই আজও এই সমাজে অজ্ঞাত রয়ে গেছে এবং কত যে বিস্মৃতির অতলে লীন হ'য়ে গেছে তারও হিসেব নেই। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের দ্রুত পরিবর্তন ঘট্‌ছে। এর ফলে বাঙ্গালীর আবার অনুষ্ঠান ও ধ্যান ধারণার বহু পরিবর্তন ঘটে যাবে। তাই এগুলির সন্ধান ও সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে বেশী করেই। রবীন্দ্রনাথের উক্তি এই ক্ষেত্রে একান্তই প্রণিধানযোগ্য 'কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ সংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশব নৃত্যের নূপুর নিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে। অথচ আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

গ্রন্থপঞ্জী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লোকসাহিত্য। ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : বাংলার লোকশিল্প। ডঃ সুশীলকুমার দে : বাংলা প্রবাদ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাঙ্গলার লোকসাহিত্য। বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : বীরভূম বিবরণ। তারাপদ সাঁতরা : হাওড়া জেলার লোক উৎসব। বিপিনবিহারী চক্রবর্তী : খাঁটুরার ইতিহাস। সুধীর কুমার মিত্র : হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ। পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ : দাশপুরের ইতিহাস। আলমগীর জলীল : রাজশাহীর ছড়া। আবদুল জলীল : সুন্দরবনের ইতিহাস। গৌরীহর মিত্র : বীরভূমের বিবরণ। অনিল সেনগুপ্ত : আউটশাহীর ইতিবৃত্ত। সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোর খুলনার ইতিহাস। অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : শিবপুর কাহিনী। যোগেশ বসু : মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস। J. M. Ghosh : Magh Raiders in Bengal. অনুকুলচন্দ্র সেন : বর্ধমান পরিচিতি। অজিতকুমার মিত্র : গাঁথা কথিকায় বীরভূম। অধরচন্দ্র ঘটক : নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত। কল্যাণী দত্ত : অতিরিক্ত বাংলা প্রবাদ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৭২। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার : সদগোপ জাতির ইতিহাস। হরিপদ সেনশর্মা : বৈশ্য হিতৈষিনী পত্রিকা (১৩৩৩)

বাংলা বর্ণমালার সংস্কার

রামপ্রসাদ মজুমদার

বাংলা ভাষায় যে বর্ণমালা বর্তমানে প্রচলিত তা মূলতঃ সংস্কৃত বর্ণমালার অনুকরণে। প্রত্নবৈদিক (Proto-Vedic বা সাধারণ নামে Indo-European বা মূল Aryan ভাষার) ভাষা যুগে প্রত্ন-প্রাকৃত বা প্রত্নসংস্কৃত ভাষার কি বর্ণমালা ছিল এবং বর্ণগুলির উচ্চারণ কি ছিল তা বহুকাল পরে যথাযথভাবে জানা সম্ভব নয়। গুরু পরম্পরা বা প্রাচীন ব্যাকরণ এ বিষয়ে নানা সহায়তা করলেও মতভেদ ও পথভেদ রয়েই গেছে। বেশী কি আধুনিক কালের বহু ইংরেজী বর্ণের (যেথা f, s, r প্রভৃতি) উচ্চারণও অনেকের অজানা বা কখনও কখনও অশুদ্ধ হয়। আমাদের বর্ণমালায় যা বর্ণ আছে সেগুলির অনেকের প্রকৃত উচ্চারণ (যেমন অন্ত্যস্থ ব, ণ, স, ষ প্রভৃতি) আমাদের অনেকের জানা নেই বা উচ্চারণও করি না বা দোষদুষ্ট করি; তাছাড়া এমন অনেক ধ্বনি আমরা উচ্চারণ করি (যেমন অ্যা; ইংরাজী z ধ্বনির মত শব্দ; য-স্থলে জ ইত্যাদি) বা উচ্চশিক্ষায় বা ভাষান্তরশিক্ষায় এমন ধ্বনির ব্যবহার করি (যেমন q, এবং ও—উভয়েরই হ্রস্ব-দীর্ঘ ইত্যাদি) যার প্রতীক বাংলা-সংস্কৃতে নেই বা প্রায় নেই। উক্ত ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যভাষার শাখা-প্রশাখা রূপে সংস্কৃত, ইরাণী (পার্ণী), গ্রীক্, লাতিন, জর্মন, ইংরাজী, বাংলা প্রভৃতি গণ্য। সংস্কৃত ভাষায় সংগে যার নানাদিকে সাদৃশ্য সেই আর্যভাষা।

বাংলা ভাষা উত্তর ভারতের বহু ভাষার মতই পরবর্তী অপভ্রংশ ও তার মাতৃস্থানীয় (শেষাবস্থার) প্রাকৃত ভাষা হতেই প্রধানতঃ রূপান্তরিত, ফলে বর্ণ ও বর্ণধ্বনি সাধারণ ও ব্যবহারিক বাংলায় তথা উক্ত ভাষাদ্বয়েও অনুচ্চারিত বা কাজে লাগে না। সে জন্য অনেকে বাংলা বর্ণমালাকে সংক্ষিপ্ততর করার পক্ষপাতী। প্রাথমিক বা নিম্ন বা সাধারণ স্তরে শিক্ষার জন্য ঐরূপ আন্দোলনে আমার দুঃখ বা তেমন দুঃখ হয় না, যদিও নানাদিক ভেবে ছোট না করাই ভাল বলে মনে করি। তবে উচ্চস্তরে বিশেষতঃ গবেষণাদির জন্য নানা ধরণের কৃত্রিম বর্ণ ও স্বরাঘাত-চিহ্ন সৃষ্ট হওয়া অবিলম্বে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। ইংরাজী প্রভৃতি সমৃদ্ধভাষায় নানা চিহ্ন বসিয়ে ও নানা কৃত্রিম বর্ণের সৃষ্টি ক'রে এই অভাব দীর্ঘকাল ধ'রে অনেকটা পূরণ করা হচ্ছে; কিন্তু বাংলা প্রভৃতি এ বিষয়ে প্রায় অনড়-অচল হয়ে আছে। গ্রীক্-রুশ-আর্বী-চীনা প্রভৃতি ভাষার বিশেষ ধ্বনি যদি বাংলায় একেবারে অনুচ্চারিত থাকে বা সেগুলির প্রতীক বর্ণ আমরা যদি না সৃষ্ট করি তবে ঐ ভাষা বিষয়ে বাংলায় বেশ কিছু লিখতে বা উদ্ধৃতি দিতে আমরা পারব কেন?

এখন (১) প্রাকৃতে তথা পালিতে কতগুলি বর্ণ কম আছে, (২) সংস্কৃত-বাংলা বর্ণের ধ্বনির ব্যাখ্যায় কি ত্রুটি আছে বলে মনে করি, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত ও পালিতে বর্ণসংখ্যা অল্প, অপভ্রংশে ও সংখ্যা অল্প; অথচ বর্ণসংস্কার করতে গেলে বর্ণের ধ্বনির বা ব্যাখ্যার দোষত্রুটি সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনার বোধহয় প্রয়োজন আছে।

স্থূলতঃ পালি ও প্রাকৃতে ঋ, ঌ, ঐ, ঔ এবং শ, ষ ও ঃ—এগুলির অস্তিত্ব নাই। পালিতে

ন ও ণ দুই-ই আছে, প্রাকৃতে ন, ন্ন অস্তিত্ব নাই বল্লেই চলে। পালি ভাষাকে কেউ কেউ প্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করেন এবং ফলে রাজা অশোকের পালি ভাষার অনুশাসনগুলিকে প্রাকৃত ভাষায় লেখা বলে মনে করেন। প্রাকৃতের ব্যাপকতর অর্থেই তা বলা যায়। পুরাতন বা অঞ্চলীয় বেদাংশ বা বৈদিক ব্যাকরণের নিয়মের সংগে প্রাকৃত ভাষা ও ব্যাকরণের ঘনিষ্ঠতা ও সংস্কৃতের সংগে পালির ঘনিষ্ঠতা নিবিড় বলে মনে হয়।

এবারে কয়েকটা বর্ণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য বলি। কিছুটা অদ্ভুত ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ত হবে, কিন্তু স্থূল বক্তব্য হয়ত বহুস্থলে সত্য।

অ ও আ :—অ-কে সংস্কৃতাদিতে হ্রস্বস্বর বলা হয়। আর্যভাষা লাতিন ও গ্রীকে 'A' বা এ বা আল্ফার উচ্চারণ মূলে অ ছিল—কেউ কেউ বলেন ; অনেকেই আ উচ্চারণ করেন, যেমন 'অল্ফ' না ব'লে 'আল্ফা', এইভাবে 'Ars Longa…'-কে 'আর্স লঙ্গা…' ইত্যাদি বলা হয় ; ইংরাজীতে উচ্চারণ বহুবিধ। হিন্দীতে অ-ধ্বনি প্র য়ই কিছু আ ধরণের। এখন কথা হচ্ছে যে দুই বা বহুমাত্রায় যদি দীর্ঘ বা প্লুতস্বর হয় তবে 'অ'-এর ধ্বা'ন কি একাধিক মাত্রায় রাখা যায় না? নিশ্চয়ই যায় ব'লে আমার ধারণা, অনেকে কি তাই বলবেন না? পাণিনির শেষ সূত্র 'অ অ'-র ব্যাখ্যায় অ-কারের সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণের কথা বলা হয়। অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ হয়ত সাধারণ হিন্দী অ উচ্চারণের মত, কিন্তু আ হতে অ নিশ্চয়ই পৃথক। পাণিনি সূত্রের প্রথম দিকে 'ইকো গুণবৃদ্ধী' ইত্যাদি অর্থাৎ ই | ঈ, উ | ঊ, ঋ | ৠ ও ৯-এর গুণ ও বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি বলা আছে ; অ | আ প্রসঙ্গ উক্ত সূত্রে নাই। তবে গুণ ও বৃদ্ধির সূত্রে যথাক্রমে 'অ' ও 'আ'-র কথা কেমন করে আসে—তা বুঝি না। আ-কেও একমাত্রায় উচ্চারণ করা যায় ব'লে মনে করি। অ ও আ-র পার্থক্য প্রাচীন গ্রীক্-লাতিনাদি ভাষায় কিভাবে বুঝান্ হত তা দুর্বোধ্য, বর্তমানে সংকেত চিহ্ন ঐ জাতীয় বর্ণে দেওয়া হয়।

ই ও ঈ, উ ও ঊ :—সংস্কৃত শব্দে যি বা যী-র শুদ্ধ উচ্চারণ করতে গিয়ে আমরা ই বা ঈ মত ক'রে থাকি। তদ্বৎ বু বা বূ (অন্তস্থ্য ব)-এর স্থলে উ বা ঊ-র ধ্বনি বার হয়। কিন্তু স্বর ও ব্যঞ্জনের ধ্বনি সাদৃশ্য থাকলেও ধ্ব ন পার্থক্য নেই কি? আমাদের এক জর্মন্ গুরুর মন্তব্য এই ধরণের ছিল যে য বা উক্ত ব কে যুগ্মস্বর-রূপে উচ্চারণ (অর্থাৎ ই অ | বা উ অ) করা ঠিক নয়, দ্রুত ও সবলে উচ্চারণ ক'রে ব্যঞ্জনত্ব দেখান উচিত।

ঋ ও ৯ :—সংস্কৃত বা বাংলা ঋ স্থলে আমাদের উচ্চারণ 'রি' ধরণের, পার্থক্য বোঝান দায়। ঋ ও র-এর উচ্চারণস্থানও মূর্দ্ধা। তবে ঋ বা ৠ স্বীকারের কি প্রয়োজন ছিল? এদের লাতিন প্রভৃতি ভাষায় অস্তিত্ব ছিল কি না জানি না। বর্তমানে তো সংকেতচিহ্ন বহু পাশ্চাত্ত্য ভাষায় আছে। ৯ প্রসঙ্গেও কতকটা উক্ত মন্তব্য করা যায়, কারণ ৯ স্থলে 'লি' লিখলে বা বল্লে স্বর বা ব্যঞ্জনের পার্থক্য বোঝা যায় না। দ্রবিড়ীয় ভাষাগুলি স্থূলতঃ আর্য হলে ওদের বহুবিধ র ও ল-এর পার্থক্য পূর্বে হয়ত—পূর্বোক্ত নানাভাবে দেখান হ'ত, আর সাধারণ মতানুসারে ওগুলি অনার্য হ'লে ঋ প্রভৃতি ধার করা সংস্কৃত বর্ণ—একথা বোধহয় অসম্ভব নয়। ৯-এর প্রয়োগ কেবল একটিমাত্র সংস্কৃত ধাতুর মধ্যে (ক্লিপ) দেখেছি।

এ এবং ও :—এদের এটি সম্ভবতঃ পালিতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই-ই হয়। গ্রীকে 'এ প্সিলোন' বা হ্রস্ব 'এ'-র দীর্ঘরূপ ও নাম 'এ-তা', ও কারেরও গ্রীকে হ্রস্ব ও দীর্ঘরূপ আছে। সংস্কৃতে এগুলি দীর্ঘ। বাঙালীর উচ্চারণ বিকৃতি এ স্থলেও ; এক শব্দ উচ্চারণে এ = অ্যা, একটি শব্দ উচ্চারণে এ = এ।

ঐ ও ঔ :—এদের বাংলায় সাধারণ উচ্চারণ ওই ; ওউ ; যদি অই ও অউ বা ঐ ধরণের কিছু উচ্চারণ করা যায় তা হলেও এদের যুগ্মস্বর বলা যেতে পারে ; পৃথকরূপের প্রয়োজন কি বা *এর সংক্ষিপ্তরূপ কি ?*

ই / ঈ বা এস্থলে প্রভাবে বাংলায় য় বর্ণ বা ধ্বনি দেখা যায় ; সংস্কৃত য স্থলেও বহুস্থলে য় লেখা হয়। যেমন ভবতি—ভবতি>হোদি ; হোঈ>হয় ; যাএ=যায় ইত্যাদি।

স্বরবর্ণের উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত উচ্চারণ ভেদে তৎসংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণও প্রভাবিত হয় মনে হয়। উদাত্ত প্রভৃতির বাস্তব ধ্বনিরূপ লুপ্ত বা লুপ্ত প্রায়। বহু সাধারণ উত্তরভারতীয় পণ্ডিতের বিশ্বাস যে 'উচ্চৈরুদাত্তঃ' ইত্যাদির অর্থ জোর গলায় বল্লে উদাত্ত ইত্যাদি হয়। অন্য মতের কথাও শুনেছি। সূত্রের ভট্টোজীকৃত ব্যাখ্যায় কিন্তু দেখা যায় যে মুখের উচ্চস্থান (তালু প্রভৃতি) হতে উচ্চারিত বর্ণ উদাত্ত ইত্যাদি। পাণিনীয় শিক্ষাসূত্র প্রভৃতিতে এদের স্বর লিপিমতে ব্যাখা দুর্বোধ্য। এ তিনটিকে eccented, unaccented ও circumflex বলাও সংগত হবে কি ? এইগুলির ফলে বা বিশেষ বিশেষ কারণে কতকগুলি ব্যঞ্জনবর্ণেরও বহুবিধ উচ্চারণ বা পার্থক্যযুক্ত, উচ্চারণ করা যায় বা করা হয়—একথা বোধহয় স্বীকার্য। উদাহরণ দিচ্ছি—

ক-বর্গ :—ক্ (অ) বা K (a) ও এর ঈষৎ রূপান্তর প্রভৃতিকে guttural, velar ও labio-velar এই তিন পরিচয়ে বহু ভাষাতত্ত্ববিদ্ পরিচিত করান। মূলে বা ফলে হয়ত k, c, q, qu প্রভৃতির জন্ম বা রূপান্তর। আদিম একটি (বোধহয় আফ্রিকায়) ভাষায় ক উচ্চারণ করতে ভিতরে শ্বাস বা দম নিতে হয় বলে পড়েছি। এক বর্ণের পরিবর্তন বা রূপান্তর তো হয়ই। যেমন বলা হয় সংস্কৃত শতম্ শব্দের শ স্থলে বহু আর্য ভাষায় ক হয় ; যথা লাতিন্ ও গ্রীকে যথাক্রমে Centum (কেন্তুম) ও (he)-Katon ('এ-কাতোন্)। বাংলা প্রভৃতিতে সপ্তাহস্থলে হপ্তা ও শালা স্থলে হালা প্রভৃতি ও হয়ই।

ড় ও ঢ় :—ট বর্গ পাশ্চাত্য আর্যভাষায় ছিল কি ? ড় ও ঢ় দ্রাবিড়ীয় প্রভাবে বা ঐতরেয় আরণ্যকোক্ত "বঙ্গা-বগধা-শ্চেরপাদাঃ"-র সাধারণ প্রভাবে বাংলা ভাষায় এসে থাকতে পারে, অথবা আর্য ভাষায় অতিপূর্বে ছিল ; দ্রবিড়ীয় বা ঐ ধরণের র বা ন ধ্বনির ভেদও হওয়া অসম্ভব নয়। ঋগ্বেদে 'ঈডে' (আমি স্তুতি করি) প্রভৃতির ড-কে ল রূপেও লেখা হয় বা অল্পবিস্তর উচ্চারণ করা হয়।

ফ :—ইংরাজী F ও Ph-কে আমরা ফ উচ্চারণ করি, কিন্তু F-এর উচ্চারণ ওষ্ঠ্য বা ঠিক ওষ্ঠ্য নয়।

বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব :—এদের উচ্চারণ ও লেখায় পার্থক্য দুই-ই (প্রায়) লুপ্ত। সাধারণ বাংলা অভিধানেও দুই ব-এর পার্থক্য দেখান হয় না। এটি লজ্জার কথা। লাতিন্, ইংরাজী প্রভৃতির V-র উচ্চারণ অন্তঃস্থ ব, ভ নয়। সাধারণ বাঙালী Vote-কে ভোট, very-কে ভেরি ইত্যাদি বলে, বোট বা বেরি শুনলে নিশ্চয়ই হাসবে ও পরকে টিটকারী দেবে ; কিন্তু নিজেদের ত্রুটি নয় কি ? W = double V বা দুইগুণ ব। জর্মন্ ভাষায় V রূপী বর্ণটি ভ্ নয় ফ্, ফলে

von = ভন্ নয় ফন্ ; আবার সম্ভবতঃ জর্মন্ W = ভ্ নয়, হ্ব বা এই ধরণের।

শ, ষ, স :—বহু প্রাচীন আর্য ভাষায় এই তিন 'স'-জাতীয় ধ্বনির অস্তিত্ব দেখা যায় না, হয়ত লুপ্ত বা বিকৃত। স ধ্বনি বোধহয় জাঁকাল ছিল। কোন কোন প্রাকৃত গ্রন্থে বা তন্মধ্যে অপভ্রংশসূত্রে অঞ্চলভেদে এক শ কারের উচ্চারণ প্রচলিত বা সাধারণতঃ প্রচলিত এই কথা বলা আছে। বাঙালীর শ উচ্চারণ সহজে হয়, আমরা বিদেশীয় আর্য ভাষায় স-কেও বহু স্থলে শ করে থাকি, যেমন স্কুল বা ক্লাস্ স্থলে ইশ্কুল ইত্যাদি।

ক্ষ :—এটি (ক্ ষ্, অ) বাংলায় কৃত্রিমভাবে এসেছে মনে হচ্ছে, সাধারণ উচ্চারণ ক্ খ।

: ও ৺ :—বিসর্গের উদাহরণ সংস্কৃতজ্ঞেরা হ্ র মত করেন বা পূর্বস্বরে ঝোঁক দেন, উচ্চারণস্থান দুর্জ্ঞেয়। ৺-র প্রয়োগ সন্ধিস্থলে সংস্কৃতে দেখা যায়, অন্যত্র আছে কি না মনে পড়ে না ; উচ্চারণস্থান দুর্জ্ঞেয়।

বিবিধ ভাষার বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও পূর্বোক্ত নানা ধরণের স্বরাঘাতের চিহ্ন ভারতীয় ভাষাগুলিতে বিশেষতঃ বাংলায় নেই বল্লেই হয়। গবেষণাদির জন্য বা বঙ্গাক্ষরে অন্য ভাষার শব্দ লেখার জন্য (transcription) বঙ্গ ভাষায় নূতন বর্ণ—ও স্বরধ্বনির প্রতীক সৃষ্টি করা আশু প্রয়োজন ; তাই নয় কি ? তাহলে বাংলা সাহিত্য ৭ম বা ৮ম স্থান হ'তে উর্দ্ধগামী হবে বা সমৃদ্ধতর হবে এই আশা করি।

'শিখরিদশনা'

ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত ইন্দু রক্ষিত রচিত 'ভারতের রূপাদর্শে তন্বীশ্যামা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। এবং আনন্দ পেয়েছি বলেই তাঁর কাছে আর একটি অনুরূপ আলোচনা দাবী করে এই পত্র লিখতে বসেছি।

'তন্বীশ্যামা' কথাটির প্রচলিত ব্যাখ্যা রক্ষিত মহাশয়ের মনে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করেছিল—ফলে আমরা একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আলোচনা পড়বার সুযোগ পেলাম। কিন্তু, কি আশ্চর্য! 'শিখরিদশনা' কথাটির প্রচলিতার্থ তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় জাগাতে সমর্থ হলো না?—শ্রেণীবদ্ধ পর্বতশিখর দেখলে কি সুন্দরী তরুণীর দন্তপংক্তির কথা মনে পড়ে? না কোন অবিশ্বাস্যরূপ বিরাটকার হাঙরের করাল দংষ্ট্রা বিকাশ দেখছি বলে মনে হয়? টীকাভাষ্যকারেরা আমার মাথায় থাকুন, এ রকম একটা বিটকেল উপমা কালিদাসের কলম থেকে বেরিয়েছিল এ কথা আমি কিছুতেই মানতে রাজি নই।

যে সব অনুবাদকেরা 'দন্তপাঁতি মনোলোভা' অথবা 'দশনগুলি যেন মুকুতাসার' লিখে ফাঁকি দিয়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করেছেন তাঁদের কথা না তোলাই ভাল। কবি নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ 'দন্ত তুষার শিখর হেন'। সাদা দাঁতের সংগে তুলনায় সুবিধা হবে বলে গিরিশৃঙ্গে তুষার-চুণকামের এই প্রচেষ্টাও খুব প্রীতিকর হয়েছে বলে মনে হয় না।—আর বুদ্ধদেব বসু মহাশয় লিখেছেন 'সূক্ষ্মদান্তিনী'। আফ্রিকার কোন কোন অতি দুরধিগম্য অঞ্চলের কোন কোন অসভ্য জাতির মেয়েরা শুনেছি উখো দিয়ে ঘসে নিজেদের দাঁতগুলোকে সযত্নে সূক্ষ্মাগ্র ও ধারালো করে তোলে। তাদের ধারণা এতে তাদের মুখের সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয়, হাসির মাধুর্যেরও নাকি খুব খোলতাই হয়। প্রাচীন ভারতের বিলাসিনীদের মধ্যেও অনুরূপ প্রসাধন-প্রচেষ্টা প্রচলিত ছিল একথা যতদিন বুদ্ধদেববাবু প্রমাণ করতে না পারছেন ততদিন তাঁর অনুবাদের যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমি অতি অপণ্ডিত ব্যক্তি। শুধু Monier Williams-এর অভিধানখানাই দেখেছি। তাতে দেখলাম, 'শিখরী' শব্দের একটা অর্থ 'the Arabian jasmine' উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী বন্ধু বললেন, ফুলটা হলো কুঁদফুল, অর্থাৎ 'কুন্দপুষ্প'।

তাহলে কি 'শিখরিদশনা'-র সংগে পর্বতশিখরের কোন সম্পর্কই নেই? কথাটার অর্থ কি তাহলে 'কুন্দদন্তী'? সংশয় নিরসনের জন্য রক্ষিত মহাশয়ের শরণ নিলাম।

বোপদেব শর্মা

'শিখরিদশনা'

ভারতের রূপাদর্শে তন্বীশ্যামা প্রবন্ধটির সূত্রে শ্রদ্ধেয় বোপদেব শর্মা মহাশয় লিখিত পত্রখানি পড়লাম। আমার প্রবন্ধ যে সুধীসমাজের কাউকে আনন্দ বা তৃপ্তি দিতে পেরেছে তা জেনে নিজেও তৃপ্তি অনুভব করছি। তিনি যে প্রশ্ন তুলে আমার 'শরণাপন্ন' হ'য়েছেন তার মীমাংসা চেষ্টায় হয়তো আর একটি প্রবন্ধের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আসলে আমি শিল্পী, সংস্কৃতজ্ঞ নই। শিল্প সম্বন্ধে মাঝে মাঝে লিখে থাকি। 'ভারত শিল্পে দেহরূপ' প্রসংগে এবং বেতার কথিকা উপলক্ষ্যে 'শ্যামা' শব্দটি সংশয় এনেছিল। 'শিখরি দশনা' বা 'শিখর দশনা' শব্দও যে আমার মনে সংশয় জাগিয়েছিল তার কিছুটা ইংগিত আমার প্রবন্ধের মধ্যেই আছে। কাব্যানুবাদ যাঁরা করেছেন তাঁরা সত্যই 'শিখরি দশনা'র উপযুক্ত প্রতিশব্দ খুঁজে পাননি বা খুঁজে দেখেননি মনে হয়। কবি প্যারীমোহনের অনুবাদগ্রন্থের টীকায় প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ও তীক্ষ্ণ দন্তের কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—" 'তীক্ষ্ণ দশনা'—মুক্তার মত তীক্ষ্ণ দাঁত নারীদের সৌন্দর্য ও কল্যাণের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত।" মুক্তায় তীক্ষ্ণতার সাদৃশ্য কেমন করে উপযুক্ত বিবেচিত হ'তে পারে তাও প্রশ্ন। রাজশেখর বসু লিখেছিলেন 'ইঁদুর-দাঁতী'। ইঁদুরের মত দাঁত এখনো হয়তো পছন্দের। ছোটদের 'দুধেদাঁত পড়ে গেলে মা, ঠাকুরমারা উপদেশ দিয়ে থাকেন দাঁতটি ইঁদুরের গর্তে ফেলে দিয়ে মুখে বলতে—'ইঁদুর, আমার পড়া দাঁতটি নাও আর তোমার ছোট্ট দাঁতটি দাও।" কিন্তু সে ব্যাখ্যায় মন ভরে না। অন্ততঃ কালিদাসের কালে এমনটি যেন খাপ খায় না।

শিখর শব্দটির একটি প্রতিশব্দ মল্লিকা ফুল অথবা কুন্দ ফুল। Monier Williams-এর 'The bud of srabian Jasmine কুন্দদন্তকে সমর্থন করে। এ কথা শর্মা মহাশয় তো দেখেইছেন। এই প্রতিশব্দটি আপ্তেও উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত করেছেন 'মেদিনী' হতে শব্দকল্পদ্রুমও মল্লিকা প্রতিশব্দটি। Boethlink ও Roch ও 'মল্লিকার' সমর্থন করেছেন—(তাঁর জার্মান হলো—nach einem Schol Zahne wie Jasminknospen.) কুন্দ ফুলের মত দাঁত কুন্দদন্ত বা কুন্দকলি এ উপমা এখনো প্রচলিত, কালিদাসের কালেরও উপযুক্ত ও সুশোভন। অপরপক্ষে সূচাগ্র বা পর্বতশিখরবৎ সত্যই বিসদৃশ, তা সে শিখর তুষারমৌলিই হোক বা আর যাই হোক। এ ছাড়া অভিধানের সমর্থনপুষ্ট আর একটি প্রতিশব্দও অনুসন্ধিৎসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বাংলা অভিধানে জ্ঞানেন্দ্রমোহন একটি প্রতিশব্দের উল্লেখ করেছেন—দাড়িম্ববীজ। সংস্কৃত অভিধানেও আছে এর সমর্থন। তবে সেখানে আছে রত্নের কথা, মাণিক্যের কথা এবং রক্তিমাভার কথা। মনে পড়ে শৈশবকালে যখন অসুস্থতার সময় বেদানা খেতে দেওয়া হতো তখনই বেদানার দানার মধ্যে দাঁতের আকৃতিকে দেখতে পেতাম। এই দ্বিতীয় প্রতিশব্দ বিষয়ে Monier Williams লিখেছেন—"A ruby like gem (of a bright red colour) said to resemble a pomegranate seed". শব্দকল্পদ্রুমও শিখরঃ বলতে মেদিনীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন "পক্কদাড়িমবীজাভমাণিক্যম্"। বাস্তবিক পাকা টুকটুকে লাল ডালিম চুনিকে মনে করিয়ে দেয়। তবে কোন কোন বেদানা পাকা এবং

সুমিষ্ট হলেও তার সাদা হতে বাধা নেই। সেই সাদার একপাশে কিছুটা লাল আভা থাকে যা দন্তসংলগ্ন মাড়িকে স্মরণ করায়। লক্ষ্য করার—Mõnier Williams "of a bright red colour" বাক্যাংশটি বন্ধনীর মধ্যে রেখেছেন। এ বিষয় বিদগ্ধজনেরা চিন্তা ও বিচার করে দেখতে পারেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন শিখর (শিখরি নয়) দশনার দ্বিতীয় প্রতিশব্দ হিসেবে স্পষ্টই লিখেছেন—"দাড়িম্ববীজাভ বা রত্নসদৃশ সুন্দর দন্তযুক্ত।"। জানি না এতটা বলার মত সূত্র তিনি কোথায় পেয়েছিলেন! তবে কুন্দকলি উপমা কাব্যময় ও সুশোভনই আমাদের কাছে প্রতীত হয়।

ইন্দু রক্ষিত

অনন্ত স্বপ্নের মাঝে তুমি মিশে আছো ॥ মৃণাল হালদার ॥ পরিবেশক : গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১এ, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ আড়াই টাকা

ঈশ্বরের চোখে সকলেই সমান ॥ (মহাত্মা গান্ধীর রচনা থেকে সংকলিত) পাবলিকেশনস্ বেতার ও তথ্য মন্ত্রক, ভারত সরকার। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

কবি মৃণাল হালদার তরুণতর কবি। এবং 'অনন্ত স্বপ্নের মাঝে তুমি মিশে আছো তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বিগত পাঁচ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে লেখা কবির কবিতা সংকলন গ্রন্থ এটি। বলাবাহুল্য, এর অধিকাংশ কবিতাই ইতিপূর্বে নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মৃণাল হালদারের কবিতা পাঠ করে পাঠক তাঁকে মূলত রোমান্টিক ভাবনার কবি হিসেবেই অভিহিত করবেন। তাঁর ভাববস্তু প্রেম এবং কবির ভাবনায় মানসদর্পণে কল্পনার কোনো এক মানসী বেদনা অনুরাগের লীলাবৈচিত্র্যে বর্তমান কাব্য সঙ্কলনে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

১ 'অথচ তুমি জানো মাঝে মাঝে আমাদের ব্যক্তিগত আত্মা কত আর্তি নিয়ে কেঁদে ওঠে একটি কবিতার জন্যে, কেন জানি না, তোমার জন্যে কত চেষ্টা করেও একটি কবিতা লেখা হল না।' (অথবা তোমার প্রতিরূপ)

২, তোমার মনের ঋতু পরিবর্ত্তনে
অন্তত কিছু আলো ধরে যেন কেউ
প্রতিটি পদ্মের রক্তিম সীমা রেখা
ভালোবাসা হলে মুছে ফেলে দেবে ঢেউ।' (এই বসন্তে)

'অনন্ত স্বপ্নের মাঝে তুমি মিশে আছো' গ্রন্থের কবিতাবলীর মধ্যে একটি ক্রম-পরিণতিলাভের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়—যা থেকে পাঠক কবির নিজস্ব জগতের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করতে পারেন। কবির মধ্যে যুগযন্ত্রণার গভীর বেদনা কাজ করেছে, তবে তা ক্ষেত্রে বিশেষে সূক্ষ্মশরীরে উপস্থিত না হওয়ায় কোথাও কোথাও প্রেমকে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে তিনি অনুভব করতে পারেন নি। তবু বলা যেতে পারে, কবিকল্পনার ক্ষেত্রে, মূলধর্মে, তাঁর রোমান্টিক মন এক অন্যতর সৃষ্টির নেশায় মগ্ন। বর্তমান কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই প্রেমাভিজ্ঞানের আলো থেকে উৎসারিত বলে সাধারণ পাঠকের চিত্তে দোলা দেয়। বিশেষত কবি যখন বলেন, 'বুকের মধ্যে তোমরা দোলা দোলা দেবে বলেছিলে | এখন আমি কোন এক ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশে, | তোমরা আসতে পারো এখনই প্রকৃষ্ট সময় | আজ না হোক কাল না হোক পরশু তো বলেই…।' (প্রকৃষ্ট সময়) কিংবা 'এই যে আমি ঝাঁপ দিয়েছি বিচূর্ণ কুন্তলে | ভয় কি আছে, এসো না ছাই বনের ময়ূর বলে ; | জ্যোৎস্না মেখে সাগর বেলা স্থ-চিক্চিকে বালি | ওপার বুকে মুখ রেখে আজ হাওয়ার করতালি |

শুনতে পেতাম যদি ?' (সমুদ্রাভিসার) ইত্যাদি। 'তপার জন্য,' নির্বাসন', 'মহিলারা যথাকালে কিংবা 'কাল্পনিক কবিতা পাঠের আসরে' কবিতাবলী কবির ঋজু ভাবনার পরিচায়ক। কবি শান্ত কণ্ঠে প্রেমের কথা উচ্চারণ করতে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন ভালোবাসাবাসির বিষয়সমূহ। কবির প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে বিশেষ জড়তা নেই তবে রূপকল্প নির্মাণে কোথাও কোথাও কষ্টসাধ্য প্রয়াস পাঠকের দৃষ্টি এড়াবার নয়। আঙ্গিকের দিকথেকে আরো যত্নশীল হওয়া আধুনিককালে প্রয়োজন। কবির মধ্যে প্রতিশ্রুতি বর্তমান—এবং আগামী দিনে তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অবশ্যই গভীর থাকবে। গ্রন্থসজ্জা সাধারণ।

'ঈশ্বরের চোখে সকলেই সমান' গ্রন্থটি গান্ধীজীর বিভিন্ন সময়ে লেখা অস্পৃশ্যতা এবং তার নানাদিক সম্পর্কে রচনার সংকলন। প্রাচীন কালথেকে অস্পৃশ্যতা নামক এক সামাজিক ব্যাধির কবলে পড়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে শ্রেণী বৈষম্য মানুষেরই চক্রান্তে লালিত হয়েছে তা ক্ষমাহীন, পরিণাম ক্ষতিকর। বলাবাহুল্য, ঈশ্বরের চোখে, ঈশ্বরের সংসারে সকল মানুষেরই সমানাধিকার।

সমাজের পাপ অস্পৃশ্যতাকে দূর করবার জন্য গান্ধীজীর আজীবন সংগ্রাম সর্বজনবিদিত। হরিজনদের মধ্যেও তিনি কাজ করে গিয়েছেন এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। গান্ধীজী বলেছেন, 'হিন্দু ধর্ম কোথাও কোনও মানুষকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করবার অধিকার দেয় নি। স্বধর্মজ্ঞ এবং স্বধর্মানুসারী কোন ব্রাহ্মণের কাছে সে নিজেও যা—একজন শূদ্রও তা। ব্রাহ্মণের থেকে চণ্ডাল কোন অংশে ছোট একথা ভগবদগীতা কোথাও শেখায়নি। ব্রাহ্মণ যখন নিজেকে সবাইকার থেকে বড় ভাবতে শুরু করে তখন সে আর ব্রাহ্মণ থাকে না।' আবার, 'হিন্দুধর্ম আজ এক দুরপনেয় কলঙ্ক বহন করছে। স্মরণাতীত কাল থেকে আমরা এই কলংকের উত্তরাধিকার লাভ করে আসছি—এ আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই। নিশ্চয়ই সভ্যতার এক সংকটকালে এই বিশ্রী, দুর্ভাগ্যজনক দাসব্যবসায়ী সুলভ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই কলংক থেকে গেছে এবং এখনও সমাজের গায়ে আঠার মত লেগে রয়েছে। আমার মনে হয়, যতদিন এই অভিশপ্ত প্রথা আমাদের মধ্যে রয়েছে ততদিন আমরা এই পুণ্যভূমিতে যত দুঃখ দুর্দশাই ভোগ করি না কেন, সবই হবে এই দারুণ অপরাধের ন্যায্য শাস্তি।'

বলা বাহুল্য, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে অস্পৃশ্যতা আইনত নিষিদ্ধ হলেও স্বাধীনতালাভের সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরেও কোনো কোনো আলোকিত অঞ্চলে এখনও এই অমানবিক প্রথার অস্তিত্ব বর্তমান। এই বিষবৃক্ষের সমূল উৎপাটন অনতিবিলম্বে আবশ্যক। অস্পৃশ্যতামোচনে সেদিক থেকে গান্ধীদর্শন প্রভূত সহায়তা করবে। এই দিক থেকে বেতারমন্ত্রকের অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে গান্ধী ভাবনার বর্তমান সংকলনটির প্রকাশ অত্যন্ত সময়োচিত। শ্রীজি. এল. নন্দের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি সুন্দর।

ইন্দ্রনীল সেন

সপ্তদশ বর্ষ ১৩৭৬

মে ১৯৬৯—এপ্রিল ১৯৭০

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা
সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

চৈত্র

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মর্ডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 April '70 (0.50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN